

## লেখক

কৃষ্ণ ও সুগন্ধ	স্বামী প্রকাশানন্দ	... ৪৩৯
কৃষ্ণ ও প্রেমোন্মত্ততা	শ্রীশবচন চক্রবর্তী, বি, এ	৪২০
জক ছবি ( নং ১ ও নং ২ )	"জ" .. ...	১, ৫৮২
দী (কাব্য)	শ্রীহা	১৭, ১০৪, ২৪৯, ৪ ৬
বিসেকানন্দের জন্মোৎসব	... ..	৩০
বিসেকানন্দের পত্র	... ১০৯, ২০৯, ৩০৭, ৪০৯, ৫৫৯	
দ ও মন্তব্য	... ১২৬, ১৫৮, ১৯১, ২২১, ২৫৩,	
	২৮৫, ৩১৭, ৩৮০, ৪১৬, ৪৫৮, ৪৭০, ৫০৫, ৫৭৫, ৫৯৮, ৬৩১, ৬৭০, ৭০৪	
গান ( কবিতা )	শ্রীক্ষীরোদবিস্তারী বাঘ চৌধুরী	১৫৫
জিব কথা	... ..	১৫৬
জির সত্বিত ছই চাবিটা দিন	শ্রীজিবপদ মিত্র	১৬১
শিষ্ণু-সংবাদ	শ্রীশবচন চক্রবর্তী, বি, এ	১৮৩,
		২২৫, ২০৩
লোচনা	... ১৯১, ২৮২, ৪৫৬, ৫৭৩, ৬৬৮	
জিব কথা	শ্রীজিবপদ মিত্র	২৫৭, ৪৩৪
উত্তম	শ্রীজয়ীকেশ কাক্সিলাল	৩৬০, ৪৮১
পাজ ও মন্তব্য	স্বামী বোধানন্দ	... ৪২৪
জির স্মৃতি	শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ	... ৪৪৯
বৈদেশী সমাজ ( উদ্ধৃত )	শ্রীলবীজনাথ ঠাকুর	... ৫০১
সাধ ( কবিতা )	শ্রীবেবতীমোহন চৌধুরী	... ৬৬৭

## ভ্রমশুদ্ধি ।

“একবাবকার বোণী আর এক একবাব বোজা” নামক প্রবন্ধের ভিতরের পৃষ্ঠা নম্বর ভুলক্রমে ৩৪৭ স্থলে ৩৪৫ এবং সংবাদ ও মন্তব্য ৩৫০ স্থলে ৩৪১ ছাপা হইয়াছে। পাঠকবর্গ অমুগ্রহ পূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীতাপস্বর্গভাষ্যমুদ্রার পৃষ্ঠা নম্বর পৃষ্ঠার নীচে দেখিবেন।

# সামাজিক ছবি ।

( নং ১ )

—:~:~:~:—

“শ্রাম গেও মধুপুর, হাম কুলক্ষা,

বিপথে পডল সখি মালতী মালা ।”

পূর্ণ বাবুর বৈটকখানায় চারমনিয়ম ও ডাইনে ডুবকির বাজনার সঙ্গে একখানি মিঠা গলা গাহিতেছিল,

“বঁধু গেও মধুপুর”

বাহিরে টাননি সন্ধ্যা । বিরহসন্তপ্ত গোপ-বধূ আক্ষেপে প্রতিধ্বনি তান তরঙ্গে গা ভাসাইয়া নিশ্চল জ্যোৎস্নাসমুদ্রে ডুবিয়া বাইতেছিল ।

সন্ধ্যাটি যথার্থই ‘শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিতা’ পাছে তাহার দৌন্দর্য্য-রাশি মুক্তা রূপ অঙ্গ-হীনতা দোষে দূষিত হয়, তাই বুঝি কেহ ছবি খানি সূর্য্যাস্তের করিবার জন্য স্বীয় মোহিনী শক্তি বিস্তার করিয়া মধুব মানব কণ্ঠ সৃষ্টি করিয়াছিল ।

“শ্রাম গেও মধুপুর”

সেই সন্ধ্যায় সেই মধুর কণ্ঠের কুহকে বড় কাহাবও শীঘ্র চলিয়া যাইবার শক্তি রহিল না । পূর্ণ বাবুর বৈটকখানার সম্মুখে সাধারণ রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়া গেল । ছুটি যুবক সন্ধ্যা সমীরণ সেবন করিয়া সেই পথে ফিরিয়া বাইতেছিল, তাহারাও দাঁড়াইল ।

গায়ক আবার বলিল,

“গোকুলচন্দ্র ব্রজে আ গুণ ;

আমার এ রূপ যৌবন, পরশ বতন

কাঁচের সমান ভেল ।”

এমন সময় যুবক দুটি দৃষ্টি বৈটকখানার উপরের ঘরে জানালার দিকে আকৃষ্ট হইল । কারণ, কঠাৎ সেই জানালা দিয়া একটি আলো দেখা গেল এবং একটি বিরক্তিপূর্ণ স্বর বলিল, “এখানে একলা বসে আছিস কেন, কি হচ্ছে এখানে ?”



“বাপাবটা বুঝ্‌শ্যে ?” একটি যুবক অপবটিকে বলিল।

“বুঝ্‌লুম বৈ কি। কি অজ্ঞায়। মেয়েটি বিধবা হয়েছে বলে গান শুনতেও দোষ। চণ। আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না।”

“দোষ হাত পাবে বৈ কি। পূর্ণ বাবুব বাড়ীতে গাওনা বাজনা করা উচিত নয়।” চলিতে চলিতে প্রথম যুবকটি বলিল।

“কি রকম ? নেমে বিধবা হয়েছে বলে পূর্ণ বাবুকেও বৈধব্য গ্রহণ কব্‌তে হবে নাকি।”

“মেয়েব ব্রহ্মচর্য্য বক্ষা করা উদ্দেশ্য থাকিল কিছু তপস্শ্রা, আত্মসংযম কব্‌তে হবে বৈ কি। যুবতী মেয়ে—এক বছর হয়নি বিধবা হয়েছে, বাপ নেই মেয়েব কাণেব কাছে বৈটকখানায় নিরহসংগীত গাওয়াচ্ছেন। মোস নিজেব বাড়ীতে ও পাড়ায় অনবরত ইঞ্জিয়সন্তোষণেব ও কামেব চৰ্চ্চা শুন্‌ছে ও দৃষ্টান্ত দেখ্‌ছে। এক ছবস্ত যৌবন, তার উপর এত উদ্দীপন, ব্রহ্মচর্য্যাব অবসর কোথায় ?”

“একথা মানি। কিন্তু বাড়ীতে একজন বিধবা হলে বাড়ীশুদ্ধ বিধবা হতে হবে, এও ত বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার চেয়ে বিধবা বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।”

“তাতে লাভ হবে না। বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবা-দেব জালাগুলি কুমারীদেব পোয়াতে হবে। মেয়েদেব সংখ্যা স্বভাবতঃ পুরুষেব চেয়ে বেশী। সমান সমান ধ্বল্‌ও যতগুলি বিধবা ছবাব বিবাহ কব্‌লে, ততগুলি কুমারীব বিবাহ হবে না। কাষই পতি অভাবে বিধবা-দেব যে অবস্থাগুলি হাচ্ছে, কুমারীদের ঠিক সেই গুলি হবে। লাভের মধ্যে কুমারীদের উপব অবিচাবটা অ্যাগদা হবে, কারণ, বিধবাদের এক বারের অধিক পতি লাভ্‌ অবসর দেওয়া হলে, তারা একবারও পাবে না।

“বটে। তাই বুঝি বলে, যুবোপ বিবাহেব বাজাবে বিধবাদের জন্ত কুমারীদেব বব মেলা তার। তা হলে উপায় কি ? আমি ত কিছু বুঝ্‌ উঠ্‌তে পাচ্ছি না।”

“শ্রমটা গুরুতব। এক কপায় নীমাংসা হবার নয়। সব দেশে সব সমাজেই এই গোল আছে। তবে আমাদের সমাজে বাড়ার ভাগ কতকগুলো মিছে জঞ্জাল জন্মে ব্যাপারটাকে আরও খারাপ করে তুলেছে। এই বাজে কামোশ গুলাকে এখনি উঠান উচিত। তা হলে ছাথ অনেক লাভব হবে”—

“কি মেণ্ডলো?”

“প্রথম বাণ্য বিবাহ। একে ত এ প্রথাটা মহা অস্বাভাবিক, সমস্ত জাতটাকে নিবীৰ্য্য কবে ফেলেছে। মনে কর, উনিশ কুড়ি বছর বয়স না হলে মেয়েদের শরীর পুষ্ট হয় না, গর্ভ ধারণে পবিপক্বতা হয় না। আর তেব বছবে সন্তান হচ্ছে। এবকম পুরুষানুক্রমে কত শতাব্দী ধবে হয়ে আসছে। কচি বাঁশে ঘুন ধবে, কচি গাছে তক্ততা হয় না, এ সব কথা আমাদের দেশের লোকে খুব বোঝে। আর এইটুকু বোঝে না যে, কচি ছেলের ঢোল হওয়া কত অনিষ্টজনক। আমাদের দেশের লোকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, আত্মনির্ভরশীল হবে কি কবে? কাকব যে হাড় শক্ত হতে পারিনি। মানুষের গুণ দোষ পূর্বা পেতে হলে মানুষের শরীরটা পুরানো ত্রায় পাওয়া চাই। ছশ পুরুষ ধবে বিশ বাইশ বছরের বাপ, আর তেব চৌদ্দ বছরের মা হয়ে আসছেন, শরীর গড়ে কি কবে? তাই না আমবা শারীরিক বা মানসিক বলের কার কব্বতে পারি না, কোন জাতীয় বা সামাজিক একটা বড় কার কব্বতে পারি না? যাত্রা চেষ্টা কব্বত যায়, ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তাদের অধিকাংশকে মানব লীলা সম্বরণ কব্বত হয়। জমায় বল নাই, খবচ কবে কি?

“আমাবও মত তাই। আমি বলি, দশ বছর যদি অকাল পড়ে, বিবাহটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কতকটা মঙ্গল হয়। সে যা হোক, —আমাদের বিধবাদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।”

“হাঁ। উনিশ কুড়ি বছর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হলে, বাল বিধবা থাকবে না। আমাদের সমাজে বালবিধবাদের যত্নগাই ভবানক। দ্বিতীয় কথা, মেয়েদের লেখা পড়া শেখান। লেখা পড়া শিখলে আপনাদের ভাল মন্দ বুঝতে পারবে, আপনাব পায়ে দাঁড়াতে পারবে, আপনাদের কষ্ট লাঘব কব্বার উপায় কব্বতে পারবে। তৃতীয় কথা, চিবকুমারী থাকার প্রথা প্রবর্তন করি। অনেকের মত, বৈদিক সময়ে, এমন কি, মহাভাব-তেব সময়েও আমাদের সমাজে এ প্রথা ছিল। মেয়েদের বিবাহ ছাড়া গতি নাই, এ কথাব মানে কি? পুরুষের বেলা অথও ব্রহ্মচর্য্যে ব্রহ্ম-চেয়ে উজ্জদশা আব নাই, আব মেয়েদের বেলা উটো বুঝি? এ সব লক্ষ্মীছাড়া ভুলগুলো সামাজিক মন থেকে হঠাতে না পারলে হিন্দু জাতির কল্যাণ নাই।

# তাড়িত-রহস্য ।

প্রথম প্রস্তাব ।

(শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম, এ)

প্রকৃতি-বিজ্ঞান মনুষ্যজাতিব সুখস্বচ্ছন্দতাসম্বন্ধনে যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। পাশ্চাত্য-জাতীয়েবা আত্র যে সভ্যতাব উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আপনাদিগকে পৃথিবীর অজ্ঞাত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞান শাস্ত্রব সমুন্নতি যে সেই সভ্যতার মূল, ইহা কে অস্বীকার করিবে ? বিজ্ঞানচর্চা দ্বারা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন সমর্থ হইয়া মানব এক অনির্বচনীয় আনন্দ অমুভব করেন। বিশ্বরাজ্যে নিত্য কত নূতন ব্যাখ্যার সংঘটিত হইতেছে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিলে মনুষ্যের জ্ঞানভাণ্ডার বর্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃতিদেবীর কখনও প্রশান্ত মুক্তি কখন বা রুদ্ধ মুক্তি অধ্যয়ন করিতে করিতে ভাবুক কত গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। সাধারণ লোকের চিন্তার অবিষয়ীভূত তুচ্ছ ঘটনা কত শত মহতী গবেষণার সাহায্য কবিয়াছে। বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা মনুষ্যসমাজের উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশই তাড়িতবিজ্ঞানমূলক। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে কে জানিত যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ প্রেরিত হইয়া সহস্র নব নারীর চিন্তাকুল মনে শাস্তি আনিতে পারে ? কে জানিত যে, যানবিশেষ দ্বারা স্বল্পকালে মধ্যে ভূগর্ভবর্ত্তী পথে অনায়াসে সূদূরপর্যটন সাধিত হইতে পারে ? কে জানিত যে, রশ্মিবিশেষ দ্বারা অজ্ঞাচিকিৎসা কঠোরৈকে দেহের অভ্যন্তরস্থ অস্থিসমূহ অতি সহজে পরীক্ষিত হইতে পাবে ? কে জানিত যে, চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ, ক্রিয়াবিশেষের অধীন হইলে একই প্রতিঘাত দ্বারা বিশ্বরাজ্যস্থ একই শক্তির

\* ইতিপূর্বে উদ্যোতনে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রতি শনিবার মেট্রোপলিটান কলেজ গৃহে কৃত্রিমকৃত্য বিবেকানন্দসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীঅনাথনাথ পালিত মহাশয় বহু পণীক্ষার সহিত বিজ্ঞানবিষয়িণী বক্তৃতা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে সেই বিষয়গুলিই উদ্যোতনের প্রাথমিকবর্ণের উপন্যাসের নিমিত্ত আবণ্ড বিস্তৃত ও সরলভাবে আনোচিত হইয়াছে।

ইতি সং ।

পরিচয় দিতে পারে? যে তাড়িতবিজ্ঞানোলোচনা দ্বারা এই সকল মহোপকার সাধিত হইয়াছে, নিম্নে তৎসংঘটিত ব্যাপার সমূহের বখাধক বিচার করা গেল।

১। পদার্থদ্বয়ের সংঘর্ষে উভয়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড আকর্ষণ রূপ গুণ প্রাপ্ত হয়, ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিতেরা জানিতেন। একখানি বর্ষণজ তাড়িত, তাড়িতের লক্ষণ ও প্রকাণ্ডেদ। তাড়িতদোলক।

শুষ্ক রেশমী রুমাল একখণ্ড লাক্ষার সহিত ঘর্ষণ করিলে দেখা যায় যে, লাক্ষাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজকে আকর্ষণ করিতে পারে। আরও দেখা যায় যে, অন্ধকারে লাক্ষাখণ্ড হইতে ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। এই আকর্ষণ ও ফুলিঙ্গ যে শক্তির পরিচায়ক, তাহাই “তাড়িত”। রেশমী রুমালের সহিত ঘর্ষণ দ্বারা শুষ্ক কাচদণ্ডও এইরূপ আকর্ষণী শক্তি প্রাপ্ত হয়। কাষ্ঠফলকে আবদ্ধ ধাতুদণ্ড হইতে রেশমী সূত্র দ্বারা আলম্বিত অতি ক্ষুদ্র শোলা খণ্ডের বা “তাড়িত-দোলকের” (Electric Pendulum) নিকট তাড়িতযুক্ত লাক্ষাদণ্ড (গালায় বাঁতি) আনিলে দেখা যায় যে, শোলাটি প্রথমে নিকটে ক্লান্দিতহে, পরে দূরে চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে লাক্ষা-সংস্পর্শনে তাড়িতযুক্ত শোলায় নিকট ঘূষ্ট কাচদণ্ড আনয়ন করিলে দোলকটি আকৃষ্ট হইবে। তাড়িতযুক্ত শোলাটি ঘূষ্ট লাক্ষা দ্বারা বিকৃষ্ট ও ঘূষ্ট কাচ দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কাচে ও লাক্ষায় বিরুদ্ধধর্মী তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিরুদ্ধধর্মীবিজ্ঞাপনের জন্য কাচে “ধন” (+ Plus বা Positive) ও লাক্ষায় “ঋণ” (-Minus বা Negative) তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, কহা যায়। ধর্মবৈষম্যানুচনা ব্যতীত ধন ও ঋণ এই দুই সংজ্ঞার অন্য কোনও বিশেষ অর্থ নাই। একই পদার্থ—যেমন কাচ; পশমের সহিত ঘর্ষণে ঋণতাড়িতযুক্ত ও রেশমের সহিত ধনতাড়িতযুক্ত হয়।

২। যেমন তাড়িতযুক্ত কাচদণ্ড তড়িৎজ্বিত শোলা খণ্ড বা তাড়িতদোলককে আকর্ষণ করে, সেইরূপ রেশমী সূত্র দ্বারা আলম্বিত হইলে তড়িৎজ্বিত পদার্থ দ্বারা উহা নিজেও আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ যদি কাচদণ্ডের নিকট হস্ত স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহা হস্তের নিকটে আসে এবং হস্ত সরাইলে তাহাকে অনুসরণ করে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, দুইটি পদার্থের মধ্যে একটি তাড়িতযুক্ত ও

অপরটি তাড়িতবিহীন হইলে উভয়েই পবম্পর দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তবে যেটি সঞ্চালনসমর্থ, তাহাবই গতি দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। আলম্বিত ঘুষ্ট কাচদণ্ডেব নিকট অপর একটি ঘুষ্ট কাচদণ্ড আনিলে প্রথমটি দূবে চলিয়া যায়, কিন্তু ঘুষ্ট লাক্ষাদণ্ড আনিলে তাহাব নিকটে আসে।

এইরূপ আলম্বিত ঘুষ্ট লাক্ষা অপব ঘুষ্ট  
লাক্ষাদ্বারা বিকৃষ্ট ও ঘুষ্ট কাচ দ্বারা  
আকৃষ্ট হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে

যে, “সম”তাড়িতযুক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে “বিকর্ষণ” (Repulsion) ও “বিষম” তাড়িতযুক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে “আকর্ষণ” (Attraction) ঘটে। পূর্বাধিকৃত লাক্ষাস্পৃষ্ট তাড়িতদোলকে সম-তাড়িতেব উৎপত্তি হওয়াতেই উহা ক্ষণকাল পরে লাক্ষা হইতে দূবে চলিয়া গিয়াছিল।

৪। পদার্থদ্বয়ের পবম্পব মদনে উভয়েই তাড়িতযুক্ত হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, একটিতে ধন ও অপবে ঋণ তাড়িত উৎপন্ন হইযাছে ; আবও

জানা যায় যে, উভয় তাড়িতেবই পবিমাণ  
সমান। কেননা মর্দিত পদার্থদ্বয়  
(যেমন কাচদণ্ড ও বেশম) পবম্পব

সংস্পৃষ্ট অবস্থায় তাড়িতযুক্ত দোলকের নিকট আনীত হইলে দোল-  
কটি নিশ্চল থাকে কিন্তু একে একে আনীত হইলে একটি দ্বারা আকৃষ্ট ও  
অপবটি দ্বারা বিকৃষ্ট হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, একে যে পবিমাণ  
ধন তাড়িত জন্মিয়াছে, অপবে ঠিক ততটুকু ঋণ তাড়িত জন্মিয়া পরস্পবেব  
ক্রিয়াকে ব্যর্থ কবিয়াছে।

৫। তাড়িতদোলকেব জ্বায় কাঠকলকে আবদ্ধ স্থচীমুখে অতি শিথিলভাবে  
আশ্রিত ও অবাধে সঞ্চালনসমর্থ যে কোনও অতি লবু দণ্ড (যেমন খড়,  
হংসপুচ্ছ বা কাষ্ঠ) দ্বাবও তাড়িতের সত্তা পবীক্ষা কবা যায়। এইরূপ

যে কোনও যন্ত্রকে “তড়িদ্দীক্ষণ”  
(Electroscope) কহে। আবও  
সুক্ষ্মতব উপাবে পরীক্ষা করিত হইলে

একটি মোটা কাচের বোতলের তলা কাটিয়া ফেলিয়া বোতলকে একখানি  
কাঠে বসাইতে হইবে ; এখন উহাব ছিপি ভেদ কবিয়া একটি পিণ্ডল-  
শলাকা প্রবেশ করাইতে হইবে, যাহার উর্দ্ধপ্রান্তে বৃত্তাকার পিতলের পাত

বা বর্জুল থাকিবে ও অধঃপ্রাপ্ত হইতে ছইখানি অতি পাতলা সোণালি তবক  
 কুলিবে পরে “রাং” নামক কোমলধাতু ছইখানি পাত সোণালি তবকের  
 সম্মুখে বোতলের ভিতর পিঠের সহিত একপে সংলগ্ন করিতে হইবে যে,  
 উহা বা তুলাব কাঠক স্পর্শ কবিত পাবে। এইরূপে যে যন্ত্র প্রস্তুত হইল,  
 তাহাকে “স্বর্ণপত্র তড়িৎদীক্ষক” (Gold-Leaf Electroscope) বাল। যন্ত্রটিকে  
 অল্পকাল বোত্রে রাখিল উহা শুষ্ক হইবে। এখন কোনও মর্দিত পদার্থকে  
 উহা বর্জুলের সহিত স্পর্শ কবিলে সোণালি পাত ছইখানি ফাঁক হইয়া  
 বাইবে, কেননা পদার্থ হইতে সমধর্মী তাড়িত উভয় পত্রে সঞ্চালিত হইয়া  
 পবম্পবকে বিকৃষ্ট কবে।

৬। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মর্দন বা ঘর্ষণ দ্বারা সকল পদার্থেই তাড়িত  
 উৎপন্ন হয়, কিন্তু কতকগুলি পদার্থ তাড়িত সংবন্ধন করিতে পারে, অপব-  
 গুলি পাবে না। প্রথমোক্ত শ্রেণীকে  
 অপরিস্রাবক বা তাড়িত } “অপরিচালক” (Non-Conductor)  
 বন্ধক, পরিচালক। }  
 শেষোক্তকে “পরিচালক” (Conductor)

কহে। ধাতুপদার্থ, হস্ত ইত্যাদি তাড়িতেব পরিচালক; কাচ, লাক্ষা, ধূনা,  
 গন্ধক, বেষ্ম, পশম, ফ্লানেল প্রভৃতি অপরিচালক। পরিচালক পদার্থে  
 তাড়িত উদ্ভূত হইবামাত্র সন্নিহিত অগ্র পদার্থ অথবা পৃথিবীতে চলিয়া  
 যায়; এই জন্ত উহাতে তাড়িতেব সত্তা দেখা যায় না। কোনও পিণ্ডল  
 দণ্ডে বা বর্জুলে তাড়িত-বন্ধ কবিত হইলে কাচ বা অগ্র অপরিচালক-  
 পদার্থনির্মিত দণ্ডের অবলম্বন ব্যবহাব কবিত হইবে। এইরূপে সুরক্ষিত  
 পিত্তলবর্জুল বেষ্ম দ্বারা মর্দিত হইলে উদ্ভূত তাড়িত উহা পৃষ্ঠের  
 সর্বত্রই বিস্তারিত থাকিবে, কেননা পরিচালনশক্তি নিবন্ধন তাড়িত  
 মর্দিত অংশ হইতে অমর্দিত অংশে চলিয়া যায়। কাচের পায়াযুক্ত  
 চৌকিতে দণ্ডায়মান কোনও লোককে বিড়ালের চান্দা বা ভাল গরম  
 ফ্লানেল দিয়া জোড়ায় আঘাত করিলে উহা গাত্রে সর্বত্র তাড়িত জন্মে;  
 অঙ্গুলি মুড়িয়া উহার গ্রন্থিস্থলকে ঐ লোকের গাত্রে যে কোনও স্থানেব,  
 বিশেষতঃ নাসিকা ও কর্ণের নিকট লইয়া গেলে পিট্ পিট্ শব্দ কুরিয়া  
 তড়িৎস্পন্দ অঙ্গুলিতে আসে। কিন্তু মর্দিত কাচদণ্ডের কেবল মর্দিত  
 অংশেই তাড়িতেব সত্তা পাওয়া যায়। সুবিধা পাইলেই তাড়িত পৃথিবীতে  
 চলিয়া যায়।

৭। এই প্রস্তাবে যে তাড়িতের বিষয় বর্ণিত হইতেছে, তাহাকে “স্থিতিশীল” (Static) তাড়িত কহে, কেননা ইহা পদার্থের পৃষ্ঠে স্থিতি ভাবে থাকে, উহার

স্থিতিশীল তাড়িত ;  
উহার অধিষ্ঠান—  
পদার্থের বহিস্পৃষ্ট ।

}

অভ্যন্তরে প্রান্তের দ্বারা সঞ্চারিত হয়  
না। স্থিতিশীল তাড়িত, পদার্থের  
বহিস্পৃষ্টেই থাকে, অভ্যন্তরে যায় না—

এই ব্যাপার পরীক্ষা করিতে হইলে, একটি ছিদ্রযুক্ত ও সুরক্ষিত \* তড়িৎশিষ্ট কাঁপা পিত্তলবর্তুলের অন্তঃপৃষ্ঠের সহিত কাচদণ্ডসংলগ্ন একটি শোলা-পণ্ডাক স্পর্শ করাইতে হইবে; পরে উহাকে তড়িৎদীক্ষণের নিকট স্থাপন করিলে বুঝা যাইবে যে, শোলাটিতে তাড়িতোদ্ভব হয় নাই; অতএব পিত্তল বর্তুলের অন্তঃপৃষ্ঠে তাড়িত নাই। কিন্তু বর্তুলের বহিস্পৃষ্টসংস্পর্শে শোলাটি তাড়িতযুক্ত হয় সুতরাং তাড়িত পদার্থের বহিস্পৃষ্টেই থাকে। একটি সুরক্ষিত খাঁচা বা কাঁপা ধাতুপদার্থের অভ্যন্তরে স্পর্শপত্র তড়িৎদীক্ষণ স্থাপন করিয়া আধারটিকে তাড়িতোদ্ভব যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিলে স্পর্শপত্রের ফাঁক হইয়া যায় না। খাঁচাটির ভিতর একটি পাখী পুঁবিয়া খাঁচাটিকে কাচের পায়াক কাঠের টুলে বসাইয়া তাড়িতযুক্ত করিলে পাখীটির শরীরে কোনও ক্ষতি হয় না।

৮। স্থিতিশীল তাড়িত পদার্থের পৃষ্ঠে সর্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না।

যে স্থান স্থূল, সেই স্থানেই অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। কেবল

পদার্থপৃষ্ঠে তাড়িতের  
অসমান স্থিতি ।

}

বর্তুলপৃষ্ঠেই সর্বত্র সমান পরিমাণ  
তাড়িতের সত্তা দেখা যায়। ভিন্নরূপিত  
পদার্থের দীর্ঘতম অক্ষের প্রান্তদ্বয়ে

অধিক পরিমাণ তাড়িত থাকে। সূচীযুক্ত শলাকায়ুক্ত পদার্থ তাড়িত সঞ্চার করিলে তাড়িত সত্তা সূচীযুক্ত সঞ্চিত বায়ুরাশিতে সঞ্চারিত হয় বলিয়া পদার্থটি তড়িৎদ্বিযুক্ত হইয়া যায়। তাড়িতযুক্ত পদার্থের সহিত প্রাচুর্য দীপশিখা স্পর্শ করিলে শিখা বিদ্যুৎ সমূহের সাহায্যে পদার্থটি তড়িৎদ্বিহীন হয়।

৯। একটি সুরক্ষিত পিত্তলবর্তুলকে তাড়িতধর্মাক্রান্ত করিয়া অল্প একটি “উদাসীন” (Neutral) বা অন্তর্ভুক্ত পিত্তলবর্তুলের সহিত সংলগ্ন করিলে প্রথমটির তাড়িত দ্বিতীয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চারিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা

\* সচরাচর কাচের পায়াক কাঠের টুল বা চৌকি দ্বারা তাড়িত সুরক্ষিত হয়।

জানা যায়, যে, যদি উভয়ের ব্যাস সমান থাকে, তবে তাড়িত সমভাগে বিভক্ত হয়, নচেৎ ব্যাসের অনুপাতে উভয়ে তাড়িত সঞ্চাবিত হয়। অর্থাৎ যদি প্রথমটির ব্যাস দ্বিতীয়ের ব্যাসের দুই, তিন ইত্যাদি গুণ হয়, তবে প্রথমটির তাড়িতের পবিমাণ দ্বিতীয়স্থিত তাড়িতের দুই, তিন ইত্যাদি গুণ হইবে। সাধাবণতঃ—কাচদণ্ডে আঁটা দুইটি পবিচালক পদার্থের মধ্যে যদি একটিকে তাড়িত থাকে, আর একটিতে তাড়িত না থাকে, তাহা হইলে উহাদিগকে ছোঁয়াইবামাত্র অথবা কোন তার দিয়া সংযুক্ত করিবামাত্র প্রথম পদার্থের তাড়িত উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইবে; অবশ্য এই বিভাগের শব্দ দেখা যাইবে যে, যে পদার্থটির “তাড়িতধাবণাশক্তি”

(Capacity) যত বেশী, সেটি তত বেশী তাড়িত পাইয়াছে। এস্থলে বলা বাহুল্য, যে, বর্তুল বা ভাঁটার মতন

জিনিসের তাড়িতধাবণাশক্তির পবিমাণ—উহাব ব্যাসের দ্বারা হইয়া থাকে; অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, একটা ভাঁটার ব্যাস আর একটির ব্যাসের দশগুণ হইলে, প্রথমের তাড়িতধাবণাশক্তি দ্বিতীয়ের তাড়িতধাবণাশক্তির দশগুণ হইবে।

১০। ঘর্ষণ (মর্দন) বা স্পর্শন ভিন্ন অগ্র উপায়েও তাড়িত উৎপন্ন করা যায়। কাচদণ্ডে আঁটা ধাতু বা ভাঁটের নিকট ধনতড়িতযুক্ত দণ্ড আনিলে

তাড়িত প্রভাব	}	উহাব সন্নিহিত প্রান্তে ঋণ তাড়িত
বা		ও দূর্বর্তী প্রান্তে ধন তাড়িত জন্মে।
তড়িতোদ্দীপন।		দণ্ডের ধন তাড়িত ভাঁটার ঋণ তাড়িতকে

আকর্ষণ ও ধন তাড়িতকে বিকর্ষণ করে; এই জন্ত সম্মুখীন প্রান্তের তাড়িতকে “আবদ্ধ” (Bound) ও দূর্বর্তী প্রান্তের তাড়িতকে “মুক্ত” (Free) তাড়িত করা যায়। ভাঁটার যে কোনও প্রান্তে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে মুক্ত ধন তাড়িত শরীর মধ্য দিয়া পৃথিবীতে চলিয়া যায়। এক্ষণে অগ্রে অঙ্গুলি ও পবে দণ্ডকে সরাইয়া লইলে আবদ্ধ তাড়িত সন্নিহিত প্রান্তে আবদ্ধ না থাকিয়া মুক্ত হইবে এবং ভাঁটার বাহ্যিক পিঠে সর্বত্রই সঞ্চাবিত হইবে। এইরূপে ভাঁটতে বিষয় (ঋণ) তাড়িত জন্মিবে। কাচদণ্ডে আঁটা ধাতু যত দূর দূরে রাখিবে তাই মুখে বাতির মতন তুখানি ধাতুপাত্র

+ এই বস্তুটির বদলে, তাকিয়ার মতন গঠনের কাঠখণ্ডে রাস্তা জড়াইয়া এবং উহাভুক্ত কাচদণ্ডে আঁটিয়া, সচরাচর তাড়িতের উদ্দীপনরূপ পরীক্ষা করা হয়।



কুড়িয়া (কালাইয়া) দিয়া, পবে উহাব উভয় প্রান্ত ও মধ্যস্থল হইতে স্তম্ভাবা শোলাখণ্ড বুলাইয়া দিয়া উহাকে পূর্ণোক্ত উপায়ে তাড়িত-যুক্ত করিতে গেলে দেখা যায়, যে, প্রথমে উভয় প্রান্তস্থ শোলাগুলি ফাঁক হইয়া বাইতেছে কিন্তু মধ্যের শোলাগুলি নিশ্চল বহিয়াছে, পবে নলটিতে অঙ্গুলিস্পর্শ করিলে দূব প্রান্ত হইতে তাড়িত চলিয়া যাওয়ায় শোলাগুলি পুনরায় জুড়িয়া যায়, এখন অঙ্গুলি ও দণ্ড যথাক্রমে সবাইলে নলের পিঠে সর্বত্র তাড়িত সঞ্চাবিত হয় সূতবাং নলের পিঠের সর্বত্রই শোলাগুলি ফাঁক হইয়া যায়। এক পদার্থের নিকট উদাসীন অণু বাতুপদার্থে এই কাপে বিষম তাড়িত উৎপন্ন করাকে “তাড়িত-প্রভাব” বা “তাড়িলোকীপন” (Electrification by Influence or Induction) কহে এবং এইরূপে উৎপন্ন তাড়িতকে “উদীপ্ত” (Induced) তাড়িত কহে।

১১। এক্ষণে বুঝা গেল, যে, তাড়িতযুক্ত পদার্থের সংস্পর্শেও যেমন উহা হইতে তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া, তাড়িতহীন পদার্থকে তাড়িত-যুক্ত করে; তেমন উহা হইতে কিছু দূবে থাকিলেও উহাব প্রভাবে উদাসীন পদার্থে তাড়িত জন্মিতে পারে। কিন্তু সংস্পর্শ বা “পরিচালন”

পরিচালনে ও উদীপনায়  
উৎপন্ন তাড়িতের প্রভেদ।

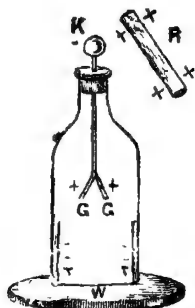
(Conduction) আব প্রভাব বা

“উদীপন” (Induction) এই দুই প্রক্রিয়ার কিছু প্রভেদ আছে। সংস্পর্শে দ্বিতীয় পদার্থে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথম পদার্থের তাড়িতের সহিত সমধর্মী অর্থাৎ প্রথমে ধন তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ধন তাড়িত আব প্রথমে ঋণ তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ঋণ তাড়িত হয়; কিন্তু প্রভাবে উৎপন্ন তাড়িত বিষমধর্মী অর্থাৎ প্রথমে ধন তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ঋণ তাড়িত উদীপ্ত হয়, আব প্রথমে ঋণ তাড়িত থাকিলে দ্বিতীয়ে ধন তাড়িত জন্মে। আবার সংস্পর্শ দ্বারা দ্বিতীয় পদার্থে তাড়িত উৎপাদন করিবার অল্প প্রথমটিতে কিঞ্চিৎ তাড়িতের হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু প্রভাবে তাড়িত উৎপাদন করিতে হইলে প্রথমটির তাড়িত কিছুই কমিয়া যায় না। প্রথমটি শুদ্ধ দ্বিতীয়টির উদাসীনত্ব নাশ করিয়া “ঋণ” ও “ধন” তাড়িতের বিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয়। এতস্ত্রির প্রথমোক্ত উপায়ে অর্থাৎ সংস্পর্শপ্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় পদার্থকে অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করা কোন মতেই উচিত নহে; কিন্তু দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায়

অর্থাৎ “প্রভাবে” তড়িত উৎপন্ন করিতে হইলে দ্বিতীয় পদার্থকে ‘ক্ষণিক পৃথিবীর’ সহিত সংযুক্ত করিতে হয়।

১২। স্বর্ণপত্র তড়িৎরীক্ষণের মাথা বা ভাঁটা হইতে কিছু দূরে ধনতড়িতযুক্ত যুক্ত কাচদণ্ড (R) আনিলে উহার প্রভাবে ভাঁটাটিতে (K) “ঋণ” ও তবক ছুখানিতে (G G) “ধন” তড়িত উৎপন্ন হয়। তবক ছুখানি এইজন্ত ফাঁক হইয়া যায়। এখন ভাঁটাটি স্পর্শ করিলে তবক ছুখানির মুক্ত ধন তড়িত পৃথিবীতে চলিয়া যায়; এই ক্ষণ উহা পূর্বের স্থায় জুড়িয়া যায়। অঙ্গুলি ও লওকে

যথাক্রমে সবাইলে দেখা যায়, যে, তবক ছুখানি পুনর্বার ফাঁক হইয়া গিয়াছে। বক ঋণ তড়িত মুক্ত হইয়া ভাঁটা হইতে, তবক ছুখানি



পর্যন্ত সর্বত্র সঞ্চাতিত হওয়ায় উহাদিগকে এক্রপ ফাঁক হইতে দেখা যায়। তড়িতযুক্ত \* তড়িৎরীক্ষণের সাহায্যে অজ্ঞাত পদার্থের তড়িত পরীক্ষা করিতে হইলে, উহাকে ভাঁটা হইতে কিছু দূরে রাখিতে হইবে। এখন যদি তবক ছুখানি পূর্বের অপেক্ষা বেশী ফাঁক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, উক্ত পদার্থে তড়িৎ-রীক্ষণের সহিত সমধর্মী তড়িত আছে; কেননা

অজ্ঞাত পদার্থে সমধর্মী তড়িত থাকিলে উহা ভাঁটার তড়িতকে বিদ্রষ্ট করিয়া তবক ছুখানিতে তাড়াইয়া দিবে এবং এইরূপে তাহাদের ব্যবধান (Divergence) বাড়িয়া যাইবে। আর যদি তবক ছুখানি পূর্বের অপেক্ষা কম ফাঁক হয়, তাহা হইলে অজ্ঞাত পদার্থে বিপরীত তড়িত আছে

স্বর্ণপত্র তড়িৎরীক্ষণ মাথা }  
তড়িতপরীক্ষা।

বুঝিতে হইবে কেননা উহার তড়িত তড়িৎরীক্ষণের তড়িতকে আকর্ষণ করিয়া উহাকে যত নিকটে আনিতে

পাবে, চেষ্টা করিবে অর্থাৎ তবক ছুখানির তড়িত ভাঁটাটিতে আসিতে

\* তড়িতযুক্ত তড়িৎরীক্ষণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে, উহার ভাঁটা, তবক আর সংযোজক তার এই তিন স্থানে তড়িত জন্মিয়াছে। যেন মনে করণ হয় না, যে, কাচের বোতলে তড়িত উৎপন্ন হইয়াছে; বোতলের দরকার—বাস্তবের ঝটিকা নিবারণ।

ব্যাপ্য হইবে, ইহাতে ব্যবধান কমিয়া যাইবে। তাড়িতহীন তড়িৎক্ষেত্রের নিকট একই দূরে দুইটি তাড়িতযুক্ত পদার্থ একে একে আনিত হইলে, তবক দুখানির ব্যবধান সমান হইবে না; একটি অপরটি অপেক্ষা যত বেশী ব্যবধান উৎপাদন করিবে, তাহাতে তত বেশী তাড়িত আছে বুঝিতে হইবে।

এইরূপে স্বর্ণপত্র তড়িৎক্ষেত্র দ্বারা জ্ঞানবা কোন পদার্থে তাড়িত আছে কি না, যদি থাকে ত কি প্রকার ( ধন না ঋণ ) আরও মোটামুটি কত পরিমাণই বা আছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারি।

এম প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, তবক দুখানির সন্মুখে দুখানি রাংতার পাত ( T I ) বোতলেব ভিতর পিঠে আঁটা আছে, এ দুখানি বোতলের তলার কাঠকে ( W ) ছুঁইয়া আছে, ইহারা থাকাতে তবক দুখানির ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায়। কেননা তবক দুখানির তাড়িত ( ধরা গেল যেন ধন ) বাংতা দুখানিতে তাড়িত উদ্দীপন করিবে—তাহাতে উহাদের নিকটবর্তী ভাগে ঋণ জন্মিবে আব দূরবর্তী প্রান্তে উদ্দীপ্ত ধন তাড়িত তলার কাঠ দিয়া চলিয়া যাইবে। প্রত্যেক রাংতার ঋণ তাড়িত নিজের সন্মুখের তবকের ধন তাড়িতকে টানিবে। একে ত তবক দুখানিতে সমানধর্মী তাড়িত থাকায় পরস্পরকে ছাড়াছাড়ি বা বিকর্ষণ করিয়া দেয় আবার রাংতায় ও তবকে টানাটানি বা আকর্ষণ; কাজে কাজেই তবকদিগেব ফাঁক বাড়িয়া যায়।

১৩। কোন তাড়িতযুক্ত পদার্থের নিকটে অপব কোন তাড়িতহীন পদার্থ আনিলে ইহার সন্নিহিত প্রান্তে বিষম আর দূরবর্তী প্রান্তে সম তাড়িত জন্মে,

উদ্দীপক ও উদ্দীপ্ত } ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নিম্ন-  
তাড়িতের পরিমাণ সমান। } লিখিত পরীক্ষা দ্বারা বুঝা যাইবে যে,  
দ্বিতীয় পদার্থে “উদ্দীপ্ত” (In-

duced) “বিষম” ও “সম” এই উভয় তাড়িতেবই পরিমাণ প্রথম বা “উদ্দীপক” (Inducing) পদার্থের তাড়িতের পরিমাণেব সহিত সমান অর্থাৎ প্রথমটিতে যত তাড়িত আছে, দ্বিতীয়ের প্রান্তদ্বয়ে ঠিক তত তাড়িত জন্মিবে। কাচের প্যায়াক্স কাচের টুলের উপর একটি টিনের বন্দনা রাখিয়া উহার বাহির পিঠকে স্বর্ণপত্র তড়িৎক্ষেত্রের সহিত তাব দ্বারা সংযুক্ত কর। এক্ষণে রেশমী সূত্র দ্বারা ষোলান “ধন” তাড়িতযুক্ত একটি পিঙ্কলের বল বহুবার

ভিতর আনিলে তবক হই খানি জুড়িয়া না থাকিয়া ফাঁক হইয়া যাইবে। ইহার কারণ এই, যে, বলটির ধন তাড়িত বদনার ভিতর পিঠে “ঋণ” ও বাহির পিঠে “ধন” তাড়িত জন্মাইয়াছে; এই ধন তাড়িত ভড়িধীক্ষণে সঞ্চারিত হইয়া তবক দুখানিকে ফাঁক করিয়া দিয়াছে। আরও দেখা যাইবে যে, বলটি বদনার ভিতরে যতই নামিবে, তবক দুখানির ব্যবধান তত বাড়িবে। অবশ্য এইরূপ হুজি বদনাব ভিতরে কিছু দূর নামানো পর্যন্ত চলিবে, তাহার পর বলকে আরও নামাইলে তবক দুখানির ব্যবধান আর বাড়িবে না। এখন যদি বলকে বদনার ভিতর পিঠের সহিত স্পর্শ করান হয়, তবে দেখা যাইবে যে, তবক দুখানির ফাঁক কিছুকি কম বেশী হয় নাই আর বলটিকে বাহিরে আনিয়া পরীক্ষা করিলে উহা তাড়িতবিহীন হইয়াছে জানা যাইবে। স্পর্শনের পূর্বে ও পরে তবক দুখানির ব্যবধান সমান থাকায় এবং বলটি স্পর্শন দ্বারা তাড়িতহীন হওয়ায় সপ্রমাণ হইতেছে যে, কলে যত পরিমাণ “ধন” তাড়িত ছিল, বদনার ভিতর পিঠে ঠিক তত পরিমাণ “ঋণ” তাড়িতের সঞ্চার হইয়াছে—কল বদনার ভিতর পিঠে ছুঁইলে সমান পরিমাণ ধন ও ঋণ তাড়িত মিশিয়া ষাওয়ায় বল তাড়িতহীন হইয়াছে, যদি ইহারা সমান পরিমাণে না থাকিত, তাহা হইলে ছোঁয়াইবার পর তবকেব ফাঁকের কিছু কম বেশ হইত। কিন্তু যদি বলকে বদনার সহিত স্পর্শ না করা হয়। আমরা বদনাকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইলে তবক দুখানি পুনরায় জুড়িয়া যায়; কেননা উহাদের মুক্ত “ধন” তাড়িত পৃথিবীতে চলিয়া যায়। এক্ষণে যথাক্রমে অঙ্গুলি ও বল সরাইলে তবক দুখানি আবার ফাঁক হইয়া যায়। ইহার কারণ এই, যে, বদনার ভিতরের পিঠেব আবদ্ধ ঋণ তাড়িত বলটি সরাইবা মাত্র মুক্ত হইয়া উহার বাহির পিঠে ভড়িধীক্ষণে সঞ্চারিত হয়। আরও দেখা যায় যে, পাত দুখানি এইভাবে যত ফাঁক হইল, প্রথমেও ঠিক তত ফাঁক হইয়াছিল কিন্তু শেষের ফাঁক উদীপ্ত ঋণতাড়িতজনিত আর প্রথমেব ফাঁক উদীপ্ত ধনতাড়িতজনিত অতএব উদীপ্ত ঋণ ও ধন উভয় তাড়িতের পরিমাণ সমান। আর পূর্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, যে, বলের তাড়িতের পরিমাণ বদনার ভিতর পিঠের তাড়িতের পরিমাণের সহিত সমান। অতএব বলা যত টুকু ধন তাড়িত ছিল, বদনার ভিতর পিঠে ঠিক তত টুকু ঋণ ও বাহির পিঠে তত টুকু ধন তাড়িত জন্মাইয়াছে। পদার্থের ক্ষমতার

যে সমান পরিমাণে ঋণ ও ধন তাড়িত--অপর পদার্থের প্রভাবে প্রমে-  
ইহা আরও সহজে পরীক্ষা করা যাইতে পারে। তাড়িতহীন তড়িৎদীক্ষণের  
মাথা হইতে কিছু দূরে ধনত্যাড়িতযুক্ত পদার্থ আনিলে প্রথমে তবক দুখানি  
ফাঁক হয় কিন্তু উহা সবাইয়া লইবামাত্র তবক দুখানি আবার জুড়িয়া যায় ;  
ইহাতে জানা যাইতেছে যে, পদার্থটি আনিবার সময় মাথায় যত টুকু ঋণ  
তাড়িত জন্মিয়াছে, তবক দুখানিতে ঠিক তত টুকু ধন তাড়িত উৎপন্ন হইয়াছে  
এবং পদার্থটি সরাইবা মাত্র বিষমধর্মী ( ধন ও ঋণ ) তাড়িতদ্বয় আবার বিক্লিষ্ট  
ধাকিতে না পারিয়া মিশ্রিত হইয়া যায় এবং তড়িৎদীক্ষণকে তাড়িতহীন করে।

১৪। সহজে তড়িৎসংগ্রহ করিতে হইলে নিম্নলিখিত অল্পব্যয়সাধ্য ক্ষুদ্র যন্ত্র  
নিৰ্ম্মাণ করিতে হইবে। এই যন্ত্রকে “তড়িৎবাহক” (Electrophorus) কহে।

অল্প ব্যয়-সাধ্য

তড়িৎ-সংগ্রহ-যন্ত্র

বা তড়িৎ-বাহক।

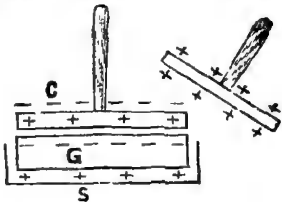
}

ইহার দুইটি অঙ্গ (১) উৎপাদক, (২)

সংগ্রাহক, “আবরণ” বা “বাহক”। এক

খানি টিনের থালায় (S) লাক্ষা বা

গালা গালাইয়া ঢালিলে এবং ঐ লাক্ষা শীতল হইয়া জমাট বাঁধিলে রটি বেলি-  
বার চাকিব মতন যে চাকি প্রস্তুত হইবে, তাহাই উৎপাদক (G) ; আর এক  
খানি পিতলের থালাব কেন্দ্রস্থলে একটি কাচদণ্ড আঁটিয়া দিলে সংগ্রাহক  
(C) প্রস্তুত হইবে। এক্ষণে লাক্ষাব



চাকিকে জোবে ক্লানেল দ্বারা আঘাত করিলে  
চাকিতে ঋণ তাড়িত জন্মিবে। এই ঋণ  
তাড়িত টিনের থালাব ভিতর পিঠে ধন  
তাড়িত ও বাহির পিঠে ঋণ তাড়িত উৎপাদন

করিবে। এই ঋণ তাড়িত পৃথিবীতে চলিয়া যাইবে কিন্তু ধন তাড়িত চাকিব  
ঋণ তাড়িতকে “আবদ্ধ” করিবে, এই কারণে চাকিব তাড়িত বায়ুগুণে  
না পৃথিবীতে গিয়া পলাইয়া যাইতে পারিবে না সুতরাং অনেকক্ষণ উহাতে  
অবস্থান করিবে। এখন যদি “সংগ্রাহক” বা পিতলের থালায় চাকি খানির  
উপর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে থালা খানি চাকিব সহিত সম্পূর্ণ  
ভাবে মিলিয়া থাকিবে না বরং উভয়ের মধ্যে একখানি অতি পাতলা  
বায়ুস্তর ব্যবধান থাকিবে, ঐ স্তরের ভিতর দিয়া তাড়িতপ্রভাব চলিবে § এবং

§ গালায় চাকি খানি অপরিচালক বলিয়া পিতলের থালায় তাড়িত পরিচা ন  
করিতে পারিবে না, ইহা কেবল তাড়িত উদ্দীপন করিবে, সুতরাং থালায় তাড়িত  
উৎপন্ন হইবার কারণ—“উদ্দীপন”—পরিচালন নহে।

চাকিব ঋণ তাড়িত পিতলের খালার নীচের পিঠে ধন ও উপর পিঠে ঋণ তাড়িত উৎপাদন করিবে। খালা খানিকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে মুক্ত ঋণ তাড়িত পৃথিবীতে যাইবে ও ধন তাড়িত চাকির ঋণ তাড়িত দ্বারা আবদ্ধ রহিবে। এক্ষণে প্রথমে অঙ্গুলি সরাইয়া পবে খালা খানিকে উঠাইলে পূর্বোক্ত বদ্ধ ধন তাড়িত মুক্ত হইয়া উহার দুই পিঠেই সঞ্চারিত হইবে। এই তাড়িতাৎপত্তি পৰীক্ষা করিতে হইলে উহাকে তড়িৎদীক্ষণের নিকট লইয়া যাইলেই চলিবে; অথবা কোন অঙ্গুলি মুড়িয়া উহার গাঠকে পিতলের খালার নিকট আনিলেই উহা হইতে তড়িৎক্ষুলিঙ্গ নির্গত হইয়া বায়ু ভেদ করিয়া পিট্-পিট্ শব্দ করিতে করিতে অঙ্গুলিতে প্রবেশ করিবে। এই যন্ত্রসাহায্যে অপরিমিত তাড়িতক্ষুলিঙ্গ পাওয়া যায়। লাক্ষাব উপর তাড়িতযুক্ত পিতলের খালা খানিকে এক বাব স্থাপন ও পরে উহাকে স্পর্শ করিয়া উত্তোলন করিবা অঙ্গুলিব গাঠটি আনিলেই হইল। যতবার এইরূপ করা হইবে, ততবার তাড়িত-ক্ষুলিঙ্গ পাওয়া যাইবে।

১৫। গালাব চাকি খানিকে একবার মাত্র তাড়িতযুক্ত করিয়া, উহার উপর পিতলের খালাখানিকে বসাইয়া রাখিয়া। আঙ্গুল দিয়া ছুঁইয়া আমরা তাহাকে যতবার উপরে তুলিব, ততবারই তাড়িতক্ষুলিঙ্গ পাইব। অনেকই জানেন যে, ঈষ্ম এঞ্জিনে কয়লা পোড়াইয়া যে তাপ পাওয়া যায়, তাহা জ্বলকে বাষ্পে পরিণত করে—আবার ঐ বাষ্পের প্রসারণ শক্তি দ্বারা ঈষ্ম এঞ্জিনেব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালিত হয়; ইহাতে কত বড় বড় কায হইতেছে। ঐ কাযের মূল যেমন কয়লা পোড়ানো, সেইরূপ এখানে এই অপরিখ্যাপ্ত ক্ষুলিঙ্গ পাওয়ার মূল কারণ কি, তাহা আলোচনা করা যাক। আমরা জানি যে, একটা ভারী জিনিষ তুলিতে গেলে আমাদের হাতেব পেশী সঙ্কুচিত হয়—আমাদের হাতে একটু টান বা জোব লাগে—আমরা বলি হাত ভেরে গেল। কেন জোর লাগে? কেন এমন হয়? ইহার জবাব এই, যে, পৃথিবী ঐ জিনিষটাকে আপনার কেন্দ্রের দিকে টান্ছে, জিনিষটা পড়ে বাবাব জন্য যথেষ্ট চেষ্টা কচ্ছে—তাকে ধরে রাখতে গেলে আমাদেরকে পেশী সঙ্কোচনব্যপ কিছু শক্তি খরচ করতে হবে; মোটের উপর পৃথিবী, যে, ঐ জিনিষটাকে টান্ছে—যে টানটা জিনিষের ভারেব কারণ, সেই টান বা আকর্ষণের বিপক্ষে আমাদেরকে কিছু কায করতে হবে। তা হলে

দাঁড়াতে এই, যে, পেশীসঙ্কোচন রূপ শক্তি ব্যয় কোরে, জিনিষটাকে তুলে রাখা রূপ কাষ সম্পন্ন হ'ল, একটার বিনিময়ে আর একটা পাণ্ডা, তড়িৎকে অপব্যাপ্ত } এ ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে  
 তাড়িতকুলিকাকপ শক্তির } বলতে দেওয়া হবে না যে, শক্তি নষ্ট  
 হ'ল কি? } হ'ল—শক্তির বিনাশ নাই; শক্তির  
 বিনিময়ে কিছু কাষ লাভ হ'ল। মনে কর, যে, উঁচু ছানের উপরে একটা  
 পাত্রে রাশিপরিমাণ জল তোলা গেল; এখন কেহ হয়ত বলিবেন যে,  
 জল তুলতে অনেকটা শক্তি নষ্ট হল—‘নষ্ট’ কথাটি কিন্তু ঠিক নয়, কেন  
 না যখন ঐ জলবাসিকে কোন বিশেষ যন্ত্রে কেলা যাইবে, তখন ঐ কলটি  
 চলিতে আবস্ত করিবে ও ভূবি ভূরি কাষ কবিয়া দিবে। জল তুলিতে  
 যে শক্তি খরচ হইয়াছিল, সেই শক্তি ছাদেব উপরিস্থিত পাত্রের রাশী-  
 কৃত জলে প্রচ্ছন্ন বা “অব্যক্ত” ( Potential ) ভাবে ছিল—পূর্ধকথিত  
 কলটিকে চালাইয়া দিয়া সেই শক্তি আবার ব্যক্ত হইল। এ সব উল্কা-  
 হরণ ছেড়ে দিযে তড়িৎকে কি হচ্ছে, দেখা যাক। এখানে চাকির  
 ঋণ তাড়িত থালাব ঘন তাড়িতকে টানছে—এই টান বা আকর্ষণ ছাড়াতে  
 গেলেই সেই পরিমাণ কিছু কাষ কবা চাই। যদি চাকি থানিতে তাড়িত  
 না থাকতো, তা হলে থালাখানাকে তার উপর বসাইয়া রাখিয়া তুলিতে  
 গেলে অবশ্য আমাদিগকে থালাব উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ আছে,  
 তার বিপক্ষে কিছু কাষ কর্তে হোতো; কিন্তু এখন কথাটা হচ্ছে এই,  
 যে, চাকির তাড়িত থালাব তাড়িতকে টানছে; কাজে কাজে এখন থালাকে  
 তুলতে গেলে আগের চেয়ে আমাদিগকে আর কিছু বেশী কাষ কর্তে  
 হবে। পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করা—সে ত আগের বারেও ছিল, এ  
 বারেও আছে; তবে বাড়ার ভাগ হচ্ছে দুটো বিরুদ্ধধর্মী তাড়িতের মধ্যে যে  
 আকর্ষণ বা টান, তাকেও অতিক্রম কবা; সুতরাং প্রতিবার থালাটি  
 তোলায় একটু একটু বেশী কাষ করা হ'ল, সে টুকু কি নষ্ট হয়ে যাবে?  
 না—তা ত হোতে পারে না। যে টুকু বেশী শক্তি খরচ হোলো, তার  
 বদলে কি লাভ হোলো?—প্রতিবার এক একটা তাড়িতকুলিকা।  
 চাকিটাতে তাড়িত না থাকলে থালা তুলতে গেলে পেশীসঙ্কোচনরূপ  
 যত টুকু শক্তি খরচ কর্তে হোতো, চাকিটাতে তাড়িত থাকতে চাকির  
 ও থালার বিরুদ্ধতাড়িতের আকর্ষণ অতিক্রম কর্তে তাহার চেয়ে

কিছু, বেশী শক্তি খরচ কর্তে হচে—যে চুই বেশী শক্তি খরচ ফোলো, তাহাই তড়িতশুল্লির রূপ শক্তিতে দেখা দিল।

১৬। তড়িতহীন তড়িতদোলকের \* নিকটে তড়িতযুক্ত কাচদণ্ড আনিলে দোলকটি কাচদণ্ডের নিকটে আসে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। দণ্ডটি আনিবার পূর্বে দোলকটিতে সমান পরিমাণ ধন ও ঋণ তড়িত মিশ্রিত



তড়িতদোলক।

হইয়াছিল; যেমনি দণ্ডটিকে আনা গেল, অমনি ধন ও ঋণ তড়িত পৃথক্ হইয়া গেল। যেন কর, যেন দণ্ডে ধন তড়িত আছে; এখন দণ্ডের তড়িতের প্রভাবে দোলকের সম্মিহিত প্রান্ত (A) তে ঋণ (—) তড়িতেব, আর দূরবর্তী প্রান্ত (B) তে ধন (+) তড়িতের উদ্দীপন হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, যে, বিষমধর্মী তড়িতের মধ্যে আকর্ষণ ও সম-ধর্মী তড়িতের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটে। সুতরাং দণ্ডের ধন (+) তড়িত A র ঋণ (—) তড়িতকে আকর্ষণ করিবে, আর B র ধন (+) তড়িতকে বিকর্ষণ করিবে। কিন্তু A, B র চেয়ে দণ্ডের কাছে আছে, সুতরাং দণ্ড ও A র মধ্যে যে আকর্ষণ, তাহা দণ্ড ও B র মধ্যে যে বিকর্ষণ, তার চেয়ে বেশী; এখন দেখা হইতেছে

অগ্র উদ্দীপন,  
পশ্চাৎ আকর্ষণ।

} যে, দণ্ডটির দণ্ড দোলকটির উপর  
দুটি শক্তি কার্য করিতেছে—একটি

হইতেছে সম্মিহিত প্রান্ত A র উপর আকর্ষণ আর একটি হইতেছে দূর-বর্তী প্রান্ত B র উপর বিকর্ষণ, আর আকর্ষণটি বিকর্ষণের চেয়ে বেশী; তাহা হইলে বাকী কাটিলে পাওয়া যায়—আকর্ষণ। কাজে কাজে দোলকটি দণ্ডদ্বারা আকৃষ্ট হয়।

এই ব্যাপারে বুঝা গেল যে, দণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হইবার পূর্বে তড়িত-হীন দোলকে তড়িতের উদ্দীপনা হয় অর্থাৎ “আগে তড়িতের উদ্দীপন, পরে আকর্ষণ।”

পাশ্চাত্য চিত্রে প্রদর্শিত তড়িতদোলকের একই ধাতুদণ্ড হইতে বাকি দুইটি

\* এ পর্যন্ত তড়িতদোলক ছোট ছোট শোলার টুকরাই প্রস্তুত হয়, বলা হইয়াছে; কিন্তু সচরাচর বুদ্ধবিশেষের নয় ও হালকা মজা বা মাজকে (Pith) ছোট গুলির আকারে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়। ইহাকে Pithball বলে।



দোলক ঝুলান যায়—একটি বেশমী সূত্রদ্বারা, অপরটি তুলার সূত্রদ্বারা ; তাহা হইলে তাড়িতবুল্ক কোনও দণ্ড উহাদিগকে সমান জোবে টানিবে না। ধরা যাক, যেন এই দণ্ডটিতে ধন তাড়িত আছে। তাহা হইলে তুলার সূত্রদ্বারা ঝুলান দোলকের, নিকটবর্তী প্রান্তে ঋণ ও দূরবর্তী প্রান্তে ধন তাড়িতের উদ্দীপনা হয়—এই উদ্দীপ্ত ধন তাড়িত পরিচালক সূত্র দ্বারা পৃথিবীতে চলিয়া যায় ; কিন্তু বেশম অপরবিচালক সূত্রবাং বেশমী সূত্রায় ঝুলান দোলকেব দূরবর্তী প্রান্তেব ধন তাড়িত পালাইতে না পাবিয়া থাকিয়া যাক, কাজে কাজে দ্বিতীয় দোলকটিতে আকর্ষণী শক্তির বিদ্যে এক বিকর্ষণী শক্তি থাকে সূত্রবাং মোটের উপর আকর্ষণ কিছু কম হয় ; প্রথম দোলকটিতে সমধর্মী ধন তাড়িত দূরবর্তী প্রান্ত হইতে পৃথিবীতে চলিয়া যায় বলিয়া বিকর্ষণী শক্তি কিছুই থাকে না সূত্রবাং আকর্ষণ পুরো মাত্রায় হয়।

## বঙ্গে অকালমৃত্যু ।

৪র্থ প্রস্তাব ।

২। ওলাউঠা।

( ডাক্তার শ্রীশশিভূষণ বোষ এম, বি লিখিত । )

অনেকেব মতে আয়ুর্বেদোক্ত বিস্থচিকা ও দেশভাষায় ওলাউঠা নামে অসাধ্য ব্যাধি একই বেগে। প্রাচীন চিকিৎসাগ্রন্থ চবকে বিস্থচিকার উল্লেখ দেখিয়া ইহার অনুমান করেন, ভারতে এই পীড়া বহুকাল বিদ্যমান। কিন্তু চরকে ইহার নিদান ও লক্ষণ বেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত এখনকার ওলাউঠার অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মন্দাঘ্নি প্রযুক্ত ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইলে আমাজীর্ণ উৎপন্ন হয়। মহর্ষি চবক এই আমাজীর্ণ রোগেব দুই প্রকার ভেদ কহিয়াছেন। যখন আমদোষ উর্দ্ধ ও অধঃ (যমন ও অতিসার দ্বারা) নিঃসারিত হয় ও সর্বদোষ স্থতীষিক-ব্য বেদনা উৎপাদন করে, তখন ইহাকে বিস্থচিকা এবং যখন “বিবন্ধ-মার্গ” অর্থাৎ বমন ও মলভেদ না হইয়া বাতরোধ প্রযুক্ত উদারাম্বান,

মলবোধ, পিপাসা, উল্গার উপস্থিত কবে, তখন অলসক সংজ্ঞা প্রদান কবিয়াছেন। চরকে লিখিত আছে, ভক্ষ্যভক্ষ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-পববশ এবং পণ্ডর ছায়া অপরিমিতভোজিগণ এই বোগে আক্রান্ত হয়। সুশ্রুত বিহুচিকায় অতিমার, বমন, পিপাসা, শূল, ভ্রম, মুচ্ছা, জ্বন্ত, দাহ, উদ্বেষ্টন (হস্তপদেব শিথিলতা), দেহেব বিবর্ণ, কম্প, হৃদয়ে বেদনা ও শিবেশূল এই সকল লক্ষণ নির্দেশ কবিয়াছেন। বিবন্ধ ও বিষজ্বষ্ট আহার প্রযুক্ত আমাশয় ও পক্ষাশয়ের প্রদাহ (Gastro-enteritis) উৎপন্ন হইলে উপবোক্ত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু ওলাউঠায় অধিক পরিমাণে জলবৎ ভেদ ও বমন বশতঃ, হাতেপায়ে খালধরা, দেহেব তাপহীনতা, (হিমাক্ত) বিন্দু বিন্দু ঘনাক্ত কলেবর, মুদ্ররোধ, ক্লীণ-বব, হস্তপদ নীলবর্ণ, অন্তঃপ্রবিষ্ট চক্ষু প্রভৃতি অবসন্নতাব (Collapse) চিহ্ন সকলই পীড়ার বিশেষ লক্ষণ। অসাধ্য হইলে বিহুচিকায় অবসন্নতাব অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সুশ্রুতে

শ্রাবদশৌচনথঃ অত্যাসন্নোবনি অর্দ্ধিতঃ অভ্যস্তবযাতনেত্রঃ।

ক্ষানদবঃ সর্ববিমুক্তসন্ধিঃ ॥

প্রভৃতি লক্ষণ, বিহুচিকা ও অলসক উভয় ব্যাধিবই মৃত্যুচিহ্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতবাং বিহুচিকা সম্বন্ধে ইহাদিগেব বিশেষত্ব নাই। একতপক্ষে আমাশয় ও পক্ষাশয়ের প্রদাহে অনেক সময়ে মুমূর্ষু অবস্থায় অবসন্নতা উপস্থিত হয় বলিয়া উহাকে ওলাউঠালক্ষণাক্রান্ত বলা যাইতে পাবে না। আর এক কথা,—বসন্ত ও প্লেগেব ছায়া ওলাউঠা মাবীভয় উৎপাদক। ইহা যেক্ষপ হুচিকিয়া, ইহাব সংক্রামকতা ততোধিক ভয়ানক। ইহার নামোচ্চাবে হৃদয় অবসন্ন হয়। বঙ্গের আপামর সাধারণ গ্রাম্যদেবতারূপে স্থাপন কবিয়া ওলাবিবির পূজার দ্বাৰা বোগের করাল হস্ত অতিক্রমের আশা কবিয়া থাকে। বর্তমান সময়ে ওলাঠাকুনাগী,—শীতলা, মনসা ও বজ্রের ছায়া বঙ্গের প্রতি গৃহস্থেব উপাশ্র। মহর্ষি চবক ও সুশ্রুত জনপদোদ্ধবংসন মহামারীব বিষয় অবগীত ছিলেন এবং জ্বর, কাশ, যক্ষা, ও নেত্ররোগেবও সংক্রামকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু বিহুচিকার সংক্রামতা সম্বন্ধে তাঁহারা যে নীবর, ইহার সহস্র কি? চর্যাকোক্ত বিহুচিকা কি কোনরূপ দেশ কালের বৈগুণ্য বশতঃ সংক্রামকতা লাভ কবিয়া আধুনিক ওলাউঠায় পরিণত হইয়াছে অথবা ওলাউঠাব বমন বিরচনাদি

অনেক লক্ষণ বিহুটিকার সহিত ঐক্য হয় বলিয়া ভারতে এই নবায়ন পীড়া বিহুটিকা নামে অভিহিত হইয়াছে ?

যোগবাশিষ্ঠে বিহুটিকা সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে।—হিমালয়ের উত্তরে কর্কাটী নারী এক রাক্ষসী বাস করিত। ইহার অপূর্ণ নাম বিহুটিকা। নিশাচরী দেহ শুষ্ক, ক্লম, কজ্জলবর্ণ, গলদেশে কদালমালা লম্বিত, রাশি রাশি ভক্ষণ করিয়াও তাহার জ্ঞানল ভৃগু হইত না। অতৃপ্তক্লমের তৃপ্তিলাভনোদেশে সে কঠোর তপস্তা করিয়া ব্রহ্মার নিকট জীবদেহজীর্ণকারী বিহুটিকার ব্যাধি হইবাব বর লাভ করে। ব্রহ্মার আদেশে সে বিবিধ উপসর্গবিশিষ্ট বিহুটিকা নামধেয় ব্যাধি হইয়া, অপরিমিত ও অন্তঃকল্যাণভোজী, দুবপ্রবাসী, দুষ্ক্রিয়া ও অশাস্ত্রীয় ব্যবহারকারীদিগের বিনাশ সাধনে নিযুক্ত হইল। কেবল বিহুটিকানিবারণক মন্ত্রদ্বারা বঞ্চিত জনগণের উপর তাহার কর্তৃত্ব রহিল না। \* একমাত্র বেধন, মৌর্য সমুৎপাদন ও বস্তি শিবাদি নিপীড়ন তাহার কার্য ছিল। সে প্রাণীহিংসা পূর্বক দশদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পশ্চিমধ্যে পশ্চিম-ক্ষিপ্ত বস্ত্র ও ভাণ্ড তাহার অলঙ্কার হইয়াছিল। অবশেষে বহুবর্ষ বাবৎ অসংখ্য প্রাণিনাশে অতৃপ্ত হইয়া রাক্ষসী প্রাজ্ঞন দেহ লাভ করিবার নিমিত্ত পুনর্বার তপস্তায় প্রবৃত্ত হয়। ব্রহ্মার বরে সে পূর্ব রাক্ষসী দেহ প্রাপ্ত হইল বটে কিন্তু বিবেক উৎপন্ন হওয়াতে তাহার জীবহিংসার আব প্ররতি রহিল না। জীবন বক্ষার্থ সে তত্ত্বজ্ঞানহীন মুগ্ধদিগকে ভক্ষ্যরূপে প্রাপ্ত হইবে, এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সুদেশ নানক কিরাত যত্নে প্রবেশ করতঃ ভক্তনীর রাজা ও অমাত্যকে বিহুটিকা মন্ত্র প্রদান পূর্বক সৌহৃদ্য স্থাপন করে। কিরাতরাজ প্রত্যাশকাল স্বরূপ স্বরাজ্যস্থ পাপাচাৰ্য বধ্য ব্যক্তিনিগকে রাক্ষসী বক্ষ্যরূপে অর্পণ করিতে প্রতীকৃত হইলেন এবং ছয় দিবসের মধ্যে তিন সহস্র বধ্য আনয়ন পূর্বক বিহুটীকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিলেন। ক্ষুধিহী হইলে পর রাক্ষসী হিমাচলে প্রত্যর্গমন

\* বিহুটিকা মন্ত্র।—ওং হ্রীং হ্রাং হ্রীং হ্রাং বিহুশস্তয়ে নমঃ। ওং নমো ভগবতি বিহুশস্তিমেনাং ওং হরহর নবনয় গচগচ মধমধ উৎসাদয় উৎসাদয় দুরে তুচ্ছ স্বাহা। হিমবন্তঃ গজ্জতীব সঃ সঃ সঃ। চন্দ্রমণ্ডনে গতোসি স্বাহা ॥ বার হন্তে এই মন্ত্র বিধিয়া রোগীকে মার্কণ্ড করিবে। অনন্তর রোগী সর্বব্যাবিধিনির্মুক্ত হইয়াছে এবং বিহুটিকা রাক্ষসী হিমালয়-পশাঘর করিয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করিলে বিহুটিকা ক্ষয় হয়।

পূর্বক সমাধিস্থ হইল। পঞ্চবর্ষান্তে পুনরায় রাজসদনে আগমন পূর্বক পূর্ববৎ বধ্যগ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে অব্যাপিত ও ঐক্লব করিয়া থাকে। নিশাচরী বিহুচিকা ক্রান্ত দেশে পিশাচভয়াদি দোষ সকল নিরাকৃত করাত্তে তথায় মঙ্গলা নামে প্রতিষ্ঠিতা ও দেবমন্দিরে সংস্থাপিতা হইয়াছে। পরম সমাদরে এই প্রতিমার পূজা হইয়া থাকে। তাহার রূপায় লোকের বাসনা পূর্ণ হয়, বিমুখ হইলে প্রজালোকের উচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত উপাখ্যানের মণ্ডোদঘাটন করিলে বুঝা যায়, যোগবাশিষ্ঠ রচিত হইবার পূর্বে হইতে ভারতে বিহুচিকা নামক ব্যাধি বিশেষ প্রবল হইয়াছিল এবং সময়ে সময়ে মারীতয় উৎপাদন করিত। বিহুচিকার আত্মকোদোক্ত নিদান ও ইহার নামার্থ হুচীবিদ্বৎ বেদনা ভিন্ন অপর কোন লক্ষণের বর্ণনা নাই সুতরাং প্রকৃত ব্যাধি নির্ণয় করা সুকঠিন। যোগবাশিষ্ঠে বিহুচিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজার উল্লেখ থাকিলেও কোন পুরাণ বা তন্ত্রে ইহার নামোল্লেখ পাওয়া যায় না এবং বসন্তরোগোৎপাদক নীতলা দেবীর ছায় কোনরূপ মূর্তি, মন্ত্র বা ধ্যানাদি প্রচলিত না থাকাত্তে উক্ত উপাখ্যানের রচনাকাল আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। যদি ইহাকে সংক্রামক বিহুচিকা বা ওলাউঠা বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে ইহা যে এদেশে তত্ত্বমতের প্রচলন সময়ে মহামারী উৎপাদক ব্যাধিরূপে বর্তমান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ভারতের কোন স্থানে বিহুচিকার মূর্তি ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠা বা পূজার ব্যবস্থা আছে কি না জানিনা। কিন্তু অধুনা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য দেবতার ছায় ওলা-বিবি বা ওলাইচণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। এদেশে এক্ষণে পূজার হুচনা কতদিন নিশ্চয় বলা যায় না, কিন্তু ইহা যে মুসলমান অধিকারের সময় দেশব্যাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে অনুমান অসঙ্গত নহে। কলিকাতার উত্তরে বেলগেছিয়ায় ওলাইচণ্ডীর মন্দির আছে। প্রায় শতবৎসর গত হইল, ডন-কাটীর নামক জনৈক ইংরাজ বণিক বর্তমান মন্দির নিৰ্মাণ করিয়া তদ্ব্যতীত দেবী অধিষ্ঠিত সিন্দূরলিপ্ত শিলাখণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বোধ হয়, তাহার ব্রহ্ম ও সোয়ার বিদ্বৎ ব্যবসারে নিযুক্ত কুটির কর্মচারী ও শ্রমজীবী-দ্বিগের মধ্যে দেবীর পূজা দ্বারা গীভাভয় দূর হইয়াছে দেখিয়া তাহা-দ্বিগের সন্তোষবর্দ্ধনার্থ এই মন্দির নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বে কলিকাতার

উত্তর প্রান্তেব লোকেই ইঁহার নিয়মিত পূজা করিত, কিন্তু এক্ষণে বহু-  
দূরত্ব ও ভিন্নপ্রদেশীয়গণ যাত্রিসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখা যায়। কোন  
স্থানে ওলাবিবি অস্বাক্ষরতা ও ঘাঘরা-পরিধানা, কোথাও চতুর্হস্তা, কপাল-  
মালাভূষিতা। অনেক স্থলে নিম্নমূলে ঘটাসনে পূজিতা হইয়া থাকেন।  
পৌরোহিত্য কার্য কোথাও মুসলমানে (খিদিরপুরে) কোথাও (হুগলিজৈলায়)  
গোয়ালী ব্রাহ্মণে সম্পাদন করিয়া থাকে। শনি ও মঙ্গলবার পূজার প্রশস্ত  
দিবস এবং ছাগবলি প্রধান উপকরণ বলিয়া গণ্য। উড়িষ্যা অঞ্চলে  
বিমলা ও তাহার সঙ্গিনী বোগিনী পীড়ার প্রাহুর্ভাব কালে পূজিতা হইয়া  
থাকেন। বর্দ্ধমানের কোন কোন স্থানে ইঁহার নাম ঠাকুবাণী। রামচন্দ্র-  
পুর গ্রামে একজন মুচি ঠাকুরাণীর পূজক। হিন্দু ও মুসলমানে ইঁহার  
পূজা করিয়া থাকে। হিন্দুবা ছাগ ও মিউদ্রা উৎসর্গ এবং মুসলমানে  
মুরগি ও হাঁস বলি দিয়া দেবীর তুষ্টি সম্পাদন করে।

যখন গঙ্গদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্কোভিগামা প্রমুখ পর্তুগিজগণ,  
মালাবার উপকূলে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহারা তথায় ওলাট্টার প্রাহু-  
র্ভাব প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণা-  
পথে যে সময়ে ভীষণ বাষ্ট্রবিপ্লব হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান বক্তে বহু-  
ক্ষবা প্রাবিত্ত কবিত্তেছিল, যখন সতত ভ্রাম্যমান সমবোদ্ধীশূ বাহিনী দল,  
ইতততঃ পলায়নপর ভয়ব্রস্ত প্রজাভুল, ভারত সাম্রাজ্যে মোগলবাজ-  
লক্ষ্যী অহর্দ্বান ঘোষণা করিতেছিল, ওলাউঠা মারীভয়েব বিকটমূর্ত্তিও আমবা  
সেই সময়ে ভারতের নানাস্থানে বিবাক্ষমান দেখিতে পাই। ১৭১১ সালে  
গঙ্গাম প্রদেশে কর্ণেল পিয়ার্সেব কর্তৃহাধীনে দেশীয় সৈনিকদলে পীড়ার  
প্রাহুর্ভাব হইয়া কিরূপ মৃত্যুভয় উপস্থিত কবিয়াছিল, তাহা বর্ণমাভীত।  
পঞ্চ সহস্র সৈনিক পুরুষের মধ্যে সহস্রাধিক লোক পীড়াভিভূত হইয়া-  
ছিল। তাবত গভর্ণমেন্ট ডাইরেক্টর সভায় এতৎসম্বন্ধে যে বিবরণী প্রেবণ  
করেন, তাহাতে লিখিত ছিল,—“এই ব্যাধি গঙ্গাম হইতে কলিকাতায় উপ-  
স্থিত হয়। একপক্ষ যাবৎ দেশীয়দিগের পক্ষী উৎপীড়িত ও বহুসংখ্যক  
কালকবলিত করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।” ১৭৮৩ সালের  
এপ্রেল মাসে হরিধারে এক সপ্তাহে বিশসহস্র ব্যতী মৃত্যুমুখে পতিত  
হয়। এই সময়ে মহীষুবে টিপুতলতানের বিরুদ্ধে অবস্থিত মহাবাষ্ট্রসৈন্য-  
দলে মধ্যভারতে করমণ্ডল উপকূলের মাজাজ প্রাক্তি প্রদেশে মহামারীর

প্রাচুর্য্যব লক্ষিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইংবাজ অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল হই-  
তেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলিকাতা, দানাপুর, পাটনা প্রভৃতি নগরসমূহের  
স্বাস্থ্য ইতিহাসে ইহার নাম শুনা যায়। এই সকল নগর ব্যতীত বহুজন-  
সনাগমস্থল, নদীসঙ্গম, দেবস্থান প্রভৃতি তীর্থভূমি ওলাউঠা মহামারী উৎ-  
পাদনেব প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ গণ্য হইত। এই সকল স্থান হইতে মারী-  
ভয় সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে কিম্বদন্তী,—ওলাউঠা প্রথম ১৮১৭  
সালের আগষ্ট মাসে যশোহর নগরে উৎপন্ন হয়। সেই সময়ে এমন  
মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল যে, পীড়াভয়ে অধিবাসিগণ নগর পবিত্যাগ  
পূর্ব্বক পলায়ন কৰ্ম্মাতে যশোহর লোকশূন্য হইয়া যায়। বিচারকার্য্যাদি  
কিছুদিনের জন্ত স্থগিত হইয়াছিল। কলিকাতার চিকিৎসকসভার কর্তৃ-  
পক্ষগণ নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন,—“যে মারীভয় উপস্থিত  
হইয়াছে, তাহা প্রতি বৎসর এই সময়ে এদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে,  
তবে বর্তমান ঋতুর বৈষম্য এবং যশোহরব কোন স্থানীয় কারণে এত-  
দূর প্রবল হইয়াছে। কলিকাতার কোন কোন অংশ এক্ষণে মহামারী  
বর্জক আক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং এই নিম্ন ও আর্দ্র বঙ্গদেশের  
এমন কোন নগর নাই, যাহা ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে।”

১৮১৭ সালের জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এই লোকক্ষয়কর  
মহামারী পাটনা, যৈমনসিং, কলিকাতা, যশোহর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী,  
ভগলপুর, মুন্সের, পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, বাগেশ্বর, কটক, বহুবলপুর, রঙ্গপুর  
প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইতে শুনা যায়। কিন্তু এইরূপে বঙ্গের সর্বত্র  
অকালমৃত্যু প্রবাহিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। ১৮১৮ সালে ইহা সমগ্র  
ভারত প্রাবিত করিয়াছিল। ১৮১৯ সালে ব্রহ্মদেশ; ১৮২০ সালে আরব,  
গ্রায়, মালাক্কা ও চীন; ১৮২১ সালে পাকিস্তান ও তুরস্কে প্রবেশ করিয়া  
আসিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হয়। ১৮৩০ সালের পূর্বে আসিয়া খণ্ডের  
বহির্ভাগে ওলাউঠা মারীভয় অজানিত ছিল। ঐ সালে প্রথম ইহা  
ইউরোপে প্রবেশ লাভ করে এবং তথা হইতে আমেরিকা ও আফ-  
রিকার উত্তরাংশ অধিকার করিয়া থাকে। অদ্যাবধি সাতবার ওলাউঠার  
ঐক্য মৃত্যুঝটিকায় ইউরোপ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং প্রতিবারই এই  
মানবকুলসংহারক ব্যাধি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সলিলসিক্ত নিম্নবঙ্গে আবি-  
র্ভূত হইয়া মহাবল সক্ষম কর্ত্তব্যঃ সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য-

স্বাস্থ্যবিদগণ এক বাক্যে বঙ্গদেশকেই ওলাউঠার জন্মস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। হতভাষা বঙ্গের কপালে এ কলঙ্ক অনপনের। বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর ওলাউঠায় গড় মৃত্যুসংখ্যা দুইলক্ষ। এই দুর্ভিক্ষনীয় ব্যাধির হ্রাস প্রত্যাহ প্রিয় স্বজনগণের অকালমৃত্যুও আত্মাদিগকে ইহার নিবারণে নিশ্চেষ্ট রাখিয়াছে কিন্তু কার্যকুশল পাশ্চাত্যগণ কদাচিৎ ইহার করাল হস্তের সংস্পর্শ অনুভব করিলেও ইহার উচ্ছেদ সাধনে কিরূপ সকলকাম হইয়াছে, ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যবিবরণী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ওলাউঠা মহামাণী কি কারণে কেবল বঙ্গদেশের সমতলে বদ্ধমূল রহিয়াছে, কি কারণেই বা সর্বগ্রাসী সংহাবমূর্তি ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে দিগ্দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, আমবা যথাস্থানে এই সকল প্রশ্নের অনুশীলন করিব।

## নিশ্চেষ্ট অবস্থা।

( ত্রিগিরিশ চন্দ্র ঘোষ । )

সন্ন্যাসী ও গৃহীর সাধন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে, পবনহংসদেব বলিতেন, যিনি গৃহে থাকিয়া সাধনা করিতে পারেন, তিনি বীরভক্ত। আমবা তখন বুকিয়াছিলাম যে, ইহা একটা উত্তেজনা বাক্য, গৃহীদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত। কিন্তু এখন অনুভব হয়—তাহা নয়, তিনি সত্যই বীরভক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণে সাধক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আপনাকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করে, বার বার দুর্গম কান্তার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভাবে—আমার রক্ষাকর্ত্তা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণে এই উচ্চ শিক্ষা লাভ হয়। এই উচ্চ শিক্ষাই দৈব লাভের প্রথম সোপান। এই অবস্থায় সাধনা আরম্ভ হয়, এত দিনে তীর্থ ভ্রমণের ফল সম্পূর্ণ হয়, দিবারাত্র বলে—“ভগবান, আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা, তুমি এখন কোথায় ?” এই উচ্চ শিক্ষা গৃহে অতি কঠিন। কখনো জনশূন্য ভূবারাহত উচ্চ শূলে, নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ আহার দেয় নাই ; কঁহার অর্জিত অর্থে প্রত্যহ পোলাও কালিয়া মেলে ; কখনো পথচীন কান্তারে প্রবেশ করেন নাই ; সে কান্তারে রক্ষাকর্ত্তা আছেন কি না, তাহা তিনি জানেন না ; রাজশাসিত রাজপথে সূর্যময় যানে বলিয়া বাতাস্রাত করেন ; পীড়ার

সময় ভাঙার আছে, নারায়ণ বৈদ্য ও গঙ্গোদক ঔষধ, এ অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেন নাই; বৈষয়িক কার্যে কৌশলি আছে, সর্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা—ভাল কৌশলি দিয়াছেন,—তিনি যে নিরাশ্রয়, এ কথা তাঁহার উপলব্ধি হওয়া অতি কঠিন।

কিন্তু যদি আমরা স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখি যে, যোব তরঙ্গে সাগরনিমগ্ন ব্যক্তির গ্রাঘ আমরা প্রত্যেকেই নিরাশ্রয়; ভুঙ্গ শৃঙ্গে যিনি সন্ন্যাসীকে আহার দিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিত্য আহার দিতেছেন; অর্থ সম্পদ সকলই তাঁহারই দান, জনবৃন্দের গ্রাঘ এখনি লয় হইবার সম্ভাবনা; প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন নাশের সম্ভাবনা; চতুর্দিকে বিপদজ্ঞান, বিপৎকালে আশ্রয় নাই, তিনিই একমাত্র আশ্রয়;—তাহা হইলে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের কিঞ্চিদাত্ত প্রভেদ থাকে না। কিন্তু বিষয়বিজড়িত মলিন বুদ্ধি কিছুতেই বুদ্ধিতে দেষ না যে, সাগরনিমগ্ন ব্যক্তির গ্রাঘ আমরা নিরাশ্রয়। চক্ষুর উপর বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত, গন্ধাবাত প্রভৃতি নিত্যই দেখিতেছি। এই আছে—এই নাই—যেন ভাসিতে ভাসিতে সাগরের জলে ডুবিয়া গেল। এই ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে, পদ্মা ভাঙ্গিয়ে নিল, বাজা ছিল—ভিকারী। এই স্বজন দাস দাসী পবিবোষ্ট—মৃত্যু সময় তালা দিতে সকলে ব্যস্ত, শয়্যাপাথের গুপ্তধার নিমিত্ত কেহই নাই। দারুণ বোগেব যন্ত্রণা, বিচক্ষণ ভাঙার বসিয়া আছে, উপশম হইতেছে না। তথাপি নিরাশ্রয় জ্ঞান হয় না। ঘোর বিপদে বিদ্যুৎ চমকেব গ্রাঘ জ্ঞান উদয় হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই ঘোর অন্ধকাবে আরত। আবার ভুলিয়া যায়; আর্মি নিরাশ্রয়, এই মহাজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু যদি কেহ ঐগ্যবান, এই সংসারে থাকিয়া সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, তিনি পরমহংস, তাঁহার পক্ষে সংসার-গৃহ নাই।

কেহ বলিতে পারেন, এই অবস্থা কি হয়? পরমহংসদেব বলিতেন,—হয়। আমরা দেখিয়াছি,—হয়। পরমহংসদেবের ভক্তের মধ্যেই দেখিয়াছি। এ মহাপুরুষ-চরিত্র বর্ণনা কবা আমার কতদূর সাধ্য জানি না, কিন্তু সত্যই সেই মহাপুরুষ দেখিয়াছি। তাঁহার নাম ছিল দুর্গাচরণ নাগ,—ইনি পূর্ববঙ্গেব অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রাম-নিবাসী,—ইনি যখন পরমহংসদেবেব নিকট যান, তখনিয়াছিলেন যে, ভাঙার, উকিল, দালাল, এদের দ্বন্দ্ব লাভ হওয়া কঠিন। নাগ



মহাশয় ( আমরা সকলে তাঁহাকে ভাগ্য মহাশয় বলিয়া কাকিতাম )  
 হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বাটাতে কিরিয়া আসিয়া ঔষধের বাক-  
 সরা গজাঙ্কলে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্বে ডাক্তারি করিতে গিয়া,  
 দর্শনীর পবিত্রের্তে বোগীব পথ্য অনেক সময়ে নিজের দিয়া আসিতেন।  
 কোন দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, দোকানদারকে করজোড়ে বলি-  
 তেন,—“রূপা করিয়া এক টাকার সন্দেশ দেন।” দোকানদার যাহা  
 দিল, তাই। ঘরের বাঁশ বাঁকারি ভাঙ্গিয়া অতিথিকে কাট দেওন,—  
 গৃহ আছে, স্ত্রী আছে, ইনি গৃহী। কিন্তু ইহার সন্ন্যাসী হইতে কিছু  
 প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর শ্রাঘ আশ্মাচেটাবহিত। একদিন তাঁহাব  
 গৃহের পাথে' অপর গৃহে আগুন লাগিবাছে, তাঁহার পরিবাব যাহা  
 জিনিসপত্র ছিল, বাহিরে আনিতেছেন। তিনি নিবারণ করিয়া বলি-  
 লেন,—“কি করিতেছ? গৃহে লইয়া যাও। যদি অগ্নিদেব দগ্ধ করেন,  
 কে রক্ষা করিবে? আইস—আমরা অগ্নিদেবের স্তব করি, বাহাতে রক্ষা  
 হয়।” সত্যই, রক্ষা হইল। ইহা বায়ুর গতি পরিবর্তনমেই হউক বা  
 বাহাতেই হউক, কিন্তু সত্যই রক্ষা হইল। এইরূপ পরম নিশ্চেট  
 মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি।

এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের কি নিশ্চেট হওয়া উচিত? না,  
 কখনই নয়। সাধারণতঃ পক্ষে কখনই নয়। আলস্য বশতঃ যদি কখনও  
 নিশ্চেট হইবার চেষ্টা পাও, দেখিবে, সম্পূর্ণ নিশ্চেট হইতে পারি-  
 তেছ না। নিশ্চেট হওয়া একটা অবস্থা। অলস হইয়া চূপ করিয়া বসে  
 বসিয়া থাকি। তোমার বাসনা তোমার চেষ্টা করাইবে। নিরন্তর  
 লগ্ন চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিবা যদি নিশ্চেট হইতে পার। কায়মনোবাক্যে  
 ভগবানের রূপা প্রার্থনা করিয়া তবে নিশ্চেট হইতে পারিবে। পুনঃ  
 পুনঃ বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—তবে নিশ্চেট  
 হওয়া সম্ভব। বড়ুবা আমি নিশ্চেট হইয়াছি এই ভান জীবনে বিড়ম্বনা।  
 বাহার্য্য অপদার্থ, কার্য্যে উদ্যমশূন্য, তাহারাই অনেকে যাহা আছে বলিয়া  
 ( প্রকৃত নিশ্চেট হয় না ) কার্য্যে বিরত থাকে। নিষত দৈবভয়ের নিকট কখন  
 স্তম্ভর আসিবে, তাহা জানিতে ব্যগ্র হয়; বিপদে অবীর ও সম্পদে উন্নীত,  
 নিশ্চেট তাকে তাহাদের জীবন যাত্রা একটা বিড়ম্বনা, তাহার তমো-  
 শবীর আদর্শ। সংসারে এই সকল ব্যক্তি লক্ষ্যীছাড়া; কিন্তু যিনি পক্ষ-

পুরুষাৰ্ধ-সম্পন্ন, ভগবানের উপর আশ্বনির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট,—তিনি মহা-  
কর্মভাশালী। মা সন্নী তাঁহার পশ্চাতে বনে অন্ন লইয়া যান, সন্নীর  
বরপুর ভূপতি তাঁহার দর্শনে অবনতশির হন। তিনি সুখ দুঃখে অটল,  
সকলবুদ্ধিরহিত, সমস্ত সংসার তাঁহার পিডুসংসার জ্ঞানে নির্ভয়ে বিচ-  
রণ করেন। এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ কবা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর শত-  
গুণে কঠিন। সন্ন্যাসীরা তো ফকড়, ফাঁকি দিয়াছে। আমরা সেয়ানা  
হইয়া সকলের কাছে ফাঁকে পড়িতেছি। গুরুর নিকট প্রার্থনা যে, সেয়ানা  
বুদ্ধি দূর হইয়া যেন আপনাকে “সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়” জ্ঞান লাভ করিতে  
পারি। যেন তুমি একবার রক্ষাকর্তা, এই বোধ সকল অবস্থায় অচল  
ধাকে, নিদ্রা জাগরণে সমান থাকে, যেন অকপট হৃদয়ে একবার তোমার  
ডাকিতে পারি।

## সাবিত্রী ।

ঈশ্বর ঈশ্বরী পদ করিয়া বন্দনা,  
বন্দি ভক্তি ভাবে অতি বাণী পাছুখানি,  
সুখদ পরশে যাব মুদিত কমল  
বিকচে পুলক ভরে, বিস্তারি সৌরভ;  
অতুল প্রভাবে যার, কি কব অধিক  
মুকমুখে ক্ষুরে বাণী সুধাসার হেন।  
নমি অবশেষে তোমা হে কবিশেখর  
বেদব্যাস! অজ্ঞানের মোহদুরকাষী!  
অতি আশে দীন আমি লয়েছি ক্ষরণ  
চরণসুগলে তব, কৃপা চক্ষে চাহি,  
কৃতার্থ করহ দাসে। বহনিন হতে  
জাগিছে কামনা হৃদে গাহিতে সে গান  
পুণ্যময়ী সাবিত্রীর, সুধাময় বাহা  
পিয়ে নিত্য সুরগণ ত্রিদিব সভায়  
অম্মদ-কিন্নর-কণ্ঠ-নির্ধর-নিশ্চেষ্ট।

দেহ পদরজঃ শিরে বাণীপুত্রবর—  
 হাহার প্রভাবে কবি ভারবি ভারতে  
 অবিনাশি যশকীর্তি কবিতা স্থাপন।  
 যেই পদরজঃ শিরে করিয়া ধারণ  
 নবরসে পূর্ণকাব্য রচিলা ভাষায়  
 কালীদাস পুণ্যযুতকুণ্ড সম, যাহে  
 অবগাহি, গৌড়জন নাশে পাপবাশি।  
 উহার প্রভাব বিনে কি সাধা আগার  
 কবিত্বসম্পদহীন—করিতে কীর্তন  
 মহতী সাবিত্রী গীতি কীর্তি-অমুযাত,  
 ভূষিতে সজ্জন যত ; তোমার যেই মতে  
 সমীপে হত বাস কবি বিতরণ।

গত বহুদিন হায, সে দিন কি আর  
 উদ্বিবে ভাবতে পুনঃ, শোভিবে স্নানব  
 নিষ্কলঙ্ক গৌরবের প্রভায় উজ্জ্বল,  
 খেদাইবে দূরে যোব এ তিমির বাশি,  
 শতক শতাব্দী ব্যাপি অবিচ্ছিন্ন ভাবে  
 আচ্ছাদি বেখেছে যাহা অতীত গৌরব ৭

গত বহুদিন আজি—নন্দনাব বুলে  
 শোভে যথা দেশ-চাক মদ্র অভিধান  
 স্বয়ংকপ্রদেশ সম—নিবসিত তথা  
 দিবসংকুলোজ্জ্বল নৃপ অম্বপতি।  
 দ্বিতীয় রাঘব প্রায় প্রজার পালনে  
 সতত নিবত নৃপ করি প্রাণপণ ;  
 প্রজাগণ—জনকের রেহেব সজ্ঞান।  
 নাহি রাজ্যে অত্যাচার শমন সোদর  
 লোলজিহ্ব, রক্তনেত্র, ভ্রুকুটি কুৎসিৎ,  
 করাস রূপাণ করে উন্নত তাওবে ;

অত্যাচার সহোদর ছুঁজি ভীষণ  
 গীর্ণকায়, অস্থিময়, ব্যাদিত বদন,  
 কোটরিবিগতচক্ষু, ধূলিরুদ্ধকেশ,  
 মুখে অমঙ্গল ধ্বনি রটিত সতত,  
 অথবা মড়ক ঘোর জনক ব্যাধির,  
 মৃত্যুর নির্দয় পুত্র,— পরশে ঘাহার  
 সুলভ নন্দন বন আশান সঙ্গ,  
 ঘাব নাম প্রবেশিলে শ্রবণ কুহর  
 জীবন্ত গুহকণ্ঠ, বিবর্ণ বদন,  
 সঘনে ধ্বনিত-বক্ষ মুমূর্ষু প্রায়।  
 ভ্রমে কভু রাজ্য প্রাপ্ত কবে না পবন  
 শোক হুখে সহোদরা উন্মাদ যমজা  
 বিষাদ কালিমারত বদন মণ্ডল  
 মুখে হাহাকার ধ্বনি মর্মান্তিকব,  
 নেত্রে দরদর ধাবা, তপত নিশ্বাসে  
 ভয়ীভূত হয়ে সব উড়ে বেগু বেগু।  
 সূশাসনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত এ সবে।  
 যথাকালে দেয় দেখা (ধাম্বিক নৃগতি)  
 ছয় ঋতু, বার মাস, ধনধাত্তে ভরা  
 বসুমতী; অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বজ্রা,  
 অগ্নিভয়, বিদ্রোহিতা নাহি সেই দেশে।  
 সূশাসনে প্রজাগণ দূর অম্লগত।  
 কাব মনে ইচ্ছে সদা নৃপব মঙ্গল।

অহরহ পূবমাকে আনন্দের স্রোত,  
 কোথাও বাজিছে বাঁদা; গাহিছে কেহ বা  
 সঙ্গীত সুগীত যায় জেখর বন্দনা,  
 নৃপকীর্তিকথা কিম্বা রাগভাবান্বিত।  
 নাচিছে নর্তকীদল; কুহকী বাহার  
 চক্ষু মন করি মুগ্ধ কুহকের বশে  
 দেখায় কুহক কত কৌতুক করিয়া।

প্রজার মঙ্গল ইচ্ছি সতত নৃপতি,  
 পরম বিত্তম্ভ চিত্তে, তদ্ব কলেবরে,  
 পরম পিতার পদ করেন অর্চনা,  
 বাগ যজ্ঞ অমুষ্ঠান শাস্ত্রের সম্মত।  
 দীন হীন জনে যত আপন হস্তেতে  
 প্রদানেন ধনধান্য, বাহ্য বহুবিধ,  
 বস্ত্র অলঙ্কার আদি; না রাখেন আর  
 হৃদয়ের খেদ কারও, হাসিমুখে সবে  
 ফিরি যাব, আশীর্বাদ করি উচ্চারণ।  
 আনন্দে আনন্দ-অঞ্জন কেলেন নৃপতি,  
 মুকুটল জিনি দ্বাধা অমূল্য জগতে।

হায় রে, বিধি বিধি কে পারে বুঝিতে  
 এ জগতে; হেন দেব-রূপী নর এই  
 যে নৃপতি, মনপন্ন সতত তাঁহার  
 অপ্রকৃত, অমুদিত সন্তান তপন!  
 অস্বামী নৃপতি নিজে, মহিষী সতত  
 খেদিতা অন্তরে বহু, তাঁহাদের সুপে  
 দুখিত নিতরা প্রজা পারিষদ আদি।

বহু বহুকালব্যাপি সস্ত্রীক নৃপতি  
 পূজিলা সাবিত্রী দেবী, পরে যব লভি  
 পায় কস্তা, স্মরি যার পুণ্যময় নাম-  
 স্বধর্মবিচ্যুতা নারী লভি পুণ্যধন  
 অবহেলাে চলি যান্ন বৈকুণ্ঠ মগরী।  
 আজন্ম করিত্ত সেই বেই জন হার  
 আজন্ম পুথিছে হৃদে আশার আশাস,  
 কুহকী স্বপ্নের ছলে কত প্রতারণিত,  
 হঠাৎ শরন হতে উঠিয়া প্রত্যেকে  
 হেরি লরু দুই করে দুইটা নাগিক  
 সাত নৃপতির ধন—অপার আনন্দ

তোমার সুখী-মন বধা; আজি নৃপতির,  
হৃদয় কড়া, সেইরূপ আনন্দ অমের।

আকাশ সমুদ্র বাণী দিইল ঘোষণা—  
“পুণ্যবান্ তুমি নৃপ, দুই দেবকুল,  
তবেই সে কলকারণে সাবিত্রী আপনি  
উদয় তোমার ঘরে, বাড়াইতে তব  
কুলমান, বস্ত্র বলি মানহ আপনা।”  
তুনে নৃপ শূন্য দেশে অমর-সঙ্গীত,  
আনন্দের কোলাহল, বীণা বস্ত্র ধ্বনি,  
ছপুরের যুগরব নৃত্য-বিজ্ঞানিত।  
সহসা পবন আনি ছড়ার চৌদিকে  
পারিজাত পরিমল, দেবপুষ্পবাস।  
সহসা হাসিল দিক স্বর্গীয় বিভাগ  
অপ্সরস, তেন কেহ বর্ষজন্ম দিয়া  
আ-দম্বর ক্ষিতিল করিল মার্জিত।  
(ক্রমশঃ)

নমো বিবেকানন্দায়।

## “ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ।”

পূবর হুয়ার ধুলে কে এলো রে ধীরে ধীরে,  
আলিয়া জ্ঞানের দীপ আঁধার বস্ত্রের ঘরে।  
নিবিল চন্দ্রমা জ্যোতি, কে তুমি গো মহামতি,  
ক্ষিতীয় তাকর ভাতি বিশ্বভূমি আলো কবে।  
হেরে সে আলোকরাশি, চমকিত বিশ্বরাসী,  
চাহিয়ে মানব পানে আত্মার স্বরূপ হেরে।  
তুনেছি পণ্ডিত পাশে, এ আলোক কল্প জ্ঞানে,  
দিতে “তত্ত্বমসি” বার্তা জাগাতে অজ্ঞান নরে,  
তুনিছ এ ব্রহ্ম-জ্যোতি, পুন তাসাইতে ক্ষিতি,  
দিতে লেই তত্ত্বভাতি উদ্ভিত ভারত ঘরে।  
তাই আজি লোকময়, আনন্দের ধারা বর,  
এ সংবাদ সুধাময় বিল্যাইতে ঘরে ঘরে।  
পৌর, কল্যাসপুত্রী।

কিরণ।

## স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ।

বিাত ৯ই জানুয়ারি শনিবার বেলেড়ু মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-  
তিথি উপলক্ষে মধ্যাহ্নে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও বাত্রে কালীপূজা হয় ।

১০ই জানুয়ারি পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধায়ী বেদ এবং স্বামী  
গুজ্ঞানন্দ উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । নানাঙ্গানে স্বামীজির কটো  
লিপো প্রকৃতি চিত্রাবলি সুসজ্জিত ভাবে স্থাপিত হয় । বাবু কালীনাথ  
সুন্দর, বাবু পুলিনবিহারী মিত্র ও শালসিয়ার ভক্তরুদ্র সঙ্গীত গাহিয়া-  
ছিলেন । কনসার্টও সুসজ্জিত হবে বাদিত হইয়াছিল ।

মধ্যাহ্নে সিক্টার নিবেদিতা স্বামীজির সম্বন্ধে এক সাবগর্ভ বক্তৃতা  
করেন । তিনি বলেন, “আমরা এখানে কেবল উৎসবের আনন্দে ক্ষণিক  
উদ্বলিত হইতে সমর্থ হই নাই । যাহাতে স্বামীজির শিক্ষা প্রাণপণে  
কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তাহার শক্তি লাভের জন্তই এই উৎসবের  
আয়োজন । তাঁহার কি শিক্ষা ছিল ? তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার নাম  
লোকে গান করুক ? না, আমরা জানি, তিনি নাম যশ প্রাপ্তের সহিত  
স্বপ্না কবিতেন । তিনি কি চাহিতেন, তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম  
চহুদিকে প্রচারিত হউক ? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না । তিনি কি  
চাহিতেন, তাঁহার বিশেষ উপদেশ বা কার্য্যপ্রণালী সকলে অনুসরণ  
করুক ? না, তিনি তাহাও চাহিতেন না । তবে তিনি চাহিতেন কি ?  
তিনি চাহিতেন, সকলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াক, মানুষ হউক ।”  
বক্তৃতান্তে প্রায় ৫১৬ শত ভক্তলোক প্রসাদ পাইলে গরিবদিগের ভোজন আরম্ভ  
হইল । দুই সহস্রের অধিক গরিব দুঃখী উন্নত পুরিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন  
করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল । কলিকাতায় বিবেকানন্দ সমিতি সকলের সভাগণও  
‘শ্রুতিমন্দিরের’ ছাত্রগণ পরমোৎসাহে তাহাদের সেবা করিয়া আপনাদিগকে  
যত্নবান করিয়াছিলেন ।

কাশীরামকৃষ্ণ অশ্রিত আশ্রম ও ভাবদা রামকৃষ্ণ অনাধারম হইতেও  
আমরা উৎসবের সংবাদ পাইয়াছি ।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

( ত্রীম—কথিত । )

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'দেবী চৌধুরাণী' ।

প্রথম পারিচ্ছেদ ।

আজ শনিবার ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দ, পৌষ শুক্লা সপ্তমী  
তিথি। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম উপলক্ষে ভক্তদেব অবসর হইয়াছে। অনেকে

\* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ত্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য এক টাকা ;  
ভাল কাপড়ে বাঁধান মূল্য পাঁচ দিকা। ১৮৮২, গুরু প্রসাদ চৌধুরীর স্তেনে শ্রীপ্রভাস  
চন্দ্র গুপ্তের নিকট বা ৫৭ নং বামকাণ্ড বস্তুর স্ট্রীটে (বাগবাজার) শ্রীশান্তিরাম বোম্বের  
নিকট পাওয়া যায় ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূতের ইংরাজী অনুবাদ New York Vedanta Society দ্বারা শীত্র  
ছাপা হইবে অর্থাৎ Leaves from the Gospel of Sri Ramakrishna এই পুস্তক সম্বন্ধে  
স্বামী বিবেকানন্দ ত্রীম—কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন ।

Dehra-Dun

24th November, 1897

My dear M—

Many many thanks for your second leaflet. It is indeed wonderful.  
The move is quite original and rever the life of a great teacher was brought  
before the public untarnished by the writer's mind as you are doing.

The language also is beyond all praise, so fresh, so pointed and withal  
so plain and easy.

I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I am  
really in a transport when I read them. Strange is n't it? Our Teacher and  
Lord was so original and each one of us will have to be original or nothing.  
I now understand why none of us attempted his life before. It has been  
reserved for you this great work. He is with you evidently.

With all love and namaskar

( Sd. ) Vivekananda.

Socratic dialogues are Plato all over, you are entirely hidden. Moreover the  
dramatic part is infinitely beautiful. Every body likes it here or in the West.



ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিবাছেন। সকালেই অনেকে উপস্থিত হইবাছেন। মাষ্টার ও প্রসন্ন + আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার ঘবেব দক্ষিণ দিকের দালানে বহিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া চরণবন্দনা করিলেন। ঠাকুর মাষ্টারকে বল্লেন, ‘কই, বন্ধিকে আন্লে না?’

বন্ধি একটা ছুলেব ছেলে। ঠাকুর বাগবাজাবে তাঁহাকে দেখিয়া-ছিলেন। দূর থেকে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, ছেলেটা ভাল।

ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। কেদার, বাম, নৃত্যোপাল, তাবক, সুবেশ (মিত্র) ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পবে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে গিয়া বসিয়াছেন। ভক্তেরা চতুর্দিকে ঘেঁষিয়া বহিয়াছেন, কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া। ঠাকুর পঞ্চ-বটীমূলে ইষ্টকনির্মিত চাতালের উপর বসিয়া আছেন। দক্ষিণপশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন। সহাস্তে মাষ্টারকে বলিলেন, ‘বইখানা কি এনেছ?’

মাষ্টার। আচ্ছা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পড়ে আয়াব একটু একটু শোনাও দেখি।

ভক্তেরা আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিলেন, কি পুস্তক। পুস্তকের নাম ‘দেবী চৌধুরাণী।’ ঠাকুর গুনিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণীতে নিষ্কাম কৰ্ম্মের কথা আছে। লেখক শ্রীযুত বঙ্কিমের সুখাতও গুনিয়াছিলেন। পুস্তকে কি তিনি লিখিয়াছেন, তাহা গুনিলে তাঁহার মনেব অবস্থা বুঝিতে পারি-বেন। মাষ্টার বলিলেন, ‘মেয়েটা ডাকাতের হাতে পড়েছিল। মেয়েটার নাম প্রহ্লাদ, পরে হ’ল দেবী চৌধুরাণী। যে ডাকাতটার হাতে মেয়েটা পড়েছিল, তার নাম ভবানী-পাঠক। ডাকাতটা বড় ভাল। সেই প্রহ-লকে অনেক সাধন ভজন করিয়েছিল। আব কি রকম কোরে নিষ্কাম কৰ্ম্ম করিতে হয়, তাই শিখিয়েছিল। ডাকাতটা ছুই ওলোকদের কাছ থেকে টাকা কড়ি কেড়ে এনে গরীব দুঃখীদের পাওবাভো, তাদের দান কোতো। প্রহ্লাদকে বলেছিল, আমি দুঃখের দমন, শিক্তের পালন করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও ত রাজার কর্তব্য।

+ শ্রীযুক্ত সাবঙ্গাপ্রসন্ন—স্বামী ত্রিগুণভীত। ইনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই প্রথম দর্শন করেন।

মাক্টার। আর এক জায়গায় ভক্তির কথা আছে। ভবানী ঠাকুর প্রকল্পর কাছে বাকুবার জন্তে একটা মেথেকে পাঠিয়ে দিছিলেন। তার নাম নিশি। সে মেয়েটা বড় ভক্তিমতী। সে বোলতো, শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বামী। প্রকল্পর বিয়ে হয়েছিল। প্রকল্পর বাপ ছিল না, মা ছিল। মিছে একটা বদ্‌নাম তুলে পাড়ার লোকে ওদের একষরে কবে দিচ্ছিল। তাই খণ্ডব প্রকল্পকে বাড়ীতে নিয়ে যায় নি। ছেলেকে আরও দুটা বিয়ে দিচ্ছিল। প্রকল্পের কিন্তু স্বামীর উপর বড় ভালবাসা ছিল। এই খানটা ভুলে বেশ বুঝতে পাবা যাবে।

“নিশি। আমি লীহার (ভবানী ঠাকুরের) কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে এক প্রকার সম্প্রদান কবিয়াছেন।

প্রকল্প। এক প্রকাব কি?

নি। সর্বদ্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কি বকম?

নি। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

নি। হঁ— কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমাতে অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রকল্প দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কবিয়া বলিল, ‘বলিতে পারি না। কখন স্বামী দেখ নাই, তাই বলিতেছি। স্বামী দেখিলে কখন শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।’

মুখ ব্রজেশ্বর (প্রকল্পের স্বামী) এত জানিত না!

বয়স্ক বলিল, ‘শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেন না, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।’

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেনা, কিন্তু প্রকল্প নিরাক্ষর—একবার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্মপ্রণেতার উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র জন্ম-পিঞ্জরে পুরিতে পারি না, কিন্তু সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জন্মদীপ্ত হিন্দুরূপপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এই জন্ত প্রেম পবিত্র হইলে স্বামী জন্মের আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অজ্ঞ সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিহিত।

প্রকৃত মূল্য মেয়ে, কিছু বুকিতে পানিল না। বলিল, ‘আমি অত কথা ভাই বুকিতে পারি না। তোমার নামটী কি, এখনও ত বলিলে না?’

বয়স্কা বলিল, ‘ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি। আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে এক দিন আলাপ কবিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পবন স্বামী। স্বীলোকের পতিই দেবতা। ত্রীকল সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণেব ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুইভাগ করিলে কতটুকু থাকে?’

প্র। দুঃ! মেয়ে মানুষেব ভক্তিব কি শেষ আছে?

নি। মেয়ে মানুষেব ভালবাসাব শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালবাসা আব।”

( আগে ঈশ্বর সাধন না আগে লেখাপড়া ? )

মাক্তাব। ভবানী ঠাকুর প্রকৃতক সাধন আবস্ত কবালেন।

“প্রথম বৎসব ভবানী ঠাকুর প্রকৃতক বাড়ীতে কোন পুরুষেব যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ীব বাহিবে কোন পুরুষেব সঙ্গে আলাপ কবিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসবে, আলাপ পক্ষে নিষেধ বহিত কবি লেন। কিন্তু তাহার বাড়ীতে কোন পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পবে তৃতীয় বৎসবে, যখন প্রব্র মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্ট সঙ্গে লইয়া প্রকৃতক নিকটে যাইতেন—প্রকৃতক নেড়া মাথায অবনত মুখে তাহাদেব সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ কবিত।”

তাব পব প্রকৃতক বিদ্যাশিক্ষা আবস্ত হোল। ব্যাকরণ পড়া হোল, রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা। একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত, একটু জ্যোতিষ।

ত্রীবাক্ষক। এর মানে কি জান? না পড়লে গুলে জ্ঞান হয় না। যে লিখেছে, এ সব লোকের এই মত। এরা ভাবে, আগে লেখা পড়া তার পর ঈশ্বর। ঈশ্বকে জানতে হলে লেখাপড়া। কিন্তু যহ মন্ডিকের সঙ্গে যদি আলাপ কবতে হয়, তা হলে তাব কথানা বাড়ী, কত টাকা, কত কোম্পানী কাকজ, এ সব আগে আমার অত পবরে কাজ কি? যো মো কবে, তব কবেই হোক, বারবানদের ধারা খেবেই হোক, কোন মতে বাড়ীব ভেতর ঢুকে যহ মন্ডিকের সঙ্গে আলাপ কবতে হয়। আব যদি টাকাকড়ি ঈশ্বর্যেব খবব জানতে ইচ্ছা হয়, তখন যহুনিষ্টকে দিজ্ঞাসা কলেই হবে যাবে। খুব সহজে হবে যাবে। আগে

রাম, তাব পর রামেব ঐশ্বর্য—জগৎ। তাই বাম্বীকি “মবা” মন্ত্ৰ জপ কোবেছিলেন; আগে “ম” অর্থাৎ জেশ্বর, তাব পব “রা” অর্থাৎ জগৎ—তাঁব ঐশ্বর্য।

ভক্তেরা অবাক্ হইয়া ঠাকুবের কথামৃত পাম করিতে লাগিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

( নিষ্কাম কর্ম ও ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ । )

মাক্টিব। অধ্যয়ন শেষ হলে আব অনেক দিন সাধনের পব ভবানী ঠাকুব প্রহ্নের সঙ্গে আবাব দেখা কব্তে এলেন। এইবাব নিষ্কাম কন্মের উপদেশ দিবেন। গীতা থেকে প্রোক বলেন,

‘তন্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কন্ম সমাচর।

অসক্তো হ্যচরন্ কন্ম পবমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥’ \*

গীতা। ৩।১২।

অনাসক্তির তিনটী লক্ষণ বলেন,—

( ১ ) ইন্দ্রিয়সংযম।

( ২ ) নিরহঙ্কার।

( ৩ ) শ্রীকৃষ্ণে ফলসমর্পণ।

নিরহঙ্কার ব্যতীত ষষ্ঠাচরণ হয় না। গীতা থেকে আবাব বলেন,

‘প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি শুণৈঃ কন্ম্যণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমুক্তান্না কর্ত্তাহমিতি মজ্জতে ॥’ †

গীতা। ৩।২৭।

যে কাযই কর, তোমার শুণে তাহ; হইল, কখন মনে করিবে না।”

তার পর সৰ্বকর্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ। আবাব গীতা থেকে বলেন,—

\* অতএব অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্ত্তব্য কর্ম কর। কাণ, অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিলে পুরুষ সেই প্রেষ্ঠ ভগবৎপদ লাভ করেন।

† লম্বদ্য কর্মই প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা কৃত হইয়াছে; কিন্তু অহঙ্কারবিমুক্ত থাকি আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

‘বৎ করোষি বদনাসি বজ্জ্বহাসি দনাসি বৎ ।

বৎ তপস্তসি কোত্তয় তৎ কুরুষ মনর্পণং ॥’

গীতা । ৯।২৭।

নিজাম কর্ণের এই তিনটি লক্ষণ বলেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ বেশ । গীতার কথা । কাটবার জো নেই । তবে আর একটা কথা আছে ।

শ্রীকৃষ্ণে ফলসমর্পণ বলেছে ; কৃষ্ণে ভক্তি বলে নাই ?

মাষ্টার । এখানে একথাটা বিশেষ করে বলা নাই ।

( সম্যাস ও ঈশ্বরলাভ )

তার পব ধনের কি ব্যবহার কন্তে হবে, এই কথা হল । প্রকৃত বসে, এ সমস্ত ধন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলাম ।

“প্রকৃত । যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম ।

ভবানী । সব ?

প্রকৃত । সব ।

ভবানী । ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না । আপনার আহারের জন্ত যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে । অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষারূপে হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহরক্ষা করিতে হইবে । ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে । অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে ।”

মাষ্টার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সহাস্তে ) । এই টুকু পাটোয়ারি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, ঐ টুকু পাটোয়ারি । ঐ টুকু হিসেব বুঝি । সে ভগবানকে চায়, সে একেবারে কাঁপ দেয় । দেহরক্ষার জন্ত এইটুকু থাকল, এ সব হিলাব আসে না ।

মাষ্টার । তার পরে আছে, ভবানী জিজ্ঞাসা করুন, ধন নিয়ে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কেমন কোরে করি ? প্রকৃত বসে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতে আছেন । অতএব সর্বভূতে ধন বিতরণ করবো । ভবানী বসে, ভাল, ভাল । আর গীতা থেকে শোক বলতে লাগলো,—

\* বাহা কিছু কর, বাহা থাক, যে হোম কর, বাহা দান কর, যে তপস্যা কর, তাহাই আমাতে অর্পণ কর ।

‘যো মাং পশুতি সৰ্বত্র সৰ্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।  
তত্ত্বাহং ন প্রপশ্যামি স চ যেন প্রপশুতি ॥  
সৰ্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বাস্থিতঃ ।  
সৰ্বথা বৰ্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বৰ্ত্ততে ॥  
আত্মোপদেয়ম সৰ্বত্র সমং পশুতি যোহৰ্জুন ।  
স্বখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥’ \*

গীতা । ৬ অঃ ৩০।৩১।৩২ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এগুলি উত্তম ভক্তের লক্ষণ ।

( বিষয়ী লোক ও তাহার ভাষা । )

মাষ্টার পড়িতে লাগিলেন । সৰ্বভূতে দানের জন্ত অনেক শ্রমের  
প্রয়োজন । কিছু বেশবিজ্ঞাস, কিছু ভোগবিলাসের ঠাট্টের প্রয়োজন হবে ।  
ভবানী তাই বদ্বেন, কখন কখন কিছু ‘দোকানদারী’ চাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিরক্তভাবে ) । দোকানদারী চাই । যেমন আকর, তেমনি  
কথাও বেবোয় । বাতদিন বিষব চিন্তা, লোকের সঙ্গে কপটতা, এ সব  
করে করে কথাগুলোও এই বকমই হয়ে যায় । মূলো খেলে মূলোর  
চট্‌কুর বেবোয় । দোকানদারী কথাটা না বলে ঐটে ভাল করে  
বন্ধেই হোতো, “আপনাকে অকৰ্ত্তা জেনে কৰ্ত্তব্য ভাষ কাষ করা ।” সে  
দিন একজন গান গাচ্ছিল । সে গানের ভিতরে ‘লাভ,’ ‘লোকসান’  
এই সব কথাগুলো অনেক ছিল । গান গাচ্ছিল, আমি বাল্লণ কন্মু ।  
যা ভাবে রাতদিন, সেই বুলিও উঠে ।

\* যে ব্যক্তি সৰ্বত্র আমাকে দেখিয়া থাকে এবং সকল বস্তুকেও আমাতে দেখিয়া  
থাকে, তাহার নিকট আমি কখনই অদৃষ্ট থাকি না, সেও কখন আমার দৃষ্টির  
ধামে না । যে ব্যক্তি জীব ও ত্রস্তে অভেদদর্শী হইয়া সৰ্বভূতস্থিত আমাকে ভজন  
করে, সে যে কোন অবস্থাতেই পাতক না, সেই যোগী আমাতেই অবস্থান করে । যে  
অৰ্জুন, সুখই হউক, দুঃখই হউক, যিনি নিজের জ্ঞানার সকলের প্রতিই সমদর্শন  
করেন, সেই যোগীই আমার মতে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

(ঈশ্বরদর্শনের উপায় ।)

পাঠ চলিতে লাগিল । এইভাবে ঈশ্বরদর্শনের কথা । প্রভু এখানে দেবী চৌধুরানী হইয়াছেন । বৈশাখী গুপ্তা সপ্তমী তিথি । দেবী বজ্র-বাব উপর বসিয়া দিবাব সহিত কথা কহিতেছেন । চাঁদ উঠিয়াছে । গঙ্গা-বক্ষে বজ্রা নঙ্গন কবিয়া আছে । বজ্রবার ছাদে দেবী ও সখীদ্বয় । ঈশ্বর কি প্রত্যক্ষ হন, এই কথা হইতেছে । দেবী বলেন, যেমন ফুলের গন্ধ ঘ্রাণেব প্রত্যক্ষ, সেই রূপ ঈশ্বর মনের প্রত্যক্ষ হন । “ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষেব বিষয় ।”

শ্রীবামকৃষ্ণ । মনের প্রত্যক্ষ । সে এ মনের নয় । সে শুদ্ধ মনের প্রত্যক্ষ । তখন এ মন থাকে না । বিষয়াসক্তি একটু থাকিলেও হয় না । মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন শুদ্ধ মনও বলতে পার, শুদ্ধ আত্মাও বলতে পার ।

মাষ্টার । মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ যে সহজে হয় না, একথা একটু পবে আছে । বলেছে, প্রত্যক্ষ করিতে দ্রুবীন চাই । ঐ দ্রুবীনের নাম যোগ । তাব পর যেমন গীতায আছে, বলেছে, যোগ তিন রকম,—জ্ঞানযোগ, কন্মযোগ, ভক্তিযোগ । এই যোগদ্রুবীন দিযে ঈশ্বরকে দেখা যায় ।

শ্রীবামকৃষ্ণ । এ খুব ভাল কথা । গীতার কথা ।

(পাতিব্রতধর্ম ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ ।)

মাষ্টার । শেষে দেবী চৌধুরানীর স্বামীব সঙ্গে দেখা হোলো । স্বামীর উপর খুব ভক্তি । স্বামীকে বল্ল, ‘তুমি আমার দেবতা । আমি অল্প দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম,—শিখিতে পারি নাই । তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ ।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । ‘শিখিতে পারি নাই !’ এর নাম পতিব্রতা ধর্ম । এও আছে ।

পাঠ সমাপ্ত হইল । ঠাকুর হাসিতেছেন । ভক্তেরা চাহিয়া আছেন, ঠাকুর আকার কি বলেন ।

শ্রীবামকৃষ্ণ (সহাস্তে কেদার ও অম্বাভ্য তক্তদের প্রতি) । এ এক

রকম মন্দ নয়। পতিব্রতাদর্শ। প্রতিমার ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীৱন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা কছেন।

(ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।

ও

সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন।)

“কি অবস্থা সব গেছে! হবগৌরী ভাবে কতদিন ছিলুম! আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণ ভাবে! কখন সীতাবামেব ভাবে! রাধার ভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কবতুম, সীতাব ভাবে রাম রাম কবতুম।

“তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পন বহুয়, মা, এ সবে বিচ্ছেদ আছে। যাব বিচ্ছেদ নেই, এমন অবস্থা করে দাও। তাই আবার কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই ভাবে বইলুম। ঠাকুরদের ছবি ঘব থেকে বার কোরে দিলুম!

“ঠাকুরে সর্বভূতে দর্শন কবতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল। এই বেল-গাছ। বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁস খানিকটা উঠে এল। দেখলাম, গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হোলো। দুর্গা তুলতে গিয়ে দেখি, আব সে বকম করে তুলতে পারিনি। তখন রোক করে তুলতে গেলুম।

“আমি লেবু কাটতে পাবি না। সে দিন অনেক কষ্টে, ‘জয় কালী’ বলে তাঁর সম্মুখে বলির মত করে তবে কাটতে পেবেছিলুম। এক দিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে,—গাছে ফুল ফুটে আছে, ঘেন বিরাট সম্মুখে—পূজা হয়ে গেছে—বিরাটের মাথায় ফুলের জুতাড়া। আর ফুল তোলা হোলো না।

“তিনি মানুষ হয়েও লীলা কছেন। আমি দেখি, সাক্ষাৎ নারায়ণ! কাঠ ঘসতে ঘসতে এমন আঙুর বেরোয়, ভক্তির জোব থাকলে মানুষ-বেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। তেমন টোপ হোলে বড় রুই কাতলা কপ কোরে ধায়।

“প্রেমোন্মাদ হলে সর্বভূতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল, আমিই কৃষ্ণ! তখন উন্মাদ অবস্থা। গাছ দেখে বলে, এবা তপস্বী, শ্রীকৃষ্ণের ধাম



কছে। তুণ দেখে বলে, শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ কোরে ঐ দেখ পৃথিবীর  
রোমাঞ্চ হয়েছে।

“পতিব্রতা-ধর্ম। স্বামী দেবতা। তা হবে না কেন? প্রতিমায পূজা হয়,  
আব জীবন্ত মানুষে কি হয় না?

( প্রতিমায আবির্ভাব । )

“প্রতিমায আবির্ভাব হতে গেলে তিনটা সিনিষের দরকার,—প্রথম  
পূজাবিব ভক্তি, ২য় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, ৩য় গৃহস্বামীর ভক্তি।

“বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, শেষে নরলীলাতেই মনটা কুড়িয়ে আসে।

“তবে একটা কথা আছে,—তাকে সাক্ষাৎকার না কল্পে একরূপ লীলা দর্শন  
হয় না। সাক্ষাৎকারেব লক্ষণ কি জান? বালক স্বভাব হয়। কেন  
বালকস্বভাব হয়? ঈশ্বর নিজের বালকস্বভাব কি না! তাই যে তাঁকে  
দর্শন করে, তাবও বালক স্বভাব হয়ে যায়।

“এই দর্শন হওয়া চাই। এখন তাঁর সাক্ষাৎকার কেমন কোরে হয়?  
তীব্র বৈবাগ্য। এমন হওয়া চাই যে, বোলবে, কি জগৎপিতা—আমি  
কি জগৎ ছাড়া? আমায় তুমি দয়া কোববে না? শালা!

“যে যাকে চিন্তা করে, সে তাব সত্তা পায়। শিবপূজা করে শিবের  
সত্তা পায়। একজন রামের ভক্ত রাতদিন হনুমানের চিন্তা কোরতো।  
মনে কোস্তো, আমি হনুমান হয়েছি। শেষে তার ঈশ্বর বিশ্বাস হোলো  
যে, তার একটু গাজও হয়েছে।

“শিব অংশে জ্ঞান হয়, বিষ্ণু অংশে ভক্তি হয়। যাদেব জ্ঞানীর স্বভাব,  
তাদের শিব অংশ, যাদেব বিষ্ণু অংশ, তাদের ভক্তের স্বভাব।

মাফ্যাব। চৈতন্যদেব? তাঁর ত আপনি বলেছিলেন, জ্ঞান ও ভক্তি  
দুই ছিল।

শ্রীবারকৃষ্ণ (বিবজ্র হইয়া)। তাঁর আলাদা কথা। তিনি ঈশ্বরের অবতার!  
তাঁর সঙ্গে জীবের অনেক তফাৎ! তাঁর এমন বৈবাগ্য যে, সার্কর্ভৌম যখন  
জিহ্বায় চিনি ঢেলে দিলে, চিনি হাওয়াতে ফব্ফব করে উড়ে গেল,  
ভিজলো না। সর্কর্দাই সমাধিস্থ! কত বড় কামজয়ী! জীবের মুহিত  
তাঁর তুলনা! সিংহ বার বছরে একবার রমণ করে, কিন্তু মাংস খায়;  
চতুই কাকর খায়, কিন্তু রাতদিনই রমণ করে। তেমনি অবতার আর

জীব। জীব কাম ভাগ করে; আবার একদিন রমণ হয়ে গেল, মা-  
লাতে পারে না।

(মাষ্টারের প্রতি।) লজ্জা কেন? যার হয়, সে লোক পোক দেখে!  
'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।' এসব পাশ। 'অষ্ট পাশ' আছে না?

"যে নিত্যসিদ্ধ, তাব আবাব সংসাবে ভয় কি? ছকবাঁধা খেলা।  
আবাব কেনে কি হয়, ছক বাঁধা খেলাতে এ ভয় থাকে না।

"যে নিত্যসিদ্ধ, সে মনে কল্লে সংসারেও থাকতে পারে। কেউ  
কেউ হুই তলোওয়ার নিয়ে খেলতে পারে। এমন খেলওয়াড যে, ঢিল  
পড়লে তলোয়াবে লেগে ঠিকবে যায়।

একজন ভক্ত। মহাশয়, কি অবহায় দীক্ষকে দর্শন পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন সব কুড়িয়ে না আনলে কি হয়? ভাগবতে শুক-  
দেবেব কথা আছে—পথে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীন চড়ান! কোন দিকে দৃষ্টি  
নাই। এক লক্ষ্য—কেবল ভগবানের দিকে দৃষ্টি। এর নাম যোগ!

"চাতক কেবল মেঘের জল খায়। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী আর সব  
নদী জলে পবিপূর্ণ, সাত সমুদ্র ভবপুৰ, তবু সে জল খাবে না। মেঘের  
জল পড়বে, তবে খাবে!

"যার একরূপ যোগ হয়েছে, তাব দীক্ষকের দর্শন হতে পারে। ধিয়ে-  
টায়ে গেলে যতক্ষণ না পর্দা উঠে, ততক্ষণ লোকে বসে বসে নানারকম  
গল্প কবে—বাড়ীর কথা, আপিসের কথা, ইন্সকুলের কথা, এই সব। যাই  
পর্দা উঠে, অমনি কথাবার্তা সব বন্ধ! যা নাটক হচ্ছে, একদৃষ্টে তাই  
দেখতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে যদি এক আধটা কথা কয়, সে ঐ  
নাটকেরই কথা।

"মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দের কথাই কয়।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

নৃত্যগোপাল সামনে বসিয়া আছেন। তিনি সর্বদা তাবস্ত, মুখে একটা  
কথা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ (নৃত্যগোপালের প্রতি সহাস্তে)। গোপাল! তুই  
কেবল চুপ কোরে থাকিস!

নৃত্য। আমি—জানি—না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝেছি, কিছু বলিস না কেন। অপরাধ ?

“বটে, বটে। জয় বিজয় নারায়ণের দ্বারী। সনক সনাতনাদি ঋষি-  
দের ভিতরে যেতে বারণ কবেছিল। সেই অপরাধে তিন বার এই  
সংসারে জন্মাতে হয়েছিল।

“শ্রীদাম \* গোলোকে বিবজ্রাব দ্বারী ছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণকে বিবজ্রাব  
মন্দিরে ধব্বার জন্তে তাঁর দ্বারে গিচ্ছিলেন, আর ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিলেন—  
শ্রীদাম ঢুকতে দেয় নাই। তাই শ্রীমতী শাপ দিলেন, তুই মর্ত্যে অন্তর  
হয়ে জন্মাগে যা। শ্রীদামও শাপ দিচ্ছলো! (সকলের ঈষৎ হাস্য।)

“কিন্তু একটা কথা আছে,—ছেলে যদি বাপের হাত ধরে, তা হলে  
খানায় পড়লেও পড়তে পারে, কিন্তু বাপ যাব হাত ধরে থাকে, তার ভয় কি !

\* \* \* \* \*

কেদার (চাটুষ্যে) এখন ঢাকায থাকেন ; তিনি সরকারী কর্ম করবেন।  
আগে কর্মস্থল কলিকাতায় ছিল, এখন ঢাকায। তিনি ঠাবুঁরের পরম  
ভক্ত। ঢাকায অনেকগুলি ভক্তের সঙ্গ হইয়াছে। সেই সকল ভক্তেরা  
তাঁর কাছে সর্বদা আসেন ও উপদেশ গ্রহণ করেন। ভক্তদর্শনে শুধু হাতে  
আসতে নাই। অনেকে মিষ্টান্নাদি আনেন ও কেদারকে নিবেদন করেন।

কেদার (অতি বিনীত ভাবে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। তাদের জিনিষ  
কি খাবো ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি ঈশ্বরে ভক্তি কবে দেয়, তা হলে দোষ নাই।  
কামনা করে দিলে সে জিনিষ ভাল নয়।

কেদার। আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বলেছি, যিনি  
আমার রূপা কবেছেন, তিনি সব জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)। তাত সত্য! এখানে সব রকম লোক আসে,  
তাই সব রকম ভাব দেখতে পায়।

কেদার। আমার নানী বিষয় জানা দরকাব নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)। না গো, সব একটু একটু চাই। যদি মুন্দির  
দোকান কেউ করে, সব রকম রাখতে হয়—কিছু মুন্দির ডালও চাই,  
হোলো খানিকটা তেঁতুল এ সব বাধতে হয়।

“বে বাজনার ওস্তাদ, সে সব বাজনা কিছু কিছু বাজাতে পারে।

\* \* \* \* \*

ঠাকুর ঝাউকলায় বাহে গেলেন—একটা ভক্ত গাড়ু লইয়া সেইখানে রাখিয়া আসিলেন।

ভক্তেরা অনেকেই এদিক উদিক বেড়াইতে লাগিলেন—কেহ বা ঠাকুরের ঘরের দিকে গমন কবিলেন, কেহ কেহ পঞ্চবটীতেই ঠাকুরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিৎকণ পবে তাঁহারা দেখিলেন, ঠাকুর ফিবিয়া আসিতেছেন।

ঠাকুর পঞ্চবটীতে ফিবিয়া আসিতেছেন। সেখানে আসিয়া বলিলেন—  
“হু তিন বাব বাহে গেলুম। যহু মল্লিকের বাড়ী খাওয়া—ঘোব বিষয়ী! পেট গবম হয়ে বয়েছে।”

ঠাকুরের পানের ডিবে পঞ্চবটীর চাতালে এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। আরও হু একটা জিনিষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। ঐ ডিবে আর কি কি আছে, ঘরে আন।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের দিকে দক্ষিণাশ্র হইয়া যাইতে লাগিলেন। ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। কাহারও হাতে পানের ডিবে, কাহারও হাতে গাড়ু ইত্যাদি।

ঠাকুর মধ্যাহ্নের পর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। হুই চারিটা ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট খাটুটীতে একটা ছোট তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

‘মহাশয়, জানে কি ঈশ্বরের Attributes—গুণ—জানা যায়?’

ঠাকুর বলিলেন, “সে এ জানে নয়। অমনি কি তাঁকে জানা যায়? সাধন কত্তে হয়। আর একটা কোন ভাব আশ্রয় কত্তে হয়। দাস ভাব। ঋষিদের শাস্ত্রভাব ছিল। জানীদের কি ভাব জান? স্বরূপকে চিন্তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (একজন ভক্তের প্রতি সহাস্তে)। তোমার কি?

ভক্তটা চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)। তোমার হুই ভাব—স্বরূপকে চিন্তা করাও বটে, আবার সেব্য সেবকের ভাবও বটে। কেমন ঠিক কিনা?

ভক্ত (সহাস্ত্রে ও কুণ্ঠিত ভাবে)। আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীবামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)। তাই হাজরা বলে, তুমি মনের কথা সব বুঝতে পার।

“ও খুব এগিয়ে গেলে হয়। প্রজ্ঞাদের হয়েছিল।

“কিন্তু ও ভাব সাধন কষ্টে গেলে কৰ্ম চাই।

“একজন কুলগাছেব কাঁটা টিপে ধরে আছে—হাত দিবে রক্ত দর দর কোরে পড়ছে, কিন্তু বলে, আমাব কিছু হয় নাই, লাগে নাই! জিজ্ঞাসা কন্দি বলে,—বেশ, বেশ। তাই ভাব সাধন কষ্টে হয়।”

ভক্তেরা ঠাকুরের কথা মত পান করিতে লাগিলেন।

## গীতাতত্ত্ব ।

—\*:\*:\*—

(১৮ই জানুয়ারি, ১৯০৩ ত্র কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে স্বামী সাবদানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতাৰ সারাংশ।)

ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মতে ভাবতবর্ষেব ধর্মই বল, দর্শনই বল, কেবল বৈবাক্যের কথাই বলছে;—সংসারের কোন বিষয়ে মন দিও না, কেবল ত্যাগ কব, ত্যাগ কব, এই কথাই বলছে। তাঁরা বলেন, সেই জগৎই হিঁদু জাতটাব ভিতব একটা Melancholy বা বিষাদের ছায়া, একটা কৰ্মে উদাসীনতা বা উদ্যমরাহিতা, দুদিনেব জীবনে এসব আর বেন, এই রকম একটা ভাব এবং ভাব ফল স্বরূপ আলস্ত ও জড়তা এসে পড়েছে। কথাটা কতদূর সত্য, তা গীতা পড়লেই বুঝতে পারা যায়। ‘ভগবান্ গীতাকাব কেবল যে বাব বাব বলছেন, কৰ্ম ছেড়ো না, তা নয়। কিন্তু নিজ জীবনে প্রতি ক্ষণে দেখাচ্ছেন, Intense activity with intense rest,—অপূৰ্ণ কৰ্ম উদ্যমের মধ্যে অপূৰ্ণ বিরাম। সব কাষ কচ্ছেন, অথচ ভিতরে অনন্ত স্থিরতা। ইহা-কেই গীতাকাব নির্গিষ্টতা, অনাসক্তি ইত্যাদি নামে নির্দেশ করেছেন। অতএব ইউরোপী পণ্ডিতেরা যে বলেন, হিন্দুশাস্ত্র মানুষকে অকৰ্মণ্য করেছ, এ কথা সত্য নয়। ওঁরা মনে করেন, ওঁদের ধর্ম ওঁদের জাতটাকে

বড় লড়ায় করে ভুলেছে এবং সে জন্তই ওঁদের ভিতর সাংসারিক উন্নতি এবং কর্মোদ্যম এত বেশী। সেটাও বাস্তবিক ঠিক কথা নহে। বাইবেলে প্রত্যেক জাযগায় বৈবাগ্যেব উপদেশ ;—“Think not of the morrow, the birds of air have their nest and the beasts of burden have their lair, But the Son of Man hath not where to lay down his head.”—কালকের জন্তে কিছু ভেবো না, আকাশেব পাখীরও বাসা আছে এবং বন্ত পশুবও থাক্বাব গর্ত আছে, কিন্তু শিক্ষাদাতা যে আমি, আমার মাথা জুঁজে থাকিবাব একটুও স্থান নাই। ঈশার জীবনী আমাদের দেশেব সন্ন্যাসিন্দ্রীবনেব মত—পড়লেই বুঝা যায়। ওঁবা এখন বাইবেলেব মানে ঘুরিয়ে আপনাদের দবকার মত মানে কবে নিষেছেন। তা বলে কি সেই মানে নিতে হবে? গীতা বলেন, মানুষেব ধর্ম্মানুষ্ঠান তাব প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। Anglo-Saxon জাত সকলকে দাবাবে, সকলেব সঙ্গে লড়াই করবে, কেন না ওঁদের ভেতর রজোত্তম ঠাসা রয়েছে। ওবা ধর্ম্মের মর্ম্মও যে ঐক্যে আপনাদের মত বুঝবে, এতে আব বিচিত্র কি? নচেৎ সকল ধর্ম্মেব মর্ম্মই এক, এবং সকল ধর্ম্ম, ত্যাগই পূর্ণ জ্ঞান ও অমৃতত্ব লাভেব এক মাত্র পথ, এ কথা মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে।

মহাভারত ও গীতা পাঠে বুঝা যায়, কোন্টা কর্ম্ম, কোন্টা অকর্ম্ম, কি কি কায কবা উচিত এবং কি কি উচিত নয় এবং মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য—জ্ঞান—কর্ম্মেব দ্বারা লাভ হয় কি না, এই বিষয় নিয়ে যে কোন কাবণেই হোক, সেই সময়ে একটা সন্দেহ উঠেছিল। সেই জন্ত গীতাতে বারবার ইহা বুঝাবার চেষ্টা যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পৃথক্ নয়। কর্ম্ম আশ্রয় কল্পে চিত্ত শুদ্ধ হবে এবং তাহা হলে জ্ঞান আপনিই আসবে। অর্জুন কিছ্র ওকথা সহজে বুঝতে পাচ্ছেন না, কেবল ভুলে থাকেন। সেই জন্ত শ্রীকৃষ্ণ ফের বলছেন, সকলের এক পথ নয়। নিজের লাভ লোক-সাম্প্রদায় দিকে দৃষ্ট না বেখে কর্তব্য বোধে অন্যারের যাবতীয় কাষই কর, অথবা কামকান্ধন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন কাটাও, উভয় পথের কল একই হবে। কারণ, উভয় পথই মানুষকে ত্যাগ শিক্ষা দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই ধর্ম্ম লাভের একমাত্র পথ।

ভোগ সুখের জন্য অমূল্য সাংসারিক কর্মও মানুষকে ধীরে ধীরে ত্যাগ শিক্ষা দেয়। সাংখ্যাকাব মহামুনি কপিল বলেন, পুরুষকে স্বমহিমা অমূল্যব করিয়ে দেবার জন্যই প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টি রূপ বিচিত্র উদ্যম। ভোগ সুখের দ্বারা আপনাব তৃপ্তি সাধন কত্তে গিয়ে থাকার উপর ধাক্কা খেয়ে মানুষ, জীবনের প্রতিদিন কেমন ধীরে ধীরে অনিত্য সুখের উপর বিবর্ত্ত হয় ও ত্যাগ শিক্ষা কবে, তা ভাবলে ওকথা ক্রম সত্য বলে বোধ হয়। আবার ছেলেকে ভুলিয়ে ঔষধ খাওয়ানোর মত মানুষের চোখের উপর নাম, কপ, দশ, প্রভৃৎ বা অন্য কোন একটা অনিত্য পদার্থ-বিশেষকে অতিবিক্রিত কোবে ধোরে তাইতেই সুখ শান্তি, তন্মাত্তেই পুরুষার্থ, ইহা বুঝিয়ে কেমন সহজ উপায়ে প্রকৃতি তাকে অন্ত্য অনিত্য পদার্থ সকলের তুচ্ছতা অমূল্যব কবিয়ে দেয়।

মনে কব, একজন ভাবলে, আমি বড় লোক হব। প্রথমে বুঝলে, বড় লোক মানে টাকা হবে, দশ জন লোক বশে থাকবে ইত্যাদি। অনেক পবিশ্রমে ধনী হল। বুদ্ধি শুদ্ধিও একটু মার্জিত হল। কিন্তু ধনী হবার পর দেখলে, বিদ্বান্ হওয়া আবও বড়। তখন একটু আগিয়ে গিয়ে বুঝলে, ঠিক বড় হতে গেলে আরও কিছু ত্যাগ স্বীকার চাই। কেন না, বিদ্যা শেখা দরকার, নচেৎ লোকে বড় লোক বলে মানবে কেন? বিদ্যা শিখতে গেলে কাজেই পাঁচজনকে লয়ে কথা আমোদ প্রমোদ, আপাতমধুর নানাপ্রকার সুখসন্তোষ ইত্যাদি হতে আপনাকে পৃথক রাখতে হলো। এইরূপ বড়লোক কথাটার মানে যত বুঝতে লাগলো, তত ধীরে ধীরে তার ধারণা হতে লাগলো যে, ত্যাগ-স্বীকার না করে উচ্চ হওয়া যায় না। মানুষ এইরূপ সকল বিষয়ে বোঝে যে, ত্যাগ স্বীকার না করে কিছুই লাভ হয় না। শাস্ত্র বলছে, ছোটখাট বিষয়গুলিতে এইরূপে অল্প অল্প ত্যাগ কত্তে শিখে অবশেষে মানুষ পূর্ণ ত্যাগ কোরে অমৃতত্ব পর্যন্ত লাভ করবে।

কর্মের দ্বারা মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই উচ্চতর মহত্বের আকাঙ্ক্ষার মন বুঝতে ও ধস্তে পারে। উহা লাভ কত্তে অন্ত্য সামান্য বিষয় ত্যাগ করা আবশ্যক দেখে সে, সে গুলি ত্যাগ করে ফেলে। বিবেকানন্দ স্বামী-জির একটা উপমা এখানে বেশ খাটে,—আমরা স্বর্ষ্যকে এখান থেকে দেখছি, একটা ধানার মত। হাজার মাইল এগিয়ে যাও, সেই স্বর্ষ্যই

দ্রুত বড় দেখাবে। আরও হাজার মাইল ঘাও, আবার বড় দেখাবে। কিন্তু তোমার বোধ থাকবে, এ সূর্য্য সেই। তেমনি আদর্শ এগিয়ে এগিয়ে ভগবানে পৌঁছাবে অথচ আমাদের বোধ হবে, আমরা একটা আদর্শই চিরকাল ধরে আছি। পবমহৎসদেব বদন্তেন, মানুষ যদি একটা বিষয় ঠিক ঠিক ধরে, তা হলে তাতেই শেষে ভগবানের পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাবে।

গীতায় বলছেন, যোগ ও ভোগ, কর্ম ও সন্ন্যাস, মানুষের নিজের অবস্থা ভেদে সত্য ও অসত্য, জ্ঞাতের বিষয় বা অজ্ঞাতের বিষয়, এই ভাবে অনুভূত হয়। অর্থাৎ কহাবো মনে যোগই ঠিক আবার কারো মনে ভোগই ঠিক বলে ধারণা হয়। দেখা যায়, কর্ম সকলের সমান নয়। সাধারণ মানবের কর্ম আপনার সুখ বিলাস এবং স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনে আবদ্ধ। তা হতে যে একটু উঁচু হয়েছে, সে নিজের দেশের জন্য ভাবে। কিসে দেশের লোক খেতে পাবে, কেমন করে তাদের লেখা পড়া শেখাবা সুবিধা হবে, কেমন কবে তাবা পৃথিবীর অপব জ্ঞাতের সঙ্গে সমান হয়ে চলতে পাবে, এই সব চিন্তায় ব্যাকুল হয়; তাব চেয়ে ঘাবা বড় হয়েছে, তাবা ভাবে, কেমন করে দেশের লোক সত্য পথে থাকবে, সংযমী হবে, অপবের উপর বিনা কারণে অজ্ঞা অত্যাচার না কবে দাবা চক্ষে দেখবে ইত্যাদি। (কেন না, তাবা দেখতে পায়, ঐ সব দোষ এলে পরেই জাটটা পতন হবে।) আবার তাব চেয়ে যে বড়, তাব কর্ম জগদ্ধাপী। সকল কালের সকল দেশের সকল অবস্থাপন্ন মানবের কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয়, তাঁরা সেই ধ্যানে মগ্ন। যেমন অবতারণা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সাংখ্য ও যোগ তকাত নয়, মূর্খেরাই আলাদা মনে কবে। হে অর্জুন, যখন ভূমি এখনও এত উচ্চ অধিকারী হও নি যে, একেবারে কর্ম ছেড়ে দিতে পার, তখন কর্মের মধ্য দিয়া তোমার উদ্দেশ্য লাভ কন্তে হবে, নিজের লাভ লোকমানের দিকে দৃষ্টি না দিবে কর্মের কর্ম কর্তে কর্তে যাব চিত্ত একেবারে স্বার্থপর হইবে গেছে, তারই ধ্যানাদি দ্বাৰা সমাধি লাভ কবা ছাড়া সাধারণ মানবের জ্ঞান কাষ করায় কিছু লাভ নাই। সেই তখন নিজের মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ক্রমবিকাশের স্রোতে শাধারণ মানব-প্রকৃতির সীমা উল্লেখন করেছে। অতএব তার পক্ষে তখন অজ্ঞান বাবস্থা, এই ববো কাষ করে যাও।



ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে এইরূপে কর্ণের চরম পরিণাম অকর্ণ বা কর্ণরহিতাবস্থা, শাস্ত্রের এই কথা না বুঝার এক বিষময় ফল হয়েছিল। যত ভক্ত, ধৃষ্ট ও অজ্ঞ লোকেরা কর্তব্য কর্ষ ছেড়ে দিয়ে একেবারে বড় লোক হতে বসেছিল। অধুনা কর্ষী, এ কথা বোললে লোকে নাক স্টেকাত বা তাকে দয়ার চক্ষে দেখে বোলতো, ‘এখনও বুঝতে পারে নি, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে, কর্ষ না ছাড়লে কিছু হবে না’ ইত্যাদি।

মায়ূরের এই বকম ভুল সকল দেশেই সকল সময়েই হয়ে থাকে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানশূন্য ভক্তি বড় বলেছেন অথচ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই জ্ঞানশূন্য বা অহেতুকী ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়, এ কথাও বলেছেন। সে কথাটা ভুলে যাওয়ার আজকালকার বৈষ্ণব বাবাজীদের হৃদশা দেখ। সকলেই একেবারে জ্ঞানশূন্য ভক্তি লাভ কর্ণে! জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যে কবে, সে যেন তাদের চোখে বড় কুলাজ কক্ষে। সকলেই একেবাবে বড় লোক হবে! বড় লোক হতে গেলে সে কত ‘কাট খড় পোড়াতে’ হয়, কত স্বার্থত্যাগ ও উদ্যম কস্তে হয়, তা কেউ কর্ণে না। একটা গল্প মনে পড়ে,—একজন লোক এক সন্ন্যাসীর মঠে গিয়ে এক সাধুকে বোললে, “মহাবাজ, আমায় চেলা বানিয়ে নিন।” মঠের লোকেবা জিজ্ঞাসা করে, “তুমি পার্ণে? চেলা হওয়া বড় শক্ত। মঠের ঠাকুরজীর ভোগ রাধতে হবে, হাণ্ডা মন্ডতে (মাজতে) হবে, জল তুলতে হবে, সাধুদের ফাই ফরমাজ পাটতে হবে, গুফ যা বলে দেবেন, সে পড়া মুখস্থ কর্ণে হবে, তাঁর সব কথা শুন্তে হবে ও সন্ধ্যার পর তাঁর পদসেবা কস্তে হবে।” সে দেখলে বিষম মুন্ডিল! তবে চিন্তে জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা, গুফ যিনি হবেন, তাঁকে কি কর্ণে হবে?” তারা বোললে, “গুফ?—জপধ্যান পূজাদি করেন, চেলাদের শিক্ষা দেবেন ও তাদের দিয়ে কাষ কবিয়ে নেবেন।” তখন সে বলে, “তবে মহারাজ, আমাকে একেবারে গুফই বানিয়ে নিন।” আমাদের দেশে এখন এ ভাবটা বড় অধিক। তত্ত্বশ্রেষ্ঠ ভুলসীদাসের কথানি শ্রীমদ্রুকদেব প্রায়ই আমাদের শুনাতেন যে, গুফ মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক। এ ভাবটা যে গৃহস্থের ভিতর বেশী, আর সন্ন্যাসীর ভিতর কম, তাও নয়। লোকে মনে করে, সন্ন্যাসী হয়ে গেরুয়া কাপড় পব্লেই আর কর্ষ থাকে না,

একবারে জ্ঞানী হয়ে যায়। তা নয়। গীতাকার বলেন, ‘কর্মণ্যকর্ম  
 যঃ পশ্চাদ্ধর্মণি চ কর্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ যন্তঃ স বুভুঃ কৃৎসনকর্মণঃ॥’  
 সর্বদা কর্ম করলে আত্মাকে সাক্ষাৎ দেখার দরুন তাঁর সর্বদা সকল অব-  
 স্থায় এই জ্ঞান ঠিক ঠিক থাকে যে, আমি কিছুই করি না, আমি  
 আত্মা, আর আত্মাকে না দেখে জ্ঞানীর ভান করে অলস হয়ে বসে  
 থাকলে যিনি দেখেন যে, বিষয়চিহ্নরূপ যত কর্ম সব করা হতে,  
 মাহুষের ভিতর তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কর্ম যেমন  
 করে করা উচিত, ঠিক সেই রকম করে কন্তে পারেন। তাঁর ভিতরেই  
 গীতাকারের স্থায় অনবচ্ছিন্ন কর্ম-উদ্যমেব ভিতর যোগীর অবিরাম শান্তি  
 দেখতে পাওয়া যায়। যিনি ঠিক ঠিক জ্ঞানী বা ঠিক ঠিক ভক্ত হয়ে-  
 ছেন, তাঁর ঐরূপ হয়। তিনিই কর্ম করার সময়েও আপনাকে তা  
 থেকে আলাদা দেখতে পান। তিনি যেন পাকা নারকেল, ভিতরে  
 খোলা থেকে শাঁস আলাদা হয়ে গেছে, নাড়, খট্ খট্ কোরে আত্ম-  
 যাজ হবে আর আমরা যেন ডাব,—খোলাতে শাঁসেতে একসঙ্গে জড়িয়ে  
 রইছি। খোলায় আবার লাগলে শাঁসেও গিয়ে লাগে। কর্মযোগ  
 কর্তে কর্তে মাহুষ পেকে যায়। পাকা নারকেলের মত তার ভিতরে  
 খোলা ও শাঁস ছেড়ে যায়। মন বুদ্ধি অহংকার ইন্দ্রিয় ও শরীর প্রভৃতি  
 হতে তার আত্মা আলাদা হয়ে গিয়ে আপনাতে আপনি থাকতে পারে।  
 এ সব বাইরের জিনিষগুলো ছেড়ে দিয়ে তার আত্মা আলাদা হয়ে  
 দাঁড়াতে পাবে। জেগে থাকবার সময় ত কথাই নাই, ঘুমাবার সময়ও  
 সে আপনার শরীরটাকে দেখে যেন আর একটা কাব শরীর, যেন  
 অপর একজন কেউ ঘুমাচ্ছে। সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীবামপ্রসাদ\* যেমন গেয়ে  
 গেছেন, ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি,  
 এখন যার ঘুম তারে দিবে ঘুমেই ঘুম পাড়ায়েছি। তার অবস্থাও তখন  
 ঠিক ঐরূপ হয়। আর এ গানের মানেও সেই ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।  
 মাহুষ যত নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করে, ততই ধীরে ধীরে তার শরীরেজিয়াধি  
 থেকে আমি বুদ্ধি হঠে গিয়ে আত্মায় গিয়ে দাঁড়ায় ও ঐরূপ অবস্থা  
 লাভ হয়।

আর এক কথা এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে  
 সর্বত্র একটা বিষয় বোঝানোর বিশেষ চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় যে, মুক্তি-

জিনিষটা কণ্ঠেব দ্বারা লাভ কবার নয়। উহা 'কণ্ঠদাধ্য' নয়। গীতা-কাবেরও এ কথাটা ঐ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা দেখা যায়। এব মানে কি? এ কথাটার ঠিক ঠিক মানে বুঝা দবকাব। না বুঝলে বিশেষ ক্ষতি। কেননা তা হলে কর্মটাকে ছোট জিনিষ মনে হবে। মনে হবে, মুক্তিৰ সঙ্গে ওটাব কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই, অতএব কর্ম কর্ত্তেও প্রবৃত্তি থাকবে না, কর্মে নিষ্ঠা আলাগা হয়ে বাবে। তবে এ সব বিচান শাস্ত্রে কিসেব জ্ঞান? এইটী বুঝাবার জ্ঞান যে, কর্মের দ্বারা আত্মাব স্বরূপ বা স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হব না, আত্মা ক্ষয়ক্ষিবহিত, উৎপত্তিবিনাশ-শূন্য, নিত্যানন্দস্বভাব। কর্ম—শরীর মন ইঞ্জিবাদিকে বদলে দেয়। যে সব যন্ত্রেব ভিতর দিঘে আমবা আত্মা ও জ্ঞান দেখছি, কয় সেই ঙুলোকে ঘরে য়েজে পরিষ্কার কোলে দেয়। কলসরূপ মন বুদ্ধিৰ ভিতর দিঘে এতদিন যে কাপসা কাপসা দেখছিলাম, কুয়াসার ভিতর দিঘে দেখার মত এতদিন যে ছোট জিনিষটাকে বড় দেখাছিল বা জিনিষটাব অস্তিত্বই বোধ হচ্ছিল না। সেই সব ভুলগুলো ঘুচে গিযে যে জিনিষটা মেখন, সে জিনিষটাকে ঠিক তেমনি দেখতে পাওবা যাব। অতএব তাঁদেব মতে কর্মেব ফল হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। আত্মাটা যে ছোট ছিল, কর্মেব দ্বারা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগে। এবং অবশেষে এত বেড়ে উঠলে যে, তাব সব বাঁধন গুলো পটপট করে ছিঁড়ে গেল, তা নব; কেন না, এক রকম কর্মেব দ্বারা আত্মাটা যদি বাড়তে পাবে, তা হলে আব এক রকম কর্মেব দ্বারা সেটা ছোট হবে হবে, অবশেষে বিল্কুল নাও থাকতে পাবে—এইটা এসে পড়ে। এই জ্ঞান তাঁবা বলেন যে, আত্মার মুক্তি যদি কর্মদাধ্য হয়, তবে তাব অস্তিত্ব আছে। কাবণ, কর্ম দ্বারা যে জিনিষেব উৎপত্তি হয়, তাব আদি, বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। অতএব তাঁবা বলেন, মুক্তিটা আত্মাতে সন্দেহ রয়েছে, ওটা হচ্ছে তাব স্বার্থ স্বভাব; সেইটে ভুলে গিযেই তাব আপনাকে কেহ মনু ইত্যাদি বোলে মনে হচ্ছে, আব তাব ফলেই, আপনাকে সুখী দুঃখী বলে মনে কবছে।

যদি জিজ্ঞাসা কর, এ বকম ভুল তার কেন হল? তাতে তাঁরা বলেন, সেটা বোঝাব বা বোঝাবার কথা নয় হে বাপু। সে ভুলটা আগে হলে তবে বোঝা বোঝান আসে। তোমাব মন বুদ্ধিৰ দৌড়টা ঐ ভুলের গভীর ভিতর। সে জ্ঞান সে ভুলটার কারণ মন বুদ্ধি কেন

করে জানবে হে? তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, কেমন কবে সে ভুলটা হ'ল, তা হলে তাঁরা বলেন, 'অজ্ঞানেনারিতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানটা ঢাকা পড়েছে, সেই জন্ত এই কষ্ট। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে উপায়? তা হলে তাঁরা বলেন, হাঁ, সেটার একটা উপায় ঠাউরিছি। সুখ দুঃখ, লাভ লোকসানের দিকে নজর না দিয়ে স; কাজ গুলো করে যাও দেখি। তা হলেই এই অজ্ঞানের জড অহংকারটা নষ্ট হয়ে যাবে; আব 'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাস্মিন বিন্ধতি।' এইরূপে কায কর্তে কর্তে পূর্ণ ভাবে নিষ্কাম হলেই সে জ্ঞান আপনা আপনি এসে পড়বে। তা হলেই ভ্রমটা যুচে যাবে। তখন মবীর মন যে আব কায কর্ণে না, তা নহ, ঈশ্বরেচ্ছায় আরো ভাল করে কায কর্ণে। তখন বুঝবে, কখন বা কর্ণ করা দবকাব আবাব কখন বা চূপ করে থাকে দরকাব। আরো বুঝবে, কর্ণই বা কি আর কর্ণ থেকে বিরত হয়ে ঠিক ঠিক চূপ কবে থাকাকাই বা কাকে বলে। তখনি মাধু-ষের কায করা না না করা এ দুটো ক্ষমতাই আসবে। সাধারণ মাধুষের তা নাই। সে কেবল কায কন্তেই জানে। এক দণ্ড কায না করে চূপ করে থাকতে জানে না। কায যেন ভূতেব মত তার ঘাড়ে চেপে রয়েছে আব বুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এইরূপে কর্ণের অধীন হয়ে সে এমন জড়িয়ে পড়ে যে, বিশ্রাম বা মুক্তির ভাবটা তার নজর থেকে একেবারে উড়ে যায়। মববারও আর অবসর পায় না। ইহাই বিপদ। যদি বল কেন? কোন কায না করে কি আমরা স্থিব হয়ে কখন কখন বসে থাকি না? বা রাত্রিকালে ঘুমাই না? তখন আর কি কায করে বুবে বেড়াই? গীতাকাব বলেন, হাঁ, ঘুরে বেড়াও না সত্য, কিন্তু তা বলে কি কায করা একেবারে বন্ধ দাও? চিত্ত, ভাবনা বা স্বপ্ন এ গুলোও যে কর্ণ। তার পর নিঃশ্বাস তোলা, হৃদয়স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি কাযগুলো তো হতেই থাকে। তবে আর একেবারে কায থেকে বিরত হলে কি করে? ওকথা কোন কাষেব কথা নয় হে বাপু। তুমি কর্ণের দাস। একেবাবে পরাদীন। ভুলে মনে কচ্ছ, আমি স্বাধীন, আমি কায ক্বলেও কন্তে পারি, না ক্বলেও কন্তে পারি; বিরান কাকে বলে, তার কিছুই বোঝ না এবং একটু আশটু বুলেও তোমার তা করার শক্তি নাই। যদি বিরাম কথাটার বার্থ্য মানে বুঝতে চাও, তা

হসে নিজের লাভ লোকসানটা আঁজ থেকে আর না খুঁজে কর্তে হয় তাই কচ্চি বলে সব কাষ গুলো করে যাও। তা হলেই কালে বুঝতে পার্কে, এই রকমে কাষ করার নামই হচ্ছে কর্মযোগ। যে কাষগুলো কত্তে কত্তে লোকের নানাপ্রকার বন্ধন আসছে, সেই গুলোকে এমন ভাবে করা যে, যা কিছু ওন্‌ছো, যা কিছু বোল্‌ছো, যা কিছু কোন্‌ছো, সেই সমুদয় কাষ গুলো তোমায় আর জড়িয়ে না ফেলে কর্মের দাসত্ব থেকে মুক্ত কোরে দেবে।

কর্মযোগ ব্যাপারটা কি ? না, কর্ম কব্বার এইরূপ কৌশল ;—‘যোগঃ কর্মস্থ কৌশলং’—এমন কৌশলে কর্ম করা যে, কাষ করে আর জড়িয়ে পড়তে না হয় ; যাতে আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে কাষ কত্তে পারি। কি করলে তেমন করে কাষ করা যায় ? নিজের লাভের দিকে দৃষ্ট না রাখলে। যেখানেই স্বার্থ, সেখানেই ফলের আশা আর সেখানেই আসক্তি এসে পড়ে। তুমি কাষ কর কিন্তু দেখো, কাষ যেন না তোমায় পেয়ে বসে। নতুবা কাষ ত কত্তেই হবে। পিতা-মাতার সেবা কত্তে হবে, যদি বিবাহিত হও ত স্ত্রীপুত্রদের পালন কত্তে হবে। যে সমাজে আছ, তার প্রতি কর্তব্য আছে ; যে দেশে জন্মেছ, তার প্রতি কর্তব্য আছে ; সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রতি কর্তব্য আছে। শাস্ত্র বলেন, দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়।

কাষ কত্তেই হবে। তবে পরমহংসদেব যেমন বলতেন, সেই ভাবে কাষগুলো কর। মনে কব, যেন তুমি বড় লোকের বাড়ীর চাকরাণী। সে কাষ কর্ম কত্তে, ছেলেনের খাওয়াতে দাওয়াতে, তাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ‘হচ্ছে কিন্তু মনে মনে জানে, আমি এদের কেউ নই।’ মনিষ যে দিন ইচ্ছা করে, সেই দিনই তাড়িয়ে দেবে। তুমিও সংসারে এই ভাবে থেকো।

অর্জুন যতদিন রাজস্ব ভোগ লড়াই দাঙ্গা প্রভৃতি তাঁর জীবনের সব কাষ গুলো এই ভাবে করে আসছিলেন, ততদিন তাঁর বুদ্ধি পরিষ্কার ছিল। ভালবাসার মোহে পড়ে ততদিন তাঁর বুদ্ধিওন্ধি গুলিয়ে যায় নি। ক্রত্ৰিয় জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য—সত্যনিষ্ঠা, অস্ত্রায় অত্যাচারের দণ্ড-বিধান করে অ্যায় বিচার স্থাপন, ধর্মের উচ্চভাব আপনার হৃদয়ে পোষণ করে অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করান, শরণাগতকে শরণদান,

হুঁসল শঙ্কর-প্রতি কমা ও দয়াতাব, আশনার আত্মীয় কটুষ্ণ বা ভাল-  
বাসার পাত্রও অজ্ঞা অধর্ম করলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া ইত্যাদি—  
এতদিন বজায় রেখে কাঁচ করে যাচ্ছিলেন। মনে করেছিলেন, এ ত  
খুব সোজা। এই ভাবেই চিরদিন কাঁচ কয়ে যাবেন। কিন্তু মায়ার  
বিষয় প্রতাপ! হঠাৎ একদিন কুকুকেত্রেব ভীষণ হত্যাভিনয়ের আড়ম্বর  
উদ্যোগ, জীবনের পরিবর্তনসম্বল পরীক্ষার দিন সামনে উপস্থিত। দেখ-  
লেন, ঘটনাস্রোতে আপনি একদিকে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, ছাড়-  
বার পথ নাই! ধর্ম, সত্য, জ্ঞান, বিচার সব তাঁর দিকে। অমিতপ্রভ  
ধর্মবন্ধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিকে। নাই কেবল তারা, যাদের জীব-  
নের কিশোর কাল হতে শ্রদ্ধাভক্তি করে এসেছেন, ভালবেসেছেন, হৃদ-  
য়ের কোমল ভাবগুলো দিয়ে এসেছেন। নাই কেবল তারা, যাদের  
হাত থেকে এমন অত্যাচার অবিচার অধর্ম নৃশংসতা পাবাব প্রত্যাশা  
মানুষ স্বপ্নেও করে না। আবার তাবা যে কেবল তাঁর দিকে নাই,  
ভাও নয়, তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এত সাধের ক্ষত্রিয়-ধর্ম, জীবনের  
উচ্চ আদর্শ যদি রক্ষা কর্তে হয়—ত তাদের হত্যা কবা ভিন্ন অন্য উপায়  
নাই। দেখলেন,—তাদের হৃদয়েব উষ্ণ শোণিতধারায় তর্পণ ভিন্ন ধর্ম-  
নিষ্ঠা দেবী প্রসন্ন হচ্চেন না। অর্জুনের বীর হৃদয় সে ছবি স্থির  
হয়ে দেখতে পারে না। ভিতরে সহস্র সহস্র বিপরীত ভাবের প্রবল  
তরঙ্গ সমূহ এককালে ছুটছুটি কবে আবর্তনসম্বল করে ফেললে।  
ভালবাসার মোহ এল। মোহ, ধর্মভাবের উচ্চ স্মৃতিসম্বল ডুবিয়ে  
ফেললে। কাষেই বুদ্ধি আব দিগ্নির্গয়ে সমর্থ না হয়ে আবর্তের  
ভিতর নৌকা চালিয়ে অসহায় হয়ে পড়লো। তখন স্বার্থ এলো। মান  
অপমানের চিন্তা, জয় পরাজয়ের ভয় ও ভাবনা সব একে একে এসে  
বোললে, “পালাও পালাও, এ ত ধর্ম নয়, এ যে অধর্ম কর্তে বসেছ। কাদের  
সঙ্গে লড়াই কতে কৌমর বেঁধেছ? এদের সঙ্গে পার্কেই বা কেমন করে?  
ঐ দেখ ইচ্ছাকৃত্য ভীষ্ম, ঐ দেখ গুরু দ্রোণ, ঐ দেখ বিচিত্রকবচকুণ্ডল-  
ধারী, একবাতী-অস্ত্রসহায় কর্ণ, ঐ দেখ অমর রূপ ও অশ্বখামা, ঐ দেখ  
পিণ্ডবরদপৌ সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ—এদের সঙ্গে পার্কে? একটুকু ক্ষমির জন্মে  
এত বড় বিশ্বব্যাপী মানটা কি খোয়াবে? পালাও পালাও, তিন্কা করে  
থাও, সেও ভাল আর যদি জেতও ত এদের মেয়ে সে রাজ্যভোগ কি

সুখের হবে?" অর্জুন যে ধর্মের জন্ত, সত্য বিচারের জন্ত লড়াই কর্তে দাঁড়িয়েছেন, সে কথা ভুলে গেলেন। সব কালেই জীবনের এইরূপ হলে যান্নবেব এমনি হয়। উদ্বেগ ভুলে স্বার্থে জড়িয়ে পড়ে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এটা বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেনুপজায়তে ।

সঙ্গাং সঙ্গায়তে কামঃ কামাং কোধোইতিজায়তে ॥

কোধানুবতি সম্মোহঃ সম্মোহাং স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাধু ক্লিনাশো বুদ্ধিনাশাং প্রণশতি ॥

কপ রসাদি ভাবতে ভাবতে কোন জিনিষটা প্রথমে যাহ্নবের মনে ভাল লাগে ও মন সেই দিকে ঢলে পড়ে, biassed হয়। অমনি কামের উদয় অর্থাৎ ঐটে আশাব হোক, এইরূপ ইচ্ছা হয়ে সেইটে মর্তে এগিয়ে যায়। উহাতে বাধা পেলোই বিরক্তি আসে। বিরক্তির পরিণাম কোধ। তাব বশীভূত হয়ে সে সেই বাধাটা দূব কর্তে চেষ্টা কবে। তার পরিণামে মোহ আসে। মোহ আসলে সত্যপথে চলবো, ধর্মপথে থাকবো ইত্যাদি উচ্চ উদ্বেগ ওলি ভুলে যায়। ইহাবই নাম স্মৃতির লোপ হওয়া। তখন ঝারে হোক অজ্ঞায়ে হোক সে জিনিষটা মাতৃষ লাভ কর্তে ছোটে। শুক উপদেশ প্রভৃতি এতদিন যা তাকে মন্দ কায, পাপ কায থেকে লিবত বেথেছিল, সে সব ভুলে যায়। ফলে বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ও পাপ কায করে অশেষ প্রকাবে কষ্ট পায়।

মনে কর, কেউ অর্থ উপার্জন কর্তে চায়, দেশেব উপকাব কর্তে বোলে। প্রথম প্রথম ঐ ভাব বেশ প্রবল থাকে। কিন্তু টাকা হাতে আসলে টাকার প্রতি মায়া হয় এবং ক্রমে অর্থলালসায় উদ্বেগ ভুলে নিজের সুখবিলাস অথবা কাঙ্ক্ষনকেই জীবনের লক্ষ্য করে ফেলে। সেই জন্ত উদ্বেগ ঠিক বাধতে হয়, ফলের দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না; এই হচ্ছে কর্মযোগ। কর্মযোগী কে হতে পারে? ৩য়ে আপনাকে বশ কর্তে পেরেছে, আপনার ইঞ্জিয়গুলোকে বশ করেছে; জীবনের উচ্চ উদ্বেগ যার অবিকলিত আছে, কায থাকে না চালিয়ে যে কাযকে চালায়, সেই কর্মযোগী হতে পারে। উদ্বেগ পূর্ণ হলে সে বন্ধ হতে পারে, আমার কায ফুরিয়েছে এবং কায থেকে অবসর নেয।

গীতায় তাই শিক্ষা দিচ্ছেন, কায কর। কায না করার চেয়ে কায

করা ভাল। কিন্তু কাঁচ কৰ্ত্তে পারে, ফলকামনা কোরে না। ফলকামনা আসলেই বাধা পড়তে হবে। দেখতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে যারা কোন বড় কাৰ্য্য কোরেছে, তারা সকলেই সংযমী পুরুষ, আপনার উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। ছাত্রজীবনে কে বড় হয়? যে পাঁচটা আনোদে না নেতে উদ্দেশ্য ঠিক রাখে। সংসারে কে বড় হয়? ধর্মে কে বড় হয়? যে উদ্দেশ্য ঠিক রাখতে পারে। উদ্দেশ্যহারা হলোই পড়তে হবে ও তোমার দ্বারা কাণের মত কাঁচ আর একটাও হবে না। কেননা, তোমার বুদ্ধি গুলিয়ে যাবে। কোনটা করা উচিত, কোনটা নয়, তা আর ধর্মে পারবে না। ফলে কতকগুলো বাজে কাঁচে ছুটানুটি করে মরাই সার হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, মন থেকে একেবারে ফলকামনা যদি যায়, তা হলে কাঁচ কোরো কেনন করে? কোন উদ্দেশ্য-বিশেষ কামনা করা ভিন্ন কাঁচ কি করা যাব? ঠিক কথা; উদ্দেশ্য ছাড়া কাঁচ হতে পারেনা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের দিকে যাবার সময় নিজের লাভালাভ খতাব কেন? আমরা কেবল নিজের লাভ লোকমান খতাতে চাই। ওইটে আগে খতিয়ে তবে কাঁচ লাগি। লেখা পড়া শিখি রোজগার কৰ্ত্তে পারো এবং নাম হবে বলে, জানের জন্ম নয়। জ্ঞী পুত্র প্রভৃতিকে ভালবাসি নিজে সুখী হই বলে, তাদের জন্ম নয়। এইরূপে তনিয়ে দেখলে আমাদের সকল কাঁচেরই উদ্দেশ্য দেখতে পাই স্বার্থসেবা—আপনার অহঙ্কারের ষোড়শোপচারে পূজা ভিন্ন আর কিছু নয়। আমাদের মুখে একখানা থাকে আর মনে একখানা থাকে। এই ভাবের ধরে চুরীটা প্রথমে না ঘুচলে কোন স্বার্থ কাঁচই আমাদের দিয়ে হবে না। কোন সত্যের পথই আমাদের চোকের সামনে পড়বে না। সেই জন্তই গীতাকার অর্জুনকে সামনে রেখে আমাদের সকলকে বলছেন, ফলকামনাই সর্বনাশের মূল। ফলকামনাই তোমার অজ্ঞানে জড়িয়ে রেখেছে, কৰ্ত্তব্য কৰ্ত্তে দিতে না। চোখে ঠুলি বেঁধে সামনে সত্য থাকলেও দেখতে দিতে না। ফলকামনা ছাড়, ছাড়। ফলটুকু দিকে দৃষ্টি না রাখলেই অজ্ঞান অধর্মের মূল বার্ষপিরতার হাত থেকে এড়াবে। তখন ঠিক ঠিক সুখ কাকে বলে, তা বুঝবে, ঠিক ঠিক ভালবাসা কাকে বলে, তা দেখবে। ফলটার দিকে দৃষ্টি না রাখলেই ভূমি যোগ্য হবে, জ্ঞানী হবে, তত্ত্ব হবে। তোমার সব হৃৎ দূরে যাবে।



শাস্ত্র পড় বা বলতাই শোন, শাস্ত্রের কথাগুলি যদি-জীবনে পরিণত করে কায না কতে পার, শাস্ত্র যদি জীবনে না ধাটে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সহায় না হয়, তবে সে পড়াশুনা সব মিথ্যা। তার কোন প্রয়োজন নাই। ছাত্রজীবনেই বল, সংসারে ভোগের ভিতরেই বল আর সন্ন্যাসের ত্যাগের মধ্যেই বল, এটা কতে শেখা অগে চাই। তা হলেই মানুষ যেখানে যেমন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, শাস্ত্রজ্ঞান জীবনের উচ্চ লক্ষ্য তার সামনে ধরে তাকে সেখান হতেই ফুলে দেবে।

স্বামীজি বলতেন, আমাদের দেশে এখন আর শাস্ত্র কেউ বোঝে না, কেবল ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃতি প্রকৃতি কতকগুলো কথা শিখে মাথা গুলিয়ে ধরে। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যটা ছেড়ে দিয়ে কেবল কথাগুলো নিয়ে মারামারি করে। শাস্ত্র যদি মানুষকে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সাহায্য কতে না পারে, তা হলে সে শাস্ত্রের বড় একটা আবশ্যক নাই। শাস্ত্র যদি সন্ন্যাসীকে পথ দেখান আর গৃহীকে পথ দেখাতে না পাবেন, তা হলে সে একদেশী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি দরকার? অথবা শাস্ত্র যদি মানুষ অল্প কায কর্ম সব ছেড়ে বনে গেলে তবে তাকে সাহায্য কতে পারেন, কিন্তু সংসারের কোলাহলের ভিতর, দিনরাত শাটুনির ভিতর, রোগ শোক দৈন্যের ভিতর, অল্পতপ্তের নিরাশার ভিতর, অভ্যাচারিতের বিচারের ভিতর, রণক্ষেত্রের করালতার ভিতর, কামের ভিতর, ক্রোধের ভিতর, আনন্দের ভিতর, জয়ের উদ্ভাসের ভিতর, পরাজয়ের অন্ধকারের ভিতর, এবং পরিশেষে মৃত্যুর কাল যাত্রির ভিতর মানুষের হৃদয়ে আশার আলো জালিয়ে দিয়ে পথ দেখাতে না পারেন, তবে হুর্ল মানুষের সে শাস্ত্রে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

মনে কর, ছাত্রজীবনে জ্ঞান লাভের জন্ত বা অল্প কোন সং উদ্দেশ্যে আশ্রয় বিলাস বেতে হবে। শাস্ত্র যদি না আমার সে সময় সে বিষয়ে সাহায্য কতে পারে, তবে আমার দশা কি হবে? কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, আমাদের শাস্ত্রের কোন দোষ নাই, দোষ আমাদের। আমরা শাস্ত্রোপদেশ কিরূপে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় লাগাতে হয় ও লাগাতে পারা যায়, তা একেবারে ভুলে গেছি। ভুলে গিয়ে মনে করছি, গাটি বক্ষ কক্ষ কতে হলে বনে যেতে হবে। পীতাকারের অস্ত্র মত্ত। তিনি একমিকে অর্জুনকে বলছেন, তুমি বিচারের জন্ত লড়াই না করে তোমার ধর্ম লাভ কিছুতেই হবে না। আমার উত্তরটি এই—

প্রকৃতির লোককে বলছেন, তোমাকে সব ছেড়ে ছুড়ে পাহাড়ে বদরিকা-  
জনে গিরে অনন্তমনে ধ্যান জপাদি কন্তে হবে। তা না হলে তোমার  
ধর্মলাভ হবে না। অতএব শাস্ত্রের কথাই হচ্ছে এই, ভূমি যেখানেই  
থাক, কর্মকল ছেড়ে ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থ হয়ে কর্ম করে সেখান থেকেই  
তোমার মুক্তি হবে।

পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হয়ে বাহুব যে কাজ কন্তে পারে, আমাদের চোখের  
সামনে পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দ স্বামী তাহা নিজ নিজ জীবনে দেখিয়ে  
গেছেন। তাঁরা আমাদের মত শাস্ত্রের ছোবড়া নিয়ে টানাটানি করেন  
নি। আমাদের জীবনের সহিত শাস্ত্রোপদেশের ঐক্য চাই। তা হলেই  
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারা যায়, তা দেখিয়ে গেছেন। কেমন  
করে শাস্ত্রজ্ঞান জীবনে প্রতিকলিত কন্তে হয়, তাই শিখিয়ে গেছেন।  
আমাদের সেটা বহু কবে শিখা চাই। তোমাদের সমিতিরও তাই উদ্দেশ্য,  
সেটা ঘেন কখন ভুলো না। দেশ কাল ও পাত্র তেদে ধর্ম নানা-  
ভাবে প্রকাশিত হবে, এইটা গিজে নিজে ভাল করে বুঝে জগতের  
সামনে জীবনে সেইটি দেখাতে হবে, এ কথাটা ভুলো না। শাস্ত্রের  
উপদেশগুলি একালেও যে জীবনে পরিণত করা যায়, আর কন্তে পারলে  
মহত্ব যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, বিশেষ সাহায্য পায়, জীবন-  
সংগ্রামে বিশেষ জোর পায়, তা দেখাতে হবে, ভুলো না। শাস্ত্রের যদি  
দোষ থাকতো বা উহা যদি একালের অমুপযোগী সেকলে একঘেয়ে  
উপদেশে পূর্ণ থাকতো, তা হলে ভগবান্দ্রীয়ারাক্ষদেব ও ধর্মবীর  
বিবেকানন্দের জীবন গঠনে কখন সহায় হতে পারতো না, এটা বেশ  
করে বুঝো। শাস্ত্রের দোষ দিও না। দোষো আপনাতর চোকে, যে,  
শাস্ত্রের স্বার্থ অর্থ, ঠিক ঠিক উদ্দেশ্য তার দেখবার শক্তি নাই। দোষো  
আপনাতর শিক্ষাকে, বাতে চোক, কাণ, নাক, মুখের ব্যবহার কেমন করে  
কন্তে হয়, তাও লোককে শিখতে দেয় না।

আমাদের ভিতর কটা লোক ইঞ্জিয়ার ব্যবহার কর্তে জানে? ইঞ্জি-  
য়ারকে হুগ জিনিষ ক্রমে ক্রমে ধর্তে শেখালে তবে ত তারা ধর্তে পারবে।  
আজকাল আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, কেমন করে আমরা ভাল  
কেরাশীটা হতে পারবো। নুতন নুতন ভাবে চিন্তা কর্তে, হুগ হুগ  
বিষয় বারশা কর্তে, মস্তিষ্ক ও ইঞ্জিয়ার চালনা কর্তে শিখান দূরে থাক,

চিহ্ন করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে হাত পাঙলা শেটের ভিতর চুকিয়ে ছেলেগুলোকে একেবারে জড় করে তুলছে। ইঞ্জিয়গুলো সবল, কশ্মঠ হলে তবে ত সকল বিষয় উপলব্ধি করতে পার্কে এবং তবেই ত জ্ঞান হবে। আমরা চাই,—অশিক্ষিত ভাঙ্গাচোরা শরীরের জ্বির দিয়ে যোগীর বহুকালের শিক্ষিত সতেজ অথচ বশীভূত ইঞ্জিয় মনের মত হস্ত যন্ত্র বিষয় সব একদিনে অন্ততব কোরো। আরে পাগল, ভাঙ কি কখন হয়? আগে ইঞ্জিয়গুলোকে সতেজ কব, শিক্ষা সহায়ে বশীভূত কর, বহুকাল ধরে অভ্যাস কব, প্রকার সহিত চেঁচা কব, তবে ত পার্শি। তা কোরো না, আব বোলুবো,—আমাদের শাস্ত্রটা সব জাজ্ঞেবি ও মিথ্যাতে ভরা। হিন্দু ধর্মটা কিছু না। এব চেয়ে মূখতা আর কি হতে পারে? ছেলে বেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম। গল্পটার নাম—চোক থাকা ও না থাকার কত প্রভেদ। গল্পটা এই,—দুজন লোক এক মাঠে উপর দিয়ে একদিন বেড়াতে গিয়েছিলো। একজন সমস্ত দিন ঘুবে ঘুরে বিশেষ কিছুই না দেখতে পেয়ে মহা বিবর্ত হয়ে কিরে এল। আর তার সঙ্গী কত কি নূতন নূতন গাছ গাছড়া সংগ্রহ কোরে জমিটার উর্বরতা পরীক্ষা কবে নানা রকমেব নূতন পাথবে জামাব পকেট পুরে মহা আনন্দে কিরে এল। এক মাঠেই বেড়াতে গিছলো। কিন্তু শেষের লোকটা চোখের ব্যবহার জানতো, এই প্রভেদ। স্বামীজিবি সহিত যারা বেড়িয়েছে, তারা জানে, তাঁব কিরূপ দৃষ্টি ও ধারণা ছিল। কত-বার দেখিছি, একই দেশের ভিতর দিয়ে, একই স্থানে বাস করে, এক সঙ্গে বেড়িয়ে এলাম। তিনি এসে তাদের বিচিত্র আচার ব্যবহার ইতি-হাসাদিবি কত কথা বলতে লাগলেন। আমরা শুনে অবাক হয়ে জাব্তে লাগলুম, ইনি এত কখন দেখলেন বা শুনলেন।

শাস্ত্র বলেন, দৃশ্যবীর, সতেজ ইঞ্জিয়গ্রাম, ধারণাসমর্থ মনবিশিষ্ট পুরুষই বেদজ্ঞানের অধিকারী হতে পাবেন। সে পুরুষ এখন কোথায়? দেশের লোকের ভিতর এত যে অন্ধকৈব দোহাই দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকা দেখতে পাও, সবটা কি মনে কর, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস থেকে আসে? তা নয়। দুর্বলতা ও তমোগুণই হচ্ছে তাঁর প্রধান কারণ। অদৃষ্ট বা দৈব মানুষকে সহায়তা না করলে কার্যসিদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু গীতাকার বলেন, কার্য সিদ্ধি হবার পাঁচটা কারণের ভিতর

দৈবট। একটা করণ যাত্র। দৈব সহায় না হলে যেমন কোন কাঁচ সফল হয় না, সেইরূপ তার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধান ভাবে চাই, “অধিষ্ঠানং ভরা কর্তা করণং চ পৃথগ্ধিৎ। বিবিধান্চ পৃথক্চেষ্টাঃ।” উপযুক্ত দেশ কাল, উদ্যমশীল কর্তা, সন্তোজ শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার ও তৎসহায়ে বারবার নূতন নূতন উপায়ে কর্তার উদ্যম করা। শাস্ত্র বলেছে, দৈবসহায় ভিন্ন কোন কাণ্ড হয় না। সেটা আশ্রয় বোধ করে ধরে বসে আছি, কিন্তু শাস্ত্র যে তা ছাড়া আরও বলছেন, সবল হও, অনলস হও, ক্রমাগত চেষ্টা কর, কার্য্য কর, সেগুলো আমরা শুনেও শুনেও না, দেখেও দেখেও না। কেননা, তা যে আমাদের বিলুপ্ত নাই, আমরা যে মহা ভয়ঙ্করে পড়ে রয়েছি।

কাষের আগ্রহ চাই, তার উপর দৈব চাই। হুটোরই দরকার। তবে ফলসিদ্ধি হয়। তোমার হাতে আছে উদ্যমী হওয়া, অনলস হওয়া, ফলসিদ্ধি তোমার হাতে নাই, তোমার দেখবার দরকারও নাই। তোমার দেখতে হবে, উদ্দেশ্যটা ঠিক রাখতে পেরেছে কি না। কর্ম-যোগে গীতাকার এইটা হাতে তোমায় শিক্ষা দিচ্ছেন।

কর্মযোগের আর একটা উদ্দেশ্য আছে,—শক্তিকর্ম নিবারণ করা। যোগ হচ্ছে,—কর্ম করবার কৌশল। কর্মবিশেষে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করা দরকার, ততটুকু তাতে লাগান, অল্পও নয়, অধিকও নয়। ফল-কামনা না করলে সেইটা হয়। মনে কব, ফলের দিকে মন দিয়ে যদি অক্লান্তকার্য্য হোলে, তা হলে মনস্তাপে তোমার কত শক্তি ক্ষয় হোলো। কর্মযোগ বলছে, শক্তিকর্ম কোরো না। শক্তি সঞ্চয় কর এবং শারীরিক শক্তির সার ভাগকে মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর। সংযম ও কর্মযোগের এই শিক্ষা। যতটুকু শক্তি প্রয়োগ দরকার, ততটুকু কাষে লাগাও। তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে, ততটুকু করেছে কি না, সর্বাঙ্গী দেখো। কিন্তু যেটা তোমার হাতে নাই, সেটার জন্ত মাথা খুঁড়ে, হা হতাশ করে শক্তিকর্ম ছোড়ো না। ভোগী, ফলকামী পুরুষের শক্তি সর্বাঙ্গী ঐ রূপে ক্ষয় হয়। কাষেই কর্ম করবার শক্তিও তার দিন দিন কমে যায়। সেই জন্ত কেবল উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে কাষ করে চলে যাও।

ঐ রূপে কাষ করবার উপযুক্ত কে? যে আপনার মনটাকে বশ

কর্ত্তে গেরেছে। ঐরূপে কাব করে গেলে কি হয়? কর্ম্মকলন কেটে গিয়ে বীরে বীরে পূর্ণ কামলাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এই কর্ম্মযোগের অমূল্য বিশেষ রূপে দেখা যায়। দেখা যায়, তাঁর ইঞ্জির মন বর্জনা অশেষ কাব করলেও ভিবি অন্নবাহরু ফলাকাঙ্ক্ষী মন। তাঁহার জায় অবতারেরাই জগতের ববার্ষ শুদ্ধ। তাঁদের জীবনই জ্ঞানের বিজ্ঞারের জজ, লোকের শিক্ষার জজ। তাঁদের জীবন দেখে ঐ ভাবে কাব কতে শেখ। নতুবা সংঘ কস্তে না শিখলে, ফলাকাঙ্ক্ষায় কাষে ঐরুত্ব হলে, মন ক্রমে ক্রমে ইঞ্জিরের দাস হয়ে পড়বে এবং ঐ ইঞ্জিরই আবারের মাটি কবে। ইঞ্জিরের দাস হলে চলবে না, কাষ হবে না, উদ্বেগ হারাতে হবে। ইঞ্জির ও মন বশে রাখতে হবে। মহান্ উদ্বেগ সামনে রেখে নিকাম হয়ে কাষ কবে যাও। দেখবে, জ্ঞানযোগী তীর বৈরাগ্য সহারে যে অবস্থা লাভ করেন, কর্ম্মযোগী কর্ম্মের দ্বারা ঠিক সেই অবস্থায় পৌঁছিবেন। ছুজনেরই উদ্বেগ এক কিন্তু পথ আলাদা। পথে যতক্ষণ, ততক্ষণ উভয়ের মিল না থাকলেও উদ্বেগে পৌঁছিবেন আর বিরোধ থাকে না।

## আমেরিকায় বেদান্ত।

— :: :: —

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোতে প্রাচীন আৰ্য্য ঋষিগণের বংশধরগণ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, 'তীর পাশ্চাত্য কিরণে,' যখন আঁধি ধাঁধিা দাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং কেহ পিতৃ-পুরুষের সম্বন্ধহীন, পদব্র্জিগণের অজ্ঞতাভ্রান্ত উপেক্ষায় আবর্জনা-মধ্যগত মানিকোর অস্তিত্ব অবিদিত হইয়া আবর্জনা 'চুরীকরণে' ফিঞ্জ-কর, কেহ বা পিতৃপুরুষগণের গুঢ় আদেশের বর্থাববোধে অক্ষম হইয়াও কুসংস্কারের প্রেরণায় আবর্জনাগুলির নিকট নতজাহু হইতেন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, একদিন এই মানিক্য আবর্জनावিস্মৃত হইয়া কেবল আধ্যাত্মিক গৃহ উজ্জ্বলিত করিবে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার চুরবিসপী প্রভার 'দাঠ' 'দুহ' 'তেজ' 'দরী' পারকেও আলোকিত করিবে? এখনও অনেক

কুলে মানিক্য-অঙ্গ-সংলগ্ন আবর্জনা-কণাগুলি অনেকের হস্তে ইটকবচ-  
রূপে রক্ষিত হইতেছে এবং ভাবায়ের লামান্ত শিরশীড়া আরোগ্য হইতে  
হুটির অস্ত্রের হস্ত রহভোক্তেন্দ্রশক্তি প্রচারিত হইতেছে বটে, কিন্তু কালের  
গতি অভিজ্ঞ স্বল্পদর্শিগণ দেখিতেছেন; হর্ষোদয়ে পেচকের ও কেন্দ্র-  
গর্ভনে জঙ্ঘকের পলায়নের দ্বায সেই অবলম্বিত বাণিক্য নিম্ন জ্যোতিঃ  
ও মহিমার নিজ পারিপার্শ্বিকগণকে পরাস্তব করিয়াছে—ঐতির সেই  
‘দত্যমেব জয়তে নানুতং’ বাণী সফল হইয়াছে।

পতিতপাবনী জঙ্ঘুনিনীর পূতললিলধোত, বাদশশিখরশিরশোভিত,  
প্রকৃতি-সুখের নিত্য আরাধনায় পবিত্রিত দক্ষিণেশ্বরশ্রীমন্দিরের অদ্বয়-  
হিত ফলকুলসৌরভিত, বিহগকুলনির্নাদিত, জনসমাগমবিরহিত বিপিনে  
পঞ্চবট-বোগসনে সমাবিষ্ট মহাপুরুষের ইন্দিতে যে আজ সত্যাত্মাশ্রী,  
বিজ্ঞানসহায়, কটেকপরায়ণ জাতি পরিচালিত হইবে, তাহা কে স্বপ্নেও ভাবিয়া-  
ছিল? কিন্তু আজ সেই অসম্ভব সম্ভব দেখিতেছি। তাঁহার হৃদয়ে যে অনি-  
র্কণ ব্রহ্মানন্দ জলিয়াছিল, তাহার ফলিত মাদ লইয়া সেই ‘কলিকাতা-  
বাসী বুঝক’ যে বহি আলাইয়া আসিয়াছেন, তাহা তদীয় তিরোধানের না  
নিষিয়া দিন দিন দেখিতেছি, আরো জলিয়া উঠিতেছে। এ হোমানলে  
যিনি একখণ্ড সমিধ বা ক্রবৈকমাত্র হবিঃ সংযোগ করিতে পারেন,  
তিনিও ধন্ত।

আমরা স্বামী ত্রিগুণাতীতের আমেরিকায বেদান্ত প্রচারে আশাতীত  
কৃতকার্যতার সংবাদ পাইয়া আশাবিত হইয়াছি। তিনি এক্ষণে আবে-  
রিকার সানফ্রান্সিসকোতে কার্য্য করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে  
তাঁহার কার্য্য এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে ও এরূপ সুপ্রাণাদীকৃত হইয়া  
আসিতেছে যে, অবিরাহ কার্য্য করিয়াও তিনি সকলের আলাজ্ঞা পূরণ  
করিতে পারিতেছেন না। হানাত্মনে এবারে তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে সংক্ষেপে  
উল্লেখ্যমাত্র করিব। ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

[১] প্রীতি রবিবারে সায়েংকালে ৮টার সময় সর্বসাধারণের জট  
বক্তৃতা হয়। গতবর্ষে (১৯০৩ সালে) নিয়মিত বক্তৃতাগুলি নিম্নলিখিত  
ভাবে দিয়াছিলেন। (১) বর্ষের স্তন্যমার্চর (২) দশহরতের উত্তর  
(৩) ব্রহ্মাণ্ড-সংসার অপূর্ণ যীমাংশ (৪) অদ্বৈত ব্রহ্মনিব্বি আরিহাস  
(৫) বর্তমানযুগের আত্মিক বৈজ্ঞানিক জীবনব্যবহাচরিত (৬) ভারতীয় পারি-

বার্ষিক জীবন (৭) ভারতের আচার ব্যবহার (৮) ভারতের বাল্যবিবাহ (৯) ভারতীয় নারীর নিত্য-কর্তব্য (১০) অহিংসপ্রণালীর শারীর-রহস্য (১১) ব্রহ্মচর্যের ধাত্মিক কি? (১২) ‘আমি’র স্বরূপ (১৩) আত্মার স্বরূপ (১৪) জৈব বিজ্ঞান খৃষ্ট ধর্মের ভিত্তি (১৫) গ্রীক কাহাকে বলে? (১৬) খ্রীষ্টবাদের প্রকৃত ও হিতকরী ব্যাখ্যা (১৭) হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না? (১৮) প্রকৃত খ্রীষ্টান হইবার উপায় (১৯) অবিচলিত-স্বভাব হইবার উপায় (২০) পরমসুখী হইবার উপায় (২১) পবন সূত্রের হইবার উপায় (২২) ঈশ্বরকে লাভের উপায় (২৩) সৃষ্টিবাদ (২৪) জীবনের লক্ষ্য (২৫) ঈশ্বরের স্বরূপ (২৬) ঈশ্বরদর্শনের উপায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতার তালিকা এই :- [১] অব্যাক্ত শক্তি [২] শক্তির ব্যক্ত-ভাব [৩] জীবাত্মা [৪] মন [৫] ভূত [৬] হে-যোগ [৭] রাজযোগ [৮] যোগসিদ্ধি [৯] ধর্মবিজ্ঞান [১০] অনন্ত [১১] সিদ্ধি-রহস্য [১২] শত্রু না মিত্র? [১৩] বিশ্বাস-তত্ত্ব [১৪] বিচার-তত্ত্ব [১৫] প্রার্থনা-তত্ত্ব [১৬] উপাসনা-তত্ত্ব [১৭] আত্মাসম্বন্ধে বেদান্তের মত [১৮] ঈশ্বর সম্বন্ধে বেদান্তের মত [১৯] মাহাত্ম্য কি, এতৎ-সম্বন্ধে বেদান্তের মত [২০] বেদান্ত মতে পরিত্রাতা কে? [২১] বেদান্ত মতে [২২] কল্প-জীবনে বেদান্ত [২৩] মনুষ্য-জীবনের চারি অবস্থা [২৪] উদ্বাহ-তত্ত্ব [ক] [২৫] উদ্বাহ-তত্ত্ব [খ]।

[২] প্রতি সোমবার সায়ংকালে আটটার পর গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মস্পতিবার সন্ধ্যা ৮ইটার সময় বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা।

[৩] প্রতি ব্রহ্মস্পতিবার সন্ধ্যার পর ধ্যান শিক্ষা।

[৪] প্রতি বক্তৃতার পর অর্ধঘণ্টা ধরিয়া যে কোন ব্যক্তি ধর্ম সাধন সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন করেন, তাহাব উত্তর দেওয়া হয়।

[৫] বৃহৎ ও শুক্রবারে সংস্কৃতভাষা শেখান হয়।

[৬] সান্দ্রানসিঙ্কো ব্যতীত অন্যান্য স্থলে বাইনোও বক্তৃতা দিয়া থাকেন। গত বৎসর লস এঞ্জেলস নামক স্থানে তিন মাস থাকিয়া বক্তৃতা দেন।

[৭] বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একমাসকাল কানিকোর্ণিয়ার অন্তর্গত ‘সান্তি-আশ্রমে’ বাইয়া যোগশিক্ষা দেওয়া হয়।



# তাড়িত-রহস্য ।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

( সচিত্র । )

—০ঃ\*ঃ০—

( শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম্ এ )

১৭। ১লা মাষেব উদ্বোধনে প্রকাশিত মৎপ্রবীত “তাড়িত-রহস্য” প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে উক্ত হইয়াছে, যে, “তাড়িতাকর্ষণ অন্তোত্তা-প্রযী”—অর্থাৎ দুইটা পদার্থের মধ্যে যদি একটাতে তাড়িত থাকে, অস্ত্র-টিতে তাড়িত না থাকে, তাহা হইলে উহারা পরস্পরকে টানিবে ; কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ঐ দুয়ের মধ্যে যেটি সঞ্চলন করিতে পারে, সেইটি অস্ত্রটির ( অর্থাৎ যেটি স্থির, তাহার ) নিকট চলিয়া আসিবে। আরও উক্ত প্রবন্ধের তৃতীয় প্যারা-

বিকর্ষণই তড়িৎপরীক্ষার  
একমাত্র স্থানিষ্ঠিত  
উপায়।

গ্রাফে কথিত হইয়াছে, যে, বিষমধর্মী তাড়িতযুক্ত দুইটা পদার্থও পরস্পরকে আকর্ষণ করে। একদিকে দেখা যাইতেছে যে, তাড়িতহীন ও তাড়িতযুক্ত দুইটা পদার্থের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে, অত্ৰদিকে বিষমধর্মী তাড়িত-বিশিষ্ট দুইটা পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে পারে। এই দুইটি ব্যাপারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যদি একটি পদার্থ দ্বারা অস্ত্র এক পদার্থকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রথমটিতে তাড়িত আছে কি না স্থির নির্ণয় করা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে—হয় উহা তাড়িতহীন, নয় উভয় পদার্থে তাড়িত আছে, আর উহাদের তাড়িত বিষমধর্মী। মনে করা যাউক, যেন একটি তাড়িতযুক্ত তাড়িতদোলকের নিকটে কাচদণ্ড আনিবামাত্র দোলকটি দণ্ডের নিকটে চলিয়া আসিল ; এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, দণ্ডটি তাড়িতযুক্ত না তাড়িতহীন ? ইহার উত্তর স্বরূপে এই বলিতে হইবে যে, কাচদণ্ডে তাড়িত থাকিতেও পারে অথবা



না থাকিতেও পারে। যদি থাকে ত তাহা হইলে উহা তাড়িতদোলকের তাড়িতের সহিত বিষমধর্মী। এখন বুঝা গেল যে, আকর্ষণ দেখিয়া তাড়িতের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কিন্তু যদি কাচদণ্ডটি আনিবামাত্র দোলকটি দণ্ডের নিকটে না আসিয়া উঠা হইতে সরিয়া যায়, তাহা হইলে তড়িৎপবীক্ষা বিষয়ে কোনও সংশয় থাকে না। আমবা স্পষ্ট বুঝিতে পাবি যে, দণ্ডে ও দোলকে সমধর্মী তাড়িত আছে ; কেননা সমধর্মী তাড়িতযুক্ত পদার্থ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বিকর্ষণই তড়িৎপবীক্ষার একমাত্র সুনিশ্চিত উপায়—আকর্ষণ নহে।

১৭। তাড়িতযুক্ত তড়িৎবীক্ষণের শীর্ষ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি কাচদণ্ড আনিলে যদি পত্রদ্বয়ের ব্যবধান হ্রাস হয়, তাহা হইলে দণ্ড তাড়িতযুক্ত কি না, তাহা স্থির নির্ণয় করা যায় না। কেননা তাড়িত-হীন পদার্থ ও বিষমধর্মী তাড়িতযুক্ত পদার্থ এই উভয়েই তবকত্বখানির ব্যবধান কমাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যদি দণ্ডটি আনিবামাত্র ব্যবধান বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত বলা যায় যে, দণ্ডটি তাড়িতযুক্ত আব উহার তাড়িত তড়িৎবীক্ষণের তাড়িতের সহিত সমধর্মী। সুতরাং এস্থলে ব্যবধানবৃদ্ধিই তড়িৎপবীক্ষার সুনিশ্চিত উপায়।

১৮। “তাড়িত-রহস্য” প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবের পঞ্চম প্যারাগ্রাফে আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, লক্ষ্যভাবে যুত একটি স্থতীর উপরে সহজে চৌম্বকত্বটী। চৌম্বকাকর্ষণ।  
 বিষম মেরুতে আকর্ষণ।  
 সম মেরুতে বিকর্ষণ।

সঞ্চালন কবিত্তে পাবে, এমন ভাবে  
 একটি হংসপুচ্ছ, খড় বা হালুকা ও  
 লম্বা পাতলা কাঠ বা অল্প বোন

পাতলা পদার্থকে (পাতলা লোহার পাত লইলেও চলিবে) আশ্রয় কবিলে উহা দ্বারা তাড়িতপবীক্ষা করা যাইতে পারে। স্থল প্রান্তবিশিষ্ট একখানি পাতলা লোহার পাতের দুই প্রান্তে একখানি চুম্বকের দুই মূখ যথাক্রমে দ্বিলে লোহার পাতখানি লৌহচূর্ণসমূহকে টানিতে পারিবে অর্থাৎ উহা চুম্বকের ধর্ম প্রাপ্ত হইবে, ইহা বোধ হয় অনেকে জানেন। আর এই লোহার পাত খানিকে যদি একটি লক্ষ্যভাবে স্থিত স্থতীর উপর এক্ষেপে আশ্রয় করা যায় যে, উহা অনাবাসে স্থতীর বিন্দুর চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে, তাহা হইলে, দেখা যায় যে, পাত খানি ঘুরিয়া আসিবার পর

যখন স্থির হইবে, তখন উহার প্রান্তদ্বয় প্রায় উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ নির্দেশ করিবে। এইরূপ চৌম্বকধর্মপ্রাপ্ত লোহার পাতকে “চৌম্বকসূচী” (Magnetic Needle) বলে। একটি ছুঁচের দুই মুখে চুম্বকেব দুই প্রান্ত ঘষিয়া যদি ছুঁচটিকে এমন ভাবে একটি ছিপির ভিতরে প্রবেশ করান যায় যে, উহা একটি জলপাত্রে জলের পৃষ্ঠেব সহিত সমান্তরভাবে (সোজা হইয়া) ভাসিতে পারে, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, ছুঁচটি যখন স্থির থাকে, তখন প্রায় উত্তর দক্ষিণ দিক্ নির্ণয় করে। গীহার “দিগ্‌দর্শন সূচী” বা কম্পাসের কাঁটা (Compass Needle) দেখিয়াছেন, তাঁহাবা এই ব্যাপারটি সহজে বুঝিতে পারিতেছেন। এই চৌম্বকসূচী বা কম্পাসের কাঁটার যে মুখ উত্তর দিক্ নির্দেশ করে, তাহাকে “উত্তর মেরু” (North Pole) আর অপর মুখটিকে “দক্ষিণ মেরু” (South Pole) বলা গেল। এক খানা চুম্বক দণ্ডের এক প্রান্তকে চৌম্বকসূচীর উত্তর মেরুর নিকট লইয়া গেলে ঐ মেরুটি দণ্ড হইতে সরিয়া যায়; আর দণ্ডের অপর প্রান্ত আনিলে উত্তর মেরুটি দণ্ডের নিকটে চলিয়া আসে। এই ব্যাপাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দণ্ডের দুইটি প্রান্ত চৌম্বকসূচীর একই মুখ বা প্রান্তের উপর বিপরীত কার্য্য করে অর্থাৎ দণ্ডের একপ্রান্ত সূচীর উত্তর মেরুকে আকর্ষণ আর অপর প্রান্ত উহাকে বিকর্ষণ করে। সূচীর দক্ষিণ মেরু উপর দণ্ডের প্রান্তদ্বয়ের ক্রিয়া উহার উত্তর মেরু উপর ক্রিয়াব ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ দণ্ডের যে প্রান্তটি সূচীর উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ করিবে আর দণ্ডের যে প্রান্তটি সূচীর উত্তর মেরুকে বিকর্ষণ করে, তাহা সূচীর দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করিবে। চুম্বকদণ্ডকে যদি এক্রূপে ঝুলান যায় যে, উহা পৃথিবীপৃষ্ঠেব সহিত সমান্তরভাবে থাকিতে পারে, তবে স্থির হইলে দণ্ডটিও চৌম্বক সূচীর ন্যায় উত্তর দক্ষিণ দিক্ নির্দেশ করিবে; সুতরাং চৌম্বক সূচীর ন্যায় চুম্বক দণ্ডেরও এক প্রান্তকে উত্তর মেরু ও অপরকে দক্ষিণ মেরু বলা যায়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, চুম্বক দণ্ডের উত্তর মেরু সূচীর উত্তর মেরুকে বিকর্ষণ ও দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ আর দণ্ডের দক্ষিণ মেরু সূচীর দক্ষিণ মেরুকে বিকর্ষণ ও উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, “সম” মেরুদ্বয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ও “বিষম” মেরুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে।

১৯। তাড়িত ও চৌম্বকত্ব ( Magnetism ) এই দুয়ের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। যথা.—সমধর্মী তাড়িতে ও সম মেকদ্রবে বিকর্ষণ

তাড়িত ও চৌম্বকধর্মের  
সাম্য ও বৈষম্য।

}

আর বিষমধর্মী তাড়িত ও বিষম যেক-  
দ্রবে আকর্ষণ। আবও যেমন তাড়িত-

যুক্ত পদার্থের নিকটে থাকিলে তাড়িত-

হীন পদার্থে তাড়িতের উদ্দীপনা হয়; সেইরূপ যে লৌহ চুম্বক নহে, তাহা চুম্বকসংস্পর্শে চুম্বক হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আব একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা উচিত, যে, দুইটি পদার্থ তাড়িতযুক্তই হউক বা চৌম্বক-ধর্মীই হউক, যে শক্তি দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে, তাহা উহাদের তাড়িত বা চৌম্বকধর্মের মাত্রাসাপেক্ষ; আরও ঐ শক্তি উহাদের দূরত্বের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ পদার্থ দুইটির দূরত্ব ঠিক থাকিলে উহাদের তাড়িতের পরিমাণ যত অধিক হইবে বা উহা বা যত অধিক পরিমাণ চৌম্বকধর্মী হইবে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণও তত অধিক হইবে; আব উহাদের তাড়িত-পরিমাণ বা চৌম্বকধর্মের মাত্রা ঠিক রাখিয়া দূরত্ব যত বাড়ান যাইবে, আকর্ষণী অথবা বিকর্ষণী শক্তিও তত কমিবে অর্থাৎ দূরত্ব দুই তিন চাব ইত্যাদি গুণ বাড়িলে উক্ত শক্তি চার নয় বোল ইত্যাদি গুণ কমিবে। এই দুই প্রক্রিয়ায় আবার পার্থক্যও আছে। সকল দ্রব্যকেই উপায়বিশেষে তাড়িতযুক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু কেবল লৌহকে ( আর কোবাল্ট ও নিকেল নামক আর দুইটি ধাতুকে অতি অল্পপরিমাণে ) চুম্বক করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন আর একটি বিষয়েও প্রভেদ আছে, কোনও পদার্থে একপ্রকার তাড়িত ( ধন + বা ঋণ - ) উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু একটি মাত্র মেগনিসিট চুম্বক কখনও পাওয়া যায় না।

২০। চৌম্বক সূচী চুম্বক দণ্ড দ্বারা যেমন বিচলিত হয়, তাড়িত-যুক্ত দণ্ড দ্বারাও সেইরূপ বিচলিত হয়। ঐ সূচীর নিকট তাড়িতযুক্ত দণ্ড আনিয়া মাত্র সূচীটী দণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহার নিকটে আসে

আকর্ষণ সংশ্লেষ

মূল।

}

সুতরাং সূচীটি দ্বারা তাড়িতের সত্তা  
পরীক্ষা করা যায়; এই জন্ত সূচীটিকে  
এক প্রকার তড়িৎপরীক্ষণ বলিলে দোষ

হয় না। চৌম্বক সূচীর নিকট চৌম্বকধর্মহীন লৌহদণ্ড আনিলেও

সূচী আকৃষ্ট হইবে, আবার কোনও চুম্বক দণ্ডের বিষয় যেহেতু, সূচীর এক প্রান্তের নিকট আনিলে সূচীর ঐ মুখটি চুম্বক দণ্ডের উক্ত মেরুর নিকটে আসিবে কেননা পূর্বে বলা হইয়াছে, যে, বিষয় চুম্বক মেরুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ ঘটে। এই তিনটি ব্যাপাবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, চৌম্বক সূচীর কোনও বিশেষ মেরুর (ধরা যাউক যেন উত্তর মেরুর) আকৃষ্ট হইবার কাণ্ড এই তিনটির যে কোনটি;—(১) তাড়িতযুক্ত দণ্ড (২) চৌম্বকধর্মহীন লৌহদণ্ড (৩) চুম্বক দণ্ডের বিষয় মেরু (এ স্থলে দক্ষিণ মেরু); সুতরাং যখন এই আকর্ষণের কারণ তিনটি বস্তুর যে কোনওটি, তখন স্বীকার কবিত্তে হইবে যে, আকর্ষণ বিশেষ সংশয়ের মূল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, যদি কোনও অজ্ঞাত পদার্থ চৌম্বক সূচীর এক-মুখ বা মেরুকে এক্রূপ আকর্ষণ করে, তাহা হইলে ঐ পদার্থটি কি—তাহা ঠিক বলা যাইবে না—উহা পূর্বোক্ত তিনটির একটি হইতে পারে। আবার ঐ পদার্থটিকে সূচীর অগ্র মুখ বা মেরুর নিকট লইয়া গেলে যদি ঐ মুখটিও পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পদার্থটি চুম্বক নয়; কেননা চুম্বক দণ্ড চৌম্বক সূচীর এক মুখকে আকর্ষণ ও অগ্র মুখকে বিকর্ষণ করিবে—উভয় মুখকে কখন আকর্ষণ করিতে পারে না। উভয় মুখের আকর্ষণ তাড়িতযুক্ত দণ্ড বা চৌম্বকধর্মহীন দণ্ড দ্বারাই উৎপাদিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞাত পদার্থের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ বিষয়ে যোব সন্দেহ রহিল। এখন পদার্থটি তাড়িতযুক্ত দণ্ড বা চৌম্বকধর্মহীন দণ্ড ইহা স্থির নির্ণয় কবিত্তে হইলে উহাকে দীপশিখার উপর রাখিতে হইবে—এক্রূপ করিলে বাস্তবিকই যদি উহাতে তাড়িত থাকে, তাহা হইলে উহা তাড়িতহীন হইবে সুতরাং উহা সূচীকে আর আকর্ষণ করিবে না; কিন্তু যদি এখনও আকর্ষণ করে, তবে বুঝিতে হইবে, যে, উহা চৌম্বকধর্মহীন দণ্ড মাত্র। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, দণ্ডটিকে সূচীর দ্বিতীয় মুখের নিকট আনিবা মাত্র ঐ মুখটি যদি দণ্ড হইতে দূরে চলিয়া যাক বা উহা দ্বারা বিকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে দণ্ডটি যে চুম্বক, এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না। অতএব দেখা গেল, যে, “আকর্ষণ সংশয়ের মূল”।

২১। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাড়িত, পরিচালক পদার্থের ভীষণ ভাগ বা সূক্ষ্মতম অংশে অধিক পরিমাণে সম্মিলিত হয়। এই জ্ঞাত পদার্থে

তাড়িত রক্ষা করিতে হইলে উহাতে ধারাল অংশ, কাঁটা বা সূচীব মতন  
বিন্দু বাহাতে না থাকে, তাহা দেখা উচিত। সূচীমুখ শলাক বা কাঁটা,

বিন্দুসম্ভার  
ক্রিয়া।

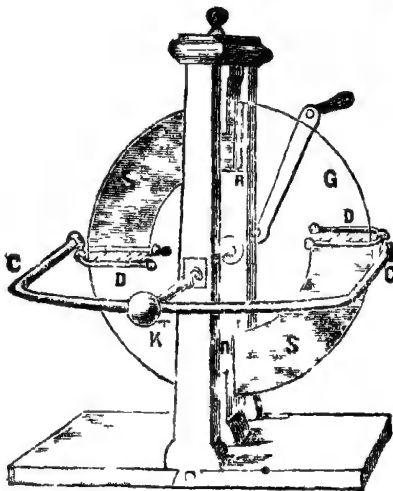
}

কোনও তাড়িতযুক্ত বস্তুলের সহিত  
সংযুক্ত থাকিলে বস্তুলের ঐ অংশে  
তাড়িত সম্মিলিত হয়, এই জ্ঞ

সূচীমুখে তাড়িতেব ঘনসন্নিবেশ হইয়াছে, বলা যায়। সূচীমুখে তাড়িতেব  
“ঘনত্ব” বা “সান্দ্রত্ব” (Density) সন্নিবেশ অধিক বলিয়া নিকটস্থ  
বায়ুকণাসমূহ সূচীসংস্পর্শে তাড়িতযুক্ত হয় এবং উহা বা সূচীব সহিত  
সমানধর্মী তাড়িত লাভ করিতে সূচী দ্বা বা বিকৃত হইয়া দু'ব চলিয়া যায়  
আব এক বায়ুকণাশ্রেণী আসিয়া উহাদেব স্থান অধিকার কবে এবং  
উহাদের গ্রায তাড়িতযুক্ত হইবামাত্র বিকৃত হইবা চলিয়া যায়। এইরূপে এক  
এক বার এক এক দল বায়ুকণা আসিয়া সূচী হইতে কিছু কিছু তাড়িত  
অপহরণ কবিয়া লয়। ফলে লাভ হয় এই, যে, সূচীমুখযুক্ত বস্তুলটি  
তাড়িতহীন হইবা যায়। পদার্থকে তাড়িতহীন করা রূপ ক্রিয়া ভিন্ন  
সূচীর আর একটি অধিকতর প্রয়োজনীয় ক্রিয়া আছে। একটি স্বর্ণপত্র  
তড়িৎদীক্ষণেব শীর্ণস্থিত পিতলের চাকিব সহিত যদি একটি সূচীমুখ তার  
সংযুক্ত কবিয়া দিয়া, যন্ত্রটির নিকট একটি তাড়িতযুক্ত দণ্ড আনা যায়,  
তাহা হইলে দণ্ডেব তাড়িত, যন্ত্রটিতে তাড়িতেব উদ্দীপনা কবিবে—চাকি  
সংলগ্ন তাবটিতে উদ্দীপ্ত বিষম তাড়িত বায়ুবাশিতে পলায়ন কবিবে;  
কিন্তু মুক্ত সম তাড়িত স্বর্ণপত্রদ্বয়ে বা তবক জুথানিতে থাকিবা যাইবে!  
এই ব্যাপারে দেখা যাইতেছে যে, উদ্দীপক পদার্থে যে প্রকারেব তাড়িত  
আছে, তড়িৎদীক্ষণে সেই প্রকারেবই তাড়িত উদ্দীপ্ত হইল। এখন বুঝা  
গেল যে, কোনও তাড়িতযুক্ত পদার্থের সাহায্যে (উদ্দীপনায়) অল্প  
পদার্থে তাড়িত সংগ্রহ কবিতে হইলে শেষোক্ত পদার্থে সূচী বা কাঁটাব  
শ্রেণী সংলগ্ন কবিয়া দিতে হইবে; অবশ্য কাঁটাগুলি প্রথমোক্ত পদার্থের  
সম্মুখীন থাকিবে। ইহাতে এই লাভ হইবে, যে, প্রথম পদার্থ দ্বা বা  
কাঁটাতে যে বিষমধর্মী তাড়িত উদ্দীপ্ত হইবে, তাহা কাঁটা হইতে নির্গত  
হইবা উক্ত পদার্থে পতিত হইবে এবং উহার তাড়িতেব সহিত মিশ্রিত  
হইয়া উহাকে তাড়িতহীন কবিবে; কেননা ঐ পদার্থে যত পরিমাণ তাড়িত  
ছিল, সূচীনিঃসৃত বিষমধর্মী তাড়িতেব পরিমাণ ঠিক তত। [ উদাহরণ

স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম পদার্থে যেন + ১০ পরিমাণ 'ধন' তাড়িত ছিল আর হট্টানিস্থত বিষমধর্মী অর্থাৎ 'ঋণ' তাড়িতের পরিমাণ—১০; উভয়ে মিশিয়া শূন্য (০) হইয়া গেল—অথবা জমা ১০ খবচ ১০ বাকী কিছু বহিল না।] কিন্তু দ্বিতীয় পদার্থে যে সমধর্মী তাড়িত উদ্দীপ্ত হইবে, তাহাব কিছু ক্ষতি হইবে না। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমের সাহায্যে কিরূপে তাড়িত সঞ্চয় বা সংগ্রহ করিয়া লইল। কোনও তাড়িতসংগ্রহ যন্ত্রের যে অংশে তাড়িত সঞ্চিত হয়, তাহাব সহিত একটি সফ তাব অঁটিয়া দিয়া, কোনও অন্ধকাবময় গৃহে তাড়িত-সঞ্চয় পবীক্ষা কবিলে দেখা যায়, যে তাবের মুখ হইতে দীপ্তিমান সুন্দর তাড়িতফুল্লিঙ্গ নির্গত হইতেছে। জাহাজের মান্ডল হইতে সময়ে সময়ে এইরূপ আপনা আপনি তাড়িতালোকক্ষুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। নাবিকেবা ইহাকে St. Elmo's Fire বলে। ইহার কারণ এই যে, জাহাজের উপরে বায়ুবাশিতে যে তাড়িত থাকে, তাহাব উদ্দীপনায় মান্ডলে বিকল্পধর্মী তাড়িত জন্মে; এই তাড়িত মান্ডলের স্তম্ভ অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া নীলাভ ফুল্লিঙ্গাকাবে বিদ্যোতমান হয়।

২২। অধিক পরিমাণে তাড়িত সংগ্রহ করিতে হইলে নিম্নলিখিত যন্ত্র প্রস্তুত কবিতো হইবে। একখানি কাঠের তক্তায় আবদ্ধ লম্বভাবে হিত দুইখানি কার্ঠগণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে এক খানি পুক কাচের থালাকে (G) এমন ভাবে



আশ্রিত কবিতো হইবে যে, কাচ থানির কেন্দ্র (মধ্যবিন্দু) ও কার্ঠগণ্ডের মধ্যবিন্দুতেদকাবী একটি দণ্ডের চতুঃপার্শ্বে থালাখানিকে ঘুরাইতে পারা য়। কার্ঠগণ্ডের উপর ও নীচ উভয় প্রান্তেই দুই দুই গানি চাষড়া (R R) সংলগ্ন করিতে হইবে—যাহারা ঘূর্ণিত কাচের উভয় পৃষ্ঠের সহিত সম্পূর্ণ রূপে ঘর্ষণ করিতে পাবে। কাচের থালার ঘর্ষণ

দ্বারা যে তড়িত জন্মে, তাহাই যন্ত্রটির তড়িতোৎপত্তির কারণ বলিয়া কাচের থালাকে যন্ত্রেব “উৎপাদক” (Generator) অঙ্গ বলা গেল। তিন অংশে বক্রীকৃত একটি সুদীর্ঘ পিত্তল দণ্ডের (DCKCD) মধ্য অংশে একটি পিত্তলের

গোলা (বর্জুল বা ভাঁটা) (K) এবং  
 রাসমুন্ডেনের তড়িতসংগ্রহ }  
 প্রত্যেক বাহু বা প্রান্তে (C C) দুই  
 বস্ত্র। ইহার বর্ণনা। }  
 সাব ধাতুনির্মিত কাঁটা, দাঁত বা চিরুণিব

দাড়ি (D) আবদ্ধ করিয়া ঐ দণ্ডকে যন্ত্রের অক্ষ (Axis) বা ঘূর্ণনদণ্ডের সহিত এইরূপে সংলগ্ন করিতে হইবে, যে, উভয় প্রান্তেবই কাঁটাব সার দুইটি, কাচ পানির কোনও পৃষ্ঠ স্পর্শ না করিয়া, উহার অতি নিকটে অসংলগ্ন বা আলগা ভাবে থাকিতে পাবে। বক্রীকৃত ধাতুদণ্ডে তড়িত স্রবন্ধিত করিবার জন্য উহাকে কাচের পায়ার উপর আশ্রয় করিতে হইবে অথবা (যেমন এই চিত্রে আছে) উহার সহিত সংলগ্ন, যন্ত্রেব অক্ষ বা ঘূর্ণনদণ্ডকে কাচনির্মিত করিলেই চলিবে। ধাতুদণ্ডেব গোলাটিতেই তড়িত সংগৃহীত হয় বলিয়া ইহাকে যন্ত্রেব “সংগ্রাহক” (Collector) অঙ্গ বলা গেল। কাচের থালায় ঘর্ষণ দ্বারা অধিক পরিমাণ তড়িত উপাদান করিবার জন্য, উপরেব ও নীচের এক এক ঘোড়া চামড়ার সহিত এক একখানি বেশমী কাপড় (S S) আঁটা থাকে।

২২ক। একটা হাতল দিয়া যন্ত্রকে ঘুবাইলে কাচের সহিত চর্ম ও রেশমের ঘর্ষণে কাচে “ধন” (+) ও চর্মে “ঋণ” (—) তড়িতের সঞ্চাব হয়। চামড়া ছুখানিব সহিত দুইটা পিত্তলের সুরু শিকলি আঁটিয়া দিলে ঐ শিকলি দিয়া ঋণ (—) তড়িত পৃথিবীতে চলিয়া যাইবে। ধনতড়িত-

তড়িতসংগ্রহ যন্ত্রের }  
 কার্য প্রণালী। }  
 যুক্ত কাচের প্রভাবে বক্র ধাতুদণ্ডের  
 নিকটবর্তী প্রান্ত অর্থাৎ কাঁটার শ্রেণীতে  
 (DD) ঋণ তড়িত (—) ও দূরবর্তী

প্রান্ত অর্থাৎ পিত্তলের গোলাতে (K) ধন তড়িত (+) জন্মে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ধাতু পদার্থের বিন্দুময় সূক্ষ্মতম স্থান হইতে তড়িত নির্গত হইয়া যায়; এই জন্য কাঁটাগুলির সন্নিহিত বায়ুস্তর উহাদের ঋণ তড়িত অপহরণ করিয়া কাচের থালার উপর পতিত হয়। কাচের ধন তড়িত ঐ সমান পরিমাণ ঋণ তড়িতের সহিত মিশিয়া যাওয়ার কাচখানি তড়িতহীন হয়; সুতরাং ঘর্ষণদ্বারা উদ্ভূত পুনরায় ধন তড়িত উদ্ভূত হইবে। আর প্রত্যেক

স্বর্ণেই উন্নীপ্ত ধন তাড়িত ধাতুময় গোলাতে (K) সঞ্চিত হইবে। এইরূপে যন্ত্রটিকে যতবার ঘূরান যাইবে, গোলাটিতে তত অধিক ধন তাড়িত জমিবে। ইহাতে বুঝা গেল যে, এই যন্ত্রে কেবল ধন তাড়িতই সংগৃহীত হয়। ইহা হইতে ঋণ তাড়িত সংগ্রহ করিতে হইলে, যন্ত্রকে কাচের পায়খুন্ড একখানি কাঠের টুলের উপর স্থাপন করিয়া গোলকটিতে পিতলের সন্ম শিকলি দিয়া পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। ইহাতে ধন তাড়িত গোলা হইতে পৃথিবীতে পালাইবে, আব ঋণতাড়িত চামড়া ছুথানিতে শাকিয়া যাইবে।

## প্রভুভক্ত কুকুর।

(শ্রীরাখালকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, প্রোফেসর,  
জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা)

সবকালি নিয়ম অনুসারে বৎসবে একমাস “শ্রিভিলেজ লিভ” পাইতে আমার অধিকার আছে। চাহিলে যে ছুটিটা প্রান্ত বৎসবে না পাওবা যাইত, তাহা নহে। অনেক পাওনা ছুটি লইতে ত্রুটি করিতেন না। আমি কিন্তু পনব বৎসবেব মধ্যে একদিনও ছুটি লই নাই। ঈশ্বরকৃপায় শরীরটা আমার ভালই ছিল। বাড়ীতে যাইবার কোন বিশেষ আবশ্যকতাও ছিল না। দেশে যাইব যাহাদেব জ্ঞ, তাহারা আমার সঙ্গেই এবাবর কলিকাতাবাসী। অত্যাগ্র লোকে আমাকে ঠাট্টা করিত। আমি ঠিক জানিতাম, ছুটিতে বাড়ীতে বসিবা থাকিলে শরীর ধারাপ হয়। আর যাহারা সহবে অনেকদিন বাস কবে, তাহাবা পন্নীগ্রামে যাইবা থাকিতে পাবে না। কেবল যে খাবাব সময় কলেব জলের অভাব বোধ হয়, তাহা নহে, তই স্থানের সামাজিক আব হাওয়া ভিন্ন প্রকাবের। আমাদেব গ্রামে আপিসে কাজ কবে, এমন লোক আর ছিল না। অবশ্য ভদ্র লোকের কোন অভাবই ছিল না। কিন্তু তাহাদের আনন্দ প্রমোদ, মনের সহানুভূতি, চিন্তার গতি ভিন্ন দিকে; আমাদেব জায় চাকুরে লোকের মত নহে। তাহার উপবে আমাদের পরিবাব ও সন্তান সন্ততি বিদেশে



সহরের মধ্যে যে ভাবে গঠিত হয়, তাহাদের সেভাবে হয় না। স্তরসং  
 সাজী বাইয়া গ্রামের লোকদের সঙ্গে আমি সপরিবারে কেমন খাপ খাইয়া  
 উঠিতাম না। বোধ হয়, অধিকাংশ গ্রাম্য চাকুবে সহরবাসী হইয়া এই  
 ক্ষেত্রে আপনার স্বজনের সহায়ত্ব হইতে বঞ্চিত হন। পূর্বে পূর্বে পুজার  
 ছুটিতে বাড়ী যাইতাম। ক্রমে দেখিলাম, গ্রাম্য লোকদের সহায়ত্ব  
 প্রতি বৎসর আমাদের উপরে অল্প হইয়া পড়িতেছে। আপনার লোককে  
 সহায়ত্ব-বিহীন সমালোচক দেখিলে প্রাণে বড় আঘাত লাগে। দুই  
 একদিন তাহারা আমাদের নিকটে আসিত, সহরের সংবাদ সংগ্রহ করিবার  
 জন্য। সেগুলি উদবস্থ করিয়াই তাহারা আমাদেরই প্রত্যেক বিষয়  
 সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিত। আমি চিবকাল এই সমালোচনার  
 ভয় করিয়া আসিতেছি।

এই হইল দেশে যাওয়ার আপত্তি। কিন্তু ছুটি লওয়াতেই আমার  
 কিছু আপত্তি ছিল। পুজার বারদিনে অনিয়ম ঘটিয়া ক্ষুধামান্য হয়।  
 আর একমাস বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে কি করিয়া দিন কাটাইব, ইহাও  
 আমার চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু এবার ছুটি লওয়া নিতান্ত আব-  
 শ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কল্লার বিবাহ দিতে দেশে যাইতে হইবে। আমাকে  
 কিছু বেশী দিনেব জন্ম ছুটি লইতে হইবে শুনিয়া সাহেব মুচকি হাসি-  
 লেন কিন্তু ছুটি মঞ্জুর করিয়া উপবণ্ডালাব নিকট আমার আবেদন-পত্র  
 পাঠাইলেন। যথাসময়ে ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল। আমিও সপরিবারে  
 দেশে বড়না হইলাম।

কলিকাতায় যে আমার কল্যাকে বিবাহ করিতে পাবে এমন উপযুক্ত  
 পাত্রের অভাব, তাহা নহে। কিন্তু সহরে বিবাহের বাজাবে জামাতা কিনিতে  
 হয় অত্যন্ত অধিক দাম দিয়া। আমার মত গরীব কেবাগীর এতাদৃশ  
 মহামূল্য জামাতা-রত্ন কিনিবার কোন উপায় নাই। কোন আত্মীয় লোকের  
 সাহায্যে গ্রামের নিকটে উপযুক্ত পাত্র একরূপ স্থির করিবাছিলাম।  
 দেখাভনা বাড়ী বাইয়া কবির মনস্থ ছিল। বাড়ী বাইয়া দেখিলাম,  
 পাত্র স্থির করা যত সহজ কার্য মনে করিবাছিলাম, তত সহজ  
 কার্য নহে। তিন মাস ছুটির মধ্যে যে কল্লার বিবাহ দিয়া যাইতে  
 পারিব, তাহা ত বোধ হয় না। তবে আত্মীয় সম্পর্কের কয়েকজন বহু-  
 দর্শী গ্রামস্থ ব্যক্তি একাধারে আমার সাহায্য করিতে ব্রতী হইলেন। সহ-

রের নকলে পাড়াগাঁয়েও বিবাহের বাজাবে জামাতার বেশ নয় চড়ি-  
য়াছে তবে ঠিক সহরের মত অত্যন্ত অধিক নহে। কিন্তু সহরে পুষ্টি  
সার কথা ছাড়িয়া দিলে মনের মত পাত্র পাওয়া যায়, অনেক গ্রামে  
উপযুক্ত পাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। উপযুক্ততা হিসাবে দর নিতান্ত কম  
নয়। যাহা হউক, কন্যা বিবাহ বা পাত্র নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলিয়া  
আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে কথা ছাড়িয়া দিলাম। যে ঘটনা  
বিশেষ ভাবে উল্লেখ করাব ইচ্ছা, তাহা বলিতেছি।

গ্রামে আসিয়া প্রথম কয়েকদিন বড় ভাল লাগিল না। আহাৰ নিম্ন-  
মিত সময়ে হয় না। দ্বিপ্রহবে নিদ্রা দিয়া ও হাই তুলিয়া ও বিছানার  
গড়াগড়ি দিয়া সমস্ত সময় কাটাইতে পারি না। গ্রামের সকল লোকেই  
আমাব হিসাবে নিরুপদ্রব। কাবণ, কাহাকেও আপিস যাইতে হয় না।  
স্বচ্ছন্দভাবে আহাব বিহার করে। সময়েব উপবে কাহারও দৃকপাত নাই।  
কাহাবও কাহাবও বাড়ীতে ঘড়ি আছে বটে কিন্তু প্রযোজন্যভাবে তাহার  
সকলেই প্রায় বিকলাবস্থায় পতিত। তাহাব উপরে ঘড়ি চালাইব, কোন  
আদর্শ দেখিয়া? কলিকাতাব মত সকল স্থানে বেলা একটার সময় তোপ  
পড়ে না। ক্রমে বুঝিলাম, সচবে হওয়াব ভিতবে তোপধ্বনিও একটা  
উপাদান। কেমন সংস্কার বশেই যেন একটার সময় উৎসুকনেত্রে আপ-  
নার ঘড়ির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতাম। পদক্ষেপে বুঝিতাম, এ সে  
আপিসের কর্তব্যাবী পরিপূর্ণ সাহেব-বিবাজিত কর্তব্য নহে যে, ঘড়িটা এক  
সেকেণ্ড তফাৎ হইলে মহাপ্রমাদ ঘটিতে পারে।

হায় যে ঘড়ি, তোমাব আদর কি কেবল সহবেই? সহবে তোমার  
ক্লপাদৃষ্টি লাভেব দ্রুত সাহেব হইতে দপ্তরি চাকর পর্যন্ত লালায়িত। আত্ম  
এখানে সমস্ত দিনে কেহ তোমাব বদনমণ্ডলের দিকে ফিবিয়াও দেখিতে  
চাহে না! মনের হৃৎথে তুমি আপনার ভিতরে কত বিভ্রাট বাধাইতেছ, কিন্তু  
হে ভববদনে! হে জেনিভানন্দিনি! এখানে তোমার মূহু বা দ্রুত গতির  
উপর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কখনই নির্ভর করে না, ইহা দ্রুত নিশ্চিত জানিবে।  
কেরাণীজীবনের বিধাত্রী তুমিই। তোমাব হুকুম না পাইলে কার্য শেষ করিয়া  
রাখিয়াও বাড়ী আসিতে পাই না। আর তোমার হুকুম পাইব এখন  
আশা হয়, তখন কত উৎসাহে কত নব উদ্যমে কত জ্ঞানর তাড়নার  
সহিত চেয়ারের কাঠের হাতখানা হইতে বাঁধা উড়ানী খুলিয়া সইয়া

কেহ মস্তকে শিবস্তম্ভ স্বরূপ বাঁধে কেহ ছুই কাঁধে বুলাইয়া দেয় ! দেবি ! তোমারই হৃক্বে অর্ধসিদ্ধ অন্নবান্ধনে উদব অর্ধপূর্ণ কবিতা অবিংগতি আফিস অভিযুগে ধানমান হইয়া জীবন সার্থক কবি। হে মণ্ডলাকাবে, শীতপ্রধান দেশে তোমাব জন্ম। তোমাব অঙ্গ ও স্তনাতল, কিন্তু তোমার অঙ্গুলিপ্রদর্শনের সহিত সাহেব-কুলের মস্তিষ্কের উন্নতা বৃদ্ধি হয় কেন ? তোমাব অঙ্গুলি দশটাব ঘর ধরিলেই দরওয়ানজীকে হাজিবা বহিখানা কেন সাহেবের টেবিলের উপরে বাখিয়া আসিতে হয় ? কিন্তু তুমি ভক্তবৎসলা। আমি চিরকাল তোমাব উপাসনা কবিতা আসিতেছি। প্রণাম্যমি ! আশীর্বাদ কর দেবি ! যেন কোন দিন দশটাব পাব সাহেবের টেবিল হইতে হাজিবা বই লইয়া সেই কবিতাে যাইতে না হয়। সাহেবপুস্তকের তৎকালীন বিলোল কটাক্ষ যেন আমার উপবে কখন নিপতিত না হয়। এ অসত্য পল্লীগ্রামে তোমার লাঞ্ছনা ও অবহেলা দেখিয়া আমি মস্তে মস্তে গীড়িত হইয়া আছি জানিবে। প্রসন্ন হও, চিরকাল প্রসন্ন থাকিও। আনাব পকেটে থাকিয়া কখনও বিশ্বাসঘাতকের কাজ কবিতা মৃদুগতি হইও না। ভক্তবৎসলে ! আমি তোমার জন্ত সুবর্ণ-শৃঙ্খল গড়াইতে দিব, কণ্ঠ্য বিবাহটা একবার কোনগতিকে হইয়া যাউক, সুবর্ণ-শৃঙ্খলের সহিত তোমাব যোগ না হইলে লাম্বাদব বাঙ্গালির উদবেব শোভা বৃদ্ধি হইত কি কবিতা ? সময় থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে আব কণ্ঠ্যবিবাহের দায় স্বন্ধের উপবে না থাকিলে ঘড়ির বিষয়ে আবও কত অতি প্রযোজনীয় অথচ দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা দেশের ও মানবজাতির কতপ্রকার উপকার না সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আন এখন এসকল গবেষণার সময় কোথায় ? অহো ! কণ্ঠ্য বিবাহ দেওয়া কি ঘোব দাদ। কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝিয়াছি, এই ঘোব দায়েব জন্ত দেশের অনেক উন্নতি আটকাইয়া বহিয়াছে। হয় কণ্ঠ্য বিবাহ দেওয়া প্রথা উঠিয়া যাউক আর না হয় বিবাহের বাজারে জামাতাবাজীদিগেব দর কমুক। তাহা না হইলে নিশ্চয় নিশ্চয় জানিবে, বহুমুত্র বোগে দেশ ছাবখার হইবে।

উদ্বেগ বিষয় বর্ণনা কবিতাে কিছু বিলম্ব হইল ; কিন্তু স্বচক্ষে ঘড়ির অবমাননা দেখিয়া একেবারে নির্ভীক হইয়া থাকিও ত ঘাঘ না।

ধাক্ ও সকল কথা। ছুটিবা প্রথম কয়েক দিন কিছু অসুবিধা

বোধ করিলাম। বোধ হয় মাছগুলোকে ডাঙ্গার তুলিলে এইরূপই বোধ হবে। তার পরে ৭-টার পরে বেলায় খাওয়া, দ্বিপ্রহরে দীর্ঘনিদ্রা ও জ্বুণ, পাশ-পশিনকরন প্রভৃতি বিষয়ে কন্ঠিততা বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তবুও বেলা তিনটার পূর্বে শয্যা ত্যাগ কবিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। সে সময়ে সাথের সাথী, প্রাণের আরামদাতা হক্কা ভিন্ন আর কাহাবও সঙ্গ লাভ করিতে পারিতাম না। অন্ততঃ ছইজন খেলার সঙ্গী পাইলে তাহা খেলিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু বেশ্য তিনটা পল্লীগামের দ্বিপ্রহর, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। বহুদীর্ঘমানের এ সময়ে নিদ্রার প্রথম সংস্করণই শেষ হয় না। তাঁহাবা খেলিবার জন্ত সমাগত হইবেন কি কবিয়া? সাধারণ ভাবে বলিতে হইলে বলা উচিত, দ্বিপ্রহরের সময় নিজা না যাঁইয়া তাহা পেটা সহরে ফ্যাসান। গ্রামে রাত্রিকালে খেলার জন্ত দণ্ডনহস্তে দূর দূরান্ত হইতে লোকে সমাগত হয়। সুতরাং গ্রামে খেলার স্পৃহা বা উদ্যমের অভাব স্বীকার কবি না, তবে দেশভেদে আচরণভেদ হওয়া সম্ভব। চারিটার সময় পাশাখেলা কোন কোন স্থলে প্রচল আছে এবং রবিবারে বা অল্প কোন ছুটিব দিনে তৃতীয় প্রহরে কোন কোন বড় লোকের বৈঠকখানায় তাহাও চলে বটে কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে স্থি কবিয়াছি, এ সকল সংস্কার সহবপ্রবাসীরা নূতন দেশে কবিয়া আসিলে তাহাদের মধ্যেই দেখা যায়। ইহা সহবেব অমুকরণ মাত্র। আমি যে সময়ে বাড়ী আসিয়াছি, সে সময়ে কোন বড় ছুটি উপলক্ষে প্রবাসীদের গ্রামে ফিরিয়া আসিবার সময় নহে। গ্রামে প্রতি দিন রবিবার সুতরাং এদিক ওদিক ঘুবিয়া সদর দরজায় বসিয়া সর্পগতিব মত ঘুবিয়া ফিরিয়া গ্রাম্য গলিগুলি অপ্রশস্তভাবে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেমন গিয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত দেখা ও মধ্যে মধ্যে তামাকু সেবন ভিন্ন তৃতীয় প্রহর কাটাইবার অল্প কোন সহুপায় আবিষ্কার করিতে পাবি নাই। কোন কোন দিন মাছ ধরিলার অছিলা করিয়া কয়েক জন যুবককে আমার সঙ্গী করিয়া লইতাম। ক্রমে একরূপ জীবনও বেশ ভাল লাগিয়া আসিতেছিল।

অলস জীবনের এক রূপ মাদক শক্তি আছে বোধ হয়। একবার অভ্যাস হইলে উহার প্রভাব দূর করা নিভান্ত সহজ ব্যাপার

নহে। সহরে যেমন রৌদ্রের দোদীপ্ত প্রতাপ, গ্রামে সেদৃশ্য নহে। বেলা তিনটার পর সদর দরজায় একখানি টুল পাতিয়া বসিয়া থাক। কষ্টকর ব্যাপার নহে। ছেলের দল পথে কড়ি লইয়া খেলা করিতেছে। আমি টুলে বসিয়া ধূম পান করিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদের খেলার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিতেছি। সম্মুখ দিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিতে করিতে নাল ও সাদা ছাপযুক্ত একটা কুকুর আমাদিগের হইতে কিছু দূর দিয়া চলিয়া যাইল। আজ প্রথম নয়। কয়েকদিন যাবৎ দেখিতেছি, এই কুকুরটা এই সময়ে এই স্থান দিয়া একই দিক্ হইতে আসে ও একই দিকে চলিয়া যায়। তাহার গলায় একখানা কাপড় জড়াইয়া বাধা। প্রথম দিন সে আমাকে দেখিয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাব পবে যখন বুঝিল যে, এই মানবজাতীর জীব কেবল আপনার মুখ হইতে প্রভূত ধূমোৎপাদেই ব্যস্ত, লুকাইয়া টিল তুলিতেছে না, তখন কুকুরপ্রাণে সাহসের সঞ্চার হইল এবং সম্মুখ দিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া চলিয়া যাইল। তাহাতে এমন কিছুই ছিলনা যে, মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। গ্রামেও সহরের প্রত্যেক স্থানেই এমন দেশী কুকুর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক দিন দেখিয়া দেখিয়া সে আমার মনের ভাব বুঝিল এবং প্রত্যহ অসঙ্কোচে সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত। কুকুর পুষিবাব বাতিল আমার কখন ছিল না বরং উহাদিগকে কিছু ভয়ের চক্ষুতে দেখিতাম। কিন্তু প্রত্যহ এক সময়ে একদিক হইতে আসিতে ও এক দিকে যাইতে দেখিয়া আমার কোতূহল উদীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। ভাবিলাম, বালকেরা উহার ইতিহাস অবগতই সবিশেষ অবগত আছে। এমন একটা আলোচ্য বিষয় উপেক্ষা করা নীতিবিগর্হিত মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওটা কাদের কুকুর হে? রোজ এই সময়ে কোথায় যায় আর কোথা হতেই বা আসে? জিজ্ঞাসাটা অবশ্য বিশেষ কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া নহে। সকলেই অপেক্ষা দীর্ঘকায় হালক বুদ্ধিমানের মত উত্তর করিল, “রাস্তার কুকুর। কেউ আবার ওগুলোকে পোষে নাকি?” সেদিন এই পর্য্যন্ত হইয়া ক্ষান্ত।

কত ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে কত বৃহৎ ঘটনার সূত্রপাত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? সেদিন সেই দীর্ঘকায় বালকটির মাথায় উঠিল, “এই

কুকুরটা রোজ এই পথ দিয়ে যাবে কেন? তাব এত বড় আশ্পর্ক।” তাহাই বা কে বলিতে পারিত? বালক কাহাকেও কিছু বলে নাই কিন্তু পরদিন বালকের দল সেই স্থানে থেলিতেছিল। বোধ হয় তাহার কুকুরের আশ্পর্ক দমন করিবার জন্ত সে দিন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা না হইলে প্রত্যেকে এক গাছা লাঠি আনিবে কেন? পবদিন ষাণ্মাস্যে কুকুর মহাশয় নিঃসন্দেহচিত্তে আপনার গন্তব্য পথে দেখা দিবামাত্র বালকের দল খেলা ফেলিয়া লাঠি হাতে তাহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। হঠাৎ পূর্বপরিচিত বন্ধুদল যে তাহার স্নান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয় কুকুরবৃত্তিতে একথাটা শীঘ্র বৃত্তিতে পারিল না। হুই এক বা পৃষ্ঠদেশে পড়িলে তবে বুকিল। তখন বিকট চীৎকারে আপনাব মনোবেদনা বা বালকদের দৃষ্টতা সকলকে জানাইতে লাগিল। তখনও বৌদ্ধের উত্তাপ ষথেষ্ট রহিয়াছে বলিয়া বিছানায় শুইয়া আমি নভেল পড়িতেছিলাম। হঠাৎ কুকুরের ডাকে ঔপন্যাসিক রাজহ ছাড়িয়া পৃথিবীতে নামিলাম। তাহার পরে আবও একবার ডাক শুনিয়া সমস্ত কথা বুঝিলাম। এ আর কোন কুকুর নহে। সেই লালসাদা দাগ যুক্ত কুকুরটা। বালকের দল তাহাকে কোন কাণে তাড়না করিতেছে। তৎক্ষণাৎ কটিবন্ধে কাপড় আঁটিতে আঁটিতে বাহিবে আসিয়া দেখিলাম, ব্যাপার কি হইয়াছে। তখন কুকুরকে উদ্ধাব করাই আমার প্রথম কার্য হইল। চারি দিক হইতে তাড়না এককালে কমিলামাত্র কুকুর মহাশয় আপনার গন্তব্য পথে দৌড়াইয়া পলাইল। তখন তাবিলাম, বালক দলের মনোযোগ পূর্ব দিনে তাহার প্রতি আকর্ষণ করিয়া ভাল কায কবি নাই। আজ ব্যর্থমনোরথ হইল বটে কিন্তু পুনরায় উহার দর্শন পাইলে আর উহার নিকৃতি নাই। এখন কুকুরটাকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রত্যহ আমাকে সচেতন থাকিতে হইবে।

একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইলাম। আমি যখন বালকদলের মধ্যে প্রবেশ কবি, তখন কুকুরটা আমার দিকে সক্রমণে নেত্র চাহিয়াছিল। সে আমাকে দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, এবারই শত্রুদলকে দমন করিতে সমর্থ হইবে অথবা আমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল। সে যে কি ভাবিয়া চাহিয়াছিল, তাহা আমি ঠিক বুঝি না। কিন্তু তাহার দৃষ্টিপাণ্ড আমায় কক্ষণ উদ্বেক করিয়াছিল।

আমি এখন একটা কাষ পাইয়াছি। কুকুদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দরজায় বসিয়া থাকি। পর দিন তাহাকে কিছু খাইতে দিলাম। সে অতি ব্যগ্রভাবে খাইতেছিল কিন্তু জনৈক বালককে আসিতে দেখিয়া কিছু সম্বৃত্তি হইল। আমি তাহাকে অভয় দিলে সে পুনর্বার আহাব শেষ করিয়া চলিয়া হইল। বালকের দল আসিল কিন্তু আব আক্রমণেব কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। ববং সকৌতুহলে তাহার আহাবেব ব্যগ্রতা দেখিয়া অনেক দিন খাইতে পায় নাই বলিতে লাগিল। বাস্তবিকই তখন আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কেবল আহাবেব আগ্রহ নহে, আকাব দেখিয়াও সন্দেহ হয়, সে যেখানেই থাকুক না কেন, ভাল করিয়া খাইতে পায় না। আমার প্রাত্যহিক আহাবেব পব যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত বাখিয়া দিতাম, কুকুটাকে খাইতে দিব বলিয়া। দেখাদেখি বালকের দলও তাহাই করিতে লাগিল। বালক-সভাবই এই, যাহা লেখে তাহাই শিখে। কুকুবিড়াল দেখিলে যে মাঝিতে যায়, সেটা বোধ হয় চপলতা বশতঃ কোন কু-অভিপ্রায়ে নাহ। বালকেবা অল্পে ছাড়িবে কেন ? তাহাবা কুকুকে ভাল করিয়া অতিথি সংকার না করিয়া ছাড়িবে না। তাহাবা কাকের ছানা, ইন্দুব প্রভৃতি মারিয়া আনিতে লাগিল, তাহাব রসনাব তৃপ্তির ঐশ্বর্য। কেবল পাতেব ভাত, মাছেব কাঁটা নিষ্পত্তি কুকুৰ মহাশয়কে ঝাণ্ডাইয়া মনে শাস্তি লাভ করিতে পাবিল না। সুতরাং লালসাদা কুকুরেব এপথে যাওয়া বড় সুখের বিষয় হইল।

বালকেবা তাহাব নামকরণ করিল,—“লালসাদা।” তাহাকে আব কেহ মাঝিবার চেষ্টা ভুলিয়াও কবে না। তাহাব সহিত কত আত্মীয়তা কবে, তাহাকে আপনাপন বাড়িতে আটকাইয়া প্রতিদিন পরিচর্যা করিতে চাহে। লালসাদা কিন্তু কোথাও আটকাইয়া থাকিতে চায় না। সে প্রত্যহ একই সময়ে একই পথে চলিতে চাহে। যাইবার সময় বাজীবাজী নিমন্ত্রণ খাইয়া যাইতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু কাহাবও কাছে বাঁধা থাকিতে তাহার ঘোর আপত্তি আছে। যাহা হউক, বালকের দলে তাহার ইচ্ছা বুঝিয়া চলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তাহার বড়ই মনস্কুল হইয়াছে যে, একদিন একরাত্রি তিনি কাহাবও বাড়িতে বাস করিতে চাহেন না। এটা যে কুকুরসভাবেব কোন গুণের পরিচায়ক, তাহার বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আবও একটা বিষয়ে আশা-

দেব সন্দেহ আছে। তাহার গলার চারিদিকে এক থানা কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া বাঁধা থাকে। প্রথমে জাবিতাম, উহা বুঝি সহরের বগলস বাঁধার অনুরূপ, যাহাই হউক, উহাতে বুঝায় যে, কুকুরটা প্রভুহীন নহে। কিন্তু তাহার প্রভু কে? আর সে ব্যক্তি কুকুর পুথিয়া তাহাকে খাইতে দেয় না কেন? আমরা খাওয়াইবার ব্যবস্থা না করিলে অনাহারে মারা পড়িত। অথচ কুকুর কাহারও বাড়িতে অনেক আশ্রয় পাইয়াও থাকিতে চাহেনা কেন? এই সকল আমার এখন নূতন চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাব অনুগমন করিয়া দেখিয়াছে, সে কাপড়খণ্ডে কি বাঁধা পুঁটলি মত মুখে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া মাঠের উপর দিয়া কোথায় ঘাষ। ব্যাপাবটা বেশ বহুশ্রম হইয়া উঠিয়াছে।

একদিন হঠাৎ সকল রহস্তেব ব্যাখ্যা হইল। ঐ দিন প্রাতে নিদ্রাভঞ্জে পবই লালসাদাব পরিচিত স্বর শুনিলাম। অথবা তাহার স্বরেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঐরকাল—জানলা খোলা ছিল। জানালাব নীচে সে ডাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, ঘেন বড় ব্যস্ত। কুকুরটা ত এত সকালে কোন দিন আসে না। আজ ব্যাপাব কি? তাড়াতাড়ি বাহির হইবামাত্র সে আমাব কাপড় ধরিয়া টানিল এবং দৌড়িয়া একদিকে চলিল। আবাব আমি অগ্রসর হইসাম না দেখিয়া ফেরি ফিরিয়া আসিয়া আমাব কাপড় মুখে ধরিয়া টানিল। বেশ বুঝিলাম, কোন কারণে সে আমাকে একটা বিশেষ দিকে লইয়া যাইতে চাহে। কি আশ্চর্য! কুকুরেও ত মানুষেব মত অভিপ্রায় জানাইতে চাহে! কোতূহলী হইয়া তাহাব পশ্চাৎ চলিলাম। গ্রাম পাব হইয়া মাঠপার হইয়া একদিকে চলিলাম। সে দিকে কোন গ্রাম নাই, লোকালয় নাই। অনেক দূর যাইয়া দেখিলাম, কতকগুলি গাছের ঝোপের ভিতবে একখানি কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরে এক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শয়ান। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। পাশে আরও দুইখানি কুঁড়ে ঘর আছে। চাষারা বাস করে ঐ স্থানে।

একজন অপরিচিত লোককে সে স্থানে দেখিয়া প্রতিবেশীরা আসিল। তাহাদিগের নিকট শুনিলাম, ঐ বৃদ্ধা চাষার ঐ পালিত কুকুর ভিন্ন আর কেহ নাই। এক সময়ে তাহার আত্মীয় স্বজন ছিল। অবস্থাও কিছু ভাল ছিল। ম্যালেরিয়া জ্বরে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা তাহাকে পৃথিবীতে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুকুর তাহাকে ছাড়িতে পারে



নাই। রুদ্ধ কিছুকাল হইতে চলৎশক্তিবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরে  
 বাইতে পারিত না। কুকুব তাহাব খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিত। রুদ্ধ  
 কাহাবও দান নহইতে চাহিত না। আপনি কৃষিকার্য্য কবিত্তেও পাবিত না।  
 বোধ হয় পূর্বসংকীর্ণ কিছু ছিল। আয়ুষ্কাল দুবাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সেই  
 সঙ্কীর্ণ অর্থেই চালাইত। কাহাবও নিকট ভিক্ষা কবিত না। প্রতিবেশীদেরও  
 সাহায্য চাহিত না। কুকুবের গলায় কাপড় বাঁধা ছিল। সে দোকান হইতে  
 খাদ্য আনিয়া দিত। হাটের দিনে কিছু চাল ডাল আনিয়া দিত। অগ্ৰাণ্ণ দিন  
 আপনাব খাদ্য সংগ্রহেব জগ্গ বাহিন হইত। না বাইতে পাই।।ও এই চতু-  
 স্পদ জন্তুটা এইরূপে প্রভুভক্তি দেখাইয়াছে। রুদ্ধেব মৃত্যুব পবে কুকুবটা  
 আমার নিকটে আসিয়া বাস কবিত্তেছে। প্রতিবাসীদের কাহাবও নিকটে  
 সে থাকিতে চাহিল না। সে এখন আমার পবিবাবস্থ একব্যক্তি। বাল-  
 কেবা তাহাকে কি কবিয়া সন্তুষ্ট বাখিবে, খুঁজিবা পায় না। স্বয়ং  
 গৃহিণী তাহাকে পরিতৃপ্ত কবিয়া ভোজন কবান। বাস্তবিকই আমরা তাহাকে  
 মানুষের মত আত্মীয় বোধ কবি।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

শ্রীম—কথিত ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্ববে ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও ভক্তিয়োগ )

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘবেব মধ্যে ছোট খাটগীতে বসিয়া আছেন। সমা-  
 ধিত। ভক্তেবা নেপ্তেতে বসিয়া আছেন,—একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতে—

\* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—লিখিত প্রথম ভাগ দ্বিতীয়  
 সংস্করণ মূল্য এক টাকা। কাপড়ে বাঁধাই পাঁচ সিকা। ৫৭নং  
 রামকান্ত বস্তুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তি-  
 রাম ঘোষেব নিকট অথবা ১৩১২ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেনে  
 শ্রীপ্রভাসচন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তবা ।

ছেন। মহিমাচরণ, রাম (দত্ত), মনমোহন, নবাই চৈতন্ত, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকে বসিয়া আছেন।

আজ দোলষাত্রা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জন্মদিন, ১২শে ফাল্গুন, পূর্ণিমা তিথি, রবিবার ১লা মার্চ, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তেরা একদৃষ্টে দেখিতেছেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। এখন ভাবের পূর্ণযাত্রা। শাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন,—

‘বাবু হবিভক্তির কথা—

মহিমাচরণ। আবাসিতো যদি হরিতপসা ততং কিং।

নাবাসিতো যদি হবিতপসা ততং কিং॥

অন্তর্বর্হিদি হরিতপসা ততং কিং।

নান্তর্বর্হিদি হবিতপসা ততং কিং॥-

বিরম বিবম ব্রহ্ম কিং তপস্তানু বৎস।

ব্রহ্ম ব্রহ্ম দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্কবৎ জ্ঞানসিদ্ধং॥

লভ লভ হবিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপঙ্কং।

ভবনিগডনিবন্ধছেদনীং কর্তনীয়ং॥

নাবদপঙ্করাগ্রে এটা আছে। নাবদ তপস্তা ক’ছিলেন, এমন সময় দৈব-বাণী হল, “হবিকে যদি আবাসনা কবা যায়, তা হলে তপস্তার কি প্রয়োজন? আব হবিকে যদি না আবাসনা কবা হয়, তা হলেই বা তপস্তার কি প্রয়োজন? হবি যদি অন্তরে বাহিবে থাকেন, তা হলেই বা তপস্তার কি প্রয়োজন? আব হরি যদি অন্তরে বাহিবে না থাকেন, তা হলেই বা তপস্তার প্রয়োজন কি? অতএব হে ব্রহ্ম, বিরত হও, বৎস, তপস্তার কি প্রয়োজন? জ্ঞানসিদ্ধ শঙ্কবৎ কাছে শীঘ্র গমন কর। বৈষ্ণবে বা হবিভক্তির কথা বগে গেছেন, সেই সুপরা ভক্তি লাভ কব, লাভ কর। এই ভক্তি,—এই ভক্তির দ্বারা ভবনিগড় ছেদন হবে—ভক্তি-কাটারি দিয়ে ছেদন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবকোট ও ঈশ্বরকোট। জীবকোটের ভক্তি বৈদী ভক্তি। এত উপচারে পূজা কত্তে হবে, এত জপ কত্তে হবে, এত পুরস্কার কত্তে হবে। এই বৈদীভক্তির পর জ্ঞান। তার পর লয়। এই লয়ের পর আব ফেবে না।

“ঈশ্বরকোট আলাদা কথা,—মেমন অমূল্য বিলোম। ‘নেতি

‘নেতি’ করে ছাতে পৌঁছে যখন দেখে, ছাতও যে জিনিষে তৈরি,— ইট, চুন, স্মৃষ্কি,—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈরি, তখন কখন ছাতেও থাকতে পারে আবার ওটা নাবাও করতে পারে।

“শুকদেব সমাধিস্থ ছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি—জড় সমাধি। ঠাকুর নারদকে পাঠিয়ে দিলেন,—পবীকৃতকে ভাগবত শুনাতে হবে। নারদ দেখলেন, জড়ের স্থায়ী শুকদেব বাহুশূন্য—বসে আছেন। তখন বীণার সঙ্গে হরির রূপ চার ধোকে বর্ণনা করতে লাগলেন। প্রথম শোক বলতে বলতে শুকদেবেব বোমাঝ হলো। ক্রমে অশ্রু, অন্তরে, সদয়মধ্যে চিন্ময় রূপ দর্শন করতে লাগলেন। জড় সমাধির পর আবাব রূপ দর্শনও হলো। শুকদেব ঈশ্বরকোটি।

“হনুমান্ সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করে রামমূর্তিতে নিষ্ঠা করে থাকলো। চিদম্বন আনন্দের মূর্তি—সেই রামমূর্তি।

“প্রজ্ঞাদ কখন দেখতেন সোহহং আবাব কখন দাসভাবে থাকতেন।

“নারদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে হরিভক্তি নিয়ে থাকতেন।

“ভক্তি না নিলে কি নিয়ে থাকে? তাই সেব্য সেবক ভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়, তুমি প্রভু আমি দাস। হরিরস আনন্দন করবার জন্ত। রসবসিকের ভাব—হে ঈশ্বর, তুমি রস, \* আমি রসিক।

( ভক্তির আমি । )

“ভক্তির আমি, বিদ্যার আমি, বালকের আমি, এতে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার আমি বেথেছিলেন লোকশিক্ষা দিবার জন্ত। বালকের আমিও আঁট নাই। বালক গুণাতীত,—কোন গুণেব বশ নয়, এই রাগ করে আবার কোথাও কিছু নাই; এই খেলাঘর কল্পে আবাব ভুলে গেল; এই খেলুড়েদের ভাল বাসছে আবার কিছুদিন তাকে না দেখলে সব ভুলে গেল। বালক সব রজ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।

“তুমি ঠাকুর আমি ভক্ত,—এটা ভক্তের ভাব, ভক্তির আমি। কেন ভক্তির আমি রাখে? তাই \* মানে আছে। আমি ত যাবাব নয়, তবে থাক্ শালা দাস আমি, ভক্তেব আমি হয়ে।

\* রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবাং লক্ষ্যানলৌ ভবতি। কোহবাংনাং কঃ প্রাণ্যাং বদেব আবাস আনন্দো ন স্যাৎ।  
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

“হাজার বিচার কর, আমি যায় না। আমি রূপ কুন্ড। ব্রহ্ম যেন সমুদ্র—জলে জল। কুন্ডের ভিতরে বাহিবে জল। জলে জল! তবু কুন্ড ত আছে। ঐটা ভক্তের আমার স্বরূপ। বতকণ কুন্ড আছে, আমি ভূমি আছে; ভূমি ঠাকুর আমি ভক্ত, ভূমি প্রভু আমি দাস এও আছে। হাজার বিচার কর, এ ছাড়বার জো নাই। কুন্ড না থাকলে সে এক কথা।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁহার নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ । ]

নরেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। কথা কহিতে কহিতে নীচে মেঝেতে আসিয়া বসিলেন। মেঝেতে মাহুর পাতা ছিল। এতক্ষণে সব লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভক্তেরাও আছেন, বাহিরের লোকও আসিয়াছেন।

ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। ভাল আছি? তুই নাকি গিরীশ ঘোষের ওখানে প্রায়ই যাস?

নরেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে যাই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের নিকট গিবীশ কয়মাস হইল নূতন আসা যাওয়া কবিতোছেন। ঠাকুর বলেন, গিরীশের বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না। যেমন বিশ্বাস তেমনি অল্পবাগ। বাড়ীতে ঠাকুরের চিন্তায় সর্বদা মাতোয়ারা হয়ে থাকেন। নরেন্দ্র প্রায় যান; হরিপদ, দেবেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্ত তাঁর বাড়ীতে প্রায় যান। ভক্তেরা এলেই গিবীশ তাদের সঙ্গে কেবল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথাই কন। গিবীশ সংসারে থাকেন, কিন্তু ঠাকুর দেখিতেছেন, নরেন্দ্র সংসারে থাকিবেন না। কামিনী কাকন ত্যাগ কবিবেন।

ত্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই গিরীশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস।

( ত্যাগ বা সন্ন্যাসের অধিকারী । )

“কিন্তু রস্তুনের বাটা যত ধোওনা কেন, গন্ধ একটু থাকবেই। ছোঁক-বারা শুদ্ধ আধার; কামিনী কাকন স্পর্শ করে নাই; অনেক দিন ধরে কামিনী কাকন ঘাঁটলে রস্তুনের গন্ধ হয়।

“যেমন কাকে গোঁকরান আমি। ঠাকুবদের দেওয়া যায় না, নিজেরও সন্দেহ।

নূতন হাঁড়ি আর দৈপাতা হাঁড়ি। দৈপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে তয় হয়। প্রায় দুধ নষ্ট হয়ে যায়।

“ওবা থাক আলাদা। যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন বাব-ণেব ভাব—নাগকণ্ঠা দেবকণ্ঠাও লেবে আবাব রামকেও লাভ কববে।

“আব অসুখবা নানা ভোগও কচ্ছে আবাব নারায়ণকে লাভ কচ্ছে। নবেন্দ্র। গির্দীশ ঘোষ বেঞ্জা ছেড়েছে।

শ্রীনামকর। আমি বড় বেলায় দাম্ভা হয়েছি,—বর্দ্ধমানে দেখেছিলাম। একটা দাম্ভা গাই গরুর কাছে যেতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা কব্বুম, একি হলো? এ তো দাম্ভা। তখন গাভোয়ান বলে,—‘মশায়, এ বেশী বয়সে দাম্ভা হয়েছিল।’ তাই আগেকাব সংস্কাব যায় নাই।

“এক জায়গায় সন্ন্যাসীবা বসে আছে—একটা স্ত্রীলোক সেই থান দিখে চলে যাচ্ছে। সকলেই ঈশ্বরচিন্তা কচ্ছে, একজন আড চোপে চেয়ে দেখলে। সে তিনটা ছেলে হবাব পব সন্ন্যাসী হয়েছিল।

“একটা বাটীতে যদি বসুন গোলা যায়, রসুনব গন্ধ কি যায়? বাবুই গাছে কি আম হয়? হতে পাবে সিদ্ধাই তেমন থাকলে বাবুই গাছেও আম হয়। সে সিদ্ধাই কি সকলের হয়?

“সংসারী লোকেব অবসর কই? একজন একটা ভাগবতের পণ্ডিত চেয়েছিল। তাব বন্ধু বলে,—একটা উত্তম ভাগবতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু তাব একটু গোল আছে। তাব নিজের অনেক চাষ বাস দেখতে হয়। চারখানা লাঙ্গল, আটটা হেলে গরু। সবদা তদাবক কব্বে হয়; অবসর নাই। যাব পণ্ডিতের দরকার, সে বলে, আমাব এমন ভাগবতের পণ্ডিতের দরকার নাই, যাব অবসর নাই। লাঙ্গল-হেলে-গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিত আমি খুঁজছি না, আমি এমন ভাগবত পণ্ডিত চাই, যে আমাকে ভাগবত ওন্মতে পাবে।

“এক রাজা বোজ ভাগবত ওন্মতো। পণ্ডিত পড়া শেষ হলে রাজাকে বন্মতো,—বাজা, বুঝেছ? রাজাও বোজ বলে,—তুমি আগে বোঝ। পণ্ডিত বাড়ী গিয়ে রোজ ভাবে,—রাজা এমন কথা বলে কেন যে, তুমি আগে বোঝ। লোকটা দাধন ভজন কব্বে—ক্রমে চৈতন্য হলো।

তখন দেখলে যে, ত্রিপাদপদ্যই সার আর সব মিথ্যা । সংসারে বিবস্ত্র হয়ে বেরিয়ে গেল । কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বলতে যে,—রাজা, এইভাবে বুঝেছি ।

“তবে কি এদেব ঘৃণা কবি? না, ব্রহ্মজ্ঞান তখন আনি । তিনি সব হয়েছেন,—সকলেই নাবায়ণ । সব যোনিই মাতৃযোনি, তখন বেগ্নাও সতীলক্ষ্মীতে কোন অভেদ দেখি না ।

“কি বলবো, সব দেখছি কলাইএব ডালের খন্ডেব । কামিনী কাকুন ছাড়তে চায় না । লোকে মেঘে মাতৃয়ের রূপে ভুলে যায়, টাকা ঐশ্বর্য্য দেখলে ভুলে যায়, কিন্তু ঈশ্বরের রূপদর্শন কবলে ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয় ।

“বাবণকে একজন বলেছিলো, তুমি সব রূপ ধরে সীতাব কাছে যাও, রামরূপ ধব না কেন? বাবণ বলে,—বামরূপ হৃদয়ে একবার দেখলে বস্তা তিলোত্তমা এদেব চিতাব ভঙ্গ বলে বোধ হয় । ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পবিত্রীর কথা ত দূবে থাক্ ।

“সব কলাইএব ডালের খন্ডেব । শুদ্ধ আধাব না হলে ঈশ্ববে শুদ্ধা ভক্তি হয় না—এক লক্ষ্য হয় না, নানাদিকে মন থাকে ।

“বাখালকে বল্লুম—

( সংসারীর দাসত্ব )

(মনমোহনের প্রতি) । তুমি বাগই কব আর ঘাই কব—বাখালকে বল্লুম,—ঈশ্ববেব জন্ত গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে মবেছিস, একথা বরং শুনবো ; তবু কারু দাসত্ব করিস, চাকরী করিস, এ কথা যেন না শুনি ।

“নেপালের একটা মেঘে এসেছিল । বেশ এসরাজ বাজিয়ে গান ববলে । হরিনাম গান । কেউ জিজ্ঞাসা কবলে,—তোমাব বিবাহ হয়েছে? তা বলে—আবাব কাব দাসী হব, এক ভগবানের দাসী আমি ।

“কামিনী কাকনের তিতবে থেকে কি কবে হবে? অনাসক্ত হওয়া বড় কঠিন । একদিকে মেগেব দাস, একদিকে টাকাব দাস, আব এক দিকে ইংবাজ মনিবের দাস,—তাদের চাকরী কবতে হয় ।

“একটা ফকিব বনে কুটীব করে থাকতো । তখন আক্বর সা দিল্লীব রাজা ছিল । ফকিবটার কাছে অনেকে আসতো । অতিথিসংকাব কবতে তাঁর বড় ইচ্ছা হয় । একদিন ভাবলে যে, টাকা কড়ি না হলে কেন

করে অতিথি সংকার হয়। তবে যাই একবার আকবর সার কাছে। সাধু ফকিরের অব্যাহত দ্বার। আকবর সা তখন নমাজ পড়ছিলেন, ফকির নমাজের ঘরে গিয়ে বসলো। দেখলে,—আকবর সা নমাজেব শেষে বলছে,—হে আল্লা, ধন দাও, দৌলত দাও, আরো কত কি। এই সময়ে ফকিরটা উঠে নমাজের ঘর থেকে চলে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলো। আকবর সা ইশারা করে বসতে বলেন। নমাজ শেষ হলে রান্না জিহ্বাসা কবলেন,—আপনি এসে বসলেন আবার চলে যাচ্ছেন কেন? ফকির বললে,—সে আর মহারাজের শুনে কাষ নেই, আমি চলুম। বাদশা অনেক জিন্দ করাতে ফকির বললে,—আমার ওখানে অতিথি অনেক আসে। তাই কিছু টাকা প্রার্থনা করতে আপনার কাছে এসেছিলাম। আকবর বলে, তবে চলে যাচ্ছিলেন কেন? ফকির বললে—যখন দেখ-লুম, তুমিও ধন দৌলতের ভিখারী,—তখন মনে কবলুম যে, ভিখারীও কাছে চেয়ে আর কি হবে? যদি চাইতে হয় ত আল্লাব কাছে চাইব।

নরেন্দ্র। গিরীশ ঘোষ এখন কেবল এই সব চিন্তাই করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে খুব ভাল। তবে অত গালাগাল, মুখ খারাপ করে কেন? সে অবস্থা আমাব নয়। বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিষ তত নড়ে না, কিন্তু সারি ঘট্ ঘট্ করে। আমার সে অবস্থা নয়। সবগুণের অবস্থায় হৈ টে সহ হয় না। হলে তাই চলে গেল, যা রাখলেন না। শেষাশেষী বড় বাড়িয়েছিল। আমায় গালাগালি দিত, হাঁক ডাক কবতো।

(নরেন্দ্রের প্রতি)। “গিরীশ ঘোষ যা বলে, তোর সঙ্গে কি মিললো?

নরেন্দ্র। আমি কিছু বলি নাই, তিনিই বলেন, তাঁর অবতার বলে বিশ্বাস। আমি আর কিছু বললুম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু খুব বিশ্বাস! দেখেছিস?

ভক্তেরা সকলে একদুষ্টে দেখিতেছেন, ঠাকুর নীচেই মাহুরের উপর বসিয়া আছেন। কাছে মাস্টার, সম্মুখে নরেন্দ্র, চতুর্দিকে ভক্তগণ।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া রহিলেন, নরেন্দ্রকে স্নেহে দেখিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্রকে বলিলেন, বাবা, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না হলে হবে না। বলিতে বলিতে তাবপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। সেই করুণাযাখা স্নেহ দৃষ্টি, তাহার সঙ্গে তাবোন্মত্ত হইয়া গমন করিলেন,—

গান ।

কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই ।  
 মনে সন্দেহ হয় পাছে তোমাধনে হারাই হারাই ॥  
 আমবা জানি যে মনুতোব, দিব তোকে সেই মনুতোব ।  
 এখন মন তোব, আমরা যে মন্ত্রে বিপদে তবি তরাই ॥

ঠাকুর বামকৃষ্ণ যেন ভয় পাইয়াছেন, বুঝি নবেন্দ্র আর কাহারও  
 উইল, আমাব বুঝি হল না ।

নবেন্দ্র অশ্রুপূর্ণালাচনে চাহিয়া রহিলেন ।

বাহিবেব একটা লোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন । তিনিও  
 কাছে বসিয়াছেন । তিনি সমস্ত দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন । তিনি  
 বলিলেন,—

মহাশয়, কামিনী কান্ধন যদি ত্যাগ কব্বে হবে, তবে গৃহস্থ কি  
 কব্বে ?

শ্রীবামকৃষ্ণ । তা তুমি কব না । আমাদেব অমনি একটা কথা হয়ে গেল ।

( গৃহস্থেব প্রতি অভয় দান ও উত্তেজনা । )

মহিমাচরণ চূপ কবিয়া বসিয়া আছে, মুখে কথাটা নাই ।

শ্রীবামকৃষ্ণ ( মহিমা প্রতি ) । এগিয়ে পড় । আবও আগে যাও,  
 চন্দন কাট পাবে; আবও আগে যাও, কপার খনি পাবে, আরও এগিয়ে  
 যাও, সোণার খনি পাবে, আবও এগিয়ে যাও, হীবে মাণিক পাবে ।  
 এগিয়ে পড় !

মহিমা । আজে, টেনে বাখে যে,—এগুতে দেয় না ।

শ্রীবামকৃষ্ণ ( সহাস্তে ) । কেন, লাগাম কাট, তাঁব নামের গুণে কাট ।  
 কালীনামে কালপাশ কাটে ।

\* \* \* \* \*

নরেন্দ্র পিতৃবিশ্রামের পর সংসারে বড় কষ্ট পাইতেছেন । তাঁহার  
 উপর দিয়া অনেক তাল বাইতেছে । ঠাকুর মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে  
 দেখিতেছেন । ঠাকুর বলিলেন,—

তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস ?

‘শতমারী ভবেঔষধ্যঃ ।

সহস্রমারী চিকিৎসকঃ ॥’ ( সকলের হাস্য ) :



ঠাকুর কি বলিতেছেন, নরেন্দ্রের এই বয়সে অনেক দেশাশ্রম  
হইল, সুখ হৃৎকের সঙ্গে অনেক পরিচয় হইল ?  
নরেন্দ্র ঐশ্বর্য হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

( শ্রীশ্রীদোলযাত্রা ও ভক্তসঙ্গে আনন্দ । )

নবাই চৈতন্ত গান গাইতেছেন। ভক্তেরা সকলেই বসিয়া আছেন।  
ঠাকুর ছোট খাটীতে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ উঠিলেন। ঘরের বাহিরে  
গেলেন। ভক্তেরা সকলে বসিয়া বহিলেন, গান চলিতে লাগিল।

মাষ্টার ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ঠাকুর পাকা উঠান দিয়া কালী-  
ঘরের দিকে যাইতেছেন। বাধাকান্তের মন্দিরে আগে প্রবেশ করিলেন।  
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তাঁহার প্রণাম দেখিয়া মাষ্টারও প্রণাম  
করিলেন। ঠাকুরের সম্মুখে ধান্য আবির্ভাব ছিল। আজ শ্রীশ্রীদোলযাত্রা—  
ঠাকুর বামফল্গু তাহা ভুলেন নাই। খানার ফাগ লইয়া শ্রীশ্রীরাধাস্তায়কে  
দিলেন, আবার প্রণাম করিলেন।

এইবার কালীঘরে যাইতেছেন। প্রথম সাতনী ধাপ ছাড়াইয়া চাতালে  
দাঁড়াইলেন। মাকে দর্শন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মাকে আবির্ভাব  
দিলেন। প্রণাম করিয়া কালীঘর হইতে চলিয়া আসিতেছেন। কালীঘরের  
সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন,—বাবুবামকে আনুলে না  
কেন ?

ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর  
একজন আবির্ভাব খালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া  
সব পটকে ফাগ দিলেন—হু একটা পট ছাড়া—নিজের ফটোগ্রাফ ও  
মীত্র খ্রীষ্টের ছবি। এইবার বারাগায় আসিলেন। নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতে  
বারাগায় বসিয়া আছেন। নকোন কোন ভক্তের সহিত কথা কহিতেছেন।  
ঠাকুর নরেন্দ্রের গায়ে ফাগ দিলেন। ঘরে ঢুকিতেছেন, মাষ্টার সঙ্গে  
আসিতেছেন, তিনিও আবির্ভাব প্রসাদ পাইলেন।

ঘবে প্রবেশ করিলেন। মত ভক্তের গায়ে আবির্ভাব দিলেন। সকলেই  
প্রাণে করিতে লাগিলেন। ।

অপরূহ হইল। ভক্তেরা এদিক্‌ ওদিক্‌ বেড়াইতে লাগিলেন। ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছেন। কাছে কেহ নাই। ছোঁকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন। বলছেন,—“আচ্ছা, সবাই বলে বেশ ধ্যান হয়, পণ্টর ধ্যান হয় না কেন?”

“নরেককে তোমাব কি রকম মনে হয়? বেশ সরল, তবে সংসারের অনেক ভাল পড়েছে, তাই একটু চাপা ও থাকবে না।

ঠাকুর মাঝে মাঝে বারাগাঘ উঠিয়া বাইতেছেন; নরেক একজন বেদান্ত-বাদীর সঙ্গে বিচার করছেন।

ক্রমে ভক্তেরা আবার ঘরে আসিয়া ছুটিতেছেন।

মহিমাচরণকে স্তব পাঠ করিতে বলিলেন। তিনি মহানির্কাণ তন্ত্র হইতে স্তব বলিতে লাগিলেন।

হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিবীহং ।

হরিহরবিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্ ॥

জননমরণভীতিভ্রংশি সচ্চিৎস্বরূপং ।

সকলভুবনবীজং ব্রহ্মচৈতন্তমীড়ে ॥

মহানির্কাণ তন্ত্র। ৩৮ উদাস। ৫০ শ্লোক।

( গৃহস্থের প্রতি অভয় । )

আরও দু একটা স্তবের পর মহিমাচরণ শব্দবাচাৰ্য্যের স্তব বলিতে লাগিলেন। তাহাতে সংসারকুপের, সংসারগহনের কথা আছে। মহিমাচরণ সংসারী ভক্ত।

স্তবটী এই—

হে চক্ৰচূড় মদনাত্মক শূলপাণে, স্থাপো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শঙ্কর।

ভূতেশ ভীতিভয়হৃদন মাননাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

হে পার্শ্বভীতদয়বন্ত চক্ৰমৌলে, ভূতাপিশ প্রমথনাথ গিরিশজাপ।

হে বামদেব ভবরূপ পিনাকপাণে, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

হে বিষ্ণুনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গঙ্গাধর প্রমথনাথক নন্দিকেশ।

বাণেশ্বরাকরিরপো হর লোকনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

কালগঙ্গীপূরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দ্বন্দ্বমথকাল বিভো গণেশ।

সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞৈকনিবাস নাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর রূপায় হে দয়ালো, হে ব্যোমকেশ শিতিকঠ গণাধিনাথ ।

ভয়ানকরাগনুকপালকলাপমাল, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

কৈলাসশৈলবিনিবাস কৃষাকপে হে, মৃতুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগদ্বিবাস ।

নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

বিশেষ বিশ্বভবনাশিতবিস্করূপ, বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ ।

হে বিশ্ববন্দ্য ককণাময় দীনবধো, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥

গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়, পঞ্চাননায় শবণাগতবল্লকায় ;

শর্কায় সর্কজগতামধিপায় তন্মৈ, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিলায় ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) । সংসাররূপ কেন বল ? ও প্রথম প্রথম বলতে হয় । তাঁকে ধবলে আর ভয় কি ? তখন—

এই সংসার মজাব কুটি ।

আমি ঝাই দাই আব মজা লুটি ॥

জনকবান্ধা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রিটি ।

সে যে এদিক্ ওদিক্ হৃদিক্ রেখে থেয়েছিল হৃথেক বাড়ি ।

“কি ভয় ? তাঁকে ধব । কাটা বন হলেই বা । জুতো পায় দিয়ে কাটা বনে চলে চাপ ।

“কিসেব ভয় ? যে বুড়ী ছোঁয়, সে কি আব চোব হয় ?

“জনক রাজা দুখানা তলোয়ার ঘোবাত । একখানা জ্ঞানেক, একখানা কণ্ঠেব । পাকা খেলোয়াডেব কিছু ভয় নাই ।

এইরূপ ঐশ্বরীয় কথা চলিতে লাগিল ।

ঠাকুর ছোট খাটগীতে বসিয়া আছেন, খাটের পাশে মাষ্টার বসিয়া আছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) । ও যা বল্লে, তাইতে টেনে বেখেছে ।

ঠাকুর মহিমাচরণের কথা বলিতেছেন ও তাঁহার কথিত ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক গোকের কথা ।

নবাই চৈতন্ত ও অশ্রান্ত ভুজেরা আবার গাহিতে লাগিলেন । এবার ঠাকুর যোগদান করিলেন আর ভাবে মগ্ন হইয়া মধীর্জন মধো নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

কীৰ্ত্তনান্তে ঠাকুর বলিলেন, এই কাজ হলো, আর সব মিথো । পেয় ভক্তি বস্তু আর সব অবস্তু । /

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

( গুহ্য কথা । )

বৈকাল হইয়াছে। ঠাকুর পঞ্চবটীতে গিয়াছেন। মাষ্টারকে বিনোদেব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিনোদ মাষ্টারের স্থলে পড়িতেন। বিনোদেব ঈশ্বর চিন্তা করে মাঝে মাঝে ভাবাবস্থা হয়। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাহাকে ভালবাসেন।

এইবারে ঠাকুর মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ঘবে ফিরিতেছেন। বকুলতলাব ঘাটের কাছে আসিয়া বলিলেন,—এই যে কেউ কেউ অসত্য বলছে, তোমার কি বোধ হয়?

কথা কহিতে কহিতে ঘবে আসিয়া পড়িলেন। চাঁট জুতা খুলিয়া ছোট খাটীতে বসিলেন। খাটের পূর্দিকের পাশে এক খানি পাপশ আছে। মাষ্টার তাহার উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন। ঠাকুর ঐ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। অগ্নাত ভক্তেরা একটু দূরে বসিয়াছিলেন। তাহারা এ সকল কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি কি বল?

মাষ্টার। আজ্ঞে আমারও তাই মনে হয়। যেমন চৈতন্যদেব ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ, না অংশ, না কলা? ওজন বল না।

মাষ্টার। আজ্ঞে, ওজন বুঝতে পারছি নি। তবে তাঁর শক্তি অব-  
তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ত আছেনই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, চৈতন্যদেব শক্তি চেয়েছিলেন।

ঠাকুর কিরংকণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরেই বলিলেন,—কিস্ত  
বড়-ভুজ?

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, চৈতন্যদেব বড়-ভুজ হয়েছিলেন—ভক্তেরা  
দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর—একথা উল্লেখ কেন করিলেন?

( ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তর্ক বিচার । )

ভক্তেরা অদূরে ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র বিচার কবি-  
তেছেন। রাম ( দত্ত ) সবে অন্তর থেকে সেরে এসেছেন, তিনিও ঘোবতর তর্ক  
করছেন।

ঠাকুর দেখিতেছেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । আমার এ সব বিচার ভাল লাগে না :  
( রামের প্রতি ) । ধাম ।—তোমার একে অসুখ ! আচ্ছা, আস্তে আস্তে ।

( মাষ্টারের প্রতি ) । “আমার এ সব ভাল লাগে না” আমি কীদু  
তুমি আর বলতুম, মা, এ বলছে এই এই, ও বলছে আর এক রকম :  
কোনটা সত্য তুই আমায় বলে দে !

## আত্মস্পৃহা ।

ওহে তুমি দেহবাসী রহস্ত-নিলয়,  
কিবা মায়াময় জ্ঞান, কে তুমি, কি তুমি,  
দিবে কি বলিয়া ? ঘূচাবে কি তুমি এই  
জন্মজাত এ আমার অজ্ঞান-তিমির ?  
ওহে অপ্ৰকাশ, ওহে চির-স্বপ্নাকাশ,  
কি উদ্দেশ্যে প্রবেশিয়া এ দেহ-নিবাসে  
কি কার্য্য সাধন তরে এলে ধরণীকে  
দিবে কি বলিয়া ? ঘূচাবে কি শঙ্ককার ?

মারের সন্ধান প্রতি কেন এত প্রীতি ?  
এত আত্মবিসর্জন কেন বা তাঁহার ?  
দেহবাসী আত্মা ওহে মহান পুরুষ,  
সে শুধু তোমারি প্রতি প্রীতির লাগিয়া ।  
কেন ভালবাসে সতী প্রাণপতি তার ?  
কেবল আকাঙ্ক্ষা তার পতির চরণ ?  
সে শুধু নিরুত্তি তরে তব কামনার ।  
কেন ভালবাসে পতি প্রেমসী তাহার ?  
কেন রূপমোহ, কেন বিষয়ের তৃষা ?  
মহে নহে সে তো। রূপমোহ অর্থতৃষা ;  
সে শুধু তোমারি তৃষ্ণা পূরণের তরে  
অধিক কল্পনামাত্র মুক্ত মানবের ।

এই যে সংসারে নিত্য শৈশবিক ভাব  
 হেরে এ নয়ন, বল সে কাহার তরে ?  
 কি হেতু করিছে হতা পুত্র পিতৃদেবে ?  
 জননী সত্যানে কেন করিছে নিধন ?  
 পুরুষ করিছে কেন পত্নী পীড়ন ?  
 রমণী বিষুখী কেন স্বামীতে আপন ?  
 কি লালসা রক্ততৃষা উঠিছে সংসারে  
 “দাও দাও মোরে দাও” শুধু এই সব  
 হাহাধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠে দিকে দিকে  
 সে কাহার তরে ? কাব এ রক্তপিপাসা ?  
 কার তৃষ্ণা পূবাইতে মুক্ত জীবগণ  
 করিতেছে নরমেধ বস্ত্র আয়োজন ?  
 হে রহস্যাকর, ওহে দেহগৃহবাসী,  
 ভূমি সে রাক্ষসী বৃত্তি, ভূমি সে রাক্ষস ।

ওই যে জ্বলিছে গৃহ ধু ধু ধু ধু করি  
 লহ লহ উঠিতেছে অনলের শিখা  
 কে রমণী তুচ্ছ করি জীবনের আশা  
 কাঁপ দিল হের ওই অনল-সাগরে  
 সন্তান বক্ষার লাগি ? পুনঃ দেখ চেয়ে  
 জলমগ্ন তরীখানি, বিপন্ন আরোহী  
 কে সুবক আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করি সেই  
 তরঙ্গসঙ্ঘলা ভীমা পদ্মার হৃদয়ে  
 কাঁপ দিল রক্ষিবারে আর্তের জীবন ?  
 ক্রোরপতি মহারাজা সর্বত্র বিলায়ে  
 দরিদ্রে হাতখুবে যেতেছেন •বনে ।  
 সন্তান শিভায় লাগি দিতেছে জীবন ।  
 হত পতি যদি সতী হৃদয় মাঝারে  
 অনলে দিতেছে কাঁপ । এই চাক বৃত্ত  
 কে দেখালে, কে অদমিল কর্তে বরণ ?

নেহগুহবাণী ওহে রহস্ত-আকব,  
তুমিই সে দেবব্রতি, তুমি সে দেবতা ।

চির প্রজ্জ্বলিত বহিস্রম এ হৃদয়ে,  
জ্বলিতেছে কিবা আনি দিব উপহাব,  
জন্মাবধি জীব জিবময় সে চিন্তায় ।  
প্রেম দিয়া প্রীতি দিয়া মেহমুগ্ধ দিয়া  
উত্তপ্ত শোণিত দিয়া স্নেহ-পিণ্ড দিয়া  
চিবদিন পূজা করি চরণ তোমার  
কিসে তৃপ্ত হবে হায, হা অন্ধ মানব !  
কোথা তৃপ্তি ! কোথা শান্তি ! শুধু হাহাব !  
নিতি নিতি নব আশা নবীন বাসনা,  
নিতি নবম্পৃহা নিতি নূতন কল্পনা,  
কোথা তৃপ্তি ? কোথা শান্তি ? হায বৃথা শুধু ;  
ছুড়াল না ঝিটল না আত্মার পিপাসা ।

ছুড়াইব কিসে তোমা, কিসে তৃপ্তি পাবে ?  
এতদিনে নাহি পেছু পরিচয় যার  
জানিব কেমন করি বাসনা তোমার ?  
কেমনে জানিব বল কি যে তুমি চাও  
অবোধ শিশুর মত বাড়াইয়া কর  
কোন্ গগনের চাঁদ ধরিত্ত্বের আশে  
যত কিছু আনি দিই চরণে তোমার  
বারেক আত্মাণ কবি ফেলে দাও দূরে ?

বল হে করুণা করি বাসনা তোমার,  
কিসে তব তৃপ্তি হবে দাও পরিচয়,  
বারেক আলাপ কর আত্মীযের মত,  
সন্ধান বসিয়া দাও কোথা গেলে পাব  
তোমার যে কাব্য বস্ত্র সাধনার ধন !

## পার্বতীদেবীর মন্দিরে ।

অদূরে চিবভূমাবাবগুপ্তিতা হিমাদ্রিশৃঙ্গ নন্দাদেবী, অন্তঃসমনোমুখ দিন-করেব কোমল রশ্মিচূষনে আরক্তগ্রীবা। পার্বতীদেবীর মন্দিরেব সাক্ষ্য-বাত্তিক শঙ্খধ্বনি হিমালয়েব শিখর হইতে শিখবাস্তব পূত কবিঘা দেবী-পট্ট গ্রামে প্রতিধ্বনিত হইল। পাহাড়ী বালকগণ “জয় পার্বতী মায়িকী জগ” শব্দে করতালিসহ নৃত্য করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে মস্তক ঈষৎ নত করিয়া মাঝে মাঝে শ্রীচরণে বালক-সহজ অতি পবিত্র ভক্তিদ্বারা ঢালিয়া দিতেছে।

ব্রহ্মচারী শঙ্করনাথ ভিক্ষাদ্বারা যথাসম্ভব অর্থসংগ্রহ কবিয়া এ মন্দির নিশ্চিত করেন। সে আজ দশ বৎসর। এত দিন তিনি মন্দির সমীপস্থ পৰ্ণকুটার আশ্রয় করিয়া অতিবহ্ন সহকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত পার্বতীদেবীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। আশা,—একদিন জগজ্জননীকে সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় শ্রীপদরাজীবমুগ্ধলে দেহ মন প্রাণ স্বীয় যথাসৰ্ব্ব অঞ্জলি দানে কৃতকৃতার্থ হন।

‘প্রতিমা প্রস্তুতময়ী,’ এ চিন্তা যুহুর্ন্তের জগৎ মনে উঠিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সাবধান হইবা ‘মা চিন্ময়ী’ বলিয়া মন নিরন্তর কবিতেন। প্রভুত্ব হইতে বিপ্রহর বাত্রি পর্য্যন্ত আরতি, পূজা, ভোগ ইত্যাদি বহুবিধ সেবা-কার্য্যতৎপর ব্রহ্মচারীর হিমালয়ে একান্ত বাস আরোপিতচৈতন্যবুদ্ধি প্রতিমার সহবাসে অনেকান্ত হইত।

কয়েক দিন শঙ্করনাথের কি যেন একটা মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আরতিব পর মাকে প্রণাম করিতে আজ তাঁর বিস্মৃতি কেন? ভুবন-মোহিনীর বিমোহন রূপদর্শনে তিনি বিমুগ্ধ? না—তাঁহার ললাটে স্বপ্ন-বিন্দু; এ কি কোন আন্তরিক বিবাদতাপের বহির্বিকাশ?

মন খেয়াল সত্য মানবে আব কত দিন? দশ বৎসরের ভক্তি, ব্যাকুলতা এখনও অফল; কখনও কি তার সফলতা হইবে? দশ বৎসর প্রস্তরে চেতনহ আরোপণ সত্ত্বেও প্রস্তরের জড়ত্ব জড়ময়ী রহিল; কখনও কি এ জড়ে চৈতন্য বিকাশ পাবে? মনের এ ছুনিবার সন্দেহে শঙ্করনাথ মর্শ্বব্যস্ত। প্রবল সন্দেহপ্রোতে তাঁর এত দিনের বিশ্বাস, ভক্তি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।



রাত্রি দেবীর সেবা বন্ধ থাকিল। শঙ্করনাথ মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া কুটারে শয়ন করিলেন। মনকে কত বুঝাইতে লাগিলেন। কত মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন, যাহাবা প্রতিমায় চিত্রিত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি কেন দেখিলেন না? তাঁহার সেবায় শ্রদ্ধা ব্রটি আছে? তাঁহার ক্রন্দনে কি সরসতার অভাব? না, যাহাবা প্রতিমায় চৈতন্য দেখিয়াছে, তাহাবা বিরহমত্তিক? শঙ্করনাথের নিদ্রা নাই।

প্রভাত হইল। মন্দিরের দ্বার বন্ধ। চঞ্চল মনে দেবীপূজা অসত্যের পূজা; শঙ্করনাথ মন স্থির না হইলে পূজা করিবেন না।

সায়ংকাল আগতপ্রাণ। “দশ বৎসর জীবন আকাশকুসুম লাভ চেষ্টায় কাটিয়া গেল। যদি গিয়া থাকে, আরও দশ বৎসর যাক; শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না।” শঙ্করনাথ মন্দিরের কপাট খুলিতে উদ্যত হইলেন। “না, মাকে পবীক্ষা করিব। সাবাদিন আমি উপবাসী, সংশয়-তাড়নে অস্থির। দেখি, মাত প্রাণে সম্ভানের হৃৎপ্রতিঘাত করে কি না।”

দেবীপটু-পল্লীবাসী বালকবৃন্দ মন্দিরচতুর্পাশে গুপ্তস্থিবেদী, আরতি-শব্দধ্বনি প্রতীক্ষায় উল্লসিত। সে ধ্বনি নাই; বালকবৃন্দের জয়ধ্বনি, করতালি, নৃত্য, প্রণাম সবই বহিল।

এ বাত্রেও শঙ্করনাথ অনিদ্রিত। প্রাণেব আবাধ্য সত্যে অবিশ্বাস-রূপ আশীষ যাহাকে কভু দংশন করিয়াছে, তিনিই শঙ্করনাথের যাতনা বুঝিতে সক্ষম।

পবনায় পূর্ণিমা তিথি। নিশানাথের কিরণহাথে বসুমতী হাস্যময়ী। হৃদয়ের অমাবস্তা কি সে কিরণ দূর করিতে পারে! শঙ্করনাথ তীক্ষ্ণ-ছুরিকা হস্তে পাষণময়ী দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। “মা, সত্য যদি তুমি, দেখা দেও; নহিলে অভাগা হৃদয়কুণ্ডলে তোমায় শেষ পান্য প্রদান করিবো।”

সহসা স্নিগ্ধকর জ্যোতিতে মন্দির ভাসিয়া উঠিল। বাহুজ্ঞানহারা শঙ্করনাথ তাহাতে নিমগ্ন। দুবে কর্কশস্বরে কে যেন বলিতেছে, “বালক, যিনি অনন্ত শক্তি, জ্ঞান ও আনন্দের আধার, যাহার মহিমাগর্বে আদ্যন্ত-রহিত বিশ্ব বাবিবিন্দুসম, যাহাকে লাভ করিলে অস্ত্র কিছুই লভ্য থাকে না, যাত্র দশ বৎসরের চেষ্টা সে পবনমণ্ডল লাভে বিফল হইয়াছে বলিয়া তোমার ধৈর্যচ্যুতি! কোঁটা কোঁটা যুগ যাহার নিমেষ কাল যাত্র, তন্মাত্র-

চেষ্টা কোটি বৎসর বিফল হইলেও ধৈর্য্যচ্যুতির জাঘাতা কোথায়? আত্ম-হত্যা—বাতুল, বিশ্বপ্রলয়, যাহাব ক্রীড়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মৃত্যুতে তিনি কি বিচলিত? সেবা—যাহাব ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি, ধাতার কিসের অভাব? সেবক মহামাতৃসেবায় নিজেই ধন, মার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সেবা করেছো, মাব প্রোধজনবৃদ্ধিতে। অনন্ত মাকে সান্ত্ব কবেছো, দেবীজ্ঞানে পিশাচী পূজা কবে। নি? পিশাচীপূজকের দৃষ্টি দেবীদর্শনে অসমর্থ। যাও, এই দণ্ডে—বিশ্ববাদী মায়েব ছেলে—তানের সেবা কর; শরীর মন প্রাণ এক কবে, সন্মোহন মায়েব অঙ্গে তাবা, এ দূত বুদ্ধি-যোগে সেবা কব, তাতে দৃষ্টি বিমল হবে, তখন তুমি মার দর্শনে অধিকারী।”

ক্রমে শঙ্করনাথের বাহুসংজ্ঞা আসিল। দেখিলেন, তিনি ভূপতিত; মৃতক পার্শ্বতীদেবীর চরণোপরি। দেবীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কল্পিতকলেবরে মন্দির ত্যাগ করিলেন।

\* \* \* \* \*

চল্লিশ বৎসর অতীত হইবাছে। এত কাল তিনি দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, দরিদ্র ধনী মূর্থ জ্ঞানী নির্বিশেষে জগজ্জনের কাষমনোবাক্যে সেবা করিতেন। যেখানে যাইতেন, সংসাবহুঃখতাপিত নরনারী পবমাজীব স্বরূপ তাহার সঙ্গে—পবমা শান্তি লাভ করিত। জবাগন্ত এখন তাঁর বয়স অশীতি বৎসর। শেষ দিন সন্নিহিত বুঝিয়া আদরের পার্শ্বতীদেবী দর্শনে তিনি বিশেষ উৎসুক হইবাছেন।

যে শিখরে পার্শ্বতীদেবীর মন্দির, তাহার নিয়ে নানাপ্রশস্ত তটিনী প্রবাহিত। শঙ্করনাথ কিরিয়া আসিবাছেন; নদীতে স্নান করিলেন। বীরে বীরে পাহাড়ে উঠিলেন। দেখিলেন, মন্দির ভগ্নাবশিষ্ট, চতুর্দিকে জঙ্গল, বগ্ন পশুর আবাস। কুরুসহকায়ে লতাগুল্য কণ্টক বনের মধ্য দিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ভিতরে প্রবেশ করিলেন—প্রতিমা বহুখণ্ডে বিভক্ত পড়িয়া বহিয়াছে। সাফটাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আর উঠিলেন না।

যোদৃষ্টি থাকিলে দেখিতাম,—শঙ্করনাথ চিবাবিস্তারিত শ্রীপদে সমাধিষ্ট।  
“পার্বতবাসী”।

## নূতন জাপান।

( স্বামী সদানন্দ )

হংকং এৰ কথা আপনাকে পূৰ্বে লিখিছি। কলিকাতা হতে হংকং পৰ্য্যন্ত আপকাৰ কোম্পানিব ষ্টিম জাহাজ যাতায়াত করে। হংকংএ জাহাজ বদল হল। যে জাহাজে চডলাম, তাহাৰ মাত্ৰে জাপানি নিশান। বড জাহাজ, মাল ও যাত্ৰী বোকাই। ষ্টিম জাহাজেৰ নাম আকি মাক, খোদ জাপানি, নিপন ইউসেন কেইদা নামে জাপানি জাহাজ-ওয়ালাৰ ইহাৰ মালিক। এখানি তাৰেব সৰ্বাপেক্ষা বড জাহাজ। জাপানেৰ মেল ( Mail ) ইহাৰাই লইয়া যায়। এই কোম্পানিৰ ষ্টিম ও পাল জাহাজ চীন, ফিলিপাইন, বোম্বাই, ইউৰোপ, আমেৰিকা ও অষ্ট্ৰেলিয়া সৰ্বত্ৰ গমনাগমন করে। জাহাজেৰ অফিসাৰ—কাপ্তেন, মালিম ও ইঞ্জিনিয়াৰ ইউৰোপীয়, অগ্ৰাণ কৰ্মচাৰী ও খালাসী জাপানি। কাপ্তেন সাহেব জাভে ডাচ ( Dutch ), জাপানি ভাষায় কথা কন, অনেক কাল জাপানেৰ চাকরি কৰিছে। জাপানেৰ অনেক বড জাহাজে এই বকম বিদেশী কাপ্তেন ও ইঞ্জিনিয়াৰ আছে। চম্ভিশ বৎসৰ পূৰ্বে জাপানেৰ না ছিল একখানি ষ্টিম জাহাজ বা পাল জাহাজ, না ছিল দুব সমুদ্রে সদাগরী। সামাগ্ৰ বাণিজ্য ব্যাপাৰ দেশী জৰ্কেৰ সাহায্যে চীন ও কোৰিয়াৰ সঙ্গ চলত। জৰ্কেৰ গঠন ও আকৃতি সমুদ্রযাত্ৰাব একদম উপযোগী নয়। আমাদেব দেশেৰ মালদ্বীপি হাডিব মত তীব্বেৰ নিকটে চলাচল করতে পাবে। এখনো প্ৰায় বিশ হাজাৰ জৰ্ক এইকপ কাজে নিযুক্ত আছে। ১৮৭০ সালে জাপানে বিলাতি গঠনেৰ ৩৫ খানি ষ্টিম ও ১১ খানি পাল জাহাজ ছিল। অধিকাংশই ইংলণ্ড ও আমেৰিকাৰ কাছে কেনা অতি সামাগ্ৰ সংখ্যা জাপানে নিৰ্মিত হৰিছিল। এই সব নূহন ধৰণেৰ জাহাজ দেশীয লোকে চালাতে জানত না বলে, বিদেশী লোকেৰ হাতে প্ৰথমে চালাবাৰ ভাব দিতে হৰিছিল। তাৰ পৰ জাপানি গভৰ্ণমেণ্ট নৌবিদ্যালয় স্থাপন কৰে খালাসি থেকে কাপ্তিনী পৰ্য্যন্ত সমস্ত কাজ শিক্ষা দিতে লাগল। নৌবিদ্যালয়েৰ শিক্ষায় পাবদশী হলে কাজ কৰাব লাই-বেঙ্গ পায়। এ না হলে জাহাজি কাজে ভৰ্ত্তি হবাব যো নাই। দেশী

বিদেশী সকল লোকেই এখানে শিক্ষা পেতে পারে। ১৯০১ সালে প্রায় পনের হাজার জাপানি ও তিনশত জন ইউরোপীয়, জাপানি জাহাজে অফিসারী কাজ করিত। বিদেশী অফিসারের সংখ্যা এখন দিন দিন কম হয়ে আসছে। প্রথমে ষ্টিমার ও পাল জাহাজ জাপানিরা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না, কিনে চালাত। এখন বড় ষ্টিমার ছাড়া আর সমস্তই জাপানে তৈয়ারী হইছে। চৌদ্দশত ষ্টিম ও চাব হাজার পাল জাহাজ এখন জাপানি নিশান উড়াইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে। সম্প্রতি ষ্টিম তৈয়ারী করবার কারখানা স্থাপন হওয়াতে, বড় বড় ষ্টিমার ও যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণ করবার সুবিধা হইয়াছে।

একটি জাপানি বন্দরে আমাদের আলাপ হল। ইনি জাপানের সিবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কলেজের ছুটিতে ফিলিপাইন বেড়াতে গিয়াছিলেন; এখন জাপান ফিরে যাচ্ছেন। ছেলেটি একটু ইংরাজি জানে, ইংরাজি লিখবার খুব ইচ্ছা; কথা কবার সুবিধা হবে বলে আমাদের সঙ্গী হলেন। জাপান দেখতে যাকি শুনে দেশের সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা হতে লাগল। হংকং ছাড়বার তিন দিন পবে আমাদের জাহাজ ইয়াংসি নদীর মোহানার ভিতর সাংহাই বন্দরে উপস্থিত হল। আশী মাইল দূর থেকে দেখা গেল, নদীর ঘোলা জল, নীল সমুদ্রে এসে পড়ছে। ঠিক গঙ্গাসাগরসঙ্গম। সাংহাই ইয়াংসি নদীর মোহানা হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল উপরে। জাহাজ থেকে দেখা যেতে লাগল, চারিদিকে বিস্তৃত চড়া, চীনে-চাৰি লোকে চাব বাস করছে। চীনের অনেক জঙ্গি জাহাজও এই থানে রয়েছে। সাংহাইতে ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি কনসলেরা (Consuls) আছেন; তাঁরা মিলে মিশে যে আইন করেন, তাহাই এখানে চলে। প্রত্যেক কনসলের অধীনে স্বতন্ত্র পোষ্ট অফিস ও বিচারালয় আছে। জাহাজ থেকে নেমে আমরা বেড়াতে বেরুলাম; জাপানি বন্ধুটিও আমাদের সঙ্গে। সাংহাই বড় সহব, নানাবিধ ব্যবসার স্থান। এখনো শিপ পণ্টন এখানে রয়েছে কিন্তু হংকং-এর অপেক্ষা সংখ্যা কম। আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমানও অনেক রয়েছে; সিন্ধি (Sindh) সদাগরবো ইহাদের মধ্যে সঙ্গতিপন্ন। আব একটি জাপানির সঙ্গে পথে দেখা হল। ইনি আমাদের জাপানি সঙ্গীটির বন্ধু, চীনে বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ

কবে তাঁর হোটেল নিয়ে গেলেন। হোটেলটি জাপানি। পবিচাবিকা প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোক, বিচিত্রবেশধারিণী, সহাস্যবদনা, বিনীত, ভদ্র ও সুকৃতিসম্পন্ন। প্রবেশ মাত্র মাথা নিচু কবে অভিবাদন করলে। এইটি জাপানি শিষ্টাচার। কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি ইতর কি ভদ্র, পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সঙ্গে কার্যগতিকে দেখা হলেই এইরূপ অভিবাদন কবে থাকে। হোটেলের ঘর দ্বার পবিত্রার পবিচ্ছন্ন, টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজান। শ্রান্তি দূর হলে তাপ পব জল পাবার দিয়ে গেল। একটা কাটের বেকাবীতে কতকগুলি বং কবা কেক ও খান কত পাতলা কাগজ ভাঁজ কবা। পবিবেশনকারিণী কাগজগুলি খুলে টেবিলে পেতে দিয়ে কেক-গুলি ফুলের মত করে সাজিয়ে দিলে। কার সামনে নীলফুল কাব বা লাল ইত্যাদি। কেক খেয়ে বোধ হল ঘেন খই খাচ্ছি। আহাবেব সময় আর এক ঘবে নিয়ে গেল। লম্বা টেবিলের চাবি দিকে চেয়ার পাতা। টেবিলের উপর আর এক খানি কবে কাটের ছোট চৌকি। তাতে কতক গুলি বাটি সাজান। একটাতে ভাত, একটাতে মাছের ঝোল, এক খানি বেকাবীতে মাচ পোড়া, একটাতে ডালের বুবি ভাজাব মত চিংড়ি দিয়ে ঝোল, মুলোর চাটনি আব কাটাচামচেব বদলে, দুটি কাটি, ইহাই জাপানি আহার। সাধারণ জাপানীবা কোনরূপ মাংস আহাব কবে না। ব্যঞ্জনে মসলা নাই সুতরাং আমাদের দেশেব লোকের আবাদনে ইহা বিস্বাদ। অতিথি সংকাব ও সদালাপ শেষ হলে আমরা জাহাজে ফিবিয়া আসিলাম। সাংহাই পবিত্যাগ কবিয়া তিন দিনের পর আমাদের জাহাজ জাপানে পৌঁছিল।

চারটি বড় দ্বীপ লইয়া জাপান। উত্তরে থোকেন্দো, মধ্যে নিপন, দক্ষিণে কিউসো ওসিককু। নিপন ও কিউসোর মধ্যে একটা অপ্রশস্ত প্রণালী, কোথাও ৪৫ মাইল কোথাও বা এক মাইল বিস্তৃত। এই প্রণালী জাপানের 'ভিতর সমুদ্র' প্রবেশ করিবার পূর্বদ্বার। 'ভিতর সমুদ্র' প্রশান্ত মহাসাগরের অংশ নিপন ও কিউসু ওসিককু দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত। ইহা দীর্ঘে ২৪০ মাইল, প্রস্থে ৪০ মাইল। পূর্বে পশ্চিম ও দক্ষিণে সুদূত দুর্গ-রক্ষিত তিনটি অপ্রশস্ত প্রণালী দ্বারা প্রবেশ কবা যায়। জাপানের সমস্ত দক্ষী জাহাজ ও নৌবল এখানে নিরাপদে থাকতে পারে এবং সুবিধামত বহির্গত হয়ে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করতে পারে। এরূপ নিরাপদ

পোতাশ্রয় (Harbour) অপর কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের জাহাজ 'ভিতর সমুদ্রের' পূর্ক দ্বার দিয়া প্রবেশ কবলে। উভয় তীরে উচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় তোপসাজান, সাতটি অভেদ্য দুর্গ জলপথ রক্ষণ কব্ছে। বাম দিকে সিম্নোসিকি বন্দর, দক্ষিণে মোজি। ১৮৬৩ সালে—জাপানের তখন পুৰাতন আমল—এই স্থানের অর্দ্ধস্বাধীন জমিদার (দেইমো) মার্কিন, ফরাশি ও ডাচদিগেব ৪খানি জঙ্গী জাহাজ 'ভিতর সমুদ্রে' প্রবেশমুখী দেখে প্রণালীপথ আটক করেন। বিদেশীবা পশ্চাৎ-পদ না হওয়াতে যুদ্ধ আবস্ত হল। দেইমোর কামানের মুখে অনেকে আহত হন। তাৎকালিক দেশের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা সোগুয়ের কাছে (যথার্থ রাজা মিকাদো তখন শাসনক্ষমতাহীন) ক্ষতিপূরণের জ্ঞপ্তি জানান হল। বিফলমনোবধ হওয়াতে ইংরাজ বাহাদুর মোডল হয়ে আঠাব খান জঙ্গী জাহাজ জড় করে সিম্নোসিকিতে তোপ চালাতে লাগলেন। জাপানের হার হল। জাপানকে শান্তি দিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়েচে বলে, ত্রিশ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণের দাবি করে, সকলে টাকা আদায় করলেন। মার্কিন বুঝে পাবলেন,—একাজটা গর্হিত হয়েচে। প্রাপ্ত টাকার আসলটা জাপানকে ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু অগ্রাঙ্ক মহাপুরুষেরা স্তম্ভ স্তম্ভ নিঃশব্দে হজম কবলেন। এই ঘটনা ছাড়া সিম্নোসিকি বন্দর আর একটা কাবণে খ্যাতি লাভ কবেচে। ১৮৯৫ সালে চীন জাপান যুদ্ধের পব, চীনের বুদ্ধ মহামন্ত্রী লি হাং চাং, এইখানে চীন জাপানের সন্ধি প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হলে একজন জাপানি তাঁহাকে হত্যা কবতে উদ্যত হয়েছিল।

মোজিতে জাহাজ লাগিল। আমবা জাপানি বন্ধুর সঙ্গে তীরে উঠিলাম। নগরটি পাহাড়ের উপর। এখানে মাথুবে টানা গাড়ি জিনরিক্সর কেবল ব্যবহার। গাড়িগুলি দেবদারু কাঠের, কাল রংএর বার্নিস দেওয়া ও সোনালির নানাপ্রকার চিত্র করা। জিনরিক্স চড়ে এখানকার সিমেন্টের কারখানা দেখতে যাওয়া গেল। আমাদেব জাপানি সঙ্গী পিতৃ-বন্ধু ইহার স্বত্বাধিকারী। কারখানায় তাঁব দেখা না পেয়ে বাটীতে উপস্থিত হলাম। জিনরিক্স হতে যেমন নামিতে যাওয়া, পায়ের দমকে গাড়ির বোম হুট হুট করে ভেঙ্গে গেল। আমি বেজায় অপ্রতিভ, কিন্তু গাড়ি-ওলা না রাম না গঙ্গা, কোন ক্রপ অসন্তুষ্টি ভাব প্রকাশ করলে না।

এটা কি আপানি শিষ্টাচার না বিদেশী দেবে ক্ষমা ক'লে? বাটাতে প্রবেশ ক'বামাত্র গৃহস্থানী ও তাঁহার পত্নী অগ্রসর হয়ে মাথা নিচু করে শাস্তবদনে অভ্যর্থনা ক'লেন। এখানকার সমস্ত বাড়ি কাটের। সকল বাড়ীর সঙ্গে একটু কবে বাগান, নানারকম ফুলগাছ দিখে সাজান।

## সাবিত্রী ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

পৌর্ণমাসী স্নানকর উদিলে আকাশে

অস্থির সাগর যথা ; অথবা যে কালে,

গোপবেশে সমুদ্রি, যশোদার ঘবে

রাধানাথে হেরিবারে, ব্রজবাসিগণ

ধাইলা আলোড়ি পুৰী ; সেই মতে আজি

জনশ্রোত বিচঞ্চল রাজহর্ষ্যদ্বাবে ।

সুধাংগব রূপালোকে চকোব যেমতি

স্থিবনেত্র মুগ্ধমন,—তেমতি সেরূপ

বাবেক হেবিছে যেই, নয়ন তাহার

আর না ফিবিতে চাহে, অযসেব হুচী

চুম্বকে আকুউ হয়ে অবরুদ্ধ যেন ।

ঘবে ঘরে বাজে শঙ্খ, কুলনাবী যত

তুলে উলু উলু ধ্বনি, মঙ্গলসঙ্গীত ;

বাজে বীণা বেণু আদি ; যুবতী যতক

গাহে গীত, নাচে রঙ্গে, ছডায় চৌদিকে

ধান দুগা যব গুশ লাঙ্গ মুদ্রা আদি ।

গৃহচূড়ে প্রতি ঘর উডিল পতাকা

—বিদ্যামতা—সতত চঞ্চল সমীরণে ।

ঘারে ঘারে শোভে মালা, চিকণ-গ্রন্থিত

বিবিধ কুশুমকুলে ; মঙ্গল কলস,

মঙ্গল পল্লবরাজি—কমলমণ্ডিত ।

রাজপথে ছুই ধারে তরঙ্গ-বিলমে  
 লম্বিত কুসুমমালা তরু শাখে শাখে ।  
 তরুশিবে উড়ে ধ্বজ আনন্দে অস্থির ।  
 কুসুমমণ্ডিত বর্ষা ; সৌরভিত দিক্  
 ধূপ ধূনা পরিমলে ; ধ্বনিত গগন  
 বাদ্যরোলে, গীতশব্দে, জনকোলাহলে ।

সপ্তস্বীপ হতে আসি বাজ্রমণ্ডলী  
 লয়ে ধন রত্নবাজি, বাজেখব পদে  
 দেব ভেট ; সসন্ধান আমন্ত্রণ কবি  
 ভুষেন নৃপতি সবে, সুধান সাদবে  
 বাজ্রের মঙ্গলবার্তা । দীন দুঃখী যত,  
 সমাদবে নৃপমণি মুক্ত ছুই কবে,  
 বিতবেন তা সকলে আকাজ্জনা অধিক  
 ধন বস্ত্র বস্ত্র ভূষা খাদ্য বহুবিধ ।

হেন মতে পুৰবাসী তিন দিন ধরি  
 রহিলা আনন্দে মগ্ন, আখিনে যেমতি  
 বহে বঙ্গ স্রুথে মগ্ন, আসেন যে কালে,  
 রূপাময়ী, রূপা কবি ভকতসন্তানে ।

জননীর মেহরসে হইয়া শিক্ষিত,  
 জনকের আনন্দের বর্ধনের সহ  
 বাড়িতে লাগিলা কল্যা ; সাবিত্রী তাহার,  
 সাবিত্রী রাখিলা নাম জগৎ-মঙ্গল ।

শুভদিনে শুভক্ষণে আসি কুলশুদ্ধ  
 আরম্ভিলা বিদ্যাভ্যাস ; অদ্বুত প্রতিভা !  
 যখন যে শিক্ষা গুরু কবেন প্রদান  
 অমনি অভ্যাসগত ; রূপণ যেমতি  
 অতি বয়ে রত্নরাশি করে সুসঞ্চিত,  
 তেমতি বালিকা অতি বয়সের সহিত  
 জ্ঞানধন হৃদিকোবে লাগিলা সঞ্চিত ।  
 জননী ভাবতী হেন দিলা শিক্ষা তায়



দীন হীন জনে দয়া, জীবন উৎসৃজি  
 পরহিতে হতে ব্রতী ; জগৎ-পিতার  
 নিত্যপূজা—জগতেব হিতবাঞ্ছা কবি,  
 সমিতে দ্ববস্ত বিপু, সদা ভক্তিমতি  
 দেব দ্বিজ্ঞে গুরুজনে, কাক কৰ্ম্ম যত ।

( জয়শঃ )

## ঋতু-নিদাঘ-সংবাদ ।

( বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বনে )

ঋতু গুরু, নিদাঘ শিষ্য—গৃহী। গুরু শিষ্যবাড়ী গিয়া হাজির।  
 আজ কাল যেমন কুলগুরুকে বাড়ী আসিতে দেখিলে শিষ্য অর্থ দিবার  
 ভয়ে জড় সড় হন, নিদাঘ তা হইলেন না। কাবণ, ইনি অতিথি সাজিয়া  
 ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন। আবও অস্ত্র কাবণ ছিল; তা পবে প্রকাশ  
 পাইবে।

অতিথি ত অর্থ নিয়ে হাত পা ধুয়ে আসনে বসুন। নিদাঘ বলেন,  
 তবে আর কি? কিছু উপযোগ ককন।

অতিথি। খাবো তো বোলুছো বাপু। কি খাব বল দিকি? বলি,  
 ভাল ঝাঁট টাঁট আছে কিছু? ডাল চকুড়ি খেয়ে খেয়ে ত বাবা,  
 অকচি জন্মে গেছে।

নিদাঘ। মশায়, সুন্দর আতপ চালেব ভাত, গব্য দ্বত, ডাল, কপিব  
 তরকারী, পিটে, পায়েস প্রভৃতি আছে। যা ভাল লাগে, আহার করুন।

ঋতু। না বাবা, ও সব চলবে না। মাংসের পোলাও কালিষে, পুরী,  
 রাবড়ী, কচুৰী, বরফী খাওয়াতে পাব,—তবে তোমাব অতিথি হই।  
 না হলে বাপু চলুন।

এখনকাব গৃহস্থ হলে অতিথির এতটা বেয়াদবি সহ করা দূরে থাক্,  
 অতিথির—একেবাবে অপরিচিত অতিথিব—ও কথাগুলো মুখে  
 আনিবারই ভবসা হোতো না। কিন্তু নিদাঘ একজন অতিশয় ধৰ্ম্মপরা-

যশ লোক ছিলেন। তিনি অমনি গিরিকে ডেকে অতিথি বা ফব-  
মাজ কোবলেন, সব যত শীঘ্র সম্ভব তৈয়ার কবাইয়া অতিথির তৃপ্তি  
সাধন কোরলেন। আহাঃ তাহ্মলচর্কণ, তামাকুসেবন প্রভৃতি বধ্য-  
রীতি হইল। তখন ভক্তরাজ নিদাঘ হাত ঘোড় কবে জিজ্ঞাসা করলেন,  
প্রভু, বেশ তৃপ্তি হয়েছে ত? আপনার বাড়ী কোথা? কোথায় বাছেন  
কোথেকেই বা আসছেন?

তখন ঋতুকে একটু খানি গম্ভীর দেখা গেল—যেন সে মানুষ নয়  
—তিনি এক দিবা লেক্‌চাব জুড়ে দিলেন,—“ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে  
তৃপ্তি কথ্য কি বদ্‌চো? যাব খিদে হয়, তাবই খেলে তৃপ্তি হয়।  
আমাব খিদেই হয়নি। তৃপ্তি আবাব হবে কি? ক্ষুধা তুফা ত দেহের  
ধর্ম; তা ত আমাব কখন নেই। খিদে আমাব মোটেই হয় না। তাইতে  
আমাব সদাই তৃপ্তি রয়েছে—আনন্দের ত কমতি দেখতে পাইনি।  
তুষ্ট, শান্তি এগুনো চিন্তেব ধর্ম। অতএব তুমি তৃপ্তি হয়েছে কি না, চিত্তকেই  
জিজ্ঞাসা কবতে পার। তুমি জিজ্ঞাসা কোবছিলে, আমাব বাড়ী কোথা,  
কোথা যাব, কোথেকে আসছি,—এসব কথাব আব জবাব কি দোবো?  
আমি ত সেই আকাশবৎ সর্বব্যাপী পুরুষ—তোমাব প্রশ্নগুনোই যে  
ভুল হচ্ছে। আমি ত কোথাও যাই না—কোথেকেও আসিও না—এক  
জায়গায় বসে আছি, তাও নয়। আরও দেখ, তুমি বা অপর কেউও  
এবকম ক্ষুদ্র নও, তোমাব সর্বব্যাপী। তুমি যে ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্রমন বোলে আপ-  
নাকে জ্ঞান কোবচো, তা ত তোমাব মাজে না—তুমি সর্বব্যাপী, আপনাকে  
ব্রহ্ম বলে জ্ঞান কব। যদি বল মশায়, আপনি বেশ এখন পেটটি ঠাণ্ডা  
করে লেক্‌চার ঝাঙ্কছেন, নিজেব ত দিবা পোলাও কালিয়ে না হলে  
খাওয়া হয় না। তা বাপু, আমি সত্য বদ্‌চি। আমি ভাল খাবার দাবার বড়  
তোষাক্কা বাখি না। ভাল খাওয়াব কথা বলে তুমি ভাল মন্দ যে কোন  
ভেদ নেই, একথা বল কিনা, তাই তোমাব জ্ঞান জ্ঞাবাব জন্তে তোমাকে  
পোলাও কালিয়েব কথা বলেছিলুম। আমি তোমাকে ভাল জিনিষ খেতে  
বারণ কচ্চি না। কিন্তু ভাল খাবাব জন্তে যে একটা ছটফটানি, সেটা  
ছেড়ে দিতে হবে। দেখনা, পেট যখন আকর্ষণ পূর্ণ হয়েছে, সে সময়  
যদি খুব ভাল জিনিস নিষে এসো, তাতে বমি আসে। আবাব যখন  
বড় খিদে পেয়েছে, তখন দুই ভাত পেলেই অমৃত জ্ঞান হয়। খাবার

জিনিষ গুলো আর কি ? কতকগুলো পরমাণুব সমষ্টি মাত্র তো । এই রকম মনে করে সব বিষয়ে সমতা ভাব অবলম্বন করা দবকাব । সমতা ভাব এলেই মুক্তি । ‘ইহেব তৈজ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতঃ মনঃ ।’ ”

এরকম লেকচার শুনলে আমবা লাটি নিয়ে তাড়া কবতুম, সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের উপাখ্যান বলছেন, ইনি এই জ্ঞানের উপদেশ শুনে করজোড়ে প্রণাম কোবে জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে, আমাবে বলতেই হবে । তখন গুরু আত্মপরিচয় দিবে শিষ্যকে জ্ঞানাভ্যাস কবতে উপদেশ দিবে সবে পড়লেন ।

এ দফায় গুরু শিষ্যেব কাছে তোকা খাঁট মেবেছিলেন, কিন্তু আব একেবারের ঘটনা শুনুন । এক্ষেত্রে শিষ্য গুরুব ঘাড়ে চড়েছিলেন । অনেক দিন বাদে আবাব গুরু শিষ্যে দেখা । নিদাঘ ফুল দুর্দাদি পূজাব উপকরণ যোগাড় করে বাড়ী ফিবচেন, এমন সময় ঐ দেশেব রাজা বেরিযেচেন । আর বাজ্যেব লোক বাজাকে দেখবাব জন্তে বুঁকে পড়েচে । নিদাঘ ব্রাহ্মণ, ভাল মানুষ বেচাবা । এক ধারে সবে দাঁড়িয়ে রযেচেন, রাজা চলে গেলে ভিড কম্লে বাড়ী যাবেন । এমন সমবে ঋভু ছয়-বেশে হাজিব । ঋভু নিদাঘেব কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম কোবে বোল্লেন, বামুন ঠাকুর, এ বকম একান্তে এক ধাবে দাঁড়িয়ে যে ? নিদাঘ বোল্লেন,— দেখ্চেন না, রাজা আস্চেন—লোকের বেজায় ভিড় ।

ঋভু । কোন্টী রাজা, আমাকে দেখিয়ে দেবেন কি ?

নিদাঘ । ওই যে পাহাড়ের মতন হাতী দেখ্চেন, ওরই উপর যিনি বসে আছেন, তিনি বাজা ।

ঋভু । কোন্টী হাতী, কোন্টীই বা রাজা, আমাকে ভাল কোরে বুঝিয়ে দিন না ।

নিদাঘ । হাতীব পিটে মানুষ চড়ে থাকে, এ কথাটা কে না জানে, মশায় ? ওই নীচে যেটা, সেটা হাতী, আর ওর উপরেই রাজা বসে আছেন ।

ঋভু । বামুন ঠাকুর, রাগ কববেন না । আমি আপনাব কথা এখনও বুঝতে পাচ্চি না । নীচ উপর কাকে বলে, ঠাকুর ?

ঋভুর এই কথা বলা আব নিদাঘেব তাঁর ঘাড়ে চোড়ে বসা । বোল্ন্তে লাগ্লেন—এইবাবে বুঝতে পাচ্ছেন,—আপনি যেন হাতী, আপনি নীচে

বয়েচেন আর আমি আপনার উপর চড়ে বসে রয়েছি, আমি যেন রাজা।

ঝড়! তাই যদি হয়, তবে আপনিই বা কে আর আমিই বা কে? বুঝিয়ে দেবেন কি?

তখন নিদাঘেব সন্দেশ হোলো—লোকটা কে? তাড়াতাড়ি নেবে গুণ্ডর পা ধরে বললেন—কমা কব্বেন—আপনি নিশ্চয় আমার গুণ্ড। আর কাহারও মন এমন অস্থিতবিচারপরায়ণ নয়।

এইবারে গুণ্ডপদেশে নিদাঘ বিশেষরূপে তত্ত্বচিন্তা কোরতে লাগলেন। শেষে সমস্ত ভূতকে তিনি আত্মার সহিত অভেদ দেখতে লাগলেন। তাব কোন ভেদজ্ঞান রইল না।

আমাদের গুণ্ডবা শিষ্যের জ্ঞান বা ভক্তি উৎপাদনের দ্রষ্টা কি যত্ন কোব্বেন?

## স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।

জর্জ ডবলিউ হেলের বাটী,

৫৫১, ডিয়ারবর্ন এভিনিউ,

চিকাগো।

২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯৪।

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে। ‘ইন্সটিটিউট’ পত্রিকার সমালোচনা,—সমুদয় আমেরিকাবাসীর তাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে ‘নীলনাসিক প্রেসবিটেরিয়ান’দের কাগজ বলে। এ সম্ভ্রদায়ী খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকাবাসী সাধারণ, তাহার মধ্যে প্রবাহিতই অধিকাংশ, আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। এইরূপ

কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া পত্রিকাসকল যে খ্যাতিনামা হইতে চায়, এই কৌশল এখানকার সকলেই জানে, সুতরাং এখানকার লোকে উহা কিছুই গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভারতীয় মিশনবিগণ যে ইহা হইতে অনেক সুবিধা পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও,— ‘হে ইহুদী, লক্ষ্য কর, তোমাব উপর এখন ঈশ্বরের বিচার আসিয়াছে।’ তাহাদেব প্রাচীন গৃহেব ভিত্তি পর্য্যন্ত এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে আর তাহার পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। মিশনারিদের জন্ত অবশ্য আমাব দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে আসাতে তাহাদের ভাবতে আসিয়া বড়মানুষী করিবার চাঁদা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান প্রধান পুরোহিতগণের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাই হোক, যখন পুকুরে নামিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই জ্ঞান করিব। আমি তাহাদের সম্মুখে আমাদের ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটা সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই মুখে মুখে। আশা করি, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে পুস্তকাকারে সেগুলিকে গ্রথিত করিতে পারিব। ভাবত হইতে কোন সাহায্যের আমার আবশ্যক নাই, এখানে আমার যথেষ্ট আছে। বরং তোমাদের নিকট যে টাকা আছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ কবাও। আর চারিদিকে উহার প্রচার কব। ইহাতে আমাদের জাতীয় মনের সম্মুখে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উদ্ভিত রাখিবে। আর সেই কেন্দ্র-বিদ্যালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দিকে শাখাবিদ্যালয় সকল সংস্থাপনকব কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সহায়তা লাভের জন্ত চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কব। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর। বামুনাথ বা যে কোন নাথকে পাও, তাহার নিকট হইতেই সহায়তা জাহেব চেষ্টা কব। এই কার্য্যের জন্ত টাকা ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে থাক। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনাটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য করিতেছি। এখানে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট যোগাড় হইয়া যাইবে। আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে,

এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভার-  
তান্তর্গত বা ভারতবর্ষস্থিত মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারশি সৃজন করি-  
য়াছেন, তাহা অতি হীন, আত্ম দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার; তার  
পর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত বা উত্তীয়া যাওয়া  
উচিত, জ্ঞানলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত বা অমুচিত, এ বিষয়ে  
আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। চিন্তা ও কার্যেব স্বাধীনতাই  
জীবন, উন্নতি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই,  
সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যস্তাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালীবদ্ধ মত প্রচলিত  
থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি  
বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্যে বাধা দেয়,  
(অবশ্য বতর্কণ পর্য্যন্ত না উহা অপরের অনিষ্ট কদে) তাহাই পৈশা-  
চিকভাবাপন্ন এবং তাহার পতন অবশ্যস্তাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটা চক্র প্রব-  
র্তন করিব, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্ববাশি বহন  
করিয়া লইয়া যায়। তার পথ প্রত্যেক নরনারী আপন আপন অদৃষ্ট  
আপনিই গঠন করিয়া লইবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এবং অজ্ঞাত  
জাতির জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন,  
তাহা তাহারা ভাবুক। বিশেষতঃ তাহাদের জানা উচিত, অপরে কি করি-  
তেছে। তার পর তারা কি করিবে, আপনারাই স্থির করুক। রাসায়নিক  
দ্রব্যগুলি আমাদেরকেই একত্রে মিশাইতে হইবে, উহা কোন বিশেষ  
আকার ধারণ করিবে প্রকৃতির নিয়মে। আমেরিকান মহিলাগণ সম্বন্ধে  
বক্তব্য এই—তাহারা আমার খুব বন্ধ। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমে-  
রিকায়। তাহাদের দ্বারা জন্ম আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ  
করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাহাদিগকে আশীর্বাদ করুন। এই দেশে  
মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্যে অতি-  
শয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না। এখনকার  
মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় কার্যের জীবন-স্বরূপ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অল্পগ্রহপূর্বক বলিবে, আমি তাহার ফনোগ্রাফের  
কথা বিস্মৃত হই নাই, তবে এডিসন ইহার একটা নূতন সংস্কার করি-

গাছেন। যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রম করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢ়ভাবে কার্য্য কবিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাষে লাগো। আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যেব এই মহান সার কথা মনে রাখিবে,—জনসাধারণের উন্নতি বিধান—ধৰ্ম্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্ত কিছুই করেন নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যাব উপরে কোন জাতিব অদৃষ্ট নির্ভর কবে না, জাতিব অদৃষ্ট নির্ভর করে জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পাব আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধৰ্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবাব জন্তই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যেব প্রসূতি। এগিযে যাও, এগিযে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরীব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের নূলমন্ত্র। এগিযে যাও বীর-হৃদয় বালকগণ।

তোমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।

## জ্ঞান ।

( শ্রী বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিত । )

বঙ্গাল দেশে আমরা জ্ঞানের কথা শুনিতে ভয় পাইয়া থাকি। মুক্তি লাভ হইলে কিছুই থাকিবে না, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভাল বাসি, জ্ঞান গুরু মার্গ, জ্ঞানের কচকচিতে কি হইবে, ইত্যাদি কথা আমরা প্রায় শুনিতে পাই। এমন কি, কাহাকেও কাহাকেও লিখিতে দেখিয়াছি, সোহহং-

বাদী হইলে স্বেচ্ছাচার হইতে হয়। কেহ কেহ আবার জ্ঞানমার্গ সন্ন্যাসীর  
অনুষ্ঠেয় বলিয়া জ্ঞানকে সংসার হইতে নির্দাসিত করিতে চাহেন।

আমাদের দেশে জ্ঞানের বহুল চর্চা নাই বলিয়াই যে এই সমুদয়  
কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে বাহার সম্বন্ধে  
যত অমভিজ্ঞ, সে তাহাকে তত সন্দেহেব চক্ষে দেখিয়া থাকে। এক্ষণে  
বুঝিতে চেষ্টা করা যাক, জ্ঞান বলিতে কি বুঝা যায় এবং তাহা সাধনের  
উপায়ই বা কি?

জ্ঞানীদেব মত এই,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু আর সব অবস্তু। এই  
তাহাদেব মূল মত। ইহাবই উপর তাহাদেব অন্যান্য মত প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে  
এই মত একটু পবিষ্কার কবিয়া বুঝিবাব চেষ্টা করা যাউক।

এই কাস্ত-ভীষণ প্রকৃতির লীলা, এই বিচিত্র-বৈষম্যময়-প্রকৃতিশাণী  
নবনারীর বিচিত্র সঙ্গিলন স্বরূপ সমাজ-সংহতি, এ কি? এসকল কোথা  
হইতে আসিল? ইহাব আদি কোথা, অন্তই বা কোথা?

দেখিতেছি, জ্ঞাতে নানা প্রকাব সুখ আছে, আবার দুঃখও আছে।  
কেহ কেহ ক্রমাগত সুখ সম্ভোগ কবিয়া চলিয়াছে, কেহ আবার যেন  
দুঃখভোগেব জগ্ৰই স্ফট হইয়াছে আবার কেহ কেহ কতক সুখ কতক বা  
দুঃখ ভোগ কবিতেছে। মনীষী ব্যক্তিগণ ইহার রহস্য আবিষ্কারেব চেষ্টা  
কবিলেন। তাহাবা দেখিলেন, একটু ভিতরে প্রবেশ কবিলে দেখা যায়  
যে, বাস্তবিক সুখী দুঃখী বলিয়া কোন ভেদ নাই, কারণ, সকলেই বাস-  
নানলে দগ্ধ। সুতরাং যাহাকে আমরা দুঃখী বলিতেছি, তাহাকে সাংসা-  
রিক ভোগসুখ অধিকতর পবিমাণে দিলেই যে সে সুখী হইবে, তাহা  
কখনই নহে, তাহাব দুঃখ কোন যত্নেই ঘুচিবে না।

এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে। কোন ব্যক্তি দশ টাকা মাহিনার এক  
চাকর কবিত। তাহার বাড়ীর পরিবারেরা তাহাকে সর্বদা টাকা পাঠাও, টাকা  
পাঠাও লিখিয়া উদ্ভ্যক্ত করিত। সে নিজ খরচের জন্ত ৫ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট  
বাটিতে পাঠাইয়া দিত। ক্রমশঃ তাহার সততা ও পরিশ্রমের গুণে ৫  
টাকা করিয়া মাহিনা বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্রই ৭৫ টাকা বেতন হইল। সে  
কখনও নিজ খরচের জন্য ৫ টাকার অধিক রাখিত না। উত্তরোত্তর বাড়ীতে  
অধিক টাকা গেষেও বাড়ী হইতে চিঠি আসিবার সময় প্রতিবারেই  
লেশা থাকিত, এই খরচে এখানে চলছে না। ৭৫ টাকা পাঠাইলেও ঘর



বাড়ী হইতে ঐরূপ পত্র আসিল, তখন তাহার মনে সহসা এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে একখানি কর্ণত্যাগপত্র লিখিয়া লইয়া আফিসে গিয়া হাজির। সকলে তাহার কর্ণত্যাগপত্র দেখিয়া বিস্মিত হইল। আফিসের সাহেবেরা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিত, তাহাকে অতিশয় কর্ণঠ ও বিধানী বলিয়া জানিত। তাহা বা মনে কবিল, এ বাস্তব আরও কিছু অধিক বেতন চায়। তাহার তাহাকে অধিক বেতন দিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু সে কোন মতেই আর চাকরী করিতে রাজি হইল না, কেবল বলিতে লাগিল, আমাকে লক্ষ টাকা মাহিনা দিলেও আমার চলবে না। তখন সকলে তাহাকে উন্নত স্থির করিল।

এটা নিতান্ত গল্প নহে; আমাদের জীবনে প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাইতেছি। এই অভাব যেমন দরিদ্রের কুটারে, তেমন ধনী প্রাসাদেও বিদ্যমান। ইহা দেখিয়া মনীষীগণ হির করিলেন, আমাদের নানারূপ দ্রব্যের অভাব বোধ হইলেও অভাব বাস্তবিক কোন দ্রব্যগত নহে, অভাবের অভাব না হইলে নিস্তার নাই, নিবৃত্তি নাই। এই ভাব হইতেই ত্যাগ, বৈরাগ্য বা বিবেকের উৎপত্তি। ইহা ইতিহাসে ও সংসাবে নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা।

এখন আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। এখন কিরূপে সম্পূর্ণরূপে এই অভাব স্থিতির মূলোচ্ছেদ করা যায়, তাহা চিন্তা করা যাক। জানিগণ দেখিলেন, আমরা চেষ্টা ও সাধনা বলে যখন অভাবকে মত ইচ্ছা কমাইতে পারি, তখন অভাব এক মানসিক স্থিতিবিশেষ, সন্দেহ নাই। এখন তাঁহারা দেখিলেন, এই অভাব কিসের অভাব? কোন ভাবপদার্থ মূলে না থাকিলে কখন অভাব শব্দই আসিতে পারে না। অতএব আমাদের স্বরূপ 'ভাব' বা অস্তিত্ব বা পূর্ণতা। অভাব ইহাবই উপর যেন যেষের জায় পড়িয়া ভাব পদার্থকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। যখন আমি ভাবস্বরূপ, তখন আমার কোন রূপ সুখ দুঃখ নাই, আমি যখন পূর্ণ স্বরূপ, তখন আমি খণ্ড কখনই হইতে পারি না। সুতরাং এক আমিই আছি, আর কিছু নাই। আর এই যে অভাব বোধ, ইহাও আমি অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি, জানিতে না পারিলেও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিতেছি না। এই জন্ত ইহা ইঙ্গিতালবৎ—মায়া। এই অভাবের জন্তই ধ্যান

ধারণা সমাধি, ইহারই জন্ত দানাদি সংক্রিয়া, ইহাবই জন্ত চৌর্য্যব্যতি-  
চরাদি অপকর্ম্ম আবার ইহারই জন্ত নিদ্রা আস্ত্র প্রভৃতি। অতএব  
এই অভাব ত্রিগুণময়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইহার ত্রিবিধ বিকাশ। জ্ঞান-  
পদার্থ এই ত্রিবিধ বিকাশের অতীত—ত্রিগুণাতীত। মানুষ বা অজ্ঞ জীবের  
বিচিত্র চেষ্টাময় কার্য্যকলাপ বা প্রকৃতির অত্যন্ত দীর্ঘা, সমুদয়ই সেই  
অভাব হইতে উৎপন্ন। যেখানে কেবল তাব পদার্থ, সেখানে সৃষ্টি নাই,  
বিকার নাই, চেষ্টা নাই। এই তাব পদার্থই ‘আমি’ ‘তুমি’ রূপে ধ্বংসঃ  
বিভক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক ‘আমি’ ‘তুমি’ নাই। এই তাব পদা-  
র্থকেই বলে ব্রহ্ম, অভাবকে বলে মায়া আর জীব এই ভাবাতাবের মিশ্রণ  
স্বরূপ।

জ্ঞানীর এই মত। এক্ষণে তাহার সাধনপ্রণালী কি, তাহা তাহার  
মত হইতেই সহজে বুঝা যাইবে। পূর্বে যেইঙ্গিত করা গিয়াছে, তাহাতে  
বুঝা যাইবে, বিবেক বৈরাগ্য তাহার প্রথম সাধন। সত্ত্বগুণের বিশেষ  
বিকাশ করিয়া বাহাতে রজঃ তমোগুণের তনুতা হয়, শেষে  
সুগুণ ত্রিগুণেবই বিলয় হয়, ইহাই তাহার সাধনপ্রণালী। অতএব  
জ্ঞানীর পক্ষে নিয়ন্ত্রণের কৰ্ম্মযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিব্যোগ, রাজ-  
যোগ প্রভৃতি যত প্রকার সাধনপ্রণালী আছে, তাহার মধ্যে বাহা যাহা  
তাহার সত্ত্বগুণের বিকাশের সুবিধা হয়, তাহাই অবলম্বনীয় এবং বাস্ত-  
বিক প্রকৃত জ্ঞানবাদিগণ তাহাই করিয়া থাকেন।

যেমন সকল মত বিকৃত হয়, তেমনি জ্ঞান মতও বিকৃত হইয়াছে ও  
উহার দোহাই দিয়া অনেকে নানা প্রকার অসদাচরণের বা বধেচ্ছা-  
চরণের পোষকতা করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানের কোন  
মালিঙ্গ জন্মে নাই। জগতে এক্ষণে মতও অপব্যস্ত আবিকৃত হয় নাই,  
বাহা অজ্ঞানীদিগের হস্তে পড়িয়া অসদাচরণে বদ্ব্যপেক্ষ না হইয়াছে।  
কিন্তু তাহাতে মতের কোন দোষ হইতে পারে না। এই কারণেই  
পরমহংসদের অতিবিকৃত ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের মতেও কোন দোষ দেখিতে  
পাইতেন না।

জ্ঞান কাহাকেও কস্ম ত্যাগ করিতে বলে না, বরং বলে, ‘চিন্তিত  
ওদ্ধয়ে কৰ্ম্ম’,—কৰ্ম্মের দ্বারা চিন্তাভক্তি হয়। কৰ্ম্মী যখন নানারূপ কৰ্ম্মে  
বিস্তৃতি হইয়া, যখন সে আচমনের সময় কয় গও ব্রহ্মসংসার করিব,

উত্তরমুখো বা পূর্বমুখো বসিয়া পূজা করিব, কতবার জল ছিটাইব, অম্বু-  
কের হাতে থাইতে দোষ ইত্যাদি কৰ্ম্মকাণ্ডের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত  
হইয়া বলে, এ সব কি ছেলেখেলা করিতেছি, এ সকলের অর্থ কি,  
তখন জ্ঞান বজ্রগস্তীবববে বলেন, ‘চিন্তাশূন্য শুদ্ধয়ে কৰ্ম্ম,’—তাহাই কৰ্ম্ম,  
যাহা চিন্তাশূন্যকিব। চিন্তাশূন্য যাহাতে হয়, তাহাই কব। যদি পূর্বমুখো  
বসিলে তোমার চিন্তাশূন্য সহায়তা হয়, তাহাই কব, আবার পশ্চিম-  
মুখো বসিলে যদি হয়, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই, বস্তুতঃ ‘চিন্তাশূন্য  
শুদ্ধয়ে কৰ্ম্ম।’ অতএব জ্ঞানের আলোকে কৰ্ম্মী স্বার্থরূপে ও উত্তমরূপে  
কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতে পাবেন, দেখা গেল।

ভক্ত—তোমার ভক্তিব বস্তু কোন ঐতিহাসিক অবতাব বা সাকার  
মূর্ত্তি অথবা সত্ত্ব ব্রহ্ম। তাকিক আসিয়া বুঝাইয়া দিল, ইতিহাসের প্রমাণে  
কৃষ্ণ বা গীষ্ট বলিয়া কেহ ছিগেন না ; সাকার মূর্ত্তি ভগবানের হইতেই  
পারে না। তাঁহাকে ঈশ্বর বল, তাঁহাতে যে দয়া, সর্ব্বশক্তিমান্তা, সর্ব্বজ্ঞতা  
প্রভৃতি গুণের আরোপ কর, সেই গুণগুলি বাস্তবিক পরম্পরের বিবোধী।  
ঈশ্বর যদি দয়াময় হন, তবে তিনি কেন সকল জীবকে সুখী কবিলেন  
না ? তিনি যদি জানিতেন, জগতে বেদন ছুঃখই বিবাজ করিবে, তবে  
তিনি জীবকে সৃষ্টিই বা কবিলেন কেন ? যদিই বা সৃষ্টি কবিলেন, তাহাকে  
পূর্ণ কবিয়া সৃষ্টি কবিলেন না কেন ? এ সকল প্রশ্নে ভক্তের চিন্তা  
যখন সংশয়দোলায় দোহুলমান হয়, তখন জ্ঞানীই তাঁহাকে বুঝাইয়া  
দেন, অবতাবগণের ঐতিহাসিকর সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেও ভাবরূপে তাঁহা  
নিত্য। সাকাররূপ সকলও এইরূপ নিত্য, ভক্তিরূপে এই সকল রূপ  
যোগেন্ত্রে প্রতিভাক হইয়া থাকে। ঈশ্বর সম্বন্ধেও জ্ঞানীদের উপদেশে  
বুঝিতে পাওয়া যায়, যুক্তিতে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ হয়  
বটে, কিন্তু মানুষ দৈতভাবে জগৎকাবণ পূর্ণ স্বরূপকে উপলব্ধি কবি-  
বার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে ঐক্যেই জানা যায়। একান্তবুদ্ধি না  
হইলে তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের পূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জ্ঞানী যোগীবও গুরু। যে সকল যোগী নেতি ধৌতি প্রভৃতি নাড়ী-  
শুদ্ধিকর কার্য্যে মন প্রাণ নিয়োগ কবিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলেন,  
নাড়ীশুদ্ধি উদ্দেশ্য চিন্তাশূন্য। চিন্তাশূন্য না হইলে তোমার সমুদয় কার্য্য বুধ।  
সাঁহারা সামান্ত একটা সিদ্ধি পাইয়াই মাতিয়াছেন, জ্ঞানী তাঁহাদিগকে

বলেন, সমুদয় সিদ্ধি তোমার ভিতরে, শুধু তোমার নয়, আরক্তক পর্যাস্ত সকলেরই ভিতরে রহিয়াছে। তুমি একটা সামান্ত সিদ্ধি লইয়া মাতিয়াছ, ইহা ত তোমায সাঙ্গে না। তুমি ব্রহ্ম। চিত্তবৃত্তি নিরোধ কবিয়া একবার যথার্থ দৃষ্টব্যরূপে অবস্থিত হও দেখি।

অতএব দেখা যাইতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মী, তত্ত্ব বা যোগী কাহারও বিরোধী নহেন, বরং সকলেবই সহায়ক।

জ্ঞানকে লোকে শুদ্ধ তর্কের সঙ্গে এক করিয়া থাকে। জ্ঞান বাস্তবিক শুদ্ধ তর্ক নহে। বাস্তবিক যতক্ষণ না তর্কবৃত্তির নিরোধ হয়, ততক্ষণ জ্ঞানেব উদয়ই হয় না। সাধাবণ বিষয়জ্ঞানের সহিতও ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সোসাদৃশ্য নাই। বিষয়জ্ঞানে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনটা থাকে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে এ তিনেব লয় হয়। উহা একরস, একতত্ত্বরূপ।

এই জ্ঞান—কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, যে কোন আশ্রমী, যে কোন বর্ণ, আয়ত্বেচণ্ডাল সাধন কবিত্তে পাবেন। কারণ, সকলেরই ভিতর এই জ্ঞানরূপ বহিয়াছেন, কেবল একটা আবরণ পড়িয়াছে মাত্র। সাধন, চতুষ্কর দ্বারা এই আবরণ সবাইতে পাবিলেই জ্ঞানস্বর্গের প্রকাশ হয়। এই জ্ঞানই আনন্দ ও ইনিই ব্রহ্ম স্বরূপ।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

শ্রীম—কথিত ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

কাশীপুর বাগানেব পূর্বধাবে গুরুশ্রীর ঘাট । চাঁদ উঠিয়াছে । উদ্যান-পথ ও উদ্যানের বৃক্ষগুলি চক্ৰকিরণে স্নাত হইয়াছে । গুরুশ্রীর পশ্চিম দিকে বিতল গৃহ । উপরের ঘবে আলো জ্বলিতেছে, গুরুশ্রীর ঘাট হইতে সেই আলো খড়খড়ি মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহা দেখা যাইতেছে । কক্ষ মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ শয্যাব উপর বসিয়া আছেন । একটি ছুটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বসিয়া আছেন বা এ ঘব হইতে ও ঘর বাইতে-ছেন । ঠাকুর অল্পহ, চিকিৎসার্থ বাগানে আসিয়াছেন । ভক্তেরা সেবার্ষ লগ্নে আছেন ।

গুরুশ্রীর ঘাট হইতে নীচের তিনটি আলো দেখা যাইতেছে । একটি ঘরে ভক্তেরা থাকেন, তাহাব আলো দেখা যাইতেছে । সে ঘরটি দক্ষিণ দিকের ঘব । মানের আলোটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীব ঘর হইতে আসিতেছে । মা, ঠাকুরের সেবার্ষ আসিয়াছেন । তৃতীয় আলোটি রান্নাঘরের । সেই ঘব গৃহের উত্তর দিকে ।

উদ্যানমধ্যস্থিত ঐ ছতলা বাড়ীর দক্ষিণপূর্ব কোণ হইতে একটি পথ গুরুশ্রীর ঘাটের দিকে গিয়াছে । পূর্বাশ্র হইয়া ঐ পথ দিয়া ঘাটে যাইতে হয় । পথের দুইধাবে, বিশেষতঃ, দক্ষিণ পাশে অনেক ফল ফুলের গাছ ।

---

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১ টাকা । বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা । ৫৭ নং রামকান্ত বহুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তি-রাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য ।

চাঁদ উঠিয়াছে। পুঙ্কর ঘাটে গিরীশ, মাষ্টার, লাটু, আরও দুই একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুরের কথা হইতেছে।

কিয়ৎকাল পরে গিবীশ ও মাষ্টার ঐ পথে বেড়াইতেছেন ও মাঝে মাঝে কথাবার্তা করিতেছেন।

মাষ্টার। কি সুন্দর চাঁদের আলো! কতকাল ধরে এই নিয়ম চলছে।

গিরীশ। কি কবে জান্নে?

মাষ্টার। প্রকৃতির নিয়ম বদলায় না (Uniformity of nature) আর বিলাতের লোকেরা নূতন মূতন নক্ষত্র টেলিস্কোপ দিয়া দেখেছে। চাঁদে পাহাড় আছে, দেখেছে।

গিবীশ। তা বলা শক্ত; বিশ্বাস হয় না।

মাষ্টার। কেন, টেলিস্কোপ দিয়া ঠিক দেখা যায়।

গিরীশ। কেমন করে বলবো, ঠিক দেখেছে। পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানে যদি আর কোন জিনিষ থাকে, তার মধ্যে দিয়ে আলো আসতে আসতে হয়ত অমন দেখায়।

আজ শুক্রবার। ১৬ই এপ্রেল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ৪ঠা বৈশাখ, চৈত্র শুক্লা জ্যোতিষী। বাগানে ছোকরা ভক্তেরা ঠাকুরের সেবার জন্ত সর্বদা থাকেন। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুদাম, কালী, যোগীন, লাটু ইত্যাদি; তাঁহারা থাকেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ প্রত্যহ আসেন ও মাঝে মাঝে রাত্রিও থাকেন। কেহবা মধ্যে মধ্যে আসেন। আজ নরেন্দ্র, কালী ও তারক দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ীর বাগানে গিয়াছেন। নরেন্দ্র সেখানে পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে বসিয়া জঁম্বরচিন্তা করিবেন, সাধন করিবেন। তাই দুই একটি গুরুতাই সঙ্গে গিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে।

গিবীশ, লাটু, মাষ্টার উপরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর শয়ান বসিয়া আছেন। শশী ও আরও দুই একটি ভক্ত সেবার্ণ ঐ ঘরে ছিলেন; ক্রমে বাবুদাম, নিরঞ্জন, রাখাল, ইঁহারাও আসিলেন।

ঘরটি বড়। ঠাকুরের শয়ান নিকট ঔষধাদি ও নিত্যান্ত প্রয়োজনীয়

জিনিষাদি রহিয়াছে। ঘরের উত্তরে একটি দ্বার আছে, সিঁড়ি হইতে উঠিয়া সেই দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ কবিতে হয়। সেই বারের সামনা সামনি ঘরের দক্ষিণ গায়ে আর একটি দ্বার আছে। সেই দ্বার দিয়া দক্ষিণেব ছোট ছাদটিতে যাওয়া যায়। সেই ছাদের উপর দাঁড়াইলে বাগানের গাছ পালা, চাঁদের আলো, অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায়।

ভক্তদের বাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তাঁহাবাও পালা কবিতা জাগেন। মশারি টাঙ্গাইয়া ঠাকুবকে শয়ন কবাইয়া যে ভক্তরা ঘরে থাকিবেন, তিনি ঘরের পূর্ব ধারে মাহুর পাতিয়া কখন বসিয়া কখন উইয়া থাকেন। অসুস্থতা নিবন্ধন ঠাকুবেব প্রায় নিদ্রা নাই। তাই যিনি থাকেন, তিনি কয়েক ঘণ্টা প্রায় বসিয়া কাটাইয়া দেন।

আজ ঠাকুরেব অসুখ কিছু কম। ভক্তেরা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কবিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে মেজের উপর বসিলেন।

ঠাকুর আলোটি কাছে আনিতে মাষ্টাবকে আদেশ করিলেন। ঠাকুর গিৰিশকে সঙ্গেহ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমকুঞ্চ (গিরিশের প্রতি)। ভাল আছে ? (একটা ভক্তের প্রতি)।  
এঁকে তামাক খাওয়া। আর পান এনে দে।

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিলেন, কিছু জল খাবার এনে দে।

লাটু। পান টান দিবিছি। জল খাবার দোকান থেকে আনিতে যাচ্ছে।

ঠাকুর বসিয়া আছেন। একটি ভক্ত কয় গাছি ফুলের মালা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের গলায় একে একে সে ফুলি ধারণ করিলেন। ঠাকুরের জন্মযমধ্যে হরি আছেন, তাঁকেই বুদ্ধি পূজা করিলেন। ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন।

দুই গাছি ফুলের মালা গলা হইতে লইয়া ঠাকুর গিৰিশকে দিলেন।

ঠাকুর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, জল খাবার কি এলো ?

মাষ্টাব ঠাকুবকে পাখা কবিতেছেন। ঠাকুরের কাছে একটি ভক্ত-প্রস্তুত চন্দনকাঠেব পাখা রহিয়াছিল। ঠাকুর সেই পাখা ধানি মাষ্টা-রেব হাতে দিলেন। মাষ্টার সেই পাখা লইয়া বাতাস করিতেছেন।

মাষ্টার পাখা করিতেছেন, ঠাকুর দুই গাছি মালা গলা হইতে লইয়া তাঁহাকেও দিলেন।

লাটু ঠাকুরকে একটি ভক্তের কথা বলিতেছেন। সেই ভক্তটির

একটি গাঢ় বৎসরের সন্তান প্রায় দেড় বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। সে ছেলেটি ঠাকুরকে কখন ভক্তসঙ্গে কখন কীর্তনামঙ্গল অনেক বার দর্শন করিয়াছিল।

লাটু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। ইনি এঁর ছেলেটিব বই দেখে কাল যাত্রে বড় কঁদেছিলেন। পরিবাবও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মাঝে আছড়ার। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন বলে ভাবি হেজাম হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তটির শোকেব কথা শুনিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া বহিলেন।

গিরিশ। অর্জুন অক গীতা চীতা পড়ে অভিযত্নের শোকে একেবারে মূর্ত্তিত হইয়াছিলেন। তা এঁব ছেলের জন্ম শোক হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নব।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

গির্বিষের জন্য জল খাবার আসিয়াছে। কাণ্ডব দোকানের গবন কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন। ববাহনগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তাব পর নিজে হাতে করিয়া খাবার গির্বিষের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরী।

গির্বিষ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব কোণে কুঁজোব কবিতা জল থাকিত। ঐয়কাল বৈশাখ মাস, ঠাকুর বলিলেন, “এখানে বেশ জল আছে”।

ঠাকুর অতি অসুস্থ। ঝাঁড়াইবার শক্তি নাই।

ভক্তেরা অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন,—ঠাকুরের কোমরে কাশড় নাই। দিগম্বর বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। নিজে জল গড়াইয়া দিবেন! ভক্তদের নিবাস বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ জল গড়াইলেন। গেলাস থেকে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন, ঠাণ্ডা কিনা। দেখিতেছেন, জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসঙ্গে ঐ জলই দিলেন।

গিরিশ খাবার খাইতেছেন। ভক্তগুলি চতুর্দিকে বসিয়াছেন। মাষ্টার ঠাকুরকে পাপা কবিত্তেছেন।



গিরিশ। (ঈরামকৃষ্ণের প্রতি)। দেবেন বাবু সংসার ত্যাগ করবেন।  
ঠাকুর সর্বদা কথা কহিতে পাবেন না, বড় কষ্ট হয়। নিজের  
ওষ্ঠাধর অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন, “পরিবারদের খাওয়া  
দাওয়া কিরূপে হবে, তাদের কিসে চলবে?”

গিরীশ। তা কি কব্বেন, জানি না।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। গিরিশ আবার খাইতে খাইতে কথা  
বারম্বার কবিলেন।

গিরিশ। আচ্ছা মহাশয়—কোনটা ঠিক? কষ্টে সংসার ছাড়া, না,  
সংসারে থেকে তাকে ভাকা?

ঈরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। গীতায় দেখ নি? অনাসক্ত হয়ে সংসারে  
থেকে কর্ম কব্বলে আর সব মিথ্যা জেনে জ্ঞানের পর সংসারে থাকলে  
ঠিক জৈব লাভ হয়।

“যারা কষ্টে ছাড়ে, তারা হীন থাকের লোক।

“সংসারী জানী কি রকম জান? যেমন সারসীর ঘরে কেউ আছে।  
ভিতর বার দুই দেখতে পার।

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন।

ঈরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। কচুরি গরম আর খুব ভাল।

মাষ্টার (গিরিশের প্রতি)। কাণ্ডর দোকানের কচুরি। বিখ্যাত।

ঈরামকৃষ্ণ। বিখ্যাত।

গিরিশ (খাইতে খাইতে সহাস্যে)। বেশ কচুরি।

ঈরামকৃষ্ণ। লুচি থাক, কচুরি খাও। (মাষ্টারের প্রতি)। কচুরি কিন্তু  
রসোত্তমের।

গিরিশ খাইতে খাইতে আবার কথা তুলিলেন।

গিরিশ (ঈরামকৃষ্ণের প্রতি)। আচ্ছা মহাশয়, মনটা এত উঁচু আছে,  
আবার মীচু হয় কেন?

ঈরামকৃষ্ণ। সংসারে থাকতে গেলেই ও রকম হয়। কখন উঁচু কখন  
মীচু। কখন বেশ ভক্তি হচ্ছে, আবার কমে যায়, কামিনী কাক্ষন নিয়ে  
থাকতে হয় কিনা, তাই হয়। সংসারে ভক্ত কখন ঈশ্বরচিন্তা, হরিনাম  
করে; কখন বা কামিনী কাক্ষনে মন দেয়। যেমন সাধারণ মাছি  
কখন সন্দেশ খুঁজে কখন বা গুণা বা বিষ্ঠাতেও বসে।

“ত্যাগীদের আলাদা কথা। তারা কামিনী কাকন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ঈশ্বরকে দিতে পারে; কেবল হরিনাম পান করতে পারে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে ঈশ্বর বই তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয় কথা হলে উঠে যায়। ঈশ্বরীয় কথা হলে শুনে। ঠিক ঠিক ত্যাগী হলে নিজেরা ঈশ্বর কথা বই আব অল্প বাক্য মুখে আনে না।

“মোমাছি কেবল কুলে বসে—মধু খাবে বলে। অল্প কোন জিনিষ মোমাছির ভাল লাগে না।

গিরীশ দক্ষিণের ছোট ছাদটির উপর হাত পুইতে গেলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ( মাউরের প্রতি )। ঈশ্বরের অমুগ্রহ চাই, তবে ঠাতে সব মন হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

( শাস্ত্র ও অবতার । বৈদীভক্তি ও ভক্তি উদ্ভাস )

গিরীশ পুনর্বীর ঘরে আসিয়া ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন ও পান খাইতেছেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ( গিবীশের প্রতি )। বাখাল টাখাল এখন বুঝেছে, কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা। ওবা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পবিবাব আছে, ছেলেও হয়েছে, কিন্তু বুঝেছে যে, সব মিথ্যা। অনিত্য। বাখাল টাখাল এবা সংসারে লিপ্ত হবে না।

“যেমন পাকাল মাছ। পাকের ভিতর বাস কিন্তু মাঘে পাকের দাগটা পর্যাপ্ত নাই।

গিবীশ। মহাশয়, ও সব আমি বুঝি না। মনে করলে সবাইকে নির্লিপ্ত গুহ কবে দিতে পাবেন। কি সংসারী, কি ত্যাগী, সবাইকে ভাল করে দিতে পারেন। মনযেব হাওয়া বইলে, আমি বলি, সব কাঠ চন্দন হয়—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ। সাব না পাকলে চন্দন হয় না। শিমুল আরও কয়টা গাছ আছে, এরা চন্দন হব না।

গিরীশ। তা শুনি না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ। আইনে একুপ আছে।

গিরীশ। আপনার সব নেআইনি!

ভক্তেরা অবাধ হইয়া গুণিতেন। মাষ্টারের হাতের পাখা এক একবার হির হইয়া যাইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ । হাঁ, তা হতে পারে . ভক্তি-নদী ওৎফালে ডাঙ্গায় একবার জল !

“যখন ভক্তি উদ্গাদ হয়, তখন বেদবিধি মানে না। দূরী তোলে, তা বাচে না। যা হাতে আসে, তাই লয়। ভুলসী তোলে, পড় পড় কবে ডাল ভাজে।

“আহা কি অবস্থাই গেছে।

(মাষ্টারের প্রতি)। ভক্তি হলে আর কিছুই চাই না।

মাষ্টাব। আচ্ছা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। রানাবতাবে শাস্ত, দাস্ত, বাৎস্তল্য, সখ্য ফখ্য। কৃষ্ণাবতাবে ও সবও ছিল আবার মধুর ভাব।

“শ্রীমতীর মধুর ভাব—ছেনালী আছে। সীতার গুণ সতীত্ব, ছেনালী নাই।

“তারই লীলা। যখন যে ভাব।

বিজয়েব \* সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একটা পাগলের মত জ্বীলোক ঠাকুরকে গান গুনাইতে যাইত। শ্রামাবিষয়ক গান ও ব্রাহ্মসঙ্গীতও গাইত। তাকে পাগলী বলে। সে কাশীপূব বাগানেও সর্বদা আছে ও ঠাকুরের কাছে যাবাব জন্ত বড় উপদ্রব করে। ভক্তদের সেই জন্ত সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিবীশাদি ভক্তের প্রতি)। পাগলীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছলো। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, কেন কান্নাছিস। তা বলে, মাথা ব্যথা কচ্ছে !

“আর একদিন গিছলো। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, ‘দখা কবলেন না?’ আমি উদাববুদ্ধিতে খাচ্ছি। তার পরে বলছে, ‘মনে ঠেলেন কেন?’ জিজ্ঞাসা করলুম, ‘তোর কি ভাব?’ তা বলে, ‘মধুর-ভাব!’ আমি বললাম, ‘আরে, আমার যে মাতৃধোনি! আমার যে সব মেয়েরা না!’ তা বলে, ‘তা আমি জানি না।’

“তখন রামলালকে ডাকলাম। বললাম, ‘ওবে রামলাল, কি মনে

\* বিজয়—শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গোস্বামী।

ঠালাঠেলি বলছে, শোন দেখি। ওর এখনও সেই ভাব আছে।

গিরীশ। সে পাগলী ধস্ত! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই থাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে! সে যে ভাবেই ককক, তার কখনও মন্দ হবে না।

“মহাশয়, কি বলবো! আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম, কি হবেছি! আগে আলস্ত ছিল, এখন সেই আলস্ত ভেতরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাগি ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছে। আর কি বলবো।”

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন। রাখাল পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া হুঃখ করিতে লাগিলেন। বলেন, হুঃখ হয়, সে উপদ্রব করে, আর তার জগ্ন অনেক কষ্টও পায়।

নিরঞ্জন (রাখালের প্রতি)। তোর মাগ আছে; তাই তোর মন কেমন করে। আমিরা তাকে বলিদান দিতে পারি।

রাখাল (বিরক্ত হইয়া)। কি বাহাদুরী! ওঁর সামনে ঐ সব কথা।

\* \* \* \* \*

### ( টাকায় আসক্তি )

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গিরীশের প্রতি )। কামিনী কাকনই সংসার। অনেক টাকা গায়ের রক্ত মনে করে। কিন্তু টাকাকে দেশী বস্ত্র করলে একদিন হয়তো সব বেরিয়ে যায়।

“আমাদের দেশে মাঠে আল বীধে। আল জাঁনো? বাবা খুব বস্ত্র করে চারদিকে আল দেয়, তাদের আল জলের তোড়ে ভেঙ্গে যায়। বারা এক দিক খুলে ঘাসের চাপড়া দিয়ে রাখে, তাদের কেমন পলি পড়ে, কত ধান হয়!

“যারা টাকার সিঁদাবহার করে, ঠাকুরসেবা, সাধু ভক্তের সেবা করে, দান করে, তাদেরই কাজ হয়। তাদেরই ফসল হয়।

“আমি ভক্তের কবিরাজের জিনিস খেতে পারি না। ধান্দা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে! ওদের ধন বৈদ্য রক্ত পুঁজ!

এই বলিয়া ঠাকুর হুঁইজম চিকিৎসকের মাঝ করিলেন।

গিরীশ। রাজেন্দ্র ভক্তের খুব দাঁরাজ ঝাঁ। কার কাছে একটা পরদা লয় না। আর দান ধ্যান আছে।

## সংবাদ ও মন্তব্য ।

বিগত ১৭ই জানুয়ারি কলিকাতা ‘বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে’ স্বামী বিবেকানন্দের শ্রবণার্থ উৎসব হয়। প্রাতে চতুর্থাট ও হোম হইয়াছিল। অপরাহ্নে এক সভার অধিবেশন হয়, স্বামী সারদানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়ের আস্থানে সিঁটার নিবেদিতা, বার চুনি-জাল বসু বাহাদুর, মিঃ জে চৌধুরী, সখারাম গণেশ দেউড়র, নেশন সম্পাদক মিঃ এন ঘোষ প্রভৃতি সমাগত সভ্যগণ ছাত্রগণের শিক্ষা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। ঘোষ মহাশয় বলেন,— “আমি বিগত কয়েক বৎসর হইতে অনেক ধাতনামা ব্যক্তিগণের স্মৃতি-সংরক্ষিণী সভার সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। আমার অভিজ্ঞতা এই, এই সকল সভার দ্বারা মৃত মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার বড় একটা সাহায্য হয় না। আমি বিবেকানন্দের পুস্তকাবলি পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আমার বিশ্বাস,—ঐশ্ব্যের মত সর্বসাধারণের উপযোগী কবিষা বেদান্ত কেহ এ পর্যন্ত বুঝান নাই। ঐশ্ব্যের পুস্তকাবলি পাঠ করিতে করিতে আমার মনেই কোন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই আরও ধানিক দূর পড়িয়া দেখি, তিনি যেন সেই সন্দেহ নিজের উত্থাপন করিয়া আবার উহার স্বীকৃতি করিতেছেন। আর একটি কথা আমার মনে হয় যে,—অজ্ঞাত বেদান্তব্যাখ্যাতাগণ প্রচলিত হিন্দুধর্মের উপর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু স্বামীজীর, হিন্দুধর্মের নামে প্রচলিত সকল অশু-চিন্তনগুলির প্রতি সহানুভূতি না থাকিলেও তিনি ঐশ্ব্যের আমেরিকার সেই প্রথম বক্তৃতা হইতেই হিন্দুধর্মকে বেদান্তের সহিত অভিন্নভাবাপন্ন ধরিয়া লইয়াছেন এবং ঐশ্ব্যের পরবর্তী বক্তৃতা ও পুস্তকসমূহে বেদান্তকে হিন্দুধর্মব্যাখ্যার যন্ত্ররূপ গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তকে একপন্থাবে ব্যবহার করার তিনি খুব ভালই কবিয়াছেন। আমার মতে ঐশ্ব্যের স্মৃতিচিহ্ন এই এই উপাযগুলির দ্বারা বক্ষিত হইতে পারে। —(১ম) ঐশ্ব্যের লিখিত সমুদয় গ্রন্থগুলি একত্র কবিয়া একটি উত্তম সংকলন। (২য়) এই ছাত্রাবাসের দ্বারা ছাত্রাবাস সকল সংস্থাপন। (৩য়) ঐশ্ব্যের উপদেশ সকল শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন, তদভাবে সংস্কৃত কলেজে তদীয় ব্যাখ্যাস্বামী বেদান্ত শিক্ষার জন্য নিয়মিত বক্তৃতা বন্দোবস্ত করা। (৪র্থ) মহাপুরুষগণের স্মৃতিচিহ্ন ঐশ্ব্যের প্রকৃত অশু-কর্ত্তী ও-শিক্ষণ, সুতরাং বাহ্যতে ঐশ্ব্যের শিক্ষাস্বামী জীবন গঠন করিতে পারা যায়, আমাদের সকলেরই তৎক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য। আমার হতে তদীয় উপদেশে গঠিতজীবন শিষ্টমণ্ডলিই ঐশ্ব্যের সর্বোত্তম স্মৃতিচিহ্ন।”

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির উদ্যোগে নূতন প্রকাশিত ঐক্যবানী পুস্তিকা (স্বামীজির ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষায় সচিত্র প্রাচীন সমৃদ্ধ কবিতা ও গীতির সংগ্রহ, মূল্য ১০, উদ্বোধন আকিসে প্রাপ্য) সমবেত সভ্যগণের মধ্যে বিত-বিত হয়। সমিতির সভ্যগণের আহ্বানে সমাগত ভ্রম মহোদয়গণ ক্রিয়-জলযোগ করেন।

ঘোষ মহাশয়ের কবিতা স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার উপায়গুলি সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু তিনি যে স্বামীজির বেদান্ত ও হিন্দুধর্মকে অভিন্ন ধরিয়া লইবার কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই কথাগুলি ভাল বুঝিতে পারি নাই। বেদান্ত ও হিন্দুধর্মকে অভিন্ন বলিয়াই আমরা জানি। অন্যদিকাল হইতে বেদান্তপ্রচারিত সভ্যসমূহ হিন্দুধর্মের ভিত্তিরূপ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। বেদান্তের বিভিন্ন সংগ্রাহকগণ বা ভাষ্যকারেরা হইতে বিভিন্ন মত পোষণ করুন না কেন, কেহই আপনাদিগকে হিন্দুধর্মের বিবোধী মনে করেন নাই। তবে অবশ্য সকলেই শাস্ত্রবিরোধী দেশাচারসমূহ নিষাকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। স্বামীজিও এ বিষয়ে পূর্বাচার্যগণের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। ঘোষ মহাশয় কি বেদান্তমতাবলম্বী অথচ হিন্দুধর্মের উপর বিরুদ্ধভাবাপন্ন আচার্যগণ অর্থে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্থ্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণকে বুঝিয়াছেন? যদি তাহাই তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই, এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাই বেদান্তের উপর হিন্দুর ভ্রাতৃ প্রকাশন নহেন। তাঁহারা উভয়েই বেদান্তকে সমালোচকের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে উহার অনেক স্থল খণ্ডন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিষয়ের বিশিষ্ট আলোচনা প্রত্যাশা করি।

বিগত ৬ শারদীয় পূণ্যের দিন উক্ত 'স্মৃতিসন্নিবেশ' ছাত্রগণের উৎ-সাহে পবন ভক্তিসহকারে বীণাপাণির অর্চনা হয়। বাবু পুলিনবিহারী মিত্র আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাইয়া সকলকে ভক্তিরসে আত্ম করিয়াছিলেন।

সিঙার নিবেদিতা সম্প্রতি নাকিপুর, লক্ষৌ প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন। গীতা সম্বন্ধেই অধিকাংশ বক্তৃতা হইয়াছিল। এক সভায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রসঙ্গে অর্জুনের যে বুদ্ধি অনিচ্ছা হইয়াছিল তাহা কাপুরুষপ্রসূত কিনা এই সম্বন্ধে বিচার হয়। সিঙার নিবেদিতার ব্যাখ্যায় সকলেই গীতার মর্ম সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। এই ব্যাখ্যার ফল-স্বরূপ ১৫ই মার্চের এডুকেশন গেজেটে গীতার ব্যাখ্যা নামক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পাঠকবর্গকে সেই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উগাতে এক স্থানে বলা হইয়াছে,—“ধর্মবুদ্ধি উপ-

হিত অর্জনের যুদ্ধে মোহ উপস্থিত হইল। উদ্বোধনে বলা হইয়াছে তীক্ষ্ণতা। অর্জনে তীক্ষ্ণতা আরোণ্ড ভাল লাগে নাই। কিন্তু সেদিন মিস নিবেদিতাব ব্যাখ্যায় সে ভ্রম কাটিয়া গিয়াছে।”

বিগত ১৭ই জানুয়ারি সালিখায়, ২৪শে জানুয়ারি দক্ষিণেশ্বরে ও ৭ই ফেব্রুয়ারি রামকৃষ্ণপুরে উৎসব হয়। তত্পলক্ষে এই সকল স্থানেই শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের শিষ্ট ও তত্ত্বগণের সম্মিলন ও কীর্তনাদি হইয়াছিল। এই সকল উৎসবের দ্বারা ভক্তগণের মধ্যে ঐক্যতা বর্দ্ধিত ও জীবনের মহান আদর্শকে যেন জাগ্রত রাধিবীর বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। এই সকল উৎসব বাহ্যতে এক্ষেবে তাবের পরিচায়ক না হইয়া পরমহংস-দেবের সাক্ষ্যজনীন তাবের বিকাশ স্বরূপ হয়, উৎসবের উদ্‌যোক্তাগণের প্রতি সেই বিষয়ে বিশেষ অক্লান্ত হওয়া উচিত।

## প্রাপ্তিস্বীকার ।

From Colombo to Almora—দ্বিতীয় সংস্করণ। কাপড়ে বাঁধাই ২৮ তিন টীকা, কাগজের মলাট ২১০ আড়াই টাকা। ব্রহ্মবাসিন্ প্রেস, ট্রিঙ্গলিকেন, মাদ্রাজে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকে স্বাক্ষরিত ভারতপ্রত্যাগমনের পর যে সকল অভিনন্দনপত্র প্রাপ্ত হন এবং তাহার উত্তরে যে সকল আশ্রয় বক্তৃতা করেন, তাহার সমুদয়গুলির সংগ্রহ আছে। এই পুস্তকে পূর্বে সংস্করণের অপেক্ষা সাহেবের বক্তৃতা কয়েকটি অধিক আছে এবং প্রতি পৃষ্ঠার ধারে ধারে Marginal notes দেওয়া হইয়াছে। এই পুস্তক পানির প্রথম সংস্করণ নিঃশব্দিত হইবার পর অনেক দিন অবধি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে সাধারণের সে অভাব দূরীভূত হইল।

পূর্বাভাস।—শ্রীনিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কবিতাপুস্তক। গৌরাঙ্গদেব কেন অবতীর হইলেন, ভগবান্কে বৈষ্ণবদের মত ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

কৃতাদায়। শ্রীহরিন্দাস চট্টোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত। সামাজিক নাটক। “বিবাহের বরণক্ষয়দিগের অর্পণাভেদে কলরবী হওয়াতে ভ্রমসমাজে যে বিষয় আঘাত লাগিতেছে” এবং “স্বামীদের সংস্কারচেষ্টা” যে “সামাজিক কাংক্ষণ হলে অকিঞ্চিৎকর ও আন্তরিকতাপূর্ণ” তাহাই এই পুস্তকে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। স্বামীদের বোধ হয়, ভগবান্ এই ক্ষণেই অশ্রু দিয়া একটি শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছেন। কারণ, ইহাতে বাধ্য হইয়া কল্যাণদিগের বিবাহের বরণ আপনাপনি বুদ্ধি হইয়া বাইতেছে।

## তাড়িতরহস্য ।

### তৃতীয় প্রস্তাব ।

শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম এম

২৩। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, তড়িৎ-পদার্থ-উদ্দীপন পদার্থে তড়িতে উদ্দীপন কবিতো পারে। স্বর্ণপত্র তড়িৎ-প্রভের শীর্ষ হইতে কিয়দূরে তড়িৎ-দণ্ড স্থত হইলে পত্রটির মধ্যে ব্যবধান করে। তড়িৎ-হক যন্ত্রেব পিষ্টক বা চাকিকে তড়িৎ-দণ্ড করিয়া তড়িৎ-পরি

তড়িৎ-সাম্প্রদায়িক

বা

তড়িৎ-সাম্প্রদায়িক যন্ত্র

}

উহা আবরণ বা পিষ্টকের থালা

থানিকে স্থাপন করিলে তাহাতে

তড়িৎ উদ্ভূত হয়। এই সকল ব্যাপারে

স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে, কোন পরিচালক পদার্থে তড়িৎ-উদ্দীপন করিতে হইলে, উহা ও উদ্দীপকের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবধানস্বরূপ যে কোনও অপরিচালক পদার্থ সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। পূর্বোক্ত পৰীক্ষায় বায়ু-স্তররূপ ব্যবধানের মধ্য দিয়া উদ্দীপন-কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই রূপ কাচ, লাক্ষা, গন্ধক প্রভৃতির মধ্য দিয়াও তড়িৎ-প্রভা সজ্জিত হইতে পারে। পবনস্পর্শ হইতে কিয়দূরে অবস্থিত কাচদণ্ডে আশ্রিত ছুইখানি ধাতু-ফলকের মধ্যে একখানি কাচফলকে লম্বভাবে স্থাপন কবিয়া এবং একখানি ধাতুফলকে ব্যাসসূত্রেব তড়িৎ-সংগ্রহ যন্ত্রেব বর্তুলেব সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া যন্ত্রকে ঘূরাইলে দেখা যায়, যে ফলকখানি ধনতড়িৎ-যুক্ত হইয়াছে; শুদ্ধ তাহা নহে—এই তড়িৎ দ্বিতীয় ফলকে তড়িতেব উদ্দীপন কবিয়াছে। সুতরাং উহার সন্নিহিত প্রান্তে ঋণ ও দুববর্তী প্রান্তে ধন তড়িৎ জন্মিয়াছে। প্রথমের ধন তড়িৎ দ্বিতীয়ের ঋণ তড়িৎকে আকর্ষণ ও ধন তড়িৎকে বিকর্ষণ করে। একটি ধাতুয চেন দ্বারা দ্বিতীয় ফলকে ভূপৃষ্ঠের সহিত সন্নিহিত করিয়া দিলে মুক্ত ধন তড়িৎ উহাতে চলিয়া যাইবে; কিন্তু ঋণ তড়িৎ প্রথমের ধন তড়িৎকে আকর্ষণ করিবে। ইহাতে এই ফল হইবে, যে, তড়িৎ-সংগ্রহ যন্ত্র হইতে আরও কিছু ধন তড়িৎ প্রথম ফলকে আসিবে—বে কিঞ্চিৎ অধিক ধন তড়িৎ আসিবে, তাহার প্রভাবে দ্বিতীয়ে কিঞ্চিৎ



অধিক ঋণ তড়িৎ জন্মিবে; এইরূপে কাচফলকের ভিতর দিয়া ধাতু-ফলকদ্বয়ের বিরুদ্ধ তড়িৎের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ চলিবে এবং এই কারণেই উভয় ফলকে অতি অধিক পরিমাণে তড়িৎ উদ্ভূত হইবে। দ্বিতীয় ফলক না থাকিলে প্রথম ফলক খানিতে এত অধিক তড়িৎ সংগৃহীত হইত না। পূর্বোক্ত উপায়ে ধাতুফলকদ্বয়ে অধিক পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চিত হয়; সুতরাং তড়িৎের ঘন সন্নিবেশ হইয়াছে একরূপ বলা যায়। আর যন্ত্রটি দ্বারা তড়িৎের ঘনত্বাবেশ বা “সান্দ্রত্ব” (ঘনত্ব-Density) সম্পাদিত হওয়ায় ইহাকে “তড়িদঘনীকরণ” বা “তড়িৎসান্দ্রীকরণ” যন্ত্র (Electrical Condenser) বলে। যে ফলকখানি তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্র হইতে তড়িৎ আহরণ করে, তাহাকে “সঞ্চলক” (Collecting) ফলক, আর অন্যটি অর্থাৎ বাহ্য দ্বারা তড়িৎ ঘনীভূত হয়, তাহাকে “সান্দ্রীকরণ” (Condensing) ফলক বলে। এই পরীক্ষা দ্বারা জানা যাইতেছে, যে ভূতলের সহিত সংযুক্ত সুরক্ষিত একখানি ধাতুফলকে, তড়িদাধারের সহিত সংযুক্ত আর এক খানি সুরক্ষিত ধাতুফলক হইতে কিয়দূরে রাখিয়া, উহাদের মধ্যে একখানি কাচফলক স্থাপন করিলে, প্রথমোক্ত ফলকের “তড়িদধারণশক্তি” (Capacity) বর্দ্ধিত হয়। তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্রের বর্ত্ত্বলের নিকট অঙ্গুলিগ্রহি আনিলে এবং যন্ত্রকে ঘুরাইলে, পিট্ পিট্ শব্দে মধ্যস্থ বায়ু ভেদ করিয়া গ্রহিতে যে তড়িৎক্ষুদ্র আগমন করে, ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; এই ব্যাপারটি তড়িৎসান্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার লক্ষণ মাত্র। কেননা এস্থলে গোলকে সঞ্চিত তড়িৎ, মধ্যবর্ত্তী বায়ুস্তরের অভ্যন্তর দিয়া অঙ্গুলিগ্রহিতে বিরুদ্ধ তড়িৎের উদ্দীপন করে—হুইটি বিজাতীয় তড়িৎের পরস্পর আকর্ষণের ফলস্বরূপে গোলকে অধিক পরিমাণে তড়িৎ সংগৃহীত হয়। অবশ্য অতিমাত্র সঞ্চিত বিরুদ্ধ তড়িৎের পুনর্শ্লিলন তড়িৎক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত হয়।

২৪। সান্দ্রীকরণ যন্ত্রেব অঙ্গীভূত ফলকদ্বয়ের পরিমাণ বত অধিক হইবে, আব দূরত্ব বা ব্যবধান বত অল্প হইবে, যন্ত্রদ্বারা তত অধিক

সান্দ্রীকরণ যন্ত্রের  
তড়িদধারণশক্তি  
ব্যবস্থার কারণ।

}

পরিমাণে তড়িৎ ঘনীভূত হইবে।

অবশ্য ফলকদ্বয়ের আকৃতি এবং মধ্য-  
বর্ত্তী অপরিচালক পদার্থের প্রকৃতি

অনুসারেও যন্ত্রটির তড়িদধারণশক্তি, তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ ধাতু-

পদার্থবস্তুর আকার—পাতের মতন বা নলের মতন বা বর্তুলের মতন হইলে যত্নে সমান পরিমাণ তড়িৎ সঞ্চিত হইবে না; আবার একই যত্নে সমান পরিমাণ স্থূল কাচের পাত কি গালায় পাত কি গন্ধকেব পাত, কি বাহুর স্তর ইহাদের সকলের দ্বারা সমান মাত্রায় তড়িৎ ঘনীভূত হয় না।

২৫। একটি মোটা গলাবিশিষ্ট কাচের বোতলের ভিতরের তলায়, আর গলা হইতে কিছু দূর নীচে ভিতর ও বাহির পিঠে রাঙতার পাত বসাইয়া এবং বোতলের তলা স্পর্শ করিতে পারে, এমন দীর্ঘ একটি পিস্তলের তারকে উহার ছিপি ভেদ করাইয়া দিয়া তাবের বহিঃপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পিস্তলের গোলা সংলগ্ন করিলে অল্পব্যয়সাধ্য একটি তড়িৎ-

লিডেন্‌জার  
বা বোতল

}

সাত্ত্বিকরণ যন্ত্র প্রস্তুত হইবে। ইহাকে ইংরাজীতে Leyden Jar বা লিডেন বোতল বলে। বোতলকে কিয়ৎ-

কালের অন্ত তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্রের নিকট লইয়া গিয়া, উহার গোলাটিকে যন্ত্রের বর্তুলের নিকট ধবিলে পিট্ পিট্ শব্দে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া কতকগুলি তড়িৎক্ষুলিঙ্গ বোতলের গোলাটিতে প্রবেশ করিবে এবং বোতলে তড়িৎ ঘনীভূত হইবে। এক্ষণে বোতলকে যন্ত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া এক হস্তে ধরিয়া অপর হস্তদ্বারা উহা বোতল স্পর্শ করিলে বাহ্যিকের ভিতরে অতি ভয়ানক ধাক্কা দিয়া, শবীরের মধ্যে তড়িৎ চলিয়া যাইবে। এস্থলে বোতলের উভয়-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন রাঙতার পাতে বিপুল পরিমাণে বিষম তড়িৎ (ধন ও ঋণ) সঞ্চিত হয়; এক হস্তে বহিস্পৃষ্ট স্পর্শ করিয়া পরে অন্য হস্ত দ্বারা অন্তঃপৃষ্ঠসংলিপ্ত গোলক স্পর্শ করিবার মাত্র বিরুদ্ধ তড়িৎ বাহ্যমধ্যে ও বকে সম্মিলিত হওয়ায় ঐ সকল স্তলে ভয়ানক “অভিঘাত” (Shock) বা ধাক্কা উৎপাদিত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে হল্যান্ড-দেশের অন্তঃপাতী লিডেন নগরীর বিজ্ঞানাদ্যাপক মুশেনব্রোকেসের আদেশে তাঁহার শিষ্য কিউনিয়াস্ একটি বোতলের জলকে তড়িৎ-মুক্ত করিবার জন্য, এক হস্তে বোতলটি ধরিয়া তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্রের গোলক হইতে লক্ষ্যমান একটি তারকে ঐ জলের সহিত স্পর্শ করাইয়া দিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল যন্ত্রটির কার্য চলিলে পর তিনি অকস্মাৎ অন্য হস্তে গোলক স্পর্শ করিবার মাত্র ভীষণ অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত ব্যাপার স্বয়ং পরীক্ষা করিতে গিয়া, তাঁহার গুরুও বাহ্যদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে একরূপ ভয়ানক অভিঘাত

পাইয়াছিলেন, যে, দুই দিন শয্যাগত হইয়াছিলেন এবং জৈনিক বন্ধুকে এতৎ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন, যে, সমগ্র ফরানীস রাজ্যেব আধিপত্য লাভ করিলেও তিনি এই ব্যাপারে পুনঃ পবীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন না।

২৬। পূর্বোক্ত ঘটনায় হস্তদ্বারা বিরুদ্ধধর্মী ভাঙিতের পুনঃসম্মিলনে “তড়িৎ-স্রাব” (Electrical Discharge) সত্ত্বাটিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উপায়ে নিরাপদে তড়িৎ-স্রাব সাধিত হইতে পারে। দুই অংশে বক্রীকৃত একটি ভাবেব প্রান্তদ্বয়ে বাণ্ডেব পাতদ্বাবা আবৃত দুইটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠবর্তুল (সুপারি লইলেও চলিবে) সংলগ্ন করিয়া তারের মধ্যস্থলকে একটি দীর্ঘ নলাকায় শিশিবে মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহাকে ছিপি দ্বাবা আবদ্ধ করিতে হইবে। এখন শিশিকে বোঁদ্রে ঢুকাইয়া হস্তে ধরিয়া তাবেব এক প্রান্তকে পূর্বোক্ত তড়িৎযুক্ত বোতলেব বহিস্পৃষ্টেব সহিত স্পর্শ করাইতে হইবে; পবে তানেব অপব প্রান্তকে বোতলেব শীর্ষস্থ গোলকেব নিকট আনিবামাত্র পটাং শব্দে উজ্জ্বলালোকময় তড়িৎক্ষুলিঙ্গ উক্ত প্রান্ত-স্থিত কাষ্ঠবর্তুল হইতে বোতলেব গোলকে লাকাইয়া যাইবে। এস্থলে বাণ্ডেব পাতস্বরূপ বোতলেব “আববনী” দ্বয়েব (Coatings) বিরুদ্ধ তড়িৎ-তের পুনঃসম্মিলনে সহজে বোতলে তড়িৎ-স্রাব সম্পাদিত হয়। এই প্রণালীর

ধীর তড়িৎস্রাব ও  
মুহূর্তসাধ্য তড়িৎস্রাব।

}

তড়িদ্ভিচ্ছাতিকে “আকস্মিক” বা  
“মুহূর্তসাধ্য” (Instantaneous)  
তড়িৎ-স্রাব বলে। আব ধীবে ধীবে

বোতল হইতে তড়িদ্ভিযোজন করিতে হইলে উহাকে কাঠেব পায়ায়ুক্ত টুলে বসাইতে হইবে। এক্ষণে অঙ্গুলিগ্রস্থিকে উহাব বর্তুলেব নিকট লইয়া গেলে একটি ক্ষুলিঙ্গ নির্গত হইবে; পবে গ্রস্থি, বোতলেব বহিস্পৃষ্টেব নিকট আনীত হইলে আব একটি ক্ষুলিঙ্গ পাওয়া যাইবে। এইরূপে লগ্নাক্রমে বোতলেব অন্তঃস্পৃষ্ট ও বহিস্পৃষ্ট স্পর্শ কবিলে অনেকক্ষণ পবে নোতলটি সম্পূর্ণরূপে তড়িদ্ভিহীন হইবে। এবস্থি তড়িদ্ভিযোজন ব্যাপাবকে “ধীর তড়িৎ-স্রাব” (Slow Discharge) কহে।

২৭। লিডেন জার বা বোতলেব “আববনী” অথবা অন্তঃস্পৃষ্ট ও বহিস্পৃষ্ট-সংলগ্ন বাণ্ডেব ফলকদ্বয়, পূর্বোক্ত বক্রীকৃত তারের “নিঃস্রাবদণ্ডেব” (Discharger) প্রান্তদ্বয় দ্বাবা যুগপৎ স্পৃষ্ট হইলে দেখা যায়, যে, কখন কখন বোতলটি সম্পূর্ণরূপে তড়িদ্ভিহীন হয় না। উহা হইতে পুনর্বাৎ এক বা অধিক

ক্ষণ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর অভিধাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার কারণ এই, যে, বোতলটিকে তড়িৎযুক্ত করিবার সময় কাচপাত্রটি তৎসংলগ্ন বিরুদ্ধ-

লিডেন জারের উদ্ভূত  
তড়িৎের কারণ।

}

ধর্মী তড়িৎের আকর্ষণে “আকৃষিত”  
(Strained) হইয়া যায়। এই  
আকৃষ্টনাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে

কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। যখন ও ঋণ এই বিষম তড়িৎ, পাত্রের অভ্যন্তরে  
কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করে; উহারা প্রথম নিঃশ্রাব-স্বরূপেই কাচপৃষ্ঠে আবি-  
ভূত হয় না। কিয়ৎকাল পরে বহির্গত হয়। তখন আবার পাত্রটি স্বাভাবিক  
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জন্তই একবার তড়িৎস্রাব সংঘটিত হইলে পাত্রটিতে  
কিঞ্চিৎ তড়িৎ অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই উদ্ভূত তড়িৎের মাত্রা,  
বোতলে তড়িৎসংযোগকালের উপর নির্ভর করে। এস্থলে বলা বাহুল্য  
যে, কাচপাত্রটি অতি ক্ষীণ হইলে আকৃষ্টনাবস্থা সহ করিতে পারিবে না—  
বিরুদ্ধধর্মী তড়িৎ কাচপাত্রভেদ করিয়া সম্মিলিত হইবে এবং পাত্রটি  
ভগ্ন হইয়া যাইবে।

২৮। কাচপাত্রটি সাক্ষীকরণ ব্যাপাবেব মূলীভূত কারণ, উহারই  
পৃষ্ঠদ্বয়ে বিরুদ্ধ তড়িৎ সঞ্চিত হয়, আর আবরণদ্বয় দ্বারা কেবল উক্ত  
তড়িৎ পরিচালিত হয় মাত্র—এই সকল ব্যাপাবেব সম্যক্ পরীক্ষার জন্ত

সাক্ষীকরণ যন্ত্রে  
তড়িৎের অবস্থান ভূমি  
—অন্তরবগ্নী কাচ-পৃষ্ঠ।

}

এরূপ একটি লিডেন জার বা বোতল  
প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহার অঙ্গ-  
ত্রয় অর্থাৎ দুইটা ধাতুময়ী আবরণী

ও কাচপাত্র পরস্পর পৃথক্ করা যায়। এইরূপ “বিচ্ছিন্ন লিডেন জার”  
(Dissected Leyden Jar) নির্মাণের জন্ত একটি কাচের ও দুইটি  
টিনের ম্যাসেব প্রয়োজন। অন্তরাবরণী স্বরূপ টিনের ম্যাসাট অংশটির  
অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও উহার মুখ আবদ্ধ; এই আবদ্ধ মুখের সহিত বক্রী-  
কৃত তারযুক্ত এক পিস্তল গোলক সংলগ্ন থাকে। বিরুদ্ধ তড়িৎের অব-  
স্থান কোথায় ইহা পরীক্ষার জন্ত এইরূপ লিডেন বোতলকে তড়িৎযুক্ত  
করিয়া উহাকে কাচের পায়ারুক্ত কাঠের টুলে স্থাপন করিতে হইবে।  
পরে অতি সাবধানে যন্ত্রের তিনটি অঙ্গকে উন্মুক্ত করিয়া টুলে রাখিতে  
হইবে; অবশ্য উহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্ত হস্ত ব্যবহার করা উচিত  
নয়, কাচদণ্ড দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এক্ষণে পদীকা

করিলে দেখা যাইবে, যে, আবরণীধৰ্মে তড়িতের লেশমাত্র নাই। কিন্তু অল্প গুলি পুনঃ সংজিত হইলে যন্ত্র হইতে পুনরায় তড়িৎপ্রব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এই ব্যাপারে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে, আবরণীধর কাচপাত্রটির উভয় পৃষ্ঠে বিরুদ্ধ ধর্মী তড়িৎকে চালিত করিয়া দেয়, সুতরাং উক্ত পাত্রপৃষ্ঠই তড়িদ্রুয়ের অবস্থান-ভূমি। উহাদের আকর্ষণে কাচপৃষ্ঠ আকৃষ্ট হইয়া যায়।

২৯। শরীরে ভীষণ উত্তেজনা উৎপাদন ব্যতীত পূর্কোক্ত বোতলের অল্প ক্রিয়া আছে। একটি শিকলির একপ্রান্ত তড়িৎযুক্ত বোতলের বহি-

তড়িঃপ্রাবের  
ক্রিয়া।

}

পৃষ্ঠে জড়াইয়া অপর প্রান্ত, ঈশ্বর বা স্পিরিট (সুরাসার) নামক সহজে দাহ্য তরলপদার্থ পূর্ণ ধাতুপাত্রের

সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া। বোতলের গোলাটি পাত্রস্থ তরল পদার্থের নিকট আনিবা মাত্র তড়িঃপ্রাব হইয়া যাওয়ায় তরল পদার্থটি প্রেজ-লিত হয়। তড়িঃপ্রাব দ্বারা সূক্ষ্ম তার উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত হইতে পারে, ক্ষীণ কাচ বিদীর্ণ হয়। যৌগিক পদার্থ বিক্ষিপ্ত হয়। মূল পদার্থ সংযোগে যৌগিক পদার্থ উৎপাদিত হয়। তড়িৎসংগ্রহ যন্ত্র চালিত হইবার সময় একবার তীব্র গন্ধের আশ্রাণ পাওয়া যায়। উহা “ওজোন” (Ozone) নামক বায়বীয় পদার্থের উৎপত্তির লক্ষণ। বায়ুবাশিষ্ট অক্সিজেন বা অক্সিজেন (Oxygen) তড়িৎ-পরিচালনা দ্বারা বিকৃত ও ঘনীভূত হয়। এই ঘনীভূত অক্সিজেনই ওজোন। ছই আয়তন উদ্বজনক বায়ু ও এক আয়তন অক্সিজেনক বায়ুদ্বারা পূর্ণ বোতলে তড়িঃপ্রাব সঞ্চালিত হইলে, তখনক শব্দে বায়ুয়ের রাসায়নিক সম্মিলন সম্পাদিত হইয়া জল উৎপন্ন হয়। উপায়বিশেষে প্রস্তুত নির্কাত কাচ নলে (Geissler's Tubes) তড়িঃপ্রাব সঞ্চালিত হইলে দিব্যদ্যুতিভাণকারী নয়নাভিরাম বিচিত্র বর্ণরূপ আবির্ভূত হয়।

৩০। কৃত্রিম উপায়ে কিরূপে তড়িৎ উৎপন্ন করা যায়, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা হইল। কিন্তু যে প্রাকৃতিক শক্তি কণপ্রভাকরূপে নখন চমকিত করিয়া কড় কড় শব্দে নরনারীর হৃৎকম্প জন্মাইয়া দেয়, সেই বিদ্যারূপা শক্তি ও তড়িৎ যে একই প্রকার, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যন্ত্রোদ্ভূত তড়িৎ বিদ্যাতের ক্ষুদ্র প্রতিমা-স্বরূপ। অতি প্রাচীন

কাল হইতে এই উভয় শক্তির সাম্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনই

প্রথম এই সাদৃশ্যকে পরীক্ষা-সিদ্ধ করেন। তিনি রেশমী বস্ত্র নির্মিত একখানি ঘুড়ীর রজ্জুতে রেশমী

বিদ্যুৎ ও  
তড়িতে সাদৃশ্য। }

সূত্র বাঁধিয়া উহারের সন্ধিস্থলে একটি চাবি ঝুলাইয়া দেন এবং রেশমী সূত্রেব অপর প্রান্তটি একটি বৃক্ষে আবদ্ধ করেন। বধন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ঘুড়ী উড়ান ব্যাপারটি তখন পরীক্ষা করা হয়। তিনি কিয়ৎকাল উর্দ্ধমুখ হইয়া বিদ্যুতের ক্রিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে চাবিটির নিকট অজুলি-গ্রহি আনয়ন কবিলে তড়িত-ক্ষুণ্ণিত পাইলেন না দেখিয়া তিনি হতাশ্বাস হইলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে হঠাৎ দ্বারা বেশমী সূত্র আর্দ্র ও তড়িত-পরিচালক হইলে তিনি ক্ষুণ্ণিতদায় দর্শন করেন। এই ব্যাপারে কৃতকার্য হইয়া তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, যে, অগ্নিবিসর্জন সংবরণ করিতে পাবেন নাই। এস্থলে বস্তু বাহুল্য মাত্র যে, তড়িত-যুক্ত মেঘ ঘুড়ী খানিতে তড়িতের উদ্দীপন করিয়াছিল।

৩১। সকল সময়েই বায়ুমণ্ডলে তড়িত বিদ্যমান থাকে। শুধু যে ঋতুকাকালে উহার সত্তা উপলব্ধি করা যায়, এমন নহে। এই তড়িত সাধারণতঃ ধন কখন কখন ঋণ হইয়া থাকে। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধতর স্তরগুলি

বায়ু মণ্ডলের  
তড়িত পরীক্ষা। }

ধন তড়িত যুক্ত হয়; কিন্তু হঠাৎ সময় তড়িতের প্রকৃতির বোর পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ উহা ঋণ হইতে ধন, ধন হইতে ঋণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। এই তড়িতের উৎপত্তির কারণ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মত-বৈধ আছে। কাহারও মতে ভূপৃষ্ঠ হইতে জলীয় বাষ্পের উত্ত্ব, কাহারও মতে ভূপৃষ্ঠের সহিত বায়ুর সংঘর্ষণ, কাহারও মতে লতা ওজাদির লম্বাই বায়ুমণ্ডল হইতে উত্ত্ব-হেতু। এই তড়িতের সত্তা পরীক্ষা করিতে হইলে স্বর্ণপত্র তড়িৎকণের শীর্ষের সহিত এক সুদীর্ঘ সূত্র শলাকা সংলগ্ন করিতে হইবে। ইহাতে পত্রটির মধ্যে যে ব্যবধান উৎপাদিত হইবে, তাহা বায়ুমণ্ডলের তড়িত দ্বারা উদ্দীপ্ত সমধর্মী তড়িতের লক্ষণ

মাত্র। এস্থলে বলা বাহুল্য, যে, উদ্দীপ্ত বিষমধর্মী তড়িৎ শলাকার  
হৃদয় মুখ দ্বারা বায়ুবাশিতে পলায়ন করে ; সুতরাং বায়ুমণ্ডলে যে জাতীয়  
তড়িৎ থাকে, পত্রদ্বয়ে সেই জাতীয় তড়িৎ উদ্ভূত হয়।

৩২। বায়ুবাশিতে অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান জলকণা সমূহে ভূরি ভূরি  
তড়িৎ থাকে। পৃথিবীর আকর্ষণে উহা বা ভূপৃষ্ঠাভিমুখে পতিত হইবার  
কালে পরস্পর মিলিত হইয়া যায়। কতকগুলি কণার সম্মিলনে যে বৃহত্তর  
জলকণা গঠিত হয় তাহাব তড়িৎ এক একটি কণার তড়িতেব অনেক  
গুণ। বর্ষুলাকার কণা সমূহের আয়তন বর্দ্ধিত হওয়ায় তড়িকার্যশক্তি

বাড়িতে থাকে ; কেননা পূর্বে  
বিদ্যুৎ ও বজ্রের কারণ, }  
বজ্রপাতের ক্রিয়া। }  
উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ষুলের ব্যাস  
(Diameter) যত অধিক হয়,

তড়িকার্যের ক্ষমতাও তত অধিক হইবে। এক একটি মেঘে যে কত  
জলকণা আছে, তাহার পরিমাণ কবা যায় না। সুতরাং এইরূপ তড়ি-  
জ্বালিত অসংখ্য বারিবিম্বের সমবায়ে মেঘপৃষ্ঠে তড়িতেব ঘন সম্মিলন সংঘ-  
টিত হয়। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে, যে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠ যেন একটি  
বিশাল তড়িৎসাম্রাজ্যের যন্ত্রের দুইখানি আবরণ—তড়িৎবিশিষ্ট মেঘ, বজ্রটির  
তড়িৎসঞ্চয়ী ফলক আর ভূপৃষ্ঠ ঘনীভবকারী ফলক। মধ্যবর্তী বায়ু-  
স্তরের সহায়তায় ভূপৃষ্ঠে যে বিষমধর্মী তড়িৎ উদ্দীপ্ত হয়, তাহা মেঘা-  
শ্রিত তড়িৎকে আকর্ষণ কবে ; এইরূপে উহার নিম্নপৃষ্ঠে এত বিপুল পরি-  
মাণে তড়িৎ বাড়িতে থাকে যে, ভূপৃষ্ঠস্থ বিরুদ্ধ তড়িতেব সহিত সম্মিলিত  
হইতে চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য মাত্র যে, এই ব্যাপারে বায়ুবাশি সম্যক  
কুঞ্চিত হয়। বিরুদ্ধ তড়িতেব মাত্রা যতই বর্দ্ধিত হয়, আকৃষ্টন প্রক্রিয়ায়  
প্রকোপও তত বাড়িতে থাকে। শেষে বায়ুবাশি আকৃষ্টনাসহ্য আর সহ  
করিতে পারে না এবং লিডেন জারের কাচপাত্রটির জ্বালা বিদীর্ণ হইয়া  
যায়। বিরুদ্ধ তড়িতেব পুনঃ সম্মিলনরূপে তড়িৎ-প্রাণ মেঘপৃষ্ঠের এক অংশ  
হইতে ভূপৃষ্ঠাভিমুখে বিদ্যুৎলেন্থার জ্বালা আবির্ভূত হয়। এই ছটা কখন  
কখন অর্ধজ্যোতিষ দীর্ঘ হইয়া থাকে। বায়ুস্তূপবিদারণসত্ত্বে শব্দই বজ্রনগ্ন  
বলিয়া বিখ্যাত। অবশ্য বিদ্যুৎ ও বজ্র একই সময়ে উৎপন্ন হয় ; কিন্তু  
আলোকের গতি শব্দের গতি অগোচর অনেক গুণ অধিক বলিয়া আমরা অগ্রে  
বিদ্যুৎ দেখিতে পাই ; পরে বজ্রধ্বনি আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে।

বজ্রপাতের ক্রিয়া বৈচিত্র্যবয়ী। বজ্রপাতে জীবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, দাহ পদার্থ প্রক্ষালিত হয়, ধাতব পদার্থ অতি উত্তপ্ত হইয়া দ্রবীভূত হয়, অপরিচালক পদার্থ ঋণ ঋণ হইয়া বিভক্ত হয়, লৌহ চৌম্বকবর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং চৌম্বক সূচীর মেরু বিপর্যাস্ত হইয়া যায়। আকাশপথে বিদ্যুৎ-সঞ্চালন দ্বারা বায়ুর অক্সিজেন ঘনীভূত হইয়া “ওজোন” রূপে বিকৃত হয়; এই কারণেই সূর্যের কলে নাইট্রিক অ্যাসিডের সত্তার উপলব্ধি হয়। কখন কখন যে স্থলে বজ্রপাত হয়, তাহা হইতে অনেক দূরে জীবনরীয়ে উহার সাংঘাতিক ক্রিয়া দেখা যায়। তড়িৎদ্বারা যে জীবদেহে বিকল্প তড়িৎ উৎপাদন করে; যে ও ভূপৃষ্ঠের বিষমবর্ষা তড়িৎের সঞ্চিত কালে জীবদেহে উদ্দীপ্ত তড়িৎ সহসা নির্গত হইয়া ভূপৃষ্ঠে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। অকস্মাৎ তড়িৎহীন অবস্থা হইতে বিমুক্ত হইবার সময় শরীর মধ্যে যে ভীষণ উত্তেজনা জন্মে, তাহাই পূর্কোক্ত বিপৎসঙ্কুল ব্যাপারের কারণ।

৩৩। পূর্ক উল্লিখিত হইয়াছে, যে, সূর্যমুখ স্কন্দ শলাকা, পদার্থকে তড়িৎহীন করে। গৃহকে বজ্রাঘাত হইতে নিরাপদে রক্ষিত করিতে হইলে

উহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি সূর্যশীর্ষ

বজ্রবারক

সূর্যমুখ লৌহশলাকার স্কন্দপ্রান্তকে

ভূগর্ভের সহিত উত্তমরূপে প্রোথিত

করিতে হইবে। শলাকাটির স্কন্দ প্রান্ত গৃহের উচ্চতম অংশ অতিক্রম করিয়া শূন্যে অবস্থিত থাকিবে। এইরূপ লৌহদণ্ডকে “বজ্রবারক” (Lightning Conductor) বলে। তড়িৎবিশিষ্ট যে, দণ্ডে উর্দ্ধস্থ আকাশ পথ দিয়া বাইবার সময় দণ্ডে যে বিকল্পবর্ষা তড়িৎ উদ্দীপন করে, তাহা দণ্ডের সূর্যশীর্ষ দিয়া নির্গত হয় এবং মেঘের তড়িৎের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে তড়িৎহীন করে। এইরূপে দণ্ডটি যেন বীরে বীরে তড়িৎদ্বারা মেঘ হইতে তড়িৎরূপে অনল অপহরণ করে।

৩৪। পৃথিবীর মেরুপ্রান্তে দিবাবসান কালে মধ্যে মধ্যে আকাশ

পথে এক দিব্যপ্রভা বিদ্যোভাসমান

মেরুপ্রভা।

হয়। ইহাকে “মেরুপ্রভা” (Polar

Aurora) বলে। এই ছটা প্রথমে

যেন কুহেলিকার জাঘ অক্ষুটভাবে প্রতিভাত হয়, ক্রমে পীতাত ধূসর আকারে পরিবর্তিত হইয়া যায়। শেষে ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া



পড়ে ; সঙ্গে সঙ্গে রশ্মির বর্ণপরিবর্তনও ঘটে। এই আলোকময় ধনুঃ চৌদ্দকন্টার ব্যতিক্রম উৎপাদন করে এবং উহার জাঘ উত্তরদিক্ সূচনা করে। এই কারণে কেহ কেহ অস্বাভাবিক করেন, যে, এই নৈসর্গিক ঘটনাটি বায়ু-রাশির উর্দ্ধতম প্রদেশের ভূত্বিকঃস্রাবের লক্ষণমাত্র। বাহা ইউক, প্রকৃতি-দেবীর শিরোবেষ্টন স্বরূপ এই জ্যোতিঃ যে বিশ্বস্তার এক স্ফটিক শিল্পের নিদর্শন, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

## উত্তরাখণ্ডে গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি ।

( ত্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক । )

আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেব দেশভ্রমণে বা তীর্থ ভ্রমণে আগ্রহ দেখা যায়। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে অতি শুভ চিহ্ন ; কাবণ, শিক্ষিত লোকে যদ্যপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শিল্প বাণিজ্য এবং সামাজিক ও বাজ্ঞনৈতিক অবস্থা সকল এই ভ্রমণ বাপদেশে বিশেষ মনোযোগেব সহিত লক্ষ্য রাখিয়া এবং কোন্ দেশ কোন্ বিষয়ে কেন উন্নতি বা অবনতি লাভ করিতেছে, তাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া, সে বিষয়ে স্থির ভাবে বিচার পূর্বক, নিজ দেশের বা সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতিতে যে সকল দোষ আছে বা তাহাতে দেশের বা সমাজের অবনতি হইতেছে, তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের ও সমাজের নিশ্চয়ই প্রভূত উপকার হয়। তাহা-বের কৃত সংশোধন বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাবে যে আন্দোলন, তাহাতে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই প্রাণের সহিত নিশ্চয়ই যোগ দান করে ; নচেৎ দেশের বা সমাজের ছববস্থা নিজে প্রত্যক্ষ না করিয়া, এবং অপরাপর দেশ বা সমাজ সেই সকল অবনতি হইতে আপনাদিগকে কি উপায়ে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে, ও তাহার ফল সন্ধ্যাঞ্জনক হইতেছে কি না, এই সকল নিজে বিচার না করিয়া যে আন্দোলন, তাহা বৃথা সময় নষ্ট আশ্রয়। আব হিন্দুধর্মের

বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ মতের প্রাধান্ত ভারতে কতদূর বিস্তার করিয়াছে ও সেই সেই মতের প্রতিপত্তিতে দেশের সাধারণ অবস্থা কতদূর উন্নত বা অবনত হইয়াছে, এবং সেই সকল মতে কতদূর উদার বা সঙ্কীর্ণ ভাব আছে, বা সেই সকল মতের মধ্যে সাধারণ ভাব কি কি আছে, যাহাকে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি বা সাম্প্রদায়িকভাববর্জিত ভিত্তি বলা যায়; এই সকল বিষয় ভারতের বিভিন্ন তীর্থ স্থান সকল ভ্রমণে বেশ বলিতে পারা যায়, কারণ, তীর্থ স্থানে ভারতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীর সম্বন্ধেই দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কারপ্রবাসী লোকের আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে সাম্প্রদায়িক গোড়ামি বা কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব সম্প্রদায়েন অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। তীর্থ ভ্রমণে বিশেষ উপকার এই যে, ইহাতে অন্তরে ঈশ্বর চিন্তা বা ভগবদ্ভাবের বিশেষ উদ্দীপনা হয়, সহজেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়, ঘোর সাংসারিকের অপর কাহাবও ইষ্টেব প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে কেবল মাত্র নিজ বা নিজ পারিবারিক স্বার্থচিন্তার ভাব, তাহার বেগও মন্দীভূত হয়; এবং সাংসারিক নানা বিষয়ে অশান্ত জীবকে যেন অনেক পরিমাণে শান্তি দান করে।

আজকাল ভারতের প্রায় সর্বত্র বেল হওয়ায় এবং ইংবাজের অধিকার বিস্তৃত হওয়ায় তীর্থাদি ভ্রমণে কোন রূপ অসুবিধা নাই এবং তীর্থ ভ্রমণ বিষয়ে অনেক পুস্তকাদি বাহিবে হওয়ায় সাধারণের ঐ সকল স্থানের বিবরণ জানিবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। তবে যে সকল তীর্থের নিকট এখনও রেল নাই এবং হিমালয়ে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ ভ্রমণে সাধারণের কিছু অসুবিধা হয়; কাবণ, একে ত ঐ সকল স্থানের বিবরণ প্রাঞ্জল ভাবে কোন পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় না, তাহাতে আবার পথ অতিশয় দুর্গম, ঐ সকল পথে সচবাচর সুবিধামত স্থান বাহনাদি পাওয়া যায় না, শারীরিক অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়, পাকশাক করিবার অভ্যাস কতকটা নিজেব থাকা চাই, ও শরীরেও সামর্থ্য থাকা দরকার। কিন্তু এই সকল দুর্গম তীর্থে শারীরিক যতই কেন কষ্ট হউক না, মনের বল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পথে ঈশ্বরচিন্তা বা ভগবানের লীলাস্থান দেখিতে যাইতেছি, এই ভাব মনে সর্বদা জাগরুক থাকে; অপর কোনরূপ কুচিন্তা মনে আদৌ আসে না, তীর্থ স্থানের যতই নিকট হওয়া যায়, মনে ততই উত্তরোত্তর আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং

তীর্থে যাইয়া পৌঁছিলে সাংসারিক ভাব প্রায় একেবারে ভুলিয়া যাওয়া যায়। রেলের নিকট অবস্থিত যে সকল বনজনপূর্ণ তীর্থ আছে, তথায় রেবে চড়িয়া গিয়া তথাকার ঐশ্বর্য বা সমৃদ্ধি দেখিয়া ও লোকজনের, গাড়ি ঘোড়ার কোলাহল শুনিয়া পূর্বোক্ত রূপ ভগবৎ-উদ্দীপনা বা আনন্দ হয় না। সাধারণ এইরূপ দুর্গম তীর্থ দর্শন কবিযাছেন, তাহারা সাধারণের সুবিধার জন্ত সেই সকল তীর্থের বিবরণ যতদূর সম্ভব প্রাক্কল ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিলে ভবিষ্যৎ যাত্রীগণের জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনেক সাহায্য হইতে পারে।

গত আশ্বিন মাসের উদ্বোধন পত্রিকায় ‘হিমালয়ে কেদারনাথ’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। জন কতক বিদ্যালয়ের ছাত্র বিদ্যালয়ের অবকাশের সময় অলসভাবে নষ্ট না করিয়া প্রকৃতির অনন্ত গভীর মূর্তি, চিত-শান্তি-নিকেতন সেই তুষাবমণ্ডিত হিমালয়ে কেদারনাথ দর্শনে গিয়াছিল; দেশের শিক্ষিত যুবকদের ইহা অনুকরণীয় হইলে ভাল হয়। আমি নিজে কিছুদিন পূর্বে হিমালয়ের এই সকল তীর্থে একবার গিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পথেব বিবরণ ও অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় সচরাচর পুস্তকাদিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, সাধারণের সুবিধার জন্ত প্রদত্ত হইল।

আমি বৈশাখ মাসে, রেলযোগে হরিদ্বার পৌঁছিয়া হিমালয়ের গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বজ্রনাথ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিবার জন্ত, রাস্তাদির বিবরণ পাণ্ডাদের, পাহাড়ীদের এবং সাধুদের নিকট সংগ্রহ করিতে লাগিলাম; সকলেই প্রায় গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী পথের বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে লাগিল; এবং ঐ সকল স্থানে যাইবার রাস্তা নাই, সাধুরা মহা কষ্টে ঐ সকল স্থানে যায়, সাধারণে প্রায় যাইতে পারে না, সময় সময় খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, পথে লোকজন বা সহযাত্রী মিলে না, সময় সময় পথভ্রান্ত হইয়া অনেকে অনাহারে মারা গিয়াছে, এইরূপ নানান ভয় দেখাইয়া উক্ত দুই স্থানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিল। আমার নিজের রসুই করা ভাল রকম অভ্যাস না থাকায় ৫১৬ দিন মধ্যে রামচন্দ্র পাণ্ডা নামে গজাম (Ganjam) বানী একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিলাম। উক্ত ব্রাহ্মণের ঐ সকল তীর্থে যাইবার খুব প্রবল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অর্থ ও সঙ্গীর অভাবে যাইতে ইত-

স্তম্ভ করিতেছিল, আমি সঙ্গে লওয়ায় সে আনন্দিত হইল এবং আমারও রত্নয়ের সুবিধা হইল। সাধুদের মুখে গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি পথের তুর্গমতা শুনিয়া আমরা উভয়ে উপস্থিত উক্ত স্থানদ্বয় বাইবার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কেদার ও বজ্রিনারায়ণ বাইবার ঠিক করিলাম। কেদার বজ্রির পথে বরাবর ৪৫ মাইল অন্তর চটী থাকায়, এবং দ্রব্যাদিও আমাদের নিকট বিশেষ কিছু ছিল না বলিয়া আমরা আর হরিদ্বার হইতে মুটে করিলাম না। এই পথের যাত্রীগণের জন্য হরিদ্বারে বিস্তর পাহাড়ী মুটে, কাঁপান (মাল্লকে বহন করিয়া লইয়া বাইবার জন্য বুড়ি) ও কাণ্ডি (একপ্রকার ডুলি) মজুত থাকে। হরিদ্বার হইতে আমাদের যাত্রা করিবার পূর্বে দিন, কলিকাতানিবাসী বিনোদবিহারী দাস নামে একটা বাঙ্গালী যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তিনি তৎপূর্বে দিন রাত্রে আসিয়া হরিদ্বার পৌঁছিযাছেন, তাঁহারও হিমালয়ের ঐ সকল স্থানে বাইবার ইচ্ছা ছিল এবং তিনি আমাদের সহিত একত্রে বাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করার আমবা ও জন একত্রে পর দিবস প্রাতে কেদার বজ্রির পথে যাত্রা করিলাম।

কেদার বজ্রির পথ বেশ বাঁধা রাস্তা, পথে বরাবর মাইলষ্টোন দেওয়া থাকায় কত মাইল চলিয়া আসিয়াছি ও কত মাইল বাকি আছে, বেশ বুঝা যায়, পথে কুলি, কাণ্ডি ও কাঁপান পাওয়া যায়; এবং বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যহ হরিদ্বার হইতে ১৫০।২০০ যাত্রী দর্শন করিতে যায়। আমরা তিন জনে যে যাহার আপনাপন বস্ত্র কঞ্চল ঘাড়ে করিয়া চড়াই ওৎরাই করিতে কবিতো দিবা ১০।১১ টার সময় হরিদ্বার হইতে ৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত দেবপ্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে অলকানন্দার সহিত ভাগীরথী গঙ্গা মিলিত হইয়াছে। বজ্রিনারায়ণের পাণ্ডারের বাটা এই স্থানে। পাহাড়ের মধ্যে এটা বেশ বর্দিকু গ্রাম, এই স্থান হইতে গঙ্গোত্রি বাইবার একটা পথ আছে। আমাদের ৩ জনেরই মনে গঙ্গোত্রি বাইবার প্রবল বাসনা থাকায় আমরা এই স্থান হইতে উক্ত পথের ভাল করিয়া সমাচার লইলাম। এই স্থানের পাণ্ডা বলিল যে, এই পথে চটী দোকান নাই, এই স্থান হইতে ২৫ মাইল যাইলে গড়োয়ালের বর্তমান রাজধানী টিহরি সহর পাওয়া যাইবে, সেখানে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়; অতএব এই ২৫ মাইলের জন্য ২।৩ দিনের মতন চাউল, দাল, আটা সঙ্গে লইতে হইবে; এবং সেই কারণ বোক বহিবাস ও পথপ্রদর্শক বন্ধপ

মুটে করিলে ভাল হয়। তাহার উপদেশ মত এই স্থানে আমবা মুটেব জন্ত অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সুবিধামত মুটে পাওয়া গেল না। আমাদের গন্ধোত্রি যাইবার ইচ্ছা বিশেষ প্রবল হওয়ায় আমবা এইস্থানে দুই দিন থাকিয়া ও তিন দিনেব মতন আহাবীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া, তৃতীয় দিবস প্রভু্যে গন্ধোত্রি যাইবার জন্ত এই স্থান হইতে টেবি বা টিহিবী যাত্রা করিলাম। আহাবীয় দ্রব্য ও কাপড়াদি মুটে না পাওয়ায় আপনারাি খাড়ে কবিলাম, আর পূর্ব দিবস পাণ্ডাকে বলা থাকায় তিনি আমাদের সঙ্গে গ্রামেব বাহিরে আসিয়া টেবি যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

এই পথে বেশ বাধা বাস্তা নাই। স্থানে স্থানে রাস্তার চিহ্ন আছে এবং স্থানে স্থানে নাই। পথে পাহাড়ী লোক ২১ জন মধ্যে মধ্যে যাতায়াত কবিতেছে। বাহা হউক, আমরা চড়াই করিয়া প্রায় ১১টার সময় একটা ঝংনার নিকট বৃক্ষতলে আহাৰাদি করিলাম এবং এই স্থানেই এক জন পাহাড়ীকে মুটে ঠিক কবিলাম, তাহার নাম মানসিং, জাতি ব্রহ্মপুত। এই স্থানেব নিকট কোন গ্রামে তাহার বাটা। সে তাহাব পরিচিত পথের অপর লোকের দ্বারা তাহার নিজ বাটাতে মুটীয়া কক্ষে নিযুক্ত হওয়ার সম্বাদ পাঠাইয়া দিল এবং আমাদের সমুদায় দ্রব্যাদি একত্র বাঁধিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া যাত্রা কবিল।

পথে প্রথম বাত্র নাগগাঁয়ে কোন পাহাড়িব বাটাতে বাসা করিলাম। গ্রামে ২৪১২৫ ঘব লোকের বাস। সাধাবণতঃ পাহাড়িব গাঁ, আমাদের দেশের গাঁয়ের ন্যায় বহুজনপূর্ণ নহে। গাড়োয়াল এবং কুমাউনেব লোক সাধারণতঃ সবল, বিনয়ী, বিশ্বাসী, আতিথেয় এবং নিবাস্রয়কে আশ্রয় দেয়; বিশেষ, এই অঞ্চলে চুরি প্রবন্ধনা খুব কম। এই নাগ গাঁয়ে একটা নড় কুসংস্কারপূর্ণ প্রথা প্রচলিত আছে। এই গাঁয়ে যে সকল মেয়ে জন্মায়, তাহাদিগের বিবাহ দেওয়া হয় না, তাহাদিগকে এই গাঁয়ের ইষ্ট দেবতা নাগ-নাথ নামক মহাদেবেব কুমাৰী হইয়া চির জীবন থাকিতে হয়। নাগনাথ অর্দ্ধাঙ্গিনী পার্ৱতী দেবীৰ মন্দির এখান হইতে প্রায় ২ মাইল উঁচু একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। দেবীৰ নাম চম্ভবদনী দেবী। পথে বিতীয় বাত্র আমবা স্কন্দব গাঁয়ে কোন পাহাড়িব বাটাতে থাকিয়া, তৃতীয় দিবস বেলা ৮১২ টার সময় এই পথের প্রায় শেষে আসিয়া পৌঁছিলাম। কেবল মধ্যে দুই মাইল ওয়াই কবিলেই

গাড়োয়ালের রাজধানী টেরী সহরে পৌঁছিব। পাহাড়ের উপরকার এই স্থান হইতে দুই মাইল নিচে টেরী সহরের দৃশ্য অতীব রমণীয়। টেরী সহর পাহাড়ের মধ্যে নিম্ন সমতল অধিত্যকা ভূমিতে অবস্থিত, সহরের চতুর্দিকে শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্র, ফলবৃক্ষপূর্ণ বাগান, সাহেবদেব থাকিবার বাঙ্গালা, পোলো খেলিবার জায়গা প্রভৃতি রহিয়াছে; এবং সহরের মধ্যে অবস্থিত, প্রশস্ত রাজপথ সকল সুন্দর সৌধমালা ও সহরের পাশে ভাগীরথী গঙ্গা হুম্ম রজত বেণার নায় প্রবাহিত হইতেছে, দেখা যাইতে লাগিল। আমরা পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে অবস্থিত এই সকল দৃশ্য ঠিক যেন এক থানি প্রকৃতি কর্তৃক অঙ্কিত ছবিব ন্যায় দেখিয়া মনে বড় আনন্দ লাভ করিলাম।

সে যাহা হউক এই ২ মাইল পথ ওৎরাই করিয়া বেলা ১১ টার সময় আমরা টেরী সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম; সহরে রাজার বাড়ী বা কেহলা একটা উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এখানে গাড়োয়ালের হিন্দুরাজা থাকেন। নিকটেই রেসিডেন্ট (Resident) সাহেবের বাঙ্গালা এখানকার রাজা, সাধুশাস্ত্র দিগকে গঙ্গোত্রি প্রভৃতি যাইবার কারণ অর্থ সাহায্য করেন। এখানে ছত্র, ধর্মশালা, ডাক্তারখানা, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, পুলিশ, দেওয়ানী ও মোজদারি কাছারি এবং অনেক দেবালয় ও সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান আছে। আমরা এই সকল দেখিতে দেখিতে সহরের মধ্যে থাকিবার জন্য একটা ধর্মশালায় গেলাম; কিন্তু এই ধর্মশালায় সকল বিষয়ের সুবিধা না থাকায় আমরা গঙ্গার ধারে একটা মন্দিরে বাসা লইলাম। আমরা পর দিবস পথের জন্য আবশ্যকীয় ২১১ টা দ্রব্য ও ২১৩ দিনের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী খরিদ করিয়া সঙ্গে লইলাম। কাবণ; গঙ্গোত্রি পথে চটা নাই, তবে মধ্যে মধ্যে ধর্মশালা ও স্থানে স্থানে দুই একটা দোকান আছে; যাত্রিগণের নিজের সুবিধার জন্য এই পথে ২১১ দিনের খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে রাখা উচিত। টেরী সহর গঙ্গার বাম তটে অবস্থিত, এখান হইতে গঙ্গোত্রী ১০০ মাইল, গঙ্গোত্রি পর্যন্ত প্রায় গঙ্গার ধারে ধারে কখন বাম তট দিয়া কখন দক্ষিণ তট দিয়া বেশ বাধা রাস্তা আছে পথে চড়াই ওৎরাই বড় বেশী নাই।

টেরিতে ২ দিন থাকিয়া তৃতীয় দিন প্রাতে আমরা গঙ্গোত্রি যাত্রা করিলাম। প্রথমেই একটা পোলের উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া গঙ্গার দক্ষিণ তট দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক মাইল পর্যন্ত বেশ কাটরোড

আছে, তাহার পর ৯৫ হাত প্রশস্ত একটা বাঁধ রাস্তা বরাবর গঙ্গোত্রী গিয়াছে এবং পূর্বোক্ত কার্ট রোড বরাবর মসৌরি ( Mussoorie ) অবধি বিস্তৃত । বাঁধা সোজা পথে ( direct ) গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা রেলের করিয়া দেরাছুন ( Dehra-Dun ) আসিবেন ; দেরাছুন হইতে রাজপুর হইয়া মসৌরি যাইতে হয় । রাজপুর অবধি টঙ্গা পাওয়া যায় ; এবং তথা হইতে মসৌরি পর্য্যন্ত ডাঙি বা ঘোড়া পাওয়া যায় । দেরাছুন হইতে চলিয়া গেলে মসৌরি ৩ দিনে পৌঁছান যায় । পথে চটা ও দোকান অনেক আছে । মসৌরি হইতে টেরি পর্য্যন্ত বেশ চওড়া কার্ট রোড ও পাক ডাঙি বা খুন্নি রাস্তা আছে ; ইন্টিয়া গেলে কার্ট রোডে ৩ দিনে ও পাকডাঙি পথে ২ দিনে টেরি পৌঁছান যায় । তাহাব পর টেরি হইতে গঙ্গোত্রী আমরা যে রাস্তায গিয়াছিলাম, সেই রাস্তায যাইলেই হইল । আমরা টেরী হইতে এক মাইল পথ মসৌরি যাইবার কার্ট বোডে আসিয়া, পরে ডান হাতি গঙ্গোত্রির রাস্তা পাইয়া সেই রাস্তায় চলিলাম ।

প্রথম রাত্র পথে একটা গ্রামে বাস করিয়া দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় ধরাসু নামক স্থানে একটা ধরমশালায় রহিলাম, এই পথে যাত্রী খুব কম, মধ্যে মধ্যে ২৪ জনের সহিত দেখা হইতেছে, তবে পাহাড়ি লোক অনেক বাতায়াত কবে ; পথে কদাচিৎ ২১ টা দোকান পাওয়া যায় । তবে ধরাসু হইতে গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত ৫৬ ক্রোশ অন্তর ধরমশালা আছে । ধরমশালা গুলি কোথাও একতলা কোথাও দুই তলা কার্ট ও পাথরে নির্মিত । প্রায়ই অপরিষ্কার এবং পাহাড়ি মহাজন দিগের গমত্তারা এই সকল ধরমশালায় তাহাদের সমভিব্যাহারী মাল-বাহী ছাগল ও ভেড়া রাখিয়া আরও অপরিষ্কার করে । এই পথে পণ্য দ্রব্য সমুদয় মাছবের দ্বারা এবং ছাগল ও ভেড়ার পিঠে করিয়া আমদানি রপ্তানি হয় ; ছাগল ও ভেড়ার পিঠে ছোট ছোট জুইট করিয়া বলি জুইদিকে ছালা করিয়া বাধিয়া দেয় । তাহাতে চাউল, দাল, মুন, গম, সব প্রভৃতি দ্রব্য থাকে । প্রায়ই পথে এইরূপ ৫০-৭০০ ছাগল ও ভেড়ার দল, সঙ্গে ৫৬ জন মাত্র রক্ষক ও ২০-টা কুকুরের সহিত এই সংকীর্ণ পথ আবদ্ধ করিয়া বাতায়াত করিতেছে, যাত্রীদিগকে এইরূপ দল আসিলে পথ ছাড়িয়া দিতে হয় এবং সময় সময় ইহাদের পাশ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয় ।

আমরা তৃতীয় দিন হুপুর বেলার ঢুঙা নামক স্থানে পৌঁছিলাম, এখানে পাথেই গঙ্গা ও একটি পরিষ্কার ধরমশালা এবং নিকটেই একটি দোকান আছে। এই স্থানে ৪৭ জন গৃহস্থ বাড়ীর সহিত দেখা হইল, সঙ্গে ৪৫ জন পাণ্ডা আছে; বাড়িগণের মধ্যে একজন পুরুষ অভিভাবক ভিন্ন সকলেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। ইহারা বেশ সজ্জিতপন্ন, মসৌরিতে দোকান করে, ইহারা প্রথমে যমুনোত্রি দেখিয়া তবে গন্ধোত্রি বাইবে। আমাদেবও যমুনোত্রি বাইবার বিশেষ ইচ্ছা থাকায় ইহাদের সঙ্গে পাণ্ডাদের নিকট হইতে উক্ত পথের অনুসন্ধান লইতে লাগিলাম। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম যে, এই স্থান হইতে ৪৫ মাইল দূরে যমুনোত্রি বাইবার একটি রাস্তা আছে ও এই রাস্তায় চড়াই কম। অপর একটি রাস্তা উত্তর কালী কান্ধ হইতে আছে, কিন্তু তাহাতে ভয়ানক চড়াই করিতে হয়। সেই কারণ ইহারা প্রথমোক্ত পথে বাইবে স্থির করিয়াছে। আমরা যমুনোত্রি বাইব বলায় তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল; বেলা একটার সময় আমরা তাহাদের সহিত একত্রে যাত্রা করিয়া ৪৫ মাইল পথ গন্ধোত্রির বাঁধা পথে আসিয়া পাহাড়ের উপর একটি চৌকিঘর দেখিতে পাওয়ায় পাণ্ডারা বলিল, এই স্থান হইতে বাঁ দিকে যমুনোত্রি বাইতে হইবে। আমবা সকলে সেই বাঁ দিকের পাহাড়ে উঠিবার উদ্যোগ করিলে পাহাড়ের উপরকার সেই চৌকি হইতে ২৩ জন পাহারাদার বাহির হইয়া বলিল যে, এই পথের মধ্যে এক স্থানে পাহাড়ের ধস ভাঙ্গিয়া ষাণ্ডয়ার রাজার হুকুমে কাহাকেও এই পথে বাইতে দেওয়া নিষেধ। অতএব আমরা উক্ত রাস্তায় বাইতে নিবৃত্ত হইয়া উত্তর কালী হইতে বাইবার স্থির করিলাম এবং পুনরায় গন্ধোত্রির পথে চলিলাম।

পথে বাইতে বাইতে মসৌরির সেই স্ত্রীলোকেবা বলিতে লাগিল, বাবুজী, আমরা একে বৃদ্ধা, তাহাতে এই পথে কাঁপান বা কাণ্ডি পাওয়া যায় না, আমরা উত্তরকালী হইতে চড়াই পথে কি করিয়া বাইব? পাঠকগণের জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, টেন্নি হইতে গন্ধোত্রি বা যমুনোত্রির রাস্তায়, কেলার বজ্রিনারায়ণের রাস্তার জায় কাঁপান বা কাণ্ডি পাওয়া যায় না, সকলকেই হাঁটিয়া বাইতে হয়। মসৌরির বাড়িগণের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকায়, তাহারা নিতান্ত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল সুতরাং আমরা তাহাদের সব ত্যাগ করিয়া, পথে বরাট নামক স্থানের ধরমশালার রাস্তাে রহিয়া পর দিবস হুপুর বেলায় উত্তরকালী আসিয়া পৌঁছিলাম।



উত্তরকানীতে ২টা ছত্র আছে, ১টা কলিকাতাওয়ালার বা কলিকাতার মাড়োয়ারিদের ও অপরটা একজন ব্রহ্মচারীর স্থাপিত ; সাধারণ বাজীর থাকিবার জন্য কলিকাতাওয়ালা ছত্দের লাগাও বেশ ভাল ধরশালা আছে ; আমরা সেই ধরশালায় বাসা লইলাম । উত্তরকানী গঙ্গার দক্ষিণ পাশে অবস্থিত, এখানে বারাগসী কানীর জায় গঙ্গা উত্তরবাহিনী, এবং বিম্বেশ্বর ও কেশবের মন্দির, আর গঙ্গায় মণিকর্ণিকা ও কেশব ঘাট আছে । আমরা এই স্থানের একজন পাণ্ডাব সহিত গঙ্গার গর্ভে অবস্থিত মণিকর্ণিকা হুণ্ডে স্নান কবিশ্যাম এবং বিম্বেশ্বর ও কেশব দর্শন করিয়া বাসায় আসিলাম ।

উত্তরকানীতে অনেক সাধু আসিয়া গ্রীষ্মকালে বাস করেন, স্থানও বেশ রমণীয়, ও ৩০৪০ ঘর লোকের বাস ; উক্ত ছত্র দুইটা হইতে দুপুরবেলায় একবার মাত্র সন্ন্যাসীদিগকে তৈয়ারি ভাত, রুটী, তরকারি বা ডাল দেওয়া হয় তাহার। উক্ত আহারীয় লইয়া, আপন আপন কুটার বা গুফায় চলিয়া যান ; এবং তথায় নির্জনে বসিয়া দীর্ঘরাত্রি আরাধনা করেন ; অপর সাধুদিগকে ছত্র হইতে কাঁচা সিদ্ধা দেওয়া হয় । উত্তরাধিকার (সাধুরা হিমা-ব্রহ্মকে উত্তরাধিকার বলেন ) মধ্যে কেবল এই স্থানে অনেক ভাল ভাল জানী সন্ন্যাসীর সমাগম, এবং বেদান্তের বেশ আলোচনা দেখিলাম । কলিকাতাওয়ালা ছত্বেব কর্মচারীরা বেশ প্রাণের সহিত সাধুসেবা করেন, ও তাঁহাদের বিষয়ে খুব অমুরাগ আছে । গঙ্গোত্রি ও যমুনোত্রি-যাত্রাকারী সাধুদিগকে এই ছত্র হইতে পথে আহারের কারণ ৩৪ দিনের সিদ্ধা দেওয়া হয়, এই রূপ টেরির ছত্রেও সিদ্ধা দিবাব ব্যবস্থা আছে ; এই ছত্র হইতে গঙ্গোত্রিতে ১টা ও যমুনোত্রির নিকট পাণ্ডাগাঁয়ে অপর একটা শাখা ছত্র খোলা হয় ; কিন্তু শাখা ছত্রে কাঁচা সিদ্ধা দিয়া থাকে । আমরা উক্ত কর্মচারীর ঘূষে গুনিলাম যে, যমুনোত্রির পথে অভ্যস্ত বরফ থাকায় এখন পর্য্যন্ত পাণ্ডা গাঁয়েব ছত্র খোলা হয় নাই, তবে এখন অনেক পরিমাণে বরফ কমিয়া যাওয়ায়, ৫৬ দিন পরে আহানীর জন্য কুলির দ্বারা পাঠাইয়া ছত্র খোলা হইবে । যমুনোত্রি পথের অপরাপর সম্ভাব্য উক্ত কর্মচারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলাম ।

এই ধরশালায় দুইটা পাঞ্জাবি সাধু ২৩ দিবস হইল যমুনোত্রি দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনের অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগায় বৃকে পিঠে স্বাক্ষর বেদনা হইয়াছে, সে জন্য তাহার সঙ্গী বেদনার স্থানে তেল মাগিল

করিতেছিল; আমরা তাহাদের যুখে গুনিলাম যে, পথে এখনও অনেক স্থানে বরফ আছে, সেই কারণ তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। উত্তরকানীতে ২৩টী দোকান আছে, আমরা যমুনোত্রি পথের জন্ত ৫৬ দিনের আহারীয় ক্রয় করিয়া লইলাম এবং এই স্থানে ২ দিন বিশ্রাম করিয়া তৃতীয় দিবস প্রাতে যমুনোত্রি বা বঙ্কোত্রি যাত্রা করিলাম (পাহাড়িরা যমুনোত্রিকে বঙ্কোত্রি বলে)।

আমরা উত্তরকানী হইতে বাহির হইয়া প্রায় ১ মাইল পূর্বোক্ত গঙ্গোত্রির রাস্তায় টেরিব দিকে কিরিয়া আসিয়া একটা বড় বরনার নিকট যমুনোত্রির রাস্তা পাইলাম এবং তথা হইতে গঙ্গোত্রির রাস্তা ত্যাগ করিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া যমুনোত্রির দিকে চলিতে লাগিলাম। উত্তরকানী হইতে যমুনোত্রি পাহাড়িদেব কথায় ৩০ ক্রোশ, কিন্তু আমাদের হিসাবে আন্দাজ ৪৫ মাইল; পথে কোন রূপ বাধা বাস্তা, দোকান, চটী, বা ধরমশালা নাই, তবে মধ্যে মধ্যে গ্রাম পাওয়া যায় মাত্র। আমবা পথে প্রথম রাত্র কাওয়া গাঁয়ে থাকিয়া, দ্বিতীয় দিন বেলা ৩টার সময় উপরি কোট গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই গ্রামের লোকদের নিকট অগ্রবর্তী পথের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, এই স্থান হইতে একটা পাহাড় ১০ মাইল চড়াই করিয়া, পুনরায় ৯ মাইল ওৎবাই করিলে তবে দাঙ্গব গাঁয়ে পৌঁছিব, এবং চড়াইযেব যুখে ৭ মাইল জঙ্গ পাওয়া যাব না। এই সকল বিবরণ শুনিয়া এবং আমাদের পাহাড়ি মুটে পূর্বে কখন যমুনোত্রি আসে নাই, কি জানি যদি পথভ্রান্ত হই, এই ভয়ে আমরা এই গ্রাম হইতে পরসা দিয়া একজন পথজানা লোক ও পানীয় জল সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে উঠিবার সঙ্কল্প করিলাম; কারণ, তখনও তিন ঘণ্টা দিন রহিয়াছে। সে দিন আকাশে মেঘ হওয়ায় কোন লোকই আমাদের সঙ্গে বাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বলিল, যেরূপ মেঘ হইতেছে, তাহাতে শিলারূটি হইতে পাবে, এবং এখানে এক একটা শিলা আধ পোয়া, তিন চটাক পরিমাণেব পড়ে, পাহাড়ের উপর অনাহৃত স্থানে ঐ রূপ শিলারূটি হইলে বড় বিপদজনক; আর এই স্থান হইতে দাঙ্গব গাঁ একদিনে যাইলেই বড় ভাল, কারণ, রাত্রে এই পাহাড়ে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। আমরাও এই সকল অনুবিধার জন্ত সে দিনের মতন যাত্রা বন্ধ করিয়া এই গ্রামের একটা কাষ্ঠনির্মিত দেবমন্দিরে বাস

লইলাম। এই বলিলে আমাদের আগে আসিয়া গাং জন সাধু আশ্রম লইয়াছিল, তাহারাত্তি বহুনোত্রি বসিবে।

সন্ধ্যায় সময় গ্রামের অনেক গুলিন লোক আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিল। পাহাড়ের মধ্যে গড়োয়াল অত্যন্ত দরিদ্র দেশ, এখানে জী পুরুষ উভয়েই কষলের চাপকাণের কাষ পা পর্যন্ত নিচু কোর্ডা ব্যবহার করে, অবস্থাপন্ন পুরুষে কষলের পাজামা পরে, নচেৎ ভিতরে লেঙ্গুটি মাত্র থাকে, ইহারাত্তি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি ভাষায় কথা কয়, তবে অনেকেই শুদ্ধ হিন্দি কহিতে পারে ও সকলেই শুদ্ধ হিন্দি বুঝিতে পারে ; এখানকার কৃষিই উপজীবিকা, জী পুরুষ উভয়ে মিলিয়া কৃষিকার্য্য করে। পুরুষেরা কেহ কেহ নিজের বা পরিবার ভুক্ত অপরের রোগের বিষয় বলিয়া আমাদের নিকট ঔষধ চাহিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস,—আমরা সকলেই চিকিৎসা জানি ; অপর কেহ কেহ তামাক চাহিয়া লইল, কারণ এখানে ভাল তামাক পাওয়া যায় না বলিয়া ইহারাত্তি শুদ্ধ দোক্তা কন্ডেয় ভরিয়া তামাক খায় ; জীলোকেরা ছুঁচ স্নুতা, পুঁথির মালা, কপালে লাগাইবার টিপ্ প্রভৃতি চাহিতে লাগিল। এই সকল সামান্য দ্রব্য পাইলে তাহারা বড়ই আনন্দিত হয় ; যাত্রীরা অনেকেই হরিদ্বার বা টেরি হইতে এই সকল দ্রব্য কিছু কিছু খরিদ করিয়া আনিয়া ইহাদের দিয়া থাকে।

আমাদের পূর্বে আগত সেই সাধুদের মধ্যে একজন ইহাদের নিকট হুঙ্কের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। আমরাও এ পথে অনেক দিন হুঙ্ক পাই নাই, ( কারণ গ্রাম বাসীদের মধ্যে ‘হুঙ্ক পুত’ বেচিতে নাই বলিয়া একটি প্রবাদ থাকায় কেহই হুঙ্ক বেচিতে চায় না ; তবে অমনি দেয় ) সে জন্ত আমরা সেই সাধুকে আমাদের জন্ত চেষ্টা করিয়া ১১ সের হুঙ্ক খরিদ করিতে বলিলাম ; সেই সাধুটী মস্ত তন্ত্র ঔষধ দিয়া এবং বর বা শাপের লোভ বা ভয় দেখাইয়া একজনের নিকট হইতে আমাদের জন্ত ১১ সের হুঙ্ক ক্রয় করিয়া দিল এবং নিজেরও হুঙ্ক দধি বোগাড় করিয়া লইল। আমরা পর দিনের জন্ত রাত্রে খান কতক কটী করিয়া রাখিয়া দিলাম এবং গ্রাম হইতে কিছু বরের ছাত্ত ও মধু খরিদ করিয়া লইলাম। পর দিন প্রাতে উক্ত সাধুদের সঙ্গে পাহাড় চড়াই করিতে লাগিলাম ; কিন্তু তাহারা ২০ দিনে এই পাহাড়টী পার হইব বলায় আমরা তাহাদের সঙ্গে ত্যাগ করিলার কেবল তাহাদের মধ্য হইতে একজন ব্রহ্মচারী তাহাদের সঙ্গে ছাড়িয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। ( ক্রমশঃ )

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গঃ ]

শ্রীম—কথিত ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

( ডাক্তার ও মার্টার )

আজ বৃহস্পতিবার, আশ্বিন কৃষ্ণা বস্তু, ২৯শে অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ ।  
বেলা দশটা বাজিয়াছে । ঠাকুর রামকৃষ্ণ পীড়িত । কলিকাতার অস্বর্গত  
শ্রামপুকুরে রহিয়াছেন । ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন ।  
ডাক্তারের বাড়ী শাঁখারিটোলা, এখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটা সেবক  
ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেছেন । ঠাকুর রোজ রোজ কেমন থাকেন,  
সেই সংবাদ লইয়া তিনি প্রায় প্রত্যাহ আসেন ।

ডাক্তার । দেখ, বিহারীর (ভাড়ুড়ী) এক কথা । বলে, Goethe's  
spirit (নন্দ শরীর) বেরিয়ে গেল, আবার Goethe তাই দেখছে ।  
কি আশ্চর্য্য কথা !

( সার কি ? )

মার্টার । পরমহংসদেব বলেন, ওসব কথার আমাদের কি দরকার ?  
আমরা পৃথিবীতে এসেছি, বাতে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হয় । তিনি  
বলেন, একজন একটা বাগানে আঁব খেতে গিছলো । সে একটা  
কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, গুণে  
গুণে লিখতে লাগলো । বাগানের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো ।

\* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, - দ্বিতীয়  
সংস্করণ, মূল্য ১ টাকা । বাঁধান মূল্য পাঁচ পিকা । ৫৭ নং  
রামকান্ত বহুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তি-  
রাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩১২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর সেন. কলি-  
কাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য ।

সে বলে, তুমি কি কোরছো আর এখানে এসেছই বা কেন? তখন সে লোকটা বলে, এখানে কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, তাই শুদ্ধি—এখানে আঁব খেতে এসেছি। বাগানের লোকটা বলে, আঁব খেতে এসেছ ত আঁব খেয়ে যাও, তোমার অত শত, কত পাতা, কত ডাল, এ সব কাজ কি?

ডাক্তার। পরমহংস সাবটা নিয়েছে দেখছি।

অতঃপর ডাক্তার তাঁহার হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতাল সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতে লাগিলেন—কত রোগী রোগ আসে, তাদের কুর্দ দেখালেন, বলেন, ডাক্তার সাল্ফার এবং অজান্তে অনেকে তাঁহাকে প্রথমে নিকুংসাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিতেন ইত্যাদি।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠিলেন, মাষ্টারও সঙ্গে উঠিলেন। ডাক্তার নানা রোগী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রথমে চোরবাগান, তার পর মাধাধসার গলি, তার পর পাথুরিয়াঘাটা। সব রোগী দেখা হইলে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিতে বাইবেন।

ডাক্তার পাথুরিয়াঘাট ঠাকুরদের একটা বাড়ীতে গেলেন। সেখানে কিছু বিলম্ব হইল। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার গল্প করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার। এই বাবুটির সঙ্গে পরমহংসের কথা হলো। বিয়সফির কথা—কর্ণেল অলকটের কথা হলো। পরমহংস ঐ বাবুটির ওপর চটা। কেন জান? এ বলে, আমি সব জানি।

মাষ্টার। না, চটা হবেন কেন? তবে শুনেছি, একবার দেখা হয়েছিল। তা পরমহংসদের ঈশ্বরের কথা বলছিলেন। তখন ইনি বলেছিলেন বটে যে, হাঁ, ওসব জানি।

ডাক্তার। এ বাবুটি Science Association এ ৩২৫০০ টাকা দিয়েছে।

গাড়ী চলিতে লাগিল। বড় বাজার হইয়া ফিরিতেছে। ডাক্তার ঠাকুরের সেবা সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন।

ডাক্তার। তোমাদের কি ইচ্ছা একে দক্ষিণেশ্বর পাঠান?

মাষ্টার। না, তাতে ভক্তদের বড় অনুরোধ। কলকাতায় থাকলে সর্বদা যাওয়া আসা যায়—দেখতে পারা যায়।

ডাক্তার। এতে ত অনেক খরচ হচ্ছে।

মাষ্টার। ভক্তদের সে জ্ঞান কোন কষ্ট নাই। তাঁরা বাতে সেবা করতে পারেন, এই চেষ্টা করছেন। খরচ ত এখানেও আছে, সেখানেও আছে। সেখানে গেলে সর্বদা দ্বন্দ্বতে পাবেন না, এই ভাবনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

( ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও 'উত্তমভক্ত' )

ডাক্তার ও মাষ্টার গ্রামপুকুরে আসিয়া একটা দ্বিতল গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেই গৃহের বাহিরের উপরে বারাণ্ডাওয়ালা ছুটা ঘর আছে। একটা পূর্বপশ্চিমে ও অপরটা উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ। তাহার প্রথম ঘবটীতে গিরা দেখেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্ত। কাছে ডাক্তার তাহুড়ি ও অনেকগুলি ভক্ত।

ডাক্তার হাত দেখিলেন ও পীড়ার অবস্থা সমস্ত অবগত হইলেন।  
ক্রমে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কথা হইতে আশির্গ।

তাহুড়ি। কথাটা কি জান? সব স্বপ্নবৎ।

ডাক্তার। সবই delusion ( ভ্রম )! তবে কার delusion আর কেন delusion? আব সন্সাই কথাই বা কয় কেন, delusion কেনেও?  
I cannot believe that God is real and creation is unreal  
( ঈশ্বর সত্য, আর তাঁর সৃষ্টি মিথ্যা, এ বিশ্বাস আমি করিতে পারি না। )

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ বেশ ভাব—তুমি প্রভু, আমি দাস। বতক্ষণ দেহ সত্য বলে বোধ আছে, আমি তুমি আছে, ততক্ষণ সেব্যসেবক ভাবই ভাল, আমি সেই এ বুদ্ধি ভাল নয়।

“আর কি জান? এক পাশ থেকে ঘরকে দেখছি, এও বা, আর ঘরের মধ্যে থেকে ঘরকে দেখছি, সেও তাই।

তাহুড়ি ( ডাক্তারের প্রতি )। এ সব কথা বা বলুন, বেদান্তে আছে। শাস্ত্র চান্দ্র দেখ, তবে ত।

ডাক্তার। কেন, ইনি কি শাস্ত্র দেখে বিধান হয়েছেন? আর ইনিও ত এ কথা বলেন। শাস্ত্র না পড়লে হবে না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি শুনিছি কত!

ডাক্তার। শুধু তুলে কত ভুল থাকতে পারে। তুমি শুধু পোন নাই।

আবার অল্প কথা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আপনি না কি বলেছেন, 'ইনি পাগল' ? তাই এরা (মাষ্টার ইত্যাদির দিকে দেখাইয়া) তোমার কাছে যেতে চায় না।

ডাক্তার (মাষ্টারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)। কই, তবে অহংকার বলেছি। তুমি লোককে পায়ের ধূলা নিতে দাও কেন ?

মাষ্টার। তা না হলে লোকে কাঁদে।

ডাক্তার। তাদের ভুল বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

মাষ্টার। কেন, সর্বভূতে নারায়ণ ?

ডাক্তার। তাতে আমার আপত্তি নেই। সবাইকে কর।

মাষ্টার। কোন কোন মানুষে বেগী প্রকাশ। জল সব জায়গায় আছে, কিন্তু গুহুবে, নদীতে, সমুদ্রে প্রকাশ। আপনি Faradayকে বত মানবেন, নূতন Bachelor of Science কে কি তত মানবেন ?

ডাক্তার। তাতে আমি রাজি আছি। তবে God বল কেন ?

মাষ্টার। আমরা পরম্পর নমস্কার করি কেন ? সকলের হৃদয়মধ্যে নারায়ণ আছেন। আপনি ওসব বিষয় বেগী দেখেন নাই ; ভাবেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। কোন কোন জিনিষে বেগী প্রকাশ। আপনাকে ত বলেছি, সূর্যের বশ্মি মাটিতে এক রকম পড়ে, গাছে এক রকম পড়ে আবার আর্শিতে আব এক রকম। আর্শিতে কিছু বেগী প্রকাশ।

“এই দেখ না, প্রজ্ঞাদাদি আর এরা কি সমান ? প্রজ্ঞাদাদির মন প্রাণ সব তাঁতে সমর্পণ হয়েছিল।

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। আর তোমার এখানের ওপর চান আছে। তুমি আমাকে বোলোছো, তোমায় ভালবাসি !

( ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সংসারী জীব । )

ডাক্তার। তুমি Child of nature, তাই অত বলি। লোক পার হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়। মনে করি, এমন

ভাল লোকটাকে খায়াশ করে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তার চেলারা  
এ রকম করেছিল। তোমার বলি শোন—

ঈশ্বরাকৃত। তোমার কথা কি শুধবে? তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।  
ভাড়া। অর্থাৎ তোমার জীবন আছে। স্বীকৃত বস্তুই ওই, টাকা  
কতি, মান সম্বন্ধে লোভ; কাম, অহঙ্কার।

ডাক্তার। তা বল ত তোমার গলার অস্থিটি কেবল দেখে খাব।  
অন্ত কোন কথার কায় নেই। আর তর্ক করতে হয় ত সব ঠিক ঠাক  
বোলাবে।

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

( অমূল্য ও বিল্য )

( Involution and Evolution  
in vedantic Cosmology. )

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

ঈশ্বরাকৃত। ( ভাড়াটির প্রতি )। কি জানো? ইনি ( ডাক্তার-সরকার )  
এখন নেতি নেতি করে অমূল্যে যাচ্ছে। জীবন জীব নয়, জগৎ নয়,  
হৃষ্টের ছাড়া তিনি, এই সব বিচার ইনি কচ্ছে। যখন বিল্যে আসবে,  
তখন সব যাবে।

“খোল একটি আলান জিনিষ, মাঝ একটি আলান জিনিষ। মাঝ  
কিছু খোল নয়, খোলও মাঝ নয়। কিন্তু শেষে যাহুব দেখে বে, খোলেরই  
মাঝ, মাঝেরই খোল। তিনি চতুর্বিংশতি বছর হয়েছেন, তিনিই যাহুব  
হয়েছেন।

“কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে গেলে মাঝ পাওয়া যায়।

“খোল কিছু মাঝ নয়। কিন্তু শেষে দেখা যায়, খোলেরই মাঝ,  
মাঝেরই খোল।

( ডাক্তারের প্রতি )। “ভক্ত ভিন্ন রকম। অর্থ ভক্ত, বধ্য ভক্ত,  
উভয় ভক্ত।

“অর্থ ভক্ত বলে, ঈশ্বর। ভক্ত বলে, সেই আলান, ঈশ্বর আলান।

“বধ্য ভক্ত বলে, ঈশ্বর অভয়ান্বী। তিনি ঈশ্বর মধ্যে আছেন।  
সে ভক্ত মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে।



“উত্তম ভক্ত দেখে, তিনি এই সব হয়েছেন। তিনিই চতুর্বিংশতি  
তত্ত্ব হয়েছেন। সে দেখে, ঈশ্বর অথো উর্কো, পরিপূর্ণ।

“তুমি গীতা, ভাগবত, বেদান্ত এ সব পড়, তবে এ সব বুঝতে পারবে।  
শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বর কি সৃষ্টি মধ্যে নাই ?

ডাক্তার। না, তিনি সব আশ্রয় আছেন আব আছেন বলে ধোঁজা যায় না।  
কিয়ৎক্ষণ পবে অল্প কথা পড়িন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঈশ্বরীয় ভাব  
সর্বদা হয়, তাহাতে অসুখ বাড়িবাব সম্ভাবনা।

ডাক্তার ( শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি। ভাব চাপবে। আমার খুব ভাব হয়।  
তোমাদের চেয়ে নাচুতে পারি।

ছোট নরেন। ভাব যদি আর একটু বাড়ে, কি করবেন ?

ডাক্তার। Controlling Powerও ( ভাব চাপবার শক্তি ) বাড়বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাফার। সে আপনি বোলুছো ( বলুছেন )। ভাব  
হলে কি হবে, আপনি বলতে পারো ( পাবেন ) ?

## শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্ ।

গৌরাজিনীং স্তবর্ণাভাং কোটিসূর্য্যসমপ্রভাম্ ।

বন্দে হ্রাং পরমানন্দাং সানন্দাং গিরিনন্দিনীম্ ॥

সনাতনীং সতীং সত্যং সুরাসুরসমর্চিতাম্ ।

পশুপক্ষিপতঙ্গাদিপূজিতাং পরমাং পরাম্ ॥

কোটিকোটিসহস্রানাং ব্রহ্মাণ্ডাণামধীশ্বরীম্ ।

নির্লিপ্তামপি লিপ্তাং সন্তোষামপি নিন্তোষাম্ ॥

পরাস্বিকাং পরাংশক্তিং ত্রিলোকস্য পরাংশতিম্ ।

সংসারকূপমগ্নৈস্তৎ মহাজাতপরাস্রবাম্ ॥

অখিলবিশ্বচিহ্নস্তিৎ বিশ্বাখিললয়ালয়াম্ ।

শিবশবসমাসীনাম্ সৌন্দর্য্যসকলাকরাম্ ॥

বোসীজপ্পরমারাধ্যাং সাধকহৃদয়স্থিতাম্ ।

কামাদিরিপুহরীকং সংসারপাশনাশিনীম্ ॥

সর্বভয়াশহরীকং সর্বসঙ্কটতারিণীম্ ।

বিস্ববিশ্বংসিনীং দেবীং জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

স্বাগতা স্বাগতা দেবি স্প্রসন্নো দয়াবতি !  
 নিবসান্নসুখং যাত হৃদয়েন্দীযরে মম ॥  
 গৃহান কৃপয়া মাত ভক্তবাহিতসাধিকে !  
 কর্মপুণ্যং যয়া দত্তং জ্ঞানদীপং সমুজ্জ্বলম্ ॥  
 সুগন্ধিত্যধুপক ভক্তিতোয়ং সুনির্মলম্ ।  
 অমুরাগমলক্ক ঐশংগদারবিন্দয়োঃ ॥  
 প্রেমবিম্বং মনোর্ষ্যোঃ সুনৈবেদ্যমিদং বপুঃ ।  
 সর্কং ভুভ্যং দদাম্যম্ব করুণাং কুরু মে শিবে ॥  
 শ্রীহা—

## সামগান।

ও

অনন্ত ভুবন বিশাল বিশ্ব,  
 আহার সবিতা ও ;  
 স্থিতি স্থিতি প্রলয় কারী,  
 বিশ্ব বিশালা ও ;  
 বাহার বীৰ্য্যে, প্রকাশ বিশ্ব,  
 জন্ম হাবর ও,  
 তপন তারকা আকাশ চক্ৰিমা  
 সাগর ভূধর ও,  
 বাহার তেজে, শক্তি ভুবনে  
 বিশ্ব-বিলোড়ন ও,  
 চলিছে ঘুরিছে, অনন্ত তারকা,  
 অমৃত তপন ও  
 বহিছে পবন, জাগিছে জন্ম  
 স্থিতি স্থাবরে ও,  
 বাহার শক্তি মহান লহরী  
 অনন্ত সাগরে ও,  
 বাহার চেতন মানব চেতন  
 করিছে করম ও

বাহার জ্যোতি' ভাতিছে ভুবনে,  
 বিনাশিছে তহা ওঁ,  
 ওই যে পুরবে, তাহারি জ্যোতি  
 পাইয়া ভুবনে ওঁ,  
 নাশিছে তিমির, জগত সবিতা,  
 প্রথম তপনে ওঁ ।

ত্রিপুরার বিহারী বার চৌধুরী :

## স্বামীজির কথা ।

আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে স্বামীজির সঙ্গে নিম্নলিখিত  
 কথোপকথন হইয়াছিল। তাহার মধ্যে শুটকতক দেওয়া গেল।

ভারতে দার্শনিক বিষয়ে বর্তমানকালে কিরূপ আলোচনা হইয়া থাকে।

ভারতে অবিকাংশই দৈতবাদী; অল্পই অবৈতবাদী। মায়ী ও জীবাত্মা  
 সম্বন্ধেই ভারতে খুব আলোচনা হইয়া থাকে। আমি এদেশে আসিয়া  
 দেখিলাম, শ্রমজীবীরা পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারের অনেক খবর রাখে,  
 কিন্তু তাহাদিগকে ধর্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের  
 মতামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। তাহারা শুধু  
 বলে,—আমবা চর্কে গিয়া থাকি মাত্র। ভাবতে কিন্তু কোন চাষাও  
 যদি রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, সে কিছুই বলিতে  
 পারিবে না, কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারিবে। সে হয়ত  
 লেখাপড়ার কিছু ধার ধারে না, কিন্তু সাধুদের কাছে এই সকল শিক্ষা  
 পাইয়াছে। সারাদিনের ঝাটুনির পর তাহারা গাছতলায় বসিয়া এই সকল  
 বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে।

‘নিষ্ঠাবান্’ হিন্দু বলিতে এখন কি বুঝায়? আজকাল পানাহার ও  
 বিবাহের সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মানিলেই ‘নিষ্ঠাবান্’ হিন্দু হওয়া যায়।  
 তার পর সে যে মতই মাছুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভারতে  
 কখন রীতিমত প্রণালীবদ্ধ চর্চা ছিল না, শুতরাং এই এই মত মানিলেই  
 ‘নিষ্ঠাবান্’ হওয়া যায় এমন কেহ কখন বলে না। মোটামুটি আমরা  
 বলি, বেদবিশ্বাসী হইলেই ‘নিষ্ঠাবান্’ হইল। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায়,

অনেক বৈতবাদী সম্প্রদায় বেদ যত না মানেন, তাহা অপেক্ষা পুরাণ বেশী মানেন।

কৌরিক দর্শনের উপর হিন্দু দর্শন কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল?

খুব সম্ভব যে, আলেকজান্ডার লোকে হিন্দুদর্শনের ভাব অনেক গ্রহণ করিলে তাহাদের দ্বারা এই কৌরিকদের ভিতরেও হিন্দু-দর্শনের ভাব অনেক প্রবেশ করিয়াছিল। পিথাগোরাস সাংখ্যদর্শনের ভাব অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট হেতু আছে। বাহা ইউক, আমাদের ধারণা, এই সাংখ্য দর্শনই বেদনিবদ্ধ দর্শনকে যুক্তিসহায়ে সামঞ্জস্য করিবার প্রথম চেষ্টা। বেদেও এই কপিলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—‘ঋষিং কপিলং প্রমুতং বহুমত্রে’।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুদর্শনের বিরোধ কোথায়?

কোন বিরোধ নাই। হিন্দুদর্শনের সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। আমাদের ‘পরিণামবাদ’ এবং আকাশ ও প্রাণতত্ত্ব ঐক্য আধুনিক মতের মত। তোমাদের পরিণামবাদ (Evolution Theory) আমাদের যোগ ও সাংখ্য দর্শনে রহিয়াছে। পতঞ্জলি বলেন,—‘জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাং।’ তাঁহার মতভেদ কেবল ঐ মতের ব্যাখ্যায়। তাঁহার পরিণামবাদের ব্যাখ্যা ‘আধ্যাত্মিক’, তিনি বলেন,—‘নিমিত্তম-প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ’—যখন কোন কৃষক নিজ ক্ষেত্রে জলসেচন করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে কেবল নিকটবর্তী জলাশয়ের সঙ্গে তাহার ক্ষেত্রের যে ব্যবধান আছে, তাহা ভঙ্গ করিয়া দেয় মাত্র। এইরূপ সকলেই সেই অনন্তস্বরূপ, কেবল মানারূপ বাধার উহার স্বরূপ প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। কিন্তু ঐ বাধা অপসারিত হইলেই উহার সেই অনন্তস্বরূপ প্রকাশিত হয় পণ্ডিতে অরব গুণভাবে এবং নরে আবার দেবত্ব গুণভাবে অবস্থিত। সুতরাং আমাদের এই সকল নূতন মতের সহিত কোন বিশেষ বিরোধ নাই। এই দেখুন না,—বিষয় জ্ঞানসম্বন্ধে সাংখ্যের মত আধুনিক নৈবিকানের মত হইতে অতি অল্পই তফাত।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বেলুড় মঠ এবং তাহার শাখাস্বরূপ মাজাজ, কাণী প্রভৃতি স্থানের মঠে, এবং রেঙ্গুন, কটক প্রভৃতি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একসপ্ততিতম জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ভক্তগণের সম্মিলন, ভগবদ্ভাস্কর্তন, হরিকথা, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি হইয়াছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় যেন আমরা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন রূপ মহান্ আদর্শের পথে দিন দিন অগ্রসর হই। সেই মহাপুরুষের 'ব্রহ্মই সত্য বস্তু আর সব অবস্তু,' এই বাণী যেন আমাদের হৃদয়ে দিব্যরাত্রি জাগরুক থাকে। কাম, কামন, মান এসকলকে কাকবিষ্ঠা জ্ঞান করিয়া যেন আমরা শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিসম্পন্ন হইতে শিক্ষা করি।

বিগত ১৯ শে ফাল্গুন, বুধবার দোল পূর্ণিমার দিন জেলা যশোহরের অন্তর্গত সিদ্ধিয়া ও নওয়াপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী চেনাটিবা গ্রামের বর্ষাপ্রম্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ৪৫টি সঙ্কীর্্তন সম্প্রদায় প্রাতঃ হইতে প্রায় দশটা পর্য্যন্ত হবিনাম করিয়া সত্যস্থ সকলেব আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় ১০০ নবনারী প্রসাদ ধারণ করিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিবিবাব দিবস ঢাকা উকিল্‌স ইনষ্টিটিউশনে (Ukil's Institution) এক সভার আবিবেশন হয়। একটা সঙ্গীতের পব জুবিলী স্কুলের শিক্ষক বাবু মথুরা মোহন চক্রবর্তী মহাশয় ইংরেজী ভাষায় লিখিত স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ও বাবু হরপ্রসন্ন মজুমদার স্বামীজী কর্তৃক বঙ্গ ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠি হইতে কতক অংশ পড়েন। পরে অত্রস্থ জজ্ কোর্টের উকিল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ভাওয়াল ও ইম্পিরিয়েল সেমিনারীর (Imperial Seminary) হেড্‌ মাস্টার বাবু দিনসু মজুমদার স্বামীজীর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। তৎপর একটা গান পাহিয়া সভার কার্য শেষ হয়।

গত ৬ই ফাল্গুন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিবস ৬ ঘোষিনী মোহন দাস মহাশয়ের গৃহে আসনোপরি পরমহংসদেবের প্রতিমূর্তি স্থাপন

করিয়া ত্রিঐশ্বর্যকৃষ্ণ পুঁথি হইতে ঠাকুরের স্তোত্র ও জন্ম কথা এবং জীবনী হইতে উপদেশ পাঠ করা হয়। পরে ২টা গান করিয়া কার্য সমাধা করা হয়। পরে ৯ই ফাল্গুন রবিবার দিবস পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আসনোপরি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্বক প্রথমে ৩টা গান হইলে অযোধ্যা নিবাসী পণ্ডিত ত্রিযুক্ত শরৎ দাসজী ২টা বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন। তৎপরে উদ্বোধন পত্রিকা হইতে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু পড়া হয় এবং অনেককণ ধরিয়া হরিসংকীৰ্ত্তন হইলে পর উপস্থিত ব্যক্তিগুলিকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া উৎসবের কার্য সমাধা করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (Ramkrishna home of Service) সাহায্যার্থ সিরাজগঞ্জ হইতে এ, পি, কর দ্বারা প্রেরিত ৯৭৬/০ প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন।

কনখল রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সংবাদ আমরা নিয়মিত রূপে পাইতেছি। স্থানাভাবে উদ্বোধনে সমুদয় বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। বীহারী বিশেষ বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ, আলমোড়া জেলা অবৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রে অনুসন্ধান করিবেন।

সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে একটা 'বিবেকানন্দ সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য,—যুবকগণের মধ্যে সনাতন ধর্মের শিক্ষা বিস্তার। এই সমিতি ধর্ম বক্তৃতা, নিয়মিত ধর্মোপদেশ ও ধর্মগুরুকাগার স্থাপন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। অনেক গণ্যমান্ত লোক এই সহুদ্দেশ্যে যোগ দিয়াছেন। আমরা ইহার সর্কাজীন উন্নতি কামনা করি।

আমরা India's Mission to the World ও The Indian Congress নামক দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাইয়াছি। ১৩৫ নং বউবাজার ষ্ট্রট, কলিকাতা হইতে এস, কে, ব্যানার্জি দ্বারা প্রকাশিত। গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ নাই। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য দেশকে ধর্মপ্রাণ করিবার চেষ্টাতেই আমাদের সর্ব প্রকার সমস্যার মীমাংসা হইবে। স্বামী বিবেকানন্দেরও ইহাই মত ছিল। প্রেম ও ধর্মবলে পাশ্চাত্য অনুরের মধ্যে দেবত্ব সকারই ভারতের Mission,—

ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের আবেশিতা এখনও এ কথা বুলুন না একবার যে বিষয়ে এখনও আমাদের প্রেরণ অনুরোধ, সেই বর্ষকে সহায় করিয়া কর্তৃক্রেত্রে অগ্রসর হউন। Congress সম্বন্ধে পুস্তিকাকারের মত এই,—ভিকা দ্বারা কখনও বড় হওয়া যায় না। Congress Agitation ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা। পাশ্চাত্যগণকে আমাদের প্রতি প্রকাশপত্র করাইতে হইবে—তবেই সকল উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত হইবে। আমরা বলি,—ওখু ভায়াই নহে,—সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যেরা যে কারণে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে,—সেই জড় বিজ্ঞানে আমাদেরকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে, তবেই আমরা সর্ববিধ উন্নতির অধিকারী হইব।

## প্রাপ্তি স্বীকার।

কমলা। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিধিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। ৭মং বাছারাম অত্রয়ের গলি, বহুবাজার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

শিল্প ও সাহিত্য। ১৭ নং, ত্রীনাথ দাসের গলি, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কোহিনুর। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত মাসিক পত্র। কোহিনুর আফিস, খারদা (কলিকাতা) এই ঠিকানার প্রাপ্তব্য।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট দ্বাবী ব্রহ্মানন্দ সংবাদ পাইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম লইয়া অনেক ব্যক্তি নানাস্থানে সাধারণকে প্রভাষণ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিশেষ বিখ্যাত হুজুরে অবগত হইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত কানী রামকৃষ্ণ সেবাপ্রসার (Ramkrishna Home Of Service) দ্বারা নানান জনৈক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিতেছে ও সেই অর্থ সেবাপ্রসার কার্যে ব্যয় করিয়া তাঁ করিয়া তদ্বারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। এই কারণে তিনি বেলুড় মঠের ষ্টাফিংয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সাধারণের বিশেষ অবগতির জন্য ঘোষণা করিতেছেন যে, যদি কোন পক্ষপ্রচারক বা সাধারণের হিতার্থ কোন শুভকর্মের অগ্রসরতা, তিনিই সন্মত হইবেন বা গৃহীত হইবেন রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রমসাধ্য ও বেলুড় মঠের গোপনীয় প্রিজমোহরমুক্ত, বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত পত্র দেখাইতে না পারেন, তবে বুদ্ধিতে হইবে, তাঁহার সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সংগ্রহ নাই এবং তাঁহার উপর উক্ত মিশনের কোন কোন রূপ অর্থ বা ঈদা সংগ্রহের ভার নাই।

## স্বামীজির সহিত হুই চারিটা দিন ।

হে পাঠক, আমার স্মৃতির হুই এক পৃষ্ঠা যদি পড়িতে চাও ত একটু অপেক্ষা করিয়া প্রথমতঃ পূজনীয় স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে ধর্ম সম্বন্ধে আমার বোধাবোধ, বিদ্যাবুদ্ধি, স্বভাব প্রকৃতি, কিরূপ ছিল তাহার আভাস একটু জানা আবশ্যক নতুবা তাঁহার সহিত বসবাস ও কথোপকথনের যে কত দাম তাহা বুঝিতে পারিবে না। প্রথম জ্ঞানোদয় হইতে এন্ট্রেন্স পাশ করা পর্য্যন্ত (৫-১৮ বৎসর) ধর্মার্থ কিছুই বুঝিতাম না। কিন্তু চতুর্থ ক্লাসে উঠিতে না উঠিতে ইংরাজী শিক্ষার ছিটে ফোঁটা জল গারে লাগিতে না লাগিতেই প্রচলিত হিন্দু ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনাস্থা জন্মিল। তবুও মিশনারী স্কুলে আমার পড়িতে হয় নাই। এন্ট্রেন্স পাশ করার পর প্রচলিত হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব হইল। তারপর কলেজে পড়িবার সময়, অর্থাৎ উনিশ হইতে পঁচিশ বৎসব বয়সের মধ্যে ফিজিক্স (Physics) কেমিস্ট্রী (Chemistry) জিওলজী (Geology) বটানী (Botany) প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্র একটু আধটু পড়িলাম ও হক্লে ডারউইন, মিল, টিনডল, স্পেনসার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের সহিত সম্বন্ধে একটু আধটু হইল। ফলে জ্ঞানের বদহজমে বাহা হয়, ঘোর নাস্তিক হইলাম। কিছুতেই বিশ্বাস নাই, ভক্তি কাহাকে বলে জানি না এবং তখনকার আমি যে একটা হস্তপদবিশিষ্ট অতি গর্হিত কিন্তুত-কিষাকার জীব বিশেষ ছিলাম এ কথা বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। তখন সকল ধর্মেই দোষ দেখিতাম ও সকলকেই আপনাপেক্ষা হীন মনে করিতাম—এ ভাবটা অবশ্য মনে মনে ধাক্কিত; প্রকাশ্যে কিন্তু, অন্তরূপ দেখাতাম।

খৃষ্টান মিশনারীরা এই সময় আমার নিকটে বাওয়া আসা করিতে লাগিলেন। অল্প ধর্মের নিম্নাবাদ অনেক তর্ক, যুক্তি, দীও প্যাঁচের সহিত করিয়া অবশেষে তাঁহারা বুঝাইলেন যে বিশ্বাস ভিন্ন ধর্মরাজ্যে কিছুই হইবে না। খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস করাটা পূর্বে আবশ্যক তবেই ইহার ন্তনত্ব ও অল্প সকল ধর্মাপেক্ষা প্রেচ্ছন্ব বৃদ্ধা যাইবে। অকৃত্য গবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ



সে কথাখ কিছু পাষাণের মন গলিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান রূপায় শিখিয়াছি,  
 "প্রমাণ কিছুতেই ভিন্ন বিশ্বাস করিবে না," মিশনারী প্রভুবা এখন বলেন,  
 অগ্রে বিশ্বাস পাবে প্রমাণ। মন বুঝিবে কেন? কথাব জোবে কোন্ মূর্তি  
 বিশ্বাস জন্মাইতে অক্ষম হইলেন। তখন তাঁহা বা বলিলেন "বাইবেল মন দিয়া  
 সমস্ত পড়া আবশ্যক; তাহা হইলেই বিশ্বাস হইবে।" আচ্ছা, তাহাই কবিলাম।  
 ভাগ্যক্রমে ফাদার বিভিন্নটন, বেভাবেণ্ড পেট্‌ওয়ার্ড, গোবে ও বোমেন্ট  
 প্রভৃতি কতকগুলি সুবিদ্বান নিম্পৃহ ও বাস্তবিক ভুক্ত মিশনারীরও সাক্ষাৎ  
 লাভ হইল, কিন্তু কোন ক্রমেই গৃহধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল না। তাঁহাদের  
 মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন আমাব অনেক উন্নতি হইয়াছে, ঈশাব ধর্ম্মে  
 বিশ্বাসও হইয়াছে, কিন্তু জাতি ঘাইবার ভয়ে খুঁটান হইতেছি না। তাঁহা-  
 দেব সে কথাব ফল ক্রমে আত্মবিশ্বাসের উপবও সান্নিধ্য জন্মিতে লাগিল।  
 অবশেষে এই স্থির হইল যে তাঁহা বা আমাব দশটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন  
 প্রত্যেক প্রশ্ন যথান্থ সমাধানের গব আমাব সাক্ষব লইবেন। এইরূপে  
 যখন ১০ম প্রশ্নের উত্তরে আনি সাক্ষব করিব তখনই আমাব হাব হইলে  
 এবং তাঁহা বা আমাকে বাপতিস্‌ম্ (Baptism) দিবেন বা তাঁহাদের ধর্ম্মে  
 অভিষিক্ত কবিবেন। বলা বাহুল্য এটাব অধিক প্রশ্নের সমাধান হইবার  
 পূর্বেই কলক্স ছাড়িয়া সংসারে প্রবেশ কবিলাম। সংসার টুকবার  
 পবেও সকল গ্রন্থাদিই পড়ি। কখন বা চার্চ, কখন বা ব্রাক্সমন্দিরে, কখন  
 বা দেবালয়ে বাই, কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্টি বা অসত্য, কোন্টি  
 ভাল, কোন্টিই বা মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে স্থির  
 হইল যে, পরালাক আছে কি না, আত্মা অমর কিংবা মব, এ সকল কথা  
 কেহ জানে না। তাব যে কোন ধর্ম্মেই হউক না কেন দৃঢ় বিশ্বাস করিতে  
 পারিলে ইহ জন্মে অনেকটা সুখ শান্তি থাকে। আব সেই বিশ্বাসটা  
 মাহুষের অভ্যাসেই দৃঢ় হইয়া থাকে। তর্ক, বিচার বা বুদ্ধির দ্বা বা ধর্ম্মের  
 সত্যাসত্য বুঝিবার কাহাবও ক্ষমতা নাই। ভাগ্য অশুভ, — প্রচুব বেতনের  
 চাকুরীও জুটিল। তখন আমাব অর্থেরও অনাটন নাই, দশ জন লোকেও  
 ভাল বলে; সুখী হইতে গেলে সাধাবণ মাহুষের যাহা যাহা আবশ্যক তাহার  
 কিছুই অভাব থাকিল না। কিন্তু এ সকল সম্বন্ধে মনে সুখ শান্তির উদয়  
 হইল না। কি একটা অনির্জনীয় অভাবের ছায়া প্রাণে সর্বদাই লাগিয়া বহিল।  
 এইরূপে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল।

সোলাপুর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। এক স্থলকার প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সহিত আমার বাসাব আসিয়া উপস্থিত। উকিল বস্তুটা বলিলেন, “ইনি একজন বিদ্বান বাঙ্গালি সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছেন।” ফিবিয়া দেখিলাম—প্রশান্ত মূর্তি, দুই চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁপ নাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আলখালা, পায়ে মহাবাহীর দেশের বাহানা চটি জুতা, মাথায গেরুয়া কাপডেবই পাগড়ী, সন্ন্যাসীব সে অপক্লপ মূর্তি শ্রবণ হইলে: এখনও যেন চক্ষুর সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ হইল—তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কাণ জ্ঞানতে পারিলাম না। কিছু ক্ষণ পরে নমস্কাব কবিদ্যা জিজ্ঞাসা কবিলাম “মহাশয় কি তামাক খান?” আমি কায়স্থ, আমার একটা ভিন্ন ছাঁকা নাই। আপনাব যদি আমার ছাঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।” তিনি বলিলেন “তামাক চুকট যখন যাহা পাই তখন তাহাই খাইবা থাকি, আর আপনার ছাঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।” তামাক সাজাইয়া দিলাম। তখন আমাব বিশ্বাস, গেরুয়া বেশ-ধারী সন্ন্যাসী মাত্রেই জুয়াচোর। ভাবিলাম, ইনিও কিছু প্রভাশা করিয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। তা ছাড়া আমার উকিল বস্তু মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ, ইনি বাঙ্গালি। বাঙ্গালিদেব মহাবাহীর ব্রাহ্মণেব সহিত মিল হওয়া কঠিন; তাই বোধ হয় আমাব বাটীতে থাকিবাব জন্যও আসিয়াছেন। মনে এইরূপ নানা তোলাপাড় কাঁবয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহাব জিনিষপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, “আমি উকিল বাবুর বাড়ীতে বেশ আছি। আব বাঙ্গালি দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহাব মনে দুঃখ হইবে, কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাহবে।” সে রাত্রে বড় বেশী কথা বার্তা হইল না, কিন্তু দুই চারি কথা যাহা কহিলেন তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উৎসর্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকা কড়ি ছোন না ও স্তুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমার অপেক্ষা সহস্র

শ্রুণে স্মৃথী। বোধ হইল তাঁহার কিছুই অভাব নাই কারণ বার্থ সিদ্ধির ইচ্ছা নাই! আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম যদি চা খাটবার আপত্তি না থাকে তাহা হইলে কল্যা প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে স্মৃথী হইব। তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন ও উকিলটির সহিত তাঁহার বাটা ফিরিয়া গেলেন। বাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ডাবিলাম; মনে হইল এমন নিষ্পৃহ, চিরস্মৃথী, সদা সমস্ত, প্রকৃষ্ট-মুখ পুরুষত কখন দেখি নাট। মনে কবিতাম “যাহাব পয়সা নাই তাহার মরণ ভাল”; “বাস্তবিক নিষ্পৃহ সম্মানী জগতে অসম্ভব”; কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিল।

পব দিন ১২শে অক্টোবর ১৮৯২ প্রাতে ৬টাব সময় উদ্ভিষা স্বামীজির পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজির দেখা নাই। আব আপেক্ষা না করিয়া আমি এতটা বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজি যেখানে ছিলেন তথায় গেলাম। দেখি, তথায় মহা-সভা; স্বামীজি বসিয়া আছেন ও নিকটে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোক বসিয়া কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজি কাহাবও সহিত ইংবাজীতে, কাহাবও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্তানীতে, তাহাদের প্রস্নেব উত্তর, একটু মাত্র চিন্তা না করিয়াই, একবারে দিতেছেন। আমার জায় কেহ বেহ হক্সলব ফিজিওলজিক ভাবি জ্ঞান মনে করিয়া তদবসরনে স্বামীজিব সহিত তর্ক করিতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাট্টাচ্চেন, কাহাকেও গম্ভীর ভাবে যথাযথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিয়া, অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মনুষ্য না দেবতা? কাজেই তাঁহার সমুদয় কথা মনে বহিল না। যাহা মনে আছে তাহাব কয়েকটি লিখিলাম।

কোন গণ্য মান্ত ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করিলেন “স্বামীজি সন্ধ্যা, আত্মিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, আমবা তাহা বুঝি না। আমাদের ঐ সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি?” স্বামীজি উত্তর করিলেন “অবশ্যই উত্তম ফল আছে; ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া ঐ কয়টা সংস্কৃত মন্ত্রাদি ত অনায়াসে ইচ্ছা হইলে বুঝিয়া লইতে পার? তথাপি গণনা, ইহা কাহার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝিতে পার তথাপি যখন সন্ধ্যা আত্মিক বর্ণিত বস, তখন স্বর্গ কর্ষ করিতেছি

মনে কর, না কিছু পাণ করিতেছ মনে কর? যদি ধর্ম কর্ষ করিতেছি মনে করিয়া বস, তাহা হইলে; উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।” অল্প একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিল ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন, স্নেহ ভাবায় করা উচিত নহে; অমুক পুৰাণে এইরূপ লেখা আছে। স্বামীজি উত্তর করিলেন—যে কোন ভাষাতেই হউক ধর্ম চর্চা করা যায় এবং এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণ স্বরূপ দিয়া বলিলেন “হাইকোর্টব নিষ্পত্তি নিয় আদালত দ্বারা খণ্ডন হইতে পাবে না।”

এইরূপে নয়টা বাজিয়া গেল। বাঁহাদের অফিস বা কোর্টে যাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কেহ বা তখনও বসিয়া বহিলেন। স্বামীজিব দৃষ্টি আমার প্রতি পড়ায়, পূর্বদিনের চা খাইতে যাইবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, “বাবা, অনেক লোকের গন জুগ্ম করিয়া যাঁতে পাবি নাই, মনে কিছু কবিও না।” পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বলিলেন “আমি বাঁহার অতিথি তাঁহার মত করিতে পাবিলে, আমি তোমাবই নিকট থাকিতে প্রস্তুত।” টকিলটাকে বিশেষ বুঝাইয়া স্বামীজিকে সঙ্গে লইয়া আমার বাসায় আসিলাম। সঙ্গে মোটের মধ্যে একটি কমণ্ডলু ও গেরুরা কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক! স্বামীজি তখন ফ্রান্স দেশের সম্রাট সম্রাজ্ঞ একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। পবে বাসায় আসিয়া দশটার সময় চা খাওয়া হইল; তাহার পরেই আবাব এক গ্লাস শীতল জলও চাহিয়া থাইলেন। আমার নিজেব মনে যে সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সে সকল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সহসা ভরসা হইতোছে না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিজ্ঞা বুঝির পরিচয় দুই কথাতে বুঝিয়া লইলেন।

ইতিপূর্বে টাইমস্ সংবাদপত্রে একজন, একটা স্কলার পড়ে, জিজ্ঞাস করি, কোন ধর্ম সত্য,—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখিয়াছিলেন; সেই পত্রটি আমার তখনকার ধর্ম বিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ায়, আমি উহা বহু করিয়া রাখিয়াছিলাম; তাহাই তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন “লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।” আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত “ঈশ্বর দয়াময় ও ভ্রাতাবান্, এককালে দুইই হইতে পারেন না।” এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই, মনে করিলাম, এ সমস্যা পূর্ব স্বামীজিও করিতে পারিবেন না।

স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন “তুমিত Science ( বিজ্ঞান ) অনেক পড়িয়াছ দেখিতেছি । প্রত্যেক জড় পদার্থে দুইটী opposite forces centripetal and centrifugal কি act কবে না ? যদি দুইটী opposite forces জড় বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ভ্রায় দুই opposite হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভবে না ? All I can say is that you have a very poor idea of your God ।” আমিত নিস্তব্ধ । আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সত্য is absolute । সমস্ত ধর্ম কখন এককালে সত্য হইতে পাবে না । তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পবে জানিব সে সকলই আপেক্ষিক সত্য বা relative truths Absolute সত্যের ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন বুদ্ধির অসম্ভব । অতএব সত্য absolute হইলেও বিভিন্ন মন বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয় । সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি, নিত্য ( absolute ) সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সে সকল গুলিই এক দেবের বা এক শ্রেণীর । যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে Photograph লইলে একই সূর্য্যের ছবি নানারূপ দেখায, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটা ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের—তদ্রূপ । আপেক্ষিক সত্য ( Relative truth ) সকল, নিত্য সত্যের ( absolute truth ) সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত । প্রত্যেক ধর্মই সেই জন্ত সেই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য ।

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় স্বামীজি ঈশ্বং হস্ত করিয়া বলিলেন “রাজা হইলে আব থাওয়া পবাব কষ্ট থাকে না , কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন, বিশ্বাস কি কখন জোর করিয়া হয় ! অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব ।” কোন কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে আমি “সাধু” বলায় তিনি উত্তর করিলেন “আমরা কি সাধু ? এমত অনেক সাধু আছেন যাহাদের দর্শন বা স্পর্শ মাঝেই দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় ।” “সন্ন্যাসীরা একরূপ অলস হইয়া কেন কালক্ষেপ করেন ? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন—সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না” প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজি বলিলেন “আচ্ছা বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করিতেছ । তাতার বংশাম্যন্ত অংশ কেবল নিজেব জন্ত খরচ করিতেছ ; বাকি কতক অল্প কতকগুলি লোককে আপনার ভেবে তাহাদের জন্ত খরচ করিতেছ ।

তাহারা তজ্জন্তু না তোমার কৃত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সন্তুষ্ট। বাকি বকের মত প্রাণপণে জমাইতেছ; তুমি মরিয়া গেলেন অল্প কেহ তাহা ভোগ কবিবে, আর হরত—আবো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই ত গেল তোমার হাল। আর আমি, ওসব কিছু কবি না। ক্ষুধা পাইলে পেট চাপড়াইবা, হাত মুখে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই তাহা খাই, কিছুই কষ্ট করি না; কিছু সংগ্রহ কবি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান, তুমি কি আমি?” আমিও শুনিয়া অবাক্, ইহাব পূর্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলিতে ত কাহাবও সাহস দেখি নাই!

আহরামি কবিয়া একটু বিশ্রামের পর, পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটার বাসায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদাম্বাদ ও কথোপকথন চলিল। রাত্রি নন্নটাব সময় স্বামীজিক লইয়া পুনরায় আমার বাসাঘ ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম “স্বামীজি। আপনাব আজ তর্ক বিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।” তিনি বলিলেন “বাবা। তোমরা যেরূপ utilitarian যদি আমি চূপ কবিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে একমুঠা খাইত দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ কবিয়া বকি, লোকের শুনে আনন্দ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেন, যে সকল লোক সভায় তর্ক বিতর্ক কবে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবে, তাহাবা বাস্তবিক সত্য জানিবাব ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুদ্ধিতে পারি, কে, কি ভাবে কি কথা বলে ও তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “ভাল, স্বামীজি! সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কি রূপে?” তিনি বলিলেন “ঐ সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা কবেছে, আব তাহাব কতবার উত্তর দিয়াছি।” রাত্রে আহাব কবিতে বসিয়া আবাব কত কথা কহিলেন। পরস্য না ছুঁইয়া দেশ ভ্রমণে কত আয়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল সে সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ করিয়াছেন! কিন্তু তিনি—সে সব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে সমুদয় বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লজ্জা খাইয়া এমন

পেট জালা—যে এক বাগী তেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও এখানে সাধু সন্ন্যাসী জায়গা পায়না এই বলিয়া অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিশের স্তম্ভীক দৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সে সব ঘটনা তাঁহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

ব্রাহ্ম অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে নিদ্রার জন্ত বিছানাদি দিয়া, আমিও ঘুমাইতে গেলাম ; কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজিকে দেখিয়া ও তাঁহার দুই চাব কথা শুনিয়াই সমস্ত দূর হইল। আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল আমাদের কেন—আমাদের চাকরবাকরের ও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি শ্রদ্ধা হইল যে তাহাদের সেবার ও আগ্রহে স্বামীজিকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত ;

২০শে অক্টোবর ১৮৯২। সকালে উঠিয়া স্বামীজিকে নমস্কার করিলাম। এখন সাহস বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। স্বামীজিও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সত্বে আজ তাঁহার চার দিন বাস হইল। পঞ্চম দিনে তিনি বলিলেন “সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশি ও গ্রামে একদিনের বেশি থাকিতে নাই। আমি শীঘ্র যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।” কিন্তু আমি ওকথা কোন মতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া চাই। পরে অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন “এক স্থানে অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিবাছি, সেইকণ মায়ার মুগ্ধ হইবার যত উপায় আছে তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।” আমি বলিলাম যে, তিনি কখনই মুগ্ধ হইবার নন। পরিশেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও দুই চারি দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আমার মনে হইল যে স্বামীজি যদি সাধারণের জন্ত বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু লেকচার দিলে, হয়ত ‘নাম’, যশের ইচ্ছা হইবে এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভায় প্রেমের উত্তর দান ( conversational meeting ) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথা প্রসঙ্গে স্বামীজি *Picwick Papers* হইতে ছুই তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন! আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আৰ্হিত করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভাবিলাম, সম্মানী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “ছুইবার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁচ ছয় মাস হইল একবার।” অরাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“তবে কেমন কবিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?” স্বামীজি বলিলেন, “একান্ত মনে পড়া চাই, আর খাণ্ডেব সাব ভাগ হইতে প্রস্তুত বেতের অপচয় না কবিয়া পুনর্বার উহা assimilate করা চাই।”

আর একদিন স্বামীজি মধ্যাহ্ন একাকী বিজ্ঞানায় শুইয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন। আমি অল্প দূর ছিলাম। তথাৎ একপা উচ্চদরে হাঁসিয়া উঠিলেন যে আমি, এ হাঁসিব বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিয়া তাঁহাব ধবের দবজাব নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছুই হয় নাই। তিনি যেমন বসে পড়িতেছিলেন, তেমনি পড়িতেছেন। পায় ১৫মিনিট দাঁড়াইয়া বসিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না! বসে ছাড়া অল্প কোন দিকে তাঁহার মন নাটে। পরে আমাকে দেখিয়া আসিয়া বলিলেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন, “বসন যে কাজ কবিতে হয়, তখন তাহা এক মনে, এক প্রাণে, সমস্ত ক্ষমতাব সহিত কবিতে হয়। গাঙ্গিয়াবাদের কল্পনায় স্বামী ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ যেমন একমনে কবিতেন; তাঁহাব পিতলের খট্টা মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজি-তেন যে, দোনার মত দেখাটত।”

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “স্বামীজি! চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ কবে কেন? আমার মনে হয়, উহা আমাদের, উহা অপরের ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনা মাত্র। ঐক, আমার না জানাইয়া, আমার আঙ্গুর বন্ধু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে ত উহা চুরি করা হয় না? তাহার পর পণ্ড পক্ষী আদি আমাদের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহাকেও ত চুরি বলি না?” স্বামীজি



বলিলেন, “অবশ্য, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এমন কোন জিনিষ বা কাণ্ড নাই। আবার অবস্থান্তরে প্রত্যেক জিনিষ মন্দ এবং প্রত্যেক কাণ্ডই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপব কাছাবও কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যাহা কবিলে, শাবীক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার তরলতা আসে, সে কর্ম কবিলে না। উহাই পাপ ; আর তদ্বিপরীত কর্মই পুণ্য। মনে কব, তোমার কোন জিনিষ কেহ চুবি করিলে তোমার হৃৎকম্প হয় কি না ? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানিলে। এই দুই দিনের জগতে সামান্য কিছুব জন্ম যদি তুমি এক প্রাণীবে হৃৎকম্প দিতে পার, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম—না করিতে পারিবে। আবার পাপ পুণ্য না থাকিলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকিতে হইলে তাহার নিয়মাদি পালন কবা চাই। বনে গিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচ, ক্ষতি নাই—কেহ তোমাকে কিছু বলিলে না ; কিন্তু সহরে কবিলে পুলিশের দ্বারা ধরাইয়া তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ করিয়া বাগাই উচিত।”

স্বামীজি অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রোপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি শ্রুত হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব বঙ্গ বস চলিতেছে, বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতোছেন, সকলকে হাসাই-তোছেন ; আবার তখনই এমনি গম্ভীর ভাবে জটিল প্রশ্ন সমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকল অর্থাৎ হইয়া ভাবিত—“উঁহা ভিতর এত শক্তি। এইত দেখিতেছিলাম, আমাদের মতনই একজন।” সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিক্ষা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার আবাবিত ছাব ছিল। তাহার ভিতর নানা লোকে নানা ভাবেও আসিত—কেহবা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহবা খোদ-গল্প শুনিতে, কেহবা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিলে বলিয়া, আবার কেহবা সংসার তাপে জর্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট, দুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিলে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, যে যে ভাবেই আসুক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং

তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার কবিতেন। তাহাব সন্দেহেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারই এড়াইবাব বা কিছু গোপন করিবাব মাধ্য ছিল না! এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সম্ভ্রান্ত ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাব হস্ত এড়াইবে বলিয়া স্বামীজিব নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ কবিতেন লাগিল। সে আবার আমাব এক বন্ধুব পুত্র। আমি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ত্রি ছেলেটা আপ-  
নাব কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দেবেন? উহাব বাপ আমার একজন বন্ধু। স্বামীজি বলিলেন, “উহাব পরীক্ষা কাচে, পরীক্ষা দিবাব ভয়ে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি—এম, এ, পাশ করিয়া সাধু হইতে আসিও, বরং এম, এ, পাশ করা সহজ কিন্তু সাধু হওয়া তদপেক্ষা কঠিন।”

স্বামীজি আমাব বাসায় বত দিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাব সময় তাহাব কথোপকথন শুনিতে সভা বসিয়া বাইত, এতই অধিক লোক সমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমাব বাসায় একটা চন্দন গাছেব তলায় তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া তিনি যে কথা জুগি বলিয়া-  
ছিলেন, জন্মেও তাহা ভুলিতে পাবিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে। সেইজন্ত অত্র সময়ের জন্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত। এস্থলে আপনাব কথা আর একটু বলিব। কিছু পূর্ব হইতে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরু নিকট যন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাহাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, “এমন লোককে গুরু করিও, যাঁহাকে আমিও ভক্তি কবিতেন পারি। গুরু বাড়ী ঢুকিলেই যদি আমাব ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপ-  
কাব হইবে না। কোন সংপুরুষকে যদি গুরুরূপ পাই, তাহা হইলে উভয়ে যন্ত্র লইব, নতুবা নহে।” তিনিও তাহাতে দীক্ষাব পান। স্বামী-  
জিব আগমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর কি?” তিনিও আগ্রহে বলিলেন, “উনি কি গুরু হইবেন? হইলে ত আপনাদের কৃতার্থ মনে করি।” স্বামীজিকে এক দিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, “স্বামীজি, আমাব একটা প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?” স্বামীজি প্রার্থনা জানাইবার আদেশ কবিলে আমাদেব ঐ উভয়ে দীক্ষা দিবাব জন্ত বলিলাম। স্বামীজি

বলিলেন, “গৃহস্থের শক্ষে গৃহস্থ গুণকই ভাল। গুণ হওয়া বড় কঠিন। শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ কবিতো হয়। দীক্ষার পূর্বে গুণক সহিত শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক” প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিবস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। এখন দেখিলাম, আমি কোন প্রকারে ছাড়িবার নহে, তখন অগত্যা স্বীকার কবিলেন ও (২৫ অক্টোবর, ১৮৯২ সালে) আমাদেব উপযুক্ত দীক্ষা প্রদান কবিলেন। এখন আমাব ভাবি টেকা হইল, স্বামীজিব ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজ স্বীকার কইলেন না। পরে অনেক বাদান্তবাদেব পর আমাব অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ১৪শে তারিখে ফটো গোপাইতে সম্মত হইলেন ও ফটো লওয়া হইল। ইতিপূর্বে তিনি একজনেব আগ্রহ সম্বন্ধে ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া আমাকে দুই কপি ফটো তাহাক পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমিও সে কথা আনন্দে স্বীকার কবিলাম। কথা প্রসঙ্গ এক দিন স্বামীজি বলিলেন, “তোমার সতিত অবশ্যে তাঁবু খাটাইয়া আমাব কিছু দিন থাকিবার টেকা আছে। কিন্তু, চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে, যদি তাহাতে যাইবার সুবিধা হয় ত তথায় যাইব।” আমি চাঁদাব লিষ্ট কবিয়া টাকা সংগ্রহেব প্রস্তাব কবায় তিনি কি ভাবিয়া স্বীকার কবিলেন না। এই সময় স্বামীজিব ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ কবিলেন না। আমি অনেক জল্পবল করিয়া তাঁহাব মাবহাটি জুতাব পবিবর্ন্তে এক গোড়া জুতা ও এক গাছি বেতের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইতিপূর্বে কোলাপুবেষ বাণী অনেক অনুবোধ করিয়াও স্বামীজিকে কিছুই গ্রহণ কবাইতে না পারিয়া অবশেষে দুইখানি গেকরা বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজিও তাহা গ্রহণ কবিয়া য বস্ত্রাদি পবিধান করিয়াছিলেন, তাহা সেইখানেই ভাগ্য কবেন এবং বলেন “সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।”

ইতিপূর্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেক বার পড়িতে চেষ্টা কবিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝিতে না পারায় পবিশেষে উহাতে বুঝিবার বড় কিছু নাই, মনে কবিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজি গীতা লইয়া আমাদিগকে একদিন বুঝাইতে লাগিলেন। তখন দেখিলাম, উহা কি অদ্ভুত গ্রন্থ। গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহাব নিকটে যেমন শিখিয়াছিলাম, তেমন আবার অন্তর্দিকে Jules Verne এর Scientific novels এবং Carlyle এর Sartor Resartus পড়িতে তাঁহার নিকটে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন তিনি বলিলেন, “যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে শয্যাশায়ী করিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নতুবা নহে। Nervousness, debility প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টাকা কাল্পনিক। ঐ সকল বোগের হাত হতে স্ফাজ্যাবেরা যত লোককে বাঁচান, তার চেয়ে বেশী লোককে মারেন! আর ওরূপ সদা বোগ রোগ করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচ আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ আসিয়াছে, তাহা আব করিও না। তোমার আমার মত একটা মবিণে পৃথিবীও আপনাব কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবে না বা জগৎও কোন বিষয়ের বিচ্ছ ব্যাঘাত হইবে না।” এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ, উপারন্ত কন্সার্বারী সাহেবদেব সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাহাও সামান্য কিছু বলিলে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিত, এবং এমন ভাল চাকুরী পাইয়াও এক দিনের তরে সুখী হই নাই। তাহাকে এ সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, “কিসের জন্ত চাকুরী করিতেছ? বেতনের জন্ত ত? বেতন ত মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হইলে যখন চাকুরী ছাড়িয়া দিতে পার, কেহ বাধিয়া রাখে নাই, তখন ‘বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি’ তাবিয়া হুঃখের সংসারে আরও হুঃখ বাড়িও কেন? আর এক কথা, বল দেখি, যাহার জন্ত বেতন পাইতেছ, আফিসের সেই কাজ গুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া তোমার উপরওযালা সাহেবদের সন্তুষ্ট কবিবার জন্য কখনও কিছু করিয়াছ কি? কখনও সে জন্ত চেষ্টা কর নাই, অথচ তাহারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন বলিয়া তাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অস্ত্রের উপর হুঃখের যে ভাব রাখি, তাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও তাহাদেব ভিতরে আমাদের উপর, ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশ রহিয়াছে দেখি। ‘আপু ভাল তো জগৎ ভাল’ একথা যে কত দূর সত্য তাহা কেহই জানে না। আজ হতে মনটা দেখা, একে-বারে ছেড়ে দিতে চেষ্টা কর, দেখিবে, যে পরিমাণে তুমি উহা করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে তাহাদের ভিতরের ভাব এবং কার্যও পরিমিত হইয়াছে।” বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে আমার ঔষধ খাইবার ষাটিক

দুব হইল এবং অপরের উপর দোষ দৃষ্টি ত্যাগ কবিত্তে, চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

স্বামীজির নিকট একবার, ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলিলেন, “যাহা অভীষ্ট কাণ্যের সাধনভূত তাহাই ভাল ; আব যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ , ভাল মন্দের বিচার, আমরা জাযগা উঁচু নিচুব বিচারের জ্ঞান করিয়া থাকি। যত উপায় উঠিবে তত দুই, এক হয়ে যাবে। চাক্রেতে পাহাড় ও সমতল আছে বলে ; কিন্তু আমরা সব এক দেখি—সেইরূপ।” স্বামীজিব এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল যে, যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত !

আব এক দিনের কথা—কলিকাতায় একটা লোক অনাহারে মারা গেল, খবরের কাগজে এ কথা পড়িয়া এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, তাহা বলিবার নহে ; বাব বাব বলিতে লাগিলেন, “এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়।” কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, “দেখিতেছ না, অস্ত্রান্ত্র দেশে কত poor house, work house, charity fund প্রভৃতি সংস্থাপিত শত শত লোক প্রতি বৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টি ভিক্ষাব পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরিতে কখন শোনা যায় নাট। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পড়িলাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অস্ত্র সময়ে, কলিকাতায় অনাহারে লোক মরে !”

ইংরাজী শিক্ষার রূপায় আমি দুই চাবি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইত, ঐরূপে বৎসামাত্র যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না ; বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ গাঁজায় খরচ করিয়া তাহারা আরো অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতাও কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায় ! সে জন্ত আমার মনে হইত—লোককে কিছু কিছু দেওয়ার চেয়ে একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, “ভিখারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো যাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দুই একটি পয়সা, তজ্জন্ত সে কিসে খরচ করিবে, সম্বায় হবে কি

অপব্যয় হবে, এসব লইয়া এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? আর সত্যই যদি সেই পরসী গাঙ্গা খেয়ে উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়াও সমাজের লাভ বৈ লোকমান নাই। কেন না, তোমার মত লোকেবা তাহাকে দবা করিয়া কিছু কিছু না দিলে, সে উহা তোমাদেরই নিকট হইতে চুবি কবিয়া লইবে। তাহার চেয়ে ছুপসী ভিক্ষা করে, গাঙ্গা টেনে, সে চুপ কবে বসে থাকে, তাহা কি তোমাদেরই ভাল নহে? অতএব ও প্রকাব দানেও সমাজের উপকাব বৈ অপকার নাই।”

প্রথম হইতেই স্বামীজিকে বাল্য বিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি। সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কেব বিপক্ষে ধাঁড়াইতে এবং উদ্যোগী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুবাগও কোন মানুষেব দেখি নাই! বিলাত হইতে কিরিবার পর ঠাহাবা স্বামীজিব প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, ঠাহাবা জানেন না, বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাস আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন কবিয়া কান্ধন মাত্র স্পর্শ না করিয়া কত কাল, ভারত-বর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ঠাহার মত শক্তিমান পুরুষেব এত বাধা বাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই—কোন নোক একবার একথা বলার তিনি বলেন, “দেখ, মন বেটা বড় পাগল, ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না; একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সে জন্ত সকলেবই বাধাবাধি নিয়মেব ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্য নিয়মে চলতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁর খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আলুগা দেন মাত্র। কিন্তু কাব কতটা দখল হয়েছে, তা একবার ধ্যান কব্বে বস্লেই টের পাওয়া যায়! এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না! সকলেই মনে কবে, যে শ্রেণ নয, তবে আদর করিয়া স্ত্রীকে আধিপত্য করিতে দেয় মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে কবাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখন নিশ্চিন্ত থাকিও না।”

একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি বলিলাম, স্বামীজি! দেখিতেছি, ধর্ম ঠিক ঠিক বুদ্ধিতে হইলে অনেক লেখা পড়া জানা আবশ্যক। তিনি বলিলেন—“নিজে ধর্ম বোঝাব জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নাই। কিন্তু অন্যকে

বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যিক । পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, ‘বামকেটে’ বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সার তব তাঁর চেয়ে কে বুঝিয়াছিল ?” আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু সন্ন্যাসীর স্থূলকাষ ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব । এক দিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিক্রপ ছলে উত্তর করিলেন, “ইতাই আমার Famine insurance fund ; যদি পাঁচ সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্কি আমাকে জীবিত রাখিবে । তোমরা এক দিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে । আর যে ধর্ম মানুষকে স্তম্ভী কবে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia প্রসূত রোগ বিশেষ বলিয়া জানিও ।” স্বামীজি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । এক দিন একটা গান আবৃত্তিও কবিতাছিলেন । কিন্তু আমি “ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস” ; তাব পব শুনিবার আমার অবসরই বর কোথায় ? তাঁহার কথা ও গল্পই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল ।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যথা Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সবল ভাষায় দুই চার কথায় বুঝাইয়া দিতেন । আবাব ধর্ম বিষয়ক শীমাংসা সকল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বুঝাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের একই লক্ষ্য, একই দিকে গতি, দেখাইতে তাঁহার ন্যায় অধিতীর ক্ষমতা আর কাহারও দেখা যায় নাই ।

লক্ষ্য, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল । কারণ জিজ্ঞাসায় এক দিন বলেন যে, “পর্যটন কালে সন্ন্যাসীদের দেশ বিদেশের নানা প্রকার দূষিত জল পান করিতে হয় ; তাহাতে শরীর ধারাপ করে । এই দোষ নিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে । আমিও সেই জন্য এত লক্ষ্য খাই ।”

ক্ষেত্রির রাজা, কোলাপুরের চতুর্পতি প্রভৃতি রাজোয়ারা ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা রাজড়া তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিত ; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন । অসামান্য ত্যাগী হইয়া, রাজ্য রাজ-ডার সহিত অত মেশামিশি তিনি কেন কবেন, একথা অনেকেরই হৃদয়-জন্ম হইত না । কোন কোন নিকোদ লোক এজন্য তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না ।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন, “হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া ও সংকার্যের অনুষ্ঠানে লওয়াইয়া যে ফল হইবে, একজন জ্ঞানান্ রাজাকে সেই দিকে লওয়াইতে পাবিলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হইবে, ভাব দেখি। গবির প্রজার ইচ্ছা হইলেও সংকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গল বিধানের ক্ষমতা পূৰ্ণ হইতেই বহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোন রূপে তাহাব ভিতর একবার জাগাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাব অধীনস্থ সকল প্রজাব অবস্থা ফিরিবা যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।”

বাগ্‌বিত্ত্বায় ধর্ম নাই, ধর্ম অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটা বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন, “Test of pudding lies in eating, অনুভব কব, তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না।” তিনি কণ্ট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, “যে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুসঙ্গটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোব সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।” আমি বলিলাম, কিন্তু যেরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; আপনি, সর্বভূতকে সমান চোখে দেখা, বাগ ছেব ত্যাগ করা প্রভৃতি যে সকল কায ধর্ম লাভের প্রধান সহায় বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীনস্থ কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শাস্তিতে থাকিতে দিবে না। উত্তরে তিনি পরমহংস জীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটা বলিয়া বলিলেন, “কখন ফৌস ছেড়ো না আর কর্তব্য পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কর্ম করিও। কহ দোষ করে, দণ্ড দিবে, কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন রাগ করিও না।” পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন, এক সময়ে আমি এক তীর্থ স্থানের পুলিশ ইন্সপেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম, লোকটী বৈশ্ব ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫ টাকা, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাসার খরচ মাসে ২৩ শত টাকা হইবে। যখন বেশী জানাওনা হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ত আর অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কি রূপে? তিনি ঈশং হাস্য করিয়া বলিলেন, “আপনারাই চালান। এই তীর্থ স্থলে



যে সকল সাধু সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদের ভিত্তর সকলেই কিছু আপ-  
নাৰ মত নম্। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট কি আছে না আছে,  
ভ্রমাস কল্পিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচুর টাকা কড়ি বাহির হয়।  
যাহাকে চোর সন্দেহ করি, তাহার টাকা কড়ি ফেলিয়া পালায় আর  
আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুস বাস কিছু লইনা।”

স্বামীজির সহিত, একদিন অনন্ত (Infinity) পদার্থ সম্বন্ধে কথা বার্তা  
হয়। সেই কথাটা বড়ই সুন্দর ও সত্য; তিনি বলিলেন, “There can  
be no too infinities” আমি সময় অনন্ত (time is infinite)  
ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন, আকাশ অনন্তটা  
বুঝিলাম কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝিলাম না। যাহা হউক, একটা পদার্থ  
অনন্ত, একথা বুঝি, কিন্তু দুইটা জিনিষ অনন্ত হইলে কোন্টা  
কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখাবে, সময়ও যাহা, আকাশও  
তাহাই, আরো অগ্রসর হইয়া বুঝিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, ও সেই  
সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুইটা দশটা নয়।”

এইরূপে স্বামীজির পদার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায়  
আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল। ২৭ তাবিথে বলিলেন, “আব থাকিব না;  
রামেশ্বরে বাইব মনে করিয়া অনেক দিন হইল এই দিকে চলিতেছি।  
যদি এই ভাবে অগ্রসর হই, তাহা হইলে এ জনমে আর রামেশ্বরের পৌছান  
হইবে না।” আমি অনেক অনুরোধ করিয়াও আর রাখিতে পারিলাম  
না। ২৭ শে অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মবমাগোয়া যাত্রা করিবেন,  
স্থির হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়া-  
ছিলেন, তাহা বলা যায় না। টিকিট কিনিয়া তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া আমি  
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, “স্বামীজি! জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও  
আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই! আজ আপনাকে প্রণাম  
করিয়া কৃতার্থ হইলাম।”

শ্রীহরিদাস মিত্র, কয়েট অফিসার, শোলাপুর।

## অজামিল ও নামমাহাত্ম্য ।

জগতে যত ভাব আছে, যত মত আছে, সবই সত্য । জগবান সত্য স্বরূপ ; তাঁহার সৃষ্ট জগতে বাস্তবিক অসত্য কিছুই থাকিতে পারে না । যাহাকে আমরা ঈশ্বরজ্ঞান, মিথ্যা বা ভ্রম বলি, তাহাও বাস্তবিক অসত্য নহে ; কোন না কোন সত্যের আচ্ছাদিত প্রকাশমাত্র । তবে যে আমাদের দৃষ্টিতে অনেক জিনিষ অসত্য বা সত্যাপত্যমিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা আমাদের দৃষ্টিহীনতার লক্ষণ । যে দৃষ্টি অবলম্বনে দেখিলে তাহাদের সত্যতা ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধিতে পারা যায়, তাহা আমাদের নাই বলিয়াই আমরা তাহাদের বুদ্ধিতে পারি না । যে প্রথম সেই বিষয় বিশেষে সত্য বুদ্ধিযাছিল, যে প্রথম সেই বিষয়বিশেষে সত্য দেখিয়াছিল—সেই সে মতের দ্রষ্টা । তাহার জ্ঞান দৃষ্টি তোমাব আমার নাই বলিয়াই আমরা এখন সেই তত্ত্ব ভ্রম দর্শন করিয়া থাকি । নতুবা আমরা জানি বা নাই জানি, প্রত্যেক অমৃতবে সত্য পদার্থই স্পর্শ করিয়া থাকি এবং আমাদের প্রত্যেক ভাব, মত এবং করণাও কোন না কোন সত্যাবলম্বনেই উঠিয়া থাকে । উহাদের প্রত্যেকটিই সেই সেই সত্যের বিকৃত দর্শনমাত্র—এ বিষয়ে ভ্রম নাই ।

জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন, জগৎ ভাবময়—সুতরাং তিনি এখানে সম্পূর্ণ অসৎ বলিয়া কিছুই দেখিতে পান না । কুৎসিত পাপাতারীর চেষ্ঠার ভিতরেও এইরূপে তাঁহারা দৃষ্টিহীনতাপ্রসূত বিকৃতভাবাপন্ন সত্যানুরাগই দেখিয়া থাকেন । তাহাদের জ্ঞান দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেই সমুদয় বস্তু সহস্র-ভুতির চক্ষে দেখিবার শক্তি হয় । যাহাদের এ দৃষ্টির বিকাশ হয় নাই, তাঁহারা জগতের প্রতি ভাব বা মতের ভিতরের সত্য ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিশেষ বঞ্চিত, সন্দেহ নাই ।

সর্ব দেশের ধর্ম্মইতিহাস আলোচনা করিয়াই দেখা যায়, তাহার মধ্যে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা আমাদের এখনকার দৃষ্টি ও বুদ্ধির সঙ্গে কোন মতে মিলাইতে পারা যায় না । আমাদের সঙ্গে মেলে না বলিয়া সেইগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দিবার কোন কারণ দেখি না । হয়ত

যিনি প্রথমে সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, তিনি উহাকে যে দৃষ্টিতে, যে ভাবে দেখেন, আমরা যদি উহাকে সেই ভাবে দেখিতে পারি, তাহা হইলে উহাতে যুক্তির বিরোধী কিছুই দেখিতে পাষ্টব না! হরত দেখিব, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—হৃদয়ের কোন সৌন্দর্য্য দেখান, বুদ্ধির নয়। বৃষ্টিব হযত পরবর্তী টীকাধারণ ক্রমশঃ উহাকে হৃদয়ের রাজ্য হইতে বুদ্ধির রাজ্যে লইয়া যাইবার অসম্ভব চেষ্টা করিয়া অসম্মতি দোষে পড়িয়াছেন।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে পূর্বাণব অজামিল উপাখ্যান লওয়া যাউক। চলিত কথায় আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, অজামিল পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম লইয়া উদ্ধাব হইয়াছিলেন। ইহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত কবেন, সাধনভজন কিছুমাত্র না করিয়া মরণেব পূর্বে কোন মাত একবার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাঁহাদের সবকাজ হইবে—ঈশ্বর লাভ হইবে। কিন্তু একবার ভাগবত খানা খুলিয়া দেখিলে অল্প কপ দেখিতে পাই। প্রথম দেখিতে পাই, অজামিল ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার রীতিমত শাস্ত্র জ্ঞান ছিল এবং স্বভাবও পূর্বে অতি সুন্দর ছিল। তিনি সদাচারীও যমাদি নানাগুণসম্পন্ন ছিলেন। সর্বদা ব্রত আচরণ করিতেন এবং মুদ্রস্থভাব, সত্যবাদী, মন্তজ্ঞ ও গুচি ছিলেন। তিনি অহঙ্কারশূন্য হইয়া সর্বদা গুরু, অগ্নি, অতিথি ও ব্রহ্মগণেব সেবা করিতেন। সকল প্রাণীব সঙ্গে তাঁহার সৌহার্দ্যভাব ছিল। তিনি অতি সাধু ও পরিমিতভাবী ছিলেন, কাহারও প্রতি কখন হিংসা করিতেন না।

পূর্বে অবস্থার তাঁহার এত সদ্গুণ ছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অজামিল পদের প্রয়োগী হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু পূর্বোক্ত সদ্গুণগণের একটাবও দাবী করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। যাউক, অসংসঙ্গে ইহার পতন হইল। দাসীগর্ভে যেদশপুত্র হইল, তাঁহার কনিষ্ঠটির নাম রাখা হইল নারায়ণ। এটা ব্রাহ্মণের অতিপ্রিয় ছিল। পুত্রের নাম নারায়ণ রাখাতে বুঝা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ অসংসঙ্গে পড়িয়া অসংমার্গাবলম্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বের ভগবদ্ভীষ্টা একেবারে ভুলিতে পাবেন নাই।

তার পর ইহার মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম স্বরণ। ভাগবতে লিখিত আছে, প্রথমে যমদূত ইহাকে লইতে আসিয়াছিল, তার পর নারায়ণ নাম উচ্চারিত হইবামাত্র বিষ্ণুদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে সন্দেহ এই, অজামিলের হৃদয়ে কি নারায়ণ শব্দ দ্বারা ভগবদ্ভাব কিছুমাত্র উদ্ভব হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, তবে আমরাও ত অনেক সময় নানা

কারণে ভগবানের নামাত্মক বিস্তার লক্ষ উচ্চারণ করিয়া থাকি, আমাদের কাছেই বা বিক্ষুব্ধ আসেন না কেন? ইহাতে বোধ হয়, যদি এই গল্পটি একটি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা হয়, তবে নিশ্চয় পুত্রহলে নারায়ণ লক্ষ উচ্চারণ করিতে করিতে ভাবযোগে (Association of ideas) তাঁহার মনে নারায়ণের ভাবও আসিয়াছিল, আর খুব সম্ভব যে, যোগের বিকারগ্রস্ত তাঁহার নিজের মনেরই এই প্রকার বৃত্তি সাকার রূপ ধারণ করিয়া নিকটে উপস্থিত হইয়া তর্ক করিয়াছিল। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অনেক সময় আমাদের সকলেরই ঘটিয়া থাকে। যমদূত বলিতেছেন, “অস্ত্রায় কার্য্য হইয়াছে, শান্তি পাইতেই হইবে।” বিক্ষুব্ধ বলিতেছেন, “ভগবদ্ভূতপানাম সর্কপাপ ক্রম হয়।

সাধারণের একটি সংস্কার আছে, অজ্ঞামিল এই অবস্থায় মরিয়া বিক্ষুব্ধ কর্তৃক বিক্ষুব্ধলোকে নীত হন। কিন্তু ভাগবত অশ্রুত বলিতেছেন। তাঁহার বিকার ছুটিয়া চেতনা হইল! কিন্তু যমদূত বিক্ষুব্ধদিগের সেই কথোপকথন কখন ভুলিতে পাবিলেন না, উহা তাঁহার প্রাণে লাগিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি আপন পূর্বকৃত অসদাচারের জন্য অতিশয় অশ্রুতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন যে, পুত্রহলে নারায়ণ নাম শ্রবণ করিয়া আমার এইরূপ সিদ্ধপুরুষগণের দর্শন ও এত সহৃদয় প্রবণ হইল। না জানি, প্রকৃত ভাবে ভগবানের উপাসনা করিলে কতদূর উন্নতি হয়। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, ‘আমি বাহাতে আবার ঘোর পাপে নিমগ্ন না হই, ভজ্ঞজ প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযমন করিব। অবিজ্ঞা ও কামকর্শজনিত এই বন্ধন মোচন করিয়া সর্ব প্রাণীর সুহৃদ, শান্ত, দয়াবান্ ও আত্মবান্ হইয়া জীর্ণপিণী নিজমারাগ্রস্ত আপনার আত্মাকে মুক্ত করিব। এক্ষণে সত্যবস্ততে আমার বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেহাদিতে আমি আমার বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা বিসর্জন পূর্বক চিত্তকে ভগবৎকীর্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া সেই ভগবানেই স্থাপন করিব।’

এই বলিয়া তিনি সর্বভাগ করিয়া ইরিদ্বারে গমন করিলেন। তথায় আসন করিয়া পূর্বক যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মাতে মনঃসংযোগ করিলেন। তৎপরে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় হইতে আত্মাকে বিষুক্ত করিয়া জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মরূপ ভগবানে সংযোগ করিলেন।

এই সময়ে সেই পূর্বদৃষ্ট বিক্ষুব্ধগণ আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

বাঁহারা একবার মাত্র ভগবানের নাম করিয়াই ভগবানকে পাইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন অজ্ঞামিলের ন্যায় সৰ্ব্বত্যাগ ও যোগ সাধনে প্রস্তুত আছেন ?

এই রূপে ভাগবত লিপিবদ্ধ অজ্ঞামিলের জীবনেতিহাস চলিত কথার সহিত অনেক বিরোধী হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নামমাহাত্ম্যের উপর যে চলিত বিশ্বাস আছে, তাহাও ভাগবতকারের দৃষ্টিতে পবিত্রত্বের যোগ্য বলিয়া বৃত্তিতে হয়। কিন্তু যে যে দৃষ্টি অবলম্বনে শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান কবে কে ? সুখপ্রিয় মানব কষ্টের দিকে তাকাইতে চাহে না ! আমাদের দেশের পণ্ডিতকুল, বাঁহাদের উপর সাধারণে ধৰ্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ! সকল জানিয়া শুনিয়াও সাধারণে বিশ্বাস যাচাতে যথার্থ শাস্ত্রদৃষ্টি উপর স্থাপিত হয়, তজ্জন্ত তাঁহারা কিছুমাত্র চেষ্টা করেন না। তাহাব উপর গ্রহচার্য্যগণের ভ্রমসঙ্কুল যুক্তিবিরোধী গণনা এবং কথক মহাশয়দিগের মতার্থ শাস্ত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত মূর্খের মনোরঞ্জনকারী অপক্লপ শাস্ত্র-স্বাধা, সাধারণের বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাদের বিশ্বাসকে যে কি ভীষণ আঘাতে ফেলিয়াছে, তাহা দেখে কে ? এখন সাধারণের শিক্ষার প্রসার ভিন্ন এই আবর্ত হইতে উদ্ধার পাইবার আর অন্য উপায় দেখি না।

দেখা গেল, ভগবানের নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাস করার যুক্তিবিরোধী কিছুই নাই। কিন্তু সাধারণে উহা যে ভাবে দৃষ্টি করে, তাহা ঠিক নহে। অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে আর কত বহুকালান্তর হৃদয়ের প্রিয় বিশ্বাস-নিচয়, আমরা যে ভাবে সত্য বলিয়া দেখি, সে ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া, অন্য এক ভাবে, অন্য এক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পাঠক কি জানিবামাত্র সেই সেই নূতন দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সে গুলির জীবনে অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছেন ?

শুদ্ধানন্দ ।

## স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ।

(ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত)

শিষ্য । স্বামীজি ! আপনি এদেশে লেক্চার দেন না কেন ? ইউরোপ  
আমেরিকা যাত্রিয়ে এলেন, এদেশে এসে চূপ্ ।

স্বামীজি । এদেশে আগে Ground তৈয়ারি কবতে হবে । তবে বীজ ফেল  
গাছ হবে । পশ্চিমের (Europe America) প্রভৃতির মাটি  
খুব উর্বরা, বীজ ফেলবার উপযুক্ত । ওদেশ ভোগের শেষসীমায়  
উঠেছে । ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন ওদের মন তাতেও শান্তি পাচ্ছে  
না । যেন কিছু চাই এরূপ হয়েছে । তাদের দেশে না আছে  
ভোগ, না আছে যোগ । ভোগের তৃপ্তি হলে যোগের কথা  
শুনবে ও বুঝবে । অম্মাভাবে ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, রোগশোক  
পরিভোগের জন্মভূমি ভারতে লেক্চার ফেক্চার দিয়ে কি হবে ?

শিষ্য । কেন, আপনিই বলেন এদেশ ধর্মভূমি । এতে লোক যেমন  
ধর্ম বোঝে, অল্পদেশে সেকণ নয় । তবে আপনার উদ্দীপক বাগ্দি-  
তায় কেন না দেশ যেতে উঠবে—কেননা ফল হবে ?

স্বামীজি । ধর্ম কর্ম কি জানিস ? আগে কুর্ন্যবতারের পূজা চাই ; পেট  
হচ্ছেন সেই কুর্ন্য । একে ঠাণ্ডা না কলে, তোর ধর্ম কর্মের  
কথা কেউ নিবে না । পেটের চিন্তায় ভারত অস্থির । বিদেশীয়  
শোষণ, অবাধ বাণিজ্য বস্তানি, সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত দাসমূলভর্জ্য  
তাদের দেশের অস্থি মজ্জা খেয়ে ফেলছে । তাদের ধর্মকথা শুনাবি,  
আগে তাদের পেটের চিন্তা দূর কর্তে হবে । নতুবা লেক্চার  
ফেক্চারে কোন ফল হবে না ।

শিষ্য । সে জন্য আমাদের কি কতে হবে ?

স্বামীজি । প্রথমতঃ কতকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন । যাত্রা নিজেদের  
সংসারের জন্য না ভেবে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে  
প্রস্তুত হবে । তাই আমি মঠ করে কতকগুলি বাল সন্ন্যাসীকে ঐরূপ  
তৈয়্যি করব—ঘর ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে নিজেদের

শৌচনীয় অবস্থার বিষয় বুঝিয়ে বলবে—ও তাদের নিজেরদের অবস্থার উন্নতি করতে উপদেশ দেবে আব সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান সত্যগুলি জলের মত সোজা কথার' বুঝিয়ে দেবে। তাদের দেশের Mass of People (জন সাধারণ) যেন Sleeping Leviathan (এক বিরাট জানোয়ার) ঘুমিয়ে আছে। এই যে দেখু'ছিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে দেশের এক কি দুই per cent লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পাচ্ছে না। কি করেই বা বেচাষি করবে? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে, সে সাত ছেলের বাপ্। যা তা করে একটা কেরাণীগিরি, বড় জোর একটা ডেপুটী-গিরি জুটিয়ে নেয়। ঐ হল শিক্ষার পরিণাম! সংসারের ভারে উচ্চকর্ষ উচ্চচিন্তা করবার তাদের সময় নাই। স্বার্থই সিদ্ধ হয় না, —পরার্থে আবার কি করবে?

শিষ্য। তবে কি আমাদের উপায় নাই?

স্বামীজি। অবশ্য আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে। কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠবে, যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে বাবে। তরঙ্গ যত নামে তার পর তত জোরে উঠে।

শিষ্য। কি করে উঠবে?

স্বামীজি। দেখু'ছিস্ না, পূর্বাশাশে অকণোদয় হয়েছে, সূর্য্য উঠবার বিলম্ব নাই। তোরা লেগে যা। সংসার সংসার করে কি হবে? তাদের এখন কার্য হচ্ছে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোক-দের বুঝিয়ে দেওয়া যে আর আলিঙ্গি করে বসে থাকলে চলছে না; তাদের নিজের অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে বল্গে—“ভাই সব উঠ, জাগ, কত দিন আর ঘুমবে;” তাদের নিজেরদের অবস্থা উন্নতি কল্পে—পরামর্শ দিগে; আর শাস্ত্রের মহান সত্য গুলি সরল করে বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এ দেশের ব্রাহ্মণেরা ধর্মটা একচেটে করে বসে-ছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিক্লে না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে বাতৈ পায়, তার ব্যবস্থা কর্গে। সকলকে বুঝায়ে, ব্রাহ্মণদের ন্যায় তোমাদেরও ধর্মের সমানাধিকার। আচঙালকে এই অধিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথার তাদের

ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থ জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখা পড়াকেও দিক্—আর তোদের বেদ বেদান্ত পড়াকেও দিক্।

শিষ্য। আমাদের সে শক্তি কই? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি পাকলে ধন্য হতেম্।

স্বামীজি। দুব মূর্থ। শক্তি কক্তি আপনি এসে যাবে। তুই কায়ে লেগে যা না; দেখ্‌বি, এত শক্তি আসবে যে, সামলাতে পারবি না। পরার্থে এতটুকু কায কবলে শক্তি জেগে ওঠে; পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি; কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পবের জন্ত খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খুসী হই।

শিষ্য। যারা আমাব উপর নির্ভর কব্ছে, তাদের কি হবে?

স্বামীজি। তুই যদি পরের জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হস্‌ ত তগবান তাদের একটা উপায় কববেনই। “ন হি কল্যাণকৃতং কশ্চিৎ চর্যতিং তাত গচ্ছতি”, মীত্—“ডেছিঁস্‌ ত?”

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজি। আসল কথা হচ্ছে ত্যাগ—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্ত বোল আনা প্রাণ দিয়ে কায কর্তে পারে না। ত্যাগী সকলকেই সমভাবে দেখে—সকলের সেবার নিষ্কৃত হয়। তোর বেদান্তও ত বলে, সকলকে সমান ভাবে দেখতে; তবে মাগ্‌ ছেলেটা বেশী আপনাব, এ ভাবটা রাশিস কেন? তোর দোরে স্বয়ং নারায়ণ কাঙ্গাল বেশে অনাহারে মৃতপ্রাণ হয়ে পড়ে রয়েছেন! তাঁকে কিছু না দিয়ে খালি নিজের ও নিজের মাগ্‌ ছেলের নানা প্রকার চব্য চোষা দিয়ে উদব পূর্তি করবি? ও ত পণ্ডব কণ্ব।

শিষ্য। পরার্থে কার্য্য করিতে ত সময়ে সময়ে বহু অর্থের দরকার হয়।

তা কোথা পাব?

স্বামীজি। বলি ষতটুকু কমতা ততটুকু কেন কর্‌ না? আর পরসার অভাবে যদি আর কিছু নাই দিতে পারিস—একটু ভাণ কবা বা জুটো সং উপদেশও ত তাদের জন্যে পারিস্‌! না—তাতেও তোর টাকার দরকার?



শিষ্য : আজ্ঞে হাঁ তৎপারি !

স্বামীজি : হাঁ পারি বলে হচ্ছে না। কি পারিস কাজে আমার দেখা, তবে ত জানুব আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা—কষ্মিনের জন্ত জীবন ? যখন এসেছিস, তখন একটা দাগ রেখে যা। নতুন পাছ পাথরও হচ্ছে মবছে। সে রূপ জন্মাতে মরতে ইচ্ছা হয় ত তা করগ। আমার কাজ দেখা যে, তোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে শুনাগে—তোদের ভিতর সেই অনন্ত শক্তি আছে; তা জাগাতে যত্ন কর। নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে ? ও ত মহাস্বার্থপবতা। ফেলে দে তোর ধ্যান—ফেলে দে তোর মুক্তি মুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।

শিষ্য অবাক হয়ে শুনিতে লাগিল। স্বামীজি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—  
স্বামীজি : তোরা আগে জামি তৈয়াবি কবগে। আমার মত হাজার হাজার বিবেকানন্দ পবে বজ্রতা কত্তে নবলোকে শবীর ধারণ করবে। তার জন্ত ভাবনা কি ? এই দেখনা অনাথ আশ্রম, দুর্ভিক্ষ ফণ্ড কত কি থল্ছি। দেখনি না—তোদের নিবেদিতা, ইংরেজ হয়ে তোদের গুমুত ফেলতে পথ্যন্ত শিখেছে ? আর তোরা দিশিলোক হয়ে, তোদের নিজের দেশেব লোকের জন্ত তা পার-  
বিনি ? যেখানে মহামারী হয়েছে, যেখানে জীবের দুঃখ হয়েছে, যেখানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে—চলে যা সে দিকে। নয়—মরেই যাবি। তোর মত কত কীট হচ্ছে মরুচে। তাতে জগতের কি আসচে যাচ্ছে ? একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা—মরে ত যাবিই, তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরা ভাল। এই ভাব ঘবে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মঙ্গল হবে। তোরাই দেশের আশা তরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। লেগে যা—লেগে যা। দেরি করিস নি—মৃত্যু ত দিন দিন নিকটে আসছে ! আর পরে করবি বলে বসে থাকিসনি—তা হলে কিছুই হবে না।

ক্রমশঃ ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ।

## মহাকোভকরী ধর্মশক্তি ।

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার কলিকাতা টাউনহলে সিস্টার নিবেদিতা উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতা সাংগ্ৰহে উহা শ্রবণ করেন। নিম্নে উক্তার সারাংশের অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

সিস্টার নিবেদিতা 'শিবগুরু' নাম কীর্তনাস্তর বলিলেন—

ভারতের পূর্বে গগন এক মহাবূগেব উষা আজ ধীবে ধীবে উদ্ভিত—এক মহান আদর্শ এই পবিত্র ভূমে আবির্ভূত। যে দিন হইতে ইংবাজি ভাষা ভারতের তাঁব ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, সেই দিন হইতে যেন কত নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন আশা, নূতন চেষ্টা, ভাবতবাসীর চিত্ত অধিকা করিয়াছে। স্বপ্ন ভাব দেখিলে ঐ সকল বিভিন্ন ভাব এবং চেষ্টার ভিত্তি একটা লক্ষ্য বিজ্ঞান দেখা যায়; এই ঘোর সংগ্রাম যে ঐ একমাত্র গুপ্ত ধন লাভের চেষ্টায়, ইহা বুঝা যায়। উহা—সেই একতা এবং জাতীয় ভাবের বিকাশ, যাহাতে মনগ্র ভারত একদিন পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু গত একশত বৎসর ধর্ম্মা ভারতের অগ্রণী মনিষিগণ যে সকল উপায় অবলম্বনে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা কেবল লক্ষ্যভ্রষ্টই হইয়াছেন। যাহাবা মনে করেন, ইংবাজ অধিকারের পূর্বে ভাবত বুদ্ধিবিকাশবিহীন, নিশ্চেষ্ট, জাতীয়-জীবনশূন্য ছিল, তাঁহাদের ভাবের ইতিহাস পাঠ বার্থ হইয়াছে। তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, ইউরোপীয় চিন্তাতন্ত্র ভারতের চিন্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া, পূর্বেপ্রবাহিত ভাষাত্রেতে নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছে যাত্র।

ইংরাজি শিক্ষার প্রথম ফল—একদল সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব, যাহারা কেবল সামান্য আচাৰ্যের পাবিত্র্যেই ভারতের ভাবী কল্যাণ দেখিতে-ছিলেন। ইহাদিগের পশ্চাৎ, রাজনৈতিক দলের দৃঢ় অধ্যবসায়ে কার্যক্ষেত্রে অবতরণ। কিন্তু আজ দেখা যাইতেছে, ইহাদিগের দ্বারা অনেক কার্য সম্পাদিত হইলেও ভাবত যে লক্ষ্যের অভিমুখে এতকাল দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহার প্রতি কি সমাজসংস্কারক কি রাজনীতিসংস্কার-

লোচক, কাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাহার পর ধর্মসম্বন্ধে, অনেক পুনর্বোধন দেখা যাইতেছে। কিন্তু যেখানে যেখানে ধর্মের উচ্ছ্বাস, প্রকৃত ধর্ম কি সেইখানে আছে? অবশ্য ধর্মই ভারতের একমাত্র সমস্তা। চিরকাল ভারত ধর্মের ভিতর দিয়াই সকল সমস্তা পূরণ করিয়াছে ও করিবে। কারণ, চরিত্রগঠন, কর্মশীলতা ও বহুজনহিতায় কার্য্যর অনুষ্ঠান, ধর্মেরই অন্তর্ভূত। আপনারা সকলে যে মহান্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য-ধরিয়া এতকাল অগ্রসর হইতেছেন, তাহা প্রকৃত কি, তাহা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন? উহা সেই মহান্ আদর্শ, যাহা “জাতিত্ব বোধ” এই বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। এই সত্য লাভ করিতে নানা বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছে; অনেক বস্তু অসম্ভব ভাবিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু দেখিতেছেন না, যাহার অন্বেষণে গত শত বৎসরে এত শক্তি ব্যয় হইল, তাহার লাভ, কখনই ঐ সকল অমুষ্টিত কার্য্যের দ্বারা হইবার নহে?

বার বার নিশ্চল হইয়া এখন উপলব্ধি হইতেছে, কোন মহাত্মা ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে। ভারতবাসীর মনে এতদিনে উহা বিকশিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ইংরাজশাসনের ফলস্বরূপ ভারতে রেলপথ প্রভৃতি যাতায়াতের উপায়, ডাক বিভাগ, ও বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতি যেমনি প্রবর্তিত হইল, অমনি সমগ্র ভাবতবাসী, তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ভাবতে যে ভাব এবং অবস্থা প্রবাহিত ছিল, সেই ভাব এবং অবস্থার সহস্র প্রত্যাবর্তন পূর্বক আবার এক জাতিতে পবিণত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক এই একতাব ভাব ভারতে পূর্ব হইতে জীবিত না থাকিলে সহস্র ভাবে ভারত পূর্ব হইতে এক না থাকিলে, কেবল পঞ্চাশ বৎসরে একরূপ পরিবর্তন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব কথা। প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতবাসীর একতা এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিল?

উত্তরে বলা যাইতে পারে, এই একতাব ভাব, ‘স্বর্গদাপি গবীযসী,’ জন্মভূমিক বেছে আবদ্ধ, প্রজাকুলের মনোমধ্যেই অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিতেছিল। স্বদেশ-বৎসল মানবমনই যে চিরকাল অগ্নীম শক্তির আধার, একথা মহাসত্য। কেহ কেহ বলেন—একতা যে ভারতবাসীর নিত্যান্ত আবশ্যক, একথা সত্য হইলেও সাম্প্রদায়িক ধর্মের প্রভাবেই যে ভারত নিত্যান্ত ছিন্ন ভিন্ন। জিজ্ঞাস্য করি, ইহা কি প্রকৃত কথা? তাঁহাদের কি বিশ্বাস, ধর্ম তাঁহাদিগকে বিভিন্ন রাখিয়াছে, তাঁহাদিগকে পরস্পর বিবর্তনীয় করিয়াছে? প্রকৃত ধর্ম কখন

মতবিশেষে আবদ্ধ থাকে না। যতক্ষণ লোকে মতবিশেষের দাসত্ব করে, ততক্ষণই তাহারা অসত্য হইলেও উহাকে সত্য ধর্ম বনিয়া বুঝিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু যে ধর্ম মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক্ করে, মানুষকে মানুষের শত্রু করে, উহা কখনই ধর্ম হইতে পারে না।

মুসলমান ধর্মবক্তা হজরত মহম্মদের নিকট ভারতের একটি বিষয় শিক্ষা কবা প্রয়োজন। সেই আরবোষের উদ্ভূতশিচালক প্রচারিত ধর্ম মধ্যে, জগতে অদ্বৈত যে এক মহাজাতিপ্রসূতকারী শক্তি নিহিত রহিয়াছে—তাহাই। এক্ষণে জাতিত্ব বোধ রূপ যে আদর্শের জয়লাভে, সমস্ত ভাবতবাসী জয়যুক্ত হইবে, কি করিলে উহা ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহাই জিজ্ঞাস্য। ভাবত নিজেব হাঙ্গাই নিজেব ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট ধারণ করিয়া রহিয়াছে! ভাবতের মঙ্গল ভারতের হস্তে, একথা এক্ষণে যেক্রপ নিঃশেষ বলা যাইতে পারে, পূর্বে কখন সেরূপ বনিবার সম্ভাবনা ছিল না। বর্তমান বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনে ভারতের জাতিত্বভাব আজ সর্ব সমক্ষে প্রকাশিত। ভাবতবাসী কি তাঁহাদের নিজেব বিদ্যা শিক্ষার ভার নিজের হস্তে লইতে সক্ষম? মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, কি ত্যাগ স্বীকার ও আপনাকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত? জাতীয় ভাবের নূতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়া, ভারতকে কি একরূপ ভাবে গঠন করিতে প্রস্তুত; যাহা দেখিবার জন্ত জগৎ অপেক্ষা করিতেছে? ভারত কখন উপযুক্ত সন্তানের অভাব বোধ করেন নাই। কিন্তু অত্যাধি তাঁহাদিগের ভিতর নিজের শক্তি প্রকাশ করিবার উত্তেজক কাণের অভাব ছিল। এতদিনে সেই অবসর উপস্থিত। ভারতসন্তানগণের উদ্দেশ্য ও চেষ্টা এখন যেন আর নাসিক বিশ পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরি দ্বারা শোচনীয় জীবন ধারণ রূপ কার্যে পর্য্যবসিত না হয়। জ্ঞান লাভই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য—উহা তির তাঁহাদের ভিতর জ্ঞান লাভের যেন অত্র কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য না থাকে। জ্ঞানই জীবন্ত শক্তি। সকলে, জ্ঞানের জন্য যেন জ্ঞান লাভ করেন; এই শিক্ষার ফলে ভারত পরে কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা বলা অসম্ভব। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্ত পুরুষদিগের সাহায্যে, ভাবতের জীলোকগণের ভিতরই প্রথম এই বোধ তীব্রভাবে সঞ্চারিত হইবে এবং পরে তাঁহাদের দ্বারা ই দেশময় জাতিত্ব বোধের সম্যক্ উদ্‌ঘাটন অসুষ্ঠিত হইবে।

আধ্যাত্মিক এই ফল উপলব্ধি করাইবার জন্য দেশময় এই যে উদ্বোধন ধ্বনি, উহাকে নিজ নিজ স্বার্থপ্রসূত প্রয়োচনা বলিয়া জ্ঞান করিবে না। অথবা ভারতের অভাব অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া সেট অভাব মোচনের জন্য সমুদ্বীত, তাহাও নহে। ভারত মধ্য হইতে যে এই উদ্বোধন গীতি, উহা ভারতের নিকট জগতেব প্রার্থনা। জগৎ চাহিতেছে সেই জ্ঞান, সেই মহানুপ্রতি, সেই ভাবরাশি সমন্বিত মহা প্রতিভা, সেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপলব্ধি, যাহা ভারতবাসীর অবিনশ্বর পৈতৃক ধন। এশিয়া যেমন ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীর মাতৃরূপা; ভারত, আবার সেইরূপ মনুষ্যজীবনের উচ্চ আদর্শ শিখান সম্বন্ধে এশিয়ার মাতৃরূপা। যদি ভারত এখন আপনায় সেই পদের সম্মান না রাখিতে পারে, তাহা হইলে জগতকে গভীর ক্রটি-জ্ঞান শুনাইতে আর কেহই থাকিবে না। ঐ জ্ঞান শুনিবার এবং জীবনে পরিণত দেখিবার জন্ত জগৎ প্রতীক্ষা করিতেছে। হে ভারতসন্তান, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বার্থহীন বিসর্জন দাও এবং জ্ঞানলাভে অগ্রসর হও। স্বার্থ-সাধনের দিকে লক্ষ্য করিও না। কিন্তু উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ জন্ত কৰ্ম্মযোগ অবলম্বন কর। সত্যপাভেব জন্ত জ্ঞানানুসরণ কব, প্রেমের জন্ত প্রেমের অনুসরণ কর। এইরূপে শক্তিশালত করিয়া বীর কার্য সাধন কব।

তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হৃদয় এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছেন যে, যখন ইহ সংসারের সকলই মিথ্যা, জগৎই মায়ী, তখন কাম্য কবা নিস্প্রয়োজন! কেহ কেহ আবার হৃদয় বিশ্বাস করেন যে কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্বাস প্রাপ্তি গ্রহণ করাই একমাত্র যোগ। আমাব মতে মায়ী, যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য সকলের একপ মায়াত্মক অপব্যবহার কবা অপেক্ষা তাঁহাদের পক্ষে ও সকল কথা একেবারেই না শোনাই ভাল। যিনি সুখ দুঃখ হর্ষ শোকাদি দ্বন্দ্ব সংগ্রামে জরলাভ করিয়া শাস্ত্রকথিত সেই অনির্বচনীয় ভাব হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, যিনি মহা তপস্বী, ত্যাগ ও আত্মজন্মেব মধ্য দিয়া আমিত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারই কেবল মায়ী সম্বন্ধে ভাবিবাব অধিকার আছে। যত দিন মা এশিক্ষা লাভ হয় যে, লোকহিতকর, স্বজাতির কল্যাণকর যত প্রকার কৰ্ম্ম আছে, সে সকলের অনুষ্ঠানেই যোগ সিদ্ধি লাভ করা যাইতে পারে, ততদিন যোগ সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহারা যেন না উচ্চারণ করেন।

আজ হইতে সকলে অবধারণ করুন যে, এই জাতিধর্ম্মই অস্তিত্ববিহিত শক্তি প্রভাবে জাতীয় জীবনে মহাশোভা উপন্ন করিয়া উহাকে উন্নতির পথে,

সত্যের দিকে মহাবেগে লইয়া যাইতেছে। ভাবতেব খ্রীলোকদিগের দ্বারাই উহা প্রধানতঃ উদ্ঘূষিত হইবে। অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর সমক্ষে এই মহা দায়িত্ব রহিয়াছে—তাঁহারা যেন স্বকীয় পরিবারের খ্রীলোকদিগকে এক্রপ শিক্ষা দান করেন, যাহা হইতে ভারতে এই জাতিত্ব মহাশক্তির শীঘ্র শীঘ্র পুনরুদয় হয়! এষ্ট মহাশক্তির পুনরুদয় যে অতি সঙ্গিকট, তাঁহাও আমবা আজ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। “ওয়া গুরুকি ফতে” অর্থাৎ খ্রীষ্টকৃদেবের জয় উচ্চারণ পূর্বক বক্তৃতার সমাপ্ত হইয়াছিল।

## সংবাদ।

হাসী অখণ্ডানন্দের যাত্র ও পবিত্রমে, কিছুকাল হইল একটি নিম্ন প্রাইমারি বিদ্যালয়, ভাবনা রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রমের সঙ্গে পোলা হয়— একথা আমবা পূর্বেই জানাইয়াছি। ঐ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য, শুধু যে আশ্রমের বালকদিগকেই শিক্ষা দেওয়া তাহা নহে; কিন্তু গ্রামস্থ সকল গরিব বালকেই যাহাতে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়। ঐ বিদ্যালয় হইতে এই বৎসরে প্রথম তিনটি ছাত্রকে নিম্ন প্রাথমিক (Lower Primary) পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়। তিনটি বালকই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং উহাদেব মধ্যে আবার আশ্রমভুক্ত অনাথ বালকটি পরীক্ষায় সমাগত সমগ্র স্কুলার বালকদেব মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ বালকটি মাসিক ১০ টাই টাকা হারর দুই বৎসরের জন্ত একটি বৃত্তিও পাইয়াছে।

আশ্রমের অপর কাণ্ডাদি পুঙ্কের জায় প্রচাররূপে চলিতেছে। গত মাঘ মাসে ৮সবস্বতী পূজা এবং ফাল্গুনে খ্রীষ্টীয়ানকৃদেবের জন্মতিথি পূজা সমারোহে অহুষ্ঠিত হইয়া চতুঃপাশ্বে গরিব কৃষাণদের অশেষ উৎসাহ ও আনন্দ বর্জন করিয়াছিল।

জেলা বরিশালের অন্তর্গত নরোত্তমপুর গ্রামে খ্রীষ্টীয়ানকৃদেবের জন্মোৎসব হয়। তদুপলক্ষে পূজা, সঙ্গীর্তন ও সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিত-  
রিত হয়।

বর্তমান শ্রীবাসকৃষ্ণ সমিতির সেক্রেটারি বর্তমানের বর্তমান মহা-  
রাজাধিরাজ প্রণীত ১ম ও ২য় ভাগ 'বিশ্বরসগীতিকা' সমালোচনার্থ পাঠাইয়া-  
ছেন। আমরা পুস্তিকা দুইখানি আশ্রয় পাঠ করিয়া মহারাজকে তখন  
বয়সেই অসাধারণ ধর্ম্মানুবাগের পরিচয় পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।  
দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীবাসকৃষ্ণদেব সংক্ষেপ সঙ্গীতটী উদ্ধৃত হইল।

### কামোদ—ধামার ।

পরম রতন, পেয়েছে যে জন, কখন যতন, কাচে কি করে ।  
সুধার সুরসে, যে রসনা রসে, স্নদা সে বিরসে সহিতে নারে ।  
( সুধার সুতাব, রসনায় বার, বিরসে কি তাব, মানস সবে ? ) ॥

মাতৃ মহাতাব ধ্যান, যে ধন্য কবেছে প্রাণে,  
পশুতা কি তাব মনে, পারে কহু পশিবাবে ।  
তাই ত সাধকবর, বিভূপ্রমে নিরস্তর,  
ভুবায় রেখে অস্তর, তরেছ ভবহুস্তর ।  
বসি জননীর কোলে, মহানন্দে হেঁসে খেলে,  
কুশলে কাল যাপিলে, ভাবি তাঁর ভক্তিভাবে ।  
ক্ষেপা মার ক্ষেপা ছেলে, মায়ে পেয়ে সব ভুলে,  
বাসনায় পদে দলে, শিখালে জ্ঞান সবাঁবে ।  
বিষম বিষয় নিষে, লোকে যাঁহা ভালবাসে,  
ভাজিলে জ্ঞানের বশে, থাকিয়া ধবা মাঝাবে ।  
মিশি ভববাসী সনে, নিম্পাপ হলে কেমনে,  
সরল খলসদনে, দেবতা মানবাকাঁবে ।  
তোমার চরণে স্মরি, হৃদ্ধিতে পবিত্রি,  
বিজয় যেন তোমারি, দর্শিত পথে বিচরে ॥

# উত্তরাখণ্ডে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী

( ত্রীনিবুঞ্জ বিহারী মল্লিক । )

পূর্ব প্রকাশিতের পৰ।

আমরা ক্রমাগত চড়াই করিতেছি, শবীর দিয়া বাম বাহির হইতেছে, শ্বাস খুব জোরে বহিতেছে; অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হইলে বসিয়া বিশ্রাম লইতেছি, কিন্তু আমাদের মুটে আমাদেরকে বসিতে নিষেধ করিতে লাগিল ও বলিল, হাতের লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিরিয়ে নাও। তাহার কথা সত্য, কাবণ, চড়াই করিতে করিতে বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা কবে না এবং শাবীরবিজ্ঞানমতেও ইহা নিষিদ্ধ। আমরাও তাহার কথামত লাঠিতে ভর দিয়া মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম কবিয়া লইতে লাগিলাম। ৩৪ মাইল চড়াই করিয়া আমরা একটা কাঠের ফলকে বাস্তার নির্দেশ দেখিতে পাইয়া সেই নির্দিষ্ট দিকে চলিতে লাগিলাম। আরও ২১৩ মাইল যাইয়া আমরা পূর্বতপার্শ্বে অনেক নিম্নে একটা গ্রাম দেখিয়া সেইটা দাঙ্গর গ্রাম বলিয়া নিশ্চিত কবিলাম। কিন্তু পাহাড়ি মুটে বলিল যে, ওটা দাঙ্গর গাঁ নহ, এখন আবও পাহাড় চড়াই কবিতে হইবে। আমার সঙ্গীরা সে কথায বিশ্বাস কবিল না, সকলেই সেই গাঁয়ে যাইবাব ইচ্ছা কবিল এবং আমাদেরও জেদ কবিতে লাগিল। আজ এই পথে একটাও লোক দেখিতে পাই নাই যে, তাহাব নিকট পথ নিশ্চিত করিয়া লইব, শেষে আমি সঙ্গীদিগকে বলিলাম যে, পাহাডেব পথে পাহাড়িব অনুমানের উপর নির্ভবই শ্রেয়-স্কর; এবং সকলকে বুঝাইয়া মুটিয়াব নির্দিষ্ট পথে চড়াই কবিতে লাগিলাম।

পাহাডে এতদিন জল ও কাষ্ঠ এই দুটিব স্মৃগ ভোগ কবিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এই পাহাডে উপস্থিত প্রথমটাব, পলে দ্বিতীয়টাব কষ্টে বেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পুনৰায় চড়াই কবিতে কবিতে পথে দুই এক স্থানে বরফ পাইলাম এবং অত্যন্ত পিপাসা লাগায় সেই বরফ খাইয়া পিপাসা শান্তি করিলাম। কিন্তু এক্রপে বরফ ঝাড়া উচিত নহ, খাইলে অসুখ হয়। যাহা হউক, শেষে অনেক কষ্টে সর্ব সমেত ৭ মাইল চড়াই কবিয়া একটা প্রস্রবণের ( Surface stream ) নিকট আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানে বৃক্ষাদি খুব কম। আমরা অনেক কষ্টে কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া সকলে



তাপিতে লাগিলাম, কারণ, এখানে অতিশয় ঠাণ্ডা। পরে জানাদি করিয়া পূর্ব দিনের প্রস্তুত সেই কটা এবং ছাত্ত্ব সহিত মধু মাখিয়া থাইয়া লইলাম। 'ব্রহ্মচারী' জানাশ্বে পূজাদি কবিয়া লইলেন। তাঁহাকে ছাত্ত্ব থাইবার জন্য অনেক অম্লবোধ, কবিসীম, কিন্তু তিনি বলিলেন, আমি দাল তিন্ন অপব অন্ন খাওয়া ত্যাগ করিয়াছি, অতএব সন্ধ্যায় সম্বৎ দাল রন্ধিয়া থাইব।

আমবা সকলে এই স্থানে ঘটাখানেক বিশ্রাম করিয়া পার্শ্বের তৃণাদিশূন্য (Barren) পর্বত বামে বামিয়া ২১৩ বর্শি পথ ওৎবাই করিলাম : কিন্তু মুটে বলিল, আমবা বাস্তা ভুলিতেছি। এটা জঙ্গলের পথ, এদিকে যাওয়া হইবে না, বাম পার্শ্বের ঐ তৃণাদিশূন্য পাহাড় চড়াই কবিলে তবে ঠিক পথ পাওয়া যাইবে, অতএব ঐ পথে চল। সঙ্গীরা কেহই আর উক্ত পাহাড়ে চড়াই কবিতে চাহিল না, সকলেই বলিল, আমবা নিশ্চয়ই পথ ভুলিয়াছি। যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে, আব অনর্থক কষ্ট কবিব না। একপ করিয়া বিপদের সময় বুঝা অতিবাহিত করা উচিত নয়, এবং দিনমানের মধ্যে যাহাতে দাঙ্গব গাঁবে পৌঁছিতে পারি, সেই চেষ্টায় শেষে আমি মুটের সহিত ঐ পূর্বোক্ত বাম পার্শ্বের তৃণাদিশূন্য পর্বতে চড়াই কবিতে লাগিলাম। সঙ্গীরা ঐ স্থানে বসিয়া বহিল, আমবা খানিকটা চড়াই কবিলে, তবে সঙ্গীরা উঠিয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। আমবা দেড় মাইল চড়াই করিয়া পাহাড়ের শিখরে থাইয়া পৌঁছিলাম।

এই স্থান এত উচ্চ যে, চতুষ্পার্শ্বত আব সকল পাহাড় খুব নিচু; কেবল উত্তর দিকে ভূমাবমণ্ডিত পর্বতশিখর গুলি আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেখা যাইতে লাগিল। যাহা ইউক, আমবা এই পাহাড়ের উপবিভাগে মধ্যে মধ্যে বরফ পাব হইল। অর্ধ মাইল গিয়া পাহাড়ের শেষ সীমায় পৌঁছিলাম। এখান হইতে ওৎবাই কবিতে হইবে; ওৎবায়ে প্রথম খানিকটা বরফ আছে। আমাদের মুটে একটা স্থানে কম বরফ থাকায় পছন্দ করিয়া প্রথম ২১৩ বর্শি যে স্থান টুকু হইতে বরফ গলিয়া গিয়াছে, সেই স্থান টুকু ছোট ছোট গাছের গোড়া ধরিয়া বসিয়া বসিয়া নামিয়া গেল। কারণ, এই স্থানটি অত্যন্ত ঢালু; দাঁড়াইয়া নামিলে পদাশ্লিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাব পবে আমবাও একে একে ঐ পথ টুকু সেইরূপে নামিয়া সকলে একত্রিত হইলাম। পবে এই স্থান হইতে দেখিলাম যে, টেবচা ভাবে ২৫২৫ হাত নামিয়া যাইলে একটা

উচ্চ বরফশূন্য ভূমিখণ্ডে পৌঁছান যায় এবং সোভা ঢালু দিয়া নামিলে ৫০৬০ হাত নীচে তুষারময় সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়। আমাদের মুঠে সর্ব প্রথমে পা টিপিয়া টিপিয়া বরফের উপর দিয়া টেংচা ভাবে নামিয়া সেই উচ্চ বরফশূন্য ভূমিতে গেল। তাহাব পশ্চাৎ বিনোদ বাইয়া সেখানে পৌঁছিল। বিনোদেব পবে আমি নিজ হাতের লাঠিতে ভব দিয়া টেংচা ভাবে নামিতে লাগিলাম, মধ্য পথে আমাব একবার পা হডকাইয়া গেল, কিন্তু সামলাইয়া লইলাম, এবং অতি কষ্টে সেই স্থানে পৌঁছিলাম। আমার পবে ব্রহ্মচারী নামিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাব পা পিছলাইয়া যাওয়ায় তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গড় গড় করিয়া ৫০ হাত নীচে সেই বরফময় সমতল স্থানে গিয়া পড়িলেন, মুঠে তৎক্ষণাৎ বাইয়া সে স্থান হইতে তাঁহাকে হাত ধরিয়া আমাদের নিকট লইয়া আসিল; তাঁহাব কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। সর্ব শেষে উড়িয়া ব্রাহ্মণ নামিতে লাগিল, কিন্তু তাহাবও পদস্থলিত হওয়ায়, সে একেবারে ধবান্বিত হইল; এবং গড়াইতে গড়াইতে সেই নীচেব তুষারময় সমতল স্থানে গিয়া পড়িল। তথায় সে শীঘ্র উঠিয়া না বসায় আমাদের মনে তাহাব প্রাণনাশের আশঙ্কা হইল। কিন্তু মুঠে বাইয়া তাহাকে তোলায় সে মুঠের হাত ধরিয়া আমাদের নিকট আসিল, ঈশ্বর কৃপায় তাহাবও বিশেষ কোন চোট লাগে নাই। আমরা এই স্থানে অতি কষ্টে কঠিন সংগ্রহ করিয়া আগুনে শরীর সঁকিয়া পুনর্বার ওংবাই করিতে লাগিলাম; নিকটে আরও জুই স্থানে বরফ পাব হইতে হইল, কিন্তু তাহাতে পূর্বের তায় কোন বিপদ হয় নাই।

বাহা হউক, এইরূপে ৩৪ মাইল ওংবায়ের পব পাহাডেব সর্ব নিম্নে দাক্ষিণ গাঁ একটা ক্ষুদ্র ছবিব ত্রায় ও পার্শ্বস্থ যমুনা নদী একটা গুল রেখাব ত্রায় দেখা যাইতে লাগিল। আবও ঋনিক নামিলে পর নদীব অবিশ্রান্ত কল্লোলধ্বনি সমুদ্রগর্জনের ত্রায় শুনা যাইতে লাগিল। পাহাডে নদীব শব্দ অনেক দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। সে বাহা হউক, আমরা সর্ব সমেত ৯ মাইল ওংবাই করিয়া সন্ধ্যাব সময় দাক্ষিণ গাঁয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি এত উচ্চ ও ছবাবোহ পর্বত হিমালয়ের আর কোন পথে, কি কাশ্মিরে অমরনাথের পথে, কি গাড়োয়াল ও কুম্ভাউনের বাস্তায়, কি হিমালয়ের অপরাপর অংশেব বাস্তায়, কোথাও দেখি নাই। বহু-নারায়ণের পথে সর্বাপেক্ষা উচ্চ চড়াই তুষারনাথ, কিন্তু তাহাতে উঠিবাব

বাধা বাস্তা আছে, উহাও ৭ মাইল মাত্র। দাঙ্গর গাঁয়ে একটি পাহাড়ির বাটীতে বাসা কবিরাম। এখানে ব্রহ্মচারী দাল রন্ধন করিয়া খাইল। এখান হইতে যাত্রা কবিয়া পবদিন সন্ধ্যার সময় খরশালা গাঁয়ে পৌঁছিলাম। এই গ্রামটী যমুনাব দক্ষিণ তটে অবস্থিত। ইহাবই পবপাবে পাণ্ডা গাঁয়ে ছত্র আছে। যমুনোত্রিব পাণ্ডাদেব সেখানে বাস বলিয়া গাঁয়ের নাম পাণ্ডাগাঁ ; গ্রামের একটু তলতে পোল আছে, তদ্দ্বারা উভয় গ্রামে যাতায়াত আসা যায়। এখান হইতে যমুনোত্রি ৫৬ মাইল মাত্র। এখান হইতে একজন পাণ্ডা আমাদেব সঙ্গ লইল। সে আমাদিগকে বলিল যে, বসুন্দের বাসনকেসিন এবং অপবাপব দ্রব্য কতক এই স্থানে রাখিয়া দিয়া অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্গে লউন, কাবণ, যমুনোত্রিব নিকট ওৎবায়ের পথ না থাকায় ভয়ানক বিপদজনক, আব সেখানে বসুন্দের বাসন আমি যমুনা মাতার মন্দির হইতে দিব। আমবা পবদিন প্রাতে খরশালা গাঁয়ে যাত্রাব বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহাব নিকট অধিকাংশ দ্রব্য রাখিয়া দিয়া কেবল মাত্র আহাবীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি লইয়া সেই পাণ্ডাব সহিত যাত্রা কবিরাম।

এই গ্রাম হইতে যমুনোত্রি পর্য্যন্ত একটী বাস্তা অনেক কাল হইল কোন বাজা তৈয়ারি কবিয়া দিয়াছিলেন। তাহার অনেক স্থান এখন ভাঙ্গিয়া বা ধসিয়া যাওয়ায় পাণ্ডারা সেই সকল স্থানে গাছেব গুঁড়ি ফেলিয়া দিয়া যাইবাব উপায় করিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহাব উপব দিয়া যাইবাব সময় নীচেব দাকণ খড দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। পথে যাইতে যাইতে যমুনোত্রি হইতে ফেবং ৩৪ জন সাধুব সহিত দেখা হইল ; এবং শেষে আমবা যমুনোত্রির নিকট আসিয়া দেখি যে, যমুনা পর্য্যন্ত ২০২৫ হাত খাড়া ওৎবাই ; এই স্থানের জন্ত পাণ্ডা বোঝা লইতে নিষেধ কবিয়াছিল। এই ওৎবাইটী আমবা অতি কষ্টে ব্রহ্মাদিব শিকড় ধবিয়া নামিয়া যমুনাব দক্ষিণ পারে আসিলাম। এখানে যমুনাব গভীরতা এক হাত মাত্র ও উহা ৮১০ হাত মাত্র প্রশস্ত। জলে বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, তাহাদেব উপব দিয়া আমবা পরপারে অবস্থিত একটা খুব উচ্চ চিবতুষাবাক্ষর ( Ever-lasting snow ) পাহাডেব নীচে পৌঁছিলাম। এই স্থানকে যমুনোত্রি বলে।

যমুনোত্রিব দৃশ্য অতি বমণীয়, সম্মুখে চিরতুষাবাক্ষর শুভ্র বর্ণের পর্বত আকাশ ভেদ কবিয়া উঠিয়াছে ও পশ্চাতে ব্রহ্মাদিপুণ গ্রামল বর্ণের পর্বত বিরাজিত (যাহা এই নাত্র আমবা পার হইবা আসিয়াছি)।

উভয় পর্বত পাশাপাশি থাকায় ঠিক যেন ভগবানের হরিহর মূর্তির জায় দেখাইতেছে। সমুদ্রের চিরভূবারাচ্ছন্ন পর্বতটাকে এখানকার লোকে স্নমেক বলে; আমাদের সমভিব্যাহারী পাণ্ডা দুই জন সাহেবেব সহিত এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়াছিল। তাহার মুখে গুনিলাম, নীচে হইতে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিতে প্রায় ৭ মাইল পথ চড়াই কবিত হইবে। তাহাব মধ্যে প্রথম ২৩ মাইল বরফ নাই, তাহার পর্বের সমুদায় পথ চিরদিন বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উপবে ভয়ানক শীত, যেন সর্পাঙ্গ অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে বোধ হয়, সাহেবেরা উপর হইতে দূরবীণ সাহায্যে নিবাটের ছাউনি পর্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিল। এই পাহাড়টা একদিনেই উঠিয়া ফের নামিয়া আসিতে হয়। আমরা নীচে হইতে এই স্নমেকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, ইহার তদদেশ হইতে উদ্ধদিকে খানিকটা পর্যন্ত বরফ নাই, তাহাব পর সমুদায় বরফে আচ্ছন্ন। সূর্য্যকিরণে বরফ গলিয়া ছোট ছোট ধাবায় নীচে নামিয়া আসিতেছে এবং পরে ঐ ধারা সমুদায় একত্র হইয়া যমুনা নদীব আকাবে ধাবণ করিয়াছে। পূর্বে শাস্ত্রে যমুনাকে সূর্য্যতনয়া বলিয়া গুনিয়াছিলাম, আজ এখানে আসিয়া সূর্য্যতেজে বরফ গলিয়া যমুনার জন্ম বা উৎপত্তি প্রত্যক্ষ কবিয়া যমুনাকে সূর্য্যতনয়া বলিয়া জানিলাম।

যমুনোত্রিতে একটা প্রস্তর নির্মিত মন্দির আছে। কিন্তু পাণ্ডা বা পূজাবি কেহই থাকে না, এতাহ পূজাও হয় না, তবে সময় সময় যাত্রীদের সঙ্গে কোন পাণ্ডা আসিলে সেই দিন সেই পাণ্ডাই পূজা কবে। আমাদের সঙ্গে পাণ্ডা সে দিন পূজা করিল। মন্দিরাত্যন্তরে সাদা পাথরের যমুনা মাতাব মূর্তি বিবাজিত। মন্দিরের পাশেই তপ্ত কুণ্ড আছে, জল অত্যন্ত গরম। ইহার জলে কাপড়ে চাউল বাধিয়া রাখিলে ভাত তৈয়ারি হয় এবং কটা কবিয়া ফেলিয়া দিলে আপনি তৈয়ারি হইয়া ভাসিয়া উঠে। যাত্রীগণের এখানে এইরূপে আহাবীয় তৈয়ারি করিয়া খাইবার নিয়ম আছে। আমরাও সে কারণ কিছু কিছু দ্রব্য এই রূপে তৈয়ারি করিয়াছিলাম, বাকি দ্রব্য অগ্নিতে তৈয়ারি করি।

এখানে আমরা পাণ্ডাব সহিত বসুধারা, ত্রিবেণী, গৌরীধারা, সহস্রধারা, স্বয়ংকুণ্ড, গৌবীকুণ্ড, বিশ্বকুণ্ড, অদ্রিকুণ্ড, গোবক চিপি, স্বয়ংমুগী, মুখারবিন্দ, ওপমুখী প্রভৃতি স্থানে আর্চমন, হ্নান বা দর্শন কবিলাম। এখানে কাষ্ঠ না

পাণ্ডায় আমাদের ঘুটে অনেক দূর হইতে কাষ্ঠ যোগাড় কবিয়া আনিলে, আমবা মন্দিরের পার্শ্বে একটা কাষ্ঠনির্মিত ধরমশালায় রন্ধন কবিতো লাগিলাম। পাণ্ডাকে সিদা দিলাম, সেও রসুই কবিতো লাগিল। বসুয়ের বাসন পাণ্ডা মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। একজন সাধু এখানে পূর্ব দিনেই আসিয়াছিলেন, তিনি নিকটে একটা গুফা দেখাইয়া দিয়া এবং গুফা বেশ গবয় বলিয়া সেই খানে বাহ্যে থাকিতে পরামর্শ দিয়া পাণ্ডাগাঁয়ে চলিয়া গেলেন। আমবা আহাবাদি কবিলে পব পাণ্ডা আমাদের নিকট হইতে দক্ষিণা লইয়া এং বসুয়ের বাসনাদি মন্দিরে রাখিয়া দ্বাবে শিকল লাগাইয়া দিতে অন্তবোধ কবিয়া থবশালা গাঁয়ে ফিরিয়া গেল। আমবা সেই রাত্রে সেখানে থাকিতে অনেক অন্তবোধ কবিলাম, কিন্তু সে শুনিলা না।

আমবা আহাবাদির পব সেই গুফায় গিয়া আশ্রয় লইলাম। গুফাটা উচ্চে ২৩ হাত, ভিতরে ৪৫ জন লোক থাকিবাব স্থান আছে, বেশ গরম; মেজে হইতে তাপ উঠিতেছে,—বোধ হয় নীচে কোন উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। গুফার সম্মুখে ৪৫ টা উষ্ণ প্রস্রবণেব গবয় জল পিচকাবিব জ্বায় ভূমি হইতে ১০।১৫ হাত উচ্চে উঠিতেছে। পাণ্ডাবা বলে যে, ইহাব নীচে মহাঘাটা তপস্যা কবিতোছেন। এখানে সন্ধ্যাব পূর্বে আবও ৩৪ জন সাধু আসিয়া ধরমশালায় আশ্রয় লইল। আমবা রাত্রে গুফায় থাকিয়া পবদিন প্রাতে মন্দিরে বসুয়েব বাসনাদি রাখিয়া, দবজায় শিকল লাগাইয়া দিয়া এই স্থান হইতে পূর্বাগত পথে যাত্রা করিলান।

পথে থবশালা গ্রামে আমবা সেই পাহাড়িব নিকট হইতে আমাদের গচ্ছিত দ্রব্যাদি লইয়া উত্তরকানীৰ দিকে কবিয়া আসিতে লাগিলাম। বাস্তায় প্রথমে সেই উপবিকোট গাঁয়ে মিলিত সাধুদের সহিত দেখা হইল। তাহাবা উপবিকোট হইতে দাঙ্গব গাঁয়ে আসিতে সেই উচ্চ পাহাড়ে বড়ই কষ্ট পাইবাছে এবং তাহাদের ২৩ দিন সময় লাগিবাছে। পবে দাঙ্গব গাঁয়ের নিকট সেই মসৌণীৰ যাত্রীদের সহিত দেখা হইল, তাহাবাও ঐ উচ্চ পাহাড়ে বড়ই কষ্ট পাইবাছে। আমাদের আটা কুবাইবা যাণ্ডায় দাঙ্গব গাঁয়ে একজন পাহাড়ীৰ বাটা হইতে এক টাকায় ১৪ সেব আটা খুদি কবিয়া লইলাম। দাঙ্গব গাঁ হইতে উপবি কোট আসিতে সেই উচ্চ পাহাড়ে দে দিন কোন বিপদ হয় নাই, তবে পাহাড়িব উপন অত্যন্ত

কুজ্জটিকা (Fog) হওয়ায় খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল। যমুনোত্রি ভাংগ কাঁচিয়া চতুর্থ দিনে উত্তবকাশী আসিয়া পৌঁছিলাম। যমুনোত্রির পথে অনেক ভূজ্জ পত্রের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ অত্যন্ত দুর্গম ও বিপদজনক বলিয়া সাধুবা বলে, ‘যমুনোত্রি নয় যেন যমপুরী।’

আমরা উত্তবকাশীতে একদিন বিশ্রামেব জন্ত বহিলাম এবং এখানকাব শোকান হইতে একটা টিনেব কুপি গঙ্গোত্রিব জল লইবাব জন্ত দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ কবিলাম, কারণ, আমরা পূর্বে টেবি হইতে উহা খরিদ কবিত্তে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমরা পর দিবস প্রাতে গঙ্গোত্রি বাত্মা কবিলাম। পথে প্রথম রাত্রে বাটাবি নামক স্থানে বহিলাম, এখানে ধরমশালা ও একটা দোকান আছে।

দ্বিতীয় দিবস পথে একটা দ্বিতল ভাল বাঙ্গলা দেখিতে পাইয়া তথাকাব লোকদেব জিজ্ঞাসা কবায় তাহাবা বলিল, এই বাঙ্গলাটা ঠিকাদাব সাহেবেব; ইনি গভর্ণমেন্টেব বনবিভাগ হইতে এই অঞ্চলেব অধিকাংশ চিড় বা দেবদারু গাছ খরিদ কবেন এবং সেই সকল গাছ সেই স্থানেই চেবাই কবিয়া বেলঙযে শ্লিপার বানাইয়া ও প্রত্যেক শ্লিপাবেব দুইমুখে লোহাল মোহর গবম করিয়া ছাপ মাবিয়া দিয়া গঙ্গাব জলে ভাসাইয়া বেন। ইবিধাবেব নিকট উক্ত সাহেবেব এক শাখা কুটা আছে, তথায় ঐ সকল কাঠ জল হইতে উঠাইয়া লইয়া বেলঙযে চালান দেওয়া হয়। পথে মশো মধ্যে সৌকিদাব বা Ranger আছে, প্রত্যেকেব ১৫১০ মাইল করিয়া ছন্দো (Beat)। তাহাবা নদীপ্রবাহিত ঐ সকল কাঠেব তদারক করে। এই চিড় বা দেবদারু গাছ হইতে টাবপিন তৈল ও বজন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাব কাঠ বেশ মশালেব গায় দাউ দাউ কবিয়া জলে। গাড়ো-যাল জেলাব লোকেরা এইরূপ প্রদীপ্ত কাঠ হাতে লইয়া রাত্রে পরস্পরেব বাত্মিতে যাতাবাত কবে।

আমরা এই বাঙ্গলা ছাড়াইয়া ১ মাইল যাইয়া দেখি, কতকগুলি তিরতবাসী তাঁবু খাটাইয়া বহিয়াছে, সঙ্গে ভুটিয়া অস্ত্রের ও তিন চারি হাজার মালবাহী ছাগল ও ভেড়া। ইহাবা সকলে তিরতবাসী মহাজন; টেবি ও মসৌবি হইতে নাল খরিদ কবিয়া তিব্বতে লইয়া যাইতেছে; এই স্থান হইতে বা হাতি পাছাডেব মধ্য দিয়া

তিব্বত যাইযাব একটি পথ আছে। আমরা এই স্থানে রূপব বেলী  
আহারাদি করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যাইয়া ৪৫টী  
চমরীগো ( যে গরু ল্যাঞ্চে চামর হয় ) দেখিতে পাইলাম ; এই গরু  
গুলি সাধারণ গরু হইতে ক্ষুদ্রাকার, মাথায় শিং নাই এবং ইহাদের  
ল্যাঞ্চার প্রান্তভাগে চামর ঝুলিতেছে। আমরা এখানে একটি পোল  
পার হইয়া পবপার দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার সময় গঙ্গাব  
বামতটে, একটি গাঁয়ে আসিয়া বাত্রে ধর্মশালায় রহিলাম, এখানেও  
একটি দোকান আছে। ইহাবই পরপাবে গঙ্গোত্রির পাণ্ডাদের গ্রাম ও  
গ্রামের মধ্যে একটি মন্দির আছে। গুলিলাম, এই মন্দিরে শীতকালে গঙ্গা  
মাতাব উদ্দেশে পূজা হয়।

পরদিন প্রাতে এখান হইতে বওনা হইয়া বৈকালে ভৈবব কোলা  
নামক একটি ভয়ানক উচ্চ পোল পার হইয়া পবপাবে অবস্থিত  
ভৈরবজীব মন্দিরের পার্শ্ববর্তী ধর্মশালায় বাত্রে রহিলাম। এই পোলটী  
গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে, গঙ্গায় আসিয়া পতিত অপব একটি নদীর  
উপর অবস্থিত ও নদীজল হইতে ৪০০।৫০০ হাত উচ্চে নির্মিত।  
নদীৰ দুই পার্শ্ববর্তী পর্বত দুইটী পরস্পর ৪০।৫০ হাত ব্যবধানে  
পোল পর্য্যন্ত প্রায় খাড়া ( perpendicular ) ভাবে অবস্থিত। হিমা-  
জয়ের আব কোন ভানে এত উচ্চে অবস্থিত পোল নাই। পোল পার  
হইবার সময় নীচে নদীৰ দিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া আসে। পাহাড়ি  
ও সাধুদেব মুখে গুলিলাম, আসল ভৈববজী উক্ত নদীর উত্তর পার্শ্বস্থিত  
খাড়া পর্বত গাত্রে একটি ছোট গুফায় অবস্থিত। কোন কোন সাধু  
অনেক কষ্টে উক্ত ভৈরবজী দেখিতে যায়, উপস্থিত মন্দিরটী নকল মাত্র।

আমরা বাত্রে এই স্থানে থাকিয়া পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া  
বেলা ১১ টার সময় গঙ্গার দক্ষিণ পারে অবস্থিত গঙ্গোত্রী আসিয়া পৌছি-  
লাম। এখানে ৩৪টী ধর্মশালা আছে, কিন্তু সকলগুলিই লোকপূর্ণ থাকায়  
আমরা শেষে গঙ্গোত্রী মন্দিরের পাণ্ডাকে স্থানের জ্ঞাত বলিলাম; তিনিও  
তাঁহাব মন্দিরস্থ ঘরে আমাদিগকে থাকিতে দিলেন। এখানকার ধর্মশালা  
ও মন্দির সকলগুলিই কার্ঠনির্মিত; এখানে একটি দোকানও আছে,  
কিন্তু দ্রব্যাদি অতি দুর্মূল্য।

আমরা পাণ্ডাব সহিত প্রথমে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইলাম। এখান-

কার গঙ্গার বিস্তার ১২১৪ হাত মাত্র। জল ভয়ানক ঠাণ্ডা, ডুব দিবার সময় ঘেন মাথা খসিয়া যাইতে লাগিল। ২৩টিব অধিক ডুব দিতে পাবিলাম না, পাণ্ডাবাও অধিক ডুব দিতে সকলকে নিষেধ করিল। একজন গোঁবাব সাধু ১০১২টি ডুব দিয়া পাবে উঠিবা মাত্র অজ্ঞান হইবা পড়িয়া গেল, অপবাপব সাধুবা আশুন জ্বালাইবা তাহাকে সেকিতে লাগিল। হান কবিয়া আসিয়া আমবা মন্দিরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সাদা পাথবেব গঙ্গামাতার মূর্তি দর্শন কবিলাম। এই মূর্তিব চতুষ্পার্শ্বে সবস্ত্রী, যমুনা, শঙ্কবাচার্য্য, ভগীবথ, অন্নপূর্ণা, ভৈরব, গণপতি প্রভৃতি মূর্তি আছে এবং মন্দিবেব বাহিবে গঙ্গেশ্বর মহাদেব (একটা ক্ষটিকেব শিবলিঙ্গ) ও গোবীকুণ্ড প্রভৃতি আছে। এই মন্দিরে গ্রীষ্মকাল যাবৎ পাণ্ডাবা থাকে ও নিত্য পূজা হয়। শীতে বরক পড়িতে আবস্ত হইলে পাণ্ডাবা মন্দিবেব দ্বাব বন্ধ কবিয়া দিয়া পূর্ব্বকথিত তাহাদেব গাঁয়ে ফিবিয়া আসে এবং তথাকার মন্দির হইতে গঙ্গা মাতার উদ্দেশে পূজা কবিয়া থাকে।

গঙ্গোত্রি হইতে গোমুখী প্রায় ২২ মাইল, কিন্তু সেখানে যাইবার কোনরূপ বাস্তা নাই এবং গঙ্গোত্রিব পব আব কোন গ্রাম নাই, এই সকল কাৰণে কেহই প্রায় গোমুখী যাইতে পাবে না। আমরা গোমুখী যাইবাব জন্য পথপ্রদর্শক লোকেব (Guide) অনেক চেষ্টা কবিলাম কিন্তু এই স্থানে কোন পথপ্রদর্শক পাওয়া গেল না। মন্দিরেব পাণ্ডা বলিল যে, বদ্যপি আপনারা এখানে ৫১৬ দিন থাকেন, তাহা হইলে দুববর্তী গ্রাম হইতে পথপ্রদর্শক আনাইবা দিতে পারি, তাহাবাও ৫১৫ জনা একত্র না হইলে যাইবে না এবং প্রত্যেকে ১৫২০ টাকা হিসাবে যাইবে। এই সকল অন্তবিধাব জন্য আমরা গোমুখী যাওয়ার সঙ্গ ত্যাগ করিলাম। পাণ্ডার মুখে আরও শুনিলাম যে, কেবলমাত্র সাহেবেরা মধ্যে মধ্যে অনেক পথপ্রদর্শক একত্রে সঙ্গে লইয়া গোমুখী যায়, সাধারণ ব্যতী বা সাধুবা কেহই প্রায় যায় না। গঙ্গোত্রি তীর্থ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত, মহাত্মা শঙ্কর সাধারণের গোমুখী যাওয়া অসাধ্য জানিয়া এবং গোমুখী হইতে যে পবিত্র জলধারা নির্গত হইয়াছে, তাহা এই স্থান পর্যন্ত আর কোন জনধারার সহিত মিলিত হইয়া অপবিত্র হয় নাই দেখিয়া। এই স্থানে গঙ্গোত্রি তীর্থ প্রতিষ্ঠিত করেন।



এই স্থানের ২১৩ হাত নিচে গঙ্গার বাম তটে অপর একটা বরণী আসিয়া গঙ্গার নিম্নিত হইয়াছে ; এবং ঐ সংযোগের নিচে হইতে গঙ্গার জল আর বিস্তৃত নহে। গঙ্গোত্রির বিস্তৃত গঙ্গাজল সাধুবা অনেকেই লইয়া গিয়া সেতুবন্ধে রামেশ্বর মহাদেবের আশ্রয় চতায়, আশ্রয়ও রামেশ্বরের জন্ত টিনের কুপিতে গঙ্গাজল ভরিয়া লইয়া পাণ্ডার দ্বারা মন্দিরস্থ গঙ্গামাতার নিকট পূজা দিয়া, জল চড়াইবার অনুমতি মাগিয়া লইলাম ; এবং রায়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বশতঃ প্রায় অনিদ্রায় কাটাইয়া পর দিন প্রাতে উঠিয়া টেরির দিকে কিবলাম।

গঙ্গোত্রি হইতে প্রত্যাবর্তন কালে বাটারি আসিয়া শুনিলাম যে, এখান হইতে জনপথে একটা বাস্তা কেদারবদ্রি বাস্তায় অবস্থিত ত্রিযুগী-নারায়ণ নামক স্থান পর্য্যন্ত আছে, এই পথে ত্রিযুগীনাবায়ণ ৬৭ দিনে পৌঁছান যায়। কিন্তু বাধা পথে টেরি ও দেবপ্রয়াগ হইয়া উক্ত ত্রিযুগী-নারায়ণ পৌঁছিতে ২০১৫ দিন লাগে। আবও শুনিলাম যে, এখান হইতে আজ ২৫১০ জন সাধু ও ৫১৭ জন গৃহস্থ যাত্রী এই জঙ্গল পথে ত্রিযুগী-নারায়ণ যাত্রা করিবে। এখান হইতে আমরা ৫১৬ দিনের আহারীয় সঙ্গে লইয়া ও সকলে একত্র হইয়া বেলা ২৩টায় সময় এই জঙ্গল পথে যাত্রা কিবলাম। প্রায় এক মাইল পথ গঙ্গোত্রির বাধা বাস্তায় টেরির দিকে চলিয়া আসিয়া একটা পোল দেখিতে পাইলাম। পবে গঙ্গোত্রির স্নাত্তা ত্যাগ করিয়া এই পোন্স পাব হইয়া গঙ্গাব বাম পাবে অবস্থিত পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যার সময় একটা গ্রাম পাইয়া সেই স্থানে বাত্রে বহিলাম। পবদিন এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলাম ; কিন্তু আজ আব পথ ঠিক করিতে পাবা যাইতেছে না। অতি কষ্টে পথ নির্ণয় করিয়া সকলে চলিতে লাগিলাম, এবং সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামাদি না পাওয়ায় পাহাড়ের উপর অনাবৃত স্থানে রায়ে পড়িয়া রহিলাম।

আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটু রষ্টি হইয়া গেল। যাহা হউক, আমরা কষ্টে বাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরদিন প্রাতে পুনরায় আগে চলিতে লাগিলাম, এবং সেই দিন সন্ধ্যার সময় বুড়োকেদার আসিয়া পৌঁছিয়া একজন পাহাড়ির বাটাতে বাসা লইলাম। এই স্থানটী নদী'ব' তটে অবস্থিত ; অনেক শোকের বাদ ও ২১৩ স্থানি দোহা'র আছে।

এই স্থান পঞ্চ কেদারের মধ্যে একটি বলিয়া অনেক সাধু এখানে আসিয়া থাকে। আমাদের মুঠে এখানে আটা খবদ না করিয়া গম ক্রয় করিল এবং ঝরণার পার্শ্বে একটি ঘরে জাঁতা চলিতেছিল; সেই স্থান হইতে গম পিষিয়া আনিল। পাহাড়ের সকল গ্রামেই নিকটবর্তী ঝরণার উপর একটি ঘর থাকে, তাহাতে জাঁতা বসান আছে। ঝরণার জলের মধ্যে একটি বড় চাকা থাকে, সেটা জলের বেগে ক্রমাগত ঘুরিতেছে; এবং উক্ত চাকা ও জাঁতাব মধ্যে আর একখানি চাকা এমন কোঁশলে লাগান থাকে, যাহাতে পূর্ণোক্ত চাকার তেজে মধ্যবর্তী চাকা ঘোরায, তাহাব সাহায্যে জাঁতা ঘুরিতে থাকে, সেই ঘবে গ্রামেব সকলেই আসিয়া আপন আপন শস্ত পিষিয়া লয়। আমবা সন্ধ্যাব সময় বুড়ো কেদারনাথ দেখিতে যাইলাম। মন্দিরটা কঠিনিস্থিত, ধ্বংসালার প্রায়। ৫৬টা ঘব আছে, একটি ঘবে বুড়ো কেদাবনাথ বিরাজিত। কোন মূর্তি নয়, কেবল খুব বড় একটি পাথর মাত্র, ঠিক প্রসিদ্ধ কেদারনাথের প্রায়, তবে তাহা অপেক্ষা বড়।

যাঁহারা হিমালয়ে পঞ্চ কেদার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্য এখানে সংক্ষেপে পঞ্চ কেদাবেব স্থান নির্দেশ কবিয়া দিলাম (১) এই স্থানে বুড়ো কেদার (২) প্রসিদ্ধ কেদাবনাথ (৩) বজ্রিনাবাষণের পথে ওখী মঠ হইতে উত্তবে মদিন তুর্গন পাহাড়ের মধ্যে যাইলে তৃতীয় কেদার পাওয়া যায়; এই স্থানে যাইবাব ইচ্ছা থাকিলে ওখী মঠ হইতে পথপ্রদর্শক লওয়া উচিত (৪) বজ্রিনাবাষণের পথে তুঙ্গনাথ (৫) বজ্রিনাবাষণ হইতে কাটগুদাম আসিতে মেল চট্টাব নিকট আদ্ কেদার বা আদি কেদার। আমরা পূর্ব দিবস বুড়ো কেদার হইতে যাত্রা করিয়া চতুর্থ দিন সন্ধ্যাব সময় ত্রিশুগীনারায়ণ আসিয়া পৌঁছিলাম; বুড়ো কেদার হইতে ত্রিশুগীনাবাষণ পর্যন্ত রাস্তা, বাটারি হইতে বুড়ো কেদার পর্যন্ত রাস্তাব অপেক্ষা অনেক ভাল। কেদার বজ্রির পথের ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায়ই ২৪ জন ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে বুড়ো কেদার দেখিতে আসে বলিয়া এই পথে ছুঁটা চটা আছে; এবং একটি দোকান ও ২টা ধ্বংসাল পাওয়া যায়; ইহা ভিন্ন অনেকগুলি গ্রামও আছে। বাটারি হইতে ৭ দিনে আমরা ত্রিশুগীনারায়ণ আসিয়াছিলাম, পথ প্রায় ৮০৮৫ মাইল হইবে। এই পথটী বদিক জঙ্গলের রাস্তা এবং যদিও এই পথের মধ্যে মধ্যে বরফ আছে, কিন্তু তথাপি ইহা

যমুনোত্তি পথের জায় হুর্গম নহে। ত্রিযুগীনাবাষণ হইতে কেদার বঙ্গির  
বাধা রাস্তা পাওয়া যায় এবং সেই পথের সমাচাৰ অনেকই জ্ঞাত আছেন  
বলিয়া এই স্থানে ভ্রমণ বিবরণ শেষ করিলাম।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

শ্রীম—কথিত ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে ।

শ্রীযুক্ত অধব সেনেব প্রথম দর্শন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

আজ রবিবার ৮ই এপ্রেল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। ছোট খাট্টাতে বসিয়া আছেন। ভক্তেরা  
চতুর্দিকে উপবিষ্ট। আজ কলিকাতা হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মভক্ত আসিয়া-  
ছেন; আব শ্রীযুক্ত অধব সেন তাঁহার কয়টি বন্ধু সঙ্গে কবিয়া আসি-  
য়াছেন। অধর ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট। ঠাকুরকে এই প্রথম দর্শন কবিত্তে  
আসিয়াছেন। অধরের বয়স ২৯৩০ হইবে। অধরের বন্ধু পুরশোকে  
সম্ভুত হইয়াছেন। তিনি ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অফ স্কুলস ছিলেন, পেন্সন  
লইয়াছেন। পেন্সন লইয়া (এবং আগেও) সাধন ভজন করিতেন।  
বড় ছেলেটি মাঝা মাঝাতে কোন কপে সান্ত্বনা লাভ কবিত্তে পাবি-  
তেছেন না। তাই অধব ঠাকুরের নাম শুনিয়া তাঁহার কাছে লইয়া  
আসিয়াছেন। তাঁহার নিজেরও ঠাকুরকে দেখিবার অনেক দিন হইতে  
ইচ্ছা ছিল।

\* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয়  
সংস্করণ, মূল্য ১ টাকা। বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ৫৭ নং  
রামকান্ত বস্ত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ঠিকানায শ্রীশান্তি-  
রাম ঘোষের নিকট অথবা ১৩২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলি-  
কাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্য।

## ( গৃহস্থের প্রতি উপদেশ )

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক-  
খর লোক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; তখন তিনি আপনাপনি  
কি বলিতেছেন।

“বিষয়ী লোকের জ্ঞান কখন কখন দেখা দেয়। এক এক বার।  
দীপশিখার তায়। না, না, সূর্য্যের একটা কিরণের তায়। ছোটো দিবে  
যেন কিরণটা আসছে।

“বিষয়ী লোকের ঈশ্বরের নাম কবা। অহুরাগ নাই। বালক যেমন  
বলে, তোর পরমেশ্বরের দিব্য। খুড়ি জেঠির কৌদল শুনে পরমেশ্বরের  
দিব্য শিখেছে।

“বিষয়ী লোকদের বোক নাই। হোলো হোলো, না হোলো না  
হোলো। জলের দরকাব হয়েছে, বৃপ খুঁড়ছে। খুঁড়তে খুঁড়তে যেমন  
পাথর বেকল, তেমনি দেখানটা ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গা খুঁড়তে  
খুঁড়তে বালি পেয়ে গেল, কেবল বালি বেবোয়। সেখানটাও ছেড়ে  
দিলে। যেখানে খুঁড়তে আরম্ভ করেছ, সেইখানেই খুঁড়বে, তবে ত  
জল পাবে।

“জীব যেমন কষ কবে, সেইরূপ ফল পায়। তাই গানে আছে।

## গান ।

দোষ কারু নয় গো মা ।

আমি স্বথাত সলিলে ডুবে মরি শ্রামা ॥

ষড়্বিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ,

পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটলাম বৃপ,

সে কূপে বেডিল কালরূপ জল,

কাশ মনোরমা ॥

আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী,

বিগুণ কবেছ সগুণে ;

ছিল বাবু কক্ষে, ক্রমে এল বক্ষে,

জীবনে জীবন কেমনে হয় মা বক্ষে,

ওমা আছি তোর অপক্ষে,

( মাগো ) দে মা মুক্তি ভিক্ষে,

কটাক্ষেতে কর পার ॥

“আমি আর আমার অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে থাকে আমি, আমি কোরচো, তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর, তুমি শরীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু। তখন দেখবে, তুমি কিছু নও। তোমার কোন উপাধি নেই।

“এটা সোনা, এটা পেতল, এর নাম অজ্ঞান। সব সোনা, এর নাম জ্ঞান।

“ঈশ্বর দর্শন হলে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। তবে ঈশ্বর লাভ করেছে অথচ বিচার কোরচে, তাও আছে। কি কেউ ভক্তি নিয়ে তাঁর নাম গুণ গান কোরচে।

“ছেলে কাদে কতক্ষণ? ষতক্ষণ না স্তন পান কোরতে পারে। তার পরই কান্না বন্ধ হয়ে যায়; কেবল আনন্দ। আনন্দে মার হুধ যায়। তবে একটা কথা আছে। খেতে পেতে মাঝে মাঝে খেলা করে আবার হাসে।

( অবতারতত্ত্ব । )

“তিনিই সব হয়েছেন। তবে, মানুষে তিনি বেশি প্রকাশ। যেখানে শুদ্ধস্ব বালকের স্বভাব, হাসে, কাদে, নাচে, গায়, সেখানে তিনি সাক্ষাৎ বর্তমান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর অধরের পরিচয় লইলেন। অধর তাঁহার বন্ধুর পুত্রশোকের কথা নিবেদন করিলেন।

ঠাকুর আপনার মনে গান গাহিতেছিলেন।

গান।

জীব সাজ সময়ে।

রণ বেশে কাল এবেশে তোর ঘরে।

ভক্তিরথে চড়ি লয়ে জ্ঞানতুল্য,

রসনাধরকে দিয়ে প্রেমগুণ,

ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অস্ত্র তাহে সন্ধান করে।

আর এক যুক্তি রণে চাই না রথ রথী,

শক্রনাশে জীব হবে সুসঙ্গতি,

রণভূমি যদি করে দাশরথি,

ভাগীরথী-তীরে।

“কি করবে? এই কালের জন্তে প্রস্তুত হও। কাল ঘরে প্রবেশ করেছে। তাঁর নামরূপ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

“তিনি কৰ্ভা। আমি বলি যা, যেমন করাও, তেমনি করি; যেমন বলাও, তেমনি বলি। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি বর, তুমি বরণী। আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার।

“তাকে আমি মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর ভার দিলে অমঙ্গল হয় না। তিনি যা হয় করুন।

“তা শোক হবে না গা! আশ্বস্ত! রাবণ যখন বধ হল, লক্ষ্মণ দৌড়ে গিয়ে দেখলেন। দেখেন যে, হাড়ের ভেতরে এমন জায়গা নাই, যেখানে ছিদ্র নাই। তখন বল্লেন, রাম, তোমার বাণের কি মহিমা! রাবণের শরীরে এমন স্থান নাই, যেখানে ছিদ্র না হয়েছে। তখন রাম বল্লেন, হাড়ের ভেতর যে সব ছিদ্র দেখেছ, ও বাণের জন্ত নয়। পুত্রশোকে হাড় আর ছিন্ন হয়েছে। ঐ ছিদ্রগুলি সেই শোকের চিহ্ন। হাড় বিদীর্ণ করেছে।

“তবে এ সব অনিত্য। গৃহ, পবিবার, সম্ভান হু দিনের জন্ত। ভাল গাছই সত্য। হু একটা ভাল খসে পড়েছে। তার আর হুঃখ কি? ঈশ্বর তিনটি কাষ কোরচেন,—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

“মৃত্যু আছেই। প্রলয়ের সময় সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। যা কেবল সৃষ্টির বীজ গুলি কুড়িয়ে রেখে দেবেন। আবার নুতন সৃষ্টির সময় সেই বীজ গুলি বার কোরবেন।

“গিন্ধীদের যেমন ন্যাতা ক্যাতাব হাঁড়ী থাকে; তাতে শশার বিচি, সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি ছোট ছোট পুঁটলিতে বাধা থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(অধরের প্রতি প্রথম উপদেশ)

ঠাকুর অধরের সঙ্গে তাঁর ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)। তুমি ডিপুটী। এ পদও ঈশ্বরের অহংগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না।

“কিন্তু জেন সকলের এক পথে যেতে হবে। \* এখানে দুদিনের জন্ত।

\* শ্রীকৃষ্ণ অধরচন্দ্র সেন দেড় বৎসর পরে সেই ভ্রম্য করেন। ঠাকুর ই সংবাদ শুনিয়া অনেককাল পরিতাপের মধ্যে বাঁসিয়াছিলেন। অধর ঠাকুরের পদম ভক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি আমার আত্মীয়।

“সংসার কর্তৃত্বনি। এখানে কর্তৃ কোবতে আসা, যেমন দেশে বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কর্তৃ কবে।

“কিছু কর্তৃ কবা দয়কার। সাধন। তাড়াতাড়ি কর্তৃ গুলি শেষ করে দিতে হয়। সেক্‌বাবা সোণা গলাবাব সময় হাপর, পাখা, চোঙ সব দিয়ে হাওয়া কবে, যাতে আঙুনটা খুব হবে সোণাটা গলে। সোণা গলবার পর তখন বলে, তামাক সাজ্‌। এতক্ষণ কপাল দিয়ে ঘাম পড়ছিল। তার পর তামাক খানে।

“খুব বোক চাই, তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

“তাব নাম বীজের খুব শক্তি, অবিদ্যা নাশ কবে। বীজ এত কোমল, অঙ্গুর এত কোমল, তব্‌ শক্ত মাটি ভেদ কবে। মাটি ফেটে যায়।

“কামিনী কাকনের ভিতর থাকলে মন বড় টেনে নেয়। তাই সাধ-  
ধানে থাকতে হয়। ভাগ্যীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ভাগ্যী, তারা  
কামিনী কাকন থেকে তফাতে থাকে, তাই সাধন থাকলে ঈশ্বরে সৰ্বদা  
মন বাঞ্চে পাবে।

“ঠিক ঠিক ভাগ্যী, যাবা সৰ্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পাবে, তারা যৌমাছিব  
মত। কেবল কূলে বসে, মধু পান কবে। সংসারে কামিনী কাকনের  
ভিতর থাকলে ঈশ্বরে মন হতে পাবে, আবার কখন কখন কামিনী কাক-  
নেতে মন হয়, যেমন সাধাবণ মাছি। সন্দেশেও বসে আবার পচা ঘায়েও  
বসে, বিষ্ঠাতেও বসে।

“ঈশ্বরেতে সৰ্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে দিতে হয়। তার  
পর পেন্সন ভোগ কোববে।”

## স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ।

৫৪১, ডিখাববর্গ এভিনিউ,

চিকাগো ।

২৮, মে, ৯৫ ।

ভাই,

তোমার অনুরূপাঙ্গুণ সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাদের কার্য্য আদর পূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। নাগ মহাশয় একজন মহাপুরুষ। একুপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান। এই জগতে মহাপুরুষের রূপালাতই জীবের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য। তুমি এই সৌভাগ্যেব অধিকারী হইয়াছ। “মন্তুজ্ঞানাক্ষ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমামতাঃ,” তুমি যখন তাঁহার একজন শিষ্যকে তোমার জীবনের পথপ্রদর্শক রূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাঁহাকেই পাইয়াছ জানিবে।

তুমি সংসার ত্যাগেব করনা কবিতেছ। তোমার এই ইচ্ছায় আমার সহানুভূতি আছে। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা জগৎশে বড় কিছু নাই। কিন্তু তোমার নিম্মত হওয়া উচিত নয় যে, প্রভু যাহাদিগের ভাব তোমার উপব দিয়াছেন, তাহাদের কল্যাণোদ্দেশে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন কবা বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়। শ্রীবামকৃষ্ণেব উপদেশ, বিশেষতঃ, তাঁহার নিরুলঙ্ক জীবনী প্রচার কব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের পবিবাববর্গেরও তত্ত্বাবধান কবিও। তোমার কর্তব্য তুমি করিয়া যাও, আর যাহা কিছু, তাঁহার ভাব।

প্রেমে বাঙ্গাল বাঙ্গালী, অর্থ্য স্বচ্ছ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, এমন কি, নর নারী পর্য্যন্ত ভেদ নাই। প্রেম সব এক কাঁববা দেয়। স্বার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু উহা অবার্থ। বাঙ্গালা দেশেব এসং ভারতের অগ্রাঙ্গ স্থানের যুবকদের উপর সব নির্ভর কবিতেছে। এই সকল যুবকদের—বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকদের মধ্যে কার্য্য কব। তাহাদিগকে জাগাও; এইরূপ শত শত যুবক ত্যাগমন্তে দীক্ষিত হইয়া একত্রিত হউক।

---

\* ইংরাজীর অনুবাদ। কদিশাহ জৈনক ব্যক্তিকে এই পত্র লিখিত হয়।



সকল বিষয়ে আজীবন শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া । পরস্পরের অধীন হইবা চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না । আর এইরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কায হইতে পারে না । ববাহনগণের মঠ এই কেন্দ্র । অত্যাশ্রয় সকল স্থানের ভক্তগণের এই কেন্দ্রের সহিত একযোগে কার্য্য করা উচিত ।

অইংভাব ও ঈর্ষ্যা তাড়াইয়া দাও—অপরের সহিত একযোগে এবং অপরের জন্য কার্য্য করিতে শিখ । আমাদের দেশে এষ্টটার বিশেষ অভাব ।

শ্রীবামকৃষ্ণ নিবন্তব তোমায় ভাণীকাদি সকল ।

তোমাব

বিবেকানন্দ ।

পুঃ—নাগ মহাশয়কে আমরা অসংখ্য সাক্ষীজ্ঞ জ্ঞানাইব ।

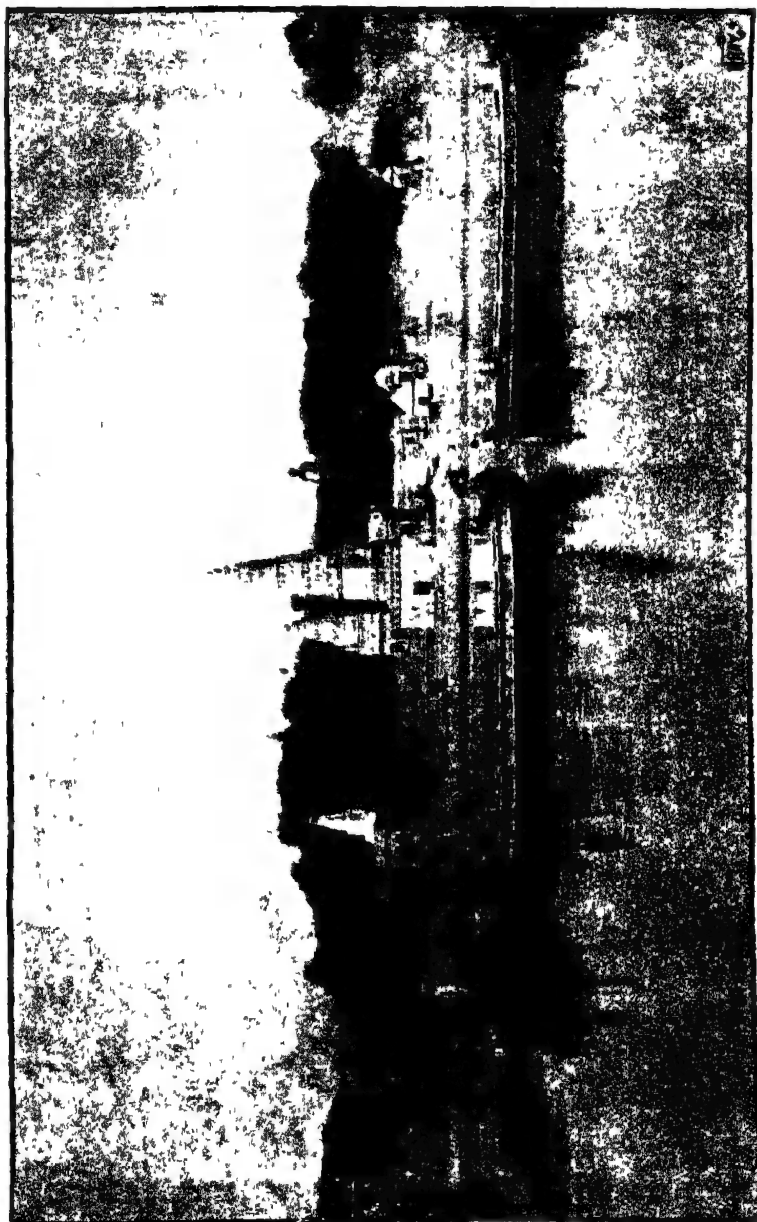
বি-

## পণ্ডরপুর তীর্থ ।

[ চিত্রের বিবরণ । বড় চিত্র । নদীর অপব দিক্ হইতে পণ্ডরপুর সহরের দৃশ্য । ২ । বিষ্ণুপদ । ৩ । পদ্মাবতীর মন্দির । ৪ । বাম দিক্ হইতে যথাক্রমে পুণ্ডলিকের সমাধি , আশ্বরনেকর স্বামীর সমাধি , গুজবাণি লোকের বৈঠক , চোপডকর স্বামীর সমাধি । ৫ । শ্রীশ্রীইঠোবা ও ককিণীদেবীর মন্দির । ৬ । বাম দিকে গোপাল পুত্রের ভীষ্মবাজের ও দক্ষিণে মুত্তলীথরের মন্দির । ৭ । শ্রীশ্রীইঠোবাদেবের মন্দির । ]

পণ্ডরপুর একটা মহাবাট্ট দেশের প্রধান তীর্থস্থান । এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইঠোবা নারী মূর্তি এবং কল্লিণী দেবীর মূর্তি আছে । মথুরা ব্রহ্মাবনের শ্রায় এখানেও যাত্রীদিগকে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকাণ্ড সমুদয় কবিত্তে হয় । বাঙ্গলা দেশের লোক, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, দ্বাবিকা, পঞ্চবটী প্রভৃতি এ দেশীয় তীর্থ স্থানের কথাই জানেন , পণ্ডরপুর তীর্থের কথা প্রায় কেহই অবগত নহেন । এক্ষণে এ স্থানের বিবরণ লোকের কচিকব হইবারই সম্ভাবনা ।

পণ্ডরপুর বঙ্গে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত শোলাপুর জেলার অন্তর্গত একটা সবডিভিজন । এখানে আসিবার দুইটা পথ । একটাতে আসিতে হইলে, দি, আই, পি, বেলে পুনা হইতে শোলাপুর আসিবার পথে বাসিন্দা



ষ্টেসনে নামিতে হয়। দ্বিতীয়টীতে, ওয়াডি জংসন হইতে শোলাপুর হইয়া বার্মিংহাম অথবা মোহল নামে মধ্যের একটা ষ্টেসনে নামিয়াও পণ্ডরপুরে আসা যায়। মোহল হইতে বোডাব গাড়ি পাওয়া যায় না, রাস্তাও তত ভাল নহে। গরুর গাড়ি পাওয়া যায়, পথ ২২ মাইল—যাইতে ৯ ঘণ্টা সময় লাগে। বার্মিংহামে নামিলে, খুব ভাল বাস্তা এবং দুই বোড়ার টাঙ্গা গাড়ি পাওয়া যায়। যাত্রীরা প্রায় এই বাস্তা দিবা ই বাতায়াত করে। বেশ টাঙ্গায় প্রত্যেক জনের ভাড়া ১৮ টাকা; স্বতন্ত্র টাঙ্গার ভাড়া ৪৫ টাকা; পথ ৩১ মাইল—৪৫ ঘণ্টায় আসা যায়। বাস্তায় মাঝে মাঝে ধর্মশালা এবং ট্রাভলার্স বাঙ্গলা আছে।

পণ্ডরপুর আসিতে হইলে ভীমা নদী পার হইয়া আসিতে হয়। বর্ষাকালে নৌকায পার হইতে হয়, অন্ত্যস্ত সময় নদীতে জল খুব কম থাকে, ইটীয়া কিল্লা পাড়ি সহিত পার হওয়া যায়। নদীর পরপার হইতে পণ্ডরপুরেব দৃশ্য অতি মনোহর।

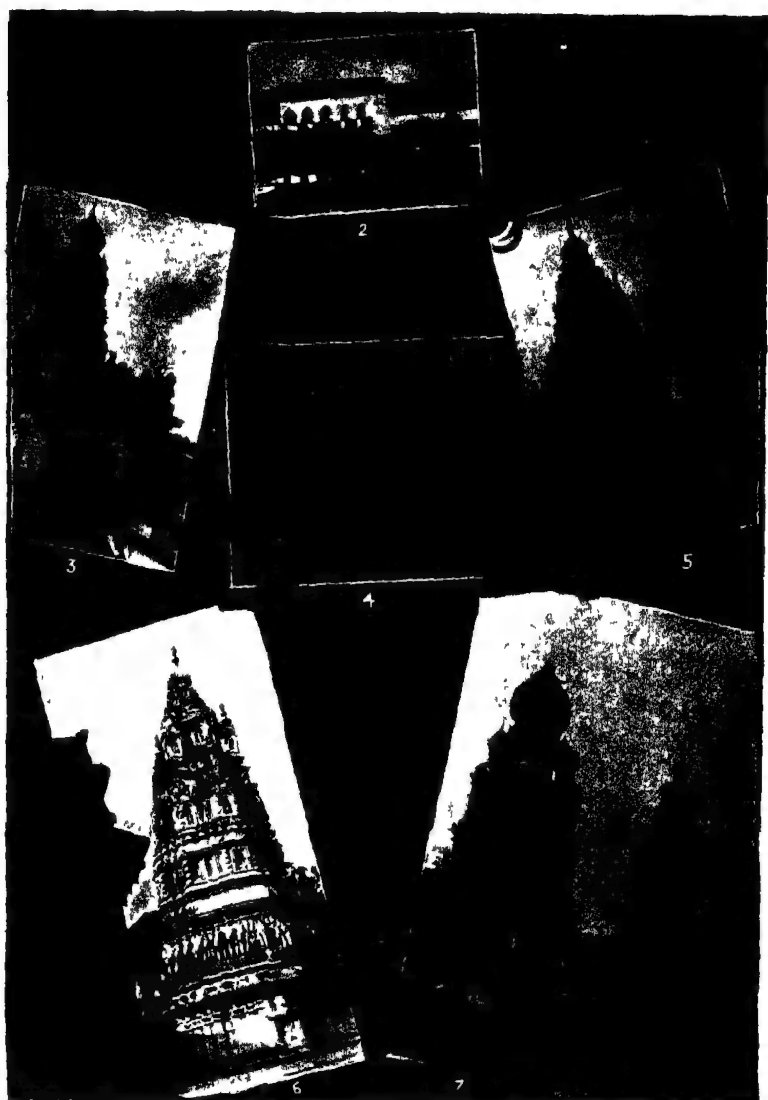
যাত্রীদের আনিতে পাওয়া কেহ কেহ ষ্টেসনে কেহবা অর্ধেক রাস্তায় আবার কেহবা নদীর তীরে অপেক্ষা কবে। ইহা বা মথুরা প্রভৃতি স্থানের জায়, লোকের নাম ধাম জিজ্ঞাসা কবিয়া নিজেদের খাতা পত্র খুলিয়া আপন আপন যজ্ঞমান বাহিব কবে এবং যাত্রীদের সঙ্গে আনিয়া তাহাদের থাকিব ও সমুদয় দেখাইবার বন্দোবস্ত কবে। নূতন লোক কেহ আসিলে যে কোন পাণ্ডার সহিত ইচ্ছামত আসেন।

এখানে কোন্ কোন্ স্থানে কি করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ দেবালয় আছে, তৎসমুদয় পবে বলিতেছি। অগ্রে, এ স্থানটি তীর্থস্থান কিরূপে হইল এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এখানে ইঠোবা নামই বা কেন হইল, তাহার বিবরণ কিছু বলিব। এই দেবমূর্তি অতিশয় পুরাতন, এরূপ প্রমাণ আছে, কিন্তু কখন কোন্ সনে প্রতিষ্ঠিত, তাহা বেহ বলিতে পারে না। যে স্থানটি এখন শ্রীক্ষেত্র পণ্ডরপুর নামে বিখ্যাত, উহা প্রাচীন কালে ভয়ানক অরণ্য ছিল। মনুষ্ণের সমাগম মাত্র ছিল না এবং সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুগণের বাসভূমি ছিল। এ বনে দিগুর নামে প্রবলপ্রভাপ-শালী এক ব্রাহ্মস ছিল; তাহার ভয়ানক উৎপাতে দেবগণ ভীত হইয়া তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গিয়া তাহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তম্ভীত ভগবান্, দেবগণের দুঃখ নিবারণের জন্য

প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন, আমি, মল্লিকার্জুন নামে চন্দ্রসেন রাজার পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইব এবং দিগির বান্ধস বধ করিব। কিছুকাল পরে ভগবান্ ঐক্ৰপে অবতীর্ণ হইয়া গদাঘাতে দিগির বান্ধস বধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, যুতাব সময় ঐ বান্ধস, প্রভুব নিকট এই বর চাহিয়াছিল যে, যে স্থানে গদাঘাতে আমার প্রাণ বধ হইবে, সেস্থানেব নাম আজি হইতে গদাধীর্থ হউক এবং যে বনে এতকাল পবন স্নেহে বাস কবিগাছি, উহা দিগির বন নামে বিখ্যাত হউক। ভগবান্ তথাস্ত বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

দিগির বনের উত্তরে প্রায় চাবি পাঁচ মাইল দূরে, ভীমা নদীর পূর্ব পাৰে, গুবশালা নামক একটি গ্রাম ছিল। তথায় জাহ্নদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী নাম সত্যবতী। তাঁহাদের পুণ্ডলিক নামে একটি পুত্র ছিল। পুত্রের সত্যব অতি নম্র ছিল। গ্রামের সকলেই তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; কিন্তু সে পিতামাতাকে অতিশয় কষ্ট দিত! সংসারের সমুদয় কর্ম বন্ধ মাতা পিতা করিতেন, তথাপি পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাদ্বিগকে সর্বদা অশেষ প্রকারে লাজুনা করিত—এমন কি, উদর পূরিয়া রাইতেও দিত না। অতিশয় মনকষ্ট পাইয়া অবশেষে স্ত্রী পুরুষে কাশী যাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন এবং পুণ্ডলিকেব অমুমতি লইয়া, এখন-কালের নবীন বাবুদের প্রবীণ পিতামাতার ছায়, জন্মের মত গৃহত্যাগ কবিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু পুণ্ডলিকেব স্ত্রী এখনকাব অনেক শিক্ষিতা স্ত্রী অপেক্ষা কোন অংশে নূন ছিলেন না। যাত্রাকালে স্বামীকে বলিলেন, গ্রামের সকলে কাশী যাইতেছে, আমবাও যাই চল। পুণ্ডলিকেব কাজেই তাহাতে মত হইল। তখন দুইটা ঘোড়া কিনিয়া উভয়ে দুইটা ঘোড়ায় চড়িয়া (এ দেশে স্ত্রীলোকে ঘোড়ায় চড়ে) পিতামাতার সহিত কাশী যাইতে লাগিলেন।

পথিমধ্যে একদিন কুকুট স্বামীব আশ্রমে সকলে বাত্রি যাপন করিবার জন্ত বহিলেন। অর্দ্ধরাতে পুণ্ডলিকের নিজা ভঙ্গ হইলে সে দেখিল—তিনটা স্ত্রীলোক মলিন বসন পরিধান কবিয়া, অবসন্নপ্রায়শরীরে সেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইল এবং আশ্রমের মার্জন লেপনাদি সমুদয় কর্ম শেষ করিল। অনন্তর সেই মুনিবরের দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া যাইবার সময় তিন জনেই দিয়া মূর্তি ধারণ কবিয়া কোথায় চলিয়া গেল! দেখিল পুণ্ডলিকের অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে মনে মনে স্থির করিল,



“আর একদিন এখানে থাকিয়া ইহায় যথার্থ কারণ জানিতে হইবে।” দ্বিতীয় রাজ্যে পুণ্ডলিক জাগরিত থাকিয়া পূর্ববৎ সমস্ত ঘটনা দেখিল এবং যখন সেই জীবলোকেরা দিব্যরূপ ধারণ করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, তখন সে তাহাদের সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কে এবং কি নিমিত্ত প্রত্যহ মলিন বেশে এই আশ্রমে আসিয়া এইরূপ কর ও কেমন কবিয়াই বা যাইবাব সময় দিব্য মূর্তি ধারণ কবিয়া যাও, ইহা আমাকে বলিতে হইবে।” নাবীগণ উত্তর করিল, “আমরা গন্ধা, হম্বনা ও সবস্তী। পাতকীরা অশেষবিধ পাপ করিয়া আমাদের জলে স্নান করিয়া উদ্ধার হয়। ইহাদের ভিতর পিতৃদ্রোহী ও গুরুদ্রোহীর পাপভাব আমাদের সহ্য হয় না; উহা আমাদের নিতান্ত অবসর ও মলিন করে। এইজন্য আমরা এই পবিত্র পুরুষের দর্শন ও সেবা কবিয়া প্রত্যহ শুদ্ধ হইতে আসি। তুই মহাপাতকী, পিতামাতার সেবা না কবিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া তীর্থ যাইতেছিস? তোব তীর্থ সফল হইবে না, তোর মুখ দেখিলেও পাপ হয়।” এই কথা শুনিয়া পুণ্ডলিকের অতিশয় পবিত্রতা হইল এবং সে সেই দেবীদের চরণ ধারণ কবিয়া বলিল, “আমাব পূর্বেজন্মের পুণ্যফলেই আপনাদের দর্শন পাইয়াছি। এখন কি উপায়ে এই পাপ হইতে উদ্ধার হইব, তাহাব উপায় বলিয়া দিন।” তাঁহারা বলিলেন, “আজ হইতে তুই একনিষ্ঠ মনে পিতামাতার সেবা কর, তাহা হইলেই উদ্ধার হইবি।” এই বলিয়া তাঁহারা স্বহানে প্রস্থান করিলেন।

পবদিবস পুণ্ডলিক আপন পিতামাতাকে সেই দুইটা ঘোড়ায় বসাইয়া আপনারা জী পুরুষে তাঁহাদের সহিত পদব্রজে চলিয়া কাশী তীর্থ দর্শন করাইল। পবে দেশে ক্রিয়য়া আসিয়া নিজেদের গ্রামে না গিয়া, দিগির বনে, ভীমা নদী তীরে একটা পর্ণ কুটীরে বাস করতঃ একমনে পিতামাতার সেবা করিতে লাগিল। পুণ্ডলিকের ভক্তিপ্রভাবে ঐ স্থান পবিত্রতা-বয় হইল এবং ভীমা নদীর ঐ স্থানের নাম চক্রভাগা হইল। কেহ কেহ বলেন, চক্র শাপদ্রব্য হইয়া নদীর ঐ স্থানে স্নান করিয়া কলকমুদ্র হইয়াছিলেন, সেই জন্যই ভীমার এখানে চক্রভাগা নাম হইয়াছে। আবার কেহ বা বলেন, এই স্থানে নদী অর্দ্ধচন্দ্রের আয় বাঁকিয়া গিয়াছে, তাই ঐ নাম হইয়াছে।

কল্পিনীদেবী এখানে আগমন সম্বন্ধেও একটি পূর্বোক্তিহাস আছে। কথিত আছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষাটবিক্রমকালীন একদিন শ্রীরাধিকাকে স্মরণ করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলে শ্রীরাধিকা তথাব আসিয়া দর্শন দিলেন। রাধিকাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রীত হইয়া বহুসম্মানে তাঁহাকে নিজ সমীপে বসাইলেন। ইতি মধ্যে কল্পিনী দেবী সেই স্থানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বাগপাব দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কাবণ, কল্পিনীদেবীর সম্মুখে অপর কোন দ্বীরই শ্রীকৃষ্ণবামে বসিবার অধিকার ছিল না। দেবীকে দেখিয়াও যখন শ্রীরাধা উঠিলেন না, তখন কল্পিনী দেবী রাগিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং এই দিগ্ভব বনে আসিয়া একস্থানে গুপ্তভাবে থাকিয়া মহা তপস্তা আবস্ত করিলেন।

শ্রীমতী চলিয়া যাইলে শ্রীকৃষ্ণের কল্পিনীদেবীর ক্রোধের বিষয় স্মরণ হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিষন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে মথুরা ও বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে গিরি গোবর্দ্ধন, গাতী ও গোপালকুল সঙ্গে লইয়া এই দিগ্ভব বনে পুনর্বার ফিবিয়া আসিলেন। নদীতীরে গাতী এবং গোপালগণকে রাগিয়া নিজে বনের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে একস্থানে দেবীকে দেখিতে পাইলেন। পবে ভ্রমণ কবিত্তে কবিত্তে পুণ্ডলিকের পর্ণকুটীরেব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুণ্ডলিক তখন একমনে, হেঁট মস্তকে মাতাপিতার সেবা কবিত্তেছিল—ভগবান্কে দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুণ্ডলিককে বলিলেন, “অবে পুণ্ডলিক। সাক্ষাৎ ভগবান্ তোকে দর্শন দিবার জন্য তোর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বহিয়াছেন, তুই দেখিতেছিস না।” তখন পুণ্ডলিক ভগবান্কে দেখিয়া আসনাতাবে একপানি ইঁট ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, “আপনি ইহাব উপর দাঁড়ান।” ভগবান্ও তাহার পিতৃভক্তির আতিশয্য দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া সেবা সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই ইঁটের উপর দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতামাতার সেবা সমাপ্ত করিয়া পুণ্ডলিক ভগবানের নিকট ছোড় হস্তে আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া “ইঠল” বলিয়া সম্বোধন করিয়া ( কারণ, ইঁটের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন ) বলিল, “প্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন ; আমি মাতাপিতার সেবা কবিত্তেছিলাম—পাছে নিয়ম ভঙ্গ হয় এবং সেবার ক্রটি হয়, তাই আপনাব অভ্যর্থনা কবিত্তে পারি নাই।”

এই বলিয়া সে অনেক স্তুতি করিয়া দেবের চরণে মস্তক বাখিয়া দণ্ড-  
বৎ হইল, এজন্ত এগনও যে কেহ এখানে দেব দর্শন করিতে আসে,  
তাহারা সকলেই ঐ মূর্তির চরণে মস্তক বাখে। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া  
পুণ্ডলিককে বলিলেন, “তোব একনিষ্ঠমনে পিতামাতার সেবা দেখিয়া  
আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। যাহা ইচ্ছা বব লও।” পুণ্ডলিক তখন  
ভগবানের নিকট এই বর চাহিল,—“প্রভু, আপনি এইখানে এই রূপে  
চিরকাল থাকিয়া পাতকী জনেব ত্রাণ করুন।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলি-  
লেন, “আচ্ছা, যে কেহ এই চন্দ্রভাগায় স্নান করিয়া তোব দর্শন করিবে  
এবং আমাব ইঠোবা মূর্তি দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে, তাহাব আর  
জন্ম মরণেব ভয় থাকিবে না।” এই বলিয়া ভগবান্ কল্লী দেবী গাভী  
ও গোপালগণসহ এখানে বাস করিতে লাগিলেন। যেখানে প্রথমে গাভী  
ও গোপালদল বাখিয়াছিলেন, সেখানে এখন গোপালপু ব নামে একটি  
ক্ষুদ্র গ্রাম হইয়াছে। উহা পশুরপুর হইতে ১মাইল পূর্বে। ঐ গ্রামের  
সন্নিকটে পুশ্বতী নদী চন্দ্রভাগা নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই  
পুশ্বতী নদীকে এখানে সকলে যমুনা কহে। গিবি গোবর্দ্ধন সহিত  
যমুনা আসিয়া পুশ্বতী নামে এখানে প্রবাহিত রহিয়াছে, ইহাই এখান-  
কার লোকে বলিয়া থাকে।

পুণ্ডলিকের মাতাপিতাব মৃত্যুব পর চন্দ্রভাগানদীতীরে তাঁহাদের  
সমাধি নির্মিত হইয়াছে। উহাতে মহা দেবের লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।  
পুণ্ডলিকের মৃত্যুব পর তাঁহাবও সমাধি তাঁহাব পিতামাতার সমাধিমন্দি-  
রের নিকট নির্মিত হয়। উহাতেও মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি আছে। পুণ্ড-  
লিকের সমাধিমন্দিরটি দেখিবাব যোগ্য। ঐ মন্দির দীর্ঘ ৬৫ ও  
প্রস্থে ২৬ ফিট। উহাব সম্মুখে সভামণ্ডপ। এখানে মাঘ মাসে শুক্ল  
দ্বাদশী হইতে পাঁচ দিবস উৎসব হয়। এই মন্দির ১৪০০ শকাব্দায়  
নির্মিত হইয়াছে। ইহার নিকট আবো কতকগুলি সাধুদেব সমাধিমন্দির  
আছে।

পুণ্ডলিকের সমাধির পূর্বে একটি চতুষ্কোণ কুণ্ড আছে; উহা পাথর  
দিয়া বাধান। উহাতে একট পাথরের ছোট নৌকা আছে, যাহা জলে  
ভাসে। এই কুণ্ডকে লৌহদণ্ড তীর্থ কহে। এইখানে পুণ্ডলিকের সহিত  
ভগবানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উহা বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়। চন্দ্র-



ভাঙ্গা নদীর অপর পারে পুণ্ডলিকের মন্দিরের সামনে গুজরাণী লোক-  
দের গুরু মল্লভাচার্য্যের মঠ। উহাকে গুজরাণী লোকের বৈঠক কহে।  
উহার ভিতরে একটা ভূতলগৃহ আছে, চারিদিকে কেল্লার মত প্রাচীর  
এবং মদীতে ঘাট বাধান; দেখিতে সুন্দর। পূর্বে এই স্থান জঙ্গলপূর্ণ  
থাকাতে যাত্রীদের যাতায়াতের বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, প্রায়  
কেহই আসিতে পারিত না। একান্ত ভক্তেরাই কেবল সকল কষ্ট সহ্য  
করিয়াও আসিত! ইহার উপর আশাব দস্তা ও ব্যাঘ্রাদির তাড়না অতি  
তরুণ ছিল। সে সময়ে ঐ স্থান শালিবাহন রাজ্যের রাজ্যভুক্ত ছিল।  
চতুশ্চাষের গ্রামের লোকে পরামর্শ কবিয়া রাজ্যের নিকট ইহার প্রতি-  
কারের জন্য প্রার্থনাপত্র পাঠাইল। শালিবাহন রাজা সেই আবেদন  
গ্রাহ্য করিলেন এবং শোক লাগাইয়া জঙ্গল কাটাইয়া ঐস্থানে গ্রাম বসা-  
ইলেন এবং পণ্ডবিমাণ্ডের নীতিমত পূজা নৈবেদ্যাদিও বন্দোবস্ত কবিয়া  
দিলেন। ক্রমে ঐ গ্রাম একটা সহবে পরিণত হইয়াছে, এবং সেখানে  
সবজন্মের কোর্ট, ফৌজদারী, মিউনিসিপ্যাল অফিস, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ  
অফিস, হাই স্কুল, অর্মানিজ, বালহত্যা-প্রতিবন্ধক-গৃহ, অনাথ-সংগোপন-  
গৃহ প্রভৃতি সভ্যসমাজের উন্নতি পরিচায়ক সমুদয় অঙ্গই বর্তমান আছে।

শ্রীশ্রীঠোবাদেবের মন্দিরটি ৩৫০ ফিট লম্বা এবং ১৭০ ফিট চওড়া :  
উহার চারিদিকে পাথরের উচ্চ প্রাচীর। ভিতরে বাইরের জন্ত ঐ প্রাচীর-  
সংলগ্ন ৮টা দরজা আছে। সম্মুখের যে বড় দরজা, তাহাকে মহাদ্বার কহে।  
ঐ দরজার সোভাস্থজী যে রাস্তা নদী পর্য্যন্ত গিয়া নদীর ঘাটের সহিত  
যোগ হইয়াছে, তাহাকে মহাদ্বার ঘাট কহে। এই মহাদ্বার দ্বিধা মন্দিরে  
বাইতে ১২টা সিঁড়ি চড়িয়া বাইতে হয়। ১ম সিঁড়িতে ইমোখা দেবের  
ভক্ত, নামদেবের পিতলের মুখ বসান আছে। মহাদ্বারের উপরেই  
নক্ষত্রখানা। ভিতরে শ্রীশ্রীঠোবাদেবের মন্দির। ইহা অতি সুন্দর  
কাকরকার্য্যে নির্মিত, দেখিতে অতি সুন্দর। শ্রীকালী দেবীর মন্দিরের  
কার্য্যও সুন্দর, কিন্তু মন্দিরটি একটু ছোট। ইহা ভিন্ন সত্যভামা, শ্রীরাধা,  
লক্ষ্মীদেবী এবং ভ্যাকটরমণ (শ্রীকৃষ্ণ), চৌবাশি দেবী, তেত্রিশ কোটি  
দেবতা, কালী বিষ্ণেশ্বর, রামেশ্বর, অমৃতেশ্বর, অন্নপূর্ণা দেবী, গকড়, গণেশ  
ইত্যাদি অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির এবং মূর্তিও স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীশ্রীঠোবার মন্দিরের সম্মুখে পাথরের একটা দলান। উহার বেজে

মারবেল পাথরে বাঁধান, এবং ছাদ পাথরের বোলাটা খামের উপর প্রতি-  
 ঠিত। উহার ভিতর একটি খাম আবার সোণা ও রূপার পাতে মোড়া  
 এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও গকডেব মূর্তি আঁকা আছে। উহাকে গকড-  
 স্তম্ভ কহে। শ্রীইঠোবা দর্শন কবিত্তে বাইবাব সময় গকডস্তম্ভ স্পর্শ  
 করিয়া দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণাব কোন হাব বাধা নাই। বাহার  
 যেমন ক্ষমতা সে সেইরূপ দেয়, কেহবা এক পয়সাও দিয়া থাকে।  
 তাহার পবেই আট ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া একটি ছোট ঘর। ঐ  
 ঘরের দরজা রূপার পাতে মোড়া। এখানে রূপার সিংহাসনের উপর  
 শ্রীইঠোবা দেবের মূর্তি, কান মকর কুণ্ডল, দুই হাতে শঙ্খ চক্র, কোমরে  
 হাত বাখিরা ইটের মত চৌকোনা একখানি পাথরের উপর দণ্ডায়মান  
 আছেন।

ঘরের ভিতর হাওয়া প্রবেশের কোন উপায় না থাকায় দেখালে  
 একটি ছিদ্র করিয়া লোহার নল বাহির হইতে ভিতরে আনা হইয়াছে;  
 গ্রীষ্মকালে যখন খুব যাত্রীর ভিড় হয়, তখন বাহিরে ঐ নলের মুখে  
 হাওয়া করিয়া ভিতরে হাওয়া প্রবেশ করান হয়। ভিড়ের সময় লোকের  
 ধাক্কা পাছে ঠাকুবকে লাগে, এইজন্ত মাঝখানে একটি রূপা মোড়া আড়-  
 গড়া আছে। ঐ আড়গড়ার নীচে দিয়া মাল্লু বাইয়া দেব দর্শন করে।  
 একজনের দর্শন শেষ হইলে সে বাহিরে আসে এবং আস্তে আস্তে যাব। এখানে  
 সমস্ত দিন ব্যতীত ছুটি প্রদীপ জ্বলে। ইঠোবাজীব পোশাক মহারাষ্ট্রদেশীয়  
 লোকের মত, মাথায় পাগড়ী, মুতি পবান এবং গলায় চান্দর, এইরূপ  
 পোশাক বোজা থাকে। উৎসবের সময় বকম বকম পোশাক, সোণার  
 মুকুট ইত্যাদি পরান হয়। শ্রীইঠোবা দেবকে অনেক রাজা ও ধনিলোকে  
 মণিমুক্তার অনেক অলঙ্কারাদি দিয়াছেন। উলিয়াম, ঐ সব অলঙ্কারের  
 মূল্য দুই তিন লক্ষ টাকা হইবে। দেব দর্শনে পূজার উপকরণ—ধূপ,  
 কপূর, নারিকেল বুন, (এক বকম কাণ খড়া সুবাসিত), ফুলের মালা  
 তুলসীপত্রের মালা, মিষ্টান্ন (পেঁড়া বিজা মিছরি) ইত্যাদি লইয়া বাইতে হয়।  
 ঐ সমুদয় দ্রব্য মহাপ্রায়ে পাওয়া যায়। পূজার পর দক্ষিণা দুই দফা  
 দিতে হয়, কারণ, পূজারীরা দুই দল আছে।

ইঠোবাজীব দর্শনের পর কন্দিগী দেবীর দর্শন। সেখানেও পূজার  
 উপকরণ ঐরূপ, কেবল বেশীর ভাগ কন্দু ও কুন্দু লইয়া বাইতে হয়।

কল্পিণা পূর্বের জায় চুই স্থানে দিতে হয়। এখানেও রূপার আডগড়াও আছে। শাকি যত দেবমন্দির আছে, তাহাতে এক এক পয়সা দিয়া দর্শন করিলেই হয়। চৌরাশি দেবীর নিকট পাণ্ডাবা যাজ্ঞীদেব পিঠ ঘসিতে বলে। বলে, এখানে পিঠ ঘসিলে চৌরাশি নরক হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

ইঠোশ দেবের সাতজন সেরাট্ট অশ্বত, ইঁতাবা ব্রাহ্মণ। ভোবে চারি-টাব সময় প্রথম দুধে স্নান। তাব পর গরমজলে স্নান, ( কারণ এ দেশে কেহ ঠাণ্ডা জলে স্নান করে না ) কড়াইয়া, মাখন মিছরি ভোগ এবং মঙ্গল আবতি হইয়া থাকে। বেলা দশটাব সময় পূজা এবং দুপুর বেলা ভোগ ও আবতি হয়। সন্ধ্যাব সময়, সন্ধ্যা শাবতি, ভোগ ও শয়ন আবতি হয়। বারো শয়ন আবতি হইলে, ত্রিইঠোবা দেবের মন্দির হইতে শয়ন ঘর পর্য্যন্ত একপানি কাপড় স্নান। এতেন এফট মশান লইয়া শয়ন ঘর পর্য্যন্ত যায়। ইহাই ঠাকুরের শয়ন। কাম্বী দেবীও একপ সমুদয় পূজা হয়। ভোব তিনটা হইতে বার ১০টা পর্য্যন্ত মন্দিরে কীর্তন, ভজন, পুশণ পাঠ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এখন তীর্থযাত্রীদের কর্তব্য বিবরণ, বলি। প্রথমে আসিয়া নদী-তীরে কেহ কেহ শ্রদ্ধা তর্পণ, ফ্লোর কন্ড, গোদান প্রভৃতি কবিত্তে ইচ্ছা করেন। ঐ সকল সমাপন করিয়া বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করেন। পবে, চন্দ্রভাগ্য স্নান করিয়া পুন্ডলিকের দর্শন করিয়া পত্ৰবিনাশ ইঠোবাব দর্শন করেন এবং বাক্সগভোজন ইত্যাদি কবাইয়া থাকেন।

গোপালপুরে মুবজীধর এবং ভীষ্মকবাজেব মন্দির আছে। এখানে জন্মাষ্টমীতে উৎসব হয়। প্রত্যেক মাসেব গুরু একাদশীতে প্রায় ৬৫ হাজার যাত্রী আসে। তাব মধ্যে আবাব মাঘ ও কার্তিক মাসে বেশী উৎসব ও ভিড় হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসেব শয়ন একাদশীতেও এখানে মহোৎসব হয়। গুনিলাম, ঐ সময় প্রায় দেড় লক্ষ যাত্রী জমা হইয়া থাকে। এখানে তিন চার স্থানে অগস্ত্য ও সনারত আছে। অল্পসঙ্কানে জানিলাম, ঐ সকল সিদ্ধের সরকাব, হোলকব, সাকলিকর প্রভৃতি অগ্রান্ত্র ধনী লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যাজ্ঞীদেব থাকিবাব জন্ত ২০০ শতাব অধিক ধর্মশালা আছে।

এখানে আরো অনেক দেবালয় আছে। যথা, দত্তাত্রেয়, বামণীতা, মুবজী-ধর, মল্লিকার্জুন, ব্যাসদেব, কোটেধব, গণপতি, পঞ্চমুখী মাকতি, উদ্ধব, ও অক্ষদেবীর মন্দির। লখুবাই এর মন্দিরটি, ত্রীকৃষ্ণের সহিত যেখানে কল্পিণী

দেবীর দেখা হয়, সেইখানে স্থাপিত। ইহাকে লক্ষ্মীতীর্থও কহে। কুণ্ডল তীর্থটি কুয়ার মত একটা কুণ্ড। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান কবিকার জ্ঞান কাণের কুণ্ডল খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাদের ভিতর পদ্মাবতী দেবীর মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা, ১২০০ ফিট লম্বা ও ৪৫০ ফিট চওড়া একটা পুষ্করিণীর মধ্যে নির্মিত। পুষ্করিণীর চারি দিকে ষাট বাধান। মন্দিরে ষাবার বাস্তা, পূলের মত বাধান। ইহা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তৈয়াব হইয়াছে। পূর্বে এখন বাবমাস জল থাকেনা, কেবল বর্ষাকালে জলে পূর্ণ হয়। এখানে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজাব সময় ৯দিন ধরিয়া মেলা হয়। এখানে বামাত্মজ মতেব শ্রীবৈষ্ণবদেব একটি মঠও আছে। তথায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মঠাব মঠ, সেই সাধুর বয়স ১০০ বৎসরেব অধিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। মঠেব ভিতবে একটা মন্দিরে ষ্ঠেত পাথদেব রাম, সীতা ও লক্ষ্মণেব মূর্তি আছে। ঐ মঠেও একটি সদাব্রত ও অন্নছত্র আছে, কিন্তু উহা কেবল বামাত্মজমতাবলম্বী বৈষ্ণব বাবাজীদেব জন্মই প্রতিষ্ঠিত।

## বিবেকানন্দাষ্টকম্ ।

স্বামিনং শ্রীংকং নম্রা বিবেকানন্দমব্যয়ং ।

স্তোত্রমেতৎ প্রবক্ষ্যামি সৰুপাণপ্রশাসনম্ ॥

ওঁ কবি-পারিত্রা-নিভুদ্রা মুক্তিং

বন্দে নিবাস্তুনিবিনোদ-কান্তম্ ।

বিবেকসংমোদহতাবিগমং

ভবাক্ষি-পোতং প্রণমামি দেবম্ ॥১॥

নটব-নিভূপং নন্দি-নাথ-প্রশান্তং

নগিন-নয়নমণ্ডং মোক্ষসংসর্গহেতুম্ ।

নিখিল-মল্লজপালং সংশরণ্যং দয়াসুং

তমহমজবিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥২॥

মোহান্তমসঙ্কেদং শাবদেন্দু-শত-প্রভম্ ।

ভাঙ্গরং হৃদয়াকাশে বন্দে সত্য-সনাতনম্ ॥৩॥

বিষম-বিষম-বাণৈর্বিদ্ধ-সংলুপ্তবুদ্ধিঃ

সকল-ভবজনং যশ্চাবলোক্যর্দ্রচিহ্নঃ ।

জনন-মরণ-দুঃখং প্রাপ্তবোধঃ প্রসেহে,

তমহমজ্জবিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥৪॥

বেদাদি শব্দ-সামগ্রী-বক্তব্যস্বী-মহোদধিঃ ।

স্বামি সংসৃতি-শ্রেয়ঃসম্পত্তিমক্ষবৎ গুরুম্ ॥৫॥

কাকণ্যকল্পদ্রুম-চাক-কপঃ

গুরুং প্রপদ্যে ভব-তাপ-নাশম্ ।

বিবাক্সমানং হৃদি বমা-বেশং

মূর্ত্তং বিবেকং শবণং চ নাথম্ ॥৬॥

নং দ-শ্রীবামকৃষ্ণাখ্য-ব্রহ্মশিষ্যং মুদাকরম্ ।

দা-সৌহৃদং সততং বন্দে বিবেকানন্দমক্ষবম্ ॥৭॥

যম-হয়-লন-কানী যো বিভর্ত্তেবমুত্তিঃ

বহুবপি ভুবনে যঃ সৰ্ব লোকৈক-বন্ধুঃ ।

অচল-চক-স্বমেবোধীবতা যত্র ভাতি

তমহমজ্জ-বিবেকানন্দ-দেবং প্রপদ্যে ॥৮॥

শ্রীশ্রীবাবকানন্দ-স্বামিপাদ-শিষ্যেণ

শ্রীশবচ্ছন্দেবশম্ভবা লিখচিত্রমেতৎ

স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

## বঙ্গানুবাদ ।

অব্যয় বিবেকানন্দ গুরু কবি নমস্কাৰ ।

সৰ্বপাপপ্রণাশন বলিব এ স্তোত্রসাব ॥

পবিত্র-প্রণব-গুরু-প্রকটিত-কলেবর ।

বন্দি সে বিনোদকান্তি নিষ্কলঙ্ক শশধব ॥

ষড়রিপু হীনবল বিবেকবিচাবে যাব

ভবসিদ্ধিপোতকপী গুরুদেবে নমস্কাৰ ॥১॥

নটবব নিভরূপ সদাশিব শাস্তিময়

প্রধান, নলিনেন্দ্র মুক্তিহেতু অসংশয় ॥

নিখিল পালক যিনি শবণ্য দয়ালুজ্ঞতি  
 জগদ্বীণ হ্রীবিবেকানন্দ পদে মোর নতি ॥২॥  
 শারদেন্দুশতপ্রভ উদ্ভিন্ন মোহ আঁধার  
 হৃদাকাশে নীপ্ত সত্য সনাতনে নমস্কার ॥৩॥  
 বিষম বিষয় বাণে বিদ্ধ লুপ্তবুদ্ধিবল  
 ক্ষুণ্ণমন- হেবি যিনি নিখিল এ ভূমণ্ডল  
 জ্ঞানরূপ ওব সহে জগদুদ্ভাসিত  
 জগদ্বীণ হেন গুরু পদে কোটি নমস্কার ॥৪॥  
 বেদাদি অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারের রত্নাকর।  
 সংসারের সার যিনি নমি সে গুরু অক্ষর ॥৫॥  
 ককণাব কল্পিতক মোহন মূৰ্ত্তি ধীর।  
 তবতাপবিনাশন শুকদেবে নমস্কার ॥  
 হৃদিশতদলে তিনি দীপ্তিমান্ রম্যবেশ।  
 বিবেক স্তম্ভিমান শবণ্য মম প্রাণেশ ॥৬॥  
 সদানন্দ বামকৃষ্ণব্রহ্মশিষ্য বাঙ্গাপায়  
 এ দাসেব কোটিনতি যিনি ভূমানন্দকায় ॥৭॥  
 বহুরূপ হয়ে যিনি নিত্য একমূর্ত্তিধর  
 নিখিল জনেব বদ্ধ দুবকাবী যমডব  
 অচল শুক সুরমেক ধীরতা গাঁহাতে স্থিতি  
 জগদ্বীণ হেন গুরু পদে মোর কোটিনতি ॥৮॥  
 শ্রীশবকজ চক্রবর্তী।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

ভাগসপুরে ভয়ানক প্লেগের প্রকোপ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও  
 কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির কয়েকজন যুবক মিলিয়া ভাগসপুরে যাইয়া  
 প্লেগ নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যেখানে যেখানে  
 কার্য্য করিতেছেন, তথায়ই প্লেগের প্রকোপ অনেক কমিয়া যাইতেছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীত ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সানফ্রান্সিস্কো হইতে গিথিতেছেন,—

“গত ২০শে ফেব্রুয়ারিতে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মমহোৎসব হইয়া গিয়াছে। অনেকেই ভাল ভাল ফুল পাতা প্রভৃতি আনিয়াছিলেন। দুইটা হল-ষব ভক্তবৃন্দের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তদ্যতীত অনেকে স্থান-ভাবে বাহিবে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। এই দিন সকলেই বাতীতে বিশেষ ভাবে ধ্যানজপাদি কবিয়াছিলেন। সভায় আমি Psychic powers অর্থাৎ যোগবল সম্বন্ধে এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করি। এখানকার দ্বাবতীয় ভক্তকে সংস্কৃত নাম দেওয়া হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মমহোৎসব উপলক্ষে (মাতা বা সংস্কৃত নাম পান নাই) তাঁহাদিগকে সংস্কৃত নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এখানকার প্রায় সকল ভক্তই কদাচ মালা জপ কবিয়া থাকেন এবং প্রত্যহ প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া আমাদেব মত ধ্যান কবিয়া থাকেন। অনেক ভক্ত এখানে সংস্কৃত শিক্ষা কবিতোছেন।

সংস্কৃত নাম দেওয়ার পূর্ব পূর্বমহোৎসবে যে সকল গান গাতিজেন, তাহার মধ্যে একটি গান এখানকার একটি ভক্ত পিয়ানোব সঙ্গে গান। পরে সুরধ্বনি সঙ্গীতরবে প্রণবধ্বনি করা হয়। তাহার পূর্ব ধ্যান, পরে পুনরায় প্রণবধ্বনি। তৎপরে ‘The life of the great Indian prophet of the Age’. অর্থাৎ বর্তমান যুগের মধ্যে ভাবতের প্রধান অবতাবের জীবনী সম্বন্ধে একঘণ্টাকাল বক্তৃতা করি।

এখানে এই মহোৎসব উপলক্ষে অনেকে পূর্ব দিবসের বেলা দ্বি-প্রহর হইতে পরদিবস বেলা ৯টা পর্য্যন্ত নিবন্ধ উপবাস কবিয়াছিলেন।”

বিগত ১২ই মাঘ তারিখে আলোচনা সমিতির বিশেষ আধবেশনে সিটিকলেজ হলে শ্রীযুক্ত বাবু ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর “ধর্মপ্রচাব” নামধেয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা বিগত চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধটির মধ্যে প্রকৃত ধর্মপিপাসুর ব্যাকুলতা এবং ধর্ম-সমাজের কৃত্রিমতা ও অসুদৃঢ়তার আবেগময় প্রতিবাদধ্বনি দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম। ভগবান শ্রীবামকৃষ্ণদেব এবং পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখনির্গত অনেক বাণীর প্রতিধ্বনিও ইহাতে দেখিতে পাইলাম। আমরা কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত কবিতোছি। পাঠকগণ প্রবন্ধটি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

“প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।”

“আধ্যাত্মিক সত্যকে যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা জীবনের মধ্যে লাভ না করিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি এই সত্য প্রচারের ভার লইলে কেনল যে প্রচাৰকাৰ্য্য ব্যর্থ হয়, তাহা নহে; সত্য জ্ঞান হয়, সত্য অসত্য হইয়া উঠে। দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্মপ্রচারের অধিকার সম্বন্ধে আমবা বড় অধিক চিন্তাই করি না।”

“ব্রাহ্ম সমাজও কি প্রাচীন নামের সহিত আধুনিক অসঙ্গতি যোগ করিয়া আব এক নূতন প্রহসনের জনতাৰণা করিবেন?”

“আমবা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মনামে নিশ্চয়ভাবে চিহ্নিত করিয়া হিন্দু সমাজের অপব অংশকে সেই চিহ্নের সাহায্যেই দ্বন্দ্বগত স্থান হইতে বঞ্চিত করি, তবে ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রহ্মকেই দূর্বর্ত্তী করিয়া বাধি।”

“ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে আজকাল যে অপবিতৃষ্ণি, যে অসন্তোষের ভাব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহাব প্রধান কাৰণ,—ব্রাহ্ম সমাজ দীৰ্ঘকাল ভাঙনের কাজেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে, গড়নের কাজে মন দিতে পাবে নাই।”

“আমি জ্ঞানি, হিন্দুসমাজে মাহাত্ম্য ব্রাহ্মনাম ধারণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীতিব দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মঙ্গলকর্ম্ম দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা, পবিত্র জীবনের দ্বারা সংসারের মধ্যে ব্রহ্মকে সত্য ভাবে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতেছেন।”

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

এই পক্ষ হইতে উদ্বোধন মাস দুইখানি একত্রে প্রেবিত না হইবা প্রতিপক্ষে একখানি কবিয়া পাঠান হইতেছে। একখানি ১লা ও অপব-খানি ঠিক ১৫ই তারিখে প্রকাশিত করিবার কথাসাধা চেষ্টা করা যাইবে। উদ্বোধন পাক্ষিক পত্র হইলেও টিহা ‘Registered Newspaper’ শ্রেণীতে পরিগণিত না থাকায় পোষ্টেজ বেশী লাগিত। এক্ষণে পোষ্টমাষ্টাব জেনেবাল মহাশয়ের অন্তগ্রহে উহা উক্ত সুবিধা ভোগে সমর্থ হওয়ায় আমবা উদ্বোধন প্রতিপক্ষে গ্রাহকগণকে দিতে সমর্থ হইব। ইহাতে আমাদের আর্থিক সুবিধা কিছুই হইবে না। ববং আমাদের পবিত্রমের কিছু বৃদ্ধি হইল। আরও, এই সংখ্যায় গ্রাহকগণের দেশ ভ্রমণের ঐংস্ক্য



স্বাক্ষরিত পত্রপুস্তক নামক একটি বোম্বাই প্রদেশস্থ অপরিচিত ভীষণ বিবরণ এবং তথাকার মন্দিরাদির চিত্র বহুব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া সন্নিবেশিত করিলাম। আশা করি, আমাদের গ্রাহকগণ অন্তর্গতপূর্বক তাঁহাদের বন্ধুবর্গের মধ্যে তাঁহাদের এই প্রিয় পত্রিকার প্রচার করিয়া বাধিত করিবেন।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

বেলুড মঠ ও বামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংবাদ পাইয়াছেন যে, বামকৃষ্ণ মিশনের নাম লইয়া অনেক ব্যক্তি নানাস্থানে সাধাবণকে প্রত্যাগা কবিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অর্থসংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিশেষ বিখ্যাত স্ত্রে অবগত হইয়াছেন যে, বামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত কাশী বামকৃষ্ণ সেবাস্রমেব (Ramkrishna Home of Service) নাম লইয়া জনৈক ব্যক্তি অর্থসংগ্রহ করিতেছে ও সেই অর্থ সেবাস্রমেব কার্যে ব্যবহার না করিয়া তদ্বারা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। এই কারণে তিনি বেলুড মঠের ট্রাষ্টিগণের সহিত পবামর্শ কবিয়া সাধাবণের বিশেষ অবগতির জন্ত ঘোষণা করিতেছেন যে, যদি কোন ধর্মপ্রচাষক বা সাধাবণের হিতার্থ কোন শুভকর্মের অন্তর্গততা, তিনি সন্ন্যাসী হউন বা গৃহী হউন, বামকৃষ্ণ মিশনের শিলমোহব ও বেলুডমঠের গোপনীয় শিলমোহরযুক্ত, বেলুড মঠের প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত পত্র দেখাইতে না পারেন, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁহার সহিত বামকৃষ্ণ মিশনের কোন সংস্রব নাই এবং তাঁহার উপর উক্ত মিশনের জন্ত কোন রূপ অর্থ বা চাঁদা সংগ্রহের ভার নাই।

স্বাধীজি। এক দিন ঠাকুর বাগানে আমাব ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; তা প্রথম দেখলুম, ঘববাড়ী, দোব, দালান, গাছপালা, চক্ক, সর্ষা সব উড়ে

যাচ্ছে—চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে—অণু পরমাণু হয়ে আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও লয় পেয়ে গেল—তার পর আর কিছুই স্রবণ নাই ; ভয় হয়েছিল—ক্রমে আবাব দেখ্‌লুম,—ঘরবাড়ী, দোর, দোলান। আর একদিন—আমেরিকায় একটা lake এর ধাবে ঠিক ঐরূপ হয়েছিল।

শিষ্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল—“আচ্ছা এ অবস্থা মস্তিষ্কের বিকাবেও তো হতে পারে ; আর ঐ অবস্থাতে আনন্দই বা কি ?”

স্বামীজি। ইহা মস্তিষ্কের বিকার ? বিকার কি করে বলবি ? যখন বোগের থেথাল নয়, নেশা কবে নয়, বক্রমবিবকমের দম টেনেও নয়, সহজ মানুষের সুস্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে ? আবার এ কথা বেদের সঙ্গেও মিলেছে। পূর্ব পূর্ব আচার্য্য ও ঋষিগণের আশ্র-বাক্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আমরা কি শেষে তুই বিকৃতমস্তিষ্ক ঠাণ্ডাবালি ?

শিষ্য। না, তা আমি বলছি না। যখন শাস্ত্রে শতশঃ একরূপ একস্বাস্থ-ভূতির দৃষ্টান্ত রয়েছে ও আপনি যখন বলছেন যে, ইহা কবা-মলকবৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং আপনার অপবোক্তাস্থভূতি, যখন ইহা বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বাক্যেব অবিসম্বাদী, তখন ইহাকে মিথ্যা বলতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—ক গতং কেন বা নীতং ইত্যাদি।

স্বামীজি। জান্‌বি,—এই একত্বজ্ঞান—যাকে তোদের শাস্ত্রে বলে ব্রহ্মাস্থভূতি—তা হলে জীবের আব ভয় থাকে না—জন্মমৃত্যুর পাশ ছিন্ন হয়ে যায়। এই হেয় কামকাঞ্চন বন্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ কতে পারে না। সেই পবমানন্দ পেলে জন্মের সুখ দুঃখে জীব আর অভিভূত হয় না।

শিষ্য। যদি তাই হয়, এবং আমরা যদি যথার্থ পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে থাকি, তা হলে সে সুখলাভে আমাদের ষত্ৰু হয় না কেন ? আমরা সামান্ত কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়ে বার বার মৃত্যুমুখে ষাবমান হচ্ছি কেন ?

স্বামীজি। তুই মনে কচ্ছিস, জীবের বৃত্তি সে শান্তিলাভে আগ্রহ নাই ?

ভেবে দেখ, যে বা কছে, তা সেই ভুমা স্রুতের আশায়। তবে সকলে তা বুকে উঠতে পাচ্ছে না। সে পরানন্দ আব্রহ্মন্ত পৰ্যন্ত সকলে পূর্ণভাবে রয়েছে। তুইও সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মুহূর্তে ঠিক ঠিক ভাবেই অমৃতভূতি হয়। কেবল অমৃতভূতির অভাব মাত্র। তুই যে চাকরী কবে মাগেব জন্য এত খাট্‌ছিস, তার উদ্দেশ্যও সেই সচ্চিদানন্দলাভ। ক্রমশঃ এই মোহেব মার পেঁচে পড়ে পড়ে স্ব স্বরূপে নজব আসবে। বাসনা আছে বলেই ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে। সকলেরি এক সময় পড়বেই পড়বে। কারো এজন্মে কারো বা লক্ষ জন্মে।

শিষ্য। আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের রূপা না হলে হবে না।

স্বামীজি। ঠাকুরের রূপা-বাতাস ত বইছেই। তুই পাল তুলে দেনা। যখন বা ক'বি, খুব একান্তমনে ক'বি। দিনরাত ভাব'বি, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—আমাব আবাব ভয় ভাবনা কি? এই দেহ মন বুদ্ধি সবই কণিক—এব পারে যা, তাই আমি।

শিষ্য। এই ভাব কণিক আসে; আবার তক্ষুনি উড়ে যায়—ছাই ভস্ম ভাবি।

স্বামীজি। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে। ক্রমে শুধবে যাবে। তবে মনের খুব তীব্রতা চাই। এই ভাব'বি যে, আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব, আমি কি আবাব অগ্ন্যাব কার্য কন্তে পারি? আমি কি সামান্য কামকান্দনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের গ্রায মুক্ত হতে পারি? মনে এমনি জোব ক'বি। এতে ঠিক কল্যাণ হয়ে যাবে।

শিষ্য। এক একবার মনেব বেশ জোব হয়। আবাব ভাবি, ডেপুটি পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মজায় থাক'ব।

স্বামীজি। মনে যখন ওসব আসবে, তখুনি বিচার কর'বি, তুইত বেদান্ত পড়েছিস। ঘুমাবার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিষ্যের রেখে থু'বি, যেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগুতে পারে। এইরূপ জোর কন্তে কন্তে ক্রমেই বৈরাগ্য আসবে—তখন দেখ'বি, স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে।

শিষ্য। আচ্ছা স্বামীজি। ভক্তিশাস্ত্রে যে বলে, বেশী বৈরাগ্য হলে ভাব থাকে না?

স্বামীজি। আবে ফেলে দে তেব সে ভক্তিশাস্ত্র, যাতে ও রকম কথা আছে। বৈবাগ্য—বিষয়বিত্ত্বা—না হলে কাকবিষ্ঠাবস্থায় কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না কব্লে, “ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতত্তবেহপি”, ব্রহ্মাব কোটিকল্পেও জীবের মুক্তি নাই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপস্যা কেবল বৈবাগ্য আন্বাব জন্ত। তা যাব হয়নি, তাব জান্দি,—নোঙ্গব ফেলে নৌকাব দাড় টানাব মত হচ্ছে। “ন ধনেন ন চেজ্জাথা ত্যাগেনৈকেন অমৃতকমানন্তঃ”।

শিষ্য। কামকাঞ্চন ত্যাগ হলেই কি সব হ'ল ?

স্বামীজি। ও ছোটো ত্যাগের পবও অনেক লেঠা আছেন। তাব পব আসেন লোকখ্যাতি। সেটা যে সে লোক সাম্ভ্রান্তে পাবেন না। লোক মান নিতে পাবে, নানা ভোগ এসে জোড়েন। এতেই তাগিদেব ম'থা ১০ আনা বাধা পড়েন। এই যে ম'ঠ ব'ই কব'ছি, কে জানে, যাকাকই লা আবার আসতে হবে।

শিষ্য। আপনি এ কথা বলছেন—তবে আমলা ত গিছি।

স্বামীজি। ভয় কি, “অতীতীবতীঃ”। নাগ মহাশয়ের দেখেছিছ ত ? এত সংসার চালে চণ্ডো সন্ন্যাসীর বাড়া। এমনটা বড় দেখিনি। গেদন্ত যদি কেহ হয় ত, যেন নাগ মহাশয়ের মত হয়। তোদের পৃথকবঙ্গ আলো ন'ব বসে আছে। ওদোশের লোকদের বলবি, যেন তাঁর কাছে যাব। তা হ'লে তাদের কল্যাণ হবে।

শিষ্য। নাগ রশ্মি বাকরুণালীলার জীবন্ত দীনতা।

স্বামীজি। তা একবার বলতে ।। আমি তাঁকে একবার দর্শন কতে যাব—তুইও যাবি। আমি জলে জলে ভেসে গেছে, এমন মাঠ দেখে। তুই গিগিস।

শিষ্য। আমি লিখে দিব। আপনাব কথা শুনে তিনি উন্মাদ। বলেন, পূরুবঙ্গ আপনাব চরণধূলিতে তীর্থ হয়ে যাবে।

স্বামীজি। জানিস, নাগ মহাশয়ে ঠাকুর বলত জলন্ত আগুণ।

শিষ্য। তা এনেছি।

স্বামীজি। অনেক বাত হয়েছ, তবে এখন আয়। না—কিছু খেয়ে যা।

শিষ্য। যে আজ্ঞে।

কিছু প্রসাদ পাইয়া শিষ্য কলিকাতা যাচ্ছেন আব হাব'ছেন, ‘আমি

মুক্ত', এ অভাবগী যিনি শুনালেন, ইনিই কি সেই জ্ঞানমুক্তি সাক্ষাৎ শব্দর ?

( ক্রমশঃ )

শ্রীশব্দে চক্রবর্তী।

## বঙ্গ অকালমৃত্যু।

মসূরিকা বা বসন্তরোগ।

( ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ, এম, বি। )

নবকুলক্ষয়ক বোগ সকলেব মধ্যে ইহাই সৰ্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কৰ। ইহাব স্পর্শে স্কন্দৰ দেহ কুৎসিতাকাৰ ধাবণ কৰে, জীৱিত শৰীৰে মৃত্যুৰ পুতিগন্ধ নিঃসৃত হয়; ব্যাধিচিহ্নিত পুত্ৰমুখ নিরীক্ষণ কৰিতে জননীৰও বিভীষিকা উপস্থিত হয়। ভাবতেব ইতিহাসে ইহাব ন্যায় সৰ-গ্রাসী মহামাবীৰ কথা আৰ শুনা যাব না। পূৰ্বে যখন ইহাব আবি-  
ৰ্ভাব হইত,

হাহাকাৰা অথোৰ্ণী মনুজভয়কণী ফেৰবাৰ্শ্চ ভীমৈ:

শূণ্ণগ্রামাতবেমুঃ নরপতিবহিতা ভূবিকঙ্কালমালা।

তখন পৃথিৱীতে হাহাকাৰ ধ্বনি, ফেকপালেব নবীতিকৰ ভীষণ বৰ চহুৰ্দ্ধিকে শুনা যাইত এবং গ্রামসকল লোকশূণ্ণ, ৰাজ্য নবপতি-শূণ্ণ ও দেশ কদালমালায় পৰিপূৰ্ণ হইত। কি দোষে মনুজকুল একুপ মহাবোগে অভিভূত হয় কি অপৰাধেই বা বিতীৰ্ণ জনপদ ইহাৰ স্পর্শে লোকশূণ্ণ হইবা যাব, এই মৃত্যুসহচৰেব দাকণ স্কন্ধানলই বা কিসে নিকাশিত হইতে পাবে, সাধাবণ মানববুদ্ধিতে এই সকল অগ্নেৰ কেবল এক মীমাংসাই সম্ভব। এই অপ্ৰাতঃতপস্কৃতি মহারোগেব উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও নিবাবণ একমাত্ৰ দেব-ইচ্ছাব অধীন। বাহা মানুষেব আয়ুজা-বীন নহে, দেৱশক্তি তিঃ তাহাব নিয়ামক আৰ কে হইতে পাবে? সাধাবণ বিশ্বাস সমর্থন কৰিয়া শাস্ত বলিলেন,

দেৱা শাতলক্ষা কাণ্ডা মস্টৱৈব হি শাতগা।

অৰ্য্য চ যথা ভূতাদিভ্যো বিষমজ্বৰঃ ॥

বিষমজ্বর—ম্যালেরিয়া মহামারী—যেদ্রুপ ভূতাদিষ্ট, তদ্রুপ মনুবিকা-  
গ্রস্ত রোগী শীতলা দেবী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

‘ স্বন্দপুরাণে শীতলা ধ্যান বর্ণিত আছে । কার্তিকেয় দ্বিজ্ঞাসা করিতেছেন,

ভগবদ্বেদবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্ ।

বক্তুমুইশ্শেষেণ বিম্ফোটকভষাপহম্ ॥

হে দেবের দেব ভগবন্, বিম্ফোটকের ভয়নাশক, মহুস্তের কল্যাণকাবী  
শীতলাস্তব বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করুন ।

ঈশ্বর উবাচ ।

বদেহহং শীতলাং দেবীং বাসভস্থাম্ দিগম্বরীম্ ।

যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিম্ফোটকভয়ং মহৎ ॥

শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্ধাহপীড়িতঃ ।

বিম্ফোটকভয়ং ঘোবং ক্ষিপ্রেং তস্মৈ প্রণশ্রুতি ॥

যস্তামুদকমধ্যে তু ধুত্বা সম্পূজয়েন্নবঃ ।

বিম্ফোটকভয়ং ঘোরং কূলে তস্মৈ ন জায়তে ॥

শীতলে জ্ববদক্ষস্ম পুতিগন্ধগতস্ম চ ।

প্রণষ্টচক্ষুঃ পুংসন্মাহর্জীবিতোষধম্ ॥

নমামি শীতলাং দেবীং বাসভস্থাম্ দিগম্বরীম্ ।

মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্ণালঙ্কৃতমন্তকাম্ ॥

অস্ম শ্রীশীতলাস্তোত্রস্ত মহাদেব ঋষিঃ অন্তঃপুচ্ছন্দঃ শীতলা দেবতা  
শীতলোপদ্রবশাস্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ।

শীতলে তনুজান্ বোগান্ গাং হবসি হুস্তবান্ ।

বিম্ফোটকবিশীর্ণানাং স্তমেকামৃতবর্ষিণী ॥

গলগণ্ডগ্রহারোগা য়ে চান্তে দারুণা নৃণাম্ ।

তদমুখ্যানমাজেন শীতলে যাস্তি তে ক্ষয়ম্ ॥

ন মহৎ নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্ত বিদ্যতে ।

স্বমকা শীতলে ধাত্রি নাগ্নাং পশ্যামি দেবতাম্ ॥

মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিস্নান্ধ্যাসংস্থিতাম্ ।

যস্তাং সক্ষিস্তযেদেবি তস্মৈ মৃত্যুর্ন জায়তে ॥

অষ্টকং শীতলাদেব্যা যঃ পঠেন্নানবঃ সদা ।

বিম্ফোটকভয়ং ঘোরং কূলে তস্মৈ ন জায়তে ॥

শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমর্ষিতৈঃ।

উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥

শীতলাষ্টকমেতচ্চি ন দেয়ং যন্ত কস্তচিৎ।

কিন্তু তন্মৈ প্রদাতব্যং ভক্তিশ্রদ্ধাষিতো হি যঃ ॥

হৃদপুরাণ, কানীখণ্ড।

ঈশ্বর বলিতেছেন,—যাহাকে প্রাপ্ত হইলে বিস্ফোটকের মহাভয় নিবা-  
শ্তিত হয়, সেই গর্দভবাহিনী দিগম্বরী শীতলা দেবীকে নমস্কার করি।  
যে শীতলা শীতলা উচ্চারণ কবে, তাহার দাহসংযুক্ত ঘোব বিস্ফোটক  
ভয় শীঘ্র নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি জলমধ্যে ধাবণ কবিয়া শীতলা পূজা করে,  
তাহার বংশে বিস্ফোটক ভয় থাকে না। হে শীতলে, যে ব্যক্তি জর-  
দগ্ধ ও পুতিগন্ধযুক্ত, যাহার (স্ফোটকদ্বারা) চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, তুমিই  
তাহার জীবন বন্ধার একমাত্র ঔষধ। যিনি মৃত্যুকে শূর্ণ (কুলা) ধারণ  
কবিয়াছেন, সেই সমাজ্জননী ও কলসীধারিণী গর্দভস্থা দিগম্বরী শীতলা  
দেবীকে নমস্কার। শীতলা উপদ্রব প্রশমনার্থ নিয়ন্ত্রিত শীতলা স্তোত্র জপ  
কবিতে হয়।

হে দেবী শীতলে, মানবগণের দেহজাত কঠিন বোগ সমস্ত তুমি হরণ  
কব এবং বিস্ফোটক দ্বারা বিশীর্ণদেহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একমাত্র তুমিই  
অমৃতবর্ষিণী। গলগণ্ডাদি অস্ত্র যে কোন কঠিন বোগ হউক, তোমাকে  
স্মরণ কবিলেই বিনষ্ট হয়। এই পাপ রোগের অস্ত্র কোন প্রকার  
ঔষধ বা মন্ত্র নাই, হে মাতঃ শীতলে। তুমিই একমাত্র উপায়; অস্ত্র কোন  
দেবতা দেখা যায় না, যিনি ইহাব প্রতীক্য কবিতে পাবেন। হে  
দেবি, তোমাকে মৃণালতন্তুর জায় নাতি ও হৃদয়ের মধ্যদেশে স্থিত  
মনে করিয়া যে ব্যক্তি ধ্যান কবে, তাহার মৃত্যু হয় না। যে ব্যক্তি  
সর্বদা শীতলাষ্টক পাঠ করে, তাহার বংশেও বিস্ফোটক ভয় উপস্থিত  
হয় না। উপসর্গ বিনাশের জন্য শীতলাষ্টক ভক্তির সহিত শ্রবণ ও পাঠ  
কবিবে, কাবণ, ইহাই পবন স্বস্ত্যয়ন। ভক্তিশ্রদ্ধাষিত ব্যক্তিকে এই  
শীতলাষ্টক দিবে, সর্বসাধারণকে দিবে না।

প্রকৃতজ্ঞবিদগণের মতামুযায়ী সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও হৃদপুরাণের  
বর্তমান আকার প্রচলিত ছিল। সুতরাং ভারতে শীতলা পূজার প্রাচী-  
নতা সহজে অনুমান হইতে পারে। ইহার কত শত বৎসর পূর্বে হইতে,



এ দেশ ভীষণ বসন্ত মহামারী কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে, কে বলিতে পারে ?

দেবী শীতলা অধিষ্ঠিত শীতলা বোগ সাত প্রকাব বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত আছে ; এবং সাধাবণেবও বিশ্বাস,—শীতলা বা বসন্ত চণ্ডী এক নতেন, আদ্যাশক্তির সহচরী সপ্ত যোগিনী । বিহাব অঞ্চলে ইঁহাব সপ্ত ভগিনী,—ফুল মাতা, কাকব মাতা, বাদি মাতা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধা । ইঁহাব মাধা কাকব মাতা সর্কাপক্ষা ভবক্ষবা । ফুল মাতা সপ্ত বর্ষেব অনধিক-বয়স্ক শিশুদিগকে এবং বাদি মাতা সপ্ত চট্টতে পঞ্চদশ বৎসব বয়স্ক বালকদিগকে গাঁড়া দিয়া থাকেন । অনেক স্থানে গ্রামেব বহির্ভাগে একটা মণ্ডপ নির্মিত ও তন্মধ্যে সাতটি মূর্তিকাপিও সপ্ত ভদ্রীৰ অধিষ্ঠান স্বরূপ স্থাপিত হইয়া থাকে । দেবীৰ পূজায় মিষ্টান্ন ও পুষ্পাদি নিবেদিত হয় । উচ্চবর্ণে দেবীৰ প্রীত্যর্থ ছাগ বা রূপোত ও নিয়শ্রেণীৰ লোকে শূকর বলি দ্বেয । মাবীভয উপস্থিত হইলে কি উচ্চ কি নীচ সকল বর্ণ শূকর বলি পদান কবে । পূজাকার্য্য দোসাদ প্রভৃতি নিয়শ্রেণীৰ লোকেব দ্বাবাই নির্বাহিত হইয়া থাকে । বসন্তকাল উপস্থিত হইলে শীতলাপূজা মহাসমাবোহে সম্পন্ন হয় । স্ত্রীলোকেবা দলবদ্ধ হইবা দ্বাবে দ্বাবে শীতলাৰ গান গাহিবা পূজাব জন্ত ভিক্ষা কবিবা বেডাব । পূজা সংগ্রহ হইলে দেবীস্থানে সকলে সমাগত হইয়া থাকে এবং পৌৰোহিত্যকার্য্য স্ত্রীলোকেব দ্বাবাই নির্বাহ হয় । এই দেশীয় চামাবেবা গোবসন্তেব বিস্তৃতিৰ জন্তও সপ্ত ভদ্রীৰ পূজা কবিয়া থাকে ।

এইরূপ মিলিত ভাবে সপ্তভদ্রী পূজিতা হইলেও শীতলা চণ্ডীৰ পূজাই সর্কাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । সৰ্বত্র ইঁহাকেই বসন্তেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া স্বীকাৰ করা হয় । বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে ইনি চতুর্ভুতা ও সিংহবাহিনী । কোথাও কাষ্ঠ বা প্রস্তবোধিত মুখমণ্ডল, তৈল ও সিন্দূৰ লিপ্ত এবং স্বর্ণাদি ধাতুদ্বাবা স্ফোটকেব অনুকবণে চিহ্নিত । যশোহবে দেবী স্বেতবর্ণা, দিগ্বসনা ; উড়িষ্যায ষট্চিহ্নে পূজিতা । খুলনাৰ পোদজাতিব ইনিই প্রধান উপাস্যা দেবী । উত্তৰপশ্চিম প্রদেশে দেবীমূর্তি মন্দিবে বিবাজিত দেগা যয কিন্তু এ দেশে মুচি ভোম বাগি প্রভৃতি নিয় শ্রেণীৰ গৃহেই প্রতিষ্ঠিতা । ইঁহারা মূর্তি বহন কবিয়া ভিক্ষা কবিয়া বেডাব । বঙ্গদেশে অনেক আচার্য্য ব্রাহ্মণ, কুস্তকার ও মালাকাবেবা গৃহে দেবীমূর্তি স্থাপন কবিয়া নিত্য পূজা

কবিয়া থাকে। ইহাদিগের পূৰ্ণপূজ্যেবা পূৰ্ণপ্রচলিত বসন্তেব টোকা দিত এবং বৰ্তমান সময়েও পীড়ার চিকিৎসায় নিযুক্ত আছে। শীতলার পণ্ডিতেরা মহাবি, ঝুগ, কুলটে, বইচি, পুকুরে, বাতাসি প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বসন্ত বোগ নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহাবা যেকপ সোগ চিকিৎসায় জাড়ি, পাঁচন, ছোপ, নিম্বপত্রের বাজনাদিব ব্যবহা কবে, তদ্রূপ বোগীব শয্যার পাশে গোময়লিপ্তস্থানে শীতলামূর্তি স্থাপন এবং পূজা, স্বস্ত্যয়ন, হোম, শীতলাগান প্রভৃতিও কবিয়া থাকে। পূজাব সাধাবণ উপকরণ ব্যতীত দেবীর ছুটীব জগ্ৰ ছাগবলি প্রদত্ত হয়। উক্তপূর্ণবা শীতলাপূজার সময় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা কার্যা সম্পাদন কবেন।

পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসাগ্রন্থ চবক সংহিতায় মস্বিকাব বর্ণনা আছে।

যাঃ সর্গগায়েযু মস্ববমাত্রা মস্ববিকাঃ পিত্তকফাঃ প্রদিত্তাঃ।

বিসর্পশাশো বিহিতা ক্রিযায়া তাং তাস্ম কুঠে চ হিতাং বিদধ্যাং ॥

পিত্তকফ হইতে সর্গগাত্রে মস্ববেব জায় আকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকার পীড়কা হয়, উহাব নাম মস্ববিকা। ইহাব চিকিৎসা বিসর্প ও কুঠের জায়। মতর্ষি সূত্রতও মস্ববিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—তাম্রবর্ণ, দাভ্রব ও তীব বেদনাযুক্ত যে সকল ব্রণ সর্পাঙ্গে উৎপন্ন হয়, তাহাব নাম মস্ববিকা।

কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে মস্ববিকাব ক্ষুদ্রশীর্ষবর্ণনা থাকিলেও ইহা বিস্ফোটক, ব্রণাদি ক্ষুদ্র বোগেব সমশ্রেণীতে গণিত হইয়াছে। “ন মস্ত্রং নোষধং ক্রিকিং পাপবোগস্য বিদ্যাত” এই নিবাসাবাকা একালে জনিতে পাই না এবং বোগশাস্তিব জগ্ৰ দেবী শীতলাব আবির্ভাবেবও কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল সূক্ষ্মদর্শী আয়ুর্কেন্দকর্তাগণ মস্ববিকার বিশ্বব্যাপী সংক্রামক ও নিদাকণ সংহাব মূর্তি পর্যাবেক্ষণে কি অক্ষম ছিলেন বা পববর্তী কালেব জায় তীব্র বসন্ত বোগ তৎকালে ছিল না? যাহা হউক, অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত মাধব কবেব নিদান গ্রন্থে মস্ববিকার যেক্রূপ লক্ষণ ও ভেদাদি বর্ণিত আছে, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহারই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। নিদানকর্তা লিখিয়াছেন, অপরায়ণ কাবণেব মধ্যে—ছুট্টনিপাবশাকটৈঃ প্রছুট্টপবনোদকৈঃ—দূষিত অন্ন, বায়ু ও জল সেবনে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত ও ছুট্ট রক্তেব সহিত মিলিত হইয়া দেহে মস্ববের জায় আকৃতি বিশিষ্ট পীড়কা উৎপাদন করে। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্র ইহাপেক্ষা এই সংক্রামক বোগের কারণ অবধারণে বড় অধিক

দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। নিদানে কফ, পিত্ত, রস রক্তস্রাব প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার মহাবিকার ভেদ বর্ণিত আছে। আয়ুর্বেদমতানুযায়ী বসন্ত-বোগেব এই প্রকার শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহামারীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া নবকুলেব অকালমৃত্যু সাধন করিতে বসন্ত বোগেব ত্রাণ দ্বিতীয় আব নাই। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চীনেব হানবাজবংশের রাজত্ব কালে মধ্য আসিয়া হইতে প্রত্যাগত, বিজয়ী সৈন্যদলের পথান্তসবণ করিয়া চীনসাম্রাজ্যে ঘোব মহামারী উৎপাদন করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে যেমেনেব হাব্‌সি সম্রাট্ আবরাহেমেব মক্কাঅববোধকারী সৈন্য মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বিজয়দীপ্ত বাহিনীকুল নির্মূল করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে হজবত মহম্মদেব নবধর্মদীক্ষিত আববজাতি ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যখন ইউরোপ অভিযুগে ধাবিত হয়, খৃষ্ট ইউরোপ সে তেজে যেক্রপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তৎসহ সমাগত দারুণ মহামারীর আক্রমণে ততোধিক অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমেরিকা মহাদেশে বসন্তেব উৎপীড়নে জাতিবে জাতি উৎসন্ন গিয়াছে। এক সময়ে মেক্সিকো দেশে ৩৫ লক্ষ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৫৬৩ সালে ব্রাজিল প্রাণ মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল। যখন নুশংস সমবানল প্রজ্জ্বলিত ও দুর্ভিক্ষেব হৃদয়ভেদী হাহাকার উথিত, সেই সময়ে বসন্ত চণ্ডীও লোকসংহাবক লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহার প্রভাবে বাক্সোম্বেব প্রাসাদ হইতে, দবিদ্রের পর্ণকুঠাব সমভাবে নিপী-ড়িত হইয়াছে। ১৭৭০ সালেব ( ছিয়াত্তশব ) মনস্তবে, বসন্ত মহামারী এক্রপ প্রবলাকাব ধাবণ কবে যে, মুবসিদাবাদেব রাজপথে মৃতদেহ স্তপাকাবে ইত্যন্ততঃ পতিত দৃষ্ট হইয়াছিল এবং নবাবঅস্তঃপূব আকান্ত হওয়াতে অতিযত্নসেবিত নবাবপুত্র সাইফুদ্ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইংলণ্ডেব অমব সন্তান জেনাবেব গোবীজটাকা প্রবর্তন হইতে এই মহামারীবিষদস্ত ভগ্ন হইয়াছে। যেখানে গোবীজটাকা বীতিমত প্রচলিত, বসন্ত রোগেব ভয় সে স্থান পবিত্যাগ করিয়াছে। জর্মান্য বাক্সো ১৮২৯ সালে ৪৫ লক্ষ অধিবাসীবি ভিতব ২৮ জন মাত্র এই রোগে প্রাণত্যাগ কবে। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ বৎসব বসন্তেব প্রাবল্য না থাকিলেও ২১০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উভয়দেশেব লোক সংখ্যা তুলনা করিলে, গোবীজ টাকা সন্তেও বঙ্গদেশে জর্মান্যি অপেক্ষা বসন্তেব মৃত্যু সংখ্যা পাঁচশত ও ৭ অধিক। সংক্রা-

যক রোগের নিবারণোপায় পর্যালোচনার সময় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

## রাজপুতনার অন্তর্গত খেতড়ির মহারাজের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

‘যখনই ধর্ম্মের প্লামি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি ধর্ম্ম পুনঃ-স্থাপনাব জগ্গ আবির্ভূত হই।’ হে মহারাজ, এ কথাগুলি বিবিধ গীতাশাস্ত্রে সেই সনাতন ভগবানের বাক্য; এই বাক্য জগতে আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রবাহেব সনাতন উত্থান পতন নিয়মেব মূলমন্ত্ররূপ।

এই সকল পবিত্রবর্জন বাব বাব নূতন তালে, নূতন ছন্দে জগতে প্রকাশিত হইতেছে আব যদিও অগ্গাচ্ছ মহান পবিত্রবর্জনের ত্রায়, তাহাদেব কার্যক্ষেত্রেব মধ্যগত প্রত্যেক ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম বস্তুব উপর তাহাব প্রভাব বিস্তার কবিতোছে, তথাপি অন্তর্কূল স্থানেই তাহাদেব কার্যাবিতা অধিক প্রকাশ পায়।

সমষ্টিভাৱে যেন জগতেব আদিম অবস্থা ত্রিওণেব সাম্যভাব, (এই সাম্যভাৱেশব্দক্ষুদ্র) ও তাহা পুনঃপ্রাপ্তিব জগ্গ সমুদয় চেষ্টা লইয়াই এই প্রকৃতিব বিকাশ বা ব্রহ্মাণ্ড, যতদিন না এই সাম্যাবস্থা পুনরায় আসে, ততদিন এই ভাবেই চলিতে থাকে) ব্যাটীভাবে তেমনি আমাদেব এই পৃথিবীতে যতদিন মনুষ্যজাতি বর্ত্তমান আকাবে থাকিব, ততদিন এই বৈষম্য ও তাহাব নিত্যসহচর এই সাম্যভাৱেব চেষ্টা দুই পাশাপাশি বিবাজ কবিবে। তাহাতে সমুদয় পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতিব ভিতব, জাতিব উপবিভাগগুলিব ভিতব ও এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, প্রবল বিশেষত্ব থাকিব, যাহাতে একটা হইতে অব একটাকে পৃথকরূপে জানা যাইবে।

অতএব নিবপেক্ষভাবে যেন ভুলানড়ে পরিমাণ কবিতা সকলক সমান শক্তি প্রদত্ত হইলেও প্রত্যেক জাতিই যেন কোন বিশেষ প্রকার শক্তিসংগ্রহ ও বিতরণের উপযোগী এক একটা অদ্ভুত যন্ত্র স্বরূপ আব সেই জাতিব অগ্গাচ্ছ অনেক শক্তি থাকিলেও দেই বিশেষ শক্তিনই দেই জাতিব বিশেষ

লক্ষণরূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। মনুষ্যপ্রকৃতির কোন বিশেষ ভাবের বিশেষ বিকাশ ও উদ্দীপনা হইলে, তাহার প্রভাব অল্পবিস্তর সকলেই অনুভব করিলেও যে জাতির উহা বিশেষ লক্ষণ এবং সাধারণতঃ, বাহ্যকে কেন্দ্র কবিরাই উহা উৎপন্ন হয়, তাহা সেই জাতির অন্তরের অন্ততল পর্য্যন্ত আলোড়িত করে। এই কাবণেই ধর্ম্যজগতে কোন আন্দোলন উপস্থিত হইলে, তাহার ফলে ভাবতে অবশ্যই নানাপ্রকার গুণতর পবিবর্তন হইতে থাকিবে, যে ভাবতরুপ কেন্দ্র হইতে বহুবিস্তৃত ধর্মতরঙ্গসমূহ বারংবার উথিত হইয়াছে, কাবণ, ধর্মভূমি বলিয়াই ভাবতের বিশেষত্ব।

প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাকেই কেবল সত্য বলে, যাহা তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করে। সাংসারিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট যাহা কিছুই বিনিময়ে টাকা হয়, তাহাই সত্য, যাহার বিনিময়ে টাকা হয় না, তাহা অসত্য। প্রভুত্ব যাহার আকাঙ্ক্ষা, যাহাতে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার বাসনা চরিতার্থ হয়, তাহার নিকট তাহাই সত্য, নাকি কিছুই নয়। এইরূপে যাহা কোন ব্যক্তির জীবনের বিশেষ প্রিয় আকাঙ্ক্ষারূপে সদয়ধর্মনিব প্রতিধ্বনি না করে, তাহাতে সে কিছুই দেখিতে পায় না।

যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য জীবনের সমুদয় শক্তির বিনিময়ে কাঞ্চন, নান্য বা অপব কোনরূপ ভোগসুখের অর্জন, যাহাদের নিকট সমবসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদলের যুদ্ধযাত্রাই একমাত্র শক্তির বিকাশের লক্ষণ, যাহাদের নিকট ইন্দ্রিয়সুখই জীবনের একমাত্র স্তূপ, তাহাদের নিকট ভাবত শুধু এই একটা প্রকাণ্ড মকব গ্রাঘ প্রতীতমান হইলে; তাহারা যাহাকে জীবনের বিকাশ বলিয়া বিবেচনা করে, উহার এক এক বায়ুপ্রবাহই যেন তাহার পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ।

কিন্তু গাঁহাদের জীবনভূমি ইন্দ্রিয়জগতের অতি দূরে অবস্থিত অনন্ত-নদীর সলিলপানে একেবারে মিটিয়া গিয়াছে, গাঁহাদের আত্মা সর্বের জীর্ণ-ত্বক্‌মোচনের গ্রাঘ কাম, কাঞ্চন ও ঘণঃস্পৃহাক্রূপ ত্রিবিধ বন্ধনকে দূরে ত্যাগ কবিয়াছে, গাঁহারা চিত্তবৈহর্যের উন্নত শিখরে আবোহণ কবিয়া তথা হইতে, ইন্দ্রিয়বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ দ্বারা ‘ভোগ’ নামে নির্দিষ্ট মাকাল ফলের জগ্ন নীচজনোচিত কলহ, বিবাদ, দ্বেষহিংসার প্রতি প্রীতি ও প্রসন্নতাব দৃষ্ট নিম্নোপ করেন, গাঁহাদের সজ্জিত পূর্ব সংকল্পের দ্বারা চক্ষু হইতে অজ্ঞানের আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে, এবং গাঁহাদিগকে অসার নাশক

তবে কবিতা প্রকৃত সত্য দর্শনে সক্ষম কবিতা, তাহার। যেখানেই থাকুন না কেন, আধ্যাত্মিকতার জননী ও অনন্তধর্মি স্বরূপ ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট ভিন্নাকাবে—বহিঃপ্রাণ উজ্জ্বলতাবাবে—প্রতীত হয়, ছায়াবাজিপ্রায় জগতে যিনি একমাত্র প্রকৃত সত্য, তাহার অনুসন্ধানপর্বাণ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উহা আশাব আলোকরূপে প্রতীত হয় ।

অধিকাংশ মানবই তখনই শক্তিকে শক্তি বলিয়া বুঝিতে পারে, যখন উহা তাহাদের অনুভবের উপযোগী হইয়া স্থূল আকারে তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ পায় । তাহাদের নিকট প্রবল সমবোৎসাহ লুপ্তনাদিই, খুব স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ শক্তির বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয় ; আর যাহা কিছু ঝড়ের মত আসিয়া সম্মুখে যাহা কিছু পায়, তাহাকেই উল্টিয়া পালুটিয়া দেখে না, তাহাই তাহাদের দৃষ্টিতে মৃত্যুরূপ । স্মৃতবাং শত শত শতাব্দী ধরিয়া কোনরূপ বাধা দিবার চেষ্টাশূন্য হইয়া বিদেশী বিজেতৃগণের পদতলে পতিত, একতাহীন, স্বদেশহিতৈষণালেশশূন্য ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট গলিত অস্থিগুণ ভূমি বলিয়া, প্রাণহীন পচনশীল পদার্থবাশি বলিয়া প্রতীত হইবে ।

কথিত হয় যে, যোগ্যতমই কেবল জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া থাকে । তবে সাধারণ ধারণানুসারে যে জাতি সংজ্ঞাতির মধ্যে অযোগ্যতম, সে জাতি দাক্ষিণ্য জাতীয় দুর্ভাগ্যচক্রে নিশ্চেষ্ট হইলেও কেন তাহাব বিনাশের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যাইতেছে না ? তথা-কথিত বীর্য-শালী ও কল্পপর্বাণ জাতিসমূহের শক্তি যেমন একদিকে প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, তেমনি এদিকে দুর্নীতিপর্বাণ (২) হিন্দু বর্ণোপেক্ষা অধিক শক্তির বিকাশ হইতেছে, ইহা কিরূপে হয় ? সাঁহাবা এক মুহূর্তের মধ্যে জগৎকে শোণিতসাগরে প্লাবিত কবিতা দিতে পাবেন, তাঁহাবা খুব প্রশংসা পাইবার যোগ্য বটেন । সাঁহাবা জগতের এক লক্ষ লোককে স্মৃতে স্বচ্ছন্দে বাধিবার জগৎ পৃথিবীর অর্ধেক লোককে শুকাইয়া মারিতে পাবেন, তাঁহা-দেবও মহৎ গৌরব প্রাপ্য বটে কিন্তু সাঁহাবা অপব কাহারও অন্ন না কাড়িয়া লইয়াই শত শত লক্ষ লোককে শাস্তি ও সুখস্বচ্ছন্দে রাখিতে পাবেন, তাঁহাবা কি কোনরূপ সম্মান পাইবার যোগ্য নহেন ? শত শত শতাব্দী ধরিয়া অপরের উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার না কবিতা লক্ষ লক্ষ লোকেব অদৃষ্টচক্রে পবিচালনা করিতে কি কোনরূপ শক্তির বিকাশ সঞ্চিত হইতেছে না ?

সকলি প্রাচীন জাতব পুরাণেই বীরগণের উপাখ্যানে দেখা যায়,— তাঁহাদের প্রাণ তাঁহাদের শরীরেব কোন বিশেষ ক্ষুদ্র অংশে আবদ্ধ ছিল। যতদিন উহাব উপর হাত পড়ে নাই, ততদিন তাঁহারা অজ্ঞেয় ছিলেন। এইরূপ বোধ হয়, যেন প্রত্যেক জাতিবই এইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থানে জীবনীশক্তি সঞ্চিত আছে ; তাহাতে হাত না পড়িলে কোন দুঃখবিপদেই সেই জাতিকে নাশ করিতে পাবে না।

ধর্মই ভাবতের এই জীবনীশক্তি। যতদিন হিন্দুজাতি তাঁহাব পূর্ব-পুরুষগণের নিকট উক্তবাধিকাব স্মরে প্রাপ্ত জ্ঞান না বিস্মৃত হইতেছেন, ততদিন জগতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা উহাকে ধ্বংস করিতে পাবে।

যে ব্যক্তি সর্বদাই স্বজাতিব অতীত কার্যকলাপের আলোচনা কবে, আজকাল সকলেই তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাবা বলেন, এইরূপ ক্রমাগত অতীতের আলোচনাতেই হিন্দুজাতিব নানারূপ দুঃখহুঁরিপাক ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ইহাব বিপরীতটাই সত্য। যতদিন হিন্দুজাতি তাহার অতীতের গৌরব, অতীতের ইতিহাস ভুলিয়াছিল, তত দিন উহা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়াছিল। যতই অতীতের আলোচনা হইতেছে, ততই চাবিদিকে পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যৎকে এই অতীতের ছাঁচে ঢালিতে হইবে, অতীতই ভবিষ্যৎ হইবে।

অতএব হিন্দুগণ যতই তাঁহাদের অতীত ইতিহাসের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ততই উজ্জ্বলতর হইবে আব যে কেহ এই অতীতকে প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ত্ত করিবাব চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই স্বজাতিব পবন হিতকারী। আমাদের পূর্বপুরুষগণের আচার ও নিয়মগুলি মন্দ ছিল বলিয়া ভাবতের অবনতি হয় নাই কিন্তু এই অবনতি হইবাব কারণ এই যে, ঐগুলির বেক্রপ ত্রাযতঃ পবিধাম হওয়া উচিত ছিল, তাহা হইতে দেওয়া হও নাই।

ভাবতের ইতিহাসের প্রত্যেক বিচারশীল পাঠকই জানেন, ভাবতের সামাজিক বিধানগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে।

প্রথম হইতেই এই নিয়মগুলি কালে ধীবে ধীবে ক্রমাভিব্যঙ্গমান এক বিরাট উদ্দেশ্যের তদানীন্তন সমাজে প্রতিফলনের চেষ্টারূপ ছিল। প্রাচীন ভাবতের ঋষিগণ এত দূরদর্শী ছিলেন যে, জগৎকে তাঁহাদের

জ্ঞানের মহত্ত্ব বৃদ্ধিতে এখনও অনেক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে। আর তাঁহাদের বংশধরগণেব, এই মহান উদ্দেশ্যেব পূর্ণতাৰ ধারণার অক্ষম-তাই ভাবতের অবনতির একমাত্র কারণ।

প্রাচীন ভাবত শত শত শতাব্দী ধৰিয়া তাহাব সৰ্বপ্রধান দুই জাতিব— ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিব—উচ্চাভিলাষপূর্ণ অভিসন্ধি সাধনেব যুদ্ধক্ষেত্র ছিল।

একদিকে ব্রাহ্মণগণ, সাধাবণ প্রজাগণেব উপব ক্ষত্রিয়গণেব অবৈধ সামাজিক অত্যাচার নিবাবণে বদ্ধপবিকব ছিলেন—এই প্রজাগণকে ক্ষত্রিয়-গণ আপনাদেব ধৰ্ম্মসম্ভত খাদ্যরূপে নির্দেশ করিতেন। অপর দিকে, ক্ষত্রিয়ই ভাবতে একমাত্র শক্তিসম্পন্ন জাতি ছিলেন, তাহাবা ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক অত্যাচার ও লোকগণকে বন্ধন কবাবাব জন্ত তাঁহারা যে ক্রমবৰ্দ্ধমান নূতন নূতন ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ কবাইতেছিলেন, তাহাব বিবন্ধে চেষ্টা কবিয়া কিয়ৎপৰিমাণে ক্লতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন।

উভয় জাতিব এই সংঘর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আবম্ভ হইয়া-ছিল। সমুদয় শ্রুতিব ভিতবেই ইহা অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইতে পাবে। এক যুদ্ধেব জন্ত এই বিরোধ মন্দীভূত হইল, যখন ক্ষত্রিয়দল ও জ্ঞান-কাণ্ডেব নেতা শ্রীকৃষ্ণ উভয় দলেব সামঞ্জস্য কল্পণে হইতে পাবে, দেখা-ইয়া দিলেন। তাহাব ফল গীতাৰ শিক্ষা, যাহা ধৰ্ম্ম, দৰ্শন ও উদাবতার সাবক্ষপ। কিন্তু বিবোধেব কাবণ তখনও বৰ্ত্তমান ছিল স্মৃতরাং তাহার ফল অবশ্যস্তাবী। সাধাবণ দ্ববিদ্র মুখ প্রজার উপব প্রভুত্ব কবাবাব উচ্চা-কাঙ্ক্ষা পূৰ্ব্বোক্ত দুই জাতিবই বৰ্ত্তমান ছিল স্মৃতবাং আবার প্রবলভাবে বিবোধ জাগিয়া উঠিল। আমবা সেই সময়কাব যৎসামান্য সাহিত্য যাহা প্রাপ্ত হই, তাহা সেই প্রাচীনকালেব প্রবল বিবোধেব স্মৃণ প্রতিফলি-মাত্র কিন্তু অবশেষে ক্ষত্রিয়েব জয় হইল, জ্ঞানেব জয় হইল, স্বাধীনতার জয় হইল আর কৰ্ম্মকাণ্ডের প্রাধান্য বহিল না, কৰ্ম্মকাণ্ডেব অধিকাংশ একেবাবে চিবকালেব জন্ত গেল।

এই উত্থানেব নাম বৌদ্ধ সংস্কার। ধৰ্ম্মের দিকে উহাতে কৰ্ম্মকাণ্ড হইতে বিমুক্তি সূচনা কবিতেছে আব বাজনীতিব দিকে ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বিনাশ সূচিত হইতেছে।

ইহা বিশেষ লক্ষ্য কবাবাব বিষয় যে, প্রাচীন ভাবত যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন ব্যক্তিকে প্রসব কবিয়াছিল, তাঁহারা উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন—



কৃষ্ণ ও বুদ্ধ—আর ইহা আবার বেশী লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই দুই অবতারই লিঙ্গজাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকেই ক্রান্তের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের অদ্ভুত নীতিবলসত্ত্বেও উহার অধিকাংশ শক্তিই ধ্বংসকার্যে নিয়োজিত হওয়াতে উহাকে উহার জন্মভূমিতেই মৃত্যুলাভ করিতে হইল। আর উহার বাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও, উহা যে সকল কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ড নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ ভয়ানক কুসংস্কার ও ক্রিয়াকাণ্ডে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যদিও উহা আংশিকভাবে বৈদিক পণ্ডলি নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিল, কিন্তু উহা সমুদয় দেশকে মন্দির, প্রতিমা, যন্ত্র ও সাধুগণের অস্তিতে পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

বিশেষতঃ, উহা দ্বাবা আর্য্য, মঙ্গোলীয় ও অসভ্য জাতিব যে একটি কিল্বত মিশ্রণ হইল, তাহাতে অজ্ঞাতসাবে কতকগুলি বীভৎস বামাচার সম্প্রদায়েব সৃষ্টি হইল। প্রধানতঃ এই কাণেই সেই মহান আচার্য্যের উপদেশাবলির এই বিরূত পবিগতিকে শ্রীশঙ্কর ও তাঁহার সন্ন্যাসিসম্প্রদায়কে ভাবত হইতে তাড়াইতে হইয়াছিল।

এইরূপে মনুষ্যদেহধাবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বুদ্ধ কর্তৃক পবিত্রানিত সঞ্জীবন শক্তিপ্রবাহও পুতিগন্ধময় বোগবীজপূর্ণ ক্ষুদ্র আবদ্ধ জলাশয়ে পবিগত হইল এবং ভাবওকেও অনেক শতাব্দী ধবিয়া অপেক্ষা করিতে হইল, যতদিন না ভগবান্ শঙ্কর এবং তাহার কিছু পবে পবেই রামানুজ ও মথুরাচার্য্যের অভ্যুদয় হইল।

ইতিমধ্যে ভারতেতিহাসের এক সম্পূর্ণ নূতন পবিচ্ছেদ আবন্ত হইয়াছিল। প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। হিমালয় ও বিক্রোব মধ্যবর্তী আর্য্যভূমি, বাহা কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে প্রসব করিয়াছিল, বাহা মহামাত্র রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের ক্রীড়াভূমি ছিল, তাহা নীবব বহিল আর ভাবত উপদ্বীপের সর্বনিয়দেশ হইতে, ভাষা ও আকারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের বংশধর বলিয়া গোঁববকারী বংশসমূহ হইতে বিরূত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আবন্ত হইল।

আর্য্যাবর্তের সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কোথায় গেলেন? তাঁহাদের একেবারে লোপ হইল, কেবল, এখানে ওখানে ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়জাতিমানী কতকগুলি মিশ্র জাতি বহিল। আর তাঁহাদের ‘এতদ্বেশপ্রমুতস্য সকাশা-

দগ্ধজয়নঃ। স্বং স্বং চবিত্রং শিক্ষেরন পৃথিব্যাং সৰ্বমানবাঃ ॥’ (যশু) এই এই দেশ (ব্রহ্মাবৰ্ত্ত ও ব্রহ্মবর্ষদেশ) প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণেব নিকট হইতে পৃথিবীৰ সকল মানুষ আপন আপন চবিত্র শিক্ষা কবিবে, এইরূপ অহঙ্কৃত, আত্মপ্রাণাময় উক্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অতি বিনয়ের সহিত দীনবেশে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ইহাব ফলস্বরূপ ভাবতে পুনৰাব বেদেব অভ্যাস হইল—বেদান্তেব যে পুনৰুত্থান হইল, একরূপ বেদান্তের চৰ্চ্চা আব কখন হয় নাই, গৃহস্থেবা পর্য্যাপ্ত আবণ্যকপাঠে নিযুক্ত হইলেন।

বৌদ্ধধর্মপ্রচারে ক্ষরিয়েবাই প্রকৃত নেতা ছিলেন, দলে দলে তাঁহাবা বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কার ও ধর্মাস্তবকরণেব উৎসাহ সংস্কৃত ভাষা উপেক্ষিত হইয়া লোকপ্রচলিত ভাষাসমূহেব চৰ্চ্চা প্রবল হইয়াছিল। আব অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত শিক্ষাব বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূতবাং দাক্ষিণাত্য হইতে যে এই সংস্কারতত্ত্ব আসিল, তাহাতে কিয়ৎ পৰিমাণে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণেবই উপকার হইল। কিন্তু ভাবতেব অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোকেব পদদেশে উহা পূৰ্ণ হইতেও অধিক শৃঙ্খল পুরাইল।

ক্ষত্রিয়গণ চিবকালই ভাবতেব মেকদণ্ড স্বরূপ; সূতবাং তাঁহারাি বিজ্ঞান ও স্বাধীনতার সনাতন বন্ধক। দেশ হইতে কুসংস্কার তাড়াইবাব জ্ঞান চিবকাল তাঁহাবা বজ্রবাণী উচ্চাবণ কবিয়া গিয়াছেন আব ভাবতেতিহাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যাপ্ত তাঁহাবা ব্রাহ্মণকুলেব অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা কবিবাব অভিদ্য প্রাচীণস্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান আছেন।

যখন তাঁহাদের অধিকাংশ ধোব অজ্ঞানে নিমগ্ন হইলেন আব অপরাধমধ্য এসিয়াব বর্ষেব জাতিব সহিত শোণিতসম্বন্ধ স্থাপন কবিয়া ভারতে পুরোহিতগণেব অপ্রতিহত শক্তি স্থাপনে তববাবি নিযোজিত কবিলেন, তখনই ভাবতেব পাপেব নাত্রা পূর্ণ হইয়া আসিল আব ভাবতভূমি একেবারে ডুবিয়া গেল,—কখনও আব উঠিবেও না, যতদিন না ক্ষত্রিয় নিজে জাগরিত হইয়া আপনাকে মুক্ত কবিয়া অবশিষ্ট জাতিগণেব চরণশৃঙ্খল উন্মোচন কবিয়া দেন। পৌরোহিত্যই ভাবতের সর্বনাশের মূল। মানুষ নিজ ভ্রাতাকে হীনাবস্থ কবিয়া স্বয়ং কি কখন হীনভাবাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারে?

জানিবেন, বাজাজী, আপনার পূৰ্ণপুরুষগণের দ্বারা আবিষ্কৃত সত্য সমূহেব মধ্যে সৰ্বশ্রেষ্ঠ সত্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব। কোন ব্যক্তি কি আপনার কিছুমাত্র অনিষ্ট না করিয়া অপরের অনিষ্ট করিতে পারে? এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচারসমষ্টি চক্রবৃদ্ধি নিয়মে তাঁহাদের মস্তকে এই সহস্র-বর্ষব্যাপী দাসত্ব ও অবনতি আনয়ন কবিয়াছে—তাঁহারা অনিবার্য কৰ্ম্মফলই ভোগ কবিতেছেন। আপনাদেবই একজন পূৰ্ণপুরুষ বলিয়াছিলেন, ‘ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যো স্থিতং মনঃ,’ ‘সাঁহাদেব মন সাম্যভাবে অবস্থিত, তাঁহারা জীবদশাতেই সংসাবজয় কবিয়াছেন।’ তাঁহাকে লোকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস কবিয়া থাকে, আমবা সকলেই ইহা বিশ্বাস কবি। তবে কি তাঁহাব এই বাক্য অর্থহীন প্রলাপমাত্র? যদি না হয়, আব আমবা জানি তাহা নয়, তবে জ্ঞান, লিঙ্গ, এমন কি, গুণ পর্যন্ত বিচার না কবিয়া সমুদয় সৃষ্ট জগতের এই সম্পূর্ণ সাম্যের বিকক্ষে যে কোন চেষ্টা, তাহা ভয়ানক ভ্রমপূর্ণ আব যতদিন না কেহ এই সাম্যজ্ঞান লাভ কবিতেছে, ততদিন সে কখনই মুক্ত হইতে পাবে না।

অতএব হে বাজন্, আপনি বেদান্তের উপদেশাবলি পালন করুন,—অমুক্ত ভাষ্যকার বা টীকাকারের ব্যাখ্যানুসাবে নহে, আপনার অন্তর্ধ্যামী আপনাকে যেরূপ বুঝাইয়াছেন, সেইরূপ ভাবে। সর্বোপরি, এই সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে সমজ্ঞানরূপ মহান্ উপদেশ প্রতিপালন করুন—সর্বভূতে সেই এক ভগবানকে নিরীক্ষণ করুন।

ইহাই মুক্তির পথ; বৈষম্যই বন্ধনের পথ। কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি বাহ একত্ব জ্ঞান ব্যতীত বাহ স্বাধীনতা লাভ কবিতে পারে না, আব সকলের মানসিক শক্তির একত্বজ্ঞান ব্যতীত মানসিক স্বাধীনতাও লাভ কবিতে পারে না।

অজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি ও বাসনা, এই তিনটাই মানবজাতির জুংথেব কাবণ, আর উহাদের মধ্যে একটীব সহিত অপবটীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একজন মানুষের আপনাকে অপব কোন মানুষ হইতে, এমন কি, পশু হইতেও শ্রেষ্ঠ ভাবিবাব কি অধিকাব আছে? বাস্তবিক ত সর্বত্রই এক বস্তু বিরাজিত। ‘ঈশী ঈশী পুমানসি ঈশ কুমাৰ উত বা কুমাৰী,’ ভূমি স্ত্রী ভূমি পুরুষ, ভূমি কুমাৰ আবাব ভূমিই কুমাৰী।

অনেকে বলিবেন, ‘একপ ভাৰা সন্ন্যাসীৰ শোভা পায়, তাঁহাদের পক্ষে

ইহাই ঠিক বটে, কিন্তু আমরা যে গৃহস্থ! অবশ্য গৃহস্থকে অস্ত্রান্ত অনেক কর্তব্য করিতে হয় বলিয়া সে ততটা এই সামান্যতবে অবস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহাদেবও ইহা আদর্শ হওয়া উচিত। এই সমত্বাভ লাভ করাই সমুদয় সমাজের, সমুদয় জীবের ও সমুদয় প্রকৃতির আদর্শ। কিন্তু হায়, লোকে মনে করে, বৈষম্যই এই সমজ্ঞান লাভের উপায়, এ যেন অগ্রায় কাষ করিয়া গ্রায় পথে পঁছানির গ্রায় হইল।

ইহাই মনুষ্যপ্রকৃতির ঘোব দুর্বলতা, মনুষ্যজাতির উপর অভিশাপ স্বরূপ, সকল চুঃখের মূলস্বরূপ,—এই সৈমগ্য। ইহাই ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিধ বন্ধনের মূল।

‘সময় পশুন হি সর্বত্র সমবাস্তবীশ্বরং ॥

ন হিনস্ত্যাত্মনাঙ্গানং ততো যাতি পবাং গতিং ॥’

ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে হিংসা কবেন না, স্মৃতবাং পবম গতি লাভ কবেন। এই একটা শোকের দ্বারা, অল্প কথার মধ্যে মুক্তির সার্বভৌমিক উপায় বলা হইয়াছে।

বাকপুত আপনাবা প্রাচীন ভাবতের গৌববস্বরূপ। আপনাদেব অবনতি হইতে আবশ্য হইলই জাতীয় অবনতি আবশ্য হইল। আব ভাবত তাহা হইলই কেবল উঠিতে পারে, যদি ক্ষয়িষগণের বংশধরগণ ব্রাহ্মণের বংশধরগণের সহিত সমবেত চেষ্টায় বন্ধপবিকর হন, নুষ্ঠিত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ভাগ কবিয়া লইবার জন্ত নহে, অজ্ঞানগণকে জ্ঞানদানের জন্ত ও পূর্বপুরুষগণের পবিত্র বাসভূমির বিনষ্ট গৌবব পুনরুদ্ধারের জন্ত।

আব কে বলিতে পারে, ইহা শুভ মুহূর্ত্ত নহে? আবাব কালচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে, পুনরুদার ভাবত হইতে সেই শক্তিপ্রবাহ বাহির হইয়াছে, বাহা অনতিদীর্ঘকালমধ্যে নিঃশেষই জগতের চরম প্রান্তে পৌঁছিতে। এক বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, বাহার প্রতিধ্বনি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর শক্তিসংগ্রহ করিতেছে, আর এই বাণী ইহাব পূর্ববর্তী সকল বাণী হইতেই অধিক শক্তিশালী, কাবণ, উহা উহাব পূর্ববর্তী বাণীগুলির সমষ্টিস্বরূপ। যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, বাহার প্রতিধ্বনি নগরাজ হিমালয়েব চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্তের ভিতর দিয়া সমতল প্রদেশে নামিয়া দেশ প্রাবিত কবিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা আবাব উচ্চারিত

হইয়াছে । আবার দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে । সকলে আলোব বাজ্যে প্রবেশ কর—দ্বার আবার উন্মোচিত হইয়াছে ।

আর হে প্রেমাস্পদ মহাবাক, আপনি সেই জাতির বংশধর, যাহারা সনাতন ধর্মের জীবন্ত অবলম্বনশূন্যরূপ, ইহার অঙ্গীকারবদ্ধ রক্ষা ও সাহায্যকারী ; আপনিই কি ইহা হইতে দূরে থাকিবেন ? আমি জানি, তাহা কখন হইতে পাবে না । আমাব নিশ্চয় ধারণা, আপনাবই হস্ত আবার প্রথমেই ধর্মের সাহায্যার্থে প্রসারিত হইবে । আব যখনই হে রাজা অজিৎ সিং, আমি আপনাব সম্বন্ধে চিন্তা কবি, মীহাতে আপনাদের বংশের সর্বপরিচিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব সহিত এমন পবিত্র চবিত্রের ( যাহা থাকিলে একজন সাধুও গৌবব ব্রিত হইতে পাবেন ), এবং সর্ব মানবে অসীম প্রেমের ষোগ হইয়াছে, যখন এইরূপ ব্যক্তিগণ সনাতন ধর্ম পুনর্গঠন কবিতো ইচ্ছুক, তখন আমি উহাব মহাগৌববময় পুনরুদ্ধাবে বিশ্বাসী না হইয়া থাকিতে পারি না ।

চিবকালের জগ্গ আপনাব উপবে ও আপনাব স্বজনগণের উপব শ্রীবাম-কৃষ্ণের আশীষাদ বর্ষিত হউক আব আপনি পবেব হিত ও সত্যপ্রচারণের জগ্গ দীর্ঘকাল জীবিত থাকুন, ইহাই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা ।

## প্যালেস্টাইন ভ্রমণ ।

জেরুসালেম ।

[ শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত । ]

[ পূর্বপ্রকাশিতোব পব । ]

জেরুসালেম দুই অংশে বিভক্ত । প্রথমটা নূতন--ইহা নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে, ইহাব বাটীগুলি প্রস্তবনির্মিত, ছাদে লোহার কডি । বাটী গুলি প্রায় দ্বিতল, দুই একটা ত্রিতল । সব বাড়ীগুলিই ইউরোপীয় প্রণালীতে গঠিত । এই স্থানে অনেকগুলি ধর্মগণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন কবিয়াছে । পুবাণ সহবটা প্রাচীরেব তিতর । এই সহবটাতে প্রধানতঃ তিনটা দ্বাব আছে--প্রথম--জাফাদ্বার, ২য় ডামাস্কাস বা শ্রামদ্বার, তৃতীয় ট্রফেনদ্বার । বিষ্ঠাদ্বার নামক একটা দ্বাব আছে । ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, কেবল গবীব ইহুদীবাই এখানে বাস করিয়া থাকে ।

আর কয়েকটা পুরাতন দ্বার ছিল, তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জাফা দ্বার অতি উচ্চ, উহা প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা বাত্রে আবদ্ধ হয়। গেটগুলিতে সারী থাকে। নবাগত লোক হইলে কখন কখন সাদ্বীদিগকে pass-port (ছাড়পত্র) বা তজ্জাবা দেখাইতে হয়। এই দ্বারের নিকট অনেকগুলি আঙ্গুর, রুট, তামাক, নাপিতেব দোকান প্রভৃতি আছে। এই গেট পার হইয়া কিছুদূর গমন করিলে বাস্তা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। দক্ষিণ রাস্তাটা দাউদের দুর্গের ও অপরটা হারেমের দিকে গিয়াছে।

জেকসালেম ইহুদী, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদের তীর্থস্বরূপ। এই তিন সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক এই স্থান দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। আববদেশীয় ইহুদী বা খ্রীষ্টিয়ানেরা এখানে আসিলে আপনাদিগকে হাজি (পুৰাতন ইংবাজী Palmer) কহিয়া থাকে। অনেক সময় এখানে নামের পূর্বে হাজি শব্দ থাকায় ইহাবা ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান জানা বড় কঠিন। যদিও ইহুদীদিগকে দেখিলে শীঘ্রই বুঝিতে পাবা যায় কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান প্রভেদ করা স্মকঠিন। পবিত্রস্থান, আচাবব্যবহার ও অনেক সময় নাম একই বকয়েব। যথা— ফারিশ, আবদাল্লা, দাউদ, ঈশা, মুশা প্রভৃতি নাম খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান উভয়েই রাখে।

সম্ভবতঃ দাউদ বা ডেভিড এই সহর নির্মাণ করিয়া যান। অদ্যাপি দুর্গটা দাউদের নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সহরের সর্বোচ্চস্থানে এই দুর্গটা নির্মিত, উহাব নিম্নাংশ অতিশয় পুৰাতন ও দাউদের নির্মিত বলিয়া জনপ্রবাদ। সম্প্রতি ডুকিরা সাময়িক কিছু পবিত্তন করিয়াছে। তাহারা আপনাদের সিপাহীদিগকে এই স্থানে রাখে। দাউদের পুত্র সলিমান এই সহরে নানাপ্রকার অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া এই সহরটাকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। লিবানন পাহাডের জঙ্গল হইতে কাষ্ঠাদি আনিয়া ইনি মন্দির নির্মাণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ভাবতবর্ষ হইতে চন্দনকাষ্ঠ ও গন্ধাদি দ্রব্য সলিমানকে পাঠান হয়। সলিমানের বহুসংখ্যক নানাবর্ণাবলম্বিনী পত্নী ছিল। অত্র ধর্মাবলম্বিনী পত্নীগণের অনুবোধে তিনি অগ্ন্যাজ ধর্মসংক্রান্ত মন্দিরও অনেক করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময় ইহুদীবাস্ত্য অতিশয় বিস্তীর্ণ হয়। সলিমানের লোকান্তর গম-

নের পর তাঁহার অধোগা পুত্র পিতৃসিংহাসন অধিকার কবে, তাহাতে দেশে নানা প্রকার বিপ্লব হয় ও ড্যান হইতে বীৰশেবা পর্য্যন্ত রাজ্য ক্রমে ক্রীণবল হইয়া যায়। কতিপয় বৎসর পরে আলেকজাণ্ডার এই সহরে সসৈন্তে আসেন। সম্ভবতঃ তিনি জাফা গেট দিয়া সহবে প্রবেশ করেন ও মন্দির দর্শনে যান। ইহুদীরা নিতান্ত ভীত হইয়া দ্বার উদ্বাটিত করিয়া দেয় ও প্রধান রাজক বহুসংখ্যক অমুচর লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা কবেন। ড্যানিয়েলের পুস্তক হইতে এক অংশ পাঠ করিয়া, পুরোহিতেরা প্রমাণ করেন যে, আলেকজাণ্ডার ঈশ্বরপ্রেরিত।

আলেকজাণ্ডার নিতান্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। সেই সময় পারশ্বদেশের সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। আলেকজাণ্ডার ইসাস ও গ্রীনিকাস যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ডেবায়স পলাইয়া যান ও পূর্বদেশে আসিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলেকজাণ্ডারের সহিত আববেলায় লড়াইবার নিমিত্ত কৃতচেষ্টি হন। এই স্থান আধুনিক কানবেলাব নিকট। এই সময়ে আলেকজাণ্ডার ফিনিসীয় ( আধুনিক লিবার্ট ) রাজ্য আক্রমণ কবেন ও টায়র বা শুব নগর অববোধ কবেন। শুব শব্দ হইতে নেশেব নাম শুবীয় বা শিবিয়া হইয়াছে। শুব অববোধ কালে তিনি নিজ সেনাপতিকে তথায় রাখিয়া মিসর জয় করিতে যান ও মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জেরুসালেম নগরে আসেন।

### ( ইহুদী জাতির ইতিহাস । )

জেরুসালেম সহর দেখিলে ইহুদীদিগের পুর্বাতন ইতিহাস মনে উদয় হয়। ইহুদীরা অতি পুর্বাতন জাতি ও সিমাইট বা সেমিটিক বংশীয়। ভগবান জিশাব ৪২ পুরুষ পূর্বে ইব্রাহিম নিনিভা ( আধুনিক মোসেল ) নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তথায় নিমবড বা নামকদ নামক রাজা ছিলেন। নামকদ মূর্তিপূজা করিতেন। ইব্রাহিম পারশ্বদেশীয় ( Zoroaster ) জরতুষ্ট্র হইতে অনেক ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জরতুষ্ট্র মতানুযায়ী তিনি অগ্নিকে পূজা করিতে শিপেন ও দৈতবাদ অবলম্বন করেন। জরতুষ্ট্র মতে আঙ্গামান্ন ও সাপান্দামান্ন নামক দুইজন ভগবান আছেন, একজন শুভ ও অপবজন অণ্ডের বিধাতা। ইব্রাহিম এই মতের অনুকরণে জিহোভা ও শএ-তান নামক দুই দেবতার বিষয় প্রচার কবেন। জিহোভা স্রষ্টা ও শএ-তান অবি। এই নূতন ধর্ম অবলম্বন ও প্রচারের জন্ত নামকদ তাঁহাকে

দেশ হইতে বাহির করিয়া দেন। ইব্রাহিম স্বীয় পত্নী সারা ও দাসী হ্যাগারকে লইয়া উরুফা (মোসেল ও হালাবের বা বর্তমান আলিপোর মধ্যস্থান) নগরে উপস্থিত হন। উরুফা নগরে তাঁহাকে নানাপ্রকার নিৰ্য্যাতন করা হয়। অদ্যাপি এখানে ইব্রাহিমের নামের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট একটা মৎস্যপূর্ণ পুঙ্কল্পিণী আছে। লোকে এখানে তীর্থ করিতে যায়। কথিত আছে, কোন সময়ে এখানে এক মোল্লা বাস করিতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, ইব্রাহিম আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, মোল্লা তুমি এপুঙ্কল্পিণীর মৎস্য আৰু কেহ খাইতে পারিবেন না, খাইলে সবংশে নিৰ্ৰংশ হইবেন। তদবধি ইহা পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ইব্রাহিমের অশীতিবর্ষ বয়স হইলেও তিনি অপুঙ্কল্প ছিলেন। অবশেষে একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, জিব্রাইল (Gabriel) নামক দৈত্বরূত আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছেন, তুমি থিৎনা বা ত্বচ্ছদ কব; তাহা হইলে তোমার পুত্র হইবে। সাবা তখন রুজা হইয়াছিল। দাসী হ্যাগারের গর্ভে তাঁহার এক সন্তান হইল। তাহার নাম ইশ্মায়েল। ইশ্মায়েলের জন্ম হইলে সারা নিতান্ত হিংসাপরবশ হইল এবং হ্যাগার ও তাহার পুত্রকে কয়েকটা উট দিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহার পব জিহোভাদেবের বিশেষ রূপায় সাবার গর্ভে ইস্রায়েল নামে এক পুত্র হয়। ইব্রাহিমের এই দুই পুত্র হইতে দুই জাতি উৎপন্ন হয়। ইশ্মায়েলের বংশধরবো বেনি-ইশ্মায়েল (ইশ্মায়েল-সন্তান) বা আবব নামে পরিচিত। ইস্রায়েলের পুত্রগণ বেনি-ইশ্মায়েল বা ইহুদী। ইশ্মায়েল বড় হইলে যখন সে বিমাতা কর্তৃক পিতৃগৃহ হইতে দূরীকরণ প্রভৃতি সকল রক্তান্ত অবগত হইল, তখন সে ইস্রায়েলবংশীয়গণের প্রতিহিংসার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। (My hand shall be against men and men against me for ever and ever.)

যদিও সাধারণতঃ ইব্রাহিম নামই প্রসিদ্ধ, তথাপি প্রকৃতবান লোকেরা এনাম বলিতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হয়। তাহারা ইব্রাহিমকে খলিল রহমান বা দয়াময়সখ (দয়াময় ভগবান বাঁহার বন্ধু) বলিয়া থাকে। অদ্যাপিও বাহার নাম ইব্রাহিম রাখা হয়, তাহাকে অনেক সময় লোকে খলিল বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। ইব্রাহিম সপত্নীক উর্কী হইতে জেরুসালেমের নিকটবর্তী এক স্থানে আসিয়া বাস করেন। সেই স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয় ও তথায় তাঁহার সমাধিমন্দির আছে। এই স্থানের নাম খলিল রহমান।



মুসলমানদিগের প্রচলিত কোর্সান বা বাৎসবিক বলিদানপ্রথা ইব্রাহিম প্রথম প্রবর্তিত করিয়া যান। ইহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্রে একরূপ লিখিত আছে যে, ভগবান ইব্রাহিমের বিশ্বাস পরীক্ষা করিবাব নিমিত্ত তাঁহাকে বলেন যে, তিনি যদি নিজ পুত্র ইসাহাক বা ইসায়েলকে বলি দিতে পাবেন, তবে তিনি প্রীত হইবেন। ইব্রাহিম এই ভগবদ্বাক্যানুসারে যখন আপনাব পুত্রকে বন্ধন করিয়া প্রাপসংহাব করিতে উদ্যত হন, সেই সময় দেখেন যে, কয়েকটা রুক্কেব মধ্যে খুব বড় শৃঙ্গযুক্ত একটা মেঘ বহিয়াছে। ইব্রাহিম সেই মেঘটা লইয়া বলিদান করেন। তাহাতে তাঁহাব পুত্রের প্রাণরক্ষা হয়। মুসলমানধর্মের মতে তীর্থ হিসাবে মক্কা মেদিনাব পব জেকসালেমেব স্থান। মুসলমানধর্মাবলম্বীরা এখানে তীর্থ করিতে আসিয়া একটা বিশাল প্রস্তব দর্শন করে ও তাহাব নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই প্রস্তবকে আববী ভাষায় তক্ত বাকেল আলমীন (জগৎপতির সিংহাসন) বলিয়া থাকে। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবাদ এই, কেবামৎ বা শেষ দিনে ভগবান এই প্রস্তবের উপর বসিয়া জগদ্বাসী সকলের বিচার করিবেন ও সকলের যথাযোগ্য পুণ্যের বা দণ্ড দিবেন। এই জন্য ইহাবা এই প্রস্তবকে এত পবিত্র বলিয়া মানে। কিন্তু জেকসালেম বাস কালে ইব্রীয় (ইহুদী) ভাষাপাবদর্শী কয়েকটা পণ্ডিতেব একরূপ মত শুনা গেল যে, পূর্ককালে ইব্রাহিম স্বীয়পুত্র ইসাহাককে এই প্রস্তবেব উপর বলিদান করিতে গিয়াছিলেন। তদবধি ইহা অতি পবিত্র বলিয়া পবিগণিত।

ইব্রাহিমের কতিপয় পুরুষ পবে তাঁহার বংশে অনেক গুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে কোন পবিবাবে ইউসিফ (যোসেফ) ও বিন্নাবিন (বেঞ্জামিন) নামে দুইটা সহোদর ভ্রাতা ছিল। ইহাদেব দশজন বৈমাত্র ভ্রাতাও ছিল।

বিমাতাপুত্রোবা শিশু ইউসিফকে মিসবদেশীয় এক বণিকেরানকট বিক্রয় করে ও কপট বোদন করিতে করিতে বুদ্ধ পিতার নিকট আসিয়া কহে যে, ব্যাত্ত আসিয়া শিশুকে খাইয়া গিয়াছে। ইউসিফ মিসব দেশে গিয়া কন্দ্র করিতে লাগিল এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বিধায় বাজার প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমশঃ প্রধান মন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হইল। অদ্যাপি কাইবো নগবে ইউসিফেব নামে পবিচিত এক অদ্ভুত কূপ (বিব-ইউসিফ অর্থ্যাৎ ইউসিফের কূপ) আছে। তথায় পাহাডেব উপর যে একটা হুর্গ আছে, (এখন যেখানে ইংবাজসৈন্ত বাস করে,) তথায় উহা অবস্থিত। পাহাডেব উপর হইতে একটা সুউচ্চ ভিতর

দিয়া জুপের পেঁচেব জায় খনন কবিদা গাপ কবিঘাছে ও ৪২০ ফুটের নীচে  
জল ।

ক্রমশঃ ।

## সাবিত্রী ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

যে কাল ঘটায় হেন চিত্তেব প্রসাদ,  
হেবি ববতনুখানি, অতি প্রীতিভবে,  
সাজাইলা কচিব যৌবনভূষা দিয়া;  
সাজান যতনে যথা শচীব স্তম্ভ  
( অনন্তযৌবনা ধনী ) কল্পপরিমণী  
বিবিধ কুসুম বন্ধে ;—অথবা যেমতি  
উজলেন উপবন ঝড়ুকুলপতি ।  
পূর্ণিমার নিশাকালে সুধাকব যথা  
শোভে সুসগায় পূর্ণ,—যৌবন মিলনে  
সহজ সন্দেহ দেহ শোভিল তেমনি ।  
লাবণ্য নিখিল জলে বিশেষ মার্জিত  
কবি দিল তনুখানি, হেবে লোক তায  
নিজদেহ বিশ্বখানি দর্পণে যেমতি ।  
ববি শশী কব বিভা সে অঙ্গে ফলিয়া  
ঝলমলে, ক্ষুরে যেন তডিং অঙ্গি ।  
বর্মণীয় রূপখানি, নিমিষে নিমিষে  
নূতন মাধুরী ধবি, না দেয় ধবিতে  
হৃদয়ে, সে ছবি খানি কেমন প্রকার ।  
ক্ষবিত সত্যত অঙ্গে সৌবত সন্দর,  
( সুলক্ষণবতী কল্প ) বাস পেয়ে যার  
উড়ে কাছে কাছে অলি গুঞ্জরি মধুর ।  
কণ্ঠেব সুরান ব্রহ্ম জনমাব সদা,  
কুহবে কি পিকবব ? বাজিল কি বীণা ?

সুধীর মন্থন গতি পায় পায় তাব  
 ললিত লাবণ্য ছটা বিকীর্ণ চৌধাব ।  
 নীলপদ্ম ছটা অঁখি সহজ তবল  
 উজ্জ্বল কিরণ মাখা—অল্পমিত তায়  
 স্ফুটতঃ জ্ঞানেব জ্যোতি নিকলিছে যেন ।  
 ক্র-দুখানি চিত্রে লেখা ফুলধন্য হেন ।  
 ললাট অপূর্ণ ইন্দু উজ্জ্বল বিকাশ,  
 দ্ব্যতিমান্ বরে যেন হয়েছ গঠিত,  
 মডঙ্গ বৈতন ভোগ করিছে স্ফুটিত ।  
 গঞ্জি খগচক্ষু নাশা , অধব পল্লব  
 বজ্রিম, তবল অতি, চিরণ সন্দব ।  
 দন্ত বুদ্ধল গুলি, মুকুতাব মত  
 বালমলে, সুরঞ্জিত প্রশান্ত কপোল ।  
 গ্রীবা স্বেতকম্বু যথা , মৃণালগঠিত  
 ভুজযুগ, অঙ্গুলি চম্পক কলি চাক ।  
 সুধাংশুব অংশু লয়ে, দিয়াছে বজ্রিয়া  
 নখগুলি অর্দ্ধাকৃতি । স্ফটিকবচিত  
 সন্দব বেদিকা হেন পৃষ্ঠ সুবিস্তৃত ।  
 আলুখালু পড়িয়াছে চাবিপাশে তাব,  
 কুঙ্কিত স্নকেশগুচ্ছ কৃষ্ণ ঘনতব  
 পবশি নিতম্ব দেশ, কাল মেঘে যেন  
 ঢেকেছে নির্মল নভঃ । স্বচ্ছ সর্বোবব  
 পীন বক্ষ, সুরেশল উন্নত উবজ ।  
 ডম্বকব মাঝা জিনি ক্ষীণ কাটদেশ  
 মুষ্টিগ্রহ অনায়াসে । কদলী নির্দিষা  
 গুরু উক । অসামান্য সে রূপ বিকাশ !  
 এরূপ সেকপ নহে উদীপিত যাহে  
 কামক্ষুধা নবহৃদে—এরূপ দর্শনে  
 জাগায় সন্তম মনে—জ্ঞান হয় তায়,  
 স্বর্গ তাজি দেবী কোন্ ভূতলে উদয় !!

ক্রমশঃ ।

## উপনিষদের গম্প।

উপনিষদে যে সকল উপাখ্যান আছে, তাহা আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করিলে তাহা দ্বাৰা অনেকের উপকাৰেব সম্ভাবনা। উহাতে যেমন নানা উপদেশ নিহিত, তদ্রূপ উহা দ্বাৰা অনেক প্রাচীন আচাৰ ব্যবহাৰ জানিতে পাৰা যায়। আৰও ঐ সকল গল্প পাঠ করিলে মূল উপনিষদ্ পাঠেও অনেকের কৌতূহল হইতে পাবে, এই সকল বিবেচনা করিয়া আমবা উপনিষদের প্রধান প্রধান গল্প গুলি প্রকাশ কবিত্তে আরম্ভ কৰিলাম।

### দেবগণের ব্রহ্মদৰ্শন।

কেনোপনিষদে এই উপাখ্যান আছে। ব্রহ্ম দেবতাদেব হইয়া যুদ্ধে জয় লাভ কৰিলেন। আমবা যে কোন উচ্চকাৰ্য্য কবিত্তে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা যেমন বাস্তবিক ব্রহ্মশক্তিবেলে হইলেও তাহা নিজেতে আবোপিত করিয়া অভিমানে ক্ষীত হইয়া থাকি, দেবগণেবও ঠিক সেই দশা হইল। দেবগণও ব্রহ্মকে ভুলিলেন, ভুলিয়া আপনাবাই অভিমান কবিত্তে লাগিলেন, আমাদেবই কৃত এ বিজয়, আমাদেবই এ মহিমা। বাস্তবিক কি সকল জাতিব জীবনেও এই ব্যাপাব ঘটে না? মহাশক্তিব রূপাব তাঁবই শক্তিবলে এক জাতি জগতেব শীষস্থান অধিকাব কবে। কিন্তু যখন সে বিজয়লক্ষী ও ধন ধাত্ত সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই বিজয়লক্ষী কোথা হইতে আসিল, তাহা ভুলিয়া আপনিই আপনাব গোববে ক্ষীত হইয়া অপবকে আপনাব গোবব, আপনাব মাহাত্ম্য দেখাইতে যায়। তখনই সেই জাতিব পতনেব সূচনা হয়।

দেবগণেব প্রতি তাহাব বিশেষ রূপ। তাই তিনি তাহাদেব এই অভিমান জানিতে পাৰিয়া তাহাদেব নিকট নিজ যোগমাহাত্ম্যানিৰ্ম্মিত অত্যন্ত বিস্ময়জনক রূপে প্রাক্তভূত হইলেন। দেবগণ তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও পূজা বলিয়া দিব কৰিলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহা সবিশেষ জানিতে পারিলেন না।

তখন তাহাবা অগ্নিদেবকে বলিলেন, জাতবেদঃ, এই পূজনীয় স্বরূপ কে, আপনি জানিয়া আসুন। অগ্নি তাহাব নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি

অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি উত্তর দিলেন, ‘আমি অগ্নি, আমি জ্ঞাতবেদা।’ ‘আচ্ছা তোমার কি শক্তি আছে?’ ‘আমি সব দক্ষ করিতে পারি—এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সবই মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করিতে পারি।’ ‘এই তুণগাছটা দক্ষ কব দেখি।’ হায়, হায়, অগ্নে, কাহার সম্মুখে অভিমান করিতেছ? অভিমানভাবে বুঝিতেছ না, যাহাব এককণা শক্তি পাইয়া তোমাব এই অগ্নিস্থ, তাহার ইচ্ছায় কোটি কোটি অগ্নির সৃজন হইতে পারে। অগ্নির যত শক্তি, সব সেই তুণদাহে নিষোজিত হইয়া বিফল হইল, তখন তিনি মানে মানে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেবগণকে নিবেদন করিলেন, জানিতে পারিলাম না, পুঞ্জীয স্বরূপ ইনি কে?

তখন তাহার বায়ুকে প্রেরণ করিলেন। বায়ুকেও সেই প্রশ্ন গভীরভাবে জিজ্ঞাসিত হইল। বায়ুও অগ্নির গ্রায নিজে বড়াই করিয়া বলিলেন, ‘আমি বায়ু, আমি মাতবিশ্ব।’ ‘আচ্ছা তোমাব কি শক্তি আছে?’ ‘আমি ইচ্ছা করিলে জগতের সব জিনিষ একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি।’ তাহাকেও সেই তুণ প্রদত্ত হইল। তিনি অনেক চেষ্টাযও তাহাকে তাহার স্থান হইতে এক বিন্দুও বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন স্ফোটমন্তকে দেবগণের নিকট ফিবিয়া আসিয়া তিনিও আপনাব অক্ষমতা জানাইলেন।

এইবাব দেবদেব ইন্দ্র প্রেরিত হইলেন। কিন্তু একি অদৃত পদবর্ত্তন। কোথায় সেই জ্যোতিস্ময়? এ যে বহুশোভমানা হৈমবতী উষাদেবী আকাশে আবির্ভূতা। ইন্দ্র ভক্তিতবে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, মা, যিনি এইমাত্র ছিলেন, বিহ্ব্যতের মত প্রকাশ হইয়া ক্ষণপবেই লুকাইলেন, তিনি কে? তখন জগজ্জননী গভীরস্ববে কর্হলেন, ‘স্বয়ং ব্রহ্ম তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমরা ইহা হইয়া শক্তিতে যুদ্ধে জয় করিয়াছ। এক্ষণে তোমরা উহাকেই তোমাদের সর্ব-বিজয়ের মূলীভূত কাবণ জানিয়া অভিমানশূন্য হও।’

হায়, হায়, কবে ব্রহ্ম আমাদের ঘাড় ধরিয়া এইরূপে অভিমানশূন্য হইতে শিখাইবেন? কবে আমাদের এই এক ছটাকেব আমি অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া আশুহারা হইয়া থাকিব? যখন ভাবি, তখন ত হাসি পায়। হান ববেদা তান কবেদা। তুই কে বে,

তা কববি ? যে করবার, সে ত কছে । তুই কেবল আপনাকে চিনে নে । হে অনন্ত আকাশেব অনন্ত বাণী, নিত্য গভীরস্বরে তুমি বল, ‘আমি আছি,’ ‘আমি আছি’। ভুলে যাই দেহ, ভুলে যাই মন—ভুলে যাই সংসার, ভুলে যাই কর্ম—প্রেমে মাতোয়াবা হবে তোমার নাম গেয়ে বেড়াই । নাহং নাহং তুঁহ তুঁহ । মুক্তি হবে কবে, আমি যাবে যবে । এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কাব, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল ।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী সাবদানন্দ বিগত ১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রেল তারিখে চাংড়ি-পোতা গ্রামে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়-গ্রাহণী হইয়াছিল।

ঐ তারিখেই সিটাব নিবেদিতা ক্লাসিক থিয়েটারে অগণ্য শ্রোতার সমক্ষে ‘বুদ্ধগয়া ও হিন্দুধর্মে উহাব স্থান’ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন।

বিগত ৩রা এপ্রেল তারিখে নিম্নতা হিতকরী সভার প্রথম সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। হিন্দুধর্মের চর্চা ও সাধারণের হিতানুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য। স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ সভা কর্তৃক আহ্বৃত হইয়া ‘আমাদের কর্তব্য কি’ এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, “কোন মহাপুরুষকে একবার জনৈক জিজ্ঞাসু ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের কর্তব্য কি? সেই মহাপুরুষ তাহার গুরুদেবের প্রতিমূর্তি দেখাইয়া বলেন, ইঁহাকে পূজা করুন। প্রথমতঃ এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল, এ ভদ্রানক গোঁড়ামি। কিন্তু যতই জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেখিতেছি, এ কথাই ভিতর কত অর্থ আছে। ইহাব তাৎপর্য্য এই, কোন উন্নত মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাম্পন্ন

হইলেই আমাদের জীবনের সমুদয় কার্য্য বুঝিবাব ও সেই সমুদয় স্রষ্টাক  
রূপে নির্বাহ করিবার শক্তি আসে। জীবন্ত মহাপুরুষ অভাবে আমা-  
দের কর্তব্য-নির্দেশক শাস্ত্র। শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত,—শ্রুতি ও স্মৃতি।  
শ্রুতিতে আশ্রাব সহিত পবমান্রাব সম্বন্ধ এবং সার্বভৌমিক সত্য সক-  
লের উপদেশ আছে। স্মৃতিতে সেই সকল উপদেশ বিভিন্নযুগে, বিভিন্ন  
দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই  
স্মৃতির আলোকে আমরা জানিতে পাবি, এই কলিযুগে দানই একমাত্র  
তপস্যা (মুখ)। দান চতুর্বিধ—অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান ও জ্ঞান-  
দান। এই সকল দানের জগাই কঠোর স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। জ্ঞান  
লাভেব জন্ত বালক নচিকেতাব কঠোর স্বার্থত্যাগেব কথা জ্ঞানন্ত ভাষ্য  
বর্ণনা করিয়া বলিলেন, দেশেব উন্নতিবিধান কবিতে হইলে যুবকবৃন্দকে  
এই নিঃস্বার্থ ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। জগন্নাভাব নিকট আপনা-  
দিগকে দেশেব জন্ত বলি দিতে হইবে। মানুষ চাই। মানুষ না হইলে  
কোন কার্য্যই স্থায়ী হইবে না। টাকায় মানুষ কবে না, মানুষই টাকা  
উপার্জন কবে। দেশের উন্নতিব জন্ত তিনটা জিনিষেব প্রয়োজন,—  
দেশেব দুববস্থা প্রাণে প্রাণে অনুভব কবা, ইহাব প্রতীকাবেব কোন  
উপায় আবিষ্কার এবং উপায় আবিষ্কৃত হইলে—তাহাতে সকল বাধা  
তুচ্ছ করিয়া অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া লাগিষা থাকা।

মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সিব অন্তর্গত চিদম্বরমে একটা ‘বিবেকানন্দ সমিতি’  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য—সনাতন হিন্দুধর্ম্মেব আলোচনা। সভাপতি  
টি, এন, দেশিকাচার্য্য ও সম্পাদক—সদাশিব আশ্রাব।

নিউইয়র্ক হইতে কোন সংবাদদাতা বিগত ২৭শে নবেম্বর তাবিখে  
লিখিতেছেন,—

স্বামী অভেদানন্দ ইউরোপে পাঁচমাস ভ্রমণেব পব এখানে প্রত্যাবর্ত্ত  
হইয়াছেন এবং নুতন উৎসাহে বেদান্ত প্রচাব কবিতেছেন। তাহাব  
প্রচাবফলে এখানকাব বেদান্তসমিতিব খুব উন্নতি হইয়াছে। উহাব  
আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা মজ্জল,—সভাসংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়ি-  
য়াছে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেকে কার্য্যে ইহাব প্রতি সহানুভূতি দেখা-

তেছেন। তাঁহার বেদান্ত প্রচারে সাধারণ লোকের ভিতর এত উদার ভাব প্রবেশ করিয়াছে যে, চর্কের পুরোহিতগণ গোড়া হইলেও তাঁহা-  
দেব শ্রোতৃবৃন্দেব মনোবঞ্জন ও চাঁদা সংগ্রহেব জন্ত তাঁহাদেব একটু স্বর  
ফিরাইয়াছেন। তাঁহার ববিবাসবীয় বক্তৃতায়ও খুব লোক সমাগম হই-  
তেছে। নবেম্বর ও ডিসেম্ববে (১৯০৩) তাঁহার বক্তৃতার তালিকা এই—

নবেম্বর।

১। বেদান্তে ঈশ্বরবাদ—ভক্তিযোগ।

২। ভক্তি ও প্রেম।

৩। কৃষ্ণ (খৃষ্টিয়ানেব নিকট খৃষ্ট যেমন, হিন্দুব নিকট কৃষ্ণ তেমন)

ও তাঁহার উপদেশ।

৪। ভাবতে কৃষ্ণপূজা।

৫। বুদ্ধ উপাসনা।

ডিসেম্বর।

১। তিব্বতীয় লামাধর্ম।

২। বুদ্ধদেবেব উপদেশ ও বেদান্ত।

৩। হিন্দু ও খৃষ্টিয়ানগণেব মধ্যে প্রতিমাপূজা।

৪। খৃষ্টোপাসনা ও খৃষ্টম্যাস।

স্বামী নির্মলানন্দ বিগত বুধবাতে এখানে আগমন কবিয়াছেন। এখান-  
কার সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি কবিতোছে এবং সকলেবই হিরিবিশ্বাস,  
তিনি এখানে বেদান্তপ্রচারে কৃতকার্য হইবেন।

বিগত ৩রা এপ্রেল এঁটালি আনন্দ কাননে এঁটালি বামকুমার মিশনের  
সভ্যগণ কর্তৃক শ্রীবামকুমারসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ভক্তেব সমাগম  
হইয়াছিল। কীর্তন, প্রসাদ বিতরণাদি হইয়াছিল। মিশনেব সভ্যগণের  
সাদব সম্ভাষণে ও অভ্যর্থনায় সকলেই বিশেষ তৃপ্তিলাভ কবেন।

নিবেদন।

উদ্বোধন পাঠকগণেব নিকট আজ আমাদের একটা নিবেদন আছে।  
উদ্বোধনপাঠকগণের মধ্যে অনেকেব বোধ হ'ল, শ্রীবামকুমারেব অথবা



স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ এবং অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ে কথোপকথন হইয়া থাকিবে। এই সকল কথোপকথন এখন হইতেই লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে তাহা দ্বাৰা সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সাক্ষাদর্শী ব্যক্তিগণেব সাক্ষ্যে ইহাদের জীবনীব এমন অকাট্য উপাদানের সংগ্রহ হইবে, যাহাতে ইহাদের ভাবী ইতিবৃত্তলেখকেবও বিশেষ সাহায্য হইতে পাবে। অতএব তাঁহারা উক্ত দুই মহাপুরুষের মধ্যে কাহাবও সঙ্গরূপ সৌভাগ্যলাভেব অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা দয়া কৰিয়া তাঁহাদের স্মৃতি অথবা ডায়েৰী হইতে এই অমূল্য কথোপকথন লিখিয়া পাঠাইবেন। ইহাতে লিপিনৈপুণ্যেব বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। চিত্ৰেব খসড়া অঙ্কিত হইলে মসলা বার্ষিকশেব জ্ঞাত আটকাইবে না।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

বেলুডমঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংবাদ পাইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের নাম লইয়া অনেক ব্যক্তি নানাস্থানে সাধারণকে শ্রদ্ধাবণা করিয়া নিজ স্বার্থসিক্তির জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছে। তিনি বিশেষ বিশ্বস্ত হৃদে অবগত হইয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত কাশী রামকৃষ্ণ সেবাস্রমের (Ramkrishna Home of Service) নাম লইয়া জনৈক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ কৰিতেছে ও সেই অর্থ সেবাস্রমের কার্যে ব্যবহাব না কৰিয়া তদ্দ্বাৰা নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিক্তি কৰিতেছে। এই কারণে তিনি বেলুডমঠেব ট্রাষ্টিগণেব সহিত পৰামর্শ কৰিয়া সাধাবণেব বিশেষ অবগতির জন্য ঘোষণা কৰিতেছেন যে, যদি কোন ধর্মপ্রচারক বা সাধাবণের হিতার্থ কোন শুভ কৰ্ম্মেব অনুষ্ঠান, তিনি সন্ন্যাসীই হউন বা গৃহীই হউন, রামকৃষ্ণ মিশনের শিলমোহব ও বেলুডমঠেব গোপনীয় শিলমোহবযুক্ত, বেলুডমঠের প্রেসিডেন্টেব স্বাক্ষরিত পত্র না দেখাইতে পাবেন, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁহাব সহিত রামকৃষ্ণ মিশনেব কোন সংস্রব নাই এবং তাঁহাব উপব উক্ত মিশনের জ্ঞাত কোন রূপ অর্থ বা টান্দা সংগ্রহেব ভার নাই।

## স্বামীজির কথা ।

( শ্রীহরিদাস মিত্র লিখিত । )

স্বামীজির সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হব। প্রথম আমে-  
বিকা ঘাইবার পূর্বে। সেবারকার দেখাব কথা অনেকটা আপনাদেব  
বলিয়াছি। উহাতে আমার সহিত শোলাপুবে সাক্ষাৎ হয়, লেখা হই-  
যাছে, কিন্তু সেটা ছাপাব ভুল ; বেলগামে আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।  
দ্বিতীয়, যখন তিনি দ্বিতীয়াব বিলাত এবং আমেবিকা যাত্রা করেন,  
তাহাব কিছু পূর্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয়, তাহাব দেহত্যাগেব  
ছয় সাত মাস পূর্বে। এই ক্ষয়বাবে তাহাব নিকট যাহা কিছু শিক্ষা  
করিয়াছিলাম, তাহাব আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। অনেক কথা  
আমাব নিজের সন্ধর্কে বলিয়া বলিবাব নহে, আবার অনেক কথা  
ভুলিয়াও গিয়াছি। যাহা মনে আছে, তাহাব ভিতর সাধারণ পাঠকের  
উপযোগী বিষয়গুলি জানাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিবিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতিবিচার  
সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়েব ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া  
যে বক্তৃতাগুলি মাস্ত্রাজে করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে  
করিয়াছিলাম, স্বামীজিব ভাষাটা একটু বেশি কড়া হইয়াছে। তাহার  
নিকট সে কথা প্রকাশও করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন—“যাহা কিছু  
বলিয়াছি, সমস্ত সত্য। আব ঈশ্বাদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাষা ব্যবহার করি-  
য়াছি, তাহাদের কার্যের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্রও অধিক কড়া নহে।  
সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করাব আমার তো কোন কারণ দেখি  
না, তবে ঐরূপ কার্যেব ঐরূপ সমালোচনা করিয়াছি বলিয়া  
মনে কবিও না যে, তাহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে অথবা  
কেহ কেহ যেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি, তাহার  
জন্ত এখন আমি হুঃখিত। ও কথার একটাও সত্য নহে। আমি রাগি-  
য়াও ঐ কাজ কবি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও হুঃখিত নহি। এখনও  
যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কার্য্য কবা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা  
হইলে এখনও ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে উহা নিশ্চয় কবি।”

ভুও সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার নতুনত পূর্ববারে কিছু বলিয়াছি। আর একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উঠায় বলিলেন, “অবশ্য অনেক বর্দমানের লোক ওঘাটমন্ডের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম করিয়া লুকাইবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশ করিয়া বেড়াইয়া সত্য ; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কব, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত দ্বিগুণা-ভীত হওয়া চাই। সে পেট ভরিয়া ভাল খাইলে দোষ, দিছানায শুইলে দোষ, এমন কি, জুতা বা ছাতি পরায়া তাহার ব্যবহার কবায় যো নাই। কেন, তাবাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পননহংস না হলে তাহার আব গেকয়া বদ পবিবার অধিকার নেই। ইহাও ভুল। এক সময়ে আমার একটা সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাহার ভাল পোষাকের উপর ভাবি য়োক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোব বিলম্বী মনে কবিলে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।”

স্বামীজি বলিলেন, “দেশ, কাল, পাত্র ভেদে মানসিকতার ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও তক্রপ। প্রত্যেক মানুষেরই অপার একটা না একটা বিষয়ে বেশি ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতে সকলেই আপনাকে বেশি বুদ্ধিমান মনে কবে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অস্ত্রে বুঝ না, ইহাতেই যত গড়গোল উপস্থিত হয়। সকলেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তাহারই মত দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝেছে বা জেনেছে, সেটা ছাড়া আর কোন সত্য থাকতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হউক, ওরূপ ভাব কোন মতে মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়।”

জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের নীতি এবং মৌল্য্য নোঙও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বত দেশের এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকা প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয় ভ্রমণ কালে তাহার ঐরূপ একটা তিব্বতীয় পবিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পবিবাবে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একমাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পবিচয়ের গাঢ়তা জন্মিলে স্বামীজি একদিন তাহাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে জ্ঞানায় তাহারা বিবর্ত হইয়া বলিয়াছিল, “তুমি সাধু, সন্ন্যাসী হইবা নোকেই স্বার্থপরতা শিখাইতে চাহিতেছ ?

‘এটা আমারই উপভোগ্য, অল্পেব নয়’ একপ ভাব কি অজ্ঞান নহে?’  
স্বামীজি গুনিয়া অবাক্।

নাসিকা এবং পাষেব ধর্ষতা লইয়াই চীনেব সৌন্দর্য্য বিচার, একথা সকলেরই জানা আছে। আহাবাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংবাজ আমাদের মত সুবাসিত চাউলেব অন্ন ভাল বাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজ সাহেবেব অল্প বদলি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল মোক্তার, তাহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েক সেব সুবাসিত চাউল ছিল। জজ সাহেব সুবাসিত চাউলেব ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে কবেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, তোমাদের পচা চাউল গুলো আমাকে উপঢৌকন দেওয়া ভাল হয় নাই। (You ought not to have given me rotten rice.)

কোন এক সময়ে টুেনে যাইতেছিলাম, সেই কামবায় ৪৫টা সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, সুবাসিত শুড়ুক তামাক জসপূর্ণ ছাঁকায় ব্যবহার কবাই তামাক সেবেনেব শ্রেষ্ঠ উপভোগ। আমার নিকট খুণ ভাণ্ড তামাক ছিল, তাহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাহারা আশ্চর্য্য লইয়াই বলিল, ‘এ ত অতি দুর্গন্ধ! ইহাকে তুনি স্নগন্ধ বল?’ এইরূপে গন্ধ আবাদ সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।

কোন সময়ে শাকাব কণা আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কোন পাত্ত পক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে বধ করিব, এই জন্ত প্রাণ ছট্ ফট্ করিত। বধ করিতে না পানিলে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। এখন ওরূপে প্রাণ-বধ একেবারেই ভাল লাগে না। কোন জিনিষটা ভাণ লাগা বা মদ লাগা কেবল অভ্যাসেব কাজ।

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জেদ দেখা যায়। ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে আমার উহাও বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজি এ সম্বন্ধে একটা গল্প বলিতেন। এক সময়ে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়াও জন্ত অল্প এক রাজ্য সদলবলে উপস্থিত হইল। কামেই, শত্রুর হাত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওবা যায় স্থির করিবার জন্ত সেই রাজ্যে এক মহা সভা আহূত হইল। সভায় ইঞ্জিনীয়ার, সূত্রধর, চর্ম্মকার, কৰ্ম্মকার, উকিল, পুরো-হিত প্রভৃতি সভাসদগণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিনীয়ার বলিলেন, মহারাজ

চারিদিকে বেড়া দিবে এক বৃহৎ খাল খনন কর। হৃৎকর বলিল, কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক। চামাব বলিল, চামড়ার মত মজবুত কিছুই নাই; চামড়ার বেড়া দাও। কামাব বলিল, ও সব কাষের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল; ভেদ কবে গুলি গোলা আসতে পারবে না। উকিল বলিলেন, কিছুই কবিবাব দরকাব নেই; ‘আমাদের বাজ্য লইবার শত্রুদের কোন অধিকাব নাই’, এই কথাটি, তাহাদের তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাউক। পুরোহিত বলিলেন, তোমরা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ। হোম, যাগ কর, সন্তোষন কর, তুলসী দাও, শত্রুবা কিছুই কবিতে পারিবে না। এইরূপে বাজ্য বাচাবার কোন উপায় স্থির না কবিয়া তাহাবা নিজ নিজ মত লইয়া মহা হলস্থল তর্ক আবল্ল করিল। এই বকম কবাই মানুষেব স্বভাব।

এই গল্পটা শুনিয়া আমাবও মানুষেব মনেব একঘেষে ঝাঁকসম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়িল। স্বামীজিকে বলিলাম, স্বামীজি, আমি ছেলে বেলায় পাগলের সহিত আলাপ কবিতে ভাবি ভাল বাসিতাম। একদিন একটা পাগল দেখিলাম, বেশ বুদ্ধিমান, ইংবাজীও একটু আধটু জানে; তাব চাই কেবল জল খাওয়া। সঙ্গে একটা ভাঙ্গা ঘটা। যেখানে জল পায়, খাল হউক, হোউজ হউক, নুতন একটা জলেব জাবগা দেখলেই সেখানকাব জল পান কবত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কাবণ জিজ্ঞাসায় বলিল, ‘Nothing like water sir’ (জলের মত কোন জিনিষই নাই, মশাই!) তাহাকে আমি একটা ভাল ঘটা দিবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবিলাম, সে উহা কোন মতে লইল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিল, এটি ভাঙ্গা ঘটা বলিয়াই এতদিন আছে। ভাল হইলে অগ্রে চুবি কবিয়া লইত। স্বামীজি গল্প শুনিয়া বলিলেন, “সে ত বেশ মজাব পাগল। ওদের Monomaniac বলে। আমাদের সকলেবই ঐ বকম এক একটা বোক আছে। আমাদের সেটা চেপে বাখাব ক্ষমতা আছে। পাগলের তা নাই। পাগলের সহিত আমাদের এই টুকু মাত্র প্রভেদ। বোগে, শোকে, অহঙ্কাবে, কামে, ক্রোধে, হিংসায় বা অগ্ন কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ জর্রল হয়ে ঐ সংযম টুকু হাবালেই মুক্তি। মনের আবেগ আব চাপ্তে পাবে না। আমরা তখন বলি, ও ব্যাটা গেপেছে। এই আব কি।”

স্বামীজির স্বদেশাহরণ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এক দিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপন আপন দেশের প্রতি অহুরণ নিত্যকর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন কবিয়া সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তবে স্বামীজি যে জলন্ত কথাগুলি বলেন, তাহা কখন জন্মেও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন,—“যে আপনাব মাকে ভাত দেয় না, সে অন্নের মাকে আবার কি পুষ্কবে?” আমাদের প্রচলিত ধর্ম, আচার ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজি এ কথা স্বীকার করিতেন। বলিতেন, “সে সকল সংশোধন করিবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য, কিন্তু তা বলিয়া সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে সকল ঘোষণা করবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাহিরে যে দেখায়, তাব মত গর্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street.” (মবলা কাপড় চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখেব সামনে রাখাটা উচিত নয়।)

বৃষ্টান মিশনবীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁহারা আমাদের দেশে, কত উপকাব করেছেন ও করছেন, প্রদক্ষক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনিয়া তিনি বলিলেন, “কিন্তু অপকাবও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোলাব দেবার গিলক্ষণ ঘোগাড় কবেছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে মহুশ্যদেরও নাশ হয়। এ কথা কেউ কি বোঝে? আমাদের দেব দেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাঁহাদের নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আব এক কথা, যিনি যে ধর্মমত প্রচাব কব্বে চান, তাঁর তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কাষ করা চাই। অধিকাংশ মিশনবী মুখে এক, কাষে আর। আমি কপটতার উপর ভাবি চটা।”

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম যত দূর মনে আছে, এইখানে লিখিলাম,—

“সকল প্রাণীই সত্য সত্যী হইবাব চেষ্টায় বিব্রত। কিন্তু খুব কম লোকেই সত্যী। কাষ কর্ম্মও সকলে অনববত করিতেছে, কিন্তু তাহার অভিলষিত ফল পাওয়া প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপন্নীত ফল পাই-

বার কারণ কি, তাহাও সকলে বুঝিবার চেষ্টা কবে না। সেই জন্তই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম সম্বন্ধে মেরুপ বিশ্বাস হউক না কেন, কেহ যদি ঐ বিশ্বাসবলে আপনাকে যথার্থ স্মৃতি বলিয়া অনুভব কবে, তাহা হইলে তাহাব ঐ মত পবিত্রকন কবিবাব চেষ্টা কবা কাহানও উচিত নহে, এবং কবিলেও তাহাতে স্কল ফলে না। তবে, মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে, কাহানও ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনিবাব বাস্তবিক আগ্রহ আছে, তখনই জানিবে যে, তাহাব কোন একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই।

“ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে স্মৃতি কবা। পবিত্র স্মৃতি হইব বলিয়া ইহ জন্মে দুঃখ ভোগ কবাও বুদ্ধিমানের কাষ নহে। এই জন্মে, এই মুহূর্ত্ত হইতেই স্মৃতি হইতে হইবে। যে ধর্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহাব সহিত অবশ্যস্বাভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অন্ধারী ও পশুপ্রকৃতির লোকে-রায় ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে কবিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কবিয়া চিরকাল সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিন্ত ও স্মৃতি থাকিতে পাবে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু অজ্ঞ ও পর্যাপ্ত একপ লোক দেখা যায় নাই। সচবাচ্য ইহাই দেখা যায়, সে, যাহারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে কবে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান, বিলাসী লোকদের অধিক স্মৃতি মনে কবিয়া ঘেম কবিয়া থাকে এবং তাহাদের বহুব্যয়মাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্ত লালসিত হইয়া অস্মৃতি হইয়া থাকে। সম্রাট আলেকজান্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে আব জব কবিবাব দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই জন্ত বুদ্ধিমান মনীষীরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া ভোগ বিচাব কবিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্ম যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ স্মৃতি হইতে পাবে।

“বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই জন্ত তাহাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যিক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সম্ভাব্যপ্রদ হইবে না—কিছুতেই তাহারা উহার অনুষ্ঠান কবিয়া যথার্থ স্মৃতি হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত, তাহাদের নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়

নাই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরুপদেশ, সাধুনর্শন, সংস্কৃতির সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে যাত্র।

“কর্ম সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন না কোন প্রকার কর্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না এবং কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে একপাশে কোন কর্মই নাই। ভালটা কবিত্তে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করিতেই হইবে। আব সেজন্ত কর্ম ছাড়া যেমন স্থখ আসিবে, কিছু না কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসিবেই আসিবে; উহা অবশ্যজ্ঞাবী। সে দুঃখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত স্থখ লাভের আশাটাও ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-স্থখ অন্বেষণ না করিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য্য করিয়া থাকিতে হইবে। উহারই নাম নিষ্কাম কর্ম। গীতাতে ভগবান্ অর্জুনকে উহারই উপদেশ কবিরাব জন্ত বলিতেছেন, ‘কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্তই কাজ কর।’

কোন বিষয়ের ইতিহাসটা যে কতদূর ঠিক ঠিক লেখা হয়, সে বিষয়ে আমার বড়ই সন্দেহ। তাহার কারণ অনেক। গবর্ণর জেনারেল সাহেবের কোন সহবে পদার্পণ হইতে সেই সহব তাগ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা যতদূর সম্ভব স্বচক্ষে দেখার এবং পবে তাহারই বিবরণ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র সকলে পাঠ কবাব আমাদের মত চাকুরে লোকের অনেক সুবিধা। সচরাচর আমাদের দৃষ্ট ঘটনাবলির সত্তি ঐ সকল বিবরণের এত বিভিন্নতা দেখা যায় যে, অবাক হইতে হয়। চালিদিন পূর্বে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহাই যথার্থ লিপিবদ্ধ করা যদি এত কঠিন হয়, তাহা হইলে চারি শত, চারি সহস্র বা চারি লক্ষ বৎসর পূর্বে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহার ইতিহাস কতদূর যথার্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতেই পার যায়।

আব এক কথা, খৃষ্টান মিশনারীদের মধ্যে অনেকে বলেন, তাহাদের বাইবেলের প্রত্যেক ঘটনাস্তি যে সালে, যে তারিখে, যে বর্ষায় এবং যে মিনিটে ঘটয়াছিল, তাহা একেবারে ষড়্ধি ধরিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু একদিকে Conflict between religion and Science প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তকে বাইবেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদেরই দেশের এধনকার পণ্ডিতদের মতামত পাঠ কবিরাব বাইবেলের ঐতিহাসিক একদিকে যেমন বেশ বুঝা যায়, সেইরূপ অত্ৰদিকে মিসনরীদের দ্বারা অন্তর্বাদিত হিন্দুধর্ম শাস্ত্র সকলের অপূর্ণ



বিবরণ পাঠ করিয়া তাঁহাদেব লিখিত ইতিহাসও যে কতদূর ঠিক হইবে, তাহাও বুঝিতে বাকি থাকে না। এই সকল দেখিবা জনিষা মানবজাতির সত্য-স্বরূপ এবং ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর হরিভক্তি প্রায় একেবারে উড়িয়া যায়।

গীতা বাইবেল কোবাণ পুবাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ নিবদ্ধ ঘটনা-বলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে সেজন্য আমাব আদৌ বিশ্বাস হইত না। স্বামীজিকে একদিন জিজ্ঞাসা কবি যে, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধেব অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম উপদেশ, যাহা ভগবান্গীতাব লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি না ? উত্তবে তিনি যাহা বলিয়া-ছিলেন, তাহা বড়ই সুন্দর। তিনি বলিলেন, “গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখাব বা পুস্তকাদি ছাপাব এখনকাব মত এত ধুমধাম ছিল না ; সে জন্ম তোমাদের মত লোকের কাছে ভগবান্গীতাব ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ কবা কঠিন। কিন্তু গীতাত্ত ঘটনা যথাযথ ঘটনাছিল কিনা, তজ্জন্ম তোমাদেব মাথা ঘামাবাব কারণও দেখিতেছি না। কেন না, যদি কেহ, শ্রীভগবান্ সাবধি হইয়া অর্জুনকে গীতা বলিবাছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণ প্রযোগে তোমাদেব বুঝাইয়া দিতে পাবে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস কবিলে ? সাক্ষাৎ ভগবান্ যখন তোমাদেব নিকট মূর্তিমান্ হইয়া আসিলেও তোমরা তাঁহাকে পরীক্ষা কবিতে ছোট ও তাঁহার দৈবত্ব প্রমাণ করিতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কিনা, এ কথা সমস্তা লইয়া কেন ঘুরে বেড়াও ? পার যদি তো গীতাব উপদেশ গুলি মতটা পাব, জীবনে পরিণত করিয়া কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলিতেন, আম খা, গাছের পাতা তুমি কি হবে ? আমার বোধ হয়, ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনাব উপর বিশ্বাস অবিশ্বাস কবা is a matter of personal equation. মানুষ কোন এক অবস্থা বিশেষে পড়িযা তাহা হইতে উদ্ধারকামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিযা নিশ্চিত বিশ্বাস করে। আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।”

স্বামীজি একদিন শারীরিক এবং মানসিকশক্তি অভীষ্ট কার্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, তাহা অতি সুন্দর ভাবে

আমাদের বুঝাইবাছিলেন,—“অনধিকার চর্চায় বা বুঝা কায়ে যে শক্তি ক্ষয় কবে, অতীত কার্য) সিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে আব কোথায় পাইবে? The sum total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity. প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাতাবে প্রকাশিত হইবার যে শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, উহা সসীম, সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর স্মৃতবাং অল্পভাবে প্রকাশিত হইতে পাবে না। ধর্মের গভীর সত্য সকল জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেই জন্যই ধর্মপথের পথিকদিগের প্রতি বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তি ক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্যা-দির দ্বারা শক্তি সংরক্ষার উপদেশ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়।”

স্বামীজি পাঙ্গলাদেশের পল্লিগ্রাম ও তৎকাল লোকদেব উপব বড় একটা সম্ভটে ছিলেন না। পল্লিগ্রামেব একই পুষ্কর্ণাতে ঘান, জলশৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুষ্কর্ণের জন্যই পান করা প্রথার উপর তিনি ভাবি বিরক্ত ছিলেন। প্রায়ই বলিতেন, “বাহাদেব মস্তিষ্ক মলমূত্রে পরিপূর্ণ, তাহাদের আশা ভরসা আর কোথায়? আবার ঐ যে পাড়ারগেয়ে লোক-দেব অনধিকার চর্চা করা, উহা অত্যন্ত খারাপ। সহরের লোকেরও যে অনধিকার চর্চা নাই, তাহা নহে। তবে তাহাদের সময় কম, কারণ, সহরে খরচ বেশী; কাষেই খাটুনিও বেশি। সে খাটুনি খেটে আর বড়ে টেপা, তামাক খাওয়া ও পবনিলা কব্বার সময় থাকে না। নইলে সহরে ভূতগুলো ঐ বিষয়ে পাড়ারগেয়ে ভূতের ঘাড়ে চড়ে বেড়াত।”

স্বামীজির এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একইভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁহার রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই উহা নূতন ভাবে নূতন দৃষ্টান্ত সহায়ে এমনি বলিবার ক্ষমতা ছিল যে, উহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া লোকের বোধ হইত এবং তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে ক্লান্তি বোধ দূবে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা কবা সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোন কালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন

না। বক্তৃতাব অব্যবহিত পূৰ্ণ পৰ্য্যন্ত হাসি তামানা, সাধাৰণ ভাবে কথাবার্তা, বক্তৃতাব সঙ্গ্ৰে কিছুমাত্ৰ সঙ্কল্পহীন বিষয় সকল লটুয়াও অন-ববত চৰ্চা কৰিতেন। বক্তৃতায় কি যে বলিবেন, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। আমবা যে কয়টা দিন তাঁহাব সংস্পৰ্শে থাকিমা ধু হইযাছিলাম, সেই কয়টা দিনেব তাঁহাব কথাবার্তাব বিবৰণ আবও বত দুব পাৰি, বাবাওনে লিখিবাব ইচ্ছা বহিল।

## নূতন জাপান।

স্বামী সদানন্দ }

[ পূৰ্ণ প্ৰকাশিতো পৰ।

জাপানি গৃহস্থ বাডী তৈয়াৰি কৰাবাব আগে গণককাব ডেকে গণাবে, বাডীৰ সদৰ দৰজা কোন মুখে কৰলে মঙ্গল হবে। সহবেও, বাস্তাব উপব সদৰ দৰজাৰ স্তমুখ থাকে না। সহবে এবকমে বাডী কবা স্তবিধা নয়, সেই জগ্ৰ সকল বাডীৰ সামনে বাস্তাব ধাবে, উঁচু কাঠেব বেড়া—প্ৰবেশেব জগ্ৰ একটা গেট (gate) আছে। গেট দিযে ঢুকে সদৰ দৰজায় পৌছান যায়। প্ৰত্যেক বাডীৰ সদৰ স্তববাং ভিন্নদিকে। তিথি নক্ষত্ৰ মিলিয়ে, ভাল দিন দেখে বাডী আবন্ত হয়। তাবপৰ যেদিন চাল ছাওয়া হবে—জাপানে সবই কাঠেব বাডী—সদ্ধাৰ ছুতব বাডীৰ কৰ্ত্তাৰ সঙ্গ্ৰে পৰামৰ্শ কৰে শুভদিনে ছাইতে আবন্ত কৰে। বাডী তৈয়াৰি হলে পৰ কাৰিকৰ মজুব সকলকে পেটভবে খাওয়াতে হয়, কিছু কিছু বক্‌সিসও দিতে হয়। চালেব উপব থেকে একজন নীচে কেক (cake) ছডিয়ে দেয়; পাডাব ছেলেবা এদেশে হবিব বুটেৰ মত বুড়ুতে থাকে।

বাডী প্ৰস্তুত হলে, জানলাব ফ্রেমে (frame) পাতলা কাগজ বসিয়ে ঢেকে দেয়—জাপানে সার্দি খডখড়িৰ ব্যবহাব নাই। কাগজেব ভিতৰ দ্বিযে আলো প্ৰবেশেব কোন বাধা থাকে না; হাওয়াব দৰকাব হলে ফ্ৰেমখানা—শোজি—কাটেব দেয়ালে ঢুকিয়ে দেয়। সকল ঘৰেব সামনে বারান্দা—ইয়েন—আছে, কলিকাতাব দোকানেব মত কাটেব পৰদা—আমাদো—দিযে ঢাকা। ঝড় ঝটিব সময় ও বাত্ৰে পৰদা বন্ধ থাকে, দিনেব বেলাব খোলা থাকে। কাটেব মেজেব উপব মাত্ৰেব গদি পাতা—উপব নীচে মাত্ৰব,

ভিতবে খড় পোরা, চারিধাবে কাল কাম্বিস নিয়ে মোড়া। বসা, শোয়া, খাওয়া, কাজ কর্ম সমস্ত এই মাহুবেব উপব।

জাপানিবা পশ্চিমে ধবণে ঠাঁটু মুড়ে বসে, বসবার সময় মাহুবেব উপব ছোট আসন পেতে দেয়, আহাবেব সময় ছোট কাটের চোকিতে কাটের বা চীনে মাটির বেকাব. বাটা মাহুবেব উপবই সাজিয়ে দেয়; কাটের “হিবা-চিতে” আগুণ বেখে মাহুবেব উপবই আগুণ পোয়ায়; ছেলেবা মাহুবেব উপবই খেলা কবে, বাঁধুনি বাঁশেব নলে ফুঁদিয়ে মাহুবেব উপব উননে আগুণ ধবায়। জাপানি ঘবে কোন বকম আসবাব বাখে না, শোবাব খাট. বসবার চেয়াব, লেখাব টেবিল, দেয়ালে ছবি আয়না প্রভৃতি দিখে ঘব লোডা কবে না। কেবল একটা কাটের দেয়ালে আলমাৰি বা শেল্ফ (shelf) তাব ভিতব কাপড চোপড বিছানাপত্ৰ পর্য্যন্ত সব পূবে বেখে দেয়। আসবাবেব মধ্যে বসবার ঘবে স্নানব কাজকবা কুন্দিব (তোকোনোমার) ভিতব ফুলদানে সাজান ফুলেব তোড।

এই ফুলেব তোডা তৈয়াৰি কবিবাব জগ জাপানি মেয়েবা বিশেষ শিক্ষালাভ কবে। তোডাঘ গৃহস্থকল, কুঁড়ি, ডাল, পাতা এমন করে সাজায়, যেন স্বাভাবিক অবস্থায় দুল বাট বয়েছে। এ ছাড়া জাপানি ঘবে জগ কোন আসবাব দেখা যায় না। সকল বাড়ীতেই একটা ভাণ্ডাব ঘব (কুৰা), এমন তইসি যে, আগুণ লাগবাব ভয় নাই, এই ঘবে যত দামি জিনিষ হোলা থাকে, কিবা কলাপেব সময় বাব কবে ঘব সাজায়। সকল গৃহস্থব বাড়ীতে একটা কবে ঠাকুব ঘব আছে- সিন্ধোবা কামিদানা, বৌদেবা বৃত্তদানা বলে। একটা কাষ্ঠাসনে সিন্ধো গৃহস্থ হলে ঠাকুবেব চিহ্ন একখানি আবসি, অসি ও সাদা কাগজ দান (গোঠি) প্রতিষ্ঠা কবে এবং নানাবিধ আহাবীয় নিবেদন ও পুরাকানিক একটা দীপদানে তৈল দিয়া একগুট সোলা প্রস্থ-লিত করে। বৌদ্ধ গৃহস্থ বুদ্ধমূৰ্ত্তি স্থাপনা কবে ও ধূপদীপ নৈবেদ্য দিয়া নিতাপূজা কবিয়া থাকে। জাপানি গৃহস্থ যেমন অবস্থাপন্ন হক না, সকলেরই বাড়ীস সজে একটু কবে বাগান থাকে, তাতে ফুল, ফল, তবিতবকাৰি সকল বকম গাছই বিশেষ যত্নে বোপণ কবে। এৰা নিজে যেমন খৰ্চকায, খৰ্চকায গাছ তৈয়াৰি কবতে তেমন সিদ্ধহস্ত। আমবা যে বাড়ীতে অতিথি তইলান, তাহার বাগানে একটা লাউগাছে

একগাছ লাউ ধবেচে, কিন্তু লাউগুলি ছোট জল খাবার ক্ষতির চেয়ে বড় হবে না।

জাপানি ঘরের ব্যবস্থা মত বারান্দায় জুতা রাখিয়া আমরা ঘবে প্রবেশ কবিলাম। আমাদের বসবাব জন্তু মাহুরের উপর আসন পাতা হল। গৃহস্থামিনী—জাপানে অতিথি সংকারের তার তাঁরই উপর,—ছোট কাটের চৌকি সামনে পেতে দিয়ে চা এনে দিলেন। আমাদের দেশের পান তামাকের মত এটি সাধারণ অতিথিসংকার। হাত বদন, অমাবিকতা, সাদব সম্ভাষণ, আর মাথা নীচু, গৃহকর্তার সকল কাজের সঙ্গে বেন জড়িয়ে রয়েছে। আমরা ইন্দোজেন (হিন্দুস্থানের লোক) জাপানে বেড়াতে এসেছি শুনে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করলেন। আমাদের জাপানি বন্ধু তাঁর পিতৃ-বন্ধুর সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। কিন্তু অতিথি বাড়ী এসে কথা কবার লোকাতাবে চুপ করে বসে থাকবে, এটা অত্যন্ত অভদ্রতা। গৃহস্থামিনী জাপানি ছাড়া অল্পভাষা জানেন না, তাতে ক্ষতি কি? তিনি নানা-প্রকার ছবিব বই এনে আমাদের সঙ্গে এক বকমে মনের ভাব প্রকাশ করে সময়টা কাটিয়ে দিলেন।

জাপানের মেয়েবা ছেলে বয়স থেকে এই সকল শিষ্টাচার শিক্ষা করে। এটা তাদের প্রধান শিক্ষা। কেবল দেখে শুনে এ শিক্ষা লাভ হয় না। লেখাপড়া শেখার মত বিশেষ শিক্ষকের কাছে ইহা শিখতে হয়। যে এই শিক্ষায় বিশেষ উন্নত, সমাজে তার খুব মান, সকলে তার গুণ গায়। যার ভাল শিষ্টাচার শিক্ষা হয় নাই, সমাজে তার নিন্দা। অভ্যর্থনাব সময় কি ভাবে মাতা নিচু কর্তে হয়, কি ভাবে দাঁড়াতে হয়, হাত ছুথানি কিভাবে বাখতে হয়, কি নিয়মে দরজা খুলতে ও বন্ধ কর্তে হয়, দাঁড়াতে বসতে হয়, আহারের বেকাব ও বাটি এগিয়ে দিতে হয়, কিরূপে আহারের দ্রব্য পরিবেশন কর্তে হয়, অতিথি, আত্মীয়-কুটুম্বের সঙ্গে, পিতা মাতা, ভাইভগিনী, দাস দাসীর সঙ্গে কিরূপে অভ্যর্থনা ও সদালাপ কর্তে হয়, সংসারের সামান্য কাষে, চা খাবার চৌকি পাতা থেকে, চার বাটি মাজা পর্য্যন্ত কিরূপ আচারে নির্বাহ কবতে হয়, জাপানি সমাজে এ সকলেব আইন বাধা। সমস্ত আচারেব লিভব জাপানি, সৌন্দর্য্যেব বিকাশ, প্রীতিব স্কুরণ দেখতে চায়। জাপানি মেয়ে গুরুজনের বাধ্য হবে, হাতমুখে তাঁদের আজ্ঞা পালন কববে কোন

কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করবে না, সদাচারপরায়ণ, সৌম্যবর্ণন, গুচি ও পরিচ্ছন্ন থাকবে, এইটাই তাদের জাতীয় আদর্শ। যম্ম লিখেছেন, জীলোক বাল্যে পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, বার্ককো পুত্রের অধীন; কোন কালে স্বাধীন থাকবে না। এ আইন ভারতে যেমন, জাপানেও তেমনি। আয়সংযম অভ্যাস জাপানি জীলোকের প্রধান অলঙ্কার। শোক, যন্ত্রণা, ক্রোধ, বিরক্তিতে অন্তর্দাহ হলেও, সাবধান যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়। মনের আশ্রয় মনে লুকিয়ে, যদি হাতমুখে ও প্রিয় ব্যবহারে অপরকে স্তম্ভী কব্বে না পারলে, তাহলে তোমার শিষ্টাচার শিক্ষা হয় নাই। জাপানি জীলোকে নিত্য একরূপ অগ্নিপরীক্ষা নিবা থাকে। জাপানি জীলোকের জীবনাদর্শ, ধৈর্য ও সম্পূর্ণ আত্মবলিদান। নিজের স্বার্থ এত টুকু থাকবে না। পিতা, মাতা, স্বামী, আত্মীয়, অতিথি, অভ্যাগত সকলকে স্তম্ভী করবার ভাব তার উপর, নিজের স্বখচিত্তার সময় তার নাই। জাপানি শিষ্টাচারের ইহাই নিগূঢ় রহস্য। জাপানি মেয়ে জন্ম হতে এই শিষ্টাচার শিক্ষায় বর্জিত। সে অবগুষ্ঠনবতী, অশ্রুতবাক, লজ্জাসঙ্ক-চিত্তদেহ অবশ্য নয় কিন্তু প্রগল্ভতা ও স্বাধীন চেষ্টা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাহাব স্বভাব সরল, মধুর, আত্মীয় স্বজনকে স্তম্ভী করতে সদা ব্যস্ত। অপবিচিত্র অতিথি অভ্যাগতকে বেষ্ট্রণ আদরে গ্রহণ করে, বিদে-ণীর চক্ষে তাহা লীলাবিলাস বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবে, জাপানি জীলোক হাবভাবপবায়ণা নয়, ইহা তাহার আজন্ম শিক্ষার ফল। জাপানি তোমার নিকট এইরূপ মধুর শিষ্টাচার প্রার্থনা করে। তোমার অথবা রসিকতা বা বিলাস প্রকাশ, তাহার চক্ষে কদর্য্য অভদ্রতা; তাহা অমার্জনীয়। পূর্বে বলেছি, অতিথি অভ্যাগত বা নিমন্ত্রিত বাটী আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনার তার গৃহিণীর, তাঁব অবর্তমানে এ কার্য্য কত্তারা গ্রহণ করে। আহারাদির পরিবেশন গৃহিণী বা তাঁর কত্তাকে সহজে কর্তে হয়। সজ্জিতপন্ন গৃহস্থ, দশটা চাকর চাকরাণী রাখলেও, সপরিবারে সেবা কবে থাকেন।

অতিথি সংকার শেন হলে আমরা সিমেন্টের কারখানা দেখতে যাই। আট দশটা রুহদাকার অগ্নিকুণ্ডে রাশি রাশি পাতর পোড়ান হচ্ছে। বড় বড় চিম্নিতে এই আগুণ তাতিয়ে রাখছে। পোড়া পাতর গুঁড় করে, চুন ও অজ্ঞাত মসলা মিসিয়ে, ইটের মত করে গড়ে, গরম যবে সেগুনকে

গুহ্য করা হুচ্ছে। গুহ্য হলে আবার কলে গুড্ডিয়ে সিমেন্ট প্রস্তুত হুচ্ছে। এই সিমেন্টের কারণনা, ইউরোপীয় নকলে প্রস্তুত। জাপানি গভর্নমেন্ট ১৮৭৬ সালে প্রথম কাবখানা নির্মাণ ক'বে, বিদেশী কাবিকর বেথে সিমেন্টের কাষ আরম্ভ কবেন। যখন দেশেব লোক সিমেন্ট প্রস্তুত কব'বাব প্রণালী শিখ'লে, মানুষ তৈয়াবি হল, লাভেব ব্যবসায় হয়ে দাঁড়াল; তখন দেশেব লোকেব হাতে ফেলে দিলেন। বিদেশী ধবণেব যত কল কাবখানা'ব ব্যবসায় এই কোঁশলে জাপানিবা শিখেচে। বাপ যেমন ছেলে মানুষ কবেন, জাপানি গভর্নমেন্ট, বর্তমান সম্রাটের সূচাসনে, সেই বকম কবে জাপানকে গ'ড়ে তুল'চে। কিন্তু রাজ্য'ব চেষ্টা যদি একগুণ, প্রজাব চেষ্টা দশগুণ। জাপানেব রাজা প্রজা এক মন হয়ে, দেশেব কল্যাণেব জন্তু আপনাদেব উৎসর্গ ক'বেচে। তাই আজ, ত্রিশ বৎসব অতীত হতে না হতে অসভ্য জাপানেব কার্যাকোঁশলে, সভ্য জগৎ স্তম্ভিত। যদি মন মুখ এক হয়, নিজের উপর বিশ্বাস আব সত্যেব প্রতি লক্ষ্য থাকে, তা'হলে মুঠমেয় লোক যে জগৎ টলিয়ে দেবে, তা'ব আব আশ্চর্য্য কি।

অনেক প্রাচীন কাল হতে জাপানে সূত্র ও বেসমি কাপড়, চিকন কাষ, নানাবর্ণেব বার্নিস কাষ, ধাতু, কাট ও বাঁশেব গডন জিনিষ, খোদাই কাষ, কপূর্ব প্রস্তুত প্রভৃতি ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। এগুলি যদিও চীনেব কাছে জাপানেব শেখা, কিন্তু এ সকলেব যথেষ্ট উন্নতি জাপানিবা কবেচে। এ সমস্তই হাতেব কাজ, অতি সামান্য ও স্থূল যন্ত্রেব সাহায্যে, বহু সময়ে যৎসামান্য প্রস্তুত হইলেও, ইহাতে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্য, সুন্দর কচি ও বিচিত্র কাককার্য্য জাপানিবা দেখিযেচে, তা দেখ'লে অবাক হতে হয়। এগুলি জাপানেব আদি ব্যবসায়, ইহাব শিল্পচাতুর্য্য জাপানেব নিজের সম্পত্তি। এ সকল কাককার্য্যের প্রত্যেক বর্ণে, প্রত্যেক গঠনে, জাপানি মনেব সৌন্দর্য্যাম্পূতা ফুটে বেকছে। কিন্তু যখন থেকে ইউরোপেব আধুনিক বিজ্ঞান, লোকেব ঐচ্ছিক স্তম্ভ সাধনে নিযুক্ত হল,—মানবমানেব এই সকল অতুলনীয় সৃষ্টি, প্রাচীন সভ্যতা'ব স্মৃতিচিহ্ন হয়ে বইল। কিন্তু ইহাও মহাসত্য, এই বৈজ্ঞানিক যুগে, যে দেশ বা সে জাতি, বিজ্ঞান-শিক্ষারূপ যুগধর্ম্ম অবলম্বন না কব'বেন, সে জাতি'ব পবিধায় নিশ্চিত শোচনীয়। জাপান এ সম্রাট'র সময়ে বুলে—মজা টদামে, অটন অধ্যাবসায়ে, সকল বিষয় বিপত্তি তৃচ্ছ কবে, এই জ্ঞান উপাঙ্গনে মন দিলে।

১৮৬৮ সালে বর্তমান সম্রাটের পুনরভিষেক হ'তে, জাপানে নূতন যুগের স্বত্বপাত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জাপানে কোনরূপ কলকাবখানা ছিল না। ১৮৫৩ সালে প্রথম কায়ান তৈয়াবিব কারখানা স্থাপিত হয়, ১৮৬৩ সালে একটা সুতাব কল বিলাত হ'তে আনা হয়, তাব পূর্ব ১৮৭৩ সালে একটা বেসমের কাবখানা খোলা হয়। ক্রমে ১৮৭৬ সালে সিমেন্টের কাবখানা, ১৮৭৭ সালে কাচ ও কাগজ প্রস্তুত, সাবান, চীনে বাসন, বস্ত্রের কারখানা এবং ঢালাই ও কল নিম্মাণ কাবখানা, ১৮৭৮ সালে বেসমি ও পশমি কাপ-ডের কল, ১৮৮২ সালে সুত ও কাপডের কল জাপানি গভর্নমেন্ট স্থাপন কবেন। এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত ক'ব'বাব ও কল চালাবাব শিক্ষা দেশীয় লোকের ছিল না। কাজেই সমস্ত বিদেশী লোকের হাতে বাধ্য হইয়া-ছিল। ১৮৭৩ সালে গভর্নমেন্ট প্রথম কলেজ স্থাপন করে, বিজ্ঞান, শিল্প ও কল চালান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে আবস্ত কবেন। ক্রমে লোক তৈয়াবি হতে লাগল। দেশ বিদেশে জাপানি ছেলেবা নানা কষ্ট ও অত্যাচার সহ কবে, বিশেষ বিদ্যা শিখে, দেশে ফিবে, সেই সব বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগল। এখন জাপানে নানা স্থানে ৮৩টি টেকনিকাল স্কুল, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সকল বকম কাখ শিক্ষা দিচ্ছে। সাধারণ লোক এই সকল নূতন শিক্ষায় ও নূতন ব্যবসায়ে নিজেব ও জাতির উন্নতি বুঝে নূতন পথে আপনাদের উপযোগী কব'চে। ১৮৮১ সালে গভর্নমেন্ট সাধারণ লোকের দ্বাৰা নানা বকম কল ও ব্যবসায় বেশ চলুচে দেখে, নিজেব স্থাপিত কল কাবখানা প্রজাদের বিক্রয় কবেচেন। এখন পশমের কাবখানা ছাড়া গভর্নমেন্ট অল্প ব্যবসায় চালান না। এখন জাপানে নানাবিধ ব্যবসায় ছয় সাত হাজার কল চলুচে, তার মধ্যে অর্ধেক হাতে চালান, অপরার্দ্ধ ষ্টিম, তাড়িত বা অল্প উপায়ে চালিত। প্রায় আড়াই হাজার জয়েন্টস্টক ও লিমিটেড কোম্পানি বত্রিশ কোটি টাকা মূল ধনে এই সমস্ত কল চালাচ্ছে। সর্বমুজ্জ প্রায় চাব লক্ষ লোক কলে কাজ করে, তার মধ্যে আড়াই লক্ষ স্ত্রীলোক। ১৮৫৮ সালে জাপানের বাণিজ্য ব্যাপারে চাব কোটি টাকা কেনা বেচা ছিল, ১৯০২ সালে আশী কোটি—চৌত্রিশ বৎসরে বিশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই বিস্তৃত বাণিজ্য চলুচে, জাপানের অর্থে, জাপানিদের চেষ্টায়; ইহাব ফলভাগী জাপান। কিন্তু হে ভাবত! যে কোটি কোটি টাকার সদা-



পরি প্রতি বৎসর তোমার নামে সম্পন্ন হয়, তাব কত অংশ তোমার সন্তানদের অর্থে? ইহার লাভাংশের ভোক্তা কে? যে বণিকের বেশ ধরে ইউরোপ, এশিয়ার প্রবেশ করে, তার ভিতর বিজ্ঞানবলরূপ এক মহাতেজ প্রচ্ছন্ন ছিল। ইহা ঘোষণা করার শক্তি এশিয়ার ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এশিয়া ক্রমে ক্রমে এই মহাশক্তি প্রভাবে, ষ্ট্রট ইউরোপের পদানত। এশিয়ার এই কালরাত্রির ঘোরান্নকাবে কেবল একটা আলো জ্বলচে, কেবল একটা আশাবাদী এই নীরব অশানে শোনা যাচ্ছে। জাপান নিজের শক্তি আধারে এই বিজ্ঞান বল সঞ্চয় করে, এশিয়ার মুখ্য দেহে, জীবন সঞ্চার করতে প্রস্তুত। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানই একমাত্র মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। আমার মাতৃভূমি! এই মহামন্ত্র কি সাধন কব্বে?

( ক্রমশঃ । )

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । \*

শ্রীম—কথিত ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের চৈতন্যলীলা দর্শন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

( ভক্ত-মন্দিরে । )

ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গাড়ি কবিবা দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতা বাইতেছেন ।

আজ রবিবার । এই আশ্বিন, ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ; আশ্বিনের গুয়া দ্বিতীয়া তিথি । বেলা ৫টা বাজে । গাড়ির মধ্যে মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

\* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১ টাকা । বাঁধান মূল্য পাঁচ টাকা । ৫৭ নং রামকান্ত বস্তুর ষ্ট্রট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তি-রাম ঘোষের নিকট, অথবা ১৩২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্য । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ বজ্রস্ব ।

মাষ্টার ও আরও দু'একজন আছেন। একটু ঘাইতে ঘাইতে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর ভাব সমাধিতে যগ্ন হইলেন।

অনেকক্ষণ পবে সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন ঠাকুর বলিলেন, ‘হাজরা আবাব আমাষ শেখায়। শ্রালা!’ কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, আমি জল খাব। বাহু জগতে মন নামাইবার জন্ত ঠাকুর ঐ কথা প্রাণ সমাধির পর বলিতেন।

মহেন্দ্র মুখুয্যে (মাষ্টারের প্রতি)। তাহলে কিছু খাবার আনলে হয় না? মাষ্টার। ইনি এখন খাবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবস্থ)। আমি খাবো—বাহে যাবো।

মহেন্দ্র মুখুয্যের হাতিবাগানে ময়দাব কল আছে। সেই কলেতে ঠাকুরকে লইয়া ঘাইতেছেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে ঘাইবেন। মহেন্দ্রের বাড়ী বাগবাজার মদনমোহনজীব মন্দিরের কিছু উত্তরে। তাহাব পিতা ঠাকুর পবমহৎস-দেবকে জানেন না। তাই মহেন্দ্র ঠাকুরকে বাড়িতে লইয়া যান নাই। তাহাব দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিয়নাথও একজন ভক্ত।

মহেন্দ্রের কলে তলোপোষের উপর সতবন্ধি পাতা। তাহাবই উপবে ঠাকুর বসিয়া আছেন ও ঈশ্বরের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার ও মহেন্দ্রের প্রতি)। চৈতন্যচিন্তামৃত গুণতে গুণতে হাজরা বলে, এ সব শক্তির লীলা—বিভু এব ভিতব নাই। বিভু ছাড়া শক্তি কখন হয়? এখানকার মত উল্টে দেবার চেষ্টা!

“আমি জানি, ব্রহ্ম আব শক্তি অভেদ। যেমন জল আব জলের হিম-শক্তি। অগ্নি আব দাহিকা শক্তি। তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন; তবে কোনও খানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনও খানে কমশক্তির প্রকাশ। হাজরা আবাব বলে যে, ভগবানকে পেলে তাঁব মত ষড়ৈশ্বর্যশালী হয়, ষড়ৈশ্বর্য থাকবে, কিন্তু ব্যবহার করুক আব না করুক।

মাষ্টার। ষড়ৈশ্বর্য হাতে থাকা চাই। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)। হাঁ, হাতে থাকা চাই! কি হীনবুদ্ধি! যে ঐশ্বর্য কখন ভোগ করে নাই, সেই ঐশ্বর্য ঐশ্বর্য কবে অর্থেষ্য হয়। যে শুধু ভক্ত, সে কখন ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে না।

কলবাড়ী পান সাজা ছিল না। ঠাকুর বলিলেন, পানটা আনিয়ে নেও।

ঠাকুর বাহে ঘাইবেন। মহেন্দ্র গাড়া করিয়া জল আনাঠলেন ও নিজে

গাড়ু হাতে কবিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে মাঠের দিকে লইয়া যাইবেন। ঠাকুর মণিকে সম্মুখে দেখিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, তোমাব নিতে হবেনা, এঁকে দাও। মণি গাড়ু লইয়া ঠাকুরের সঙ্গে কলবাড়ীর ভিতবের মাঠেব দিকে গেলেন।

মুখ ধোয়াব পর ঠাকুরকে তামাক সেজে দেওয়া হইল। ঠাকুর মাষ্টাবকে বলিলেন, সন্ধ্যা কি হয়েছে ? তা হলে আব তামাকটা খাইনা। সন্ধ্যা হলে সব কর্ম ছেড়ে হবি শ্রবণ কববে :

এই বলিয়া ঠাকুর হাতেব লোম দেখিতে লাগিলেন—গোনা বায় কিনা। লোম যদি গোনা না বায়, তা হলে সন্ধ্যা হইয়াছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

( নাট্যালয়ে—সমাধিমন্দিরে । )

ঠাকুরের গাড়ি বিডন্ ষ্ট্রীটে ষ্টাব থিয়েটারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। বাত প্রায় সাড়ে আটটা হইয়াছে। সঙ্গে মাষ্টাব, মহেন্দ্র মুখুযো ও আবও দু একটি ভক্ত। টিকিট কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। নাট্যালয়েব মানে-জার শ্রীযুক্ত গিবীশ খোষ কয়েকজন কর্মচারী সঙ্গে ঠাকুরের গাড়িব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও অভিবাচন করিয়া সাদবে উপরে লইয়া গেলেন। গিবীশ পবমহংসদেবের নাম শুনিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া পবম আশ্চর্যিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে দক্ষিণ পশ্চিমের Boxএতে বসান হইল। ঠাকুরের পাশে মাষ্টাব বসিলেন। পশ্চাতে আরও দু একটি ভক্ত।

নাট্যালয় আলোকাকীর্ণ হইয়াছে। নীচে অনেক লোক। ঠাকুরের বামদিকে ড্রপ সিন ( Drop Scene ) দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি Boxএ লোক হইয়াছে। এক একজন বেহাবা নিযুক্ত আছে, তাহারা Box এব পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হাওয়া কবিত্তেছে। ঠাকুরকে হাওয়া কবিবাব জ্ঞাত দ্বিরাশ একটা বেহাবা নিযুক্ত কবিয়া পেলেন।

ঠাকুর নাট্যালয় ওদখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্তে)। বাঃ এখান বেশ! এসে বেশ হলো!

“অনেক লোকে এক সঙ্গে হলে উদ্দীপন হয়। তখন ঠিক দেখতে পাই, তিনিই সব হয়েছেন।

মাষ্টার। আজ্ঞে হা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানে কত নেবে?

মাষ্টার। আজ্ঞে কিছু নেবেনা। আপনি এসেছেন, ওদের খুব আশ্বাস দিচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সব মাঝে মাঝে।

ড্রপ সিন উঠিয়া গেল। এককালে দর্শকবৃন্দেব দৃষ্ট বঙ্গমঞ্চের উপর পড়িল।

প্রথমে পাপ আব ছয় বিপ্লব সভা। তাবপব বনপথে বিবেক বৈরাগ্য ও ভক্তিব কথাবার্তা।

ভক্তি বলিতেছেন, গোবাক্স নদীয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই বিদ্যা-ধবীগণ আব মুনিঋষিগণ ছয়বেশে দর্শন কবিত্তে আসিতেছেন।

“ধন্য ধবা নদীয়ায় এলো গোরা,  
দেখ দেখনা বিমানে বিদ্যাধবীগণে  
আসিতেছে হবি দবশনে।  
দেখ প্রেমানে হইয়ে বিভোল  
মুনি ঋষি আসিছে সকল।”

বিদ্যাধবীগণ আব মুনিঋষিগণ গোবাক্সকে ভগবানেব অবতার জ্ঞানে স্তব করিতেছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঈশ্বাদেব দেখিয়া ভাবে বিভোল হইতেছেন। মাষ্টারকে বলিলেন, আহা! কেমন দেখো।

বিদ্যাধবীগণ ও মুনিঋষিগণ গান কবিত্তা স্তব কবিত্তেছেন।

গীত।

পুঙ্কষণ।—কেশব কুরু করুণা দীনে কুঙ্কাননচারী।

স্ত্রীগণ।—মাধব মনমোহন মোহন মুরলীধারী।

সকলে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমার।

পুরুষগণ।—ব্রজ-কিশোর কালীঘহ কাতর-ভয়-ভঞ্জন ।

স্ত্রীগণ।—নয়ন বাকা, বাকা শিখি পাখা,

বাধিকাসুদিবঞ্জন ॥

পুরুষগণ।—গোবর্দ্ধন ধাবণ, বনকুসুম-ভূষণ

দামোদর কংস-দর্পহাবী ।

স্ত্রীগণ।—গ্রাম বাসবসবিহাবী ॥

সকলে—হরিবোল হরিবোল হরিবোল মন আমাদ ।

বিদ্যাধরীগণ যখন গাহিলেন,

“নয়ন বাকা বাকা শিখি পাখা

বাধিকাসুদিবঞ্জন”

তখন ঠাকুর গমকৃষ্ণ গভীর সমাধি মগ্ন মগ্ন হইলেন ।

তাহার পর Concert ( ঐক্যতান বাদ্য ) হইতে লাগিল । কিন্তু ঠাকুরেব কোন ছাঁস নাই ।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

( গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীবানকৃষ্ণ । )

জগদগণ মিশ্রবে ঘবে অতিথি আসিয়াছেন । বালক নিমাই সদানন্দে সমবয়স্কদের সহিত গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন ।

নিমাইএর গান ।

কাহা মেবা বন্দাবন কাহা যশোদা মাই

কাহা মেবা নন্দ পিতা কাহা বলাই ভাট ।

কাহা মেবি ধবলী গ্রামলী,

কাহা মেবি মোহন মুবলী

শ্রীদাম স্তদাম বাগালগণ কাহা মে পাই ॥

কাহা মেবি যমুনাতট,

কাহা মেবি বংশীবট,

কাহা গোপনাবী মেবি কাহা হামাবা বাই ॥

অতিথি চক্ষু বুঝিয়া ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিতেছেন । নিমাই নৌড়িয়া গিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন । অতিথি কংহাকে ভগবান

বলিয়া জানিতে পারিলেন ও দশাবতারের স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতেছেন। মিশ্র ও শচীর কাছে বিদায় লইবার সময় তিনি আবার গান করিয়া স্তব কবিতা লাগিলেন।

### গান ।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র জয় জয় ভব তারণ ।

অনাথপ্রাণ জীবপ্রাণ ভীত ভয় বাষণ ।

যুগে যুগে রঙ্গ, নবলীলা নব বঙ্গ,

নব তরঙ্গ, নব প্রসঙ্গ ধরাভাবধারণ ।

তাপহারী প্রেমবারি বিতব রাসগানিহানী,

দীন আশ কলুষ নাশ চুইয়াসকারণ ।

স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবে বিভোর হইতেছেন।

\* \* \*

নবদ্বীপের গঙ্গাতীর। গঙ্গাস্নানে পর ব্রাহ্মণেরা মেঘে পুন্ড্র ঘাটে বসিয়া পূজা কবিতাছেন। নিমাই নৈবিদ্বি কাড়িয়া খাইতেছেন। এক জন ব্রাহ্মণ ভাবি বেগে গেলেন আর বল্লেন, আবে বেল্লিক! বিষ্ণু-পূজার নৈবিদ্বি কেড়ে নিচ্ছিস—সর্বনাশ হবে তোমার। নিমাই তবুও কেড়ে নিলেন আর পলায়ন কবিতা উদ্যত হইলেন। অনেক মেখেবা ছেলে-টিকে বড় ভালবাসে। নিমাই চলে যাচ্ছে দেখে তানব প্রাণে সইলেন। তাবা উচ্চৈঃস্ববে ডাকিতে লাগিল, নিমাই ফিরে আয়, নিমাই ফিরে আয়। নিমাই শুনিলেন না।

একজন নিমাইকে ফিরাইবার মহামন্ত্র জানিতেন। তিনি হরিবোল হরিবোল বলিতে লাগিলেন। অমনি নিমাই হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে ফিরিলেন।

মণি বলিলেন, আহা!!

ঠাকুর বামকৃষ্ণ আর শ্রীব থাকিতে পারিলেন না। শ্রীর দিকে “আহা।” বলিতে বলিতে তাকাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন কবিতা লাগিলেন।

শ্রীবামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি )। দেখ, যদি আমার ভাব কি সমাধি হয়, তা হলে তোমরা গোলমাল কবোনা। ঐহিক লোকেরা চং নহে কোরবে।

\* \* \*

নিমাইএর উপনয়ন হইয়াছে। নিমাই সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। শচী ও প্রতিবাসিনীগণ চতুর্দিকে রহিয়াছেন। নিমাই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছেন।

### গান ।

দে গো ভিক্ষা দে,  
আমি নূতন যোগী ফিবি কৈদে কৈদে ।  
ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি,  
ওগো তাইতো আসি, দেখ মা উপবাসী ।  
দেখ মা দ্বারে যোগী বলে 'রাধে রাধে' ।  
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,  
একাকী থাকি মা যমুনা তীরে,  
আঁখি নীর মিশে নীরে,  
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে ॥

সকলে চলিয়া গেলেন। নিমাই একাকী আছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণ  
ব্রাহ্মণী বেশে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

### গীত ।

পুরুষগণ।—চন্দ্র কিরণ অঙ্গে, নম বামনরূপধারী ।

স্ত্রীগণ।—গোপীগণ মনমোহন, মজুকুণ্ডচারী,

নিমাই।—জয় রাধে শ্রীরাধে ।

পুরুষগণ।—ব্রজবালক সঙ্গ, মদন মান ভঙ্গ,

স্ত্রীগণ।—উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ,

পুরুষগণ।—দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণভয়হারী,

স্ত্রীগণ।—ব্রজবিহারী গোপনারী মধন ভিহারী ।

নিমাই।—জয় রাধে শ্রীরাধে ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই গান শুনিতে শুনিতে সমাধি হইলেন।

যবনিকা পতন হইল। Concert (কনসার্ট) বাজিতে লাগিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

( প্রেমোন্মাদ ও সংসার ত্যাগ । )

অধৈতব বাটীব সম্মুখে শ্রীবাসাদি কথা কহিতেছেন । মুকুন্দ মধুর কণ্ঠে গান গাইলেন ।

গান ।

আব ঘুমাইও না মন ।  
মাথা ঘোরে কতদিন রবে অচেতন ॥  
কে তুমি কি হেতু এলে, আপনাবে ভুলে গেলে,  
চাহবে নয়ন মেলে ত্যজ কুস্বপন ।  
বয়েছ অনিত্যধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে,  
তম পরিহরি হের তরুণ তপন ।

মুকুন্দ বড় স্নকণ্ঠ । ঠাকুর বামকৃষ্ণ মণির নিকট তাঁহাকে প্রশংসা কবিতোছেন ।

\* \* \* \*

নিমাই বাড়িতে আছেন । শ্রীবাস দেখা কবিতো আসিয়াছেন । আগের শটীব সঙ্গে দেখা হইল । শটী কাদিতে লাগিলেন । বলিলেন, গুহ্ম আমাব গৃহধর্ম্মে মন দেয না ।

যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ  
প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর  
পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী

এমন সময় নিমাই আসিতেছেন । শটী শ্রীবাসকে বলিতেছেন—

আহা দেখ দেখ পাগলের প্রায়  
অঁধি নীরে বুক ভেসে যায়  
বল বল এ ভাব কেমনে যাবে ?

নিমাই শ্রীবাসকে দেখিয়া তাঁহাব পায়ে ঝড়াইয়া কাদিতেছেন আর বলিতেছেন—

কই প্রভু  
কই মম রূপ ভক্তি হলো  
অধম জনম বুঝা কেটে গেল



বল প্রভু,

কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কোথা পাব

দেহ পদধূলি বনমালী যেন পাই ।

ঠাকুর বামকৃষ্ণ মাষ্টাবেব দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে বাইতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। গদ গদ স্বর। গগুদেশ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন, নিমাই শ্রীবাসের পা ভড়াইয়া রহিয়াছেন আর বলিতেছেন, কই প্রভু কৃষ্ণভক্তি ত হলোনা।

এদিকে নিমাই পড়ুয়াদের আর পড়াইতে পারিতেছেন না। গঙ্গাদাসেব কাছে নিমাই পড়িয়াছিলেন। তিনি নিমাইকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। শ্রীবাসকে বলিলেন—

“শ্রীবাস ঠাকুর, আমবাও ব্রাহ্মণ, বিষ্ণু পূজা কবে থাকি ; কিন্তু আপনারা মিলে দেখছি, এই সংসারটা ছারখার করলেন।”

শ্রীবামকৃষ্ণ (মাষ্টাবেব প্রতি)। এ সংসারীর শিক্ষা। এও কর ওও কর। সংসারী লোক যখন শিক্ষা দেয়, তখন হৃদিক বাধতে বলে।

মাষ্টাব। আজ্ঞে হাঁ।

গঙ্গাদাস নিমাইকে আবার বুঝাইতেছেন—

“ওহে নিমাই, তোমাব ত শাস্ত্রজ্ঞান হবছে। তুমি আমাব সঙ্গে তর্ক কব। সংসাব ধর্ম অপেক্ষা কোন্ ধর্ম প্রধান আমাব বোঝাও। তুমি গৃহী, গৃহীব মত আচার না কবে অন্ত আচার কেন কব ?”

শ্রীবামকৃষ্ণ (মাষ্টাবেব প্রতি)। দেখলে ? হৃদিক বাধতে বনুছে।

মাষ্টাব। আজ্ঞে হাঁ।

নিমাই বলিলেন, আমি ইচ্ছা করে সংসাব ধর্ম উপেক্ষা কবি নাই। আমার ববং ইচ্ছা যাতে সব বজায় থাকে। কিন্তু—

প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি

প্রাণ টানে কি কবি কি কবি

ভাবি কুলে বই,

কুলে আব বহিতে না পাবি

প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেবে

সদা চায় কাঁপ দিতে অকুল পাথাবে।

শ্রীবামকৃষ্ণ। আহা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

( নিত্যানন্দ বংশ ও ঠাকুর বামকৃষ্ণের উদ্দীপন । )

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ আসিয়াছেন, তিনি নিমাইকে খুঁজিতেছেন, এমন সময় নিমাইএর সহিত দেখা হইল । নিমাইও তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন । মিলনের পর নিমাই বলিতেছেন,—

সার্বক জীবন, সত্য মম ফলেছে নগন  
লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিযে ।

শ্রীবামকৃষ্ণ ( মাষ্টাবেব প্রতি গদ্যদেব ) । নিমাই বজ্রচেন, স্বপ্নে  
দেপেছি ।

\* \* \* \*

শ্রীবাস ষড়্ভুজ দর্শন কনুছেন আব স্তব কবুছেন ।

জঘ জঘ ষড়্ভুজধারী

রূপে অকুপম

ছুই কবে ধব ধনুস্বাণ

দশস্কন্ধ দর্পচূর্ণ যায়,

আহা মবি মবি গোপী যনোজাবী

ছুই কবে ধবেছ বাশবী,

কি ছেবি—কি ছেবি—

ছুই করে দণ্ড কমণ্ডলু—

ঠাকুর বামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া ষড়্ভুজ দর্শন কবিত্তেছেন ।

গৌরান্দের দৈব আবেশ হইয়াছে । তিনি অবৈত, শ্রীবাস, হরিনাম  
ইত্যাদির সহিত ভাবে কথা কহিতেছেন । নিতাই, গৌরানের ভাব বুঝিতে  
পানিষা গান গাহিলেন ।

গান ।

কই কৃষ্ণ এল কুন্ডে প্রাণসই ।

দেৱে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে,

বাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই ।

ছি ছি কবে মান সখি মরি মরি  
এল কোথা গেল, এনে দে লো হরি,  
আমাব কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণেব সাধ,  
সই কি জান না, কৃষ্ণ আন না,  
বলো বলো তাবে, বাধা প্রাণে মবে,  
কালা বিনে বইতে পারি কই ।

ঠাকুর বামকৃষ্ণ গান শুনিতে শ্রুতিতে সমাধিস্থ হইলেন ও অনেকক্ষণ  
ঐ ভাবে বহিলেন ।

কনসার্ট চলিতে লাগিল । ঠাকুরেব সমাধিও ভঙ্গ হইল । ইতিমধ্যে  
খড়দার নিত্যানন্দ গোস্বামীব বংশের একটি বাব আসিয়াছেন ও ঠাকুরেব  
চেযাবের পশ্চাতে দাড়াইয়া আছেন । বয়স ৩৩৩৫ হইবে । ঠাকুর তাঁহাকে  
দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন । তাহাব হাত ধরিয়া কত কথা কহিতে  
লাগিলেন । মাঝে মাঝে তাহাকে বলিতেছেন, “এখানে বোসোনা, তুমি  
এখানে থাকলে খুব উদ্দীপন হয় ।” আবাব সম্মুখে তাহাব হাত ধরিয়া  
যেন খেলা করিতে লাগিলেন । সম্মুখে তাহাব মুখে হাত দিয়া আদর  
করিতে লাগিলেন । গোস্বামী চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টাবকে বলিতেছেন,  
“ও বড় পণ্ডিত । বাপ বড় ভক্ত । আমি খড়দার শ্রামসুন্দর দেখতে গেলে  
যে ভোগ এক শ টাকা দিলে পাওয়া যায় না, সেই ভোগ আনিবে আমায়  
খাওয়ায় ।

“এর লক্ষণ বড় ভাল । একটু নেড়েচেড়ে দিলে চৈতন্য হয় । ওকে  
দেখতে দেখতে বড় উদ্দীপন হয় । আব একটু হলে আমি দাঁড়িয়ে  
পড়তুম ।”

আব একটু হলে গোস্বামীকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরেব ভাব সমাধি  
হইত, এই কথা বলিতেছেন ।

\* \* \* \* \*

যবনিকা উঠিয়া গেল । বাজপথে নিত্যানন্দ মাধায় হাত দিয়া রক্তশ্রোত  
করিতেছেন । মাধাই কলসিব কানা ছুঁড়িয়া মাঝিয়াছেন । নিতাইএর  
না না নাই । গৌরপ্রসন্ন গবগব মাতোষারা । ঠাকুর বামকৃষ্ণ  
মাঝিষ্ট হইয়া দেখিতেছেন । নিতাই, জগাই মাধাইকে কোল দিবেন ।

নিতাই বলিতেছেন,—

## গীত।

প্রাণ ভাবে আশ হবি বলি,  
 নেচে আশ জগাই মাধাই।  
 মেবেছ বেশ ক'বেছ হরি বলে নাচ ভাই।  
 বলবে হবিবোল,  
 প্রেমিক হবি প্রেমে দিবে কোল,  
 তোলেবে তোল হবিনামেব বোল;  
 পাওনি প্রেমেব সাধ,  
 ওবে হবি ব'লে কাদ,  
 হেববি হৃদয় চাদ,  
 ওবে প্রেমে তোদেব নাম বিলাব,  
 প্রেমে নিতাই ডাকে তাই।

\* \* \* \* \*  
 এইবার নিমাই শচীকে বলিতেছেন, “মাগো হবিপ্রেমে হইব সন্ন্যাসী।”  
 শচী মুচ্ছিতা হইলেন। শচীব মুচ্ছা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ অনেকে হা-  
 কাব কবিতোছেন। ঠাকুর বামকৃষ্ণ অণুমান বিচলিত না হইয়া একদৃষ্টে  
 দেখিতেছেন, কেবল নয়নের কোণে একবিন্দু জল দেখা গিয়াছে।  
 \* \* \* \* \*

## দৃষ্ট পরিচ্ছেদ।

(গৌবান্ধপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ।)

অতিনয় সমাপ্ত হইল। ঠাকুর গাড়িতে উঠিতেছেন। একজন ভক্ত  
 জিজ্ঞাসা কবিলেন, কেমন দেখলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,  
 আসল নকশ এক দেখলাম।

গাড়ি মহেন্দ্র মুখুয্যেব কলে বাইতেছে। হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হই-  
 লেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রেমভাবে আপনাপনি বলিতেছেন,—

“হা কৃষ্ণ! হে রক্ষা! জ্ঞান রক্ষা! প্রাণ রক্ষা! মন রক্ষা! আত্মা  
 রক্ষা! দেহ রক্ষা!”

আবার বলিতেছেন—

“প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন।”

গাড়ি মুখুয্যেদের কলে পৌঁছিল। অনেক বহু কবিতা মহেন্দ্র ঠাকুরকে খাওয়াইলেন। মণি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর সম্মুখে তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি কিছু পাওনা। ঠাকুর হাতে করিয়া যেটাই প্রসাদ দিলেন।

\* \* \* \*

এইভাবে ঠাকুর বামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যাইতেছেন। গাড়িতে মহেন্দ্র মুখুয্যে আরও দু'তিনটি ভক্ত আছেন। মহেন্দ্র তাঁহাকে খানিকটা এগিয়ে দিবেন।

ঠাকুর আনন্দে যাইতেছেন ও গান আবৃত্তি করিলেন—

গান।

গৌর নিতাই তোমরা দুভাই পবন দয়াল হে প্রভু,

(আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ)

আমি গিষেছিলেম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলে কাশী-বিশ্বেশ্বরে

সে পবনরূপ শচীব যবে।

তোমরা নাকি আচণ্ডালে দেও কোল, কোল দিয়ে বল হবিবোল।

(ওহে পবন ককণ)

(গৌর হে, প্রাণ গৌর!)

ছিল ব্রজের খেলা দৌড়ানো ডি, এখন নদের খেলা ধূলায় গড়াগড়ি।

(প্রেমে মত্ত হয়ে।)

মণি সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র তীর্থে যাইবেন। ঠাকুরের সহিত সেই সব কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)। প্রেমের অঙ্কুর না হ'তে হ'তে

সব শুকিয়ে যাবে।

“কিন্তু শীঘ্র এস। আহা, তোমার বাড়িতে অনেক দিন থেকে যাবো মনে করেছিলাম, তা একবার দেখা হলো, বেশ হলো।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, জীবন সার্থক হলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ। সার্থক ত আছেনই। আপনার বাপও বেশ। সেদিন দেখলাম, অধ্যাত্মে বিশ্বাস।

মহেন্দ্র। আজ্ঞে, রূপা রাখিবেন, যেন ভক্তি হয়।

ত্রিামকৃষ্ণ। ভূমি খুব উদার, সরল। উদার, সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কপটতা থেকে তিনি অনেক দূর।

মহেন্দ্র শ্রীমবাক্যবের কাছে বিদায় লইলেন। পাড়ি চলিতে লাগিল।

ত্রিামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। স্বল্প মল্লিক কি করলে?

মাষ্টার (স্বগত)। ঠাকুর সঙ্কলের মঙ্গলের জন্য ভাবিতেছেন। ইনি কি লোকদের ভক্তি শিখাইবাব জন্য দেহ ধাবণ করিয়া আসিয়াছেন?

## সংবাদ ও মন্তব্য।

স্বামী অভেদানন্দের দ্বারা পরিচালিত নিউইয়র্ক বেদান্তসমিতিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই বার হইতে স্থির হইয়াছে, স্বামীজির জন্মোৎসব ও সমিতির সাধারণিক উৎসব একত্রে ১২ই জানুয়ারি তাবিখে সম্পন্ন হইবে। এবারে ঐ ১২ই তারিখ মঙ্গলবারে পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ মঙ্গলবারের অপবাহে যে বক্তৃতা হইয়া থাকে, তাহা উৎসব উপলক্ষে বন্ধ বহিল। ত্রিামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতির নিম্নে স্বামী বিবেকানন্দের একখানি প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়া ভক্তগণের দ্বারা আনীত পুষ্প, মালা, স্তোত্র পাতা প্রভৃতি দ্বারা সজ্জীকৃত করা হইল। অপরাহ্ন চারিটার সময় ভক্তবৃন্দ সমবেত হইলে শুবাদি পাঠের পর ধ্যান হইতে লাগিল। ধ্যানের মধ্যে মধ্যে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের দ্বাষ্টাধ্য প্রকাশক দুই চারিটা উদ্দীপক বাক্য এবং স্বামী নির্মলানন্দ স্বামীজির প্রিয় বৈদিক শ্লোকাংশসমূহ আবৃত্তি কবিত্তে লাগিলেন। ছয় ঘটিকার সময় ধ্যান সমাপ্ত হইল—অনেকে ক্ষিপ্ত বেদীর সমক্ষে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত বসিয়া উপাসনা কবিত্তে লাগিলেন।

আটটার সময় আরও অনেক ভক্তের সমাবেশ হইলে পুনর্বার কিরণধন ধ্যান হইল। পরে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের কার্য সম্বন্ধে তেজোময়ী ভাষায় সংক্ষেপে একটা বক্তৃতা করিলে স্বামী নির্মলানন্দ স্বামীজির জীবনচরিত সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দের প্রবন্ধ শ্রোতৃবর্গের অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি স্বামীজির ধর্মপ্রচাবক রূপে সাধারণের সমক্ষে আবির্ভূত হইবার পূর্ন-জীবনের অনেক অস্বস্তি ঘটনা এবং ভারতে ধর্মপ্রচার ও সাধারণ হিতো-

ক্ষেপে যে সকল গুডকর অনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে সমিতির সভাপতি প্রোফেসর পার্কাব বলিলেন,—স্বামীজির সহিত ঘাহাব সাক্ষাৎ হইত, সেই তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার এই মোহিনীশক্তিই আমেরিকান-গণের মনকে প্রথম বেদান্তের দিকে আকর্ষণ করে। তৎপরে স্বামীজিব একজন পবন ভক্ত শিষ্য গুডইয়ার সাহেব বলেন,—“স্বামীজিকে এখানে প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট কবিত্তে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সকল কষ্টই আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে আটটি করিয়া বক্তৃতা দিতে হইত। ইহা ব্যতীত একদিন প্রমোক্তব দ্বারা শঙ্কাসমাধান ও একদিন সাধাবণেব জন্ত বক্তৃতা দিতে হইত। ঘাহারা তাঁহাব সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়েই তিনি তাঁহার প্রতি এবং বেদান্তের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধার উদ্বেক করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ, গ্রীষ্মাবকাশের সময় আমরা কয়েকজন যখন সেন্ট লবেন্স নদীর তীরে স্বামীজিব সহিত এক গৃহে বাস রূপ সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইয়াছিলাম, তখন তাঁহার পবিত্র জীবনের শক্তিতে আমবা এতদূর উপকৃত হইয়াছিলাম যে, ঘাহারা সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা কখন আব তাঁহার প্রাণপ্রদ প্রভাব ভুলিতে পারিবেন না।”

স্বামী অভেদানন্দ সর্বশেষে বলিলেন, আমবা সকলেই জানি, স্বামী বিবেকানন্দ একজন শক্তিশালী ধর্ম্যাচার্য ছিলেন। কিন্তু তিনি কাহাব শক্তিতে এত শক্তিমান হইলেন? তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শক্তিতে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল শ্রদ্ধাবশতই তিনি মহৎ মহৎ কন্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরাও যদি সকলে তাঁহার অনুসরণ করিবা যথার্থ ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে আমরাও মহৎ মহৎ কন্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব। সর্বশেষে স্বামীজিব ‘সন্ন্যাসীবা গীতি’ নামক কবিতা পাঠের পর সভাভঙ্গ হয়।

বিগত ১৪ই জানুয়ারি তারিখে সমিতিগৃহে সমিতির কার্যানির্বাহক সভার বাৎসরিক অধিবেশন হয়। সমিতির আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল চলিতেছে। লাইব্রেরিতে আলোচ্য বৎসরে একশত খানি পুস্তক বাড়িয়াছে। পুস্তকপ্রকাশবিভাগের কার্যও সুন্দররূপে চলিয়াছে। সমিতিব

সেক্রেটারি মিস ফার এবং কোষাধ্যক্ষ গুডইয়ার সাহেব তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় মিসেস এমিলি পামার কেপ সেক্রেটারি ও এইচ, সি, মাস সাহেব কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অষ্টাভ পদে পূর্ব পূর্ব ব্যক্তিগণই রহিলেন। স্বামী অভেদানন্দ, শাহাবা পদত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিঃস্বার্থ কার্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন—বিভিন্ন বিভাগের সভ্যগণের প্রতি, সমিতির কার্যে তাঁহাদের অদম্য অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থভাবে কার্য পরিচালনাব কথা বলিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি আবও বলিলেন, স্বামী নির্মলানন্দের আগমনে এখানকার কার্য পূর্ণাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে চলিবে। এক্ষণে তিনি এখানে প্রত্যহ ধ্যানশিক্ষা দিতেছেন এবং কয়েকটা ছাত্রকে সংস্কৃত ভাষা পড়াইতেছেন।

তৎপবে কতকগুলি পত্র পাঠ করা হইল। তন্মধ্যে একখানি কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়েব ইংবাক্সী সাহিত্যেব অধ্যাপক হিরাম কর্ণেল সাহেবের প্রেবিত। তিনি ঐ পত্রে লিখিয়াছেন, বর্তমান কালে দর্শন ও মনো-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ প্রণীত গ্রন্থাবলিই সর্বোত্তম। শাহারা এই বেদান্তের শিক্ষা দিতেছেন, সেই সন্ন্যাসিগণও বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি—তাঁহারা তাঁহাদের উপদেশ কার্যে পবিণত কবিয়া দেখাইতেছেন। তিনি সেই কারণে বেদান্ত সমিতিব একজন সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, আর ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী অভেদানন্দ বাহাতে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া বক্তৃতা দেন, তজ্জন্ত তাঁহাকে বিশেষ আগ্রহেব সহিত আমন্ত্রণ করিতেছেন।

মাক্সাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বানিয়ামবাড়ি নামক স্থানে কিছু দিন পূর্বে বন্যা হয়। তথায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ রামকৃষ্ণ সাহায্যভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

স্বামী সারদানন্দ গত ১৬ই এপ্রেল তারিখে শিবতলা রামকৃষ্ণ সমিতিতে ‘ধর্ম ও মনুষ্যত্ব’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, “আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম ও যুক্তির লক্ষণ পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট আছে। বাহা বাবা আমাদের ঐহিক পারত্রিক উন্নতি হয়, তাহার নাম ধর্ম। ইহা প্রকৃতি-



লক্ষণ। আমরা এক্ষণে ধর্ম বলিতে সম্বন্ধে মুক্তিই বুঝিয়া থাকি এবং আমরা মুক্তির অধিকারী কি অধিকারী, তাহার বিচার না করিয়াই মুক্তি লইবার জন্য ছুটিয়া থাকি। আর মনে করি, মুক্তি লাভ করিতে হইলে শরীরকে ক্লান্ত করিতে হইবে, মস্তকে দুর্বল করিতে হইবে, বিচার-শক্তিকে পদদলিত করিতে হইবে, এক কথায়, বহুশ্রমকে একেবারে বিসর্জন দিতে হইবে। কিন্তু আমরা শাস্ত্রপাঠে দেখিতে পাই, বাহ্যিক ধার্মিক বা যুগুত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা দৈহিক, মানসিক সর্ববিধ শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” মহাত্মার তত্ত্বপ্রসিদ্ধ অর্জুন ভীষ্মাদির অগুরু বীরত্ব ও মানসিক বলের বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন, এই সকল মহাপুরুষকে আমাদের জীবনের আদর্শ কবিতো হইবে। বাহ্য কিছু দুর্বল করে ও বাহ্য কিছু আমাদেরকে বহুশ্রমহীন করে, তাহাই অধর্ম—বাহ্য কিছু আমাদেরকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সবলতাসম্পন্ন করে, তাহাই ধর্ম।

আমরা লেওফরের রাজকুমারী কুটাশ্রমের ১৯০৩ সালের রিপোর্ট পাই-রাছি। সম্পাদক মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৈদ্যনাথের মোহন মহারাজ আশ্রমবাসিগণের আহ্বানের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেন নাই। ইহা অতি দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। বর্তমান না আমরা জীবসেবাকে জৈবরোপাসনার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে প্রাণে জানিব, ততদিন জীবসেবায় আমাদের এইরূপ উদাস্যই থাকিবে। সম্পাদক মহাশয় পূর্ববারে যে আশ্রমগৃহের উন্নতিকল্পে সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারও আশাহতরূপ কোন ফল হয় নাই। যদি এই আশ্রমকে স্থায়ী করিতে হয়, তবে ইহা ছাড়াও প্রায় ৭০০০০ টাকা আবশ্যক। আমাদের বক্তব্য এই, বর্তমান না দেশের যুবকগণ দেশের গরিব দুঃখ পতিতদের জন্য প্রাণে প্রাণে অহুত্ব করেন এবং তাহাদের জন্য নিজেদের স্বপ্নব্রত, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতি একেবারে গলাজলে ভাসাইতে পারেন, ততদিন আমাদের দেশে অন্তর্ভুক্ত কোন সংস্কারোন্নয়নই স্থাবিবেব আশা নাই। মা নববলি চাম—নব-বলি ব্যতীত মা প্রসন্ন হবেন না।

# শ্রী শ্রীরামানুজচরিত ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ।]

[ ৫ম বর্ষ, ৩৯৭ পৃষ্ঠাব পর্ব ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অদর্শনের পর্ব শ্রীবঙ্গমন্দির মঠ প্রকৃত পক্ষে এক প্রকার নেতৃশূন্য হইয়া রহিয়াছিল । যদিও মহাপূর্ণ ও বনরঙ্গ সেই অভুলনীয় মহাপুরুষের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন, তথাপি তাঁহারা ও তদীয় অন্তান্ত শিষ্যগণ সর্বদাই সেই সর্বশাস্ত্রমর্মজ্ঞ, ঈশ্বরানুবাগময়বিগ্রহ, সৌম্যদর্শন মহাপুরুষের অভাব স্ব স্ব হৃদয়ে অনুভব করিতেন । কিন্তু তাঁহাদের মনে উক্ত অভাব পূরণের এক বলবতী আশা জাগরুক ছিল । গুরুমুখে সকলেই শ্রীমদ্রামানুজের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছিলেন । রামানুজ যে অবতার পুরুষ, ইহা তিনি বাব বাব স্বীয় শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন । তাঁহাকে আনয়নের জন্য মহাপূর্ণ প্রেরিত হইয়াছিলেন । সেই ভক্তাগ্রগণ্য বহু দিবস রামানুজালয়ে বাস করিয়া তাঁহাকে তামিল প্রবন্ধমালায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন করিয়াছিলেন । সম্প্রতি তিনি সন্ন্যাসী শ্রীমদ্রামানুজকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, রামানুজকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসেন । কিন্তু সহসা স্থান ত্যাগ কবায় তাহা ঘটয়া উঠে নাই । ইতিমধ্যে লোকমুখে যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার দেবপ্রতিম শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না । তখনই তিনি শেষশায়ী শ্রীমদ্রামানুজের পাদমূলে গমন পূর্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, “হে শরণাগতপালক, পরিপূর্ণ, পরব্রহ্ম, তুমি সকলেরই পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া থাক । শ্রীমদ্রামানুজকে আপনার পাদমূলে আনয়ন করিয়া আমাদের মহান অভাব পূর্ণ কর ।” প্রেমগদ্যদ্বিষ্টে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর তিনি শ্রীমদ্রামানুজবৎকর্তৃক এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইলেন, “বৎস মহাপূর্ণ, তুমি দেবগানবিশারদ বররঙ্গকে কাকীপুরপতি শ্রীমদ্রামানুজের নিকট পাঠাও । তিনি নিরতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় । বররঙ্গের গানে সঙ্কট হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে সে যেন তাঁহার নিকট

শ্রীবামান্নজকে ভিক্ষা চায়। তদীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্ততিবাজ \* কখনও তাঁহার পাদমূলে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।”

মহাপূর্ণ এইরূপে প্রত্যাশিষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে বরনঙ্গকে জাম্বীপুরে পাঠাইলেন। তথায় গমন করিয়া বরনঙ্গ শ্রীমদ্ববদবাজকে সঙ্গীত দ্বারা একপ সন্তুষ্ট করিলেন যে, গায়কবব শ্রীবামান্নজকে ভিক্ষাস্বরূপ চাহিলে, ত্রিশোকপতি প্রিবভক্তের বিবহ নিবতিশয় দ্রঃসহ হইলেও, তাহাব প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বরনঙ্গ যখন বামান্নজকে শ্রীবঙ্গনাথের পাদমূলে আনয়ন করিলেন, মঠবাসী বিশুদ্ধসত্য বৈষ্ণবগণ ৭ ষাবতীয় নগববাসী ব আত্ম-দেব সীমা দাইল না। শ্রীবঙ্গনাথ শেষশায়ী তাহাবে উভয়-বিভূতি-পতি করিলেন, অর্থাৎ সন্তুষ্টব সন্তাপ-নিবারণ এবং তত্ত্বপ্রতিপালনকর্মতা তাঁহাকে দান করিলেন। এই বিভূতিদ্বয়যুক্ত হইয়া স্ততিবাজ শ্রীবামান্নজ এক অপূর্ণ দিব্য শোভায় শোভাস্থিত হইলেন। দলে দলে বৈষ্ণবগণ দেশদেশান্তর হইতে আনিয় তাহাব পদযুগল স্পর্শকবতঃ আপনাদেব কৃতার্থ মনে কবিতে লাগিলেন। তাঁহার বদন হইতে শ্রীনিম্ব মাংসাত্ম্য প্রসব কবিয়া সকলে তাঁহাবে আদর্শ বৈষ্ণব বলিয়া ধারণা করিলেন।

এই সময় তাঁহাব মন পবম আত্মীব গোবিন্দেব জ্ঞাত চক্ষু হইল। যে গোবিন্দ তাঁহাকে প্রাণনাশকব যাদবপ্রকাশেব দুবতিসক্রিব হস্ত হইতে পনিব্রাণ কবিয়াছেন, তাঁহাব সবলতা, ভগবন্তুক্তি ও পাণ্ডিত্য সহপাঠিগণ ও স্বীয় গুরুকে মুগ্ধ কবিয়াছিল, তাঁহাব প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ভূতনাথ বাণলিঙ্গাবে সেবা গ্রহণ কবিয়াছেন, সেই প্রাণেব বন্ধুকে আপনাব দিব্য স্বখেব ভাগী কবিবাব জ্ঞাত তাঁহাব মন ব্যাকুল হইল। কিরূপে তাঁহাকে কালহস্তী হইতে আনয়ন কবিবেন, ইহাই তিনি ধ্যান কবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পবে তাঁহাব স্ববণ হইল যে, পবম বৈষ্ণব শ্রীশৈলপূর্ণ কালহস্তীব অনতিদূবে শ্রীশৈলে তগবৎসেবার্থ বাস করিতেছেন। তদ্বা বা গোবিন্দকে বৈষ্ণব মতে আনয়ন কবিতে পারিলে সর্কার্থ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ সন্তর কবতঃ, তিনি শ্রীশৈলপূর্ণকে লিপি প্রেবণ করিলেন। সেই পবম ভাগবত পত্রেব মর্ম্ম জাত হইয়া শিষ্যে তখনই কালহস্তিসমীপবর্তী এক বিপুল সবেবব তীবে অবস্থান করিলেন।

গোবিন্দ প্রতিদিন পুষ্পাচয়ন ও স্নানার্থ উরু সবেবব তীবে আসিতেন। সূতবাং পরদিবস ষষ্ঠাবী তান্ত্রসাবে আসিয়া দেখেন যে, এক দিনাকান্তি স্বেত-

ঋতু বৈষ্ণব কতিপয় শিষ্যের সহিত তথায় শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। তিনি তৎশ্রবণমানসে পুশ্চয়নার্ণ সমীপবর্তী পাটলি বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, এবং যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাহার মনে উক্ত বৈষ্ণবের উপর বিশেষ ভক্তির সঞ্চার হইল। বৃক্ষ হইতে অববোহণ করিয়া স্নানার্ণ গমন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীশৈলপূর্ণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহাশয়, কাহার সেবার জন্ত কুসুম চয়ন করিলে, জানিতে পারি কি ?” শিবপূজার্থে চয়ন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে মতিমন্, যিনি সংসার সৰ্বভুঃপের মূল জানিয়া যাবতীয় ভোগবাসনাকে ভয়ে পরিত্যক্ত করিয়া তদ্দ্বাবাই আপনাকে ভূষিত করিয়া বিভূতিভূষণ নাগ ধারণ করিয়াছেন, যিনি সৰ্বস্বার্থামী নাবা-  
 যণের প্রেমে উন্নত হইয়া এখানে কেই আপনাব আবাসভূমি করিয়াছেন, কুসুমাদি ভোগসামগ্রী সমূল্য তাহার কিরূপে প্রিয় হইতে পারে ? যিনি স্বাভাবিক অনন্ত কল্যাণগুণসমূহের আকর, কাহার পবন পবিত্র হৃদয়-  
 কমল হইতে এই পবিত্র সৰ্বকল্যাণকর আগ্রস্রভূষণ পর্য্যন্ত সমুদয় জীব-  
 নিবহেব নিবাসভূমি সংসার জগৎলাভ করিয়াছে, সেই অনাদি বিষ্ণুই শ্রীপাদপদ্মে ই সকল সুন্দর কুসুম শোভা পায়। তুমি বুদ্ধিমান হইয়াও শিবসেবার্থ পূজাহরণ করিয়াছ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।” গোবিন্দ ইহাতে উত্তর করিলেন, “মহাশয়, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমার এতদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। ভগবানের সেবার্থ্যনা আমবা আপনাদেনই উপকার কনি, তদ্দ্বারা তাহার কোনও উপকার সং-  
 সাধিত হয় না। যিনি সমস্ত জগতের অধিনায়ক, তাহাকে আমবা কি দিতে পারি ? সমস্তই তাহার অধিকৃত। অতএব যিনি ত্রিলোকের মঙ্গল বিধানার্থে যৎ বিধপান করিয়া চলাচল নিখিল জগৎকে বক্ষা করিয়া-  
 ছিলেন, সেই পবন মঙ্গলনিধান সদাশান্তমূর্ত্তি শরৎ নিষ্কদাসের নিকট হইতে কি দ্রব্য অভিলষ্য করিবেন ? ভক্তিই তাহার একমাত্র আনন্দের ধন। তিনি অম্বদাদিব নিকট হইতে ভক্তি ত্রিণ আন কিঙ্কই চাহেন না। সচন্দন কুসুমদাম দিয়া তাহার শ্রীপাদপদ্ম অর্চনা করিলে আমাদের তগবদ্বিষয়িনী প্রীতি প্রবর্দ্ধিত হয়, এই জন্তই পূজা প্রভৃতির আবশ্যকতা।  
 শ্রীশৈলপূর্ণ ইহাতে কহিলেন, “হে মহাশয়, তোমার ভক্তি ও নম্রতায় বৎ-  
 পকোনাশ্রি আনন্দলাভ করিলাম। তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য। সৰ্বা-  
 ধিকারী সৰ্বস্বামীকে কে কি দান করিতে পারে ? দৈত্যবাজ বলির

দাত্ত্বাভিমান যিনি বামনরূপে নাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ ভিন্ন আর কিছুই সমর্পণ করা যায় না। এই সর্কারীন আত্মসমর্পণই পরা পূজা। ইহার বলেই তিনি বামনরূপী ভগবানকে বন্দ করিয়া বাশিয়া-ছেন। বল দেখি, ভগবানের এ লীলা কেমন? তুমি এই লীলাময় হরির উপাসনা ছাড়িয়া লীলাহেবী শব্দের উপাসনা করিলে এই মধুর রস হইতে বঞ্চিত হইবে। এতদ্ভিন্ন তোমাব বৈষ্ণব বংশে জন্ম, স্মৃতরাং বৈষ্ণব ধর্মই তোমার অন্তঃস্বীয়। ‘স্বধর্মো নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ’ এই ভগবদ্ভক্তি স্মরণ কর।” ইহাতে গোবিন্দ উত্তর করিলেন, “মহাশয়, আপনি হবিহর ভেদজ্ঞান করিতেছেন কেন? ষষ্ঠাকর্ণের জ্ঞায় ভক্তি কখনও প্রশস্ত নহে, শাস্ত্রেই এইরূপ অভিপ্রায়।”

প্রতিদিনই প্রাতঃকালে এইরূপ বাদামুবাদ চলিত। কথিত আছে যে, অবশেষে গোবিন্দ শৈবধর্ম পরিত্যাগ কবিয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেন। ত্রীশৈলপূর্ণ তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত হইয়া গোবিন্দ বামাত্মজ সন্ন্যাসে গমনপূর্বক তাঁহাবই নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্যে শৈব বৈষ্ণবের নিত্য কলহ। বৈষ্ণব দর্শন বা সন্তুষ্ট করিলে শৈব গ্রন্থ কবিয়া আপনাকে শুদ্ধ জ্ঞান করেন। বৈষ্ণবেরও ঐ বীতি। ইহাব তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে একপ বোধ হয় যে, নৈষ্ঠিকী ভক্তি সাধন করিতে গিয়া অনেক মতিবৈষম্য বশতঃ এই শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। নৈষ্ঠিকী ভক্তি না হইলে ভগবদর্শন হয় না। শ্রীমহাভাবতে \* উপমম্বাব উপাখ্যান পাঠ করিলে ইহা সহজে স্ପষ্ট হয় হইবে।

উপমম্বা অধিতনয়। একদা সীয অম্বুজ ও অগ্রাণ্ড ঋষিবালাকগণেব সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে হৃদ্ধবতী ধেম্মকে দোহন করিতে দেখিয়া তাঁহাব হৃদ্ধমিশ্রিত অন্ন ভোজনে ইচ্ছা জন্মিল। গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়া মাতাকে হৃদ্ধানের বখা কহিলে সন্তানবাৎসল্যাহেতু মাতা হৃদ্ধ না থাকিলেও পিষ্টতণ্ডুলসম্বিত অন্ন হৃদ্ধান বলিয়া ভোজনার্থ দিলেন। উপমম্বা তাহা আশ্বাদন পূর্বক হৃদ্ধেব মধুব স্বাদ না পাইয়া কহিলেন, “মা, ইহা তো হৃদ্ধান নহে, আমি পূর্বে একবার পিতার সহিত কোনও যজ্ঞস্থলে গিয়া হৃদ্ধ পান কবিয়াছিলাম। আহা, তাহা কতই মধুর। ইহা তো

\* অনুশাসনপর্ব দ্বত্বর্ক অধ্যায়।

সেক্ষপ নহে।" বাতা ইহা শুনিয়া কহিলেন, "বৎস, আমরা তপস্বিনী, কোণায় কীর পাইব? যদি তোমার চক্ষুর ভোজনের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ভূতনাথ দেবদেব শব্বরের শরণাগত হও। তাঁহার প্রসাধে চক্ষু-ক্ষণ লাভ হয়।" তচ্ছবশে উপমন্বা কহিলেন, "সেই শব্ববেব দর্শন কোণায় পাওয়া যাইবে? তাঁহার রূপই বা কি প্রকার?" বাতা কহিলেন, "বৎস, নিবিড় বনে তপস্তা আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। চরাচর বিষয়ই তাঁহার শব্বপ। তিনি সৃষ্টিবাহন, খেতকায়, প্রসন্নবদন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই বৃক্ষিতে পারিবে যে, তিনিই শব্বর, কারণ, তিনি স্বপ্রকাশ। সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যপং আপনাকে ও জগৎকে প্রকাশ করেন, তিনিও সেই রূপ আপনাকে তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ করেন।" ইহা শুনিয়া উপমন্বা তৎক্ষণাৎ মাতাব অমুযতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার পানদ্রব্য বন্দনা করিয়া বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নির্জন শান্তরসময় প্রসন্নসলিল বনান্তরে উপনীত হইয়া তিনি কঠোর তপস্তায় বহুবৎসব কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকতায় ভুট্ট হইয়া দেবদেব ঐবাবতারিত ইজের রূপে তাঁহার দর্শন পথে উপনীত হইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস, আমি দেবরাজ ইজ, তোমার তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদানার্থ আগমন করিয়াছি। যথেষ্টীত বর প্রার্থনা কর।" ইহাতে উপমন্বা সর্বিন্যে সসম্মে কহিলেন, "হে দেবরাজ, আমি শিবদর্শনকামনায তপস্তা করিতেছি। শিব তির অস্ত্র কাহারও নিকট বর প্রার্থনা করি না। আপনাকে নমস্কাব, আপনি স্বর্গে প্রতিগমন করুন।

পশুপতিবচনাৎ ভবামি সদাঃ ক্রমিবধনা তরুরপানেকশাখঃ।

অপশুপতিবরপ্রসাদজা মে ত্রিভুবনবাক্যাবিভূতিরপানিষ্টা ॥

অপি কীটপতঙ্গৈ বা ভবেয়ং শব্বরাজ্যয়া।

ন তু শব্ব ভবা দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাম্যয়ে ॥

ভূতপতি শব্বরের আদেশে আমি এখনই ক্রমি বা বহুশাখ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত কিন্তু তন্ত্রির অস্ত্র কাহারও বনপ্রসাদে ত্রিভুবনের বাক্য ও ঐশ্বর্য্য পাইতে ইচ্ছা করি না। শব্ববাদেশে কীট পতঙ্গ হইতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু হে ইজ, তত্ত্ব ত্রৈলোক্যও কামনা করি না।"

ভূতপতি এইরূপে পনীক্য করিয়া যখন তাঁহার ঐকান্তিকী নৈটকী তন্ত্রির বিষয় অবগত হইলেন, তখন তিনি সীম বিস্ময়োহনরূপে তাঁহাকে

দর্শন দিয়া যথেষ্টীত বরদান করিলেন। অধিকন্তু শাহাকে অমবহ, চিব-  
গৌবনহ, সর্গজ্ঞ প্রভৃতি দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। এই আখ্যায়ি-  
কাটি দ্বাৰা একনিষ্ঠ ভক্তির মহীষমী শক্তি অনায়াসেই জদয়ঙ্গম হয়।  
পূৰ্ণাতিহাস প্রভৃতিতে একপ ভূবি ভূবি ঘটনা বর্ণিত আছে। নিরা-  
কার সৰ্গব্যাপী সৰ্গাত্ম্যায়ী ভগবানেব উপাসনা কবিত্তে গেলে যে ভক্তিব  
আবশ্যক হয়, তাহা জ্ঞানমিশ্রভক্তি নামে অভিহিত। তিনি সৃষ্টি স্থিতি  
প্রলয়ের কর্তা; তাহার স্বরূপ জানিবাব জ্ঞা যে প্রবল অনুভব বা  
দ্বিজ্ঞাসা হয়, তাহাই জ্ঞানমিশ্রভক্তি। বেদাদি শাস্ত্র তাহাই হইতে জন্মলাভ  
কৰিয়াছে এবং তিনি বেদাদি শাস্ত্র দ্বাৰাই বেদা। স্বাধায়, তপস্যা, শৌচ,  
সন্তোষ, ব্রহ্মচর্যা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতিব অভ্যাসপূৰ্ণ উপাসনাপন হইলে কাল-  
ক্ৰমে তাহাব মোহ বিদূৰিত হইয়া যায় এবং তিনি ভগবৎসাক্ষাৎকাৰ  
লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন।

সাকার উপাসকেব ভক্তি অষ্ট প্রকাৰ। ইহা শুদ্ধভক্তি নামে অভি-  
হিত। এই শুদ্ধভক্তি দুই প্রকাৰ,—বৈবী ও বাগান্ধগা। শাস্ত্রোক্ত বিধানানু-  
সাবে বহুবিধ উপচাব দ্বাৰা পূজা, জপ, হোম, ধ্যানাদি দ্বাৰা যে ভক্তিব  
বিকাশ হয়, তাহা বৈবী। এই বৈবী ভক্তি ক্ৰমে গাত অনুভব দ্বাৰা  
অনুপ্রাণিত হইলে বাগান্ধগা নামে কথিত হয়। এই ভক্তিব বিকাশে  
উপাস্ত পৰমেশ্বরেব ঐশ্বর্যা ভাব একবাবে তিবোহিত হইয়া যায়, ভগ-  
বান্কে পৰমাত্মীয় জ্ঞান হয়। ঈদৃশ ভক্ত তাহাকে, প্রভুভাবে, পুত্ৰভাবে,  
সখ্যভাবে বা স্বামিভাবে দর্শন কৰিয়া থাকেন। ইহাপেক্ষা নহুতবা ভক্তি  
আর নাই। ইহার চরমাবস্থা প্রেমা নামে অভিহিত। ভক্তেব জদয  
যখনই প্রেমদ্বাৰা উদ্ভাসিত হয়, তখনই তিনি আপনাব হৃদয়েব আত্মা  
দেবতাব সাক্ষাৎকাৰ লাভ কৰিয়া থাকেন। যশোদা বাৎসল্য ভাষের,  
মাকৃতি দাস্ত্যভাবেব, ব্রজবালকগণ সখ্যভাবেব এবং গোপবাসীগণ মধুব-  
ভাবেব আদর্শ। এই প্রেমভক্তিবলে সেই সৰ্গশক্তিমান সৰ্গব্যাপী অখণ্ড  
সচ্ছিদানন্দস্বরূপ ভগবান্ বিগ্রহবান্ হইয়া নবাকার ধারণ করতঃ কখনও  
কখনও বা পুত্ররূপে, কখনও বা প্রভুরূপে কখনও বা সখ্যরূপে,  
কখনও বা পতিরূপে ভক্তেব বশ্যতা স্বীকাৰ করেন। একান্তিকতা,  
অব্যভিচারিতা, প্রগাঢ় নিষ্ঠাই ইহাব জীবনীশক্তি। সাধকভক্ত যদি  
প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া আপনাকে বৃত্তকৃত্য কাৰ্যে চাহেন,

তাহা হইলে তাঁহাকে যেনব যাবতীও রক্তিশি নিবোধ করিবা একমাত্র  
যীৱ জদযরাজ্যের অধীশ্ববেই তন্মততা লাভ করিতে হইবে। তাহাব ভিন্ন,  
অন্ত কাহাবও রূপ যেন উক্ত সাধককে আকর্ষণ না কবে। প্রেমভক্তি  
লাভেব ইহাই একমাত্র পথ।

যাহা বলা হইল, তদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সাধক যদি গাঢ়  
অশ্রবাগবিশিষ্ট না হইয়া এই ভক্তিলাভের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে  
তাঁহাকে পূর্ণোক্ত দাক্ষিণাত্যেব শৈব বা বৈষ্ণব তুল্য হইতে হইবে।  
ধাবমান মত্তহৃদীৱ পদতলে পাণত্যাগ প্রোঃ, কিন্তু পার্শ্ববর্তী শিবমন্দিরে  
আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক প্রাণবক্ষা করা বৈষ্ণবোচিত কর্ম নহে, ইহাই  
ভূভাগাক্রমে অনেক বৈষ্ণবেব ধাবণ। যে প্রেমভক্তি ভগবৎসাক্ষাৎকারের  
একমাত্র উৎকৃষ্টতম দ্বার, তাহাব নাম গ্রহণপূর্বক কত লোক যে অজ্ঞান-  
তমঃসমাচ্ছন্ন হিংসাদেহসঙ্কুল উৎপীড়ন, অত্যাচার, নবশোণিতপাত প্রভৃতি  
বীভৎস ও ভয়ঙ্কর বৌদ্ধবসময় ব্যাকসাচারেব অবতারণা করিতেছে, তাহাব  
সংখ্যা হয় না। এই মর্কটীর্ণ দৃষ্ট বশতঃ মানবসন্তান পিশাচেব জ্বায়,  
হিংস্র পশুব গায় আচরণ পূর্বক ভ্রুংগময় সংসারকে আরও ভ্রুংগময় কবিয়া  
তুলিয়াছে।

অজ্ঞান নিবন্ধন এক সম্প্রদায়েব লোক অত্র সম্প্রদায়কে ঘৃণা কবা,  
তৎসম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণেব প্রতি অত্যাচার কবা ইত্যাদিকে ধর্ম্মাদি বলিয়া  
মনে কবে। বর্ত্তমান শতাব্দীৱ মানবগণ আপনাদিগকে প্রাচীন শোক-  
নিগেব অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত মনে করেন, কিন্তু ধর্ম্মের নাম  
কবিয়া নবশোণিতে ধবিস্বীকৃত কলঙ্কিত কবা পূর্বেও যেকপ ছিল, এখনও  
সেইরূপ আছে। সুতবাং তাঁহাদেব যে কি বিশেষ উন্নতি হইয়াছে,  
ইহা স্থির কবা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবপ্রদর্শিত পথেব পথিক হইলে মানবসন্তানকে  
আব হিংস্রপশুর গায় আচরণ করিবে হইবে না। এই মহামুত্তর, সকল  
ধর্ম্মকেই ভগবৎপাদমূলে লইয়া বাইবাব ভিন্ন ভিন্ন পথ বলিয়া উপলব্ধি  
কবিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মেব যথার্থ মর্ম্মজিজ্ঞাসু যাত্রেবই শ্রীগীতোক্ত  
“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্শ্বামুর্বর্ন্তে মনুষ্যাঃ  
পার্শ্ব সর্ব্বশঃ॥” এই শ্রীকৃষ্ণবাক্যটি বিশেষ স্মরণ বাপা কর্তব্য। এরূপ করিলে  
তিনি শ্রীবামকৃষ্ণোক্তিব সাববস্তা বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে



পারে, যদি সর্বধর্মই সত্য, তাহা হইলে বে কোন ধর্ম আশ্রয় কবিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহার উত্তবে উক্ত মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একবাক্যে বলেন, একমাত্র স্বধর্মাত্মতানই কর্তব্য। তদ্বারাই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়।

ইহা সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য তিনি কুপথনকের আচরণ দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলেন। একজন কুপথনন করিতেছে। কুপটি প্রায় দশ হস্ত পরিমিত গভীর হইয়াছে, এমন সময়ে অল্প একজন আসিয়া কহিল, “কেন মিথ্যা পবিত্র্য কবিতোছ? এখানে শত হস্ত গভীর করিলেও কুপ হইতে জল পাইবে না। আইস, আমি অল্প স্থান দেখাইতেছি। খনক তদীয় বাক্যানুসারে তদ্বিধিই স্থানে গমন পূর্বক কার্য আরম্ভ করিল, কিন্তু কুপ বিংশ হস্ত গভীর হইলেও, জলবিন্দু লক্ষিত হইল না। ইত্যবসরে অল্প একজন আসিয়া কহিল, “ভাই, এখানে খনন করিবার কুপরামর্শ কে তোমায় দিল? সমস্ত জীবন ধরিয়া যদি খনন কর, তাহা হইলেও জলবিন্দু লাভের সম্ভাবনা নাই। আমি তোমায় অল্প এক স্থলর স্থান দেখাইতেছি আইস। অত্যল্প পরিশ্রম করিলেই সেখানে সকলকাম হইবে।” তদ্বাক্যানুসারে সে তৎকথিত স্থানে গমন পূর্বক খনন আরম্ভ কবিল। দিনেব পব দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, যাইতে লাগিল। কুপ ত্রিশং হস্ত গভীর হইয়াছে, কিন্তু জল কোথায়? হতাশ হইয়া আপনাত্মক অদৃষ্টকে বারবার দিকার পূর্বক সেই চূর্ণরূপাগ্রস্ত ব্যক্তি খনন কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তাহার পরিশ্রমই সাব হইল, কোনও ফল হইল না। এতাবৎ কালে সে প্রায় ষাট হস্ত খনন করিয়াছে; যদি একস্থানে ঐক্লপ করিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাহার পরিশ্রম সকল হইত।

ধর্মবাক্যে প্রবেশেরও এই নিয়ম। একটি ধর্ম বা মতকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলে কালে তদ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। স্বধর্ম আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ, কারণ, তাহা প্রকৃতিগত বলিয়া তদ্বারা সহজে স্বীয় উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বধর্ম পালন করিতে গিয়া পরধর্মে দোষদর্শন করা মহা ক্ষুদ্রচিত্তের লক্ষণ। হীনবুদ্ধিগণ অহঙ্কার-সম্বলিত হইয়া মহামোহবশতঃ য য় সম্প্রদায় ভিন্ন অল্প সম্প্রদায় সমূহে কোনও উপকারিতা উপলব্ধি কবিতো পারে না। এই সঙ্গীর্ণরমা নরপশুগণই জগতের দাবজীয উৎপাতের কাণ। স্মরণ্য প্রকৃত ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি কিরূপ আচরণ কবিবেন? তদ্বত্তরে উক্ত মহাত্মা বলেন, স্বগুরু-সুহে

ধাকিয়া বধু যেরূপ স্বীয় স্বভগ্ন, স্বশ্রু, দেবব প্রভৃতিকে ভক্তি, যাত্র ও শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু স্বীয় পতির সহিতই অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ থাকেন, সেইরূপ প্রকৃত ধার্মিক অগ্রাভ ধর্মসমুদয়কে ভক্তি, যাত্র ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বধর্মের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ আব কোনও ধর্মের সহিত হইতে পাবে না। এরূপ কবিলেই তাঁহার শুদ্ধা-ভক্তি লাভ হইবে ও তদ্বা তাহি ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ করিবেন।

এই অব্যতিচাবিণী নৈর্দিকী ভক্তি স্বধর্ম প্রতিপালন দ্বারা গোবিন্দের হৃদয়ে বিকসিত করাইবাব জগ্‌ই শ্রীমাম্নজ শ্রীশৈলপূর্ণ দ্বারা তাঁহাকে স্বীয় বৈষ্ণব ধর্ম পুনর্গ্রহণ করাইয়াছিলেন। অতএব বামাম্নজ সদীর্ঘ দৃষ্টিব বশবর্তী হইয়া যে উক্ত কর্ম কবেন নাই, ইহা স্পষ্ট। গোবিন্দকে স্বপার্ষে পাইয়া তাঁহার আব আনন্দের সীমা বহিল না। তিনি অচিবকাল মধ্যেই স্বীয় বন্ধুকে শান্তিব অমৃতময় সাগবে নিমজ্জিত করিলেন। প্রেমভক্তিপরিপূর্ণ গোবিন্দহৃদয়ে অনতিবিলম্বেই সর্ললোকসলামভূত শ্রীমদ্বাযণেব দিব্য রূপ উদ্ভিত হইল। তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া বিজ্ঞাননের পরাকার্য উপনীত হইলেন।

শ্রীরঙ্গমহ্‌ মঠ স্বর্গদারস্বরূপ হইয়া এইরূপে যে কত শত সন্তুষ্ট-হৃদয়ে শান্তি-বারি সিঞ্জন পূর্বক দেবতুল্য আনন্দের তবঙ্গে তাহাণিকে ভাসাইয়া-ছিল, তাহা গণনা কবা যায় না। শ্রীমাম্নজের জীবহিতচিকীর্ষা কিরণ বশবর্তী ছিল, তাহা পরবর্তী ঘটনা পাঠ কবিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ক্রমশঃ।

## জগৎ সত্য কি মিথ্যা ?

( স্বামী শুদ্ধানন্দ )

সাধারণ পাঠক এই প্রবন্ধেব নাম দেখিয়াই প্রবন্ধরচয়িতাকে বহুমানের সহিত বাতুলাত্রমে পাঠাইবার জোগাড় করিবেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু বাহাবা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ‘জগৎ সত্য কি মিথ্যা’ এই প্রশ্নটি নিতান্ত অপরিচিত নহে। সাধা-

রণ পাঠক যাহাতে এই প্রবন্ধের বার্থ বোধ ও প্রকৃত মীমাংসা জানিতে পাবেন, তজ্জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আশা কবি, দার্শনিক পাঠক-গণও এতৎপাঠে উপকৃত হইবেন, কারণ, ইহাতে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সাধকজীবনের প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে ব্যাখ্যা কবিবার চেষ্টা করা যাইবে।

প্রথমে প্রশ্নটা একটু বিশদতর ভাষায় ব্যক্ত করা যাউক। এই যে বাহু জুগৎ সম্মুখে দর্শিতেছি, যাহাতে মনোহব কোকিলকাকলিব মধ্যে ভীষণ বজ্রধ্বনি, সূঠামরুপের পাশ্বেই ভূতভীতি উৎপাদক বীভৎস আকৃতি, হৃৎকেন শয্যার কোমল স্পর্শের সঙ্গে আততায়ীর খড়গাঘাতজনিত বেদনা, চন্দন অঙ্কুর স্তম্ভাণের সহিত বিষম পুতিগন্ধ এবং দেবতাবও রসনাশ্রীতিকব মধুর স্বাদেব সঙ্গে একত্রে তিজ্যোষধেব ঘোব বিবাদ বর্তমান, এই যে অমুকুল প্রতিকূল উভয়বিধ বিষয়েব নিবাসভূমি, রাগদ্বেষ উৎপন্নকারী পাঞ্চার্গ্যৈতিক জগৎ, ইহার কি মনোনিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? মনে ককন, আমি একটা সুগন্ধ পুষ্প আভ্রাণ কবিতেছি। এই পুষ্পেব অস্তিত্বটা কিং-ধরূপ, ইহা যদি আমি বিশেষ বিচার কবিয়া দেখি, তবে দেখিব, উহার মূলব রূপ, দিব্য সুবাস প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিই আমার অনুভব হইতেছে, কিন্তু ঐ সকল গুণসমষ্টি ছাড়া পুষ্প যে কি বস্তু, তাহা জানিতে পাবিতেছি না। জগতে যে কোন বস্তু ‘আছে’ বলিয়া আমবা উল্লেখ কবিয়া থাকি, তাহা ঐ রূপে আমাদেব এক, দুই, তিন, চাব বা পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন বলেন, জগতের যাবতীয় পদার্থই পাঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কবা যাইতে পারে। কোন বিষয়টা কোন ইন্দ্রিয়বিশেষের মূলভাবে গ্রাহ্য না হইলেও উহা কেবল ঐ ইন্দ্রিয়বিশেষের ক্ষমতাহীনতাব পবিচায়কমাত্র। যদ্ববিশেষেব সহায়ে ঐ ইন্দ্রিয়েব ক্ষমতা বৃদ্ধি কবিতে পাবিলে ঐ পদার্থেব ঐ গুণ ঐ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কবিয়া থাকে। নানা পদার্থেব মিশ্রণে উৎপন্ন পদার্থনিচয়ের তো কথাই নাই, অবিমিশ্র পদার্থনিচয়, যথা হাইড্রোজেন গ্যাসাদিকেও ঐক্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কবা যাইতে পাবে। সাংখ্যাদি প্রাচীন ভাবতীয় দর্শনকাব সকলের এ বিষয়ে ভিন্ন মত। তাঁহারা বলেন, মুলেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেব সমগ্র পদার্থ নিচয়ই পাঁচটা অবিমিশ্র পদার্থেব সংযোগে বা মিশ্রণে উৎপন্ন। ঐ পাঁচটা অবিমিশ্র পদার্থেব প্রত্যেকটি মানবের পাঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কোনটা একে-

ক্রিয়গ্রাহ, কোনটাই হই এবং কোনটাই বা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণীয়। একমাত্র কণেক্রিয়গ্রাহ শব্দগুণ আকাশ। হই অর্থাৎ কর্ণ ও ত্বক্ ইন্দ্রিয়গ্রাহ পদার্থ বায়ু, তিন ইন্দ্রিয় গ্রাহ ( কর্ণ, ত্বক্ ও চক্ষু ) তেজঃ, চার ইন্দ্রিয় গ্রাহ ( কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ) জল ও পাঁচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ পদার্থকে তাঁহারা পৃথিবী বলেন।

যাহা হউক, মোটামুটি দেখা যাইতেছে, সমুদয় জড় জগৎই ইন্দ্রিয়গ্রাহ রূপরসাদির সমষ্টিরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত। ঐ সকল বিভিন্নরূপরসাদি ছাড়া হয় স্বভঙ্গতের পশ্চাতে কিছু নাই বা যদি থাকে তো তাহা আমাদের গোচর নহে। এখন প্রশ্ন এই, এই সকল রূপরসাদির সমষ্টি, বাহ্যার প্রত্যেকটাকে আমরা এক একটা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া থাকি এবং বাহ্যাদিগকে আমরা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্থূলতঃ অনুভব করিয়া থাকি, বাস্তবিক কি তাহাব আমরা হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? গুণ সকল তো মনের বিষয় অথবা বিভিন্ন মানসিক পরিবর্তনের নামই আমরা গুণ দিয়া থাকি। তবে প্রত্যেক গুণানুভবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিতরে একটা প্রবল বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে যে, ঐ প্রকার মানসিক পরিবর্তন আমার বাহিরে বর্তমান, আমরা হইতে স্বতন্ত্র ঐ পদার্থবিশেষের দ্বারা উৎপাদিত হইল। অতএব মনে ঐ প্রকার পরিবর্তন সংঘটন কবা ঐ পদার্থের গুণ। আমার মনের ভিতর ঐ প্রকার পরিবর্তনবিশেষ উৎপন্ন হওয়াব সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্যই যথেষ্ট, কিন্তু বাহিরে যে একটা পদার্থবিশেষ বহিয়াছে, তাহার দ্বারা আমার মন ঐ রূপে পরিবর্তিত হইতেছে, সেটা আমার বিশ্বাস মাত্র। সত্য কি না, কে বলিতে পারে? সেই জগৎই দার্শনিকদের ভিতর পুরুষোক্ত প্রশ্নের উৎপত্তি— জগৎটা কি আমার মনছাড়া অস্তিত্ব কি অথবা মনের ভিতরেই একটা জিনিষ?

সাধারণতঃ উত্তর এই পাওযা যায়, এই জগৎতবই বাস্তবিক সত্তা আছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাব উপলব্ধি হয় মাত্র। তাঁহারা একথা বলেন, তাঁহাবা গভীর ভাবে এই প্রশ্নের ভিতর প্রবেশ করিতে পাবেন না বা চাহেন না। তাঁহারা একটু সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাবা বলেন, বাহির এবং ভিতর অর্থাৎ মন ও বাহ্যবস্ত্র উভয়ের সংযোগেই জগৎতব জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ। যখন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই জ্ঞান কেবল মনোজ্ঞান হইতে পারে না, আলাব মন ব্যতীত বাহ্যবস্ত্রও কোন জ্ঞান হইতে পারে না, একথাও সত্য।

কোন কোন মতাবলম্বী বলেন, জগৎবোধটা সমুদয়ই আমার মনের বিকাশ, কারণ, তুমি যে বাহ্যবস্ত্র দ্বারা মনে আঘাত লাগিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হয়, বলিতেছ, সে বাহ্যবস্ত্র অস্তিত্বই যে আমাব মনে—আমার মন না হইলে কে উহার অস্তিত্বে সাক্ষ্যদান করিবে ? যদি বল, আমরা সকলে দেখিতেছি, এই বস্ত্রের অস্তিত্ব বহিয়াছে, তাহাব উত্তরে বলা যাইতে পারে, তুমিও আমার নিকট বাহ্যবস্ত্র মাত্র ; তুমি যে আছ, আমার নিকট তাহার প্রমাণও আমি। আমি তোমায় দেখিতেছি, তাই তুমি আছ। যদি বল, তবে সকলেই জগৎ একরূপ দেখে কেন, ইহার উত্তর,—সকলেই জগৎ একরূপ দেখে, ইহার প্রমাণাতাব। আমি, তুমি না হইলে কখনই বুঝিতে পারিব না যে, আমিও যে জগৎ দেখিতেছি, তুমিও সে জগৎ দেখিতেছ। যদি বল, তবে সমুদয় ব্যবহার নিকাহ হইতেছে কি রূপে ? ইহার উত্তর একটা উদাহরণ দিয়া বলি গুন। মনে কর আমি বলিলাম, ‘সন্দেশ খাবো’ অর্থাৎ আমি মুখযন্ত্র এ রূপে নাড়িলাম যে, উহাতে বায়ু-সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তবঙ্গ উপস্থিত হইয়া আমার কর্ণে লাগিল। সেই ভিন্ন ভিন্ন আঘাতসমূহ আমাব কর্ণে লাগিবা ‘সন্দেশ খাবো’ এই শব্দাকারে আমার অনুভবগোচর হইল। ঐ তবঙ্গনিচয় তোমাব কর্ণেও ঠিক ঐ ভাবে যে আঘাত কবিল, তাহাব প্রমাণাতাব ! অতএব আমাব অনুভবের বিষয় ‘সন্দেশ খাবো’ এই শব্দ তোমার কর্ণযন্ত্রে কি আকারে প্রতিভাত হইল, তাহা আমার জানিবার কোন উপায় নাই। তুমি হযত গুনিলে, ‘সাপ ব্যাং।’ তার পর তুমি মুখেব একরূপ বিরূতি কবিলে, হযত তাহাব ফলস্বরূপ তুমি গুনিলে একরূপ, কিন্তু আমি গুনিলাম, ‘আচ্ছা, খাও’। এইরূপে একটু গভীর প্রণিধান করিলেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতি হইলেও যে ব্যবহার চলিতে পাবে, তাহা প্রমাণিত হয়। এইরূপ ভয়ানক গোঁড়া মনোবাদীকে যদি জিজ্ঞাসা কবা যায়, মন কি পদার্থ, বাহ্যবস্ত্রনিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণ রূপে ঐ পদার্থ থাকিতে পাবে কি না এবং যদি পাবে ত তখন ঐ স্বাধীন মনের মনস্ব থাকে কি না, তবে তাহার বড় গোল বাধিয়া যায়।

এ সম্বন্ধে আমি যুক্তি চিন্তা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমার ধারণা,—স্বাধীন বাহ্য জগৎ ইন্দ্রিয়পথে মনের উপর আঘাত কবিয়া অথবা মন স্বতন্ত্রভাবে বাহ্যবস্ত্রনিরপেক্ষ হইয়া জগৎসৃষ্টি কবে না। বিচার করিলে দেখিতে পাই, বাহ্যবস্ত্রও মন এই দুইটির অস্তিত্বই সাপেক্ষ। অর্থাৎ দুইটা

বস্তু হয় যুগপৎ অবহান কবিবে নয় যুগপৎ লীন হইবে। বাহ্যবস্তু আছে, মন নাই, ইহা হইতে পারে না, অথবা মন আছে, বাহ্যবস্তু নাই, তাহাও হইতে পারে না। তবে ইহাদের উৎপত্তি কোথা হইতে ও কিরূপে হইল ? আমার বোধ হয়,—কোন অজাত অনির্লচনীয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ নিজ শক্তিব অলৌকিক ইঞ্জজাল প্রভাবে মন ও বহির্জগৎ রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সেই পদার্থের স্বরূপ অনুমানের দ্বারা এইটুকু মাত্র বোধ হয় যে, তাহাতে আপন স্বরূপ হইতে অপব বস্তু নিচয়ের পৃথক্ অস্তিত্বরূপ পার্থক্য বোধ নাই। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিত ঐ বস্তুকেই কি শাস্ত্র নাম দেন ব্রহ্ম ?

এখানে আর এক প্রশ্ন আসিতেছে,—পূর্বে যে ইঞ্জজালশক্তির উল্লেখ কবিয়াছি, তাহা কি জীবের অর্থাৎ প্রত্যেক শরীরিগত ভেদজ্ঞানাপ্রণয়ে বর্তমান পদার্থনিচয়ে অবস্থিত অথবা পুরোক্ত অনির্লচনীয় ব্রহ্মপদার্থে ? এ প্রশ্নের কথা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেও মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া যায়। জীবের যদি ঐ শক্তি থাকে, তবে জীবভাব উৎপাদন কাহার কার্য্য ? আর ব্রহ্মে এ মায়া স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র বস্তুর সত্তা স্বীকৃত হওয়াতে নিজ-কৃত শিবান্তহানিরূপ দোষ উপস্থিত হইল।

এই পর্য্যন্ত যুক্তিগম্য, তার পর যুক্তির অনধিকার। সাধনালোকে এই সকল তত্ত্ব অতি পরিষ্কৃত। সাধক বলেন, পূর্বে যে বিভিন্ন মতের কথা বলিলে, ওর কোনটাই মিথ্যা নহে। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে এই সকল বিভিন্ন বুদ্ধি মানবের আসিয়া থাকে। যখন মন নিতান্ত তমোভাসাপন্ন থাকে, তখন বাহ্য জগৎকে একটা স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ বস্তু বোধ হয়। একটু উন্নত হইলে মনে হয়, বাহ্যবস্তু ও মন উভয়ের মিশ্রণে জগতের উৎপত্তি, আগও উচ্চাবস্থায় মনকে সর্বস্ব বলিয়া ধারণা হয়; আবার ইহা হইতেও উন্নত অবস্থায় যখন সাধক চলিয়া যান, তখন তিনি সমুদয় জগৎকে এক অনির্লচনীয় বস্তুর মায়াবিলাস বলিয়া দেখিতে পান। তদন্তীত অবস্থায় মায়া পর্য্যন্তের জ্ঞান থাকে না। এক ব্রহ্ম চৈতন্ত আপনাকে আপনি অনুভব করেন, কথায় এইটুকু মাত্র বলা যায়।

কল্পনা দ্বারা পুরোক্ত বিষয়টা একবার অনুভব কবিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রথমে কোন ব্যক্তির অনুভবে যেন সঙ্গবস্তুর এবং নিজের অস্তিত্বের বা আমি জ্ঞানের যুগপৎ অনুভূতি হইতেছে। কল্পনার পক্ষকে আব একটু প্রসারিত কর, দেখ, অনুভবকর্তা ও অনুভূত বস্তুর যেন কোন ভেদ নাই। তিনিই

যেন আপনাকে ঋণ ঋণ করিয়া একদিকে বিষয়ী অপরদিকে বিষয় সাজিয়া ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের ব্যবধান দিয়া আপনাকে আপনি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন ! একরূপ কল্পনা কবিবার আবশ্যিকতা এবং পরিণাম কি ? একরূপ কল্পনাসহায়ে চেষ্টা কবিত্তে করিতেই এই অনাদি অনন্ত সংসারপ্রবাহেব পবপাবে যাইয়া সেই “আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূর্ণ” পদার্থেব জ্ঞান নহে, অমুভূতি হইয়া থাকে । যে পদার্থ বুদ্ধিগম্য নহে, তাহার আবার জ্ঞান হইবে কিরূপে ? এইরূপে দৈবাৎ কাহারও ঘুম ভাঙে, দৈবাৎ কেহ আপনার ও জগতের যথার্থ স্বরূপ ‘সেই এক প্রথম সূর্য্য’ পর্য্যবসিত দর্শন করিয়া এবং ঐ দর্শনের ফলস্বরূপ ‘সেই সূর্য্য তারি কিরণ, যেই সূর্য্য সেই কিরণ’ এই বোধে জীবমুক্ত ও মুক্ত হইয়া থাকে !

তবেই সিদ্ধান্ত এই, এই অনন্ত জগতে যে সেই এক পদার্থকে উপলব্ধি করিয়াছে, সেই জানিয়াছে, জগৎটা কি ব্যাপাব । তাহার পক্ষে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য । আর যে উপলব্ধি কবে নাই, তাহার পক্ষে জগৎ এবং তদ্ব্যবস্থারূপবসাদিই সত্য আব ব্রহ্ম নাস্তি ! যাহারা দেখেন, জগতে কেবল সুখই রহিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু বোগ শোক মৃত্যু চাবিদিকে নৃত্য কবিয়া বেড়াইতেছে, কেহ নানা সংকার্য্য কবিয়া অতুলকীর্ত্তি বাখিয়া যাইবে বলিয়া মনে স্থির কবিলেও হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইতেছে, ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখ মান অট্টালিকা আত্মীয় বিভব মানুষকে সুখী কবিলেও তাহা দুই দিনের জন্ত, যাহাদেব এ সকল চিন্তা মনে উদয় হয়, তাহাদিগকে বিবেকবৈবাগ্যাবান বলে—তাহাবাই তত্ত্বালোচনার অধিকারী, তাহাবা জগৎকে ছায়াবাস্তি বলিয়া থাকেন । তুমি আমি উহাকে সত্য বলিয়া প্রবল নিষ্ঠাব সহিত ধরিয়া বাখিলেও জ্ঞানীচ চক্ষে উহাব সত্যত্ব কখনই প্রতিপাদিত হইতে পাবে না । জগৎকে সত্য বলিলে সত্যেব অবমাননা কবা হয় । ব্যবহারিক জগৎ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না । জগৎ দেখিতেছি সত্য, তথাপি উহা মিথ্যা, ইহা যদি লোককে বুঝাইতে পাব, তবে লোকের মন প্রকৃত সত্যাত্মসন্ধান আকৃষ্ট হইবে ।

জগতের মিথ্যাত্ব পুরোক্ষজ্ঞানে বোধ হইলেও কি রূপে জাগতিক সমুদয় কর্ম্ম স্বরূপে—পূরোপেক্ষা ভালরূপে নিরূপিত হইতে পাবে, এ সম্বন্ধে বাবাস্তবে আলোচনাব ইচ্ছা বহিঃ ।

## স্বামী-শিষ্য-সংবাদ ।

( শ্রীশরচ্ছন্দ চক্রবর্তী । )

ডায়েবি হইতে উদ্ধৃত ।

শিষ্য। স্বামীজি। জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কিরূপে হতে পাবে ?  
দেখতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ শব্দেব নাম শুনে কাণে হাত  
দেয় আবার জ্ঞানমার্গারা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন উল্লাস নৃত্য  
গীতাদি দেখে বলেন, ওরা ( Fanatic ) পাগলবিশেষ ।

স্বামীজি। কি জানিস, গৌণজ্ঞান ও গৌণভক্তি নিম্নেই কেবল বিবাদ ।  
ঠাকুরের সেই ভূতবানবেব গল্প শুনেছিস্ ত ? \*

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ ।

স্বামীজি। কিন্তু মুখ্যভক্তি ও মুখ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নাই। মুখ্য-  
ভক্তি মানে হচ্ছে ভগবানকে প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই  
যদি সর্বত্রই ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখিস্ ত কাকে আব হিংসা  
দেব কব্বি ? সেই প্রেমামৃতভূতি এতটুকু বাসনা বা ঠাকুর যাকে  
বলুতেন কামকান্দনাসক্তি—ধাক্তে হবার যো নাই। সম্পূর্ণ  
প্রেমামৃতভূতিতে দেহবুদ্ধি পর্য্যন্ত থাকে না। আব মুখ্য জ্ঞানের  
মানে হচ্ছে সর্বত্র একত্বাত্মভূতি, আত্মস্বরূপেব সর্বত্র দর্শন। তাও  
একটু অহংবুদ্ধি থাকতে হবার যো নাই।

শিষ্য। তবে আপনি যাকে প্রেম বলেন, তাই কি পবনজ্ঞান ?

স্বামীজি। তা বই কি। পূর্ণপ্রজ্ঞ না হলে কারো প্রেমামৃতভূতি হয় না।

তোদের বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলে না ?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ ।

স্বামীজি। ঐ সচ্চিদানন্দ শব্দের মানেই হচ্ছে, সৎ অর্থাৎ অস্তিত্ব ; চিত্ত  
অর্থাৎ চৈতন্য বা জ্ঞান ; আব আনন্দ বা প্রেম। ভগবানের

---

\*। শিবরামের যুদ্ধ হয়েছিল। রামের গুরু শিব। যুদ্ধও হলো, হুজনে জাগও হলো !  
কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো, ওদের স্বগড়া কিচকিচা আর  
মেটে না।



সং ভাবটা নিয়ে ভক্ত ও জ্ঞানীর কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মের চিং বা চৈতন্য সত্তাটাই বৈশী কোক দেয় আব ভক্তগণ আনন্দ সত্তাটাই বৈশী করে নজ্জবে রাখে। কিন্তু চিং স্বরূপ অনুভূতি হবামাত্র তখনি আনন্দ স্বরূপেও উপলব্ধি হয়। কারণ, যাহা চিং, তাহাই যে আনন্দ।

শিষ্ট। তবে ভাবতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন ; এবং ভক্তি ও জ্ঞান শাস্ত্রেই বা এত বিবোধ কেন ?

স্বামীজি। কি জানিস, গোঁণভাব নিয়েই অর্থাৎ যে ভাবগুলো ধবে মাহুয ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ কবে, সেই গুলোর ভিতরেই যত লাটালটি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোব কি বোধ হয়, end (উদ্দেশ্য) বড কি means (উপায়গুলো) বড ? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য হতে কখন উপায় বড হতে পারে না। কেননা অধিকারী ভেদে একই উদ্দেশ্য লাভ কব্বার উপায় নানাবিধ হয়। এই যে দেখছি জপ ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আব পবাত্তি বা পবমব্রহ্ম স্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। একটু তলিবে দেখলেই বুঝতে পাববি, বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বলছেন, পূবমুখে হয়ে বসে ভগবানকে ডাকলে তবে তাঁকে পাওয়া যায় আর একজন বলছেন, না, পশ্চিমমুখ হয়ে বসতে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হবত একজন বছকাল পূর্বে পূর্বমুখ হয়ে বসে ঈশ্বব লাভ কবেছিলেন ; তাঁর চেলারা তখনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, পূর্বমুখ না হয়ে বসলে ঈশ্বব লাভ হবে না। আর একদল বলে, সে কি কথা ? পশ্চিমমুখে বসে অমুক ভগবান লাভ করেছে, আমবা শুনেছি যে। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হবত হবিনাম জপ করে পবাত্তি লাভ করেছিলেন ; অমনি শাস্ত্র তৈয়িри হল, “আন্তোব গতিরুখা”। কেউ আবার আল্লা বলে সিন্ধ হলেন, তখনি তার আব এক মত চলতে লাগল। কিন্তু দেখতে হবে, এই সকল জপ পূজাদিব খেই কোথায়। খেই হচ্ছে শ্রদ্ধা ; সংস্কৃতভাষাব ‘শ্রদ্ধা’ কথাটি বুঝাবার মত শব্দ আমাদেব ভাষায় নাই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদবে প্রবেশ কবে-

ছিল। ‘একাগ্রতা’ কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদায় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। একাগ্রনিষ্ঠা বললে শ্রদ্ধা কথাটির ঋণিকটা মানে হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে কোন তত্ত্ব হোক না, তাবতে থাক্ণেই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্রে দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অন্তর্ভূতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তত্ত্ব বা জ্ঞান শাস্ত্র উভয়েই ঐক্য এক একটা নিষ্ঠা জীবনে আন্বাব জন্ত মানুষকে বিশেষ উপদেশ কচ্ছে। যুগপবম্পরায় বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে সে সকল মহান্ সত্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হচ্ছে। শুধু যে তোদের ভাবতবর্ষে হচ্ছে, তা নয়—পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই ঐক্য হচ্ছে। আব বিচারবিহীন সাধারণ জীব সে গুলো নিয়ে বিবাদ কবে মরছে। খেই হাবিয়ে ফেলেছে; তাই লাটলাট চলেছে।

শিষ্য। তবে এব উপায় কি ?

স্বামীজি। পূর্বের মত ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা আনতে হবে। আগছাগুলো উড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জনা পড়ে গেছে। সে গুলি সাফ করে ঠিক ঠিক তত্ত্বগুলি লোকেব সামনে ধতে হবে; তবেই তোদের ধর্ম্যেব ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য। কেনন করে তা হবে ?

স্বামীজি। কেন ? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। মারা সেই সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করে গেছেন—তাদের লোকেব কাছে Ideal রূপে খাড়া কন্তে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। বৃন্দাবন লীলা ফিলা এখন রেখে দে। গীতাসিংহনাদকাবী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা; শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য। কেন, বৃন্দাবনলীলা মল কি ?

স্বামীজি। এখন ঐ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাণী বান্ধিয়ে দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই তোপ্ তাপ্ গোলাগুলি, ঢাল তরোয়াল নিয়ে খেলা। মাব্ মাব্ কাট্ কাট্ করে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জ্ঞানবার জন্ত উঠে পড়ে লাগতে হবে।

শিষ্য । তবে বৃন্দাবনলীলা কি সত্যি নয় ?

স্বামীজি । তা কে বলছে ? সে বড় উচ্চ সাধনা । এই ঘোর কামকাঞ্চনা-  
মুক্তির সময় ও সব উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতেই পারবে না ।

শিষ্য । তবে যারা মধুবসখ্যাদি ভাবে সাধনা করছে, তারা কি কেউ ঠিক  
পথে যাচ্ছে না ?

স্বামীজি । আমার ত বোধ হয় না ; তুই একটা থাকলেও থাকতে পারে । বাকী  
জান্বে ঘোর তমোভাবাপন্ন । অধিকাংশই full of morbidity,  
অস্বাভাবিক দুর্বলতা সমাচ্ছন্ন ! দেশটাকে তুলতে হবে ; মহাবীরের  
পূজা চালাতে হবে ; শক্তিপূজা চালাতে হবে ; শ্রীরামচন্দ্রের  
পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে । তবেই তোদের কল্যাণ ; দেশের  
কল্যাণ । নতুবা উপায় নাই ।

শিষ্য । শুনেছি ত, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুন সংকীর্ণন করেন ?

স্বামীজি । হাঁ ; তাঁর কথা সত্য । জীবের সঙ্গে তাঁর তুলনা ? তিনি সব  
মতে সাধন করে দেখিয়েছেন, সকলগুলিই এক তবে পৌঁছে  
দেয় । তিনি যা কবেচেন, তাই কি তুই আমি করতে পারব ? তাঁকে  
আমরা কেহ বুঝতে পাবিনি । এজ্ঞ আমি তাঁর কথা যেখানে  
সেখানে বলি না । তিনি যে কি ছিলেন, তা তিনিই জানতেন ,  
দেহ মাত্র মানুষের মত ছিল ; কিন্তু আর সব সত্যত্ব ।

শিষ্য । আচ্ছা আপনি তাঁকে অবতার বলে মানেন কি ?

স্বামীজি । তোর অবতার কথা মানি না কি আগে বল দেখি ?

শিষ্য । কেন, যেমন শ্রীবাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরান্ধ, বুদ্ধ, জৈনা ইত্যাদি ।

স্বামীজি । তুই যাদের নাম করলি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের  
সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা ত ছোট কথা—জানি ।

শিষ্য অবাচ্ হইয়া গুনিতে লাগিল ।

স্বামীজি । থাক এখন সে সব কথা । সময় ও সমাজ উপযোগী এক এক মহা-  
পুরুষ আসেন ; ধর্ম উদ্ধার কতে । চাই তাঁদের মহাপুরুষ বল, চাই  
তাদের অবতার বল । তাতে কিছু আসে যায় না । তারা Ideal দেখিয়ে  
যান ; তাঁদের ছাঁচে ক্রমে গড়ন চলতে থাকে ; মানুষ তৈয়েরী হয় ।  
সম্প্রদায় চলতে থাকে । কালে ঐ সকল সম্প্রদায় বিকৃত হলে, আবার  
ঐরূপ অন্য সংস্কারক আসেন ; এই প্রথা প্রবাহ রূপে চলে আসছে ।

শিষ্য। আপনি ঠাকুরকে অবতার বলে ঘোষণা করেন না কেন ? আপনার ত শক্তি, বাগ্মিতা সব আছে।

স্বামীজি। আমি ঠিক বলছি, আমি তাঁকে অল্পই বুঝেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় যে, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয়, পাছে সত্যের অপলাপ হয়; পাছে আমার এই অল্পশক্তিতে না কুলায়; বড় কবুতে গিয়ে পাছে তাঁর ছবি আমার চঙে এঁকে তাঁকে ছোট করে ফেলি !

শিষ্য। কেন, অনেকে ত তাঁকে অবতার বলে প্রচার কচ্ছে।

স্বামীজি। তা করুক। যে যেমন বুঝেছে, সে তেমন করছে। তোবও বিশ্বাস হয় ত তুইও কর'না।

শিষ্য। আমি আপনাকেই ধন্তে পাচ্ছি না। তা আবার ঠাকুরকে ? আপনার রূপাকণা পেলেই আমি এ জন্মে ধন্ত হইব।

এই বলিয়া শিষ্য স্বামীজির পদধূলি লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

ক্রমশঃ।

## স্বামী বিবেকানন্দের পত্র।\*

ও নমো ভগবতে বামরুক্ষায়।

ষস্য বীৰ্য্যেণ কৃতিনো বযং চ ভুবনানি চ।

রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শব্দং স্বতন্ত্রমীশ্বরং ॥

“প্রভবতি ভগবান্ বিবি”রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগনিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌকষং বহুমন্তমানাঃ। তয়োঃ পৌকষাপৌকুষেযপ্রতীকারবলযোঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি যদা যতস্বাস্থ্যন্ শরচ্ছত্র আক্রমিতুম্ জ্ঞান-গিবিগুরোর্গরিষ্ঠং শিববৎ।

যহুজ্জং “তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিত্তি” উচ্যেত তদপি শতশঃ “তৎস্বমসি” তদ্বাধিকারে। ইদমেব তদ্বিদানং বৈবাগ্যবজঃ। ধত্তং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অবোচিসু অপি নির্দিশামি পদং প্রাচীনং,—“কালঃ

\* এই পত্রগুলি স্বামীজি প্রথম বার আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর আলমোড়া হইতে ৩রা জুলাই (১৮৯৭) তারিখে ঈশ্বরচ্ছত্র চক্রবর্তীকে লিখিয়াছিলেন।

কচ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্” ইতি । সমাক্ষতক্ষেপনীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নি-  
 ঙ্গরঃ । পূৰ্ণাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবৎ । তদেবোক্তং,—“তৎ  
 স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাশ্রয়ি বিক্ৰতি ।” “ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগে-  
 নৈকেন অমৃতত্ৰয়মশ্বতঃ” ইত্যত্র ত্যাগেন বৈবাগ্যমেব লক্ষ্যতে । তদৈবাগ্যং  
 বস্তশূন্যং বস্তভূতং বা । প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোহপি কীটভক্ষিত-  
 মস্তিক্কেন বিনা ; যদ্যপবৎ, তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ যনসঃ সঙ্কোচনং,  
 অশ্রুশ্রাৎ বস্তনঃ পিণ্ডীকবণঞ্চ দ্বৈশ্বে বা আশ্রয়ি । সর্বেশ্ববস্ত ব্যক্তিবিশেষো  
 ভবিতুং নাইতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ং । আশ্রয়িত বৈবাগ্যবতো জীবাত্মা  
 ইতি নাপদ্যতে, পবস্ত সর্বগঃ সৰ্ব্বাশ্রয়্যামী সৰ্ব্বসামান্যরূপেণাবস্থিতঃ সর্বেশ্বব  
 এব লক্ষ্যকৃতঃ । স তু সমষ্টিরূপেণ সর্বেশ্বাং প্রত্যক্ষঃ । এবং সতি জীবৈ-  
 শ্বর্যোঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তবোঃ সেবাপ্রেমরূপকর্ণগোবভেদঃ । অয-  
 মেব বিশেষঃ,—জীবৈ জীববুদ্ধ্যা যা দেবা সমর্পিতা, সা দয়া, ন প্রেম । যদাশ্র-  
 বুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম । আশ্রয়নো হি প্রেমাস্পদস্য শ্রুতিস্মৃতি-  
 প্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধাত্মা । তদুযুক্তমেব যদবাদীং ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম দ্বৈশ্বে,  
 দয়া জীবৈ ইতি । দ্বৈতবাদিত্যাং তত্র ভগবতঃ সিদ্ধান্তঃ জীবৈশ্ববযোভেদ-  
 বিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ । অস্মাকস্ত অদ্বৈতপরাগাং জীববুদ্ধিবুদ্ধনাথ ইতি । তদ-  
 স্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া । জীবৈ প্রযুক্তঃ দয়াশঙ্কোহপি সাহসিকজন্মিত  
 ইতি মতামহে । বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে ; নাস্তু কল্পান্তভূতির-  
 স্মাকং অপি তু প্রেমাস্তবঃ স্মাস্তবঃ সৰ্ব্বশ্রিন্ ।

সৈব সৰ্ববৈষম্যসাম্যকবী ভবব্যাদিনীকজকবী প্রপঞ্চাবশাস্তাব্যত্রিতাপ-  
 হবণকবী সৰ্ববস্তুরূপপ্রকাশকবী মায়াধ্বান্তবিক্ষংসকবী আত্রস্তম্বপর্যাস্ত-  
 স্বাস্তরূপপ্রকটনকবী প্রেমাস্তভূতিবৈবাগ্যরূপা ভবতু তে শর্যণে শর্যণ্ ।

ইত্যন্তদ্বিসং প্রার্থয়তি

ত্বয়ি ধৃতচিবপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ ।

## ঐ বঙ্গানুবাদ ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় ।

যাঁহাব শক্তিতে আমবা এৰং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বৰ ত্রীবামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা কবি ।

হে আত্মহীন শবচ্ছত্র, যে সকল শাস্ত্রকাব কৰ্ম্মপটু নহেন, তাঁহাবা বলেন, ভগবান্ বিধাতাই প্রবল, তিনি যাহা কবেন, তাহাই হয়, আব যাঁহাবা কৰ্ম্মকুশল, তাঁহাবা পুরুষকাবকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন । এই বে কেহ পুরুষকাবকে হুঃখ প্রতীকাবের উপায় মনে করিখা সেই বলের উপর নির্ভর কবেন, আবার কেহ কেহবা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্বোচ্চ শিখরে আবোহণের ঞ্জ যত্ন কব ।

যদিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—বিপদে পড়িলেই তত্ত্বজ্ঞানের পরীক্ষা হয়, হুঃখ কষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টপাথবস্বরূপ, কিন্তু শাস্ত্রের যেখানে তত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, সেখানে শতশত বার ইহাও কথিত হইয়াছে যে, ‘সেই ব্রহ্ম তুমিই । ইহাই বৈরাগ্য বোগের ঔষধ স্বরূপ । যাঁহার জীবনে বৈরাগ্যের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি ধন্য । তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায বলিতেছি, “কিছু সময় অপেক্ষা কবা ।” দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাব উপর নির্ভর কবিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কব; পূর্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে । এই ঞ্জই বলা হইয়াছে, “যোগে সিদ্ধ হইলে কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে ।” আব এই বে কথিত হইয়াছে,—“ধন বা সম্ভান হাবা অমবত্ন লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ হাবাই অমরত্ব লাভ হয়,” এখানে ত্যাগ শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । সেই বৈরাগ্য হুই প্রকাব হইতে পারে,—হয় লক্ষ্যহীন নয় উদ্দেশ্যযুক্ত । যদি বৈরাগ্য লক্ষ্যহীন হয়, তবে কীটভক্ষিতমাত্রিক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তন্নাভে ধত্ন কবিবে না । আর যদি বৈরাগ্য কোন উদ্দেশ্যযুক্ত হয়, তবে এই দাঁড়ায যে, ত্যাগ অর্থে অগ্ৰবস্ত্রসমূহ হইতে মনকে সবাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংলগ্ন করা । সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি

ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ । বৈরাগ্যবান ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্বব্যাপী, সর্বাত্ম-  
ব্যাপী, সকলের আত্মা রূপে অবস্থিত সর্বৈশ্বরই বুঝিতে হইবে । তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ । অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই । বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহা দয়া, প্রেম নহে ; আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয়, তাহা প্রেম । আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে । এই জগৎই ভগবান্ চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া কবিত্তে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত ; তিনি বৈতবাদী ছিলেন, অতএব তাঁহার এই সিদ্ধান্ত, যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্থচনা কবে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে । অষ্টেতিনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ । অতএব আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নহে । জীবে প্রযুক্ত দয়া শব্দও আমার বোধ হয় জোর করিয়া বলা যাত্র । আমরা দয়া করি না, সেবা করি । কাহাকেও দয়া কবিত্তেছি, এ অসুভব আমাদের নাই, তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমামুভূতি এবং আত্মানুভব কবিয়া থাকি ।

হে শর্মাণ্ ( ব্রাহ্মণ ) সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমামুভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহা দ্বারা ভববোগ আবোগ্য হয়, যাহা দ্বারা এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই, সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পাবা যায়, যাহা দ্বারা মায়াবৃত্তি অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আত্মস্বভাব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জগৎ তোমার হৃদয়ে উদ্ভিত হউক । ইহাই তোমার প্রতি চিবপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিব্যবাত্র প্রার্থনা করিতেছে ।

## নচিকেতার ব্রহ্মজ্ঞানলাভ ।

এই পতিত ভারতভূমিকে জাগাইতে একবার এস নচিকেতঃ ! আমরা এখন এমন দুর্বল হয়েছি যে, অন্ধকারেও যেতে আমাদের ভয় হয়, আব  
তুমি বালক হয়ে সেই মহা অন্ধকার, পরম রহস্যের নিলয় স্বমসদনে সাহস-

পূর্বক গিয়েছিলেন—আর তাঁর কাছে জগতের সর্বাংগের গভীর সমস্যা যে যুতুরহস্য—বাহ্যী সকলের কাছেই মহাত্ম্যে আচ্ছাদিত, দেবতাভাও বার ভদ্র নির্ণয়ে বিহ্বল হয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন করেছিলে আর তার সম্যক তত্ত্ব জ্ঞাত হয়ে আমাদের জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছে। আর হে গভীর রহস্যের অকার বমরাজ, হে সাগুবো, তোমার কাছে কোন্ তত্ত্ব অবিস্মৃত, কোন্ তত্ত্ব না তোমার হৃদয়ে ক্ষুদ্রিত হয়? তবে এস সঙ্কল্পরূপে তোমার প্রিয় শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে, যাকে পেয়ে আনন্দে বলেছিলেন, হে নটিকেতাঃ, তোমার মত প্রশ্নকর্তা যেন আরও পাই।

ব্রাহ্মপ্রবাস ব্রাহ্মণ—যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দিবেন পণ করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় সে হৃদয়, যাহাতে এই সর্বত্যাগব্রতের প্রকৃত উদ্ভাবন করেন? মনের ইচ্ছা ঘোল আনা, লোকে বলবে, ইনি সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ করেছেন; কিন্তু প্রাণ যে, ভোগ চায়। প্রাণ ভালজিনিষে যমতা ত্যাগ কহে চায় না। তাই ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দেওয়া হচ্চে, যত বুদ্ধ, আত্মর গাভী, যারা কাল শমনের দ্বারে অতিথি হবে। নটিকেতা সমুদয় দেখিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে কত চিন্তাতরঙ্গ খেলিতেছে—হঠাৎ হৃদয়ে শ্রদ্ধা আবিস্কৃত হইল।

এই শ্রদ্ধা ব্যাপারটা কি? আমরা শ্রদ্ধার কি ধার গারি যে, শ্রদ্ধা বুদ্ধবো বা বোকাবো? আমাদের ত শ্রদ্ধার স্বরে একেবারে শূন্য বলেই হয়। ধর্মের প্রশঙ্গ হতে না হতে পাঁচশো বাজে কথা কয়ে হেঁসে উড়িয়ে দিই। এ হতেই পারে না—ও হতেই পারে না; এই আমাদের বলি। আমাদের মন একটা অনন্ত ‘না’ এর সমষ্টি। আমরা হাঁ কিছুতে বলতে শিখিছিনি, নেই নেই বলতে বলতে যে সাপেব বিষও উড়ে যায়, একথা আমরা ভুলে গেছি। ‘আছে,’ ‘হাঁ,’ এস দেখি, জোর করে এই কথা বলি। একবার পারবে? হাঁ, পাবো। না শব্দ বুধে এনো না, অসম্ভব শব্দ বুধে এনো না। জীবনে পূর্ণ ত্যাগ সম্ভবে—পূর্ণ বৈরাগ্য সম্ভবে? বল, হাঁ, সম্ভবে; নিশ্চয়ই সম্ভবে। নিশ্চয় নিশ্চয়! বিশ্বাস, বিশ্বাস! যার বতটা এই শ্রদ্ধা আছে, সে ততটা মানুষ। মানুষ মানুষে তফাত এই শ্রদ্ধার ভাবভাব নিয়ে।

নটিকেতা ভাবছেন, সর্বস্ব দক্ষিণা দেবার কথা—কই সর্বস্ব ত ঠিক দেওয়া হচ্ছে না। তবে কি সর্বত্যাগ হয় না? আশিও বাপের ধনের মধ্যে—কই আমাকে ত্যাগের কথা ত কিছুই হচ্ছে না। তবে কি এ একটা কথার কথা? তবে কি ইহা অসম্ভব? অন্তরাঙ্গা বলিল, না, না, অসম্ভব নয়—



সম্ভব । শুধু সম্ভব নয়, সর্বস্ব ত্যাগ না হলে কিছুই হবে না—সত্যতাই জানতে পার্শে না। এই শ্রদ্ধা—এই শ্রদ্ধার বলেই ঋষিরা যোগীবা সিদ্ধ হইতেন, এই শ্রদ্ধাবলেই নেপোলিয়ন জগৎকে বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই শ্রদ্ধাবলেই জগতের যত বড় লোকের উৎপত্তি।

যাহা হউক, এই শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। এই শ্রদ্ধাবলে তিনি পিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ, আমায় কাহাকে দিবেন ? পিতা ভাবিলেন, ছেলেটা পাগল হল নাকি ? বাপ আবাব নাকি ছেলেকে প্রাণ ভরে অপব কাকেও দিতে পাবে ? তিনি ছেলের বালমুগ্ধ চাপল্য মনে করিয়া তুষ্ণীভূত বহিলেন। কিন্তু নচিকেতা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহার হৃদয়ে ত কপটতার লেশমাত্র নাই, তাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধার আগুন জ্বলছে। তিনি বাপকে বারবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্তে লাগলেন। দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার—বাপ আবাব থাকতে পারেন না, বেগে বলেন, তোকে যমকে দোব। নচিকেতা যেন নূতন কণা শুনিলেন। যম ? মৃত্যুর অধিপতি, পাপপুণ্যের বিচারক, পবলোকের বিধাতা ! নচিকেতার হৃদয়ে অপূর্ণ চিন্তালাহরী খেলিতে লাগিল। মৃত্যু ? মৃত্যুই কি দেহের পরিণাম ? এর আগে কি ? পরে কি ? কোথায় চলেছে ? অপূর্ণ ভাবে হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। পিতাকে সত্য পালনে বাব বাব জেদ করিতে লাগিলেন, পিতা কি কববেন, সত্যভঙ্গভয়ে পুরকে যমালয়ে প্রেবণ করিলেন।

নচিকেতা যমের বাড়ী গেলেন, কিন্তু যম তখন বাড়ী ছিলেন না। যমের বাড়ী তাঁর অত্যাশ্রয় পরিবাসাদিও ত ছিল, তাঁরাও কি নচিকেতাকে যম কবেন নাই ? কে জানে ? এখানটা উপনিষদে বড় অক্ষুট ভাবে আছে। আর যমের বাড়ীর ব্যাপার—অত খোলাখুলিও ভাল নয়। অমব নটরাজ শেক্সসপীয়র তাঁহার হাম্লেট গ্রন্থে পরকালেব ভয়ঙ্কর রহস্যময় ছবি এঁকেছেন। হাম্লেটের মনের চুঃখে আত্মহত্যার ইচ্ছা হচ্ছে। ‘To be or not to be that is the question’ বলছেন, মরাই কি ভাল ! মরণটা কি ? মহানিদ্রা কি ? হযত শুধু নিদ্রা নয়, তাতে নানা স্বপ্ন দেখতে হবে। ঐ ত মুন্সিল। নিশ্চিত যদি জানা যেত, কিছু থাকবে না, তবে ত আত্মহত্যা কলেই চুকে যেত। কিন্তু মহা নাস্তিকের মনেও এ ধোঁকা যায় না যে, হযত কিছু আছে। এব সংবাদ কে দেবে ? ‘From whose bourne no

traveller returns.' কেউ ত ফেবে না যে, সংবাদ নেবে! তার পর ছাফলেটেব পিতার প্রেতাত্মার সঙ্গে দেখা হোলো। পবলোকের অস্তিত্ব নব্বন্ধে অনেকটা সংশয় ঘুচলো। কিন্তু সেখানকার ব্যাপার কি? সেখানে যাহুব কি ভাবে থাকে? প্রেতাত্মা বলছেন, যদি সেই দেশের কথা বলা আমার নিবেশ না থাকতো, তবে

I could a tale unfold, whose lightest word  
Would harrow up thy soul ; freeze thy young blood ;  
Make thy two eyes, like stars, start from their spheres,  
Thy knotted and combined locks to part,  
And each particular hair to stand on end,  
Like quills upon the fretful porcupine ,  
But this eternal blazon must not be  
To ears of flesh and blood

আমি এমন কথা শোনান্তে পার্জুয়, যাতে তোমার রক্ত জল হয়ে যেত, কিন্তু মর্ত্যলোকেব এ শোনার অধিকার নেই।

যা হক, নচিকেতা ত ঘমেব বাড়ী গেলেন। যম তিন দিন বাড়ী ছিলেন না, নচিকেতার আতিথাসংকাব কিছু হোলো না। যম বাড়ী আসতেই তাঁর কোন আশ্চর্য তাঁকে বলছেন, ব্রাহ্মণ অতিথি অগ্নির জ্বাষ গৃহে প্রবেশ কবেন, লোকে পান্য অর্থা দিয়ে তাঁর শাস্তি কোবে থাকে। হে যম, তুমি ক্ষল আহবণ কব। যাব বাড়ীতে ব্রাহ্মণ উপবাসী থাকেন, তাঁর ইহ পবলোকে সর্বনাশ হয়। তখন যম যোডহন্তে নচিকেতার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ, হে নমস্র অতিথি, তিন বাত্রি আমার গৃহে না বেয়ে বাস করেছো, তোমাকে নমস্রাব, আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার যেন কল্যাণ হয়। আর তোমার তিনবাত্রি উপবাসী থাকবার কৃতিপূরণরূপ আমার নিকট তিনটা বরপ্রহণ কব। পিতৃভক্ত নচিকেতা প্রথমবারে পিতার কল্যাণ চাইলেন। পিতা বোবভরে বলে ফেলেছেন, যমকে দেব, কিন্তু নিশ্চয় তাঁর মন আমায় না দেখে চকল হয়েচে—তিনি হয়ত মনে উষিধ হয়ে আছেন ; তাঁর যেন মনের সে চকলতা, সে অশান্তি যায় আর তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে তিনি যেন আমায় চিন্তে পেরে সাদরসম্ভাষণ করেন। যম বলেন, তথাস্ত। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা চাইলেন, স্বর্গলোকপ্রাপক অগ্নির সাধন। 'ওনেছি, স্বর্গলোকে কোন ভয় নেই, সেখানে তুমিও নেই, লোকে ভয়

হতেও সেথা তর পায় না । ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয় অতিক্রম কোরে শোকশূন্য হয়ে, শুনেছি, স্বর্গলোকে আমোদ কোরে বেড়ায ; সেই স্বর্গলোক প্রাপ্তির স্থান অধিক সম্বন্ধে অজ্ঞান আমাকে উপদেশ দাও ।’

স্বর্গ ব্যাপারটা কি ? স্বর্গ বোলে কিছু আছে কি ? কে জানে ? কিন্তু চিরকাল মানুষে একটা স্বর্গের কল্পনা কোবে এসেছে । সংসারে দেখতে পাই, সব বাসনার তৃপ্তি হয় না । দুঃখ স্নেহের পিছনে ছায়াব মত ঘুবেছে । এখানে আলোয় অঁধার, ভালোয় মন্দ, জীবনে মৃত্যু লেগে আছে । বত বড় লোক হোক না কেন, সব বাসনার তৃপ্তি এখানে হতে পারে না । তাই হয়ত মানুষ ভেবেছিল, এখানকার চেয়ে ভাল কোন জায়গা নিশ্চয় আছে, যেখানে গেলে অথও, অবিচ্ছেদ স্নেহ পাব । কিন্তু স্নেহের ধারণা প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক মানুষের বিভিন্ন, তাই স্বর্গকল্পনাও বিভিন্ন জাতিব বিভিন্ন রকম হয়েছে । এই স্বর্গ আবার কোথায়, সম্বন্ধে সেখানে যাওয়া যায়, কি শরীর ত্যাগ কোবে, এই নিয়ে বিষম সমস্যা । এক এক জায়গা এক এক জাতিব পক্ষে অতি দুর্গম ছিল, এমন কি, অগম্যও ছিল । তারা ভয়ত সেই সব স্থানই স্বর্গ বোলে নির্দেশ কোবেছে । ক্রমশঃ যত সেই সব স্থানে লোক যেতে লাগলো, ততই সেই গুলিকে ভৌমস্বর্গ নাম দিয়ে স্বর্গকে আকাশের উপরে কোন এক গ্রহে বানাক্ত্রে ঠেলে দেওয়া হল । মানুষ মবে সেখানে যাবে । কিন্তু যে সে ত যেতে পারবে না । যে বিধিযত যাগহোম কোবে, সেই সেখানে যাবে । তাই নচিকেতা এই অধিবিদ্যার উপদেশ চাচ্ছেন । আজকাল অনেকে বোলে থাকেন যে, স্বর্গ নবক আব কিছুই নয়, মনের বিভিন্ন অবস্থা মাত্র । এ কথা সত্য হলেও বাস্তবিক স্থানবিশেষে স্বর্গ নবকের মত কোন স্থান নাই, কি কোবে বলা যাবে ? বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদী, এ সম্বন্ধে হাঁ বা না কিছুই বোলতে পারেন না । অনেক সম্প্রদায় আছে, তারা বলেন, তারা যোগী মহাত্মাদের নিকট এই স্বর্গমরকাদি সম্বন্ধে সঠিক খবর জেনে ঠিক বোলতে পারেন । কোন কোন লোক দেখাও যায়, তারা নিজেরা স্বর্গাদি দেখেছেন বোলে ঘোষণা করেন । কিন্তু বতক্ষণ না হোমাব আহার যোগদৃষ্টির বিকাশ হয়, বতক্ষণ না আমবা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, ততক্ষণ ত আমাদের সংশয় একেবারে যেটবার নয় ।

( ক্রমশঃ । )

## আত্ম-নিবেদন ।



কি ছিহ্ন কি হয়েছি এখন ।

মনে পোড়ে এই বাণী,  
কাদিয়ে উঠেগো প্রাণী,  
মুখে যোর সরে না বচন ।

কি কহিব, ভাষা না জুয়ায়,  
বাল্যের সে পবিত্রতা,  
প্রেমে মাথা সবলতা,  
আব কভু হৃদি নাহি পায় !

উৎসাহ সে অসীম অপার,  
মনে নিত্য নব আশা,  
প্রতি জীবৈ ভালবাসা,  
প্রতি কার্যে আশার সঞ্চার ।

নব নব বিদ্যা উপার্জন,  
সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ,  
হ'ত পূর্ণ মনোরথ,  
যে সঙ্গর কবেছি মখন ।

নাহি কিছু ছিল গো গোপন ।  
ছিহ্ন এক মুখে মনে,  
সমভাব জগে জনে,  
সকলরে হেবেছি আপন ।

ফুল ফুল কোমল পবাণ,  
মধু গন্ধে হৃদি ভরা,  
মন মম যাতেয়াবা.  
এবে সব করেছে পয়ান ।

এবে হৃদি শূন্য চারিধাব,  
 নাই সে সবল মন,  
 নাই সে সন্তোষ ধন.  
 এবে তথা দৈত্যোব সংসার !  
 হা বিধাতঃ হন এ কেমন ।  
 হৃদয়েব দেব-বৃত্তি,  
 কেন নাহি পায় ক্ষুণ্ণিত্তি,  
 যাহে সব হেরিছি আপন ।  
 এবে ক্ষুদ্র 'আমি' করি সার.  
 আত্ম-সুখ অবৈষণে,  
 মন বত প্রাণপণে,  
 নাহি বিন্দু উদারতা তার ।  
 বাসনায বিকল পবাপ ।  
 সাগর-লহরী মত,  
 উঠে পড়ে অবিরত,  
 অবৈষণে পেয়েছি সন্ধান ।  
 যত কিছু এবে ভাবে মন  
 নব নব বাসনাষ.  
 যে দিকে যে দিকে বাষ,  
 মূল তাব কামিনীকাঞ্চন ।  
 এই যুগ্ম নাগ-পাশে বাধা,  
 ইচ্ছা কবি শতবাব  
 যাই চলে এব পাব,  
 নাহি পারি, কি বিষম ধাঁধা !  
 বার বার সুধাইছি মনে.  
 এই কি প্রাণের আশ,  
 নাহি অস্ত্র অস্তিত্বাব ?  
 মন তাহা স্বীকার না মানে ।

মন কহে, নাই এ বাসনা,  
 শুধু সংস্কার রশে,  
 আজীবন নানারসে,  
 ঘুরিতেছি, একি বিড়ম্বনা !  
 কোথা গুরু জ্ঞানের আধার !  
 এস প্রভু দয়াময় !  
 নাশ সংস্কার চয়,  
 করি শুধু ভরসা তোমার !  
 দাও শক্তি ওহে শক্তিধর !  
 হে বিবেকানন্দ স্বামী !  
 তুমি দেব অন্তর্যামী,  
 তব কাছে মুক্ত এ অন্তর !  
 সদায়েব তম করি নাশ,  
 দাও খুলে জ্ঞান পথ,  
 হ'ক পূর্ণ মনোরথ,  
 চলে যাই কৈবল্য নিবাস !  
 শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ২২ শে এপ্রেল শুক্রাব দিবস স্বামী সারদানন্দ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ফ্রাইডে Friday club এ 'ছাত্রজীবনে ধর্ম' সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিগত ২৪শে এপ্রেল ববিবাস বেহালা হিতকরী সভায় স্বামী সারদানন্দ প্রায় একঘণ্টা কাল ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন।

আদিতে ও অন্তে সঙ্গীত হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় সভার উদ্দেশ্যাদি পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে স্বামী সারদানন্দ প্রথমেই সভাসমিতি, বক্তৃতা ও বক্তৃতার ভাবসম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, “অনেক সভাসমিতি দেখ্‌নুম, ইউরোপ অংঘেরিকায়ও

দেখলুম, এদেশেও দেখলুম। আজকাল একটা হজুক উঠেছে,— ইংরাজীতে বক্তৃতা কর্তে হবে। বীরা শ্রোতা, তাঁর হযত অনেকেই ইংরাজী জানেন না, আর যিনি বক্তা, তিনি হযত বিদেশী ভাষাবশতঃ তাঁর মনের ভাব অধিকাংশ প্রকাশ কর্তে পারেন না। তারপর বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষার উপর শ্রদ্ধা না হলে আমাদের উন্নতি কোথা থেকে হবে ?” অতঃপর শাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের কথা এবং বর্তমান কালে প্রবৃত্তিমার্গ, কর্মযোগ বা ধর্মের বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া এবং মহাত্মারতোক্ত ভীষ্মার্জুনাদি কর্মবীরের ও বর্তমানকালের জাপান-বাসিগণের আদর্শ দেখাইয়া বলিলেন, ‘যদি এই সভার সভ্যগণ কেবল বক্তৃতাদিতে শক্তিকর না কোরে সেই শক্তি কাজের দিকে লাগান, যদি সকলে এক মন এক প্রাণ হয়ে একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা কবেন, তা হলে এখনি কত কল্যাণ হতে পারে। তোমাদের পাড়ার কে খেতে পাচ্ছে না, কে চিকিৎসাভাবে কষ্ট পাচ্ছে, এ ধবব কি তোমরা নিষেছো ? তোমরা বোলছো, টাকা না হলে, ফণ্ড না হলে লোকের উপকার কর্তে পাবা যাবে না, কিন্তু আগে দরকার মানুষ—স্বার্থত্যাগী মানুষ। পরমহংসদের বোলতেন, একরকম আছে মানুষ আর একরকম আছে মানহুঁস—যাব হুঁস অর্থাৎ চৈতন্য আছে। এই মানহুঁস হতে হবে।’ বক্তৃতান্তে সমাগত সভ্যগণের মধ্যে অনেকে এবং সভাপতি মহাশয় সভার উদ্দেশ্য কিরূপে কার্যো পবিনত হইতে পাবে, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু বলিলেন।

বিগত ১লা মে তারিখে আহিরিটোলাব জনৈক ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করিয়াছিলেন। তত্পলক্ষে অনেক ভক্তের সমাগম হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, ধর্মসঙ্গীত, প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি হইয়াছিল।

কনখল রামকৃষ্ণসেবাস্রমের কথা অনেক বাব পাঠকবর্গের গোচর কবিয়াছি। বাঁহাবা জীবনে ধর্মের আবশ্যকতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং উহা সাধনার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই জানেন, সংসারে বাস করিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিলে কত বিঘ্ন প্রতিপদে ভোগ করিতে হয়। এই কারণে বাঁহারা একটু বিশেষভাবে সাধনার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সংসারের সংশ্রব ত্যাগ কবিয়া থাকেন।

এই অবস্থায় অবশ্য সেই সম্যাসী সাধক সাধারণ গৃহীর কল্পিত 'একেবারে ত্রিশ্রুপাতীত ও সমাধিহ' সাধু মত হইতে পারেন না। তাঁহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগাদি সব থাকে। ক্ষুধাধির ঔষধের জন্য অনেক সহস্র শোকের প্রতিষ্ঠিত অনেক অন্নসত্র আছে। কিন্তু তাহাতে যে খাদ্য পাওয়া যায়, তাহা অধিক দিন খাইলে বোগেব খুব সম্ভাবনা—অনেক সাধুর রোগও হইয়া থাকে। এই রোগের সম্ব সাহায্য করিতে পারিলে বাস্তবিক এক জনকে সাধনপথে সাহায্য করা হয়। কনখলের নিকট অনেক সাধুসন্ন্যাসী তপস্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এবং সাঁহার। এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে যান, সেই সকল ষাত্রীদেবও পীড়ার সময় সাহায্যার্থ এই সেবাশ্রম ১৯০১ সালেব জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসাধারণেব দানের দ্বারা এই সেবাশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হয়। কিছু দিন হইল, কলিকাতাবাসী জনৈক সহস্র ব্যক্তি এই সেবাশ্রমেব জন্য প্রায় ১৫ বিঘা জমি কিনিয়া দিয়াছেন; এক্ষণে তথায় কুটীৰ নির্মিত হইয়া সেবাশ্রমের কার্য চলিতেছে। এই সেবাশ্রমকে স্থায়ী ও বহুভুক্তফলপ্রসূ কবিত্তে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। আমাদের দেশেব লোক কি এই কার্যে বিশেষরূপ সাহায্য করিবেন না?

১৯০৩ সালে সর্বভুক্ত ১৩৫২ জন সাধু ও ১২৭৭ জন গরীব গৃহস্থ আশ্রম হইতে ঔষধ লইয়া যান। আশ্রমে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিলেন ৭৩ জন সাধু। পূর্বে বর্ষেব ক্ষেত্র লইয়া এই বৎসর সর্বভুক্ত জমা হয় ৮১৯৮/১২। ও খরচ হয় ৫০৮৮/৫। হস্তে স্থিত ৩১১ ৮৮। এতদ্ব্যতীত অনেক বন্ধু ও ভ্রাতৃ-মহোদয় চাঁল ডাল, ঔষধাদি অনেক বস্তু দান করিয়াছেন এবং কলিকাতার বটরুড পাল কোম্পানি সস্তা দরে ঔষধ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই কার্যে এক পয়সা দান পর্য্যন্ত সাদবে গৃহীত হইবে। এই দান—হয় স্বামী কল্যাণ-জন্ম, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কনখল (সাহাবাণপুর) বা সম্পাদক, প্রবুদ্ধ ভারত, লোহাঘাট (আলমোড়া) ঠিকানায পাঠাইতে হইবে। প্রবুদ্ধভারতপত্রে সমস্ত দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হয় এবং নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে খরচ পত্রের হিসাব দেওয়া হয়। উদ্বোধনে স্থানাভাবে সববারে ইহা প্রকাশ করিতে পাবা যায় না।

Is there any difference between a Christian and a Hindu ?  
মূল্য ১০ সেন্ট, Vedanta Society, 40 Steiner street, San Fran-



cisco, California, U. S. A তে প্রাপ্তব্য। স্বামী ত্রিভুগাঙ্গীতের এই বক্তৃতাটি মুলত পুস্তিকাকারে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মূল উদ্দেশ্যে এবং অনেক সাধারণপ্রণালীতেও যে অল্পত প্রক্য আছে, তাহা ইনি মুলত তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দুর মতে খ্রীষ্টধর্ম বাস্তবিক সেই সনাতন বেদান্ত ধর্মের এক সম্প্রদায় বিশেষ, সুতরাং প্রকৃত হিন্দু শুধু খ্রীষ্টকে মান্য করেন, তাহা নহে, তাঁহাকে অবতার-জ্ঞানে পূজাও করিয়া থাকেন। কিন্তু এখনও অনেক হিন্দুনাথগারী আছেন, বাঁহা বা হিন্দুধর্মের এই উদার ভাবের মর্যাদা নহেন, তাঁহা বা এই পুস্তিকা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

Vedanta and Sankhya—স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি বক্তৃতা পুস্তিকাকারে সংগ্রহ। এগুলি আব পূর্বে একত্র সংগৃহীত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মূল্য বাব আনা। অষ্ট্রেত আশ্রম, মাধাবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা হিন্দী অনুবাদ বাবাণসী রাম-কৃষ্ণ অষ্ট্রেত আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক আনা। ম্যানেজার, ভাবতজীবন প্রেস, বেনারস সিটি ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

এলাহাবাদ ব্রহ্মবাদিন্ রুব হইতে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পবনহংসদেবের জীবনচরিত ও উপদেশ হিন্দী ভাষায় প্রকাশ কবিয়াছেন। মূল্য এক টাকা। এই পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—ব্রহ্মবাদিন্ রুব, ষ্টেশন রোড, এলাহাবাদ।

১৫ই বৈশাখের উদ্বোধনে পাঠকগণের নিকট নিবেদন করা হইয়াছিল যে, বাঁহা বা খ্রীষ্টামতদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন রূপ সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলে আমাদের এবং সাধারণের বিশেষ উপকার করা হয়। আমরা জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে ইতি-বধৌই একটা কথোপকথন পাইয়াছি—উহা নীত্রেই প্রকাশিত হইবে। এ বিষয়ে সাধারণের আরও নোবোগদান প্রার্থনীয়।

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

( উত্তর বিভাগ । )

শ্রীম—কথিত ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি সান্ন্যাসপাঙ্গ ও বরাহনগর  
মঠে তাঁহাদের সাধন ও তীর্থ বৈরাগ্য ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

( বরাহনগরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম মঠ । )

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা । ৭ই মে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ । শনিবার অপরাহ্ন ।

নবেঙ্গ মাষ্টারের সহিত কথা कहিতেছেন । কলিকাতা, গুরুপ্রসাদ  
চৌধুরির লেন একটি বাড়ীর নীচেব যবে তক্তাপোষের উপর উভয়ে  
বসিয়া আছেন ।

মাষ্টার সেই ঘরে পড়াশুনা করেন । Merchant of Venice, Comus,  
Blackie's Self-culture এই সব পড়িতেছিলেন । পড়া তৈয়ার করিতে-  
ছেন । স্থলে পড়াইতে হইবে ।

কয়মাস হইল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তদের অকুল পাখাবে ভাগাইয়া সধামে  
চলিয়া গিয়াছেন ; অবিবাহিত ও বিবাহিত ভক্তেরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেবা-  
কালে যে গ্নেহমুদ্রে বাধা হইয়াছেন, তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে । হঠাৎ  
কর্ণধারের অদর্শনে আবোহিগণ ভয় পাইয়াছেন বটে কিন্তু সকলেই বেন  
একপ্রাণ, পবম্পবেব মুখ চাহিয়া বহিয়াছেন । এখন পবম্পরকে না দেখিলে  
আব তাঁহারা বাচেন না । অস্ত্র লোকের সঙ্গে আলাপ আর ভাল লাগে

---

\* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীম—কথিত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয়  
সংস্করণ, মূল্য ১ টাকা । বাঁধান মূল্য পাঁচ সিকা । ৫৭ নং  
রামকান্ত বস্তুর ষ্ট্রিট, বাগবাজার, কলিকাতা ঠিকানায় শ্রীশান্তি-  
রাম ঘোষের নিকট, অথবা ১৩১২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলি-  
কাতায় শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্তের নিকট প্রাপ্য । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-  
কথামৃত দ্বিতীয় ভাগ বঙ্গদ্র ।

না। তাঁহার কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। সকলে জীবন থাকে কি আর দেখতে পাবনা? তিনি ত বলে গেছেন, ব্যাকুল হয়ে থাকলে আন্তরিক ডাক শুনেই স্নেহ দেখা দেবেন। বলে গেছেন, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। যখন নির্জনে থাকেন, তখন সেই আনন্দময় মূর্তি মনে পড়ে। রাস্তায় চলেন, উদ্বেগহীন, একাকী কেঁদে কেঁদে বেড়ান। ঠাকুর তাই বুঝি মণিকে বলেছিলেন, তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে, তাই শরীর ত্যাগ কবতে একটু কষ্ট হচ্ছে। কেউ ভাবছেন, কই তিনি চলে গেলেন, আমি এখনও বেঁচে রইছি। এই অনিত্য সংসারে এখনও থাকতে ইচ্ছা। নিজের মনে কবলে ত শরীর ত্যাগ করতে পারি, তা কই করছি।

ছোকরা ভক্তেরা কাশীপুরের বাগানে থাকিয়া রাত্রিদিন সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অদর্শনের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলেব পুত্তলিকাব হায নিজের নিজের বাড়ী ফিবিয়া গেলেন। দু তিন জনের ফিরিয়া যাইবার বাড়ী ছিলনা। স্বরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, তাই, তোমরা আর কোথা যাবে, একটা বাসা কবা যাক্। তোমরাও থাকবে আব আমাদেরও জুড়াবার একটা স্থান চাই, তা না হলে সংসারে এবকম কবে রাতদিন কেমন করে থাকবো। সেই খানে তোমরা গিয়া থাক। স্বরেন্দ্র প্রথম প্রথম দুই এক মাস টাকা ত্রিশ কবিয়া দিতেন। ক্রমে যেমন মঠে অগাধ তাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, পঞ্চাশ ষাট করিয়া দিতে লাগিলেন, শেষে ১০০ টাকা পর্যন্ত দিতেন। বরাহনগরে যে বাড়ী লওয়া হইল, তাহার ভাড়া ও tax ১১, টাকা। পাচক ব্রাহ্মণের মাহিনা ৬, টাকা, আর বাকি ভালভাতের খরচ। বুড়ো গোপাল, লাটু ও তারকের যাইবার বাড়ী নাই। ছোট গোপাল প্রথমে কাশীপুরের বাগান হইতে ঠাকুরের গদি ও জিনিষপত্র লইয়া সেই বাসা বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে পাচক ব্রাহ্মণ শশী। বাত্রে শরণ আসিয়া বাকিলেন। তাবক ব্রাহ্মণের গিয়াছিলেন; কিছুদিনের মধ্যে তিনিও আসিয়া জুটিলেন। নবেঙ্গ, শবৎ, শশী, বাবুদাম, নিরঞ্জন, কালী এঁরা প্রথমে মাঝে মাঝে বাড়ী হইতে আসিতেন। বাথাল, লাটু, যোগীন ও কালী ঠিক ঐ সময়ে ব্রাহ্মণের গিয়াছিলেন। কালী এক মাসের মধ্যে ফিবিলেন। রাপাল কয়েক মাস পরে ও যোগীন এক বৎসর পরে ফিরিলেন।

কিছুদিন মধ্যে নরেন্দ্র, রাথাল, নিবঞ্জন, শরণ, শশী, বাবুদাম, যোগীন,

কালী, লালি, রহিয়া গেলেন আর বাড়ীতে ফিরিলেন না। ক্রমে প্রসন্ন ও সুবোধ আসিয়া রহিলেন।

যত্ন নরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া। তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল। তোমাকে যত্নবৎসল করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনীকাননত্যাগ মূর্ত্তিমান করিলেন! কৌশাববৈরাগ্যবান্ শুদ্ধাত্মা নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন! ভাই, তোমাব ঋণ কে ভুলিবে? মঠের ভাইরা মাভূহীন বালকের স্তাঘ থাকিতেন—তোমাব অপেক্ষা করিতেন, কখন তুমি আসিবে। আজ বাড়ীভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে—আসিয়া ভাইদেব খাবাব বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তোমার অকৃত্রিম মেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জন করিবে!

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

( নরেন্দ্রাদি ভক্তদের সৈখরের জগু ব্যাকুলতা

ও প্রায়োপবেশন প্রসঙ্গ । )

কলিকাতাব সেই নীচেব ঘবে নরেন্দ্র মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র এখন ভক্তদেব নেতা। মঠের সকলের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। ভগবান্কে দর্শন কবিবাব জগু সকলে ছটফট করিতেছেন।

নরেন্দ্র ( মাষ্টাবেব প্রতি )। আমাব কিছু ভাল লাগছেনা। এই আপনায় সঙ্গে কথা কছি, ইচ্ছা হয় এখনই উঠে যাই।

নরেন্দ্র কিয়ৎকণ চুপ করিয়া বহিলেন। কিয়ৎকণ পরে আবার বলিতেছেন,—

“প্রায়োপবেশন কব্বেবা ?

মাষ্টার। তা বেশ। ভগবান্কেব জগু সবই ত করা যায়।

নরেন্দ্র। যদি ক্ষিধে মাংসাতে না পারি ?

মাষ্টার। তাহলে খেখো, আবার লাগবে।

নরেন্দ্র আবার কিয়ৎকণ চুপ করিলেন—

নরেন্দ্র। ভগবান্ নাই বোধ হচ্ছে। যত প্রার্থনা করিছি, একবারও জবাব পাই নাই।

“কত দেখলাম, মত্ন শোনার অক্ষণে জল জল কব্ছে।

“কত কালীকপ ; আবও অজ্ঞাত রূপ দেখ্‌লুম। তবু শান্তি হচ্ছেনা।

“ছয়টা পয়সা দেবেন ?

নবেঙ্গ শোভাবাজার হইতে সেযাবের গাড়িতে বরাহনগরের মঠে যাইতেছেন, তাই ছয়টা পয়সা।

দেখিতে দেখিতে সাহু (সাতকড়ি) গাড়ী কবিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহু নরেন্দ্রের সমবয়স্ক। মঠের ডোকবাদের বড় ভালবাসেন ও সর্বদা মঠে যান। তাঁহার বাড়ী বরাহনগরের মঠের কাছে। কলিকাতার আপিসে কর্ম করবেন। তাঁদের ঘরের গাড়ী আছে। সেই গাড়ী কবিয়া আফিস হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নবেঙ্গ মাষ্টারকে পয়সা ফিরাইয়া দিলেন ; বলিলেন, আব কি, সাহু ব সঙ্গ যাব। আপনি কিছু খাওয়ান। মাষ্টার কিছু জলখাবার খাওয়ালেন।

মাষ্টারও সেই গাড়ীতে উঠিলেন, তাঁহাদের সঙ্গ মঠে যাইবেন। সন্ধ্যার সময় সকলে মঠে পৌঁছিলেন। মঠের ভাইবা কিরূপে দিন কাটাইতেছেন ও সাধন কবিতেছেন, দেখিবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্শ্বনদের হৃদয়ে কিরূপ প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, তাহা দেখিতে মাষ্টার মাশে মাঝে মঠ দর্শন কবিত্তে যান।

\*

\*

\*

মঠে নিবসন নাই। তাঁহার একমাত্র মা আছেন। তাঁহাকে দেখিতে বাড়ী গিয়াছেন। বাবুদাম, শবৎ, কালী ও পুতীকেই গিয়াছেন। সেখানে আবও কিছুদিন থাকিয়া ৮ বৎসরাত্রা দর্শন কবিবেন।

( ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিদ্যাব সংসার ও নবেঙ্গের তত্ত্বাবধান । )

নরেন্দ্র মঠের ভাইদের তত্ত্বাবধান কবিতেছেন। প্রায় কয়দিন সাধন কবিতেছিলেন। নবেঙ্গ তাঁহার কাছেও প্রাণোপবেশনের কথা ভুলিয়াছিলেন। নবেঙ্গ কলিকাতায় গিয়াছেন দেখিয়া সেই অবসবে তিনি কোথায় নিকর্দ্দেহ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নবেঙ্গ আসিয়া সমস্ত শুনিলেন। ‘বাজা’ কেন তাহাকে যাইতে দিয়াছেন ? কিন্তু রাখাল ছিলেন না। তিনি মঠ হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একতু বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রাখালকে সকলে বাজা বলিয়া ডাকিতেন। অর্থাৎ ‘বাগালরাজ’ শ্রীকৃষ্ণ আব একটা নাম।

নরেন্দ্র বলিতেছেন—“রাজা আশ্রয়, একবার বোঝাবো। কেন তারে যেতে দিলে?”

(হ'র প্রতি)। তুমি ত পা ফাঁক করে লেক্চাৰ দিচ্ছিলে, তাকে বাবণ কব্বেতে পান নাই?

হ। (অতি মৃদু স্ববে)। তারকা দা বলেছিলেন, তবু সে চলে গেল।

নরেন্দ্র (মার্কটবেব প্রতি)। দেখুন আমার বিনয় মুক্শিপ। এখানেও এক মাযার সংসারে পড়েছি! আমার ছোঁড়াটা কোথায় গেল!

\* \* \*

রাখাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন; ভবনাথ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

রাখালকে নরেন্দ্র প্রসন্নবেব কথা বলিলেন। প্রসন্ন নরেন্দ্রকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন; সেই পত্র পড়া হইতেছে। পত্রে এই মর্মে লিখিতেছেন, ‘আমি ঈঁটিয়া বুদ্ধাবনে চলিলাম। এখানে থাকা আমার পক্ষে বিপদ। এখানে ভাবেব পবিবর্তন হচ্ছে; আগে বাপ, মা, বাড়ীর সকলের স্বপন দেখ্তাম। তাব পন মাযাব মূর্তি দেখ্তাম। দুবাব খুব কষ্ট পেয়েছি; বাড়ীতে ফিবে যেতে হয়েছিল। তাই এবাব দুবে দাচ্ছি। পবমহৎসদেব আমার বসেছিলেন, তোর বাড়ীওবা সব কবতে পাবে; ওদেব বিশ্বাস করিস্ না।’

রাখাল বলিতেছেন, সে চলে গেছে ঐ সব নানা কাবণে। আমার বলেছে, ‘নরেন্দ্র প্রায় বাড়ী যায়—মা ও তাই ভগিনীদের স্বপন নিতে; আর মোকদ্দমা কবতে। তাই আমার ভয় হয়, পাছে তাব দেখাদেখি আমার বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়’।

নরেন্দ্র এই কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল তীর্থে ঘাইবাব গল্প করিতেছেন। ‘এখানে থাকিয়া ত কিছু হলো না। তিনি যা বলেছিলেন, ভগবান্ দর্শন কই হলো?’ রাখাল গুইয়া আছেন। নিকটে ভক্তেবা কেহ গুইয়া কেহ বসিয়া আছেন।

রাখাল। চল নর্মদায় বেবিয়ে পড়ি।

নরেন্দ্র। বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়? তাই জ্ঞান জ্ঞান কব্ছিস্। একজন ভক্ত। তাহলে সংসার ত্যাগ করলে কেন?

নরেন্দ্র। রাখকে পেলামনা বলে শ্রামের সঙ্গে থাকবোঁ আর ছেলে মেয়ের বাপ হবো, এমন কি কথা!

এই বলিয়া নরেন্দ্র একটু উঠিয়া গেলেন ।

রাখাল শুইয়া আছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র আবার আসিয়া বসিলেন ।

একজন ভাই শুইয়া শুইয়া রহিয়া ভাবে বলিতেছেন—যেন ঈশ্বরের  
অদর্শনে বড় কাতর হয়েছেন—“ওরে, আমায় একখানা ছুরি এনে দে রে !—  
আর কাজ নাই !—আর যজ্ঞণা সহ হয় না !

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে) । ঐ খান্নেই আছে, হাত বাড়িয়ে নে (সকলের হাত) ।

\* \* \*

প্রসঙ্গের কথা আবার হইতে লাগিল ।

নরেন্দ্র । এখানেও মায়া ! তবে আর সন্ন্যাস কেন ?

রাখাল । ‘মুক্তি ও তাহাব সাধন’ সেই বইখানিতে আছে, সন্ন্যাসীদের  
একসঙ্গে থাকা ভাল নয় । সন্ন্যাসী ‘নগরের’ কথা আছে ।

শশী । আমি সন্ন্যাস ফরাস মানিনা । আমার অগম্য স্থান নাই ।  
এমন জায়গা নাই, যেখানে আমি থাকতে না পারি ।

ভবনাথের কথা পড়িল । ভবনাথের স্ত্রীও সন্ধ্যাপন্ন পীড়া হইয়াছিল ।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি) । ভবনাথের মাগটা বুঝি বেঁচেছে ; তাই  
সে কুর্জি কবে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিছিল ।

কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা হইল । রাম মন্দির কবিরেন ।

নরেন্দ্র (রাখালের প্রতি) । রামবাবু মাষ্টার মহাশয়কে একজন  
ট্রাস্টী (trustee) করেছেন ।

মাষ্টার (রাখালের প্রতি) । কই, আমি কিছু জানিনা ।

\* \* \*

সন্ধ্যা হইল । শশী ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে ধূনা দিলেন ও অস্ত্রান্ত ঘরে  
বত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে গিয়া ধূনা দিলেন ও মধুর স্বরে নাম করিতে  
করিতে প্রণাম করিলেন ।

এই বার আরতি হইতেছে । মঠের ভাইরা ও অস্ত্রান্ত ভক্তেরা সকলে  
করঘোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন । কাসব ঘণ্টা বাজিতেছে ।  
ভক্তেরা সমস্তরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন—

জয় শিব গুঁকার

ভক্ত শিব গুঁকার

ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব হর হর হর মহাদেব ।

নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে ৮বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান হয়।

মণি \* মঠে আসিয়াছেন। মঠেব ভক্তদের দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। মঠে খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে ১১টা বাজিল। ভক্তেরা সকলে শয়ন করিলেন। তাঁহারা স্বপ্ন করিয়া মণিকে শয়ন করাইলেন।

রাত্রি দুই প্রহর হইল। মণির নিদ্রা নাই। ভাবিতেছেন। সকলেই বহিয়াছে; সেই অযোধ্যা; কেবল রাম নাই। মণি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। মণি একাকী গঙ্গাপুলিনে বিচরণ করিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটি কথা ভাবিতেছেন—“তুমি একটি, আর আমি একটি।”

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

( নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের বৈরাগ্য ও যোগবাশিষ্ঠ পাঠ । কীর্তন ও নৃত্য । )

মাষ্টার শনিবারে আসিয়াছেন। বুধবার পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ দিন মঠে থাকিবেন।

আজ রবিবার। গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায় রবিবারেই মঠ দর্শন করিতে আসেন। আজকাল যোগবাশিষ্ঠ প্রায় পড়া হয়। মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে যোগবাশিষ্ঠের ব্যাপারটা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া উহা তিনি যতটুকু বুঝিয়াছিলেন, তাহার সহিত মঠের ভাইদের মেলে কি না জানিবার জন্য যোগবাশিষ্ঠ সম্বন্ধেই কথা পাড়িলেন।

মাষ্টার। (বাথালের প্রতি)। আচ্ছা, যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কিরূপ আছে ?

রাখাল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রুত, দ্রুত এ সব যায়। মনের নাশই উপায়।

মাষ্টার। মনের নাশের পর যা থাকে, তাই ব্রহ্ম। কেমন ?

রাখাল। হাঁ।

মাষ্টার। ঠাকুরও ঐ কথা বলতেন। জ্যাংটা তাঁকে ঐ কথা বলেছিলেন।

\* মণি—ঠাকুরের একটা ভক্ত। কোন বিশেষ কারণে তিনি তাঁহার চলিত নাম একান্ত করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে, ‘মণি’ এই নামে তাঁকে ডাকা হইবে।



“আচ্ছা, গামকে কি বশিষ্ঠ সংসার কর্ত্তে বলেছেন, এমন কিছু দেখলে ?  
বাখাল। কই, এ পর্য্যন্ত ত পাই নাই। বামকে অবগাব বলেই  
মান্ছে না।

এইরূপে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় নবেঙ্গ, তারক ও আর  
একটি ভক্ত গঙ্গাতীর হইতে ফিবিয়া আসিলেন। তাঁহাদের কোরগবে  
বেড়াইতে যাইবাব ইচ্ছা ছিল—কিন্তু নৌকা পাইলেন না। তাঁহারা  
আসিয়া বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা চলিতে লাগিল।

নবেঙ্গ ( মাষ্টারের প্রতি )। বেশ সব গল্প আছে। লীলাব কথা জানেন ?  
মাষ্টার। হাঁ, যোগবাশিষ্ঠে আছে, একটু একটু দেখিছি। লীলাব  
ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল, না ?

নবেঙ্গ। হাঁ। আর ইন্দ্র অহল্যা সংবাদ ? আব বিদূরথ বাজা চণ্ডাল হলো ?  
মাষ্টার। হাঁ, মনে পড়্ছে।

নবেঙ্গ। বনের বর্ণনাটি কেমন চমৎকার ! \*

\* কোন দেশে পদ্মনামে রাজা ও লীলা নামে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। লীলা  
পতির অমর্য্য আকাশ্য ভগবতী সরস্বতীর আবাধনা করিয়া তাঁহার পতির জীবন  
ভদ্রীয় দেহভ্যাগের পরও গৃহাকাশে অবকল্প থাকিবেন, এই বর লাভ করিয়াছিলেন।  
পতির মৃত্যুর পর লীলা সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিতে তিনি আবির্ভূতা হইয়া  
লীলাকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ইহা স্পষ্টরূপে স্বরণ  
করাইয়া দিলেন। সরস্বতী দেবী বলিলেন, ‘তোমার পদ্মনামক স্বামী পূর্ব্বজন্মে বশিষ্ঠ  
নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহার আটদিন মাত্র দেহভ্যাগ হইয়াছে আর এক্ষণে তাঁহার  
জীবাত্মা এই গৃহে অবস্থিত আছেন আবার অত্র একস্থলে বিদূরথ নামে রাজা হইয়া অনেক  
বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। এ সকলই মায়াবলে সম্ভবে। বাস্তবিক দেশকাল কিছুই  
নহে।’ পরে সমাধিবলে সরস্বতী দেবীর সহিত তিনি স্পষ্টদেহে প্রোক্ত বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও  
বিদূরথ রাজার রাজ্যে জন্মণ করিয়া আসিলেন। সরস্বতী দেবীর কৃপায় বিদূরথের পূর্ব্ব  
স্মৃতি উদিত হইল। পরে তিনি এক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জ্ঞান পদ্মরাজার  
শরীরে প্রবেশ করিল।

বিদূরথ রাজার চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। লবণ রাজার হইয়াছিল। তিনি এক  
ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালপ্রভাবে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সারা জীবন চণ্ডালত্ব অনুভব করিয়া-  
ছিলেন। অহল্যা নামে কোন রাজার মহিষী ইন্দ্রনামক কোন যুবকের আসক্তিতে  
পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উভয়ে কামে একপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, নানাপ্রকার  
অত্যাচারেও তাঁহারা সঙ্কল্পিত কার্য্যে বিমূঢ় হন নাই।

( মঠের ভাইদের প্রত্যহ গঙ্গান্নান ও গুরুপূজা । )

নবেজাদি ভক্তেরা গঙ্গান্নান করিতে বাইতেছেন। মাষ্টারও ন্নান কবিবেন। বৌদ্ধ দেখিয়া মাষ্টার ছাতি লইয়াছেন। বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রও এই সঙ্গে ন্নান করিতে বাইতেছেন। ইনি সন্ন্যাসনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক। মঠে সর্বদা আসেন। কিছুদিন পূর্বে ইনি বৈরাগ্য অবলম্বন কবিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ কবিয়াছেন।

মাষ্টার ( শব্দেব প্রতি )। ভারি বৌদ্ধ।

নরেন্দ্র। তাই বল, ছাতিটা লই। ( মাষ্টারের হস্ত )।

ভক্তেরা গাথছা স্বন্ধে মঠ হইতে বাত্মা দিয়া পরামাণিক ঘাটের উত্তরের ঘাটে ন্নান কবিতে বাইতেছেন। সকলে গেকথা পবা। আজ ২৬শে বৈশাখ। প্রচণ্ড বৌদ্ধ।

মাষ্টার ( নরেন্দ্রেব প্রতি )। সর্দি গর্দি হবাব উদ্যোগ।

নবেজ। আপনাদের শরীরই বৈরাগ্যের প্রতিবন্ধক। না?

আপনাব, দেবেন বাবু—

মাষ্টার হাসিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন. “ওধু কি শরীর?”

\* \* \* \* \*

নানাস্তে ভক্তেরা মঠে কিরিলেন ও পা মুইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ কবিলেন। প্রণাম পূর্বক এক এক জন ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

নরেন্দ্রের পূজাব ঘবে আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। গুরুমহারাদকে প্রণাম কবিয়া ফুল লইতে যান, দেখেন যে, পুষ্পপাত্রে ফুল নাই। তখন বলিয়া উঠিলেন, ফুল নাই? পুষ্পপাত্রে হু একটি বিছপত্র ছিল, তাই চন্দনে ডুবাইয়া নিবেদন করিলেন। একবার ষষ্ঠাধ্বনি করিলেন। আবার প্রণাম কবিয়া দানাদের ঘরে গিয়া বসিলেন।

( দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর । )

মঠের ভাইরা আপনাদের দানা দৈত্য বলিতেন ও যে ঘরে সকলে একত্র বসিতেন, সেই ঘরকে দানাদের ঘর বলিতেন। সর্ব দক্ষিণের ঘরটিতে ধারা নিরুজ্জনে ধ্যান ধারণা কি পাঠাদি করিতেন, তাঁহারাই থাকিতেন। কালী ( দ্বারী অভেদানন্দ ) ঐ ঘব দাবরুদ্ধ করিয়া অধিকাংশ সময় থাকিতেন বলিয়া

মঠেব ভাইবা বলিতেন, ‘কালী তপস্বীৰ ঘৰ।’ ‘কালী তপস্বীৰ ঘৰেব’ উত্তবেই ঠাকুৰ ঘৰ। তাহার উত্তবে ঠাকুৰদেব নৈবিদ্যেৰ ঘৰ। ঐ ঘৰে দাঁড়াইয়া আৰতি দেখা বাইত ও ভক্তেবা আসিয়া ঠাকুৰ প্ৰণাম কৰিতেন। নৈবেদ্যেৰ ঘৰেব উত্তবে দানাদেব ঘৰ। ঘৰটি খুব লম্বা। বাহিৰেব ভক্তেবা আসিলে এই ঘৰেই গাঁহাদেব অভ্যর্থনা কৰা হইত। দানাদেব ঘৰেৰ উত্তবে একটি ছোট ঘৰ। ভাইবা ‘পানেব ঘৰ’ বলিতেন। এখানে ভক্তেবা আশ্রয় কৰিতেন।

দানাদেব ঘৰেব পূৰ্ব্বকাণে দালান। উৎসব হইলে এই দালানে খাওয়া দাওয়া হইত। দালানেব ঠিক উত্তবে বান্ধাঘৰ।

ঠাকুৰ ঘৰেব ও কালীতপস্বীৰ ঘৰেব পূৰ্ব্ব বাবাণ্ডা। বাবাণ্ডাব দক্ষিণ-পশ্চিমকাণে ববাহনগবেব একটি সমিতিৰ হাইৱেদী ঘৰ। এ সমন্ত ঘৰ ছতলাব উপৰ। কালীতপস্বীৰ ঘৰ ও সমিতিৰ লাইৱেদী ঘৰেব মাঝখানে একতলা হইতে দোতলায় উঠিবাব সিঁড়ি। ভক্তদেব আহাবেব ঘৰেব উত্তব দিকে দোতলাব ছাদে উঠিবাব সিঁড়ি। নবেজ্জাদি মঠেব ভাইবা ঐ সিঁড়ি দিয়া সন্ধ্যাব সময় মাঝে মাঝে ছাদে উঠিতেন। সেখানে উপবেশন কৰিবা তাঁহারা ঈশ্বৰ সম্বন্ধে নানা বিষয় কথা কহিতেন। কখনও ঠাকুৰ বামৰুজ্জোৰ কথা ; কখনও বা শঙ্কৰাচাৰ্য্যেব, বামৰুজ্জোৰ বা যীতুথুয়েব কথা ; কখনও হিন্দু দৰ্শনেব কথা, কখনও বা ইউৰোপীয় দৰ্শন শাস্ত্ৰেব কথা, বেদ, পুৰাণ, তন্ত্ৰেব কথা।

দানাদেব ঘৰে বসিয়া নবেজ্জ তাঁহাব দেবভৰ্ত্ত কণ্ঠে ভগবানেব নাম-গুণ গান কৰিতেন। শবৎ ও অগ্ৰাগ্ৰ ভাইদেৰ গান শিখাইতেন। কালী বাজনা শিখিতেন।

এই ঘৰে নবেজ্জ ভাইদেবঃসঙ্গে কতবাব ইবিনাম সঙ্গীৰ্জনে শব্দনন্দ কৰিতেন ও আনন্দে একসঙ্গে নৃত্য কৰিতেন।

### চতুৰ্থ পৰিচ্ছেদ ।

( নবেজ্জ ও ধৰ্ম্মপ্ৰচাব । ধ্যানযোগ ও কৰ্ম্মযোগ । )

নবেজ্জ দানাদেব ঘৰে বসিয়া আছেন। ভক্তেবা বসিয়া আছেন। চুন্নিলাল, হাতীৰ ও মঠেৰ ভাইবা। ধৰ্ম্মপ্ৰচাবেৰ কথা পড়িল।

যাক্টার ( নরেন্দ্রের প্রতি )। বিদ্যাসাগর বলেন, আমি বেত খাবার ভয়ে ঈশ্বরের কথা কাককে বলিনা।

নরেন্দ্র । বেত খাবার ভয় ?

যাক্টার । বিদ্যাসাগর বলেন, মনে কর, মন্স্বার পব আমবা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেবুম। মনে কব, কেশব সেনকে বমদুত্বেবা ঈশ্বরের কাছে নিবে গেল। কেশব সেন অবন্ত সংসাবে পাপ টাপ কবেছে। যখন প্রমাণ হলো, তখন ঈশ্বব হয়ত বলবেন, ওকে পঁচিশ বেত মাব। তাব পর মনে কর, আমাকে নিবে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে ঘাই। অনেক অত্যায করিছি। তাব জন্ত বেতের হুকুম হলো। তখন আমি হয়ত বললাম, কেশব সেন আমাকে এইরূপ বুকিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করিছি। তখন ঈশ্বর দূতদের আবার হয়ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিবে আয। এলে পব হয়ত তাকে বলবেন, তুই একে উপদেশ দিছিলি ? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানিসনা, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি ? ওবে কে আছিল, এবে আব পঁচিশ বেত দে।

“তাই বিদ্যাসাগর বলেন, নিজেই সামলাতে পাবিনা, আবার পরের জন্ত বেত খাওয়া (সকলের হাত)। আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝিনা, আবার পরকে কি লেক্চাব দেবো।

নরেন্দ্র । যে এটা বোঝেনি, সে আর পাঁচটা বুঝলে কেমন করে ?

যাক্টার । আব পাঁচটা কি ?

নরেন্দ্র । যে এটা বোঝে নাই, সে দয়া পরোপকার বুঝলে কেমন করে ? স্কুল বুঝলে কেমন করে ? স্কুল কবে ছেলেরদব বিদ্যা শিখাতে হলে, আর সংসাবে প্রবেশ করে, বিয়ে করে ছেপে যেযেব বাপ হওয়াই ঠিক, এটাই বা বুঝলে কেমন করে।

“যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে” ।

যাক্টার ( স্বগতঃ )। ঠাকুর বলতেন বটে, ‘যে ঈশ্বরকে জেনেছে, সে সব বোঝে’। আর সংসার কবা, স্কুল করা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন যে, ‘ও সব ব্রজোপশে হয়।’ বিদ্যাসাগরের দয়া আছে বলে বলেছিলেন, ‘এ ব্রজোপশের সম্ব। এ ব্রজোপশে দোষ নাই।’

\*

\*

\*

খাওয়া দাওয়ার পর মন্ঠর ভাইরা বিশ্রাম করিতেছেন। যাক্টার

ও চুনিলাল নৈবেদ্যের ঝরের পূর্বদিকে যে অন্তরমহলের সিঁড়ি আছে, তাহার চাতালের উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। চুনিলাল বলিতেছেন, কি প্রকারে তাঁহার ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন হইল। সংসার ভাল লাগে নাই বলিয়া তিনি একবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন ও তীর্থে নমণ করিয়াছিলেন। সেই সকল গল্প করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নবজ্ঞ আসিয়া কাছে বসিলেন। যোগবাশিষ্ঠের কথা হইতে লাগিল।

নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি)। আব বিদ্বৎের চণ্ডাল হওয়া ?

মাষ্টার। কি, লবণের কথা বোল্ছেন ?

নরেন্দ্র। ও ! আপনি পড়েছেন ?

মাষ্টার। হাঁ, একটু পড়িছি।

নরেন্দ্র। কি, এখানকার বই পড়েছেন ?

মাষ্টার। না, বাড়ীতে একটু পড়েছিলাম।

নরেন্দ্র ছোট গোপালকে তামাক আনিতে বলিতেছেন। ছোট গোপাল একটু ধ্যান করিতেছিল।

নবজ্ঞ (গোপালের প্রতি)। ওরে তামাক সাজ্। ধ্যান কি বে ! আগে ঠাকুর ও সাধুসেবা করে preparation কব্। তাব পর ধ্যান। আগে কর্ম, তার পর ধ্যান (সকলের হাস্ত)।

মঠের বাড়ীর পশ্চিমে সংলগ্ন অনেকটা জমি আছে। সেখানে অনেকগুলি গাছপালা আছে। মাষ্টার গাছতলায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত। বেলা ৩টা হইবে।

মাষ্টার। এ কয়দিন কোথায় গিছিলে ? তোমার জগ্গে সকলে ভাবিত হয়েছে। ষ্ট্রদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? কখন এলে ?

প্রসন্ন। এই এলাম, এসে দেখা করিছি।

মাষ্টার। ভূমি বৃন্দাবনে চল্পুম বলে চিঠি লিখেছ ! আমবা মহা ভাবিত ! কতদূর গিছিলে ?

প্রসন্ন। কোল্লগর পর্যন্ত গিছিলাম। (উভয়ের হাস্ত)।

মাষ্টার। বসো একটু গল্প বলো, ভনি। প্রথমে কোথায় গিছিলে ?

প্রসন্ন। প্রথমে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গেলাম, সেখানে একরাতি ছিলাম।

মাষ্টার (সহাস্তে)। হাজরা মশায়ের এখন কি ভাব ?

প্রসন্ন (সহাস্তে)। হাজরা মশায় বলে, তুমি আমাকে কি ঠাওরাও ?

( উভয়ের হাস্য )।

মাষ্টার (সহাস্তে)। তুমি কি বললে ?

প্রসন্ন। আমি চূপ করে রইলাম।

মাষ্টার। তাব পর ?

প্রসন্ন। আবাব বলে, আবাব কন্তে তামাক এনেছ ? ( উভয়ের হাস্য )।  
খাটিয়ে নিতে চায়।

মাষ্টার। তাব পব কোথায় গেলে ?

প্রসন্ন। ক্রমে কোন্নগবে গেলাম। একটা জায়গায় রাতে পড়েছিলাম।  
আগে চলে যাবো ভাবলাম। পশ্চিমের বেলভাডার কন্ত ভজ্রলোকদের  
জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে পাওয়া যেতে পারে কিনা ?

মাষ্টার। তারা কি বললে ?

প্রসন্ন। বলে, টাকাটা সিকেটা পেতে পার। অত বেলভাড়া কে দিবে ?  
( উভয়ের হাস্য )।

মাষ্টার। সন্কে কি ছিল ?

প্রসন্ন। এক আধখানা কাপড়। পবমহৎসদেবের ছবি ছিল। ছবি  
কাককে দেখাই নাই।

( পিতা-পুত্র-সংবাদ। আগে মা বাপ না আগে ঈশ্বর ? )

মঠের একটি ভাইয়ের বাবা আসিয়াছেন। বাবা মঠ থেকে ছেলেকে  
লইয়া বাইবেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অস্ত্রুথের সময় প্রায় ৯ মাস ধরিয়া  
অনন্তচিন্ত হইয়া এই ভাইটি তাঁহাব সেবা করিয়াছিলেন। ইনি কলেজে  
বি, এ, পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এণ্ট্রান্সে জলপানি পাইয়াছিলেন। বাপ  
দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিন্তু সাধক ও নির্ভাবান। ইনি বাপ মায়ের বড় ছেলে।  
তাঁহাদের বড় আশা যে, ইনি লেখা পড়া শিখিয়া বোজপার করিয়া তাঁদের  
হুঃখ দূর করিবেন। কিন্তু ভগবানকে পাইবার জন্য ইনি সব ত্যাগ করিয়া-  
ছিলেন। বন্ধুদের কাছে কেঁদে কেঁদে বলতেন, ‘কি করি, আমি কিছুই বুঝতে  
পারছি না। হাব! মা বাপের কিছু সেবা করতে পারলাম না! তাঁরা কত  
আশা করেছিলেন! মা আমার গয়না পরতে পান নাই, আমি কত সাধ  
করেছিলাম, আমি তাঁকে গয়না পরাব। কিছুই হলো না! বাড়ীতে ফিরে

যাওয়া যেন বাঁধ বোঁধ হয় ! গুরুমহারাজ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কব্‌তে বলেছেন , আর যাবাব জো নাই !

ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্বপ্নামে গমন করিবার পর এই তাইটিব পিতা ভাবিলেন, এবাবে বুঝি বাড়ী ফিরিবে ! কিন্তু কিছুদিন বাড়ী থাকাব পব, মঠ স্থাপিত হইবাব কিছুদিনের মধ্যেই, মঠে কিছুদিন স্বাতাযাতেব পব আর মঠ হইতে ফিরিলেন না। তাই পিতা মাঝে মাঝে তাঁহাকে লইতে আসেন। তিনি কোন মতে যাবেন না। আজ বাবা আসিয়াছেন ওনিয়া আব একদিব্‌ দিয়া পলায়ন করিলেন, যাতে তাঁহাব সঙ্গে দেখা না হয়।

পিতা মাষ্টারকে চিনিতেন। তাঁর সঙ্গে উপবেব বাবা ওাব উপব বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিলেন।

পিতা। এখানে কর্তা কে ? এই নবেজ্‌ই ষত নষ্টেব গোড়া। ওরা ত বেশ বাড়ীতে ফিবে গিছিল। পড়াওনা আবাব কছিল।

মাষ্টার। এখানে কর্তা নাই ; সকলেই সমান। নবেজ্‌ কি কব্‌বেন ? নিজের ইচ্ছা না থাকলে কি মানুষ চলে আসে ? আমবা কি বাড়ী একেবাবে ছেড়ে আসতে পেবেছি ?

পিতা। তোমরা ত বেশ কব্‌ছা গো। তোমবা যা কচ্ছা, এতে কি ধর্ম্‌ হয় না ? তাইত আমাদের ইচ্ছা। এখানেও থাকুক, সেখানেও থাকুক। দেখ দেখি, ওব গর্ভধাবিণী কত কাঁদছে।

মাষ্টাব হুঃখিত হইয়া চুপ কবিয়া বহিলেন।

পিতা। আব সাধু থুঞ্জ থুঞ্জে এত বেডান। আমি ভাল সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পাবি। ইজ্‌নাবাযণের কাছে একটি সাধু এসেছে, চমৎকাব লোক ! সেই সাধুকে দেখুক না !

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

( ‘আয় মা সাধন সমবে ।’ রাখালের বৈরাগ্য ;  
সন্ন্যাসী ও নাবী । )

রাখাল ও মাষ্টাব কালীতপস্বীর ঘরের পূর্বদিকেব বাবা ওাব বেড়াইতেছেন ও ঠাকুর ও ভক্তদের বিষয় গল্প কবিত্তেছেন।

বাখাল (বাস্ত হইয়া, মাষ্টারের প্রতি) । মাষ্টার মশায়, আশুন আমরা সব সাধন কবি ।

“তাইত আর বাড়িতে ফিরে গেলাম না । যদি কেউ বলে, ঈশ্বকে পেলেনা, তবে আর কেন ; তা নবেস্ত্র বেশ বলে, রামকে পেলুম না বলে কি জামেব সঙ্গে যব কব্ তেই হবে আর ছেলেপুলের বাপ হতেই হবে ! আহা, নরেন্দ্র এক একটি বেশ কথা বলে । আপনি বরং জিজ্ঞাসা করবেন ।

মাষ্টাব । তা ঠিক কথা ! বাখাল বাবু, তোমাবড় দেখছি, মনটা খুব ব্যাকুল হয়েচে ।

রাখাল । মাষ্টার মশায়, কি বলবো ? ছপুয় বেলায় নর্ষদায় বাবার জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল ।

“মাষ্টার মশায়, সাধন ককন, তা না হলে কিছু হচ্ছেনা, দেখুন না শুক-দেববড় ভয় । জ্ঞানগ্রহণ কবেই পলায়ন । বাসদেব দাঁড়াতে বললেন, তা দাঁড়ায় না ।

মাষ্টাব । তুমি বুঝি ষোগোপনিষদেব কথা বলছো ? মাযার রাজ্য থেকে শুকদেব পালাচ্ছিলেন । ঈ, বাস আব শুকদেবে বেশ কথাবার্তা আছে । ইনি সংসাবে থেকে শর্ষ কব্ তে বলছেন । শুকদেব বলছেন, হরিপাদপদ্মই সাব । আব সংসাবীদেব বিবাহ কবে মেয়ে মাম্ববেব সঙ্গে বাস, এতে ব্রণা প্রকাশ কবেছেন ।

রাখাল । অনেকে মনে কবে, মেয়ে মাম্বব না দেখলেই হলো । মেয়ে-মাম্বব দেখে ঘাড় নিচু কব্ লে কি হবে ? নবেস্ত্র কাল বাড়ি বেশ বলে, ‘যতক্ষণ আমাব কাম, ততক্ষণই জীলোক , তা না হলে জীপুরুষ ভেদ বোধ হয় না ।’

মাষ্টার । ঠিক কথা । ছেলেদেব ছেলেমেবে বোধ নাই ।

রাখাল । তাই বলছি, আমাদেব সাধন চাই ।

“মাযাতীত না হলে কেমন করে জ্ঞান হবে ! চলুন বড় ঘরে বাই ; বরাহ-নগর থেকে কতকগুলি ভ্রলোক এসেছে । নরেন্দ্র তাদের কি বলছে, চলুন তনি গিয়ে ।

( নরেন্দ্র ও শরণাগতি [Resignation] )

নবেস্ত্র কথা কহিতেছেন । মাষ্টার ভিতরে গেলেন না । বড় ঘবের পূর্দমিকের দালানে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছু কিছু তনিতে পাইলেন ।



নরেন্দ্র বলিতেছেন—সন্ধ্যাদি কেশের স্থান, সময় নাই।

একজন ভদ্রলোক। আচ্ছা মশায়, সাধন করলেই তাঁকে পাওয়া যাবে ?  
নরেন্দ্র। তাঁর কৃপা। গীতার বলছেন,—

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রামযন্ সৰ্বভূতানি যন্তারুণাণি মাযযা ॥

তমেব শবণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভাবত ।

তৎপ্রসাদাৎ পবাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাস্বতম্ ॥

“তাঁর কৃপা না হলে সাধন ভজনে কিছু হয় না। তাই তাঁর শরণাগত হতে হয়।

ভদ্রলোক। আমবা মাকে মাকে বিবস্ত্র কব্বো।

নরেন্দ্র। তা যখন হয় আসবেন।

“আপনাদেব ওখানে পদ্মাব ঘাটে আমবা নাইতে যাই।

ভদ্রলোক। তাতে আপত্তি নাই, তবে অগ্ন লোক না যায়।

নরেন্দ্র। তা বলেন ত আমবা নাই যাবো।

ভদ্রলোক। না তা নয়—তবে যদি দেখেন, পাঁচজন যাচ্ছে, তাহলে আর যাবেন না।

( আরতি ও নরেন্দ্রের গুরুগীতা পাঠ । )

সন্ধ্যার পর আবার আবতি হইল। ভক্তেরা আবার কুতাঞ্জলি হয়ে ‘জয় শিব ওঁকার’ সমস্তরে গান করিতে করিতে ঠাকুরের স্তব করিতে লাগিলেন।

আবতি হইয়া গেলে ভক্তেরা দানাদেবের ঘরে গিয়া বসিলেন। মাষ্টার বসিয়া আছেন। প্রসন্ন গুরুগীতা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তখন নরেন্দ্র নিজে আসিয়া সুর করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র গাহিতে লাগিলেন,—

ব্রহ্মানন্দং পবনসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্ ।

ব্রহ্মাতীতম্ পগনসদৃশম্ তত্ত্বমস্যা দিলক্ষ্যম্ ॥

একং নিত্যং বিমলমমলং সৰ্বদা সাক্ষিভূতং ।

ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সৎগুরুং তং নমামি ॥

আবার গাহিলেন—

ন গুরোরধিকম্ ন গুরোরধিকম্।

শিবশাসনতঃ শিবশাসনতঃ ॥

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি।

শ্রীমৎ পবং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি ॥

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং শ্রবামি।

শ্রীমৎ পবং ব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥

নবোজ্ঞ সুর করিয়া গুরুপীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। আর ভক্তদের মন যেন নিবাস্ত নিষ্কম্প দীপশিখাব ত্রাঘ হির হইয়া গেল। সত্য সত্যই ঠাকুর বলিতেন, সুরমপুর বংশীধ্বনি শুনে সাপ যেমন ফণা তুলে হির হয়ে থাকে, নবোজ্ঞ গাইলে হৃদয়ের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিও সেইরূপ চূপ করে শোনেন। আহা! মঠের ভাইদের কি গুরুভক্তি!

( ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভালবাসা ও রাখাল। )

কালীতপস্বীর ঘরে রাখাল বসিয়া আছেন। কাছে প্রসন্ন। মাটারও সেই ঘরে আছেন।

রাখাল সন্তান পরিবার ত্যাগ কবিয়া আসিয়াছেন। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য, কেবল ভাবছেন, একাকী নন্দনাতীরে কি অস্ত্র স্থানে চলিয়া যাই। তবু প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

রাখাল ( প্রসন্নের প্রতি )। কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ। এ ছেড়ে যেতে আছে? আব নরেনেব মত লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি?

প্রসন্ন। কলিকাতায় বাপ মা রয়েছে। ভয় হয় পাছে তাঁদের ভাল-বাসা আমাকে টেনে নেয়, তাই দূরে পালাতে চাই।

রাখাল। গুরু মহারাজ যেমন ভালবাসতেন, তত কি বাপ মা ভাল-বাসে? আমরা তাঁর কি করেছি যে, এত ভালবাসা! কেন তিনি আমা-দের বেহ, মন, আশ্রয় মঙ্গলের লজ্জা এত ব্যস্ত ছিলেন? আমরা তাঁর কি করেছি?

মাটার ( স্বগতঃ )। আতা, রাখাল ঠিক বলেছেন। তাই তাঁকে বলে অহেতুককৃপাসিদ্ধ।

প্রসন্ন। তোমার কি বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না?

রাখাল। আমার মনে বেয়াল হয় যে, নন্দনাতীরে গিয়ে কিছুদিন থাকি।

“এক একবার ভাবি, ঐ সব জায়গায় কোন বাগানে গিয়ে থাকি, আর কিছু সাধন করি। খেয়াল হয়, তিন দিন পঞ্চতপা করি। তবে সংসারীর বাগানে যেতে আবার মন হয় না।

( ঈশ্বর কি আছেন ? )

দানাদেব যবে তারক ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। তারকের মা নাই। পিতা বাবালের পিতার ন্যায় দ্বিতীয় সংসার কবিয়াছেন। তারকও বিবাহ কবিয়াছিলেন, কিন্তু পরীবিয়োগ হইয়াছে। মঠই তারকের এখন বাড়ী। তারকও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন।

প্রসন্ন। না হলো জ্ঞান, না হলো প্রেম, কি নিয়ে থাকা যায় ?

তারক। জ্ঞান হওয়া শক্ত বটে, কিন্তু প্রেম হলোনা কেমন কবে ?

প্রসন্ন। কাঁদতে পাবলুম না, তবে প্রেম হবে কেমন কবে ? আব এত দিনে কি বা হলো ?

তারক। কেন, পবনহংস মশায়কে ত দেখেছ। আর জ্ঞানই বা হবে না কেন ?

প্রসন্ন। কি জ্ঞান হবে ? জ্ঞান মানে ত জানা। কি জানবে ? ভগবান্ আছেন কিনা তাই ঠিক নাই।

তারক। হাঁ তা বটে, জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই।

মন্ডীর (স্বগতঃ)। আহা, প্রসন্নের যে অবস্থা, ঠাকুর বলতেন, ‘যারা ভগবান্কে চায়, তাদের ওরূপ অবস্থা হয়। কখনও বোধ হয়, ভগবান্ আছেন কি না। তারক বুদ্ধি এখন বুদ্ধিমত আলোচনা করছেন, তাই জ্ঞানীর মতে ঈশ্বর নাই বলছেন। ঠাকুর কিন্তু বলতেন, জ্ঞানী আর ভক্ত এক যায়গায় পৌঁছিয়ে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

( ভাই সঙ্গে নরেন্দ্র ; নবেস্ত্রের অন্তর্বের কথা । )

দ্যামনের যবে অর্ধাৎ কালীতপস্বী যবে, নবেস্ত্র ও প্রসন্ন কথা কহিতেছেন। ঘরের আর এক ধারে রাখাল, ই—ও ছোট গোপাল আছেন। শেষে শেষে বুড়ো গোপাল আসিয়াছেন।

নরেন্দ্র গীতা পাঠ করিতেছেন ও প্রসন্নকে বুঝাইতেছেন—

ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদয়েইচ্ছন তিষ্ঠতি ।

ব্রাহ্মণ সৰ্বভূতানি যজ্ঞাক্রান্তানি মায়ায়া ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভাবত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতং ॥

সৰ্বধন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহঙ্কাং সৰ্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি যাতুচঃ ।

নবেশ্ব । দেখ্‌ছিস ‘যজ্ঞাক্রান্ত’ ।

‘ব্রাহ্মণ সৰ্বভূতানি যজ্ঞাক্রান্তানি মায়ায়া ।’

“ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া! তুই কীট, কীট, তুই তাঁকে জানতে পাববি” ?

“একবার ভাব্ দেখি, মাহুঘটা কি। এই যে অসংখ্য তারা দেখ্‌ছিস, শুনেছি এক একটি Solar system (সৌরজগৎ)। আমাদের পক্ষে একটি Solar system এতেই রক্ষা নাই। যে পৃথিবীকে সূর্য্যের সঙ্গে তুলনা করলে অতি সামান্য একটি ভাঁটার মত বোধ হয়, সেই পৃথিবীতে মাহুঘটা বেড়াচ্ছে যেন একটা পোকা। নরেন্দ্র গান গাইয়া বলিতেছেন—

গান ।—‘তুমি পিতা আমরা অতি শিশু ।’

পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম ।

পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন ॥

জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে,

মোদের অভয় দাত হুঙ্কল শরণ ॥

একবার ভ্রম হলে, আর কি লবে না কোলে,

অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন ?

তা হলে যে আর কত, উঠিতে নারিব প্রভু,

ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥

আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন ।

পদে পদে হয় পিতা চরণ খলন ॥

কুদ্রমুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,

কেন হেরি মাঝে মাঝে ত্রুটি ভীষণ ॥

ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিওনা রোষ ।

স্নেহ বাক্যে বল পিতা কি করেছি দোষ ॥

শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি তুলে,

কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন ॥

“পড়ে থাক্ । তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাক্ ।

নরেন্দ্র যেন আবিষ্ট হইয়া আবার গাইতেছেন :—

গান । উপায়—শরণাগতি ।

এতু মায় গোলাম মায় গোলাম মায় গোলাম তেরা ।

তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা ॥

দো বোটি এক লেকট্ট তেরে পাস মো পাওয়া ।

ভকতি ভাও দে আরোগ নাম তেবা গাওয়া ॥

তু দেওয়ান মেহেবান নাম তেবা বারেয়া ।

দাস কবীরা শরণে আয়া চরণ লাগে, তারেয়া ॥

“তাঁর কথা কি মনে নাই? ঈশ্বর যে চিনির পাহাড়! তুই পিঁপড়ে,  
একদানায় ভোর পেট ভরে যায়! তুই মনে কচ্ছিস, সব পাহাড়টা বাসায়  
আন্বি। গুরু মহারাজ বলেছেন, মনে নাই, গুরুদেব হৃদ একটা ডেয়ে  
পিঁপড়ে।

“তাইতো কালীকে বনুতুম্, শ্রাণা, গজ্ কিতে নিয়ে ঈশ্বকে মাশ্বি ?

“ঈশ্বব দয়ার সিদ্ধ, তাঁর শরণাগত হয়ে থাক্ ; তিনি কৃপা করবেন ;  
তাকে প্রার্থনা কর—‘যন্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্’—

অসতো মা সাগময় ।

ভয়সো মা জ্যোতির্গময় ।

মৃত্যোর্মহিমুত্তমময় ।

আবিরাবির্ম এধি ॥

রুদ যন্তে দক্ষিণম্ মুখম্ ।

তেন মাং পাহি নিত্য ॥

প্রশ্ন । কি সাধন করা যায ?

নরেন্দ্র । শুধু তাঁর নাম কর্ ! ঠাকুরের গান মনে নাই ?

নরেন্দ্র পরমহংসদেবের সেই গানটা গাইতে লাগিলেন—

গান । উপায়—তাঁর নাম ।

নাযেরই ভরসা কেবল শ্রামা গো তোমার ।

কাজ কি আমার কোশ কুশি দেতোর হাঁসি লোকাচার ॥

নাথেতে কাল পাশ কাটে, জটে তা দিয়েছে রটে,  
 আমি ত সেই জটের মুটে হয়েছি আর হব কার ?  
 নাথেতে বা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,  
 নিতান্ত করেছি শিবে শিবেরি বচন গার ।  
 (ঈশ্বর কি আছেন ? ঈশ্বর কি দয়াময় ?)

প্রশ্ন। তুমি বলছ ঈশ্বর আছেন। আবার তুমিই তো বলো, চাকাক  
 আর অজ্ঞাত অনেকে বলে গেছেন যে, এই জগৎ আপনি হয়েছে।

নরেন্দ্র। Chemistry (কেমিস্ট্রি) পড়িসনি ? আরে, combination  
 কে করবে ? যেমন জল তৈরির করবার জন্তে Oxygen, Hydrogen  
 আর Electricity, human hand একত্র করে ।

“Intelligent Force” স্বাক্ষাই মান্ছে। জ্ঞান স্বরূপ একজন যে এই সব  
 ব্যাপার চালাচ্ছে ।

প্রশ্ন। দয়া আছে কেমন করে জান্বে ?

নরেন্দ্র। ‘যন্তে দক্ষিণম্ মুখম্’ । বেদে বলেছে ।

“John Stewart Millও \* ঐ কথা বলেছে। যিনি মানুষের ভিতর এই  
 দয়া দিয়েছেন, না জানি তাঁর ভিতরে কত দয়া ! Mill এই কথা বলেন ।  
 তিনি (ঠাকুর) তো বলতেন, ‘বিশ্বাসই সার’। তিনি তো কাছেই রয়েছেন !  
 বিশ্বাস কর্ণেই হয় ।

এই বলিয়া নরেন্দ্র আবার মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগিলেন ।

গান । উপায়—বিশ্বাস ।

মোকো কাঁহা তুঁড়ো বন্ধে মায়তো তেরে পাশ যো ।  
 হোঁয়ে যো অগ্ভি বিগ্ভি ন যয় ছুড়ি গড়াস যো ॥  
 ন হোঁয়ে যো খাল রোমযো, ন হাড়্‌ডি ন মাস যো ।  
 ন দেবাল যো ন মস্‌জ্‌দেদ যো ন কাশী কৈলাস যো ।  
 ন হোঁয়ে যয় আউধ দারকা, যেরা ভেট বিশ্বাস যো ॥  
 ন হোঁয়ে যে ক্রিয়া করম যো ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস যো ।  
 ধোঁজেগা তো আও বেলুনা, পল ওরকে তলাস যো ॥

সহরসে বাহার ডেরা হাম্মানি কুটিয়া খেরি মৌয়াস মো ।

কহত করীর গুন ভাই সাধু সব সজ্ঞান কি সাথ মোঃ

( বাসনা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস । )

প্রসন্ন। তুমি কখন বল, ভগবান নাই; আবাব এখন ঐ সব কথা বল্ছো। তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি প্রায় মত বদলাও। (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র। একথা আর কখনো বদলাবোনা—যতক্ষণ কামনা, বাসনা; ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস। একটা না একটা কামনা থাকেই। হয়ত ভিতরে পড়বার ইচ্ছা আছে—পাশ করবে কি পণ্ডিত হবে—এই সব কামনা।

নরেন্দ্র ভক্তিতে গদগদ হইয়া গান গাইতে লাগিলেন † ‘তিনি শবণাগত-বৎসল, পরম পিতা মাতা’!

গান ।

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা, জয় জয় মঙ্গলদাতা ।

সকটভয়দুঃখত্রাতা, ি স্বভুবনপাতা জয় দেব জয় দেব ॥

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা প্রভু, নাহি তব উপমা ।

প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা জয় দেব জয় দেব ॥

জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে, প্রভু প্রণমি তব চরণে ।

পরম শরণ তুমি হে, জীবনে, মরণে, জয় দেব জয় দেব ॥

কি আর যাচিব আমরা, কবি হে এ মিনতি, প্রভু করিহে এ মিনতি ।

এ লোকে স্মৃতি দেও, পরলোকে স্মৃতি, জয় দেব জয় দেব ॥

নরেন্দ্র আবাব গাইলেন—ভাইদের হরিরস পিয়াল পান করিতে বলিতেছেন—ঈশ্বর খুব কাছেই আছেন—কস্তুরী যেমন মৃগের—

পিলেরে অবধু হো মাতুয়ারা ।

শেয়ালা প্রেম হরি রসকা রে ॥

বাল অবস্থা খেল গোয়াত্রি তরুণ ভেযো নারী বশকারে ।

বৃদ্ধ ভেযো কফ বায়ুনে ঘেরা খাট পড়া রহ যা মশ্কারে ॥

নাভ কমলমে হ্যায় কস্তুরী, ক্যায়সে ভরম টুটে পশ্কারে ।

বিনু সঙ্গুরু নর এয়সা হি ভোলে, ব্যায়সে মৃগ ক্ষেয়ে বনকা রে ॥

মাষ্টার বারান্দা হইতে এই সমস্ত কথা গুনিতেছিলেন ।

নরেন্দ্র গাত্রোখান করিলেন। স্বর হইতে চলিয়া আসিবার সময় বলিতে লাগিলেন, বাধা গরম হলো বকে বকে।

বাবান্দাতে মাষ্টারকে দেখিয়া বলিলেন, মাষ্টার মহাশয়, কিছু জল খান।

মঠেব একজন ভাই নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, ‘তবে যে বল ভগবান্ নাই?’  
নরেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ।

( নরেন্দ্র ও ভীত বৈরাগ্য ; নরেন্দ্র ও গৃহস্থশ্রম। )

পরদিন সোমবার ৯ই যে। মাষ্টার সকাল বেলা মঠের বাগানের গাছ-তলায় বসিয়া আছেন। মাষ্টার ভাবিতেছেন, ঠাকুর মঠের ভাইদের কামিনী-কাকন ত্যাগ করাইয়াছেন। আহা, এরা কেমন জৈবেরে জন্ত ব্যাকুল! স্থানটি যেন সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। মঠের ভাইগুলি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। ঠাকুর বেশীদিন চলিয়া যান নাই; তাই সেই সমস্ত ভাবই প্রায় বজায় রহিয়াছে!

সেই আধোধ্যা! কেবল রাম নাই।

এঁদের তিনি গৃহত্যাগ করালেন। আমাদের তিনি গৃহে রেখেছেন কেন? এর কি কোন উপায় নাই?

নরেন্দ্র উপরের দ্বাৰ হইতে দেখিলেন,—মাষ্টার একাকী গাছতলায় বসিয়া আছেন। তিনি নামিয়া আসিবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কি মাষ্টার মহাশয়, কি হচ্ছে? কিছু কথা হইতে হইতে মাষ্টার বলিলেন, আহা, তোমার কি সুব! একটা কিছু স্তব বল।

নরেন্দ্র সুর কবিতা অপরাধভঞ্জন স্তব বলিতে লাগিলেন—গৃহস্থেরা জৈবকে তুলে রয়েছে—কত অপরাধ করে—বাল্যে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে! কেন তার! কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবা ও চিন্তা করে না!—

বাল্যে দুঃখতিবেকামললুলিতবগুঃ স্তম্ভপানে পিপাসা ।

নো শক্যকেন্নিষেভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি ।

নানারোগাদিহুঃখাদ্রোদিনপরবশঃ শরয়ং ন স্বরামি

কন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শজ্জো ॥

প্রৌঢ়েহং যৌবনস্তো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্দ্বন্দ্বসকৌ

দকৌ নষ্টৌ বিবেকঃ স্তম্ভনযুবতীসাদৃশ্যে নিবধঃ ।



শৈবীচিত্তাবিহীনং মম স্বকরমহো মানগৰ্কাধিকৃতং  
 কৃতব্যোমেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শঙ্কো ॥  
 বার্কক্যো চেজ্জিয়াণাং বিনতগতিমতিশ্চাধিদেবাদিতাপৈঃ  
 পাটৈ রৌগৈর্বিদ্যোগৈস্তনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্ ।  
 মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটেধ্যানশৃঙ্খলং  
 কৃতব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শঙ্কো ॥  
 স্নান প্রভ্যবকালে নপনবিধিবিধৌ নাস্ততং পান্নতোয়ং  
 পূজার্ঘ্যং বা কদাচিৎ পুথুতরুগহনাৎ খণ্ডবিদ্বীদলানি ।  
 নানীতা পন্নমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৌ তদর্ঘ্যং  
 কৃতব্যোমেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শঙ্কো ॥  
 গাত্রং ভষ্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং  
 ষ্ট্রীঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ ব্রহ্মভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।  
 গন্ধাকেনসিতা জটা পণ্ডপতেশ্চক্রঃ সিতো মূৰ্দ্ধনি  
 সোহয়ং সৰ্বসিতো দদাতু বিত্তবং পাপক্ষয়ং শকবঃ ॥ ইত্যাদি

স্তব পাঠ হইয়া গেল । আবার কথাবার্তা হইতেছে ।

নরেন্দ্র । ‘নির্লিপ্ত সংসার’ বলুন, আর বাই বলুন, কামিনী-কাকন ভ্যাগ  
 না করলে হবেনা । লোকেদের ঘৃণা করেনা, কামিনী-সঙ্গে সহবাস করতে  
 যে স্থানে ক্রমি, কফ, মেদ, দুর্গন্ধ—

অমেধ্যপূর্ণে ক্রমিজালসঙ্কুলে  
 স্ৰভাবদুর্গন্ধিনিরন্তরাস্তনে ।  
 কলেবরে মূত্রপুৰীষভাবিতে  
 রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

“বেদান্তবাক্যে যে রমণ করেনা, হরিরস-মদিরা যে পান করেনা, তাহার  
 বুঝাই জীবন ।

ওঙ্কারমূলং পরমং পদাস্তবং  
 গাযত্রীসাবিত্রীস্থভাষিতাস্তরং ।  
 বেদান্তরং যঃ পুরুষো ন সেবতে  
 বৃথাস্তরং তস্ত নরস্ত জীবনম্ ॥

“একটা গান শুনুন—

## গান ।

ছাড় মোহ—ছাড়রে কুমন্ত্রণা

জান তারে তবে যাবে স্বপ্ননা ।

চাষিদিনের সুখের জুতা, প্রাণ সথারে ভুলিলে,  
একি বিডম্বনা ।

“কৌপীন না পব্লে আব উপায় নাই । সংসার ত্যাগ !

এই বলিয়া আবার সুব করিয়া কৌপীনপঞ্চক বলিতে লাগিলেন—

বেদান্তবাক্যেয়ু সদা বনস্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ ।

অশোকমন্তঃকরণে চবন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

মূলং তবোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিধয়ঃ ভোক্তৃমাস্ত্রয়ন্তঃ ।

কহামিব শ্রীমপি কুংসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

স্বানন্দভাবে পবিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসংকল্পব্রহ্মবন্তিমন্তঃ ।

অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে বসন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

দেহাদিভাবং পবিবর্ত্তয়ন্তঃ স্বাশ্বান্নমাশ্রয়ন্তবলোকয়ন্তঃ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্রবন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুক্তরন্তঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ ।

ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

নরেন্দ্র আবার বলিলেন, মানুষ কেন সংসারে বদ্ধ হবে, কেন মায়ায়  
বদ্ধ হবে? মানুষের স্বরূপ কি? ‘চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং’।

আবার সুব করিয়া শঙ্করাচার্যের স্তব বলিতে লাগিলেন—

ওঁ মানাবুদ্ধ্যাহংকারচিৎতানি নাহং

ন বা শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে ।

ন চ ব্যোমভূমির্গ তেজো ন বায়ু-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥

ন চ প্রাণসংজ্ঞো ন বৈ পঞ্চাশত-

র্ন বা সপ্তষাটুর্ন বা পঞ্চকোষঃ ।

ন বাক্পাণিপদং ন চোপস্থপায়ু-

শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥

ন মে দেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ

মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্যভাবঃ ।

ন ধর্মো ন চার্ষো ন কামো ন মোক্ষ-  
 শিচদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥  
 ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং  
 ন মত্তো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ ।  
 অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা  
 শিচদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥  
 অহং নিকিকল্পো নিবাকাবকপো  
 বিভূর্ব্যাপী সর্বত্র সর্বৈল্লিখাণাং ।  
 ন চাসংগতং নৈব মুক্তির্নমেষ-  
 শিচদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥

নবোক্ত আব একটি তব বাস্তবদোষ্টক খুব কবিশা বলিলেন—হে মধুসূদন !  
 আমি তোমার শব্দগাথ, আমাকে রূপ কবে কামিনীদা, পাপ, মোহ,  
 স্ত্রীপুত্রের মোহজাল, বিষয়ভুক্ষা থেকে ত্রাণ কব। আব পাদপদ্মে ভক্তি  
 দাও ।—

ওমিতি জ্ঞানরূপেণ বাগাজীর্ণেন জীর্ঘাতঃ ।  
 কামিনীদাং প্রপন্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥  
 ন গতিবিদ্যতে নাথ ত্বমেকঃ শব্দং প্রভো ।  
 পাপপঙ্কে নিমগ্নোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥  
 মোহিতো মোহজালে ন পুত্রদাবগৃহাদিষু ।  
 তৃষ্ণয়া পীড়্যমানোহহং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥  
 ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখশোকাত্তবং প্রভো ।  
 অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥  
 গতাগতেন শ্রান্তোহহং দীর্ঘসংসারবজ্রাসু ।  
 যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥  
 বহুবোহপি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বাবং পৃথক্ পৃথক্ ।  
 গর্ভবাসে মহদুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥  
 তেন দেব প্রপন্নোহস্মি নাবাষণ পবাষণ ।  
 জগৎসংসারমোক্ষার্থং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥  
 বাচয়ামি সখোঃ পুত্রং প্রশয়ামি তবাগ্রতঃ ।  
 জরামরণভীড়োহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥

সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিৎ দৃষ্টতঞ্চ কৃতং নযা।  
 সংসাবে পাপপঙ্কেহস্মিন্ গ্রাহি মাং মধুহৃদন ॥  
 দেহান্তবসহস্রাণামন্যোজ্ঞঞ্চ কৃতং নযা।  
 কর্তৃহঞ্চ মনুষ্যাণাং গ্রাহি মাং মধুহৃদন ॥  
 বাক্যেন যং প্রতিজ্ঞাতং কৰ্ম্মণা নোপপাদিতং।  
 মোহহং দেব হুবাচাবহ্নাহি মাং মধুহৃদন ॥  
 যন্ন যত্র হি জাতোহস্মি ন্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।  
 তত্র তত্রাচলা ভল্লিহ্নাহি মাং মধুহৃদন ॥

মাষ্টাব (সগতঃ)। নবেন্দ্রেব ভিতব ত্রীষ বৈরাগ্য। তাই মঠের তাইদেব সকলেবই এই অবস্থা। ঠাকুরের ভক্তদেব ভিতব গাঁবা সংসাবে এক্ষণেও আছেন, তাঁদেব দেখে এদেব কেবল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগেব কথা উদ্দীপন হচ্ছে। আহা, এদেব কি অবস্থা। আমরাদেব তিনি সংসাবে এখনও কেন বেথেছেন? তিনি কি কোন উপায় কববেন? তিনি কি ত্রীষ বৈরাগ্য দিবেন, না, সংসাবেই ভুগাইয়া রাখিয়া দিবেন?

আজ নবেন্দ্র আবও হুই একটি ভাই আহাবেব পব কলিকাতায় গেলেন আবার বাত্রে নবেন্দ্র ফিবিবেন। নবেন্দ্রেব বাটীর মোকদ্দমা এখনও চোকে নাই।

## বারাগসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম।

একবারকার বোগী আব একবার রোজা।

চব্বিশপবগণা জেলাব অন্তগত বদিশতাট স-ডিভিজনত সিব্বা চটকাবেড়ে গ্রামে উপেক্ষ নাথ নাথ নামক ৩০১১ বৎসব বয়স্ক জনৈক যুবকেব বাস। পিতলেব তামা প্রস্তুত কবিয়া তাহা বিক্রেব দ্বারা বেশ দশটাকা উপায় কবিত। বহুদিন হইতে সে ম্যালেরিয়া জবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। ক্রমাগত জ্বৰভোগে বিবল হইয়া প্রায় তিন বৎসব হইল, জীবনের আশা পবিত্যাগ কবিয়া অবিস্মৃতপুনী - কান্দীশামে দেহত্যাগ মাননে উপস্থিত হয়। এখানে গঙ্গান্নান, বিশ্বেশ্বরঅপূর্ণাধর্শন, সত্রে তিষ্ঠা দ্বারা কথঞ্চিৎ

উদরপূরণ ও সত্ত্বের ছাদবিহীন বাবাগুহ শয়ন করিয়া কোনরূপে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। 'ঔষধং জাহ্নবীতোযং বৈদ্যো নাবায়ণো হবিঃ' এই শাস্ত্রবাক্যটাই এই সময়ে যেন তাহার জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল।

উপেন্দ্রের শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্তসত্ত্ব ৬ বাবাগুহীতে যথেষ্ট বটে, কিন্তু সে সকল ব্রাহ্মণের জন্ত ; ব্রাহ্মণের ব্যক্তি ৬ কানীধামে ভিক্ষাজীবী হইয়া থাকিলে তাহার নিরূপ পদ প্রাপ্তির অধিক বিলম্ব হয় না। গঙ্গাতীরে বা ত্রিবিম্বনাথ অন্নপূর্ণার দ্বাবে কাপড় বিছাইয়া বেলা একটা দুইটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিলে অন্নপূর্ণার রূপায় একজনের বা ততোধিক লোকের উদনারের জন্ত যথেষ্ট চাল ভিক্ষা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের উপেন্দ্রের এমন শক্তি ছিল না যে, ঐরূপে চাল ভিক্ষা করিয়া তাহা আবার বাঁধিয়া ধায়। বাঁধিবার স্থানই বা তাহার বোধায় ? সুতরাং সত্ত্ব ব্রাহ্মণদের আহারের পূর্ব যে অন্ন বাঁচিত, তাহাই ভিক্ষা করিয়া খাইয়া কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করিত।

এইরূপে কয়েকমাস যায়, একদিন কোন ভদ্রলোক দয়াপবন হইয়া উপেন্দ্রকে বামরুক্ষসেবাশ্রমের কথা জানান এবং বলেন, সেখানে গেলে বিনা ব্যয়ে ঔষধ, পথ্য এবং থাকিবার স্থান সমস্তই পাওয়া যায়। উপেন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া প্রথম প্রথম সেবাশ্রম হইতে ঔষধ নাইয়া যাইত, কিন্তু সেবাশ্রমের অধ্যক্ষেরা দেখিলেন, ইহাতে বোগের কিছু উপশম হইতেছে না। তখন তাঁহারা তাকে আশ্রমে রাখিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাহাদের যত্ন ও শুশ্রূষায় প্রায় ৭৮ মাস বোগভোগের পর উপেন্দ্র সম্পূর্ণ আবেগ্যলাভ করিল ও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আশ্রমাধ্যক্ষেরা তাকে বলিলেন, আপনি যদি আপনার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনাকে আশ্রম সাহায্য করিতে প্রস্তুত। উপেন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া বলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই, আপনাবা যদি দয়া করিয়া আশ্রমে রাখিয়া উহার কোন কার্য্য করিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি চিববাধিত হই। আশ্রমাধ্যক্ষেরা সম্মত হইলে উপেন্দ্র অতি আনন্দের সহিত জীবসেবারূপ মহৎ কর্ম্মে ব্রতী হইল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পাগল, পদ্ম, অন্ধ ও অজ্ঞাত রোগিগণকে সে যে কিরূপ যত্নের সহিত সেবা করিত, তাহা বর্ণনাভীত। তাহার

সেবা দেখিষা বোধ হইত, সে যেন নিজেরই বন্ধু পিতা মাতার সেবা করিতেছে। পাগল রোগী খেতে চাহ না, নিজে হাতে তুলে তাদের খাওয়াইয়া দিত। তাহারা মারিতেছে, গালি দিতেছে, উপেক্ষ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আপনাব কাষ কবিয়া ঘাইতেছে। উপেক্ষ অন্নদিনের মধ্যে সেবাশ্রমের একজন উপযুক্ত সেবক হইয়া দাঁড়াইল।

সেবাশ্রমের সেবকগণ প্রায় সকলেই শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর ব্রহ্মচারী শিষ্য। তাহারা সকলেই সেবাকার্য্য হইতে অবসর পাইলে, শ্রীবাম-কৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও পরমহংসদেবের অন্যান্য ভক্তদেব জীবনী ও উপদেশ চর্চা কবিতেন,—উপেক্ষ ও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। স্বামী বিবেকানন্দ মহাবাজের কণ্ঠযোগের উপদেশগুলি তাহাব হৃদয়ের পতীত্ব স্বরে প্রবেশ কবিল। ক্রমশঃ সেবাকার্য্যে তাহাব নির্ভা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, দিনবাত বোগীদের পার্শ্বে বসিয়া থাকে—অনেক সময় তাহাদের ভাবনাব বারো ঘুম হয় না। এইরূপ অতিবিক্ত পরিশ্রমে তাহাব কঠিন শিবঃপীড়া হইল। ডাক্তারগণের আদেশমত তাহাকে কিছুদিন বোগীদের নিকট ঘাইতে দেওয়া হইল না। কিছুদিন বিশ্রাম ও গুজ্জাব সে আযোগ্য লাভ কবিল।

পাঠক মহাশয়দের জানা উচিত যে, সেবাশ্রমের সাহায্যের জন্য এখানে কাশীবাসী অনেক সদস্য ব্যক্তিদের বাটীতে একটা করিয়া হাঁড়ি দিয়া আসা হইয়াছে। তাহাবা প্রত্যহ পাকের পূর্বে এক মুষ্টি চাল ঐ হাঁড়িতে ভিক্ষাব হিসাবে ফেলিয়া রাখেন এবং সপ্তাহে একদিন আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহা সংগ্রহ কবিয়া আনেন। এই উপায়ে মাসে প্রায় ৫১৬ মণ চাল সেবাশ্রমে আসে এবং তদ্বারা অনেক দীন দরিদ্র পোড়িতেব সেবা হয়। উপেক্ষনাথ এখন এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় ঠাণ্ডির সংখ্যা পূর্ণাপেক্ষা প্রায় দুই শত বৃদ্ধি কবিলেন। তদ্বারা আশ্রমের যথেষ্ট উপকাব হইতে লাগিল।

সম্প্রতি প্রায় এক মাস হইল, সেবাশ্রমের জনৈক তত্ত্বাবধারক এক বসন্ত বোগীর সেবা করিয়া নিজে ঐ বোগে আক্রান্ত হয়। উপেক্ষ ঠার গুজ্জাব করিয়া তাঁকে সুস্থ করিয়া তুলিল কিন্তু নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬ই মে শুক্রবারে কাশী লাভ করিয়াছে।

উপেক্ষ আশ্রমের যে সকল রোগীর সেবা গুজ্জাব করিত এবং বড়ী

বাড়ী গিয়া যে সকল দরিদ্র অনাথ অসক্ত বোগীদের ঔষধ পথ্য নিত্যই দিয়া আসিত, সকলেই তাহাব এই অকালে কালগ্রাসে দিবারাত্র তাহার গুণাবলি স্বরণ করিয়া বোদন করিতেছেন। ধন্ত উপেক্ষনাথ! তুমি যে মূল মন্ত্র পাইয়াছিলে, সে মন্ত্র সিদ্ধির জন্ত তুমি ষথার্থ অকপট ভাবে প্রাণেব মায়া পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া সতত যত্নবান্ ছিলে। পাঠক, সে মন্ত্রটা কি শুনিবেন? ঈশ্ববই জীবরূপে জগতে বিচরণ কবিতেছেন, নিঃস্বার্থ ভাবে জীব সেবা করিলে স্বয়ং ঈশ্ববেবই সেবা হয়, নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান, জপ, পূজা পাঠ, তপস্কা ইত্যাদিতে মনুষ্য যে দল লাভ করে, নিষ্কাম জীবসেবাতেও সেই ফল হয়; ববং কাহাবও কাহারও মতে আরো অধিক। উপেক্ষা স্বখন সেবাশ্রমের সেবক রূপে গৃহীত হয়, তখন এই মন্ত্র পাইয়াছিল এবং জীবনটী এই মন্ত্র সিদ্ধিব জন্তই উৎসর্গ কবিয়াছিল। যে সেবাশ্রমে বোগী হইয়া প্রবিষ্ট হইল, সেই খানে আবার রোজা হইয়া ভগবানের কার্য্য নিঃস্বার্থ ভাবে কবিতে কবিতে এই অবিস্মৃক্ত পুৰী কাশীধামে দেহ বিসর্জন করিলেন। ধন্ত শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী কথিত কৰ্ম্মযোগ উপদেশ, ধন্ত তাহাব গুরুদেব, যিনি লোকহিত-সাধক জীবন্ত মহামন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত কবিয়াছিলেন এবং ধন্ত তাহাবা, যাহারা আবার স্বামীজি দ্বারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

গভাব শোকের সহিত প্রকাশ কবিতেছি যে, বিগত ১৭শে বৈশাখ তাবিখে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য স্বামী নিবন্তনানন্দ হবিধাবে দেহরক্ষা কবিয়াছেন। তিনি অতি বাল্যকাল হইতেই ভগবান্ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের সঙ্গ ও রূপা লাভ কবিয়াছিলেন। তিনি নির্ভীক, তেজস্বী ও বালকবৎ সবেলস্বভাব ছিলেন। কয় বৎসব যাবৎ ছুৰাবোগ্য রক্তামাশয় বোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি কতকটা সুস্থ হইয়া হরিদ্বাবে বাস্তু পৰি-বর্ত্তনার্থ গিয়াছিলেন। তথায় হঠাৎ বিসৃচিকা বোগে আক্রান্ত হইয়া তাহাব শরীর ত্যাগ হয়।

কানিফোর্শিয়া শান্তি আশ্রমের কথা সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন। এই আশ্রম আমেরিকার কোলাহলপূর্ণ নগরী-সমূহ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। জনৈক সদস্য ব্যক্তির অগ্রহে প্রাপ্ত এই স্থানে স্বামী তুলীথানন্দ এই আশ্রম স্থাপন করবেন এবং কয়েকজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীকে সাধন ভজন শিক্ষা দেন। এই আশ্রম চতুর্দিকে উচ্চ শৈলমালায় বেষ্টিত এবং যেন সাক্ষাৎ শান্তিদেবীর নিবাসস্থান। তথায় গুরুদাস নামক একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী নিয়ত বাস করবেন।

বিগত ২৯শে অক্টোবর স্বামী ত্রিগুণাতীত সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সমিতির দ্বাদশ জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া এই আশ্রমে সাধনার্থ গিয়াছিলেন। এখানে প্রায় এক মাস কাল ক্রমাগত ধ্যান ভজন পাঠাদি হয়। ইহাব দ্বারা ছাত্রগণ বেদান্তের উপদেশ সমূহ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন। কর্মময় আমেরিকান জীবনে ইহা এক নূতন ব্যাপার! সকলেই আপনাদিগকে এই নির্জন বাসেব দ্বারা আশাতীত উপকৃত বোধ করিয়াছেন এবং কবে আবাব সেই শান্তিনিকেতনে গিয়া সংসাবেব আলা মন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া জগৎপিতার ধ্যান ধারণায় দিন কাটাইবেন, সেই শুভ দিনের আশায় উদ্গীত হইয়া বহিয়াছেন।

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারি রুহ্মপতিবার নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতিতে ভগবান্ ত্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি পূজা ও তৎপাশ্বেব রবিবারে সর্গসাধাবণেব জন্ত উৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে স্বামী অভেদানন্দ ‘প্রকৃত মহাত্মা’ বিষয়ে এক বক্তৃতা করবেন। তিনি এমন অলস্ত ভাষায় ভগবান্ ত্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনী ও উপদেশ বিবৃত করবেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দ মস্তমুগ্ধবৎ তাঁহার সমুদয় কথা শ্রবণ করবেন।

তিথিপূজার দিন স্বামী অভেদানন্দেব শিষ্য ও বক্তৃতা ভগবান্ ত্রীরামকৃষ্ণদেবকে পূজা করিবার জন্ত এত অধিক পরিমাণে পুষ্প ফলাদি আনয়ন করিয়াছিলেন যে, পবনহংসদেবের প্রতিকৃতির নিয়ন্ত্রিত বেদিতে সকল গুলির স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন হইয়াছিল। ধ্যান, ত্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও জগদম্বার জ্যোতির্দীপ পাঠ ও পূজায় সাবাদিন কাটিল। ভক্তগণের অনেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত বেদীসমীপে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।



পরে স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও তাঁহার কিছু কিছু উপদেশ পাঠ করিয়া এই আলোচনায আমাদের কতদূর উপকার হইতে পাবে, তাহা স্নন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন ।

সাধাবণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ একরূপ আগ্রহেব সহিত গ্রহণ কবিতেছে যে, ক্রুক্লিনে একটি শাখা সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে । স্বামী অভেদানন্দ ‘তথ্য সার্বভৌমিক বেদান্ত ধর্ম’ এবং ‘আত্মরহস্ত’ নামক দুইটা বক্তৃতা প্রদান করেন ।

স্বামী অভেদানন্দ কর্ণেল ইউনিভার্সিটির প্রায় তিন শত ছাত্র ও অধ্যাপকের সম্মুখে এক বক্তৃতা কবেন । বক্তৃতা সকলেবই এতদূর হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে, তৎপরদিন কর্ণেলের গৃহে কথোকথন সভায় যোগ দিবার জন্য আহুত হইয়াছিলেন । স্থানীয় সংবাদপত্রসকলও তাঁহার বক্তৃতার খুব প্রশংসা কবিতেছে ।

---

# শ্রী শ্রীরামানুজচরিত ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

স্বামী বামরুক্ষানন্দ ]

[ ২০৭ পৃষ্ঠার পর।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আগমন পূর্বক বামামুজ মহাপূর্ণকে আপনাব গুরুরূপে পাইয়া শ্রীযামুনাচার্য্য জনিত শোক বিস্মৃত হইলেন। তিনি আদর্শ শিষ্যের জায ব্যবহার কবিয়া শিষ্যকর্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শবীবং বসু বিজ্ঞানং বাসঃ কৰ্ম্মগুণান্ অশ্বন ।

গুরুৰ্বং ধাবয়েদ্ যন্ত স শিষ্যো নেতবঃ স্মৃতঃ ॥

যিনি শরীর, ধন, জ্ঞান, বসন, কৰ্ম্ম, গুণ ও প্রাণ স্বীয় গুরুর জন্তই দ্বারণ কবেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্য, অতো নহে। বামামুজ এইরূপ শিষ্যই ছিলেন। মহাপূর্ণের নিকট জ্ঞানতত্ত্ব, গীতার্থসংগ্রহ, সিদ্ধিভ্রম, ব্যাসমুদ্র, পঞ্চবাত্রাগম প্রভৃতি অধ্যয়ন কবিলেন। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভায় মহাপূর্ণ মোহিত হইয়া স্বীয় সন্তান পুণ্ডরীককে তাঁহার শিষ্য কবিয়া দিলেন; এবং তাঁহাকে কহিলেন, বৎস, এখান হইতে কিছুদূরে তিককোট্টিব বা গোষ্ঠিপূর্ব নামে এক বর্দ্ধিষ্ণু নগর আছে। তথায় গোষ্ঠিপূর্ণ নামে এক পবন ধার্মিক পণ্ডিত বাস কবেন। তাঁহার জায পবন বৈষ্ণব আব এ অঞ্চলে নাই বলিলে অছ্যক্তি হয় না। যদি তুমি অৰ্ধসহিত বৈষ্ণবমন্ত্র অবগত হইতে চাও, তাহা হইলে তিনি ভিন্ন আর কেহ তোমায় তাহা শিক্ষা দিতে পারিবেন না। অতএব কাল বিলম্ব না কবিয়া যাহাতে অচিবে মন্ত্রলাভ কবিতে পার, তাহার জন্ত যত্নশীল হও। ইহা শুনিয়া শ্রীবামামুজ তৎক্ষণাৎ গোষ্ঠিপূর্বে গমন করিলেন, এবং গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট গমন পূর্বক তাঁহার চরণ বন্দন কবতঃ স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন কবিলে তিনি কহিলেন, “অন্ত এক দিন আসিও, দেখা বাইবে।” ইহাতে বামামুজ ক্ষুব্ধ হইয়া স্বহাানে প্রতিগমন করিলেন। ইহার দুই একদিন পরে শ্রীবঙ্গয়ে মহান্ উৎসব উপলক্ষে গোষ্ঠিপূর্ণ ভগবদর্চনার্থ তথায় উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে, কোনও রত্ননাথের সেবক ভগবদাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “তুমি বামামুজকে সরহস্য যন্ত্র উপদেশ দিও। কাবণ, তাহার জায শ্রেষ্ঠ আধার আব কুত্রাপি পাইবে না।” ইহাতে গোষ্ঠিপূর্ণ উত্তর কবিলেন, “হে প্রভো, আপনিই নিয়ম করিয়াছেন যে,

ইদন্তে নাভপঙ্কায় নাভজ্য কদাচন ।

ন চাণ্ডাল্যবে দেয়ং ন চ মাং গোহত্যহরতি ॥

অগ্রে কিঞ্চিৎ কাল তপস্যাদি না করিলে চিন্তাশক্তি হয় না। অগুরু চিত্তের মন্ত্রধারণক্ষমতা কিরূপে সম্ভবে ?” ইহাতে এই উত্তর হইল, “পূর্ণ, তুমি ইহার পবিত্রতার বিষয় অবগত নহ, তাই এরূপ বলিতেছ। ইনি সর্বজন-পাবন, ইহা পবে জানিতে পাবিবে।”

শ্রীরামানুজ ইহার পব পুনরায় গোষ্ঠীপূর্ণের পদমূলে উপনীত হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। এইরূপে তিনি অষ্টাদশ বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। ভাবিলেন, “আমার ভিতর নিশ্চয়ই কোন মালিন্য আছে, এই জগৎই দেশিকেশ্বর রূপা কবিত্তেছেন না।” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিকলেক্ষিয় হইয়া রোদন কবিত্তে লাগিলেন। কতিপয় লোক আসিয়া এই বার্তা গোষ্ঠীপূর্ণকে জানাইলে তাঁহার হৃদয়ে করুণাব সঞ্চার হইল। তিনি রামানুজকে লোকদ্বারা আনাইয়া তাঁহাকে সরহস্য মন্ত্রবাজ দান কবিলেন, এবং কহিলেন, “এক শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন ইহাৎ মাহাত্ম্য আব কেহ অবগত নহে। আমি তোমায় মহান্ আধার বলিয়া জানি, সেই জগৎই ইহা তোমায় দান কবিলাম। কলিকালে ইহার অধিকারী আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতে পাই না। যে কেহ ইহা শ্রবণ কবিলে, সে নিশ্চয়ই দেশান্তে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন কবিলে। স্মরণ্য ইহা আব কাহাকেও দিও না।” শ্রীরামানুজ শ্রীগুরুবাক্য শুনিয়া পবম প্রীত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র বাসনা পূর্ণ হইল। মন্ত্রশক্তিতে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার বদনসুধাকব একপ্রকার অলৌকিক কাণ্ডি ধারণ করিল। পবম নিবৃত্তিলাভ পূর্ব্বক তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান কবিলেন ও স্বীয় গুরুদেবের চরণে বার বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক আপনাকে পরম ভাগ্য-বান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে কবিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গমের দিকে ঘাইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি গোষ্ঠীপূর্ণের শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের মহোচ্চ দ্বার লক্ষ্য কবিয়া, ভদতিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ; এবং পশ্চিমধ্যে বাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে এই বলিয়া আনন্দিত করিলেন, “মন্দির স্মরণে আইস, আমি তোমায় এক অমূল্য রত্ন দান করিব।” তাঁহার উল্লসিত মুখশ্রী, অমামুখীভাব, সারল্যময় বচনবিজ্ঞান,

ব্রহ্মব্যতেজোময়ী দিব্য কান্তি দর্শন পূর্বক মন্ত্রমুগ্ধের ভ্রায় আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহার অনুগামী হইলেন। ক্রমে সমস্ত নগরে এই জনবহু উঠিল যে, এক মহাপুরুষ স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া মন্দির সমীপে অবস্থান করিতেছেন এবং যে যাহা চাহিতেছে, তাহাকে তাহাই দিতেছেন। এই জনরবে আরুণ্ডে হইয়া যিনি যেক্রপ অবস্থাতে ছিলেন, তিনি সেই অবস্থাতেই মন্দিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এক দণ্ডের মধ্যে নগরস্থ ও নগরপার্শ্বস্থ যাবতীয় নরনারী উপস্থিত। সেই মহতী জনতা সন্দর্শনে বায়ামুজের হৃদয়ে অসীম প্রেমসিক্ত আনন্দবাতাবিতাভিত হইয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল; তিনি সমাগত শিষ্যদ্বয়, দাশবধি ও কুবেশকে আলিঙ্গন পূর্বক তাঁহাদিগকেও উক্ত আনন্দের অংশী কবিলেন। পবে গোপুব বা মন্দিরদ্বারে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “প্রাণেব অপেক্ষা প্রিয়তম ভাই ভগিনীগণ, তোমরা যদি এই মুহূর্ত্তে সংসারের যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণার হন্ত হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি লাভ কবিতো চাও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আমি যে মন্ত্ররত্ন সংগ্রহ কবিয়া আনিবাছি, তাহা আমার সহিত বাবদ্রঘ উচ্চারণ পূর্বক কৃত-কৃত্য হও।” ইহাতে সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “বলুন, কৃতার্থ করুন, আমরা প্রস্তুত।” তখন, বামুন মুনিব হৃদগতভাবের একমাত্র মর্ম্মজ্ঞ, উভয়বিভূতিপতি, সর্বসম্পাপহাবী, সর্বজনপ্রিয়, বাৎসল্যাপোষিনিধি, জীব-হুঃখসহিষ্ণু, ইত্যাদি তমসাক্ষরের ভাস্কর স্বরূপ, লক্ষণাবতাব শ্রীরামানুজ স্বীয় আনন্দময় হৃদয়ের গভীৰতম প্রদেশ হইতে বজ্রনির্ঘোষে “ও নমো নাবায়ণায়” এই মহামন্ত্রেব অবতাবণা কবিলেন। নিবতিশয় ক্ষুধাতুর যদ্রূপ আগ্রহের সহিত অন্তরস গ্রহণ কবে, সেই মহতী জনতা তদ্রূপ আগ্রহের সহিত সেই সর্বসুখনিধান মহামন্ত্র গ্রহণ পূর্বক কোটি বজ্রনির্ঘোষে এককালে তাহা উচ্চারণ করিল। শ্রীরামানুজের সহিত এইরূপ আর দুইবার বলিয়া সকলে স্থির হইল। অহো! মন্থেব কি প্রভাব! তৎকালে অবনী যেন বৈকুণ্ঠেব ভ্রায় প্রতীৎমান হইয়াছিল। আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দোদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দ্বারা এক্রপ বোধ হইতেছিল, যেন হুঃপ-মালিন্য চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। দীহাবা অর্ধাগম, বা অন্য কোন সাংসারিক বাসনাব পরিপূর্ণিত প্রত্যাশায় আসিয়াছিলেন, তাহারা কাচখণ্ড-সংগ্রহেচ্ছুর সহসা জীবকখণ্ড লাভ জনিত মহানন্দের ভ্রায় নিত্যানন্দ লাভ করিয়া অর্থ বা সংসারের কথা একবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। দিব্যা-

নন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলে দেবভূজ্য হইয়াছিলেন। এইজন্য পৃথিবীও সেই সময় স্বর্গভূজ্য হইয়াছিল। রামানুজ ত্রিচরণোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্বক তাঁহাকে ভূবি ভূরি ধন্যবাদ দিয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করতঃ জনতা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন শিষ্যদের সমভিব্যাহারে গোপুব হইতে অববোহণ পূর্বক ত্রীরামানুজ গোষ্ঠিপূর্ণের ত্রীপাদপদ্ম পূজা মানসে তদগৃহোদ্দেশে গমন করিলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য শিষ্যেব মুখে গোষ্ঠিপূর্ণ রামানুজরূতান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছিলেন। স্মৃতবাৎ শিষ্যদ্বয়েব সহিত যতি-রাজ যখন তাঁহার সম্মুখবর্তী হইলেন, তিনি ক্রোধবেগ সম্বরণ কবিতে না পারিয়া তারম্ববে কহিলেন, “দূব হও নবাশম, মহারত্ন তোমার ন্যায নর-পশুকে দিয়া আমি মহাপাপ করিয়াছি, আবাব কেন তোমাব মুখদর্শন-জনিত মহাপাপে আমায লিপ্ত কবিতে আসিয়াছ? তোমার ন্যায পিশাচের নরকেও স্থান হওয়া দুষ্কব।” রামানুজ ইহাতে কিস্কিন্মাত্র ভীত না হইয়া অতিবিনীত ভাবে কহিলেন, “মহাত্মন, নরকবাসেব জন্য প্রস্তুত হইয়াই আমি আপনাব আদেশ লঙ্ঘন কবিয়াছি। আপনাব বাক্যানুসাবে যে কেহ উক্তমন্ত্ৰ শ্রবণ কবিবে, তাহার পবমাগতি লাভ হইবে। উক্ত বাক্যেব উপব নির্ভর কার-য়াই আমি নগবেব যাবতীয নরনাবীকে মোক্ষপথেব পথিক কবিয়াছি। দেহান্তে তাহারা সকলেই পবমপদ লাভ কবিয়া কৃতকৃত্য হইবে। যদি আমার ন্যায একজন তুচ্ছলোক নরকে গমন কবে ও তৎপবিবর্তে সহস্র সহস্র নবনারী বৈকুণ্ঠ গমনেব অধিকাব পাইয়া কৃতকৃত্য হয়, তাহাহইলে এক্রপ নবকগমন আমাব প্রার্থনীয। আপনাব আদেশ লঙ্ঘন কবিয়াছি, স্মৃতবাৎ আমার নবক হউক। এবং আপনাব বাক্যানুসাবেই সহস্র সহস্র পাণী তাপীর পবমাগতি লাভ হউক। ইহাপেক্ষা ক্ষেমকর ও লাভজনক আর কি আছে?”

দুর্দ্বিন্দুসারথি কৃষ্ণবর্ণ মেঘবাজি তড়িৎরূপ মুখভঙ্গিমা দ্বারা ভযোদ্দীপক বদন বিস্ফারিত কবিয়া গর্জন কবিতে থাকিলে আবালবৃদ্ধবনিতা যেক্রপ ভ্রস্ত হইয়া উঠে, এবং পবক্ষণেই বিপবীত বায়ু সবেগে প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন কবতঃ প্রকৃতিব মুখ নির্ম্মল কবিলে যেক্রপ ভ্রাস দূব হইয়া হর্ষেব সঞ্চার কবে, সেইরূপ গোষ্ঠিপূর্ণেব ক্রোধম্লান ক্রকুটিভীষণ কঠোববাক্যবিকীর্ণ-কারী বদন অবলোকন করিয়া সকলে ভ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ত্রীরামানুজের

তীক্ষ্ণযুক্তিসম্বিত প্রেমগর্ভ বিনয়পূর্ণ কুচির বাগ্‌বিন্যাস তদীয় গুরুর বদন ক্রোধলেশপরিশ্রুতা ও নির্মল করিল, সকলের হৃদয় হইতে ত্রাস দূর হইল। আপনার সঙ্গীর্ভতা ও রামানুজের পরমোদারতা উপলব্ধি করিয়া গোষ্ঠিপূর্ণ যখন তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত আলিঙ্গন করিলেন, তখন এই অকস্মাৎ পরিবর্তনে সকলে চিত্তার্ণিতের ন্যায্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, আনন্দাতিরেকে কাহারও বাঙ্‌নিশ্চি হইল না। ভূজবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া যুক্তকরে গোষ্ঠিগুরুপতি রামানুজকে কহিলেন, হে মহানুভব, অদ্য হইতে তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য। যাহার এরূপ বিশাল হৃদয়, তিনি লোকপিতা বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। আমি সামান্য জীব। তোমার মাহাত্ম্য কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব? আমার অপরাধ ক্ষমা কর। লজ্জাবনত মস্তকে গুরুর পাদদ্বয় গ্রহণ পূর্বক শ্রীরামানুজ কহিলেন, “হে মহাত্মন, আপনি আমাব নিতাগুরু। আপনার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়াই মন্ত্রেব এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইয়াছে। আপনার অসীম প্রভার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র উক্তমন্ত্রে সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়াই ইহার সর্বলোকপাবনকাবী শক্তির উদয় হইয়াছে, যাহার বলে অদ্য শত শত নর নাবীর ভুংখসস্তাপবাশি দগ্ধ হইয়া গেল, যাহার বলে আমি গুরুবাক্য লঙ্ঘনরূপ মহাপাতক কবিলেও, আপনার দেবভূজিত আলিঙ্গন লাভ করিয়া চিকদিনের জন্য কৃতার্থ হইলাম। সন্তান বলিয়া দাস বলিয়া চিরকাল ত্রীচরণে স্থান দিবেন, ইহাই আমার একান্তিকী প্রার্থনা”।

শ্রীরামানুজের মাণ্ডু্য ও বিনয়ে পরমপ্ৰীত হইয়া গোষ্ঠিপূর্ণ স্বীয় তনয় সৌম্যনাবায়ণকে তাঁহাব শিষ্যরূপে অর্পণ করিলেন। গুরুর অমুমতি গ্রহণপূর্বক শ্রীরামানুজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহাবে শ্রীরঙ্গমে যাত্রা করিলেন। এই ঘটনার পব হইতে তাঁহাকে সকলেই সাক্ষাৎ লক্ষণাবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

## রক্তাক্ষ-গৌরীধ্বজ-মিলন ।

নৈনিসর ও চম্পাবত দুই নাতিদূরস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য । রক্তাক্ষ নৈনিসরের, গৌরীধ্বজ চম্পাবতের অধিপতি । উভয় রাজ্যের রাজধানীতে দেবী রণ-বিজয়ী মূর্তির প্রত্যহ মহা সমারোহে পূজা হয় । কিংবদন্তী যে, মূর্তিবয় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে প্রতিষ্ঠিত । নৈনিসর ও চম্পাবতের অধিপতিগণ আপনাদিগকে রণবিজয়ী বরপুত্র মনে করিতেন । কিন্তু উভয় রাজ্যেব অধিপতিই বংশপরম্পরাক্রমে পনস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবপোষণ করিতেন । বক্তাক্ষ সহস্র করিয়াছেন, গৌরীধ্বজের বিনাশ ও চম্পাবতবাস্য স্বরাজ্যভুক্ত করিবেনই ।

প্রত্যয়ে রক্তাক্ষ চম্পাবত বাজ্য আক্রমণে যাত্রা কবিলেন ! রণবিজয়ী বন্দীরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “আজ না তোমাকে প্রণাম কবিব না । পারি যদি, গৌরীধ্বজের ছিন্নমস্তকে ত্রিচবণ অলঙ্কৃত কবিয়া প্রণাম কবিব ।”

সসৈন্য রক্তাক্ষের আগমন সংবাদে গৌরীধ্বজ সংগ্রামের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন । ভক্তিসহকাৰে রণবিজয়ী পূজা কবিলেন, চবণায়ুত, নির্দ্বন্দ্বিতা ও প্রসাদ ধারণ করিয়া কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা কবিলেন, “ভৃগুতিনাশিনি, দেখো যেন যুদ্ধে তোমার অভয়পদাশ্রয়ী সন্তানের কোন অমঙ্গল না ঘটে ।”

যুদ্ধ হইল । রক্তাক্ষ কর্তৃক পবাজিত ও বন্দীকৃত গৌরীধ্বজ নৈনিসর-কাবাগারে নিষ্কিপ্ত হইলেন । কুসুমকোমলশয্যাশায়ী রক্তাক্ষ কারাগাবধূলিশয্যাশায়ী গৌরীধ্বজের চূর্তাণ্য নিজ সৌভাগ্যের সহিত তুলনা করিতেছেন, “রক্তাক্ষ, স্ববংশ উজ্জ্বল করিলে, চিবশক্রকুলোদ্ভব গৌরীধ্বজ তোমাব হস্তগত ; কাল তাকে রণবিজয়ী পূজায় বলি দিয়া তুমি যে বীরজননীৰ স্বার্থ বরপুত্র, একথা সর্বসমক্ষে প্রমাণ কবিবে । গৌরীধ্বজ, সামান্য প্রহরীর ইঙ্গিতে তুমি এখন চালিত ; তোমাব স্ত্রী পুত্র পবিবাব রক্তাক্ষের দাসত্বে নিযুক্ত । দিক্ তোমাকে ! এ অপমান স্বচক্ষে দেখা অপেক্ষা বণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ শতগুণ ত্রৈয়ং ছিল না ? অচিবে তোমাব পিতৃপিতামহাগত বাজ্যে রক্তাক্ষের পতাকা সগর্বে নৃত্য করিবে । আমি যদি তুমি হইতাম, উঃ, তা হলে এক মুহূর্তও জীবন আমার পক্ষে অসহ্য হইত ।”

“রাজা ছিলাম, বন্দী হইয়াছি । জগতেব অলজ্ঞা নিযম পরিবর্তন । কোন্ অবস্থা চিরন্তন ? সম্পদের পশ্চাৎ বিপদ পদে পদে ; ধন, মান, বল, রূপ,

এই আছে, এই নাই। আমার বলিবার কি আছে? আমার রাজ্য, আমার বনিতা, আমার অশ্বজ, এক্ষণে রক্তাকের। আমার শরীর, এ ভ্রমও জ্ঞানদ অনতিবিলম্বে দূর করিবে। সংসার হৃদিনের পান্থনিবাস, তার জন্ত সকলের ছুটাহুট কেন! জীবনের পবিণাম মৃত্যু, এ নিশ্চিত সত্য কালপুরুষ জ্ঞানন্ত অক্ষরে দশদিকে বিজ্ঞাপিত কবিতোছে; মানুষ তা দেখিয়াও কেমন দেখে মা?” সংসারের অনিত্যতা চিন্তন করিতে করিতে গৌরীধ্বজ নিদ্রিত হইলেন। রক্তাকও নিদ্রিত।

রক্তাক স্বপ্ন দেখিলেন, মা বণবিজয়ী বলিতেছেন, “গৌরীধ্বজের স্বপ্ন-তিতে তোব এত আনন্দ! জানিস, তুই যে, আমার গৌরীধ্বজও সেই।”

“কখনই না। আমি রক্তাক, গৌরীধ্বজ গৌরীধ্বজ। আমি নৈর্মিসরের অধিপতি, গৌরীধ্বজ ছিল চম্পাবতের। আমি বিজয়ী, সে পরাজিত বন্দী। রক্তাক কেন গৌরীধ্বজ হতে যাবে?”

“দেখি?”

রক্তাক দেখিলেন, ঠাঁহার আমি ক্ষুদ্র মানবদেহধারী রক্তাক জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসার হইয়া ‘আমি বৃহৎ, অতি বৃহৎ’ জ্ঞানে পবিণত হইতেছে। দেখিলেন, তিনি মহাশুনিধির ঞাণ সার্বব্যাপী। একরূপ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। আবার দেখিলেন, এক তিনি, বহু হইয়া বহুরূপে বিরাজিত। একরূপে তিনি বিশ্ব-নিবস্তা, অপরিমেয় চৈতন্য, শক্তি, আনন্দ, ঐশ্বর্যো পরিপূর্ণ, অসীম বিধ ঠাঁহার শবীর; অত্র অগণ্য রূপ সমূহে তিনিই বিশ্ববাসী হইয়া স্বীয় বিশ্বনিবস্তারূপের বিদ্বরূপ শবীরে কীটগুণসম ক্রীড়া করিতেছেন। পরক্ক্ষে এ জ্ঞান সমুচিত হইল। দেখিলেন, তিনি গৌরীধ্বজ, চম্পাবতের রাজা, রক্তাক কর্তৃক লাঞ্চিত, বনভ্রমে কারাগারে বান্ধিযাপন কবিতোছেন। নিশাবসানে রক্তাকপূজিত বণবিজয়ী বলি উদ্দেশ্যে আনীত হইলেন। উথিত রূপাণ ক্ষণমাত্রমধ্যে ঠাঁহার ইহলীলার অন্ত করিবে। তিনি ভয়বিহ্বল, বদ্ধবাস, দারুণ বাতনা অনুভব করিতেছেন।

সহসা নিজ্জাতক হইল। অদ্ভুত স্বপ্ন স্বরূপে রক্তাকের বারংবার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। বিলম্বব্যতিরেকে গৌরীধ্বজের কাবাগার অভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

প্রহরীকে কারাগারের দ্বার মুক্ত করিতে বলিলেন। নিদ্রিত গৌরী-ধ্বজকে জাগ্রত করিলেন। গৌরীধ্বজ প্রেমগদগদস্বরে বলিলেন, ভাই, আমরা



ভাই, আমরা এক মা রণবিজয়ীর বরপুত্র, আমাদের বিদেব ভাব কেন ? বলিতে বলিতে রক্তাক্তকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুধারায়াক্ত করিলেন। বলিলেন, স্নপ্নে মা আসিয়া বলিলেন, তুইও বলিস, রক্তাক্তও বলে, তোরা আমার বরপুত্র। তবে ভাই ভাইয়ের মত থাকিস না কেন ? তোদের ও সব মুখের কথা।

আজ মহানন্দে রণবিজয়ীর পূজা হইল। বক্তাক্ত ও গৌরীশ্বজ একমুখে এককালে দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। নৈনিসর ও চম্পাবতের প্রভাগণ একত্রে মহাসুখে, মান প্রসাদ পাইল। গৌরীশ্বজ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কত দিনের বিবাদ এক বাহুর বিস্মৃতির অগাধ গর্ভে চিরকালের জন্য মগ্ন হইল। গৌরীশ্বজ সত্য বলিয়াছিলেন, পবিত্র জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

“সদ্যাসী।”

## সৃষ্টিতত্ত্ব। \*

( শ্রীহরীকেশ কাঞ্জিলাল । )

যঃ পূম্বান্ সাংখ্যদৃষ্টীনাং ব্রহ্ম বেদান্তবাদিনাম্।

বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদ্যামেকান্তনির্মলম্॥

যঃ শূন্যবাদীনাং শূন্যো ভাসকো ঘোহর্কতেজসাম্।

গুরুসম্বন্ধং দেবং নমামি জ্ঞানদং বিভূং ॥

মাননীয় সভাপতি মহাশয়। বিবিধশাস্ত্রপাবদর্শী মহোদয়গণ!

অদ্য আমি একটি দুর্লভ বিষয় অবলম্বন করিয়াছি, যে বিষয় মহর্ষি কপিল দেব কর্তৃক ভূয়োভূয়ঃ আলোচিত হইয়াছে, যে বিষয় জানিবার নিমিত্ত ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞান-কুশল মহর্ষিগণ গ্রহোপগ্রহ-সমন্বিত এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করিয়াছেন। যে সৃষ্টিতত্ত্ব বশিষ্ঠপ্রমুখ

\* হরীকেশ বাবু বারাণসীর অন্তর্গত মদনপুরার মিত্রগোষ্ঠীসভার (Friend's Association) এক অধিবেশনে সংকৃত ভাষায় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ তাহারই উক্ত হরীকেশ বাবু কৃত বঙ্গানুবাদ।

বিজ্ঞানবিশ্লেষণ কর্তৃক স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, ব্রহ্মা সহস্র বৎসব তপস্বী করিয়াও বাহা অবগত হইতে পারেন নাই, আমি আজ সেই সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে উৎসুক হইয়াছি। ইহা আমার পক্ষে চপলতার বিষয়, সন্দেহ নাই। সত্য সত্যই মনোরথের অগম্য স্থান কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আজ আমাব বড়ই আনন্দেব দিন যে, আপনাদিগের জায় পবিত্রহৃদয় জ্ঞানিগণসমক্ষে আমি শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছি; আজ আমার বড়ই আনন্দ যে, মহর্ষি-দিগের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে এক একটি বজ্রাহরণ পূর্বক যে একটি অতি-লবিত মন্দির নির্মাণ কবিয়াছি, তাহাই আজ আপনাদিগকে দেখাইব।

সভ্য মহোদয়গণ। যখনই এই জীবকোলাহলপরিপূর্ণ নগরী পরিত্যাগ পূর্বক সাযাছে নির্জনে বসিয়া উচ্ছ্বাদিত দৃষ্টিনিষ্কপ করি, যখনই দোষ, পুঞ্জীকৃত নক্ষত্রমালা নীলাশ্রবে মুক্তাফলের জায় বিবাজিত রহিয়াছে, তখনই হৃদয় বিশ্বময়রসে অভিভূত হয়, তখনই মনে হয়; এই দৃশ্যমান নক্ষত্র-পুঞ্জের প্রত্যেকটী ত এক একটি জগৎ। ইহাদেব মধ্যে কোনটী পৃথিবী বা জায়, কোনটী বা পৃথিবী হইতেও বৃহৎ, কোনটী সূর্য্যতুল্য, কোনটী সূর্য্য হইতে প্রকাণ্ড। গ্রহোপগ্রহসম্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড কি বিশাল! কোথায় বিশালা সৃষ্টি, আব কোথায় বা আমার স্বল্পবিষয়গ্রাহিনী বুদ্ধি! তবে কিরূপে সৃষ্টিতত্ত্ব নিকূপণ কবিব? কে বলিয়া দিবে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কি রূপে উৎপন্ন হইল?

যেহ হইতে জলধাবাব জায় গাঁহা হইতে সমস্ত জ্ঞান ক্ষবিত হইয়াছে, সমস্ত শাস্ত্রেরই ধিনি উৎপত্তিস্থান, সেই শঙ্করব্রহ্ম বেদ বলেন—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং

নাসীদ্রজ্জো নো ব্যোমোপবোযৎ

কিমানরীষঃ কুহকশ্চ শশ্বদাভ

কিমানসীন্নহনং গহীরং

অর্থাৎ বাহা অদং, তাহা তখন ছিল না, বাহা সং তাহাও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, তাহা হইতে উন্নত স্থানও ছিল না, আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? গহন ও গহীর জল তখন ছিল কি? যদি সৃষ্টির পূর্বে—জগত সংও ছিলনা অসংও ছিলনা, তাহা হইলে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল? ঋষায়াসেই ইহা উপলব্ধি হয় যে, জগৎ একটি কার্য্য। বাহা বাহা আব্রি-

ভাব তিরোতাশাস্ত্রক, যাহা যাহা সৃষ্টিস্থিতিলয়াক্ষক, তাহাই কার্য্য। জগতও সৃষ্টিস্থিতিলয়াক্ষক, জগৎ ও উৎপত্তিবিনাশশীল, সূত্ররাং জগৎও কার্য্য। কার্য্যমাত্রেরই কাবণ আছে, কারণ বিনা আমরা কখনই কার্য্যের উৎপত্তি দেখি নাই। সূত্রবাং একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতেরও কারণ আছে। জগৎ যখন উৎপত্তিবিনাশশীল, তখন এই উৎপত্তিবিনাশশীল অনিত্য জগতের কারণও অনিত্য হইতে পারে না। অসৎ কারণ হইতে কখনও কার্য্যোৎপত্তি হয় না, কে কবে শশশৃঙ্গের আঘাতে ব্যথিত হইয়াছে? কোন্ মধুমক্ষিকা আকাশকুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্র নির্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে? তাই বলি, অসৎ বস্তু হইতে কোন সৎ বস্তুও উৎপত্তি হয় না, তাই বলিতেছি, নিয়তপরিবর্তনশীল এই অনিত্য জগতের পশ্চাতে কোন এক নিত্য অপরিবর্তনীয় কারণ বিদ্যমান আছে। এখন কারণ বলিতে আমবা কি বুঝি, তাহাই দেখিব। নৈয়ায়িকেরা কারণকে ‘অন্যথাসিদ্ধিশূন্যনিয়তা পূর্ববর্তিতা’ বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যাহাব যাহার উৎপত্তি অসম্ভব, যে যাহাব পূর্ববর্তী, সেই তাহাব কাবণ। বীজ ব্যতীত কখনও অঙ্কুরোদগম হয় না, তন্তু ব্যতীতবেক পটোৎপত্তি অসম্ভব; এইজন্য বীজ অঙ্কুরের এবং তন্তু পটের কারণ। আবার যখনই আমবা কোনও একটি কার্য্যের স্বরূপ চিন্তা কবি, তখনই কর্তৃকবণের প্রতিকৃতি আমা-দেব নয়নপথে পতিত হয়। সূত্ররাং প্রত্যেক কার্য্যেরই নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে দুইটা কবিয়া কাবণ আছে। যেমন মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটোৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকিলেও কুলালাদি বিনা ঘটোৎপত্তি কখনও সম্ভব হয় না, অতএব প্রত্যেক কার্য্যেবই নিমিত্ত উপাদান ও কারণ আছে। আমবা যতদূর আলোচনা কবিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিতে পারিয়াছি যে, কার্য্যমাত্রেরই কাবণ আছে, জগতও একটা কার্য্য; সূত্ররাং জগতেরও কাবণ আছে। আবার দেখিয়াছি যে, অভাব পদার্থ হইতে কখনও কোন পদার্থের উৎপত্তি হয় না, অনিত্য বস্তু কখনও অনিত্য বস্তু অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না, সূত্ররাং এই নিয়তপরিবর্তনশীল অনিত্য জগৎ কোনও এক অপরিবর্তনীয় কারণ অবলম্বন কবিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন আমবা দেখিব, কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য্য কাবণে বিদ্যমান থাকে কিনা, অঙ্কুরোদগমের পূর্বে অঙ্কুর রূপ কার্য্য বীজে বিদ্যমান থাকে কি না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে বস্তুও অভাব,

তাহারই উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অঙ্কুরো-  
দগমের পূর্বে—অঙ্কুরকার্য্য বীজে কখনও বিদ্যমান থাকিতে পারে না।  
যদি ঘটোৎপত্তির পূর্বে ঘট সৃষ্টিকায় বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ঘট নির্মাণে  
মহুছের চেট্টা হয় কেন? মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, ‘প্রাপ্ত্যুৎপত্তেরূপস্তিধর্ম-  
কমসং’ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে উৎপত্তিধর্মক পদার্থ অসং থাকে, ঘটোৎ-  
পত্তির পূর্বে সৃষ্টিকায় ঘট কখনও ঘটাকারে থাকে না, সৃষ্টিকার ঘটোৎ-  
পাদিকা শক্তি আছে জানিয়া কৃষ্ণকাব ঘটনির্মাণের নিমিত্ত সৃষ্টিকা আহরণ  
করিয়া থাকে। কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য্য যদি সং হয়, তাহা হইলে  
কার্য্যের উৎপত্তি বিনাশ দেখিতে পাই কেন? কার্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার  
করিলে ভাবরূপ কার্য্যে কখনও উৎপত্তিযোগ সম্ভব হয় না, কিন্তু ইহাই বা  
কিভাবে সম্ভব হইতে পারে? প্রত্যেক বিভিন্ন কার্য্যেরই উপাদান কারণ  
স্বতন্ত্র। সুতরাং কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য্য যদি কাবণে না থাকে, তাহা  
হইলে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন  
কার্য্য সম্পাদনার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সংগ্রহেরই বা প্রয়োজন কি? কার্য্যোৎ-  
পত্তির পূর্বে কার্য্য যদি অসং থাকে, তাহা হইলে কেহই তাহার সত্ত্ব সম্পা-  
দনে সমর্থ হয় না। শিল্পী সহস্র দ্বারাও নীলকে পীত করিতে পারা যায়  
না। আরও দেখা যায়, কার্য্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ আছে। কার্য্য যদি অসং  
হয়, তাহা হইলে অসং কার্য্যের সহিত সংকারণের সম্বন্ধ কি রূপে হইতে  
পারে? একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তত্ত্বধর্ম্ম  
হেতু পট বস্ত্তঃ তত্ত্ব হইতে ভিন্ন নহে অতএব কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন  
নহে। যদি কারণ সং হয়, তাহা হইলে কার্য্য কারণের অভেদ হেতু কার্য্যও  
সং হইবে, অতএব সং বস্ত্ত হইতেই সংবস্ত্ত উৎপত্তি হয়, সংবস্ত্ত হইতে  
কখনও অসংবস্ত্তর উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বাহা সং, তাহার আবার  
উৎপত্তি কি? বাহা নিত্য, তাহার আবার উৎপত্তি বিনাশ কি রূপে হইতে  
পারে? অতএব এখন আমরা সংক্ষেপে উৎপত্তি বিনাশের স্বরূপ চিত্রা করিব।  
অভিব্যক্তিই উৎপত্তি। অভিব্যক্তি কি? শক্তিরূপে কারণে গৌন কার্য্যের নিমিত্ত  
কারণ সংযোগে মূল রূপে প্রকটনই অভিব্যক্তি। বাহা বাহাতে শক্তিরূপে গৌন  
থাকে, তাহা হইতেই তাহার উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হয়। বীজে অঙ্কুরশক্তি  
বিদ্যমান থাকে, এই জন্য বীজ হইতে অঙ্কুরেব এবং সৃষ্টিকার ঘটশক্তি আছে  
বলিয়া সৃষ্টিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়। মহর্ষি কপিল ‘শক্তিশ্রু শক্যাকারণাৎ।’

এই সূত্র দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন। এখন বিনাশ কাহ'কে বলে, তাহাই দেখিব। কারণে লঘব নামই বিনাশ, কার্যের অত্যন্তাভাবকে বিনাশ বলে না, কার্যের শক্তিরূপে কাবণে স্থিতির নামই কার্যের বিনাশ। কিন্তু কার্য যদি বিনষ্ট হইয়াও স্বল্পরূপে কাবণে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? যাহারা মুঢ়, তাহারা ইহা দেখিতে পায় না; যাহারা বিবেচক, তাহারা দেখেন, তত্ত্ব বিনষ্ট হইলে মূঢ়রূপে তাহার পরিণাম হয়, পবে তাহাই আবার কার্পাস রূপে, এবং ক্রমে ফল পুষ্প তত্ত্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে কার্য মাঝেই সং, কার্য মাঝেই প্রবাহরূপে নিত্য। সদৃশ হইতেই যে সত্তেব উৎপত্তি, একই বস্তু স্বে অবস্থাভেদে কখনও সং কখনও অসং হইয়া থাকে, ইহা ভগবান্ কণাদের অভি-মত। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে অসংকার্যবাদীদিগের সহিত সংকার্যবাদীদিগের বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। অসংকার্যবাদীরা যাহাকে কার্যের প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসভাব বলিয়া থাকেন, সংকার্যবাদীরা তাহাকে কার্যের অনাগত এবং অতীত অবস্থা বলিয়া কীর্তন করেন, এইরূপে শক্তিরূপে লীন কার্যের স্থূলরূপে প্রকাশ হইতে থাকিলেই, সৃষ্টিকার্য হইতে থাকে। প্রথমে সৃষ্টি, তাহার পব স্থিতি, তাহার পব লয়। এই-রূপে সৃষ্টিস্থিতিসম্বন্ধক জগৎকার্য তালে তালে হইয়া থাকে; পবন-হিলোলে নৃত্যপব কুসুমের গ্রাঘ সৃষ্টিস্থিতিসম্বন্ধক জগৎকার্য তালে তালে হইয়া থাকে। আমবা যতদূর পর্যালোচনা কবিযাছি, তাহা হইতে ইহাই জানিতে পারিযাছি যে, কার্য কাবণের অভেদ হেতু কার্যোৎপত্তির পূর্বেও কার্য স্বল্পরূপে কাবণে বিদ্যমান থাকে, কাবণে লীন কার্যের প্রকাশই কার্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি এবং কাবণে লয় অথবা শক্তিরূপে স্থিতিই কার্যের বিনাশ বা তিবোভাব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কার্যের অত্যন্তাভাব কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, স্ততরাং এই জগৎকার্য অনাদি। এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্বে নামরূপবিনির্মুক্ত হইয়া যাহাতে লীন লয়, তাহাই ইহাব উপাদান কারণ। এই উপাদান কাবণকে কেহ প্রকৃতি, কেহ মায়া, কেহ পরমাণু বলিয়া থাকেন। অতএব সাংখ্যাচার্যাদিগের প্রকৃতি, বৈদাস্তিকদিগের মায়া, নৈয়া-য়িকদিগের পরমাণু বস্তুতঃ একই। ইহাদের সকলেই শক্তির সূক্ষ্মাবস্থা। এই শক্তির স্থূলাবস্থায় প্রকাশই জগৎ। স্ততবাং জগৎ শক্তিব বিরাট মূর্তি, জগৎ শক্তিব ক্রীড়াক্ষেত্র। যে দিকেই দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করি না কেন, সেই

দিকেই শক্তির বিষয় প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। কি-আদিত্য, কি বায়ু, কি তেজ, কি বহি, সকলই এই শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহা কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই পদার্থসমূহ পরস্পরের প্রতি পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত করিয়া থাকে, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া পদার্থসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই শক্তি দ্বারাই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের অনুভূতি হইয়া থাকে, বাতবিকই সমস্ত জগৎ এই শক্তি দ্বারা আলোড়িত হইতেছে। একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, এই শক্তি দুইভাবে বিরাজিত। ইহা এক মূর্ত্তি প্রশান্তা, সনাতনী, না জানি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া সর্বদেশ, সর্বকাল ব্যাপিয়া স্থিতিভাবে আপন মহিমা আপনি প্রকাশিতা বহিয়াছে; অপব এক মূর্ত্তি-জনঘ্রী, না জানি কতকাল এই কোটা জগৎরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই সত্ত্বগুণশালিনী চিহ্নস্তব উপর রজস্তমোময়ী বিক্ষেপ শক্তির ক্রীড়াই জগৎ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে

কবচাক্ষব এব চ।

করঃ সর্বানি ভূতানি

বৃট্শোহক্ষব উচ্যতে ॥

এই মহাবাক্য দ্বারা অর্জুনকে শক্তির দ্বিবিধ মূর্ত্তির কথাই বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিক Herbert Spencerও 'Persistence of Force ও Energy' শক্তির এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

## জ্ঞানলাভ ।

(স্বামী পরমানন্দ।)

যেব তমসাক্ষর নিশীথে অবগাহিতঃ পঞ্চভায় পথিকের উদ্যম অনিশ্চিত ফলপ্রদ। হয়ত নিজপথার্থেষণ করিতে গিয়া কোন কষ্টকর স্থানে উপনীত হইেন অথবা কর্দমাকীর্ণ অন্ধরূপে নিমগ্ন হইয়া ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করেন, কিন্তু নিশাবসানে স্বর্য়্যদেব যখন তমোবিনাশী কিরণমালা বিস্তার করিয়া জগৎকে পুনঃ প্রকাশিত করেন, তখন আর পথিকের ক্লেশ পাইতে হয় না।

অন্যাসে বর্ধার্থ পথাবলম্বনে নিজ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করেন, এবং অনভিজ্ঞ পথিকদিগকে তাহাদিগেব গন্তব্য পথ দেখাইয়া দিতেও সমর্থ হন ।

এই সংসারারণ্যের মধ্যেও বাহাদেব হৃদয় অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদের বিশ্রাম ও শান্তিলাভেব উদ্যমও ঐ প্রকার অনিশ্চিত ও নিষ্ফল কিন্তু বাহাদেব হৃদয় জ্ঞানস্বর্য্যালোকে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি পদসঞ্চালন পাষণসদৃশ সূদৃঢ় এবং উদ্যমও অভীষ্ট ফলপ্রদ এবং কেবল মাত্র তাহাবাই অগ্রাগ্র অজ্ঞানান্ধদিগকে উপযুক্ত পথ দেখাইয়া লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিয়া দিতে সমর্থ ।

আমরা সচরাচর তুলনায় অজ্ঞানকে অন্ধকার এবং জ্ঞানকে সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকি । কথা দুইটির বাস্তবিক তাৎপর্য্য কি একবার দেখা যাক । অন্ধকারের স্বরূপ কি ? আবরক, অপ্রকাশক । আলোকের ? প্রকাশক আবরণ-উন্মোচনকারী । আঁধার বিপদ ও ভ্রমজনক, আলোক বিপদ ও ভ্রমনাশক । দুইটা বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট জিনিস । অতএব একের অবস্থানে অপরের বিরাম এবং অপরের আগমনে অগ্ৰেব প্রস্থান । কারণ, স্বম্বভাবাপন্ন দুইটা বিষয়ের এককালীন অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব । যেখানে আলোক, সেখানে যে অন্ধকার নাই এবং যেথায় অন্ধকার, তথায় যে আলোকের অভাব, এ বিষয়েব প্রমাণ অনাবশ্যক । অন্ধকার আবরণশীল এবং ভ্রমজনক কেন ? আমবা রাত্রিকালে আমাদের নিত্যপরিচিত, আলোকহীন গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘরের জিনিসপত্রগুলি স্বাভাবিক সংস্থাপিত থাকা সত্ত্বেও কিছুই নয়নগোচর করিতে পারি না ; কারণ, দ্রব্যসমূহের উপর এমন কোন আচ্ছাদন পড়ে, বাহাতে উহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে অপ্রকাশিত কবিয়া রাখে । ভ্রমজনক, কেন না, আঁধারে সর্বকে রজ্জু বলিয়া ভ্রম হয়, বৃক্ষকে মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, শাদাকে কাল দেখায় ; কিন্তু তজ্জন্ত উহাদের স্বরূপের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না । বিপদজনক এই অস্ত্র যে, সাপকে দড়ি বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণাম সর্পাঘাত এবং মৃত্যু । কিন্তু আলোক ঐ আবরণ ভেদ করিয়া উহাদের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয় । কাজেই আলোক থাকিলে ভ্রম বা ভ্রমজন্য কোনরূপ বিপদ হইবার আশঙ্কা থাকে না ।

জ্ঞানাজ্ঞানেরও ঠিক ঐরূপ স্বভাব । অজ্ঞান ঐ অন্ধকারের তায় আবরণ-





আমি রূপবান, বা কুৎসিত, ধনী বা দরিদ্র, সুস্থ বা ক্রম, শক্তিবান বা দুর্বল, ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পরম পিতা, ইহারা আমার পরম ভাই ভগিনী, ইনি আমার বন্ধু, উনি আমার শত্রু, ইহারা আমাব আশ্রয়জন, উহারা পর, এইরূপে বালাঘোবন-প্রোচাবস্থাধীন রোগশোক-জরাদিযুক্ত, সীমাবদ্ধ এই নশ্বব দেহকে অচ্ছেদ্য অক্লেশ্য অশেষ্য অবিনাশী অসীম আত্মার সহিত একীভূত করিয়া, “আমি” ‘আমি’ কবা এবং আপনার সহিত এই বাহ্যজগতের রূপরসাদি বিষয়ের নিত্য সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া আমার আমার করার নামই দেহাত্মবুদ্ধিজ্ঞানিত অহঙ্কার, অজ্ঞান আবরণ বা মায়া ।

এই অহঙ্কার যে কেবল মাত্র ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ধনী ব্যক্তির ভিতরেই আছে বা সর্ব্বাসুন্দর সুস্থকায যুবকের ভিতরেই দেখা যায়, এমন নহে। কপর্দক-শূন্য পবনুখাপেক্ষী জীর্ণকল্যায়সম্বল এবং অঙ্গহীন কুৎসিত লোকের ভিতবেও সমানভাবে বর্ত্তমান, দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী ব্যক্তি ধনগর্বে গর্লিত হইয়া, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বড়, “কোন্তোহন্তি সদৃশো ময়া” আমার সমান কে আছে? ইত্যাদি ভাবিয়া উল্লসিত হয় এবং আপনাপেক্ষা অপব কাহারও ধনসম্পদ অধিক দেখিলে মূহ্যতুল্য অশাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। দরিদ্র ভিখারিও তদ্রূপ স্বশ্রেণীয় লোকের ভিতর আপনাকে বড় মনে করিয়া অহঙ্কার কবে, আবাব কখন কখন আপনাকে, দরিদ্র অসমর্থ ইত্যাদি মনে কবিয়া শোক-সন্তপ্ত হয়। সুশ্রী, সুস্থ যুবা পুরুষ ক্ষণস্থায়ী রূপগর্বে আপনাকে গোববাধিত মনে কবিয়া অন্ধকে ঘুগাব চক্ষে দেখে এবং সেই শবীরের কিছুমাত্র বিকৃতি হইলেই আপনাকে মহাদুঃখী বিবেচনা কবেন। আবাব অঙ্গবিহীন কুৎসিত লোক ঐরূপে কখন আপনাকে শ্রেষ্ঠ এবং কখন বা শক্তি-হীন, ঘৃণ্য জীব মনে করিয়া দুঃখেব অগাধ সাগরে নিমগ্ন হয়। বিচাব কবিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, মূলে ইহাদের সকলেবই মনে সেই দেহাত্মবুদ্ধিপ্রসূত অহঙ্কার বর্ত্তমান। আত্মা অসীম অনন্ত;—“অগোবণী-য়ান্ মহতো মহীযান্ আত্মাস্য জন্তোৰ্নিহিতো গুহাবান্”, এই আত্মা হৃদয় হইতেও হৃদয়তর, আবাব মহান্ হইতেও মহত্তর এবং আত্মকৃত্ত্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণীর হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। “অজ্ঞো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ঃ পুরাণো ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে।”

তিনি জন্মরহিত অপরিবর্ত্তনশীল চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, শরীরের নাশ হইলেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না। অতএব সার্ব্বদ্রিহন্ত-পরিমিত,

উৎপত্তিবিনাশশীল দেহকে সেই জরামরণবিহীন আত্মার সহিত এক মনে করিয়া দেহান্তিমামী হওয়া অপেক্ষা আর মারাত্মক ভয় কি হইতে পারে ?

এই অজ্ঞান বা অহংকার রূপ আত্মাবরণ মোচনের প্রধানতঃ দুইটি উপায় দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি এই—ক্ষুদ্র আমি ও আমার ভাব যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব, অবিনাশিত্ব, অসীমত্ব সর্বদা মনে মনে স্মরণ রাখা এবং সর্বভূতে সেই আত্মারই বিকাশ দেখিতে সর্বক্ষণ চেষ্টা করিতে থাকা। “যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি আত্মৈবাত্মবুদ্ধ্যজানতঃ। তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একতমমুপশ্যতঃ॥” ঈশোপনিষৎ। “আত্মাই সর্ববস্তু সর্বপ্রাণী হইয়াছেন জানিয়া, যিনি সকলের ভিতরেই একের প্রকাশ দেখেন, তাঁহার আবার শোক মোহ কোথায় ?” যখন সাধকের উপরোক্ত ভাবটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়, তখন আর তাঁহার শোক কিছা মোহ উপস্থিত হয় না। কাবণ, শোক ও মোহের হেতু যে ভেদ-দৃষ্টি, তাহা আর তাঁহার থাকে না। তিনি আপনাকেই তখন সর্বভূতে দর্শন করেন।

অপর উপায়টি হইতেছে—জগতের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং নিজের দুর্বলতা বুঝিয়া সর্বশক্তিমান, জগতের নিয়ন্তা ভগবৎপদে আত্মসমর্পণ করা ; “অমেব যাতাচ পিতা অমেব, অমেব বন্ধুশ্চ সখা অমেব। অমেব বিদ্যা দ্রবিণং অমের, অমেব সর্বং যম দেবদেব ॥” “ঠাকুর ! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু বান্ধব, আমার বিদ্যা বুদ্ধি বিষয় বৈভব সকলই তুমি। হে সর্বময় বিভো, একমাত্র তুমিই আমার সর্বস্ব।” তোমা বই আর আমার কেহ নাই। হে প্রভো, আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই, তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। “নাহং নাহং তুঁহ তুঁহ।” অথবা “সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাত্মেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।” ভাবিও না ; অহংকারপ্রসূত যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে আমার শরণাপন্ন হও—আমিই তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, দেহধারী যাত্রেরই আপনাকে কোন না কোন নির্দিষ্ট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধারণা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারস্থ লোকগুলিকে আপনার আত্মীয় জ্ঞানে বিশেষ বেহ বহু করিয়া থাকেন। অপরকে সেরূপ ভালবাসিতে কুত্ৰাপি দেখা যায় না। সর্বোপরি ভালবাসা আবার আপনার উপরে থাকে। নিজের দেহ আহত হইলে

আপনাকে আহত, ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পীড়িত এবং শরীরের নাশে আপনাকে বিনাশপ্রাপ্ত বিবেচনা করেন। অপরের আঘাত, ব্যাধি বা বিনাশ কিন্তু কখনও সে ভাবে অনুভব করেন না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি যে সেই জ্বামরগবহিত সর্বভূতাত্মা, তাহা কি প্রকারে জানা যাইবে? বহিস্মুখী সাধাবণ মানবের পক্ষে—“অযং লোকঃ নাস্তি পরঃ” বিশ্বাসই যাহাদের আশাব বিহাবাদি সকল চেষ্টাব মূলে বর্তমান, দেহের সুখই যাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাহাদের দৃষ্টি বাহ্য বিষয় ব্যতীত অথ কোন বস্তুর সত্তা দেখিতে অক্ষম,—তাহাদের পক্ষে যে ঐ জ্ঞানলাভ করা অতি সুকঠিন, ইহা নিঃসন্দেহ। “নাহং মন্তব্যো ন চ দেবযক্ষো ন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাঃ। ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো তিষ্কূর্ণ চাহং নিজবোধরূপঃ॥” “আমি মানব নহি, দেবতা বা যক্ষও নহি, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসপ্রতাবলম্বীও নহি, আমি একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ।” মহাপুরুষের এই আত্মতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত যে সাধারণ বিষয়বুদ্ধির অগোচর ও হৃবোধ্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বিগুহচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, অমায়িক, সদস্য-বিচার-বিশিষ্ট পুরুষের নিকট উহা সহজ-লভ্য। যাহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি অজ্ঞানের আবরণ ভেদ করিয়াছে, যাহার বিবেকবুদ্ধি বিচারের দ্বারা সত্য-পথকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহার নিকট ইহা অতি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, এবং তিনিই প্রথমতঃ আপনাতে এবং পরে সর্বভূতে আত্মবিকাশ দেখিতে পাইয়া মোহিত হইয়া বলেন,—“যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি।” এইরূপ আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি বলিতে পারেন, আমার অজ্ঞ ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ক্ষেদয়ুক্ত এবং বায়ু গুহ্য কবিত্তে পারে না। তিনিই বিদেহ জনক রাজের শ্রায় স্বরাজ্য দধ্ব হইতে দেখিয়াও বলিতে পারেন,—“মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন।” মিথিলা নগর সমস্ত পুড়ে ভস্মসাৎ হইলেও আমার কিছুই দহন হয় না।

নিত্যানিত্য বস্তু বিচারের দ্বারাই ক্রমে এপথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। আমি দেহ নহি; কাবণ, দেহ ক্ষুণ্ণপিপাসায় কাতর, জন্ম মৃত্যুর অধীন। আমি মন নহি; কেন না মন অস্থিরস্বভাব। বিষয় সকলও অনিত্য, পরিবর্তন শীল; ইহাতে আমাব মুগ্ধ থাকা উচিত নয়। এইরূপ নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা, নেতি নেতি কবিয়া আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয় সকলকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ কবিত্তে সক্ষম, তিনিই একমাত্র সেই “শিবম্ শান্তম্ অবৈতম্”

আত্মাকে জানিতে পারেন। “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি” তিনিই আপনাকে সকলের আত্মা জানিয়া হিংসাবোধপরিশূন্য শান্তস্বভাব ব্রহ্মরূপে প্রাপ্ত হন। অতএব বাহারা দেহাভিমানী হইয়া সদা ভোগবিলাসে মত্ত এবং আপাতঃ প্রীতিকর রূপরসাদিময় জগৎকে সত্য মনে করিয়া ইহারই উপাসনা করে, তাহারা সর্বতোভাবে এই অমৃত তত্ত্ব জানিবার অযোগ্য।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ বৈপায়ন রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে “আমি, আমার” ভাবটাকে পরম শত্রু জানিয়া মানুষের ত্যাগ করা কর্তব্য, একথা ভূয়োভূয়ঃ বলা হইয়াছে। অভিমত্যানয় মহাতেজা পরীক্ষিৎ একদা নিজ অজ্ঞানাক্রান্তা বশতঃ মহামুনি শমীককে অবজ্ঞা করায়, শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষিতের পূর্ব-স্মৃতি-বলে তাঁহার প্রতি রূপাপরবশ হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ শুকদেব মধুর স্বরে তমোবিনাশী ভাগবত কীর্তন করিয়া তাঁহার সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার ঘুটাইয়াছিলেন। সেই ভগবৎমহিমা শ্রবণে পরীক্ষিৎ নিজ জীবনের নশ্বরত্ব এবং পৃথিবীর যাবতীয় সুখ স্বচ্ছন্দের ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া আত্মবিষয়ক দিব্যজ্ঞান লাভ করতঃ প্রশান্ত মনে পরলোক গমনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র সময়ের অনতিপূর্বে শোকমোহাভিভূত অর্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে এই জ্ঞান লাভ করিয়াই পুনরায় চিন্তাপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং আপনাকে ও অপর সকলকে অবিনাশী আত্মা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াই সত্যের প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামে অদ্বিতীয় প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন! গীতার কথিত আছে, শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ-দর্শনে বীরাগ্রণী অর্জুনের “আমি কর্তা” এই ভাবটা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল এবং আপনাকে বিশ্বপতির হস্তে বহ্ন স্বরূপ নিমিত্ত মাত্র ঠিক ঠিক বোধ হওয়াতে শরীরেজ্বিয়কৃত কোন কৰ্ম্মই আর তাঁহাকে স্মৃতি বা ছুঁখী করিতে পারে নাই এবং মৃত্যুর করালছবিও আর তাঁহাকে ভীত বা ব্যথিত করিতে পারে নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকল সময়ে সর্বস্থানে অদ্বিতীয় চিন্তাইহর্য ও সাম্যভাবের সহিত অপূর্ণ কর্ম্মোদ্যম এবং বীরাগ্রণী অর্জুনের জীবনে ঐরূপ “নহং কর্তা” ভাবের সম্যক উপলব্ধির পরেও কুরুক্ষেত্র সময়াদি চেষ্টা ইহাই বিশেষ ভাবে প্রমাণিত করে যে, ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর এবং আত্মত্যাগ করিয়াই মানুষ জড়ভাব প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু হায়! যথার্থ নির্ভরের ভাব আজ কাল কয়টা লোক বুঝে? আমরা মনে করি, ভগবানে নির্ভর করিলে মানুষ আর কোন কৰ্ম্মই করিবে না বা করিতে পারিবে না! আমরা আগেই দেখিতে যাই যে, যে লোক বলি-

তেছে, আমি ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি, সে পূজাপাঠ ছাড়া কোন কৰ্ম করে কিনা এবং যদি করে দেখিতে পাই, তবে তাহাকে অমনি শুণ্ড বলিয়া ধারণা করিয়া থাকি ! কবে যে আমাদের ভিতর ঐরূপ ভুল ধারণা দূর হইয়া পুনরায় অর্জুনের ভ্রাতৃ, মহামতি ভীষ্মের ভ্রাতৃ যথার্থ ভগবদ্বিভর আসিবে, তাহা কে বলিবে । কিন্তু যতদিন না ঐরূপ ঠিক ঠিক নির্ভর এবং যথার্থ ‘নাহং কর্তা’ জ্ঞানের পুনরুদয় হইবে, ততদিন দেশের দুর্ভাগ্যচক্র কখনই ফিরিবে না ! ঐ জ্ঞান লাভেই মানুষ যথার্থ স্মৃতি হইতে পারে। ঐরূপ নির্ভরই মানুষকে উন্নত করিয়া মাঝে মধ্যে পশু পাখি ছিন্ন করিবার ক্ষমতা আনিয়া দেয়। ঐ “নাহং কর্তা” জ্ঞান এবং ঈশ্বর নির্ভর দুই একই পদার্থ। উহাবই অমর্ত্যানে মহামুখ্যমাজ যথার্থ সভ্যতা এবং সর্বাঙ্গীন পূর্ণতাব উচ্চশিখরে আরোহণে সমর্থ হইবে।

জ্ঞানলাভের কথিত উপায় দুইটি বহির্দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন বলিয়া প্রতী-  
 যমান হয় বটে, কিন্তু মূলে উহাদের মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। কারণ,  
 উভয় পথেই উদ্দেশ্য দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া সেই অব্যয়, অজব, অমর  
 আনন্দ স্বরূপ অনাদি পুরুষকে লাভ করা। দুই পথাবলম্বীই এক স্থান এবং  
 এক অবস্থা প্রাপ্ত হন। কাবণ, উভয় পথাবলম্বীই পরিশেষে জগতের বাব-  
 তীষ পদার্থের মধ্যেই একের বিকাশ দেখিতে পান ! জগতের সহিত ঐরূপে  
 আপনাত্মক একত্ব উপলব্ধি করিলেই মানব আপনাত্মক সহিত ভেদজ্ঞানে উদ্ভূত  
 ইচ্ছাষেষ পরিত্যাগ পূর্বক সমতাবলম্বন করে। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নামই  
 জ্ঞানলাভ বা ভগবদ্বর্শন। যাহা জানিলে আব কিছুই জানিতে বাকি থাকে  
 না, যাহা জানিলে আর প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হইয়া অন্ধের ভ্রাতৃ পুনঃ  
 পুনঃ জন্ম বৃত্তির অধীন হইতে হয় না, যাহা কিরণমালীভ্রাতৃ হৃদয়ে  
 সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার নাশ করে, তাহাই পবিত্র জ্ঞান এবং তাহাই শুদ্ধাত্মা !  
 এই জ্ঞান লাভ করাই মহামুখ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য। আমরা জ্ঞানোপার্জন  
 জন্ত নানাবিধ পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকি। আমরা গ্রন্থাদিপাঠ করিয়া  
 কোন কোন বিষয় কিছু কিছু জানিতে পাবি বটে, কিন্তু সীমাবদ্ধ জ্ঞানে  
 মনোব সন্দেহ কখনই সর্বতোভাবে দূর হয় না। পূর্কোক্ত একত্বজ্ঞানে  
 উহার সম্ভাবনা আছে। ঐ জ্ঞান কেবল মাত্র অধ্যয়নের বিষয় নহে,  
 উপলব্ধির বিষয়। কোনও অপরিচিত দেশে যাইতে হইলে যেমন সে দেশে  
 ধাঁহারা গিয়াছেন, তাহাদের নিকট হইতে গনিয়া বা তাহাদের লিখিত পুস্তক

পাঠ করিয়া সে দেশ সম্বন্ধে পূর্বে জানিতে হয়, তেমনি ঐ একজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বাহারা সে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আগে ঐ পথের অহুসন্ধান লইতে হইবে। অজ্ঞানী পুরুষকে নিজ উন্নতি সাধন করিতে হইলে জ্ঞানীর পদতলে প্রকার সহিত বসিয়া পূর্বে শিক্ষালাভ করিতে হইবে।

আম্মার অমরত্ব ভুলিয়া বাইয়া বাহারা এই দেখকেই সর্বত্র মনে করে এবং আপনাকে কর্তা ভাবিয়া কামকাননয় সংসারে মুক্ত হয়, আত্মদর্শী জ্ঞানিগণ বলেন, তাহারা আপনাকে আপনি হত্যা করে; তাহারা যথার্থ কৃপাপার। মানুষ যদি যথার্থ কর্তাই হইবে, তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেন তাহার বালা যৌবন বার্কক্য, রোগ শোক মৃত্যু ইত্যাদি আসিয়া উপস্থিত হয়? তবে কেন তাহাকে একদিন বাড়ীঘর, পরিবার সন্তান, দাস দাসী প্রভৃতি প্রিয়পদার্থ সমুদয় ছাড়িয়া ক্রীতদাসের শ্রায় মৃত্যুর অধীন হইয়া অন্তঃ গমন করিতে হয়? অজ্ঞানী মানবই কামকাননে মোহিত হইয়া ভোগবাসনার তৃপ্তি সাধন করিতে বাইয়া বারবার জন্মজবারূপ চুঃখপরম্পরা অমৃতব করে; বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিন্তু ধর্ম্মবিধিগের কথিত “নিত্যোনিত্যানাং” সনাতনগীত-ধর্ম্মনি শ্রবণ করিয়া প্রবৃত্ত হন এবং “আমার” ভাব পরিত্যাগ করিয়া বাহার ইচ্ছা এবং শক্তিতে জগতে সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে। তাহারই উপাসনা দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

## নূতন জাপান।

( স্বামী সদানন্দ ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

মোজি ( Moji ) বলয় ছেড়ে আমায়ের জাহাজ “ভিতর সমুদ্রে” প্রবেশ করলে। ভিতর সমুদ্রের কথা আগে বলেছি। ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ জলের উপর শোভা পাচ্ছে, অধিকাংশ পর্বতময়। পাহাড়ের গায়ে ধানের চাষ, নীচে সমুদ্রের ধারে জনপূর্ণ গ্রাম; আর সমুদ্রের বুকে হাজার হাজার জল ও জেলে ডিলি মাচ ধরে বেড়াচ্ছে। এই সকল গ্রামের লোকের প্রধান উপজীবিকা মৎস্য বিক্রয়। জাপানীরা বা কালীর মত মৎস্যাহারী; এই ভিতর

সমুদ্র মাছ ধরিরার প্রধান আড্ডা। সুতরাং ইহার তীরস্থানি মৎস্যজীবীদের বাসস্থান হয়েছে। প্রায় ত্রিশ লক্ষ নৌকা এই ব্যবসায় জীবন ধারণ করে, আর চার লক্ষ নৌকা ইহাতে নিযুক্ত আছে। খাওয়া ছাড়া জাপানীরা জমির সারে মাছ খুব ব্যবহার করে। চীনদেশেও মাছের অনেক রপ্তানি হয়। ভিতর সমুদ্র, নদনদী খালবিল ছাড়া জাপান সাগর, ওখটক সাগর, এমন কি, প্রশান্ত মহাসাগরে বহুদূর ব্যাপিয়া জেলেরা মাছ ধরে বেড়ায়। জেলে নৌকাগুলি প্রায় বিশহাত করে লম্বা, কিন্তু এতে পালের বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না, দাঁড়ের সাহায্যেই নৌকা চালিয়ে থাকে। বৎসরে গড়ে প্রায় সাতকোটি টাকার মাছ বিক্রয় হয়। মাছের মধ্যে হেরিং, সাডিন, বনিটো, কড, স্যামন প্রভৃতি সমুদ্রের লোনা মাছ এবং অয়েটার ও চিংড়ি অধিক ধরা হয়। জাপানে সমুদ্র ও নদীৰ মাছের রীতিমত চাষ হয়। ডিম ছাড়িয়া সেই ডিম ধরে পোনা তৈয়ারী করে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে জেলেদের শিক্ষা দেবার জন্য সম্রাট স্থানে স্থানে ট্রেনিংস্কুল (Training school) স্থাপন করেছেন। আর কিসে মাছের ব্যবসায় উন্নতি হয়, তার জন্য কুড়িটা লেবরেটরিতে (Laboratory) নানা রকমের পরীক্ষা হচ্ছে। প্রতিবৎসর রাজভাণ্ডার হ'তে পাঁচলক্ষটাকা এইরূপ শিক্ষায় ও জেলেদের সাহায্যের জন্য খরচ হয়।

জাহাজ ক্রমে তার গন্তব্য স্থান কোবি (Kobe) বন্দরে পৌঁছিল, আমরাও পোটলা পুঁটলি বেঁধে টোকিও (Tokio) যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলাম। সইরটা দেখবার ইচ্ছা হওয়াতে রেলওয়ে ষ্টেশনে (Railway Station) মালপত্র রেখে দেওয়া গেল। কুলিরা জিনিষ বুকে লয়ে আমাদের একথান করে পিতলের চাক্তি দিলে। আমরা ব্রিট্রিক্স চড়ে নগর দেখতে বাহির হইলাম। কোবি আধুনিক সহর, কিন্তু জাপানের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রীড়াঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে ইহা এখন জাপানের প্রধান বন্দর। কিছু কেন্দ্রার দরকার থাকতে প্রথমে বাজারে (কনুকুবা) যাওয়া গেল। বাজারের চারিদিক ঘেরা। ফটক দিয়ে ঢুকে সরুপথের দুইধারেই দোকান। চাল ভাল মাছ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য ছাড়া কাঁচের বাসন, লোহা পিতল প্রভৃতি ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি, ল্যাকার করা কাটের ও চিনেমাটির বাসন, ভেস (Vase) কাগজকলম, স্মৃতি সিক কেলিকোর কাপড় চোপড়, হাতে তইরি নানাবিধ কাপড়ের ফুল খেলনা প্রভৃতি সকল রকম জিনিষই বিক্রয় হয়। দোকানদার মাঝেই স্ত্রীলোক, পরিচার

পরিষ্কার ও স্বন্দরবেশভূষাসম্পন্ন; কেহ সেলাই করছে কেহবা কিছু বুনছে আর ষড়িদদার এলে জিনিষ দেখিয়ে দাম বলতে। একদরে বিক্রয়, দ্রব্য-দস্তরের আবশ্যক হয় না। বাজাবে কলরব নাই, নিশব্দ। বাজারের রাস্তাটা গোলক ধাঁধার মত ঘুরে ঘুরে আর একটা ফটকে শেষ হয়েছে, এটি বাহির হবার কটক।

বাজার হতে বাহির হয়ে কোবির প্রসিদ্ধ দাইবুন্স (বুদ্ধমূর্তি) দর্শন করিতে যাইলাম। কোবির পাশে একটা পুরাতন সহর (হিওগো) আছে। মধ্যে সক্রনদী। বর্ষাকাল ছাড়া এই নদীতে জল থাকেনা। নদীর তলদেশ পাথর ও বালিময়। বহুকাল পূর্বে—প্রায় পাঁচশত বৎসর গত হল, এই নদীগর্ভে একবার রক্তশ্রোত বহিয়াছিল। আসিকাগা বংশীয়গণ তখন জাপানের শাসনকর্তা (সোগুন)। সম্রাট (মিকাদো) পক্ষীয়দের সহিত ইহাদের কোন কারণে ঘোব যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সোগুনের আক্রমণে সম্রাট-পক্ষীয় সৈন্ত প্রায় নির্মূল হইয়া যায়। মাসাসিগি নামে এক সেনাপতি সম্রাটের সৈন্ত চালনা করিতেছিলেন। বিজয়ের আশা নাই, শত্রুহস্তেও প্রাণ থেল না দেখে মাসাসিগি কাপুরুষের জায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কবিত্তে অসম্মত হইলেন। শত্রুর হাতে বন্দী হবার পূর্বে স্বহস্তে নিজ উদর ছেদ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ আত্মহত্যার নাম হারািকিরি। জাপানের সামুরাইগণ সম্মুখ সমরে শত্রুজয় করে বা যুদ্ধে আহত হয়ে জীবন বিসর্জন করিতে না পারিলে শত্রুহস্তে বন্দী না হয়ে, এরূপ মৃত্যুকে “অপারুতম্বু স্বর্গান্বারম্বু” বিশ্বাস করে। বর্তমান সম্রাট সিংহাসন লাভ করে, ১৮৬৮ সালে মাসাসিগির প্রভুতন্ত্রের অরণচিহ্নস্বরূপ নদীতীরে এক মনোহর উদ্যান-বাটিকা ও স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করেছেন।

এই সামুরাই হলই জাপানের মেরুদণ্ড। সামুরাইয়েব বাহুবলে জাপান স্বাধীন, সামুরাইয়ের বুদ্ধিবলে জাপান শিক্ষিত, জাপান উন্নত। ভারতের জায় জাপানেও চারিবর্ষ, সামুরাই জাপানের ক্রিয়। নূতন যুগের আবির্ভাবের পূর্বে ইহার শাসনকর্তা (সোগুন) ও জমিদারদিগের (দেমো) অধীনে সৈনিক কাষে নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধের সময় প্রভুব পক্ষে যুদ্ধ, অপর সময়ে প্রভুর আজ্ঞাপালন ও বিদ্যাচর্চা করত। প্রভুতন্ত্র, স্বদেশবৎসলতা তার একমাত্র স্বার্থ। এ স্বার্থের কাছে আবশ্যক হলে



সকল বন্ধন, সকল আশা, সকল শ্রেয়, জীপুয়, আত্মীয় স্বজন বলিদান দিতে সামুরাই কুণ্ঠিত নয়। স্বধর্ম তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। সামুরাই দৈহিক নির্যাতন উৎপীড়ন মৃত্যুবরণা কিছুই ভয় করে না, কেবল ইচ্ছার ভয় করে; যান রক্ষা, ইচ্ছাত বাচাতে প্রাণ তার কাছে তুণবৎ তুচ্ছ। জীবন মৃত্যু তার সমান, যদি তাব নামে কোন কলঙ্ক স্পর্শ না হয়। সংসারের দোকানদারি সে স্বপ্নার চক্ষে দেখে। সে পাটোয়ারি-বুদ্ধিবিশীন। প্রভুর ডাঙারের যৎকিঞ্চিৎ তার সংসার শুজরাণ করে মাত্র। কিন্তু বণিকের ঐশ্বর্য্য ও শূদ্রের অর্ধোপায় দেখে কখন নীচকাষে তার প্রবৃত্তি নাই। অর্ধেব সোভ দেখিয়ে সামুরাইকে কেনা যায় না। সামুরাই মানের কানাল। সে টাকা নিয়ে নিজের পরিশ্রম বা বিদ্যা বিক্রয় করে না, চাকরীর হিসাবে সে কখন কাষ করে না, তোমার কাছে সে তার কাষের পরিবর্তে তোমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন কোন রূপ দান গ্রহণ করবে, কিন্তু যাইনে নেবে না। সামুরাই প্রাণপণে ক্ষত্রধর্ম পালন করে। স্বধর্ম তার অহঙ্কারের বস্ত্র, সে জাত্যভিমানগর্ষিত। তার এক কাষ তরবারবাজি, তার এক ধর্ম প্রভুর সন্ত্রম রক্ষা, মাতৃভূমির মানবক্ষা। যদি একাধে সামুরাই নিষ্ফল হয়, সে হারাকিরি কববে, কিন্তু স্বধর্মচ্যুত হবে না। এই হারাকিরি অতিশয় কষ্টকর মৃত্যু; কিন্তু সামুরাই কিরূপ নির্ভয়ে মৃত্যুবরণা তুচ্ছ করে, কি অটল ভাবে হৃদয়েব শেষ শোণিতবিন্দু পাত কবে, তা জগৎকে দেখিয়ে যায়। এই জন্ত সকল সামুরাইয়ের কাছে দুখানা তরবার থাকে, বড় একখান সুদেহে জন্ত, আর ছোট একখান নিজের রক্ষা আর আবশ্যক হলে হারাকিরি করতে। সামুরাইয়ের তীক্ষ্ণঅসি সর্বক্ষণ শাণিত, ইহা তাহার গৃহে গৃহদেবতার স্থায় পূজিত। তরবার তার নিত্য সহচর, কিন্তু বছর বাটী প্রবেশের পূর্বে তার দ্বারদেশে রেখে ঘরে প্রবেশ করে। তরবারে পদস্পর্শ মহা অপরাধ। নুতন জাপানের সমস্ত উচ্চপদে আজ সামুরাই প্রতিষ্ঠিত। পুরাতন জাপানের মান ইহারাই রক্ষা করিবাছে, নূতন জাপানের গৌরবগাথা ইহাদের দ্বারাই ঘোষিত হইতেছে।

পুরুষদের স্থায় সামুরাই জীলোকোবাও এই ক্ষত্রিয়ভেদপূর্ণ। কখন তারা স্বামীপুত্রপরিবৃত হয়ে নীরবে জীমূলভ সহিষ্ণুতার নিভান্ত অধীন ভাবে গৃহকর্মে নিযুক্ত, কখন সন্ত্রান্ত বংশের অন্তঃপুরবর্তিনী হয়ে প্রভু পরিবারের পবিত্র্য্য ও অবসর সময়ে শিল্পকার্য্যের অনুরণীলনে ব্যস্ত জাবার

কখন পিতা ভ্রাতা স্বামী পুত্রের স্বধর্ম পালনে সহায় হইয়া সানন্দে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আগে জমিদারদেব অহঃপুরে সামুরাই স্ত্রীলোকেরা নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকত। কিন্তু সকলকে লাঠি ধেলা, শস্ত্রবিদ্যা শিখতে হত। আবশ্যক হলে স্বামী পুত্রের সঙ্গে প্রভুর অহঃপুর রক্ষা করতে তাদের শিরায়ও বে সামুরাই বস্ত্র বইচে, সেই কোমল কমণীয় কান্তির অন্তরালে যে বজ্রসদৃশ কঠোর বীৰাঙ্গনাতেজ লুকাযিত, দেখাতে তারা পশ্চাৎপদ হত না।

১৮৬৮ সালে জাপানের শাসনদণ্ড নিজের হাতে গ্রহণ কবাতো বর্তমান সম্রাটের সঙ্গে শাসনকর্ত্তা সোণ্ডণের জীবন মরণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সোণ্ডণের পক্ষীবগণ যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে শেষে ওকামাৎসু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কবে। সম্রাটের সৈন্যগণ দুর্গ অববোধ কবলে, পবিখাব পর পবিখা আক্রমণ ও অধিকার কবতে লাগল। সোণ্ডণের সৈন্য কতকাংশ দুর্গমধ্যে কতকাংশ স্থানভাবে দুর্গের বাহিবে। যাবা দুর্গের বাহিবে, তাদের শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। এই সম্বন্ধে সময়ে সময়ে সামুরাই তেজঃ প্রজলিত হয়ে উঠিল। শতশত বালক বালিকা স্ত্রীপুরুষ স্বহস্তে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হ'ল। এক একটা পবিবার চিবদিনেব জন্ত ইহলোক হ'তে অপস্থত হয়ে গেল। যাবা নিতান্ত শিশু, কি কবে হাবাকিবি কবতে হয় জানেনা, হাঁটু মুড়ে মাথা নিচু কবে, স্থিরভাবে উপবিষ্ট হল; পিতা বা ভ্রাতা তাদের বধ কার্য্য সম্পন্ন কবলে। দুর্গমধ্যে ছেলে বড় স্ত্রী পুরুষ দুর্গবক্ষাব জন্ত নিঃশেষে জীবন সমর্পণ কবতে দৃঢ় সংকল্পে দণ্ডায়মান। স্ত্রীলোকেরা বাকদ ও বন্দুকের টোটা তৈয়ারি করতে লাগলো, ছেলে মেয়েরা পুরুষদের এই সব জোগাতে লাগলো। অবশেষে দুর্গ অবক্ষণীয় হলে যাবা অবশিষ্ট, সম্মুখযুদ্ধে পরিত হয়ে প্রভুভক্তি মহাত্মত উদঘোষন করলে।

এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সামুরাইদের প্রকৃতিনিহিত। যখন সামুরাই দেপে প্রভুর আজ্ঞা পালন কবতে অপব কর্ত্তব্যান্তিষ্ঠানে আঘাত লাগে, আর প্রভুভক্তি তাকে স্বদেশের বিবোধী বা কোন গর্হিত কাজে নিযুক্ত করে, সে এসময়ে উচ্চকর্ত্তব্যের অনুবোধে প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে এবং আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হারাকিরি করবে, কিন্তু জীবিত থাকিয়া নিজের নামে বিশ্বাসঘাতকতারূপ কলঙ্ক স্পর্শ করতে দিবে না। সোণ্ডণের পক্ষে যুদ্ধ কবাতো, জাপানের চিরাগত বাজকুলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে, তাহাদের প্রভুভক্তি তাহাদিগকে স্বদেশের

শত্রু করেছে বুঝতে পেরে পরাজিত সামুরাইগণ এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে কৃতসঙ্কল্প হল। সম্রাট সৈন্ত কর্তৃক ওকামাংসু দুর্গ অধিকারের পর দুই-জন সোণ্ডণ পক্ষীয় স্ত্রীলোক স্বজন সহিত নির্যাসিত হয়েছিল। এই আত্ম-বিচ্ছেদের দশবৎসর পরে জাপানের দক্ষিণ প্রদেশে আবাব রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ দমন করতে যথেষ্ট অর্থ ও শোণিত ব্যয় হয়েছিল। যুদ্ধের প্রাবল্যে ঐ স্ত্রীলোক দুইটি নিজেদের কৃত অপরাধ মোচন করতে বাজসমীপে আবেদন করে যে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহত সৈন্তদিককে সেবা করতে প্রস্তুত। রাজা সম্মত হলেন। জাপানের ইতিহাসে এই দুই বীরঙ্গনা যুদ্ধে আহত ও পীড়িত সৈন্তের শুশ্রূষা কবে প্রথম বেডকস সোসাইটির (Red Cross Society) ভিত্তি স্থাপন করেন।

সামুরাই রমণীদের এই ক্ষত্রতেজ আঞ্জিও জাপানে জীবন্তশক্তি। গত চীন জাপান যুদ্ধে ইহাদের স্বদেশান্ত্রবাগ ও আত্মোৎসর্গ সমস্ত সভ্য জগতের আদর্শ। যখন চীন সমবানল প্রজ্জলিত, জাপান স্বদেশবৎসল সন্তানদের স্বধর্ম পালনে আহ্বান করলে, সামুরাই ললনাকুলও সেই ভেবী নিনাদে আপনাদের কর্তব্য সাধনে অগ্রসর হল। যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সংসারের এক মাত্র অন্নদাতা স্বামী বা পুত্রকে প্রসন্নবদনে মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করেছে; স্ত্রী, মাতা, ভগিনী, প্রাণাধিকের মরণ সংবাদ অবিচলিত হয়ে শ্রবণ করেছে; অশ্রুজল প্রবাহিত হতে দেয় নাই, কারণ, ইহা রাজভক্তি, স্বদেশস্নেহের বিরোধী। পতি-পুত্র ও ভ্রাতা স্বদেশের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করেছে, ইহাতে তাহারা ধন্ত, তাহাদের বংশ ধন্ত, সামুরাই রমণীর ইহাই উচ্চাভিলাষ। এক বুদ্ধাব্য একটি মাত্র পুত্র সন্তান। সে অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। দরিদ্রতা বশতঃ অতিশয় দুঃখে কষ্টে ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মাতুষ করেছে; 'অন্নদিন হ'ল ছেলেটি উপার্জনক্ষম হয়ে সংসারে সাহায্য করছিল। বৃদ্ধা মৃতন সংসার পেতে পুত্র পুত্রবধু পরিবেষ্টিত হয়ে শেষদিন কটা সুখে কাটাবে মনে ধরে। হঠাৎ চীন যুদ্ধ উপস্থিত, পুত্রকে যুদ্ধে যেতে হবে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধা মাতা শোকাড়বা হয় নাই। আনন্দে ও উৎসাহে পুত্রের যুদ্ধযাত্রার বন্ধোবস্ত স্বহস্তে করে দিলে। গোপনেও একটি কাতর স্বাস পবিত্যাগ কবে নাই। স্বদেশের মান রক্ষা করতে পুত্র যুদ্ধে যাচ্ছে, ইহা বুদ্ধাব্য পক্ষে মহা গৌরবের কথা। হস্ত বদনে আশীর্বাদ কবে পুত্রকে বিদায় দিলে। আর একটি বৃদ্ধা একমাত্র সন্তানকে যুদ্ধে প্রেরণ কবে প্রতিদিন ব্যক্তিশেষ না

হতে উঠিত। অতিশয় শীতসম্বন্ধেও স্নানাদি কার্য সম্পন্ন করে বাটা হতে দুই কোশ দূরে কোন মন্দিরে পদব্রজে গমন করে দিনমান যাবৎ পুত্রের কল্যাণার্থ ইষ্টদেবতার পূজায় নিযুক্ত থেকে সন্ধ্যার পর প্রত্যাগত হত। তাঁহার ইষ্ট মনোভিলাষ পূর্ণ করেছিলেন। বুদ্ধার সন্তান বিজয়ী হয়ে মাতাব আনন্দ বর্দ্ধন করেছিল। এই চীন সংগ্রামে আকাগি নামে জঙ্গি জাহাজের সৈন্য-ধ্যক্ষ সাকামতো জলযুদ্ধে হত হন। তাঁর পরিবারের মধ্যে বুদ্ধামাতা, স্ত্রী ও তিনটি সন্তান। এই শোকসংবাদ দূত দ্বারা সাকামতোব স্ত্রীর নিকট প্রেবিত হয়। কিন্তু অবিলম্বে এই নিদারুণ সংবাদ বুদ্ধাব কর্ণগোচর হল। বুদ্ধা চলৎশক্তিহীন; কম্পিতপদে সংবাদদাতার সম্মুখীন হয়ে শুষ্কচক্ষে ও অকম্পিত স্বরে বললেন, আপনাব সংবাদে বুঝেছি, এবার আমার প্রিয় পুত্রের দ্বারা দেশের কিঞ্চিৎ কাজ হয়েছে। বিশ বৎসর বয়স্কা কোন রমণী, অল্পদিন মাত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়েছিল; সংবাদ এলো, স্বামী সমরক্ষেত্রে পতিত হয়েছে। ভর্তার সম্ভাব্যাহারিণী হবার জন্ত হাবাকরি করে ইহলোকের নিকট বিদায় গ্রহণ করল। ঈদৃশ ঘটনা অনেক ঘটেছিল। যে দেশে স্ত্রী চরিত্রের একরূপ নৃষ্টান্ত, যে দেশে পাবিবারিক শিক্ষা একরূপ, সে দেশ যে বীরপ্রসবিনী, সে বীর সন্তানেরা যে মুতাজিৎ, স্বদেশের জন্ত তাহারা যে সর্বস্ব উৎসর্গ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি!

মাসাসিগিব স্মৃতিমন্দিরের নিকটে বুদ্ধদেবের পিতৃলম্বী প্রতিমা (দাই-বুংনু) প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ধাতুমূর্তি ৩২ হাত উচ্চ, ইহার কোমরের বেড় ৫৬ হাত, বদনমণ্ডল ৬ হাত, কর্ণ ৩ হাত, নাসিকা প্রায় একহাত, মুখ একহাত, জাহুর বেড় ১৬ হাত, বুদ্ধাঙ্গুলিব বেড় দেড় হাত। প্রতিমার উদরগহ্বরের ভিতর অমিতাভ বুদ্ধের ধ্যানমূর্তি স্থাপিত। প্রতিমা দর্শন করে শরীর রোষাক্ত হন। ধন্য সেই ভক্তনীর, যে এই বিরাট মূর্তি কল্পনা করেছে; ধন্য সেই শিল্পকার, যে এই অদ্বুত প্রতিমা নির্মাণ করেছে। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অবতার প্রাচীন ভাবভেব যুগধর্মশক্তি শাক্যবুদ্ধ, ত্রয়োদশ শতাব্দী যাবৎ জাপানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রাচীন ভারত জাপানের পারলৌকিক দীক্ষাগুরু! বর্তমান ভারত কি নূতন জাপানের নিকট ইহলৌকিক শিক্ষা-লাভ কর্ত্তে প্রস্তুত? কর্মযোগ অভাবে ভারতের জ্ঞানযোগ লুপ্তপ্রায়। ইউরোপের কর্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়ে নিজীব জাপান আজ মহাবলসম্পন্ন। ধর্মনিষ্ঠ ভারতে কবে আবার কর্মনিষ্ঠার উদয় হবে? উঠবে ভারতের

সর্বত্র মহা উদ্বোধনধ্বনি, শুধু ক' তমোগুণসম্বলিত বর্তমান ভারত সেই ভগবৎ-মহাবাক্য, যাহা রণভূমি কুকক্ষেত্রে যোদ্ধা বীরশ্রেষ্ঠকে প্রবুদ্ধ করেছিল ।

মা রৈব্যাং পচ্ছ কোন্ত্যে নৈতং ত্রয়্যুপপদ্যতে ।

কুদ্ভং হৃদয়দৌর্ভলং ত্যক্তে তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

## সংবাদ ও মন্তব্য ।

বিগত ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে আহিবিটোলার বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণোৎসব করেন । তত্ত্বপলক্ষে অনেক ভক্তের সম্মিলন হয় । উপেন্দ্র বাবু প্রদ্বায় ও যত্নে সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন । সারাদিন ভগব-দ্বাম গুণগান হয় । বিশেষতঃ, হরিনাথ মজুমদার বা ফিকির চাঁদ ফকিরের সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন । একজন ভক্ত ফনোগ্রাফ দেগাইয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন । ভক্ত-গণ সকলেই আনন্দের সহিত প্রসাদ ধারণ করিয়াছিলেন । বাগবাজার, কাঁকুডগাছি বোগোদ্যান ও আহিণীটোলায় অপব এক স্থানেও উৎসব হইয়া গিয়াছে ।

উৎসবের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । উৎসব দ্বারা কতকগুলি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । যে সকল ভক্তের নানাকারণে কখনও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এই সকল উৎসব উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের পবন্যর সাক্ষাৎকাব হইয়া থাকে এবং তাঁহারা ভগবানের ভজনানন্দসম্প্রোগ ও প্রসাদ ভক্ষণাদিধাবা প্রাপ্ত থুনিয়া নির্মল আনন্দ সম্প্রোগ করিয়া থাকেন । সাধারণেও ভক্তসমাগম দর্শন করিয়া ভক্তসঙ্গে সাত্বিক আনন্দ সম্প্রোগ করিয়া থাকেন । ইহার দোষ এই,—ইহার একটু একঘেষেয় আছে । খেই খেই নৃত্য, উল্লসন প্রভৃতিই যেন মহোৎসবের নিত্য আবশ্যকীয় অঙ্গের মধ্যে দাঁড়াই । জ্ঞানাগোচনা, ভগবৎপ্রসঙ্গ, সঙ্গগ্রন্থপাঠ প্রভৃতি যতই ইহার স্থান অধিকার করে, ততই মজল । যাহাতে এই সকল উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষরজনীন ভাব কিঞ্চিৎ পবিমাণেও প্রতিফলিত হয়, উৎসবের উদযোজনা-গণের দৃষ্টি সেই দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত । স্মরণের বিষয়, আজকাল ক্রমশঃ এই দিকে অনেকেই দৃষ্টি পড়িতেছে ।

আর এক কথা,—যাহাদের বেশেই শোকে এই সকল উৎসবাদিতে

অকাতরে যে পরিমাণে ব্যয় করিয়া থাকেন, দেশের কোন বাস্তবিক স্থায়ী ওভকর কার্যে কি একরূপ মুক্তহস্ত হইতে পারেন? ভাবোচ্ছ্বাস ক্ষণকালের জন্ত। কিন্তু অদম্য দৃঢ় অব্যবসায়ে কোন ওভকার্যের জন্ত প্রাণপণ যত্ন আর এক জিনিষ। যাহাতে আমাদের দৃষ্ট সেই দিকে বিশেষ প্রাবৃত্ত হয়, ভবিষ্যে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

২৩শে অগষ্ট, ১৯০২ সালে কলিকাতা বিবেকানন্দসমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্যোগে স্বামী সারদানন্দ গীতাসম্বন্ধে এবং মেট্রোপলিটানের অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ পালিত এম, এ মহাশয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার কতক কতক উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতির যত্নে গত বৎসর 'বিবেকানন্দস্মৃতিমন্দির' নামক একটি আদর্শ ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছিল ও এক বৎসর বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। এই সমিতির যত্নে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নামক উদ্বোধনে প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং স্বামীজির রচিত কবিতা ও গীতসমূহ সংগৃহীত হইয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও বীরবাণী নামক দুই খানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রেগের সময় বস্ত্র পরিষ্কার করা সম্বন্ধেও সমিতি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বিগত ৪ঠা আষাঢ় শনিবার সমিতি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে উঠিয়া যাওয়ার সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজির ফটো পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। একটি ভক্ত আধ্যাত্মিক সঙ্গীত করেন ও শেষে প্রসাদ বিতরণ হয়। এই দিন স্বামীজিব অনেক অনুরাগী ভক্ত নূতন সভ্যপ্রণীতভুক্ত হওয়ার সমিতির সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, সমিতিতে আরো অধিক কার্য্যকরী করিতে হইলে ইহার নূতন গঠন আবশ্যক। তদনুসারে সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির সভাপতি বাবু অনাথনাথ পালিতকে এই নূতন নিয়মাবলি গঠনের ভার দেওয়া হয়। স্থির হয়, এই নিয়মাবলি প্রণীত হইলে একদিন সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সকল সভ্যগণের মতামত লইয়া সমিতির ভবিষ্যৎ গঠন নির্দিষ্ট হইবে। আশা করি, সমিতি নূতন গঠনের দ্বারা পূর্ণাঙ্গা এবার অধিক কার্য্যকরী হইবে। সমিতির নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে। যাহার নামে সমিতির নামকরণ করা হইয়াছে, সেই মহাপুরুষের একখানি সর্গাস্থানর জীবনী

স্থিতি হওয়া অতি আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন । এই জীবনী-  
বিশ্বাসযোগ্য ও বহুতথ্যসম্বিত হইতে গেলে অনেক উপাদান সংগ্রহের  
আবশ্যক । আমরা এ বিষয়ে বধ্যসাধ্য চেষ্টা করিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ  
করিতেছি । সমিতি এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিলে আমরা বিশেষ  
শ্রমী হইব ।

## সমালোচনা ।

ধম্মপদ অর্থাৎ ধম্মপদ নামক পালিগ্রন্থেব মূল, অম্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা  
ও বঙ্গানুবাদ । ত্রিচাক্ষুস্ত্র বস্তু কর্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত ।  
মূল্য দেড় টাকা ।

স্বামী বিবেকানন্দ মাহাত্ম্যনিবাসিগণের অভিনন্দন পত্রের যে উত্তর  
প্রদান করেন, তদ্বাচ্যে একস্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,—

'The restless Western atheist or agnostic finds in the Gita  
or in the Dhammapadam the only place where his soul can  
anchor.' অর্থাৎ অশান্ত পাশ্চাত্য নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী কেবল গীতা বা  
ধম্মপদেই স্বীয় আশ্রয় পাইয়া থাকেন । গীতার মত যেকোন বিশ্বজনীন ও উদার,  
ধম্মপদেরও তদুপ । বুদ্ধদেবের নির্বাণের অনতিকাল পরেই প্রাচীন রাজ-  
গৃহের নিকটবর্তী গ্রামে যে বৌদ্ধ মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তাহাতে  
বুদ্ধদেবের উপদেশসমূহ প্রথম সংগৃহীত হয় । এই সংগৃহীত উপদেশসমূহের নাম  
ত্রিপিটক । ইহাই বৌদ্ধশাস্ত্র । ত্রিপিটক—সূত্র, বিনয় ও অভিধম্ম এই তিন  
শ্রেণীতে বিভক্ত । ধম্মপদ গ্রন্থ সূত্রপিটকের অন্তর্গত । ধম্মপদের অন্তর্গত  
সমুদয় কথাই বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ উপদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ । খ্রীষ্টীয় পঞ্চম  
শতাব্দীর প্রারম্ভে বুদ্ধবোধ পালিভাষায় ধম্মপদের টাকা রচনা করেন ।  
ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে এই গ্রন্থ পাশ্চাত্য বুদ্ধমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ  
করে । তদবধি উহা বহুবিধ পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রচারিত  
হইয়াছে । নিতান্ত দুঃখের বিষয়, যে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি,  
সেই ভারতের প্রচলিত কোন ভাষাতেই এ পর্য্যন্ত ধম্মপদের অম্বুবাদ  
প্রকাশিত হয় নাই । স্বামী বিবেকানন্দ ও কয়েকটি বজ্র উৎসাহে চাক্র  
বাবু প্রথম ১৩০৫ সালে ধম্মপদ মূল, টাকা ও অম্বুবাদ সহ উদ্বোধনে  
প্রকাশ করিতে আবশ্য করেন । কিন্তু নানা কারণে উদ্বোধনে উহার

কয়েকটা নূতন ব্যতীত প্রকাশিত হইতে পারে নাই। এত দিন ধরিত্রী সাহিত্য সংহিতা পত্রে মধ্যে মধ্যে উহা প্রকাশিত হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে উহা সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীর পক্ষে বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ হইয়াছে ও বাঙ্গালীর সাহিত্যভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন সংস্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের উপদেশ নীতিপ্রধান। নীতির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে ধর্ম সকলের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। অনিত্য পদার্থে আসক্তি ত্যাগ ও নিত্য বস্তুতে চিত্ত স্থাপন—ইহা সকল ধর্মেরই মূল কথা। স্মৃতরাং এ গ্রন্থ বৌদ্ধগণ যেক্রমে ভক্তিভাবে পাঠ করিয়া থাকেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি অপরাপর ধর্মাবলম্বীগণও তদনুরূপ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে পারেন।

এই পুস্তক পালি ভাষায় রচিত। পালি ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা প্রায় সমুদীন। সংস্কৃত বীহারী জানেন, তাঁহাদের পক্ষে পালিভাষা আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বীহারী পালিভাষা শিক্ষা করিতে চান, তাঁহারা এই পুস্তক ধ্যানি হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন। পালিভাষার আবরণে যে সকল অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে, সেই সকল আমাদের দেশীয় সমস্ত ভাষায় প্রকাশিত হইলে দেশের এক নুতন যুগ আরম্ভ হয়।

পুস্তকটি ছাত্রিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। শেষ অধ্যায়ের নাম ব্রাহ্মণ বগ্গো। বুদ্ধদেব বলিতেছেন, এই এই লক্ষণ সম্পন্ন হইলে আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি শোক উদ্ধৃত করিলাম।

বসস পুরে চ পচ্ছা চ যজ্জ্বে চ নথি কিক্কনং।

অকিক্কনং অনাদানং তমহং ক্রমি ব্রাহ্মণং ॥

অর্থঃ—বসস পুরে পচ্ছা চ যজ্জ্বে চ কিক্কনং নথি, অকিক্কনং অনাদানং তং অহং ব্রাহ্মণং ক্রমি।

সংস্কৃত।—বস্তু (লোকস্তু) পুরঃ (পূর্বে) পশ্চাত্ত মধ্যে চ কিক্কনং (কিক্কিং) নাস্তি (ন বিদ্যতে) অকিক্কনং (রাগাদিশৃং) অনাদানং (আসক্তি-রহিতং) তং (লোকং) অহং ব্রাহ্মণং এবমি।

অনুবাদ।—বীহার পুরের পশ্চাতে বা মধ্যে কিছুই নাই, বীহার কোন বস্তুর আশা নাই এবং যিনি অনাসক্ত হইয়াছেন, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

পুস্তকখানির অনুবাদ অতি সরল, কাগজ ও ছাপাও অতি সুন্দর। আমরা বাঙ্গালী ভাষাকেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।



## গঙ্গাজল ।

কি দিব, কি দিব, দেব ? কি দিব তোমায ?

দেখ বস্তু কি আছে আমার ?

জবাকুসুমের রাশি, চাহি ও চরণে দিতে

চিত্ত কিন্তু দেয় গো শিকার !

তাহারি জিনিস্ লয়ে, তাঁরি গদ্যসেবা ।

হে পুজারি, তুলিলে কি তিনি সেই জ্ঞা ?

কর্মযোগী হয়ে কর্ম করিবারে চাই,

কল করি ও গদ্যে অর্পণ—

কে কর্মী ? কাহাণে দান ? ভেঙে যার অভিমান,

ভাবি, এ যে বৃথা আয়োজন ।

তুমি কর্মী, তুমি ক্ষল, তুমি ক্ষন্দাত্ম ।

ক্ষম ভ্রম, ক্ষম ভ্রম, হে বিশ্ববিধাতা !

জানযোগী হয়ে ভাবি—আমিই ঈশ্বর ।

আমি আছি এ বিশ্ব ব্যাপিয়া ।

অমনি সে অহঙ্কার, কব দেব চুব মার,

দুচরণ কটকে বিঁধিয়া !

তখন কঁদিয়া বলি—দোহাই ! দোহাই !

দুকুব হইবে কিসে জগত-গোমাই ?

অভিযোগে ভক্ত সাজি, কষ্টী দিয়া গলে,

বীজমালা ঘুরায়ে ঘুরায়ে,

রাধাবৃক্ষ মূর্তি-অগ্রে, বসি আমি মহাহর্ষে,

ঐপুজার নৈবেদ্য সাজায়ে ।

তোমার মোহিনী মায়া, নারী-রূপ ধরি,

ভক্তি মক্তি কাড়ি লব—ঐহরি ! ঐহরি !

আমার আমিহ সোখা ? তুমি দেব সব ।

আমি শূন্য ! আমি কিছু নই ।

তুমি যবে দয়া কর, তবেই পুজিতে পারি ।

নতুবা আমার সাধ্য কই ?

মাতর্গঙ্গে ! গঙ্গাজল দে গো, দে গো মোরে,

সেই গঙ্গাজলে ইচ্ছা পূজিবারে তোরে ।

ঐদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

## গীতাতত্ত্ব ।

( ৩১ শে জানুয়ারী, ১৯০৩এ কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি-  
তিতে স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা-সারাংশ । )

কর্মযোগ বলে, মানুষকে কর্ম করিতেই হবে। কর্ম ছেড়ে সে কখনই থাকতে পারবে না। যতদিন শরীর থাকবে, মৃত্যু না হবে, ততদিন কোন না কোন, কিছু না কিছু কায করিতেই হবে। মানুষের পক্ষে কায ছাড়া অসম্ভব।

আবার অত্মদিকে শাস্ত্র বলছেন, “সমস্ত কায যতদিন না ত্যাগ করিতে পারবে, ততদিন মানুষের জ্ঞানলাভ ও মুক্তি অনেক দূরে।”

সাধারণ ভাবে দেখলে দুটি কথা বড়ই বিপরীত। সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন। তাই, গীতায় ভগবান্ ত্রীকক্ষ কর্মযোগ উপদেশ করে ঐ দুই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা করে দিচ্ছেন; বলছেন—সম্পূর্ণ কর্মরহিত অবস্থায় না পৌঁছিলে জ্ঞানও হবে না, শান্তিও পাবে না, সেটা ঠিক; কিন্তু সে অবস্থাটা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেই যে হ'ল, তা নয়। তাতে বরং তোমায় কপটাচাবী করে তুলবে। সে অবস্থাটা লাভ হলে শরীরেন্দ্রিয়ের দ্বারা কায করলেও তোমার ভিতরে “আমি কর্মরহিত—শরীরেন্দ্রিয় বেকে সম্পূর্ণ পূবক্”—এই ভাবটা সর্বদা বর্তমান থাকবে! এমন কৌশলে কায করা যায়, যাতে কায কর্তে কর্তে ধীরে ধীরে মানুষ ঐ অবস্থায় পৌঁছায়। অতএব কর্মযোগের মূলমন্ত্রই হচ্ছে—কর্মের ভিতরে থেকেই আপনাকে কর্মরহিত করে রাখতে শেখা।

শরীর মনের দ্বারা নিয়ত কায চলবে অথচ নিজে কর্মরহিত হয়ে থাকতে হবে—এইটাই হচ্ছে ঠিক অকর্ম বা কর্মরহিতাবস্থা। হাত পা গুটিয়ে বসে আছি অথচ মনে মনে নানারকমে “অন্ধাভাপ” কচ্চি—সেটা কর্মরহিত হয়ে থাকে নয়। ঠিক ঠিক কর্মরহিত হয়ে যিনি থাকতে পারেন, ভগবান্ ত্রীকক্ষ বলেন, “তিনিই মানুষের ভিতর বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁর দ্বারাই সব কায ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয়।” যথা—

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশ্যেৎ অকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিয়ান্ মনুষ্যেষু সযুক্তঃ কৃৎসনকৰ্মকৃৎ ॥

কৰ্মের ভিতবে থেকে যিনি আপনাকে কৰ্মবহিত দেখতে পান—আব অলস হয়ে কতক কৰ্ম ছেড়ে থাকলে কৰ্মবহিত হওয়া অনেক দূর, একথাও যিনি বোঝেন, মানুষের ভিতর তিনিই বুদ্ধিয়ান্, তিনিই যোগী, তিনিই সকল কাৰ্য যথাযথ করতে পারেন ।

অতএব শবীর মন প্রভৃতি কৰ্ম নিযুক্ত বাধ্য হবেন ; আশাব সেইসঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ কৰ্মবহিত জেনে ভিতবে যোগীর অবিৰাম শান্তি নিবৃত্ত প্রবাহিত বাধ্য হবেন । এইরূপে কৰ্ম ও জ্ঞানের সামঞ্জস্য আমাদের প্রত্যেকের ভিতবে স্থাপিত হবে । মুক্ত পুরুষের এই ভাবটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গ্রায সহজ হলেও সাধককে অনেক যত্নে অনেক উদ্যমে সুখহুঃখজড়িত অনেক কৰ্মের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এই অবস্থা লাভ করতে হয় ।

কৰ্ম ও জ্ঞান উভয়ের সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য স্থাপনই গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ের বিশেষ লক্ষ্য । পূর্বে বলেছি, গীতাকাবের সময়ে জ্ঞান ও কৰ্মের সম্বন্ধ সাধাবণে ঠিক বুঝতে না পেয়ে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য গুলিয়ে ফেলেছিল । কৰ্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিকল্প—একটা করতে গেলে অগ্ৰাটা কখনই করতে পারা যাবে না—এইরূপ লোকে বুঝতো । এখনও যে আমাদের দেশে অনেক বিষয়ে ঐ প্রকার ভুল ধারণা নাই, এ কথা কে বলবে ? মনে কব, ধৰ্ম কলতে গেলে বনে যেতে হবে, জগতের কোন জীবের জগত কোন কাৰ্য করলে আব ধৰ্ম হবে না—আমাদের ভিতর পুরাণ লোকদের এই যে ‘অন্ধ’ বিশ্বাস ; অথবা—সংসারে জী পুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকাটাই জীবনের উদ্দেশ্য—সংসার ছেড়ে, কৰ্ম ছেড়ে জ্ঞানী হওয়া, সে আশাব কি বকম জ্ঞান বে বাপ্, সে একটা কোন বকম অস্বাভাবিক উপায়ে, মাথা বিগড়ে, জড়বৎ হয়ে যাওয়া—আমাদের সুশিক্ষিত (!) নবীন ছোকরাদের ইংবাজ গুরুর পদতলে বসে এই যে অদ্ভুত ‘চক্ষুমান্’ বিশ্বাস হয়েছে, সে গুলিকে ‘পবের মুখে কাঁদ না দেখে,’ নিজে নিজে শাস্ত্র পাড়ে দেখলে কি মনে হয় ? শাস্ত্রের এই কথাটা একদল একেবারে ভুলে গেছেন যে, কৰ্মের দ্বাৰা প্রথমে মন বুদ্ধি পবিস্কাৰ না হলে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব । ভগবদল একবারে ‘না পড়েই পণ্ডিত’—পরমহংসদের যেমন বলতেন, ‘ও কথা শববেব কাগজেতো লেখনি’ বা ‘ইংবাজেয়া মানে না’—তবে শাস্ত্রকথিত জ্ঞানটাকে মানুষের উন্নতির চবম সীমা বলে তারা কেমন কবে মানেন ।

শাস্ত্র বলেন, মানুষ প্রথমে বেদাভ্যাস করবে। তবে তার ধর্মে নিষ্ঠা হবে। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। অতএব ধর্মলাভ করবে বলে সে নানা কাষ করবে। নানা কাষ করতে করতে তার নানা প্রকায়ে সুখ দুঃখ অনুভব হয়ে ধীরে ধীরে ‘জগৎ অনিত্য’ এই জ্ঞান হবে। তখন সে আর নিজে সুখী হয়, বড় হয় বলে প্রত্যেক কাষ না করে, নিষ্কাম হয়ে, কর্তব্য বলে কাষ করতে চেষ্টা করবে। উহাতে ক্রমশঃ মন বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে সে নিজের লাভ লোকসান খতানটা একেবারে ছেড়ে দেবে। ইহারই নাম যথার্থ ত্যাগ। বিবেকবুদ্ধিপ্রেরিত এই ত্যাগ একবার জীবনে এলে সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বস্তুরাতির বিশেষ আগ্রহ প্রাণে উদয় হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞানও তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। তখন সকল বিষয়ে সর্ব প্রকায়ে একত্বের অনুভব হয়। ভিতরে বাহিরে সে দেখে কেবল এক—এক—এক। একবার এই একজ্ঞান হলে আর তার লোপ হয় না। মবীচিকাকে একবার বালির উপর আলোর খেলা বলে জানলে আর জল বলে বোধ হয় না।

তবে এই একজ্ঞান জীবনে অনুভব করেও কতকটা দ্বৈতবুদ্ধি, লোক-শিক্ষার জগৎ বা উচ্চ উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য ফের এনে কাষ করা যেতে পারে। পবনহংসদেব বলতেন, “যেমন সুরজ গায়ক—অনুলোম ধরে উপর গ্রামে উঠলো, আবার বিলোম ধরে নীচের গ্রামে নামলো। যখন যে সুর ইচ্ছে গলা দিয়ে বাব করলে।” একজ্ঞানীর কাষ করা না করা ঠিক ঐ রকম মুটার ভিতর থাকে! তবে হাজার চেষ্টা করেও তিনি আর কখন সাধাবণ লোকের মত, কাম কাকন যশ মানাদিকে “চিজ, বস্ত্র, মাগ” বা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে দেখতে পারেন না! যেমন মবীচিকাটা একবার জল নয় বলে বোধ হলেও আবার তুমি যেখানে ঐ রকম ভুলবুদ্ধি হয়, সেখানে যেতে ও সেই ভুলটা বার বার দেখতে দেখাতে পার, কিন্তু আব কখন ঐ জলপান করে তৃষ্ণা মেটাতে যাবে না—সেইরূপ।

কর্ম যে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়, এ কথাটা মনে না রাখতে পারলে বিষম গোল লাগবে। “জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ” পর্যন্ত সকল কর্মই এই জ্ঞানলাভ রূপ উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়, যদি নিজের লাভ লোকসানটা খতিয়ে নে উহা না করে। ভারতে গৃহী ও সন্ন্যাসী লক্ষ লক্ষ লোক জ্ঞানলাভের চেষ্টা করেন—সেটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু তাদের ভিতর পনের আনা লোকই নিজের লাভ লোকসান খতানটা

আগে না ছেড়ে আগেই কর্মটাকে মায়া বলে যতটা পারেন, ছাড়বার চেষ্টাষ থাকেন। তাতে হয় এই যে, খাওয়া, পরা ইত্যাদি স্বার্থের জন্ত অল্পাধিক কর্মগুলি ঠিক বজায় থাকে, কেবল দান, দীনসেবা, দেশানুরাগ প্রভৃতি পরহিতের জন্ত অল্পাধিক কাষ গুলিই আগে ত্যাগ হয়ে যায়,— কেননা সেগুলি করায় ঢেব ‘বখেড়া’, ‘হান্সাম’! কে “যরের খেয়ে বনের শোষ তাড়ায়?” ফলে যা দেখছি, স্বার্থপরতায় দেশ পূর্ণ হয়ে সকলেই অধঃপাতে যেতে বসেচি। বিবেকানন্দ স্বামীজী যেমন বলতেন, “দেশের লোক গুলোব যোগ ত হলোই না, ভোগও হলো না, কেবল পরের জুতো লাগি খেয়ে কাষক্লেণে কোনরূপে ছুটো উদ্বাসনের সংস্থান— তা কাকর হলো, কাকর হলো না।” ঐ সকল লোক যদি, গীতাকার যেমন বলেচেন এবং প্রতি ঘটনাধ নিজেব জীবনে দেখিয়েচেন, পরহিতের জন্ত, দেশের কল্যাণের জন্ত, গরিব দুঃখীব সেবা ও শিক্ষার জন্ত, যার যতটুকু সাধ্য নিকাম হয়ে কাষ কবে যান, তাহলে জপ ধ্যানের জায় ঐ সকল কাষই তাঁদের প্রত্যেককে জ্ঞানলাভেব দিকে এগিয়ে দেয়, দেশেরও এমন ছুববস্থা থাকে না। দেখা যায়, একজনেব স্বার্থত্যাগে যখন কত লোকের কল্যাণ হয়, তখন যে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক স্বার্থবলি দিতে কোমর বেঁধেচে, সে দেশেব কখন ছুববস্থা থাকে? অপর দিকে ইংবাজী শিক্ষিতদের ভিতর, ইংরেজ গুরুব দৃষ্টান্তে সকাম কন্মে একটু আস্থা হলেও, নিকাম হয়ে কাষ কবা তাঁবা একেবাবে বোঝেন না; এবং সেই সঙ্গে কন্মেব উদ্দেশ্যই বা কি, তাও তাঁদেব প্রাণে ঢোকে না। অতএব শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানলাভেব দিকে তাঁদেব আদৌ ঝোঁক নাই— উহা লাভ কব্তে উদ্যম করা যে দবকান, এটাও তাঁবা বোঝেন না। বোঝেন না যে, এই জ্ঞান আমাদেব স্বয়িকুল হতে প্রাপ্ত বহুমূল্য জাতীয় সম্পত্তি। যুগ যুগান্তরের পরাধীনতার পেষণে ভাবতেব বিদ্যা, ধন, মান এব গিয়াছে—আছে বাকি যেতে কেবল ঐ জ্ঞান, একজ্ঞান, অম্বৈতজ্ঞান, যা লাভ হলে মানুষ সকল অভাবেব হাত থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত্যঞ্জয় হয়। প্রত্যেক হিন্দুব এই জাতীয় সম্পত্তি অতি সাবধানে বক্ষা কবতে হবে। ঐ জ্ঞানেব যে দিন লোপ হলে, সে দিন হিন্দুব হিন্দু বাবে, ভাবতের নিজেব অস্তিত্ব লোপ হবে এবং কুলধর্ম, জাতিধর্ম সব খুইয়ে জাতটা উৎসন্ন হয়ে যাবে।

গীতাত্ত্ব এই জ্ঞান উপলব্ধির জিনিষ। আমাদের উঠা, বসা, নাওয়া, খাওয়া, শোয়া প্রকৃতি সকল অবস্থার ভিতর, সকল রকম কাষের ভিতর ইহার অন্তর্ভব চাই। তর্ক যুক্তি বা কল্পনা সহায়ে ঐ জ্ঞানের একটু আভাস পেয়ে বসে থাকলে চলবে না। অবিদ্যাগ্রস্ত কাম কাঙ্ক্ষনকে জীবনের উদ্দেশ্য কবলে চলবে না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। জ্ঞানে তন্ময় হতে হবে, উন্মাদ হতে হবে, ‘মত্ত’ হয়ে যেতে হবে।

কর্মযোগের দ্বারা যন্ত্র হল, মার্জিত হল তবেই সে বুদ্ধিতে জ্ঞানের উপলব্ধি হবে। পরমহংসদেব বলতেন, “ভগবান্, বিষয়বুদ্ধির বাহিরে, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।” অতএব ফলকামনা ছেড়ে কর্ম করাই হচ্ছে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়; আর নিজের লাভলাভটা যদি আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে যে কাযই করি না কেন, তার দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হবেই হবে। কর্মে দোষ নাই—কখনই নাই; কিন্তু দোষ রয়েছে আমাদের ভিতরে। নিজের লাভটাকে কর্মের উদ্দেশ্য করেই আমরা দোষী হয়েছি, আপনাব জালে আপনি বাধা পড়েছি, এবং মুক্ত হবার “খেই জনমের মত” হারিয়েছি। নতুবা নিজের লাভের আশাটাকে যদি চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে স্বার্থগতহীন কোন মহান্ উদ্দেশ্য সামনে রেখে কায করে যাই, তাহলে গীতাকার বলেন,—

“হত্য়াপি স ইমাম্মৌকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে।”

নরহত্যার স্রোত বহলেও আমরা খুঁজে হব না বা অপরে আমাদের খুঁজ করলেও আমরা মরবো না—এই প্রকাব অন্তর্ভব হবে! পতিততা উপাখ্যান, ধর্মব্যাধের কথা আমরা সকলেই মহাত্মারতে পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু সেই সকল আদর্শ চরিত্রের ন্যায় কায করতে একেবারে ভুলে গেছি! তাই এ দুর্দশা। গীতাকার সেজন্যই বলতেন, “নিষ্কাম হয়ে কায কর, অবিরাম কায কব—কিন্তু কর্ম কবতে কষ্টে ভিতরে কর্মরহিত হয়ে থাক ও যোগীর অচল শান্তি অন্তর্ভব কর!”

কথায় বসে, মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, তাহার সমস্তই এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে আছে—কিন্তু সমস্তই আছে। অল্প দিকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহার বৃহৎ প্রতিকৃতি আবার এই বহির্জগতে বর্তমান। মানুষের ভিতর যেমন এই কর্মের ভিতরে কর্মরহিতাবস্থা রয়েছে—কেবল অন্তর্ভবের অপেক্ষা মাত্র; সেইরূপ বহির্জগতের

অনবরত পরিবর্তন এবং গতির মধ্যেও অচল ক্রিয়াবহিত শান্তভাবে সর্বদা বর্তমান। হুসভাবে দেখে মনে হয়, এ আবার কি কথা! নানা ভাবে অনুক্ষণ স্পন্দনশীল জগতে আবার কোথায় কখন গতিরহিত ক্রিয়াবহিত অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়? প্রজ্ঞাচক্ষু দার্শনিক বলেন, সূর্য হুঃখ, আলো আঁধার প্রকৃতি বিপরীত দ্বন্দ্বের ন্যায় ক্রিয়া ও ক্রিয়াবাহিত্য, গতি এবং বিশ্রামও জগতে সদা যুগপৎ বর্তমান। ক্রিয়া, গতি প্রকৃতি, তদ্বিপরীত ক্রিয়ানাহিত্য, গতিরাহিত্য প্রকৃতি অবস্থার সহিত তুলনা করেই আমরা বুঝে থাকি। যেখানে ঐক্য তুলনা কব্বার উপায় নাই, সেখানে ক্রিয়া এবং গতিও আমাদের অনুভবের সাধ্য নাই। শুধু আমাদের অনুভব হয় না তাহা নয়, কিন্তু আমরা যাহাকে ক্রিয়া গতি ইত্যাদি বলি, তাহা সেখানে বাস্তবিক নাই। জগতের ভিতরে নানা জিনিষের নানাভাবে অবস্থান দেখে, তুলনা করে আমাদের অনবরত গতি ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হচ্ছে; কিন্তু সমুদায় জগতটাকে একটা পদার্থ বলে একবার ভেবে নিয়ে তার পর তাতে গতি রয়েছে ভাব দেখি। তার যো নাই। ঐখানেই শান্ত নিষ্পদ ক্রিয়াবহিত অবস্থা। শুনে বসেই হয়তো ‘ওঃ, ও তো কল্পনা!’ দার্শনিক হেঁসে বলেন, না হে, কল্পনা টলনা নয়—ওটাই ঠিক ঠিক সত্য। তোমার বিজ্ঞান ধর্ম প্রকৃতি সব শাস্ত্রই তো বলে, জগতটা একটা জিনিষ; এক বৈ দুই পদার্থ নাই—এক বৈ দুই শক্তি নাই। আবার ঐ পদার্থ ও শক্তিটাও একের বিকাশ। তবে তুমি আমি সর্বদা নানা জিনিষের মনে রেখে রেখে আর জগৎটাকে নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নথ কেশাদি সমন্বিত মহাব্যাপ্তীরের স্থায় একত্র সম্বন্ধ একটা জীবন্ত জিনিষ বলে ভাবতে পারি না। ওখানে আমাদের “একঘেয়ে” প্রত্যক্ষটাই গোল কোরে, গভীর বাহিরে যেতে পারি না, আর ভাবে,—ক্রিয়াবহিত জগৎ আবার কোথায়? মানুষের আত্মাতে স্বন্দ্রপ্রসূত ক্রিয়াবাহিত্য অনুক্ষণ বর্তমান। প্রত্যেক পদার্থের শেষ স্তরেও ঐ ত্রস্তাব বর্তমান। আবার লৌহজড়াদির সমষ্টিভূত জগতটাকেও ঐ। অতএব ঐ এক ভাবটা কবিকল্পনা বা আকাশকুসুমের স্থায় অলৌকিক নয়। মূলে এটাকে ধরেই জগতটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ভিতরের সদা বর্তমান ঐ অবস্থাটা একবার ঠিক ঠিক প্রত্যক্ষ করতে পারলে আর অনিত্য জন্ম, জরাদি পরিবর্তন এবং তার চবম ফল মৃত্যুও আর আমাদের ভয় দেখাতে পারবে না। / সেইজন্ত ৬গবান্ গীতাকার বার বার

অর্জুনকে সামনে বেধে সমস্ত জগতকে শিক্ষা দিচ্ছেন—ইন্ড্রিয় মন বুদ্ধাদি সর্বদা কায় করুক; কিন্তু তুমি ঐ অকর্ষ ভাবটা প্রত্যক্ষ করে সব কায থেকে তফাৎ থাকতে শেখ। হে মাহুয। তুমি যান হুঁস হও, আপনার মহিমায হুঁস বাখ, জাগ—অজব অমব আত্মাব উপলব্ধি কবে অচল অটল শাস্তিতে অবস্থান কর। কোনরূপ দুর্কলতায় গা ঢেলে দিয়ে অনিত্য জিনিষ গুলোকে নিত্য ধবে বাধুবাব চেষ্টা করে দুঃখ পেও না। কর্ণ-ফলটা তাগ কবে কায করে যাও। উহারই নাম স্বার্থ সন্ন্যাস। সন্ন্যাসও যা, কর্মযোগও তাই।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহ্ব্যোগং তং শিদ্ধি পাণ্ডব।

তুই পথই এক যাযগায় পৌঁছিয়া দেয়।

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগস্ত নিঃশ্রেয়সকবাবুভৌ।

অর্জুনের মন থেকে কিন্তু কর্মের চেয়ে জ্ঞান বড়, একথা কিছুতেই যাচ্ছে না। তিনি ভাবছেন, জ্ঞান হলে যখন কর্ম থাকে না, তখন জ্ঞানটাই শেষ জিনিষ বা লক্ষ্য। অতএব কর্মের চাইতে মিশ্চয় বড়। তিনি ভুলে গেছেন যে, গীতাকাব যে জ্ঞানটা মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য বলে তাঁর সামনে খাড়া কবচেন, সেটা দেশকালাতীত অসীম অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান। অর্জুন যেটাকে জ্ঞান মনে কবেন, সেটা নয়। সেটা দেশকালের গভীর ভিতর, কার্যাকারণের শৃঙ্খলের ভিতর চির আবদ্ধ। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দেখতে পাই, ফের অর্জুনের ঐ প্রশ্ন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ফের ঐ বিষয় বোঝাবার চেষ্টা, এবাব কিন্তু ভগবান্ আর এক পথ দিয়ে অর্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা কচ্ছেন।

ভগবান্ বসুচেন, হে অর্জুন। ভেনো না যে, কর্মযোগটা একটা নূতন পথ। জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি পথ সমুহের ন্যায় ইহাও বহু পূর্বকাল হতে মানবকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিচ্ছে এবং জনকাদি বহু খ্যাতনামা রাজর্ষিগণ ঐ পথ আশ্রয় কবে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বিশেষতঃ, ক্ষত্রিয় রাজারা। এই কর্মযোগের কথা আমি প্রথমতঃ স্বর্গ্যাকে উপদেশ দিয়াছিলাম। স্বর্গ্য তৎ-পুত্র মনুকে উহা বলেন। মনু আবার ইক্ষাকুকে উপদেশ দেন। এইরূপে উহা বহুকাল পর্যন্ত বহুজনহিতার বহুজনসুখায় নিত্যকর্মসুষ্ঠায়ী পুরুষকার-প্রধান তেজস্বী ক্ষত্রিয় বাজ-কুলের ভিতরেই জীবন্ত ছিল। সেই কর্মযোগের আজ লোপ হয়েছে। নিজের সুখটুকু ছেড়ে কেহ আর বহুজনকল্যাণের



দিকে তাকিয়ে কৰ্ম কর্তে চায় না। ধর্মের ভিতরেও ব্যবসাদারী পাটোয়ারী বুদ্ধি ঢুকেছে ; অন্য কর্ম্মাদির তো কথাই নাই। তাই তোমাকে আজ আবার সেই পুরাতন কর্ম্মযোগের কথা বলছি। বীনবুদ্ধি, কাপুরুষ, ইন্দ্ৰিয়দাস, কুশলীর, ভগ্নোৎসাহ লোকের পক্ষে ঐ পথ অবলম্বনে সিদ্ধি লাভ করা সুকঠিন। কিন্তু তোমার ন্যায় বহুজনকল্যাণে চিরনিবন্ধদৃষ্টি শ্রদ্ধাবান বুদ্ধিমান তেজস্বী বীরহৃদয়ই ঐ উদার ভাব বৃদ্ধিতে পেয়ে দৃঢ়ভাবে ধরতে ও অমুঠান করতে পারবে। তাই তোমাকে বলা। আপনার শরীরটিতে পাছে কোন আঁচড় লাগে, আপনার ধন, মান, বশ, প্রভুত্ব প্রভৃতি পাছে না লাভ হয়, এমন কি, আপনাব মুক্তিলাভ পাছে না হয়, এইরূপ ভাব যার হৃদয়ে সদা বর্তমান, সে কখন কর্ম্মযোগী হতে পারবে না। কর্ম্মযোগী হবে তেজস্বী উদারমনা বীর, যে সত্যের জন্ত বা অপরের কিছু মাত্র কষ্টদূর করবার জন্য, স্বদেশের প্রেমের জন্য, মহাপুরুষের গৌরবের জন্ত আপনাকে এককালে ভুলতে পারবে—আপনার স্বপ্ন ঐশ্বর্য্যাদির নাশ হলেও ক্রক্ষেপ কববে না। পুরাতন জিনিষের আদর করা মনুষ্যমনের স্বভাব। পরিবর্তনের স্রোত অতিক্রম করে বহুকাল যাঁহা একভাবে থাকে, তাহারি মানুষ্যের কাছে কদব। অনিত্যের ভিতর নিত্য পদার্থের অমুসন্ধান মানবের প্রাণে প্রাণে সর্বদা আছে বলেই বোধ হয় ঐরূপ হয়। সাধারণ মানবের চেয়ে, গুণী মহাপুরুষদেব হৃদয়ে আবাব ঐ ভাবটী বিশেষ প্রবল দেখা যায়। অর্জুনের ন্যায় বীরাগ্রণি বহুদেব ঐভাব প্রবল দেখেই ভগবান কর্ম্মযোগের ইতিহাস কীর্ত্তন করে তাঁকে ঐ দিকে লওয়াচ্ছেন।

আর এক কথা,—কৃত্তিযেরাই, বিশেষতঃ, কৃত্তিয রাজারাই এই কর্ম্মযোগ অমুঠান করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতেন, এবং তাঁদের নিকট হতেই ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণের ভিতর ঐ কর্ম্মযোগের প্রচার হয়েছিল। একঘাটায় অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হতে পারে, বিশেষতঃ আজকালকার ব্রাহ্মণদের তো পারেই। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস, ভারতের যত কিছু শাস্ত্রজ্ঞান ব্রাহ্মণবর্ণেরই একচেটে অধিকারে ছিল, আর তাঁহাবাই দয়া করে অন্য বর্ণকে উহা দিয়াছিলেন। এ কথা কোন কোন বিষয়ে সত্য হলেও সকল বিষয়ে যে নয়, তার ঢের প্রমাণ আছে। আমরা এই মাত্র, দেব্‌লাম, গীতাকার বলুচেন, কর্ম্মযোগ প্রথম কৃত্তিয রাজাদের ভিতরেই ছিল। এইরূপ ছানোগ্য উপনিষদ পাঠে

দেখা যায়, আকুণি ও ষ্ঠেতকেতু ব্রাহ্মণ পিতা পুত্রে প্রবাহণ জৈবলি রাজার এবং প্রাচীনশালাদি পঞ্চব্রাহ্মণ কৈকেয় অশ্বপতি রাজার শিষ্যত্ব স্বীকার করে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ নিচেন। এইরূপে কৰ্মবোধ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম উদয় যে ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণকুলের ভিতর হয়েছিল, একথা শাস্ত্রপাঠে খুব সম্ভবপর বলে বোধ হয়।

কৰ্মবোধের ইতিহাস কীর্তন হতে অর্জুনের মনে আর এক প্রশ্নের উদয় হল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হর্যাকে তিনি প্রথমে কৰ্মবোধ উপদেশ কবেছিলেন। অর্জুন ভাবলেন, এ কেমন কথা? শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ত সেদিন হল, আর হর্যেব উৎপত্তি কতকাল পূর্বে হয়েছে। তাঁকে ইনি উপদেশ দিলেন কি কবে? এই সন্দেহেব প্রশ্নেই ঈশ্বর, ঈশ্বরবাবতার ও তাঁহাদের স্বরূপ সম্বন্ধীয় কথাব অবতারণা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হর্যাকে আমি বহু পূর্বকালে অন্য মূর্তিতে ঐ উপদেশ করেছিলাম। কিন্তু আমিই যে সেই মূর্তিতে ঐ উপদেশ দিয়াছিলাম, এ বিষয় আমার বেশ মনে আছে। কেননা আমি ঈশ্বরবাবতার, আমার জ্ঞানের কখন লোপ হয় না। তুমি এবং আমি উভয়ে বহুবাব বহুস্থানে জন্মগ্রহণ করে বহুজনহিতায় বহুকণ্ঠেব অনুষ্ঠান কবেছি ও করিব। তোমার সে সব কথা মনে নাই। আমার কিন্তু পূর্ব পূর্ববাবের সকল কথাই মনে আছে। অবতাব সম্বন্ধে ভগবান্ গীতাকার কি শিক্ষা দেন, উহা আমরা পববারে আলোচনা করিব।

## তুমি যে আমার।

( শ্রীমতী চন্দ্রানন্দ বসু । )

তুমি যে সবার হরি তুমি যে সবার।

তোমা ছাড়া হলে বিশ্ব পোড়া ভয় ছার।

কে বলে গো তুমি নাই, তোমা মন সম্বন্ধে ঠাই,

তোমারি বচিত এই নিখিল সংসার।

তুমি যে সবার নাথ তুমি যে সবার।

এই যে সৌন্দর্য্য ভরা, সুজলা গ্রামলা ধরা,  
যতই হোকনা কেন শোভাব আগাব,  
তোমা বই কিছু নাই, তোমা বিনা দেখি ছাই,  
এ ব্রহ্মাণ্ড জড় পিণ্ড সকলি অসাব।

তুমি যে সবাব বিভূ তুমি যে সবাব।

এ যে আকাশ মাঝে নীবদে দামিনী রেখা,  
জলদ অক্ষরে নাথ তোমারি মহিমা লেখা।  
কুসুমের সুধমা তব শশীতে মধুব হাসি,  
তপন গগন গায় লয়ে তব তেজোবাশি।  
অনলে অনিলে তুমি সকলেতে আছ হরি,  
ও নহে সলিল ও যে তোমারি কবণাবাবি।  
তোমা ছাড়া কিছু নয়, সকলি যে তোমাময়,  
তুমি পিতা মাতা ভ্রাতা তুমি সখা সবাকাব।

তুমি যে আমাব প্রভু তুমি যে আমাব।

এই যে হতেছে দৃশ্য, অনন্ত অসীম বিশ্ব,  
তোমাতে জড়িত আছে সকলি তোমাব।

তুমি যে সবাব হবি তুমি যে সবাব।

না জানি যে কেবা তুমি- আছ দেব কোন্‌ থানে,  
সুধু বিমোহিত চিত ধায় ও চরণ পানে,  
পাপে তাপে শোকে দুঃখে সতত জড়িত হবি,  
তোমাবি মধুব নামে চালে প্রাণে শান্তি বাবি।  
ধন্মাধম জ্ঞান পুণ্য কিছু না জানিতে চাই,  
ওই সুধামাথা নামু যেন গো বলিতে পাই।  
পতিতপাবন তুমি পতিতে বাবেক চাও,  
দীননাথ দীনসখা দীন হীনে দেবা দাও।  
কোথা হে জগত নাথ জগত জীবনাধাব,  
দুঃসহ জীবন ভাব বহিতে না পাবি আব।  
এই যে বিশাল বিশ্ব অসীম সাগর প্রায়,  
আমার জীবন প্রভু ক্ষুদ্র বারি বিশ্ব তায়।  
মম এ জীবন বিশ্ব জীবনে মিশাবে যবে,

এ বিশ্ব সংসারে প্রভু তাহে কিবা ক্ষতি হবে ?  
 তবে হে জীবনদীপ এখনো কেন হে রয়,  
 অচিন্ত্য মহিমা তব কি বুঝিব দয়াময় ?  
 সকলি তোমাব ইচ্ছা, ইচ্ছা পূর্ণ হক তব।  
 প্রকৃতি তোমারি রূপ জগতে বিদিত কবে,  
 নব নব বেশে দেখ কিবা নব শোভা ধবে।  
 কভু ভয়ঙ্করীবেশী, যেন জ্বালা মুক্তকেশী,  
 নিবিড় তিমির বাশি ঢেকেছে মেদিনী।  
 আবাব গগন গায় চপলা চমকি যায়,  
 প্রলয় পবন বয় কাপায় অবনী।  
 যেন বণে ঘোবাননা মহাকালী নিমগনা,  
 করিছে উন্মাদ নৃত্য কবালবদনৌ।  
 আবার প্রকৃতি হাসে, ভাসে শশী নীলাকাশে,  
 কিরণ ববষি তোম্বে বিমল ধভনৌ।  
 গগনে তাবকামালা, যেন নিশাধিনী বালা,  
 হাসিছে পবিষে কেশে হীৰকৈব ফুল,  
 কমলে কমলা যেন, ধবা শোভামবৌ হেন,  
 তোমারি বচিত হবি সে শোভা অতুল।  
 পুন দূবে যায় নিশা, আসে স্নগমবী উষা,  
 তরুণ অকণ বাগে বঞ্জিত ভুবন,  
 গগনেতে দিনমণি, হেবি কোটে কমলিনী,  
 হে বিভু সে প্রেম হবি তোমারি সৃজন।  
 ভূমি সাজায়েছ ধবা ফলে ফুলে মনোহরা,  
 বিহঙ্গ ললিত তালে তোমারি মহিমা গায়,  
 পীত হবিত পাতা, কুসুমিত তক লতা,  
 তোমারি স্নেহের কণা লেখা যেন দেখি তাব।  
 সৃষ্টিযাছে কি সুন্দর, সিতহাসি মনোহর,  
 হেরিয়া হরিয়ে প্রাণ মোহিত হইয়া যায়,  
 সাকার কি নিরাকার গুণাতীত স্তবধাব,  
 যে হও সে হও ভূমি মম বসি তব পাশ।

তুমি বিধি বিধু হব, সৃজন পালন কর,  
 সংহার সুরতি ধব কণন আবার।  
 হও মাগো অন্নপূর্ণা, অমৃতান্নে পবিপূর্ণা,  
 জগত জননী রূপা দয়াব আধাব।  
 চৈতন্য রূপিনী তাবা মহামায়া ভবদায়া,  
 আমি কি বর্ণিন তব মহিমা অপাব ?  
 তুমি যে সবার হবি তুমি যে সবার।  
 কখন বা রাধা বামে, মদন মোহন ঠামে,  
 দাডাও যুগলবেশে দ্বিভুজে মুবলী ধবি,  
 জয় গোবর্দ্ধনধাবী, নিকুঞ্জ কাননচাবী,  
 ভুবন মোহন রূপ বাধিকানুগ হবি।  
 পবমা প্রকৃতি রাধা, তোমাৰি অঙ্গেবি আধা,  
 বাধা নামে, বাশী সাধা বাজে সদা আষ আষ।  
 যমুনা উজানে বহে, প্রেমনি তবঙ্গ বহে,  
 পুসকে গোলোক ভাসে প্রেমে বাধাগুণ গাধ।  
 ওহে নিত্য নিবজন, তুমি সত্য সনাতন,  
 জগত জীবন তুমি সকলেবি মুলাধাব।  
 তুমি হে জীবের গতি, অখিল ভুবন পতি,  
 পিতা মাতা পতি পুত্র কেহ নয় আপনাব।  
 তোমা বই কিছু নাই, স্পৃহ নাথ এই চাই,  
 অচল ভকতি থাকে চরণে তোমাৰ,  
 তুমি যে আমাৰ হবি তুমি যে আমাৰ।

## পম্পাসরোবর ।

( ত্রীনিকুঞ্জ বিহারী দার্জিলিং )

পম্পাসরোবর হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন তীর্থ স্থান, বিশেষতঃ, এখানে  
 বানববাজ বাগীর রাজধানী কিস্কিন্ধ্যা এবং দ্ব্যামুক ও মালাবান পুরুত  
 থাকায় এই স্থানটী দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটা প্রধান তীর্থ। পুরাণে

মামসরোবর, বিম্বসরোবর, মারায়ণসরোবর ও পম্পাসরোবর, এই চারিটা পুণ্যতোরা সৰোবরের বিষয় কথিত থাকায় এতদঞ্চলের লোকে গ্রহণাদি পূৰ্ণদিনে পম্পা স্নান করিতে আইসে, এবং দূরদেশ হইতে ব্যক্তিগণও প্রায়ই মথো মথো স্নান করিতে আসিয়া থাকে। যদিও অধুনা ইহা দাক্ষিণাত্যের বামেশ্বর, বালাজী, শ্রীরঙ্গ, বা কাঞ্চীর ন্যায় সৰ্বদা বহুযাত্রী-সঙ্কুল বা ঐশ্বর্যপূর্ণ তীর্থ নয় বটে, কিন্তু প্রাচীনতায় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা ঐ সকল স্থানকে পরাজিত করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যেব মাইল পরিমাণ স্থান ব্যাপী বড় বড় মন্দিরের বিষয় শুনিয়া, আমি জনৈক বন্ধুর সহিত এতদঞ্চলে বেড়াইতে আসিয়া, বথার্থই এক একটা গ্রাম পরিমিত স্থান ব্যাপী মন্দির দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বাজাব, পুষ্করিণী, ধরমশালা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোপুৰ (Gate), ও উৎসবাদি হইবার পৃথক পৃথক স্থান থাকায় উক্ত ভারতবাসী লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং দর্শনীয়। উক্ত ভারতে পূৰ্বকালীন মন্দির সকল খুব কাককার্য্যখচিত ও প্রকাণ্ড ছিল বটে কিন্তু মুসলমান বাদসাগণ প্রায় সকল গুলিই ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, এখন কেবল সে সকলের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে পূৰ্বকালীন সেই সকল মন্দির মুসলমানদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ায় এখনও অতীতের হিন্দু স্থাপত্যের পরিচয় দিতেছে।

আমরা মহীশূরের শ্রীরঙ্গপট্টম সहर হইতে সাউথ ম্যাবহাট্টা রেলযোগে বঙ্গলুৰ, গণ্টাকল জংসন ও ইংবাজ সেনানিবাসস্থান বঙ্গারি হইয়া হস্পেট (Hospet) আসিয়া পৌঁছিলাম। এ সময়ে মহীশূরে খুব প্লেগ থাকায়, বেলে আসিবার কালীন আমাদিগকে ২১৩ স্থানে প্লেগ পরীক্ষা এবং আপনাপন নাম ও গন্তব্যস্থান লেখাইয়া দিতে হইয়াছিল। হস্পেট ষ্টেশনে ১১০ টাব সময় নামিয়া আমরা পম্পা হাইবার জন্য গাড়ির অস্থগস্থান করিতে লাগিলাম, কিন্তু এখানে Jutka \* বা অত্র কোনরূপ ঘোড়ার গাড়ি না থাকায় অগত্যা গরুর গাড়ি ভাড়া করিলাম। আমরা উভয়েই এ দেশীয় কোন ভাষা না জানায় সময় সময় বড় মুষ্কিলে পড়িতাম। তবে এতদ-

\* দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত দুইচাকার ক্ষুদ্রভবনের পাকী গাড়ি। বিশেষ ইচ্ছাতে একটা ঘোড়া দোতা থাকে এবং দুই জন লোক ভিতরে বসিতে পারে।

কলের অধিকাংশ লোক ইংরাজী জানায় এবং পুলিশ ও রেল ষ্টেশনের কুলি ও গাড়োয়ানগণ কতক পরিমাণে হিন্দি শিখে বলিয়া কোন রকমে কাষ চালাইয়া লইতাম। আমাদের গাড়োয়ান হিন্দি জানায় তাহার মুখে তুনিলাম যে, পম্পা—ফেসন হইতে ৫১৬ ক্রোশ দূর, অতএব প্রথমে তাহাকে কোন একটা ব্রান্ধেব হোটেল লইয়া ষাইতে বলিলাম। এতদঞ্চলে খুব বড় বড় সহর ভিন্ন, কি বেল ষ্টেশন সমূহে, কি অপবাপব সহরে, কোথাও পুবি কচুরির দোকান নাই; বেলঘাতীদের তেলে ভাজা কুলুরি ভিন্ন গতি নাই; কদাচিৎ মিষ্টান্ন পাওয়া যায়, তবে ফল মূল, দধি বা ঘোল, ও গরম দুধ প্রায় সকল ফেসনে পাওয়া যায়। এ দেশে নিৰ্জলা দুধ প্রায়ই পাওয়া যায় না। ইহা বা দুধে অত্যন্ত জল মেশায়, এমন কি, গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ভাল দুধ চুলভ। এ দেশের আবহাওয়া প্রায় বাব মাসই গরম, সে কারণ, যদিও আমরা শীতকালে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম, তথাপি গরম কাপড়ের কোট ও আলোয়ান ভিন্ন অপব গরম কাপড় কোন দিন বাত্রে ব্যবহার করিতে হয় নাই। গরম দেশ বলিয়া ইহার বাঙ্গালির মত দুইবেলা ভাত খায়, এবং সেই কাবণ প্রায় সকল সহরেই, বিশেষতঃ বেলফেসনের উপবিস্তিত সহরে ব্রান্ধেব দ্বারা চালিত ভাতের হোটেল আছে। এই সকল হোটেল বেশ পবিস্কাব পরিচ্ছন্ন, আমাদের বাঙ্গলা দেশের ভাতের আড্ডার ন্যায় নোংবা মাছিভ্যানভেনে নহে। এখানে জাতিবিচার খঙ্গ-দেশ অপেক্ষা অনেক প্রবল, এই কাবণ ছোট ছোট কুঠরিতে লোকে পৃথক পৃথক আহার করে। সাধারণতঃ এদেশের হোটেল প্রবেশমুখে একটা বসিবার ঘর থাকে। এইখানে তিলক কেঁটা কবিবার সরঞ্জাম ও পানের সরঞ্জাম পড়িয়া আছে; আহারার্থী লোক প্রথমে এই ঘরে আসিয়া শৈব বা বৈষ্ণব ভেদে আপনাবা তিলক করিয়া লয়, পরে হোটেলের মালিক তাহাকে আহাবেব জন্য ভিতরে স্বতন্ত্র কুঠরিতে লইয়া যায়। পরে পাতে ভাত দিয়া তাহাতে ২১৩ পলা ঘৃত দেয় এবং ২১৩ বকম তবকাবি, নারিকেল কুরো, দধি ও লক্ষা মিশ্রিত চাটনি, ডাল প্রভৃতি, শেষে ঠেঁতুল গোলা ও লক্ষা বাটা একটা রসা বা ঝোল ৩৪ হাতা ভাতের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। এই রসা ও তরকাবি এত ঝাল যে, সময় সময় ষাইতে কষ্ট বোধ হয়, দুধ বা দধি ষাইবার ইচ্ছা হইলে, পৃথক পয়সা দিয়া লইতে হয়। এতদ-কলের আহবাওয়া গরম ও আহারীয় দ্রব্যে লক্ষার ব্যবহার অত্যন্ত অধিক

বলিয়া, আমাদের পবিচিত জনৈক এদেশবাসী বন্ধু আমাদেরকে প্রত্যাহ দধি বা খোল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। আহারের পর বাহিবেয় ঘরে আসিয়া নিজ হস্তে পান বাটা হইতে পান সাজিয়া লইতে হয়, এদেশের হোটেলে মৎস্য, মাংস বা তামাকেব ব্যবহার নাই। বিদেশী লোক থাকিতে চাহিলে ২১ দিনের জন্য বাস করিবার স্থান দেয়। এইরূপ হোটেলে ভারতের সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং সাধারণে সহায়ভূতি করিলে অল্পবিত্ত হিন্দুদিগেব রেলপথে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু ইহা দুবাশা মাত্র, কারণ বহুদিন পূর্বে E. I. Railway এর বড় বড় স্টেশন সমূহে কোন একজন বাঙ্গালি বাবু হিন্দু হোটেলে থলিয়াছিলেন, উহা সাধারণেব সহায়ভূতিব অভাবে শীঘ্রই উঠিয়া যায়।

আমরা হস্পেট স্টেশন হইতে গকব গাড়ী কবিয়া একপোয়া পথ আসিয়া সহবেব মধ্যে একটা ব্রাহ্মণেব হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে রান ও আহালাদি কবিয়া পুনরায় সেই গকব গাড়ি চড়িয়া সহর ছাড়াইয়া হাম্পি যাইবার বাস্তব যাইতে লাগিলাম। পথে ২১০টী গ্রাম অতিক্রম করিয়া প্রায় ২১০ মাইল পথ হাম্পির রাস্তায় আসিয়া, শেষে এই রাস্তা ত্যাগ কবিয়া বাহাতি অপর একটা রাস্তা দিয়া প্রায় ২ মাইল পবে পম্পেশ্বর নামক স্থানে বেলা ২১০ টাব সময় আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহা তুঙ্গভদ্রানদীর দক্ষিণ উপকূলস্থ অসমতল পার্বত্য ভূমির উপর অবস্থিত; পূর্বকালে ইহা একটা ধনজনপূর্ণ সহর ছিল, কিন্তু এক্ষণে পম্পেশ্বর নামক মহাদেবেব মন্দির ও তাহারই উত্তর পশ্চিম পার্শ্ব ৩০৪০ ঘর লোকেব বসবাস ভিন্ন সমুদয় সহবগী জনশূন্য ওয় অট্টালিকা স্বপে পরিণত হইয়া অতীত গোঁববেব সাক্ষী দিতেছে। আমাদের গাডোয়ান এই পম্পেশ্বর মহাদেবেব মন্দির সম্মুখে আমাদেরকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল যে, এই স্থানেব দুই তিন ক্রোশের মধ্যে ঋষামুক পর্বত, নালাবান পর্বত, কিস্কিন্ধ্যা, পম্পা ও মাতঙ্গ সরোবর প্রভৃতি আছে, অতএব এই স্থান হইতে ঐ সকল দেখিতে হইবে। আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া গাডোয়ানকে এই স্থানের কোন পাণ্ডার বাটীতে লইয়া যাইতে বলিলে, সে বলিল যে, এখানে কোন পাণ্ডা নাই, পূর্বাঙ্কে বলিলে হস্পেট সহর হইতে পাণ্ডা পথপদর্শক ঠিক করিয়া দিতে পারিতাম। আমরা এদেশের ভাষা জানিনা যে, স্বয়ং পথপ্রদর্শক বোগাভ কবিয়া লইব, এ



কথা খাড়োয়ানকে বিশেষ করিয়া বলায় সে অনেক চেষ্টা করিয়া একজন ত্রিবৈকব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুকে আমাদের পথপ্রদর্শক ঠিক করিয়া দিয়া আপন প্রাপ্য গাড়ি ভাড়া লইয়া বিদায় হইল ।

আমাদের পথপ্রদর্শক সাধুটা হিন্দুস্থানী, অতএব তাহার সহিত হিন্দিতে তীর্থাদি দর্শন ও থাকিবার বাসা সম্বন্ধে কথাবার্তা হইলে, সে পশ্চিমের মহাদেবের মন্দিরের ভিতর ধরমশালার্থে যে সকল ঘর পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে একটাতে আমাদের গেল। আমরা সেই ঘরে নিজদের আসবাব রাখিলে পর, আপনারা একটু বিশ্রাম করুন, আমি ঘণ্টা খানেক পরে আসিয়া অদ্য সন্ধ্যার পূর্বে নিকটবর্তী ২১ টা স্থান দেখাইয়া আনিব, এবং কাল সকালে আসিয়া অপরাপর স্থান দেখাইতে লইয়া যাইব, এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। অদ্য এই স্থানে আমরা পাণ্ডা না থাকিলে যাত্রীদের যে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। যদিচ আমাদের পথপ্রদর্শক ষোণাড় হইয়াছে বটে, কিন্তু পাণ্ডাদের ত্রায় তাহাব যাত্রীর প্রতি যত্ন কোথায়? সে জানে, ইহাদের সহিত আমার এই একবার মাত্র সম্বন্ধ, আরও তাহার মনে সন্দেহ আছে যে, কার্যক্ষেত্রে ইহারা পারিশ্রমিক দিবে কিনা, কারণ, এই কার্য তাহার পক্ষে অব্যবসায়ীর ব্যবসা করার ন্যায়। অত দিকে পাণ্ডারা জানে, যাত্রীদের সহিত তাহাদের পুরুষানুক্রমে নিত্য সম্বন্ধ, উপস্থিত ক্ষেত্রে যাত্রীদের নিকট কিছু না কিছু পাইবই, ইহা ভিন্ন তাহারা ব্যবসায়ী বলিয়া ভবিষ্যতের আশা রাখে। পাণ্ডাদের একটা দোষ যে, তাহারা যাত্রীদের ইচ্ছা না থাকিলেও স্বল্প মূল্যে গুণ্যক্রমের লোভ দেখাইয়া, নানান বাবদে পয়সা আদায় করে, কিন্তু ইহারা যাত্রীদেরকে যেরূপ আত্মীয়ের ন্যায় নিজ বাটতে স্থান দেয়, রত্নই বাস করিয়া খাওয়ায়, অসুখ বা বিপদাদি হইলে যেরূপ ভাবে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করে, তাহার তুলনায় পূর্বোক্ত দোষটি অতি সামান্য। বিশেষতঃ পাণ্ডার আলয়ে যাত্রীদের কখন চুরি যাইতে শুনা যায় না, সহায়শূন্য অপরিচিত স্থানে যাত্রীদের পক্ষে এই সকল বড় সামান্য লাভ নহে। দুঃখের বিষয়, আজ কাল কোন কোন লোককে পাণ্ডা প্রথাব উপর বিশেষ চটা দেখিতে পাই। ইহার কারণ আমার বোধ হয় যে, তাহারা আত্মীয় বন্ধু যে সকল স্থানে আছে, তাহা ভিন্ন অপব কোন তীর্থ স্থানে না যাওয়ায় তাহাদের বহুদর্শিতা

নাই। তাঁহারা যদি একদা আপন ভবসাব অপবিচিত্ত তীর্থে গমন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বিজয় ভ্রম বৃষ্টিতে পাবেন। তাঁহাদের মনে বাধা উচিত যে, পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই ভ্রমণ করিবার জন্য পথপ্রদর্শকের বন্দোবস্ত আছে, এবং ইহার কাবণ সর্বত্রই পারিশ্রমিক দিতে হয়, অতএব আমাদেব দেশেব পাণ্ডা প্রথায় দোষ কি ?

আমরা মন্দিরভ্যন্তরস্থ ধরমশালায় খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, কিন্তু তখন পর্যন্ত সেই পূর্বোক্ত পথপ্রদর্শক না আসায়, আমবা যতক্ষণ পর্যন্ত সে না আসে, ততক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া না থাকিয়া এই মন্দিরটী দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরটী ছুই মহল। প্রধান গোপূর্বের পূব বিস্তৃত প্রাঙ্গণ রহিয়াছে, তাহার চতুষ্পাশ্বে ষাটীদের থাকিবার জন্য ধরমশালা, দেবতার উৎসবাদির জন্য পৃথক পৃথক স্থান এবং মধ্য স্থানে জলপানার্থ কুয়া রহিয়াছে। এবান হইতে দ্বিতীয় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উঠানের মধ্যে পল্লেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখা যায়; বাহির মন্দিরে নন্দী বা ষাঁড় ও ভিতর মন্দিরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। উঠানের চতুষ্পাশ্বে যবে অপরাপর দেবতার স্থান এবং পার্শ্বতী দেবীর পৃথক স্থান আছে। এই উঠানের পশ্চিম দিকে আর একটা দরজা আছে, এই দরজা দিয়া ভূদ্রভদ্রা নদীতে ষাওয়া যায়। এই মন্দিরটী খুব পুরাতন বলিয়া স্থানে স্থানে মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিয়া বাইতেছে। ইহা দাক্ষিণাত্যের অপরাপর মন্দির অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন হইলেও আধ্যাবর্ষেব মন্দিরের হিসাবে খুব বড়। আমাদেব মন্দির ও পার্শ্বস্থ ভূদ্রভদ্রা নদী দেখিয়া আসিবার ক্ষণেক পরে পথপ্রদর্শক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার সহায়তায় আমরা অপরাপর স্থান দেখিতে বাহির হইলাম।

মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমরা ভগ্ন অট্টালিকা সমূহের মধ্যস্থ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম যে, এই ভগ্ন স্থানের মধ্যে এক একটা দোতলা বা তেতলা বাটী এখনও অভয় অবস্থায় থাকিয়া ঠিক যেম মস্তক উন্নত করিয়া ছুর হইতে পৃথিবীদিককে বস্ত্র মাত্রই নম্র বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। সে বাহা হউক, আমরা একমাইল পথ এইরূপ ভগ্ন স্থানের মধ্য দিয়া বাইয়া সহরের বাহিরে আসিলাম এবং আরও এক মাইল অসমতল পার্বত্য ভূমি অতিক্রম পূর্বক ভূদ্রভদ্রার দক্ষিণ তটে ঋষ্যমুক পর্বতের নিম্নস্থ একটা গুহার আসিয়া পৌঁছিলাম। ঋষ্যমুক পর্বত ভূদ্রভদ্রার উত্তর তটে অবস্থিত। ছুই মাইল ব্যাপী নৈলমালা, উত্তর পার্শ্বস্থ বৃক্কভাদ্রাপূর্ণ পর্বত মধ্য দিয়া ভূদ্রভদ্রা নদী সর্পের

জায় বক্র গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটী দেখিতে অতি রমণীয়। উচ্চ পাহাড়ে স্বভাবের সৌন্দর্য্য ভিন্ন যাত্রীদের দেখিবার কিছুই নাই। পথপ্রদর্শকের মুখে শুনিলাম যে, এই গুহায় স্মগ্রীব, হনুমানাদি মন্দিরচতুষ্টয়ের সহিত বানররাজ বালির ভাষে লুকাইয়া বাস করিত। রাক্ষসরাজ রাবণ যখন সীতাকে হরণ কবিয়া আকাশমার্গ দিয়া পুন্শক রথে লঙ্কায় লইয়া যাইতে-ছিল, তখন জনকনন্দিনী নিয়ে এই গুহায় অবস্থিত বানরগণকে দেখিয়া আত্মপরিচয় দিয়া নিদর্শন স্বরূপ আপন শরীর হইতে অলঙ্কার মোচন পূর্বক গুহার বানরগণের সম্মুখে ফেলিয়া দেন। এখনও গুহা সম্মুখস্থ পাথরের উপর সেই সকল অলঙ্কার পতনের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গুহার মধ্যে ৮১০ জন লোক থাকিতে পারে, এই পরিমাণ স্থান আছে, কিন্তু কোন দেব-দেবীর মূর্তি নাই। গুহার ভিতর বাহিরের স্থান সকলে মূর্তিকার লেশ মাত্র নাই, কেবল পাথর; একাবণ বৃক্ষ লতাাদি কিছুই নাই।

এই স্থান দেখিয়া আমরা তুঙ্গভদ্রার ধারে গায়ে ঋষ্যমুক পর্বতের উপর দিয়া প্রায় এক পোয়া পথ যাইয়া একটা ত্রিবৈষ্ণবদেব আখড়া বা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই আখড়াটা খুব প্রাচীন, ভিতরে বাম সীতা মূর্তি বিবাজিত। শুনিলাম, পূর্বোক্ত গুহায় লুকাইত বানরগণের মধ্যে হইতে হনুমান এই স্থানে সর্গ প্রথম শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে জনকনন্দিনীর সমাচাব নিদর্শন স্বরূপ তাহার পরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল দেখান; পবে এই স্থানে স্মগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয় এবং প্রভু রামচন্দ্র বালী বধের অঙ্গীকার করেন। এই স্থানের চতুঃপার্শ্বে বৃক্ষলতাাদি ও নিয়ে তুঙ্গভদ্রা নদী থাকায় স্থানটী অতি মনোহর এবং আশে পাশে গ্রাম না থাকায় একান্ত নির্জন; ঠিক যেন প্রাচীন ঋষিদিগের আশ্রম। ভজন সাধনের পক্ষে বেশ প্রশস্ত স্থান বলিয়া কয়েকজন বিরক্ত সাধু এই আখড়ার আশে পাশে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া আছেন। আমরা এই স্থান দেখিয়া পুনরায় ঋষ্যমুক পর্বতের উপর দিয়া চতুর্দিকেব শোভা দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পূর্বে পাশ্চাত্য মহা-দেবের মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের পথপ্রদর্শক রাতে আমাদের গকে এই মন্দিরস্থ ধর্মশালায় সতর্ক ভাবে থাকিতে পরামর্শ দিয়া এবং আগামী কল্যাণীতে আসিয়া অপবাণের স্থান সকল দেখাইয়া আনিব বলিয়া আপন স্থানে চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইলে পর আমরা সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরচিন্তা করিবার জন্য মন্দির পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রা নদীতে গমন করিলাম।

ভটকৃষ্ণ নদীজল হইতে অনেক উচ্চ। নদীতলে নামিবার জন্য কোনরূপ বাঁধা বাট নাই কিন্তু পার্শ্বস্থ স্থান বলিয়া অনেক পাথর পড়িয়া থাকায় তাহার উপর দিয়া জলে অবতরণ করিবার বেশ সুবিধা আছে। আমরা জনের নিকট ঘাইয়া দেখিয়া য়ে, নদী কিনারায় জল মধ্যে অনেক বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, সেই সকল পাথরে স্রোতজল প্রতিহত হইয়া অতি সূক্ষ্মরূপে কল্লোল ধ্বনি উঠিতেছে এবং ঐ শব্দের সহিত পাথরে উপবিষ্ট সন্ধ্যা উপাসনা পবায়ণ ব্রাহ্মণগণের স্তোত্রধ্বনি মিলিত হইয়া যে কি অতিসুখকর শব্দ উথিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাভীত।

আমরা নদীজলে অবস্থিত একটা পাথরের উপর বসিয়া ধানিকঙ্কণ জৈবর চিন্তা করিবার পূর্বে এই পুণ্যতোয়ার উপকূলবর্তী স্থানসমূহের পূর্বস্থিতি সকল মনে উদয় হইতে লাগিল। এই নদী উপকূলে বসিয়া শাক্তাং জ্ঞানমূর্ত্তি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের আলোচনা করেন এবং বেদান্তাদির ভাষ্য সকল রচনা ও বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি কৃত গ্রন্থই প্রচার করেন। এই স্থান হইতে তুঙ্গভদ্রা ক্রটি দিয়া ২১৩ দিন ঘাইলে উক্তনদীতীরে শৃঙ্গগিরিতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সিংগেবি মঠে বাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ সকলের মধ্যে ইহাই প্রধান ও প্রথম। এইস্থানে তিনি সরস্বতী মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই মঠে এখনও সকল প্রকার হুত্ৰাপ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ও মহাজ্ঞানী সরাস্বতী সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই তুঙ্গভদ্রার কূলে বিজয়নগরে দাক্ষিণাত্যেব সেই প্রধান পণ্ডিত মধ্বাচার্য্য অশেষবিধ গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত এত গ্রন্থ আছে যে, ভূমণ্ডলে আর কোন ব্যক্তি এত অধিক গ্রন্থ লিখিতে পারেন নাই। ঘাঘা হউক, এইরূপ নানাবিধ চিন্তার পর আমরা পল্লেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া সামান্য জলযোগ করিয়া রাত্রে গুইয়া রহিলাম।

পবদিন প্রাতে উঠিয়া দর্শনে ঘাইবার জন্য পূর্বোক্ত পথপ্রদর্শকের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম; কিন্তু সে না আসায় অন্তত্যা আমরা দক্ষান করিয়া তাহার ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে অপরাপর স্থান দর্শন করাইবার জন্য লইয়া ঘাইতে বলায় সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভাবে বোধ হইল, তাহার মনে সন্দেহ হইতেছে যে, দর্শনাদি কবিয়া পাছে শেষে আমরা তাহার পারিশ্রমিক ফাঁকি দি। তখন মনে হইল যে, পাণ্ডা না থাকায় আজ পরমা দিয়াও লোক পাইনা। সে ঘাঘা হউক, আমরা পারিশ্রমিক স্বরূপ

টাকা অগ্রে দেওয়ায়, সে আমাদের সঙ্গে দর্শন কবাইতে বাহির হইল।

আজ আমরা অপর একটা রাস্তা দিয়া ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকাসমূহ অতিক্রম করিয়া গ্রামের বাহিরে আসিলাম; এবং প্রায় ২ মাইল অসমতল পার্কত্যাভূমি অতিক্রম কবিয়া মালাবান পর্বততলে আসিয়া পৌঁছিলাম। পর্বতটী ফলকুলের বৃক্ষলতাদিপূর্ণ ও বেশ বন্যায়; উপরে উঠিবার জন্ত পূর্বে সিঁড়ি ছিল, এখন ২১১ স্থান ভিন্ন সমুদায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নিচে হইতে প্রায় এক মাইল পথ উঠিবার পূর্বে আমরা পর্বতশিখরদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে একটা প্রাচীন মন্দির আছে। আমরা প্রবেশ মুখে হনুমান-জীব আস্থানা দেখিয়া, একটা বড় দবজা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ কবিলাম। মন্দিরপ্রাঙ্গণ চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত; মধ্যে বান সীতাব মন্দির বিবাজিত। এই স্থানকে ষ্টিটক শিলা কহে, কিন্তু বামাখণ কথিত সে ষ্টিটক-মণিয গহ্বর, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র চাকুর্ক্ষ্য সময়ে বৃষ্টি-বাত-আতপ নিবারণ জন্ত বাস করিতেন, তাহাব কোন চিহ্ন এখন আব নাই।

শ্রীরামচন্দ্র বানবাজ বাণীকে বধ করিয়া সুরীষকে বাজা করিলে পর সুরীষ তাঁহাকে কিঙ্কিয়া নগরে থাকিতে বলেন; কিন্তু তিনি বলেন, “সখে, আমি চতুর্দশ বৎসর কোন নগরে প্রবেশ কবিল না, আমি নিকটবর্তী পর্বতশিখরে এক বৎসব কাল বাস করিব, তুমি এই ষৎকিঞ্চিৎ সময় নগর মধ্যে অবস্থান পূর্বক রাজ্যসুখভোগ কবিয়া পশ্চাৎ সীতায়েষণে যত্নবান হইবো।” এই কথা বলিয়া এই পর্বতে আসিয়া বাস কবেন। পর্বতোপরে জলের ঝরণা বা কুণ্ড না থাকায় জনকনন্দিনী পিপাসায় অতিশয় কাতব হইলে ভগবান্ রামচন্দ্র বাণাঘাতে পর্বত বিদ্ধ কবিয়া সুরীষতল জল বাহির করিয়া তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ কবেন, এখনও মন্দিরস্থ প্রাঙ্গণে ইহাব নিদর্শন স্বরূপ একটা গর্ত ও তাহাব মধ্যে জল দেবিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে ভগবান্ অপর পক্ষীয় শত্রু কবিয়াছিলেন। এখনও মন্দিরের পশ্চাদ্বর্তী প্রাঙ্গণে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরটী এবং মন্দিরস্থ অঃ জন শ্রীবৈষ্ণব সাধু কেবল মাত্র সেই অতীতের সমাচাব জগৎকে জানাইতেছে, নচেৎ পূর্বেকাল সে রামও নাই আব কিঙ্কিয়া হইতে নিত্য শ্রীরাম দর্শনে আগত বানরগণের দিবাভাস সে গগনভেদী জয় শ্রীরামধ্বনিও নাই, তবে এখনও পবিত্রাচ্ছা যাতীষ মুখে এবং মন্দিরস্থ সাধুদেব মুখে মধ্যে মধ্যে রাম বাম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, নচেৎ পর্বতোপরে বা আশে পাশে কোন

গ্রাম না থাকায় চতুর্দিক একান্ত নিস্তর, কেবল পক্ষিকুল মধ্যে মধ্যে মধুর স্বরে ও ভ্রমরেরা গুল গুল রাবে রাম নাম গান করিয়া, এবং দূরস্থ তুঙ্গভদ্রা নদী স্রোত স্বরে অবিরত রাম রাম শব্দে প্রবাহিত হইয়া এই নিস্তরতা ভঙ্গ করিতেছে যাত্র।

এই সকল দর্শন করিয়া আমরা পর্বত হইতে নামিয়া আসিলাম এবং নিম্নস্থ সমতল ভূমির উপর দিয়া কিলিক্যাব পার্বত্যের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথেব উভয়পাশে ক্ষেত্রে কৃষকগণ কেহ শস্ত কাটিতেছে, কেহ রাম নাম গান করিতেছে, কেহ গুইয়া আছে। এই সময় ইক্ষুর চাষ শেষ হওয়ায় কোথাও ইক্ষু কাটা হইতেছে, কোথাও আখ মাড়া হইতেছে। আমরা এই সকল দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণতটে, কিলিক্যা ঘাইবার পার্বত্যে উপস্থিত হইলাম। পার্বত্যে নৌকা দেখিতে পাইলাম না, তবে কয়েকটা ঝাঁকা জলে ভাসিতেছে দেখিলাম। ঝাঁকাগুলি আমাদের দেশেব কুমোরদের হাঁড়ি কলসী বহিবার ঝাঁকার স্থায় বড় বড় ও উহাদের তলদেশ চামড়ার দ্বারা ভাল করিয়া ছোওয়া থাকায় জলে বেশ ভাসিতেছে। এক একটা ঝাঁকায় ৩৪ জন লোক বসিতে পারে এবং একজন যাত্র নাবিক হস্তান্তিত দাঁড়ের সাহায্যে এই জল-যান চালাইতেছে। আমরা ৩ জনে এইরূপ একটা জলযানে বসিয়া পরপারে ঘাইয়া পৌঁছিলাম। এখানকার নদীর বিস্তার প্রায় সিকি মাইল।

আমরা পরপার হইতে এক পোয়া রাস্তা দূরে কিলিক্যা সহরে আসিয়া পৌঁছিলাম; ইহার আধুনিক নাম আনিগন্ধি। সহরটা দেখিয়া বোধ হইল যে, ইহা পুরাকালে এতদঞ্চলের মধ্যে একটা খুব সমৃদ্ধ স্থান ছিল এবং এখনও বাজার, হাট, দোকান, স্কুল, পোষ্টাফিস সকলই আছে, কিন্তু পূর্বের স্থায় সে জাঁকজমক নাই। সহরের মধ্যে পুরাকালের সেই বানররাজের রাজধানীর কোন চিহ্নই নাই, এবং আধুনিক সময়ের দর্শনযোগ্যও কিছুই নাই। আমাদের পথপ্রদর্শক সহরের বাহিরে দুইটা স্থান দেখাইল, প্রথমটা পুরাতন ছত্রি, এইস্থানে ভগবান্দ্র ত্রৈলোক্যবানীবধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় স্থানটির সম্মুখে এইরূপ উলিঙ্গ যে, ভগবান্দ্র বানীবধ করিয়া স্ত্রীকে বানর-রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলে পর, সে রাজ্যসুখভোগে মত্ত হওয়ায় ভগবান্দ্রকে সীতা উদ্ধারে সাহায্য করিব বলিয়া যে পূর্বের সত্য করিয়াছিল, তাহা প্রায় বিস্মৃত হইয়া যায়। ভগবান্দ্র রামচন্দ্র লোকধর্ম অনুসারে নির্দিষ্ট

কাল অতীত হইলে একদিন লক্ষণের নিকট বিলাপ করিয়া স্ত্রীবেব অকৃত-  
জ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করেন। লক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরূপ হস্তে কিঙ্কিয়ার বাহিরে  
এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া স্ত্রীবেবের নিকট সম্বাদ পাঠান। স্ত্রীবেব সে  
সময় অন্তঃপুরে ছিল। তাহার নিকট লক্ষণের আগমন সম্বাদ পৌঁছিলে সে ভীত  
হইয়া হনুমান ও অঙ্গদকে লক্ষণকে সাব্দনা কবিয়া তাহার নিকট আনিবার  
জ্ঞাপাঠান। হনুমান ও অঙ্গদ অর্থাহস্তে এই স্থানে লক্ষণের সহিত মিলিত  
হইয়া তাহার ক্রোধ শান্তি পূর্বক তাহাকে অন্তঃপুরে স্ত্রীবেবের নিকট লইয়া  
বান এবং স্ত্রীবেবও সীতা অদ্বৈতার্থ চতুর্দিকে চব্ব মৈত্র প্রবেশ পূর্বক উক্ত  
চরদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলেন। আনি-  
গন্ধির অন্নদূরে ভুজভদ্রা নদীর তটে হান্সী সহবের নিকট প্রাচীন বিজয়নগ-  
রের আশ্চর্য ভগ্নাবশেষ দর্শন করা অতীব প্রীতিপ্রদ। এখানকার রাজা-  
রের মধ্যস্থ শিবালয়, শ্রীরামচন্দ্রের নির্মিত বিশাল মন্দির, প্রকাণ্ড বিষ্ণুমন্দির  
প্রভৃতি দেবস্থান, এবং পাথরের মধ্যে খোদিত পুরুবিগী ও কৃপ সকল  
দেখিবার যোগ্য। এই নগরের পরিধি প্রায় ৮ মাইল।

আমবা আনিগন্ধি হইতে এক ক্রোশ দূরে পূর্বকথিত ঋষামুক পর্বতের  
বে অংশ ভুজভদ্রা নদীর বাম তটে অবস্থিত, তাহারই কোলে পম্পা সরো-  
বরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সরোবরের পরিমাণ উপস্থিত ১৫২০ বিঘা হইবে।  
ইহার চারিপাড় পাথরের সিঁড়ি দিয়া বাধান, এখন স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া  
গিয়াছে। ইহার পাশ্বেই মাতঙ্গ সরোবর, উপস্থিত একটা ঘোবার আকারে  
রহিয়াছে। এখনও পম্পায় সেই—বামাঘণবর্ষিত প্রকল্প কঙ্কাল কুমুদ ফুলে  
ভূষিত, হংস ও কারওব কুলে পরিবৃত, চক্রবাক প্রভৃতি কলচর পক্ষী  
সমূহ দ্বারা শোভিত এবং জলকুট, টিউভ ও ক্রৌঞ্চদিগের কুঞ্জে প্রতি-  
ধ্বনিত, একক্রোশ বিস্তীর্ণ অগাধ, সাধুদিগের হৃদয়ের গ্রাঘ স্বচ্ছ জল রাশি  
এবং নানাবিধ কুসুমিত লতাকালে ও বিবিধ ফলভাবে মন্ত্র তরুসমূহে আবৃত,  
বিবিধ কুসুম গন্ধে সুবাসিত তীব্রভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পূর্বের শোভা  
এখনও সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হয় নাই। এখনও এস্থান দেখিয়া দর্শক নিশ্চয়ই প্রীতি  
লাভ করিবেন। ইহারই নিকট মাতঙ্গ মুনি ও অপরাপব ঋষিদিগের আশ্রম  
ছিল। এই থানেই সিন্ধু শবরী শ্রমণা নারী তাপসী মহর্ষিগণের গুহ্যপারাংগা  
হইয়া বহুসংখ্যক বৎসর বাস করিবেন। মহর্ষিগণ সম্ভূত হইয়া ব্রহ্মলোক গমন  
কালীন তাহাকে এই আদেশ কবিয়া বান যে, বৎসে! তুমি সমাধি অবলম্বন

করিয়া এই স্থানে বাস কর। সনাতন পুত্রমাত্মা রাক্ষসকুলের বিনাশ ও স্ববিগ্ধের রক্ষার নিমিত্ত দশরথের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি স্থিরচিত্তে ধ্যানাবলম্বন করিয়া সেই বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা কর; এক্ষণে সেই প্রভু চিরকূট পৰ্ব্বতে বাস করিতেছেন। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ এখানে না আসিবেন, তাবৎকাল শরীর ধারণ করিও। পরে ভগবান্কে সমান্ত দেবিতামাত্র অনলমধ্যে নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। ওদিকে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ইহারই নিকটবর্তী স্থানে কবন্ধ বধকালীন তাহার মুখে শবরী তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ করিয়া সমুখবর্তী আশ্রমে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন ওনিয়া লক্ষণের সহিত শবরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তত্ত্বপরায়াণা শবরী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সানন্দে গাত্রোত্থান পূর্বক প্রণাম, পাদপ্রক্ষালন, অৰ্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা ও তাঁহার আতিথ্য সংকার করেন। পরে ভগবান্ বর্জুক সীতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে শবরী কহিল, হে গণ্ডো! আপনি ব্রহ্মজ, সকলই জানেন, তথাপি লোকব্যবহারামুযায়ী হইয়া আমাকে এ বিষয় বহিঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল, হে ভগবন্! রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সীতা লঙ্কায় অবস্থিতি করিতেছেন। বানর-রাজ বালী কর্তৃক পরাজিত ও হতসর্বশ্ব হইয়া তাহার ভ্রাতা সু-গ্রীব মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত পম্পা সমীপে, মাতঙ্গ শাণ্ডে বালীর অগ্ৰহাৎ প্ৰথমক পৰ্ব্বতে বাস করিতেছে; এক্ষণে আপনি তাহার সহিত সন্ধ্যা করুন; সে আপনার সকল কার্য সম্পাদন করিবে। শবরী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণান্তর, তাঁহারই সমুখে অগ্নি প্রবেশ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে অবিদ্যাজনিত সংসার বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীরামের প্রসাদে অতি তুল্য মুক্তিলভ করিয়াছিলেন। এখন সে সকল আশ্রমের কোন চিহ্ন নাই, কেবল পম্পাকূলে একটা শ্রীশৈলবর্ধিণের আখড়া আছে; এখানে জন কতক সাধু থাকেন। ইহার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি আছে, এখানকার লোকেরা বলেন যে, এই আখড়া বা মঠই পুরোক্ত ঋষিগণের আশ্রমস্থান। বাহা হউক, আমরা প্রথমে মাতঙ্গ সরোবরে আচমন ও জল স্পর্শ করিয়া পম্পা প্রদক্ষিণান্তর উহাতে স্নানাদি করিলাম ও পরে পাৰ্শ্বস্থ আখড়া বা মন্দির দর্শন করিয়া পম্পাকূলে ব্রহ্মতলে আনিগন্ধি হইতে সংগৃহীত জল ধাবার খাইয়া বিপ্রায় করিতে লাগিলাম।



বিশ্রামান্তে আমরা এখান হইতে বাহির হইয়া প্রায় দেড় পোয়া পথ আসিয়া অঙ্গন গিরি বা অঙ্গন শৈলের নিকট পৌঁছিলাম। পাহাড় খুব উচ্চ নহে, তবে বৃক্ষলতাদি দ্বারা অলঙ্কৃত। পর্বত নিম্ন হইতে পোয়াটাক পথ উপরে উঠিলেই একটা গুহার পৌঁছান যায়; গুহার মধ্যে হনুমানের মূর্তি আছে। পথপ্রদর্শকের মুখে শুনিলাম যে, এই গুহার মধ্যেই অঙ্গনাত হনুমান জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহাবই মাতাব নাম অনুসারে ইহার অঙ্গন গিরি নাম হইয়াছে। পূর্বে এই পর্বতোপরে জলের বরগা আদৌ ছিল না; হনুমান পিপাসার্ত হইয়া, উচ্চ গুহার বাহিরে পর্বত তাড়না করায়, একটা বরগার উৎপত্তি হয়, এখনও গুহার বাহিরে সেই প্রস্রবণের মুখ বা উৎপত্তিস্থান বিদ্যমান আছে। এই পাহাড়ে উক্ত গুহা ভিন্ন আর কোন দেখিবার স্থান নাই।

আমাদের পথপ্রদর্শক বলিল যে, এই স্থান হইতে তুঙ্গভদ্রার পরপারে পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির এক মাইল মাত্র; কিন্তু এ স্থানে তুঙ্গভদ্রা নদী পার হইবার খেয়া নাই, জলে নামিয়া পার হইতে হইবে, আর যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছি, সেই রাস্তা দিয়া অর্থাৎ আনিগন্ধি হইয়া পম্পেশ্বর ঘাইতে হইলে ৭ মাইল পথ চলিতে হইবে। অতএব আপনারা কোন্‌পথে ঘাইবেন? আমরা খেয়ার জন্ত অনর্থক ৭ মাইল পথ হাঁটা অপেক্ষা কষ্ট স্বীকার পূর্বক নদী পার হইয়া প্রথমোক্ত পথে যাওয়াই প্রকৃত বোধে সেই পথেই অঙ্গন শৈল হইতে যাত্রা করিলাম। প্রায় এক মাইল পথ বরগার জলসিক্ত নদী-লতাদি পূর্ণ উঁচু নিচু পাক ভাঁজমি অতিক্রম করিয়া আমরা তুঙ্গভদ্রার সমীপে আসিয়া দেখিলাম, সম্মুখে পম্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির রহিয়াছে ও লোকেরা নদীজলে স্নান করিতেছে। এ পারে লোক ৬ন কেহই ছিল না, যে, জিজ্ঞাসা করিব, কোন্‌ স্থান দিয়া নদী পার হওয়া সুবিধাজনক; অধিকন্তু পথপ্রদর্শকও আমাদের আগে আগে থাকিয়া জলের পরিমাণ ঠিক করিয়া আমাদের পথপারে লইয়া ঘাইতে ভয় পাইতে লাগিল, কারণ, নদীতল প্রস্তরসঙ্কুল ও উঁচু নিচু। বাহা হউক, আমরা পথপ্রদর্শককে নিকটবর্তী ক্ষেত্র হইতে নদী পার করিয়া দিতে পারে, এমন লোক পরলা দিয়া চেষ্টা করিয়া আনিতে বলিলে, সে লোকের সন্ধানে ঘাইলে পর আমরা নদীতীরে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে পরপার হইতে একজন কৃষক নদী পার হইয়া আমাদের পারে আসিল; আমরা পথপ্র-

দর্শকে আমাদের নিকট আসিবার জন্য উচ্চঃস্বরে ডাকিলে, সে আমাদেব নিকট আসিল ; তখন তাহা দ্বারায় সেই পরপার আগত কৃষককে পারিশ্রমিক দিব স্বীকার করিলে সে আমাদের সঙ্গে কবিতা পরপারে লইয়া যাইতে সম্মত হইল। এ স্থানেব নদীব বিস্তার দুই ফাবলঙ হইবে। আমরা সকলে নদী জলে উপস্থিত হইলে সৰ্ব প্রথমে সেই কৃষক জলের অবস্থা নির্দেশ করিয়া চলিতে লাগিল, তাহার পিছু পিছু আমরা আপনাপন হস্তান্তিত লাঠির ভরে নদীব প্রবল শ্রোত সহ্য করিয়া কোথাও কোমর জল, কোথাও বুক জল ভাঙ্গিয়া পরপারে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থানে সেই কৃষককে কথিত পারিশ্রমিক দিয়া বিনায় দিলাম এবং পথপ্রদর্শকের নিকট বিদায় লইয়া আমবা পশ্চিমের মহাদেবেব মন্দিরস্থ ধ্বমশালায় আসিয়া ক্ষণেক বিশ্রামান্তে, গকব গাড়ি ভাড়া কবিতা হম্পেট ষ্টেশনে আসিলাম এবং রেলযোগে গন্তব্য স্থানে যাত্রা কবিতাম।

## স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ।

( ১ )

বর্ষে ; ২৪ মে, ১৮৯৩।

কল্যাণববেষু,

মা, তোমাব ও হবিপদ বাবাকিব পত্র পাইয়া পবম আত্মাদিত হইলাম। সৰ্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া চুঃখিত হইও না। সৰ্বদা শ্রীহবিব নিকট তোমাদেব কল্যাণ প্রার্থনা কবিতেছি। বেলগাঁওযে এক্ষণে যাইতে পারি না, কাবণ, ৩১ তারিখে এখান হইতে আমেরিকায় বণ্ডনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনবায় তোমাদের দর্শন করিব। সৰ্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সৰ্বদা মনে বাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকা মাত্র। সৰ্বদা পবিত্র থাকিবে। কাযমনবাক্যোতেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পবোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মম্মে রাগিও, কাযমনবাক্যোতে পতিসেবা করা শ্রীলোকেব প্রধানধর্ম। নিত্য যথাসক্তি গীতাপাঠ করিও। ভূমি \* \* দাসী কেন লিখিয়াছ ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও

দেবী লিখিব। বৈষ্ণৱ ও শূদ্রেরা দাস ও দাসী লিখিব। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস। অতএব আপনাপন গোত্র নাম অর্থাৎ পতির নামেব শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা,—অমুক মিত্র ইত্যাদি। আব কি লিখিব যা, সৰ্বদা জানিব যে, আমি নিরন্তর তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। এমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্য্য বিবরণ পূর্ণ পত্র আমি মধ্যো মধ্যো তোমায লিখিব। এক্ষণে আমি বস্বেতে আছি। ৩১ তাবিস পর্য্যন্ত থাকিব। খেতড়ি মহাবাজাব প্রাইভেট সেক্রেটারি আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। কিমধিকমিতি

আশীর্বাদক বিবেকানন্দ।

( ২ )

ওঁ নমো ভগবতে বামদেবায়।

২৮ শে ডিসেম্বর, ১৮৯০

George W Hale,

541, Dearborn Avenue,

Chicago.

কল্যাণববোধু,

ব্যবাজি, তোমার পত্র কাল পাইবাছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভাবতবর্ষেব খবরের কাগজে চিকাগো রুস্তান্ত হাজির বড় আশ্চর্য্যেব বিষয়, কবণ, আমি যাহা কবি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা কবি। এদেশে আশ্চর্য্যেব বিষয় অনেক। বিশেষ, এদেশে দাবিদ্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশেব জীদেব মত জী কোথাও দেখি নাই। সংপৃক্স আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশেব মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। যে দেবী স্তব্ধতি পুরুষেব গৃহে স্বয়ং জীর্ণপে বিরাজমানা, একথা বড়ই সত্য। এদেশেব ভুবার যেমন ধবল, তেমনি হাঙ্গাব হাঙ্গাব মেয়ে দেখেছি, আব এরা কেমন বাদীন। সকল কার্য্য এবাই কবে। জুগ, কলেক মেয়েতে ভবা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়ে ছেলের পংচ্যাব নো নাই। আব এদের কত দয়া। যতদিন এখানে এসেছি, এদের যেযেরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেক্চার দেবার সব বড়োবস্ত কবে, সঙ্গে কবে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে

পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণ মুক্ত হব না।

বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাজ্জ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিবাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে। এবং মন্ত্র মহাবাজ বলিযাছেন যে, “যত্র নারীস্তু নন্দান্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ” যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পবিত্রবাবের উপর ঈশ্বরের মহারূপ। এরা তাই কবে। আর এরা তাই এত সুখী, বিদ্বান্, স্বাধীন ও উদ্যোগী। আর আমবা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল জামবা পশু, দাস, উদামহীন, মহাদবিদ্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনী জাতি আর নাই। ইংবেজবা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর বাঞ্ছতে গেলে বোজ ৬ টাকার খাওয়া পবা বাদ দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা বোজ। একটা কুলী ছটাকা বোজের কম খাটেনা। কিন্তু খবচও তেমনি। চাবি আনার কম একটা খাবাপ চুকট মেলেনা। ২৪ টাকায় এক যোড়া মজবুত জুতো। যেমন বোজকার, তেমনি খবচ। কিন্তু এরা যেমন বোজকার করিতে, তেমনি খবচ করিতে।

আর এদের মেয়েবা কি পবিত্র। ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কাকব বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর তায় স্বাধীন। বাজার হাট, বোজকার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর সব কাজ কবে অথচ কি পবিত্র। যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত্ত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমবা কি করি? আমবা মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খাবাপ হয়ে যাবে। আমবা কি মাংস, বাবাজি? মন্ত্র বলেছেন, “কৃষ্ণাপ্যবং পালনীয়া শিক্ষনীতিয়দ্রুতঃ”, -- ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যা কবে বিদ্যা শিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমবা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশু-জন্ম ঘুচিবে না।

দ্বিতীয় দণ্ড শোক। যদি কাকব আমাদের দেশে নীচ-বলে জন্ম হয়, তাব আর আশা ভবসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপ? কি অত্যাচার। এদেশের সকলের আশা আছে, ভবসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে

দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত । গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৭ টাকা । সকলে চোঁচাচ্ছেন আমবা বড় গরীব, কিন্তু ভাবতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সত্তা আছে ? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে ? হে ভগবান্, আমবা কি মানুষ । ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারি দিকে, তাদের উন্নতির জন্ত তোমবা কি কবেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্ত কি কবেছ, বলতে পাব ? তোমবা তাদের ছোঁওনা, দূর দূর কর, আমবা কি মানুষ ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্ত কি করছেন ? খালি বলছেন, ছুঁ যোনা, আমায় ছুঁ যোনা । এমন সনাতন ধর্মকে কি কবে ফেলেছে । এখন ধর্ম কোথায় ? খালি ছুঁ মার্গ—আমায় ছুঁ যোনা ছুঁ যোনা ।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্ত উপায় দেখতে । সে উপায় কি, পরে জানতে পাব্বে, যদি ভগবান্ সহায় হন ।

এদেব অনেক দোষও আছে । ফল এই ধর্ম বিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে আন সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ । এদের সামাজিক ভাব আমবা গ্রহণ কবির আন এদেব আমাদের অদৃষ্ট ধর্ম শিক্ষা দিব ।

কবে দেশে যাব জানিনা, প্রভুব ইচ্ছা বলবান । তোমবা সকলে আমাব আশীর্বাদ জানিবে ।

ইতি বিবেকানন্দ ।

## পথঘাট পরিষ্কার রাখিবার প্রস্তাব ।

( নাবীথণের প্রতি নাবীর উক্তি )

প্রাতঃকালে ফকীরবা আমাদের ছুঁযাবে আসিয়া গাহিয়া যায়,—

সকাল বেলা ছড়া কাঁট সন্ধ্যাবেলা বাতি ।

লক্ষী বলেন সেইখানেতে আমারই বসতি ॥

গিণীবা আসব কবিতা ভিক্ষা দেন আন এই উপদেশপূর্ণ শ্লোকটি বউঝিকে শোনান । ঘব দোব পরিষ্কার রাখা যে কত প্রয়োজনীয়, এ কথা আমরা গাল্যাকান হইতে শিখি । ঘব সাজান, যথাহানে যথাযোগ্য সামগ্রী

বাধা, এখানে এটা, সেখানে সেটা না থাকে, জিনিষপত্রের পবিত্রতার পরিচ্ছন্নতা রাখা এ সকল আমবা নানী, আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার। যব দোরের পারিপাট্য ও স্নগ্ধতা দেখিতে আমরা ভালবাসি এবং আয়াস-সাধ্য ও সময়ব্যয় হইলেও, সে কার্যে যত্নশীল হইতে আমবা কুণ্ঠিত হই না। কেন ? ইহার কি প্রয়োজন ? তাহা জানি বা না জানি, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাদের প্রিয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের এই কার্যে পারি-বারিক বিশেষ মঙ্গল। বন্ধন-পাত্রে কলক থাকিলে ভোজ্যবস্তুর বিষময় হয়। এমন কি, সেই বিধে উপবিবার বিনষ্ট হইতে পারে। চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিমাতেই এই কথা ভূয়োভূয়ঃ বলেন। গৃহের এক পার্শ্বে জঞ্জাল থাকিলে গৃহ এরূপ দূষিত হয়, যে, তাহাতে ওলাউঠা ও প্লেগ উৎপন্ন হয়। যিনি জঞ্জাল রাখেন, তিনি তাহার গৃহে ঐ সকল উৎকট বোগকে যত্নপূর্বক স্থান দেন। আবর্জনাই উৎকট বোগের সূত্রশয্যা। প্রভু্যে উঠিয়া, গৃহস্থার গবাক্ষাদি মুক্ত করিয়া সূর্য্য দর্শন করি। গৃহে সূর্য্যবশি প্রবেশ করে, ধীরে ধীরে বায়ু বহিতে থাকে, গৃহদ্রব্যাদি সূর্য্যোদ্দীপ্ত ও পবিত্র হয়, গৃহ আনন্দ-ধাম হইয়া উঠে। যে গৃহে সূর্য্য প্রবেশ করে না, প্রভাত বায়ু বহে না, তাহার অবস্থা বড় শোচনীয়, সে গৃহ সঁয়াতসঁতে, অপরিচ্ছন্ন ও পীড়ার আবাস-ভূমি হয়। একটা ডাকের বচন আছে,—

পূবে হাঁস পশ্চিমে বাশ।

দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে, বাড়ী কবলে ভেড়ের ভেড়ে ॥

বচনটার সার্থকতা এই, পূর্বাদিক মুক্ত থাকিলে গৃহে আলোক প্রবেশ করিবে, পশ্চিমে পড়ন্ত বোদ্র পীড়িত করিবে না, উত্তরে তীব্র বায়ু দেহে বিদ্ধ হইবে না, দক্ষিণ পবনে শলীল দ্বিদ্ধ হইবে। পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন হইবে। যে গৃহে স্বাস্থ্য নাই, তথায় লক্ষ্য নাই। যথায় রোগ শোক, তথায় উপার্জন কোথায় ? স্বাস্থ্যে পবিত্রতার বর্দ্ধন হয়, এরূপ কার্য আমাদের ভার, আমরা আহ্লাদের সহিত সে ভার বহন করি। আমাদের প্রিয়জনদের মঙ্গল-সাধন ইচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে আমরা কুলাঙ্গনা মাতেই প্রস্তুত।

কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিদ্রাগৃহ স্নান ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে যত্নপূর্ণ বত্নশীল, পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নপূর্ণ লক্ষ্য, সাধারণতঃ স্বাস্থ্যসম্বন্ধে ও সহরের পারিপাট্য সম্বন্ধে সেরূপ যত্ন ও লক্ষ্য নাই। কিন্তু ভবিষ্য

দেখিলে বুঝা যায় যে, সাধাবগেব স্বাস্থ্য ও সহবেব পাদিপাট্যবক্ষা আমাদেব ও আমাদেব পবিবাববর্গেবই সম্পূর্ণ প্রয়োজন । যে পথে আমবা গঙ্গা স্নানে গাই, তাহা যদি যথানিয়মে পবিষ্কৃত না হয়, তাহা যদি আবর্জনা, পুতি ও অশুচি দ্রব্যে বিকৃত ও বীভৎস অবস্থায় থাকে, তাহাতে আমাদেব বিপদ । যখন ঐ অপবিচ্ছন্নভাঙ্গনিত, পল্লীস্থিত কোনও গৃহস্থেব আবাস প্রেগেব কুৎসিত পক্ষাচ্ছাদিত হইবা অন্ধকাবময় হয়, তখন কি আমাদেব পবিচ্ছন্ন ও সন্তানবর্গেব সঙ্গট উপস্থিত নয় ? জীবনে মরণে মল্লযোব দায়িত্ব কেবল আপনাব ও আপনাব পবিবাবেব নিমিত্ত নয়, ওত্যেক ব্যক্তিৰ মঙ্গল বা অমঙ্গলে, সমাজেব মঙ্গল বা অমঙ্গল ।

আমাদেব নিজ নিজ গৃহ আমাদেব প্রিয় বাস্য । আমাদেব গৃহ-বক্ষাব গোঁবৰ তথায় বাস্তুবীৰ শ্রায় বিবাজিত, তথায় সকলই পবিষ্কাব ও পবিচ্ছন্ন । কিন্তু পবিত্র শ্রদ্ধামূর্তি উদয় কালীন যখন স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন কবি, তখন যদি পথ ঘাট, আমাদেব গৃহেব শ্রায় পবিচ্ছন্ন ও সন্দব দেখিতে পাই, তাহাতে কি আমাদেব আনন্দ হয় না ? যখন ইষ্টমূর্তিব উচ্চ ধ্যানে নিমগ্ন হইবা আসিতেছি, পথ ঘাট শুচি অবস্থায় থাকিলে সেই উচ্চ ধ্যানেব যে সহকাৰী হয়, তাহা কুলস্ত্রী নাহেই সত্য বলিয়া দীক্ষাব কবিবেন । এই নিমিত্ত মঙ্গলময়ী জননী তাঁহাব গৃহ প্রাঙ্গণেব শ্রায়, পথ ঘাট পবিমার্জিত দেখিতে ইচ্ছা কবিবেন । এ শুভ ইচ্ছা কি সম্পূর্ণ হয় না ? পথ ঘাট মার্জিত বাখিতে আমাদেব সাহায্যেব কি প্রয়োজন ? যদি সরকারী সমার্জনকালীনদেব কার্যেব উপব আমাদেব লক্ষ্য থাকে, কিরূপ কার্য হইতেছে আমবা দেখি, তাহা হইলে তাহাবা অচি্রে বৃত্তিতে পাবিবে ও নিজকার্যে সমধিক মনোনিবেশ কবিলে । যদি পল্লীত সকলে প্রতিনিয়ত আন্দোলন কবতঃ যাহা ব্রটি হইতেছে, স্থিৰ কবি এবং মিউনিসিপাল সভায়, গাঁহাদেব উপব কার্যভাব অর্পিত, আমাদেব যাহা শ্রায়া প্রযোজন, জ্ঞাপন কবি—বাধ্য হইবা সেই মিউনিসিপাল সভা আমাদেব প্রস্তাব শুনিবেন । সরকারী পথ যদি ভালরূপে সম্মার্জিত না হয়, বিবেচনা কবিয়া দেখিলে তাহা কতক পবিমাণে আমাদেব দোষে, ও সে দোষ সহজেই সংশোধিত হইতে পাবে । যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য বাখিলে কার্য সূচাকরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অতি সামান্য আয়াসসাধ্য ।

প্রত্যয়ে ৫টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পথেব আবর্জনা হানাস্থবিত কবিবাব স্তম্ভ মথলা গাড়ি ঘুরিয়া যায় । গৃহস্থেব বন্ধনশালাব আবর্জনা, উচ্ছিষ্ট দ্রব্য, পাতা

ডাঁটা, এটা সেটা পবিত্যক্ত ভোজ্য, ভক্ষ্য পাত্র প্রভৃতি প্রতিদিন গৃহের বহির্দেশে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে নিক্ষেপ করা উচিত। কাহারও কাহারও অমনোযোগে বশতঃ ময়লাফেলা গাড়ি আসিবার অগ্রে ঐ সকল আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয় না। প্রতি ভোজের পব উদ্ভিষ্ট দ্রব্যাদি দাস দাসীবা পথে আনিয়া ফেলে, স্তূতরাং বাতাব অবস্থাও শোচনীয় হয়। এই বীভৎস দৃশ্য দূর করা, দাস দাসীকে নিবারণ করিলে অতি সহজ হইতে পারে। আমরা অনেক তাজ্য বস্ত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে পাবি। দুইটা বস্ত্র দগ্ধ করা 'নিতান্ত প্রয়োজন। ঐ দুইটা বস্ত্র কখনই বাতায় নিক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রথম,—ছিন্ন কাগজ খণ্ড। ছিন্নকাগজখণ্ডে আবৃত পথ সমাধিস্ত করা অতি কঠিন। যে কুলারনা তাহা দেখেন নাই, তাহাব বিশ্বাস হইবে না। ঐ কাগজখণ্ড একেবারে পবিস্কার করিয়া লইয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। হেতায় দেখায় ছিন্ন কাগজ গলিত হইয়া পড়িয়া বহিয়াছে, এ দৃশ্য অতি ঘৃণিত। উহা দগ্ধ করিলে একরূপ জঞ্জাল হয় না। দ্বিতীয় বস্ত্র চিকিৎসাব আবর্জনা; ইহা দগ্ধ করা অতীত কঠিন, যথা বাড় বাঁধা চিড, পুলগীস, দেহস্থ হৃষ্ট দ্রব্য। এ সকল যদি পুড়াইয়া ফেলা না হয়, অপবের বিপদের কারণ হইয়া উঠে, তাহার আব সন্দেহ নাই।

দেবার্জনায় অর্পিত পুষ্প, পবিত্র অগ্নিব্যতীত রাখিবার জাব স্থান কোথায়? প্রতিগৃহে জালানি কাষ্ঠ বা কয়লা সঞ্চল না হইতে পাবে সভ্য, কিন্তু অবহাগত যাহা হিতকর কার্য্য, তাহা করিতে পাবি নিশ্চিত। আমরা কি পবিস্কার ছাই, চণ ও আগকাতরা যেক্রপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, সেইক্রপে ব্যবহার করি? অনেক গৃহের আবর্জনা বাধা হইয়া বাস্তার ধারে রাখিতে হয়। যথাব শুষ্ক মৃত্তিকা, তথায় রাখিলে, তাহা পবিস্কার করিবার সুবিধা। অনেকে ঠাহাদের আবর্জনা, যে গলিতে মাথব আনাগোনা করে, সেই গলির কোণে বা যথাব জলের নল ফাটিয়া গিয়া জল বাহির হইতেছে, সেই খানে বাখে। তাহাতে ঐ জঞ্জাল হইতে দুর্গন্ধময় মৃত্তিকাঃ শোষিত হয় এবং শীঘ্রই তাহা অধিকতর কর্কশ ও দুর্গন্ধময় হয়। কিন্তু ঐ সকল অবস্থায় শুষ্ক চূণ বা ভস্ম, মৃত্তিকা ও আবর্জনার মধ্যে বাধা প্রয়োজন। জঞ্জালবহনের বুড়ির অভ্যস্তব আলকাতরা দ্বারা কঠিন করা উচিত এবং জঞ্জাল বহনের পর প্রতিদিন তাহাতে ছাই দেওয়া কর্তব্য। এতদ্বারা বুড়ি অপরিষ্কৃত হইতে পারে না এবং পৃতিদ্রব্য তাহাতে থাকে না। আমাদের বস্তুপাড়াব হই



তিনটা আবজ্ঞনা রাখিবার আধার আছে। নিকটস্থ আধারে দৈনন্দিক যে সকল আবজ্ঞনা জন্মে, তাহা সহজেই নিক্ষেপ করা যায়। এই উপায় অবলম্বনে ময়লা বহনের কার্য্য অতি সহজ হয় এবং সুচাক্ষুণ্ডে সম্পূর্ণ হইবার আশা করা যায়। কিন্তু যদি ঐরূপে জঞ্জাল ফেলিবার আধার ব্যবহৃত না হয়, সকলে যদি ঐরূপ কার্য্য না করেন, তাহাহইলে আমাদের পরিচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বিফল হইবে। কর্ণওয়ালিস স্ট্রাটের বুনাবন বস্তুর লেনে, ১ নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যবক্ষাব আফিস আছে। তাহার কর্মচারীরা বস্তুপাড়ার পবিমার্জন সম্বন্ধে যাহা অভাব, তাহা শুনিতে প্রস্তুত এবং তাহা পূরণ করিতে সম্পূর্ণ সম্মত। ১৭ নং বস্তুপাড়া লেনে যাহাব যাহা অভিপ্রায়, লিখিয়া পাঠাইয়া দিলে তাহা ঐ আফিসে জানান হইবে। আমাব নিশ্চিত ধাবণা, যদি আমরা সাধাবণের পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতা প্রযোজন সম্পূর্ণ অমুদ্রাবন করি এবং যথাসাধ্য আমাদেব পল্লীতে এ বিযয়ের উন্নতি সাধনের চেষ্টা পাই, তাহাতে রাস্তা ও গলি, যথায় হিন্দুব আবাস আছে, সম্বরে সমধিক পবিচ্ছন্ন হইবে এবং ঐরূপ অবস্থা দৃষ্টে চিন্তপ্রসাদ লাভ কবিব।

নিবেদিতা। ১৭ নং বস্তুপাড়া লেন, কলিকাতা।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতিতে বিগত ২৫শে জুন ও ২রা জুলাই মাস্ত্রাজ মঠের স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা কবিযাছিলেন।

জুলাই মাসেব ডন পত্রিকায় মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক বঙ্গাচার্য্য জাতীয় উপায়ে সমাজসংস্কার নামক একটা সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধলেখকের মতে নিম্নলিখিত কয়েকটা উপায় অবলম্বন কবিলে হিন্দুসমাজেব সংস্কারকার্য্য অতি সহজসাধ্য হইতে পারে। (১) প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষিত পণ্ডিত মণ্ডলীকে আধুনিক উদার শিক্ষাপ্রদান (২) নব্যশিক্ষিতগণকে প্রাচীন শাস্ত্রেব মধ্যে শিক্ষিত করা। (৩) প্রাচীন ও নব্য তত্ত্বেব শিক্ষিতগণেব মধ্যে মধ্যে সম্মিলন দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতিব ভাব দৃঢ়ীকরণ (৪) অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে হিন্দুধর্ম ও পাশ্চাত্যজ্ঞান বিস্তারের জন্য প্রচারকমণ্ডলী গঠন।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

উদ্বোধনের ৭ম নিয়মানুসারে আমরা বৎসবেব যে সময়েই হউক এক মাস ছুটি লইতে পারি। তদনুসারে ১লা ভাদ্রের উদ্বোধন আপাততঃ বন্ধ থাকিল। পরে আর এক পক্ষের জন্ত ছুটি লওয়া বাইবে।

---

### শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত । \*

( শ্রীম—কথিত । )

ঠাকুর বামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে ; কলিকাতায় চৈতন্যলীলাদর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(রাখাল, নারায়ণ, নৃত্যগোপাল ও ছোটগোপালের সংবাদ ।)

আজ রবিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৮৮৪। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন। রাম, মহেন্দ্র (মুখুণ্ডে), চুনিলাল, বাফার ইত্যাদি অনেকে আছেন।

চুনিলাল সবে শ্রীকৃষ্ণাবন হইতে ফিরিয়াছেন। সেখানে তিনি ও রাখাল, বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। রাখাল ও বলরাম এখনও ফেরেন নাই। নৃত্যগোপালও বুদ্ধাবনে আছেন। ঠাকুর, চুনিলালের সহিত কৃষ্ণাবনের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাখাল কেনন আছেন?

---

\* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রথম ভাগ, মূল্য এক টাকা, বঁধান মূল্য পাঁচ সিকা। ঠিকানা—শ্রীশান্তিরাম ঘোষ, ৫৭ নং রামকান্ত বস্তুর ট্রাট, বাগবাজার বা শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্ত, ১৩১২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ।

চুনি। আজ্ঞে, তিনি এখন আছেন ভাল।

শ্রীৰামকৃষ্ণ। নিতাপোপাল আসবেনা ?

চুনি। এখনও সেখানে আছেন দেখে এয়েছি।

শ্রীৰামকৃষ্ণ। তোমার পরিবাবনা কার সঙ্গে আসছে ?

চুনি। বলরাম বাবু বলেছেন, ভাল উপযুক্ত লোকের সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। নাম দেন নাই।

ঠাকুর মহেন্দ্ৰ মুখুয্যের সঙ্গে নারায়ণের কথা কহিতে লাগিলেন। নারায়ণ স্থলে পড়ে। ১৬।১৭ বৎসর বয়স। ঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে আসে। ঠাকুর বড় ভালবাসেন।

শ্রীৰামকৃষ্ণ। খুব সবল, না ?

‘সবল’ এইকথা বলিতে ঠাকুর যেন অমনন্দে পৰিপূর্ণ হইলেন।

মহেন্দ্ৰ। আজ্ঞে হাঁ, খুব সবল।

শ্রীৰামকৃষ্ণ। তাব মা সেদিন এসেছিল। অভিমানী দেখে ভয় হলো। তাব পর তোমরা এখানে আসো, কাপ্তেন আসে, এসব সেদিন দেখতে পেলে। তখন অবস্থা ভাবলে যে, শুধু নাবাগ আসে আব আমি আসি, তা নয়। ( সকলের হাস্য )।

“মিছবি এসবে ছিল, তা দেখে বললে, বেশ মিছবি। তবেই জানলে, শাবাব দাসার কোন অসুবিধা নাই।

“তাদের সামনে বুলি বাব্বাবনে বল্লুম, নারায়ণের জ্ঞান আব তোব জ্ঞান এই সন্দেশ জুলি বেখে দে।

“তাব পর গণির মা ওকা সব বললে, যাগো, নৌকা ভাডাব জ্ঞান বা কবে।

“তারপর আমায় বললে যে, আপনি নাবাগকে বলুন, যাতে বিখে কবে। সেকথায় বল্লুম, ও সব অদৃষ্টের কথা। ওতে কথা দেবো কেন ? ( সকলের হাস্য )।

“ভাল করে পড়াশুনো করে না; তাই বললে, আপনি বলুন, যাতে ভাল করে পড়ে। আমি বল্লুম, পড়িসবে। তখন আবার বলে, একটু ভাল কবে বলুন। ( সকলের হাস্য )।

শ্রীৰামকৃষ্ণ ( চুনির প্রতি )। ইয়াগা, গোপাল আসে না কেন ?

চুনি। রক্ত আমেশা হয়েছে।

শ্রীৰামকৃষ্ণ। ওষুধ পাচ্ছে ?

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও থিয়েটার (theatre), মহাত্মা ও  
বেশ্যার অভিনয়।)

ঠাকুর আজ কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্তলীলা দেখিতে বাইবেন। ষ্টার থিয়েটারের তখন যেখানে অভিনয় হইত, আজ কাল সেখানে ক্লাসিক থিয়েটার হয়। মহেক্স মুখুয্যের সঙ্গে তাঁহার গাড়ি করিয়া অভিনয় দেখিতে বাইবেন। কোন্‌খানে বসিলে ভাল দেখা যায়, সেই কথা হইতে লাগিল। কেউ কেউ বললেন, এক টাকার সিটে বসলে বেশ দেখা যায়। রাম বললেন, কেন, উনি বক্সে (Box) বসবেন।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্তদেব, নিতাই এসব অভিনয় তারা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদেব প্রতি)। আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো।

“তারা চৈতন্তদেব সেজেছে, তা হুই বা। শোনার আতা দেখলে সত্যকার আতা উদ্দীপন হয়।

“একজন ভক্ত রাস্তায় যেতে যেতে দেখে, কতকগুলি বাবলা গাছ রয়েছে। সেই গাছ দেখে ভক্তটি একেবারে ভাবাবিষ্ট। তার মনে হয়েছিল যে, ঐ কাটে শ্রামশ্রুতের বাগানের কোদালের বেশ বাট হয়। অমনি শ্রামশ্রুতকে মনে পড়েছে।

“যখন গড়ের মাঠে বেলুন ওঠা দেখতে আশা নিয়ে গিছিল, তখন একটি সাহেবের ছেলে একটা গাছ ঠেসান দিয়ে দ্বিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেগাও লা, অমনি কৃষ্ণের উদ্দীপন হলো। অমনি সমাধিস্থ হয়ে গেলাম।

“চৈতন্তদেব খেড়গাঁ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গুলেন, এই গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ের হয়। বাই শোনা, অমনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন।

“শ্রীমতী মেঘ কি ময়ূরের কণ্ঠ দেখলে আর স্থির থাকতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়ে বাহশৃঙ্গ হয়ে যেতেন।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

“শ্রীমতীর মহাত্মা। গোপীপ্রেমে কোন কামনা নাই। ঠিক ভক্ত যে, কে কোন কামনা করে না। কেবল ওঁর ভক্তি প্রার্থনা করে; কোন নক্তি কি দিকাই কিছু চায় না।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

( ঈশ্বরলাভ ও অষ্টসিদ্ধি । সিদ্ধাই ও অহঙ্কার । )

“সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল । জ্যাটা আমায় খেবালে ;—একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন সময় একটা ঝড় এলো । ঝড়ে তার কষ্ট হলো বলে সে বললে, ঝড় থেমে যাক । তাব বাঁকা মিথ্যা হবার নয় । একখানা জাহাজ পালভরে যাচ্ছিল । ঝড় হঠাৎ থামাও যা, আব জাহাজ টুপ কবে ডুবে গেল । এক জাহাজ লোক সেই সঙ্গে ডুবে গেল । এখন এত গুলি লোক যাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওব হলো । সেই পাপে সিদ্ধাইও গেল, আবাব নয়কও হলো ।

“একটি সাধুব খুব সিদ্ধাই হয়েছিল আব সেই কৃত্ত অহঙ্কারও হয়েছিল । কিন্তু সাধুটি লোক ভাল ছিল আব তাব তপস্শাও ছিল । ভগবান্ ছয়বেশ সাধুব বেশ ধরে একদিন তাব কাছে এলেন । এসে তাব কাছে বল্লেন, মহাবাজ্জ, শুনেছি, তোমাব খুব সিদ্ধাই হয়েছে, সাধু খাতিব কবে তাঁকে বসালেন । এমন সময় একটা হাতি সেখান দিখে যাচ্ছে । তখন নূতন সাধুটি বল্লেন, আচ্ছা মহারাজ্জ, আপনি মনে কব্ল এই হাতিটাকে মেবে ফেলতে পাবেন ? সাধু বল্লেন, ‘যাসা হোনে শক্তা,’ এই বলে ধূলা পড়ে হাতিটার গায়ে দেখাতে সে ছটফট করে মরে গেল । তখন যে সাধুটি এসেছে, সে বললে, আপনাব কি শক্তি ! হাতিটাকে মেবে ফেল্লেন । সে হাঁসতে লাগলো । তখন ও সাধুটি বললে, আচ্ছা, হাতিটাকে আবাব বাঁচাতে পাবেন ? সে বললে, ‘ওভি হোনে শক্তাহে ।’ এই বলে আবাব যাই ধূলা পড়ে দিলে, অমনি হাতিটা ধড়মড় করে উঠে পড়লো । তখন এ সাধুটি বললে, আপনাব কি শক্তি ! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি । আপনি এই যে হাতি নাবল্লেন, আর হাতি বাঁচালেন, কিন্তু আপনাব কি হলো ? নিজেব কি উন্নতি হলো ? এতে কি আপনি ভগবান্কে পেলেন ? এই বসিয়া ও সাধুটি অন্তর্দ্বন্দ্ব করলেন ।

“ধর্ম্মেব সূক্ষ্ম গতি । একটু কামনা থাকলে ভগবান্কে পাওয়া যায় না । ছুঁচেব ভিতর যতো যাওয়া একটু বেঁটা থাকলে হয় না ।

“কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই, আমাকে যদি লাভ করতে চাও, তা হলে অষ্ট সিদ্ধিব একটা সিদ্ধি থাকলে হবেনা ।

“কি জান : সিদ্ধাই থাকলে অহঙ্কার হয়, তখন ঈশ্বরকে ভুলে যায় ।

“একজন বাবু এসেছিল—ট্যারা। বলে, আপনি পরমহংস, তা বেশ, একটু স্বস্তায়ন করতে হবে। কি হীনবুদ্ধি! পবমহংস আবার স্বস্তায়ন করতে হবে।

“স্বস্তায়ন করে ভাল কবা, সিদ্ধাই। অহংকাবে জেঁখব লাভ হয় না। অহংকার কিরূপ জান ? যেন উঁচু টিপি, বুটির জল জমেনা, গড়িয়ে যায়। নীচু জমিতে জল জমে আব অন্ধুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।

“হাজরাকে তাই বলি, আমি বুদ্ধিছি, আর সব বোকা, এ বুদ্ধি কয়োন।

“সকলকে ভাল বাসতে হয়। কেউ পর নয়। সর্বভূতে সেই হরিই আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রহ্লাদকে ঠাকুর বললেন, তুমি বর নাও। প্রহ্লাদ বললেন, আপনার দর্শন পেয়েছি আমার আর কিছু দরকার নাই। ঠাকুর ছাড়লেন না। তখন প্রহ্লাদ বললেন, যদি বর দেবে, তবে এই বর দেও, আমার যা বা কষ্ট দিচ্ছে, তাদেব অপরাধ না হয়।

“এব যানে এই যে, হরি একরূপে কষ্ট দিলেন। সেই লোকদের কষ্ট দিলে হরির কষ্ট হয়।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুর বামকৃষ্ণ ও জ্ঞানোন্মাদ। জ্ঞানোন্মাদ ও জাতিবিচার।]

“শ্রীমতীর প্রেমোন্মাদ। আবার ভক্তি উন্মাদ আছে। যেমন হনুমানের। সীতা আগুনে প্রবেশ করেছে দেখে রামকে মারতে যায়। আবার আছে জ্ঞানোন্মাদ। এক জন জ্ঞানী পাগলের মত দেখিছিলাম। কালীবাড়ির সবে প্রতিষ্ঠা পর। লোকে বললে, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সভার একজন। এক পায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে ককি আর একটি তাঁড়, আঁবচার। গলায় ডুব দিলে। তারপর কালীষবে গেল। হলধারী তখন কালীদয়ে বসে আছে। তারপর মন্ত হয়ে শুব করতে লাগলো।

শুব ।

ক্ৰোঃ ক্ৰোঃ পট্টাঙ্গধারিণীঃ ইত্যাদি ।

“কুকুরের কাছে গিয়ে কান ধরে তার উচ্ছিষ্ট খেলে, —কুকুর কিছু বলে নাই।

“আমারও তখন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে। আমি হৃদয়ের গলা ধরে বললাম, ওরে স্নেহে, আমারও কি ওই দশা হবে ?

“আমার উদ্বেগ অবস্থা। নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাশ ঝাড়ে করি বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বললে, ওই উদ্বেগ হায।

“সে অবস্থায় জাত বিচার কিছু থাকতেনা। একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁদে আমায় পাঠাতো, আমি খেতুম।

“কালী বাড়িতে কাজালিরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাধাষ আর মুখে ঠেকানুম। হলধারী তখন আমায় বললে, তুমি করছিস কি ? কাজালীদের এঁটো খেলি ; তোব ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন কবে ? আমার তখন রাগ হলো। হলধারী আমার দান্য হয়। তা হলে কি হয় ? তাকে বললাম, তবেই শালা, তুমি না গীতা, বেদান্ত পড় ? তুমি না শেখাও, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ? আমার আবার ছেলেপুলে হবে তুমি ঠিকেরেছ ! তোর গীতা-পাঠের মুখে আওণ।

(মাকীরের প্রতি)। দেখ, শুধু শ্রদ্ধাভ্রান্তে কিছু হয় না। রাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বহুত পায়, হাতে আনা বড় শক্ত।

ঠাকুর আবার নিজের জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

“সেজো বাবু সঙ্গে কদিন বজরা করে যাওয়া খেতে গেলাম। সেই যাত্রায় নবদ্বীপেও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখলাম, মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি। সেজোবাবু জিজ্ঞাসা কবলে, বাবা, ওখানে কি করছো ? আমি বললাম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজো বাবু বুঝেছে যে, ইনি এবারে চেয়ে খেতে পারেন। তাই বলে, বাবা, সব এসো।

“এখন কিন্তু আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাবো।

“কি অবস্থা সব গেছে ! দেশে চিনে সাকরা আর আব সময়সীদের বললাম, ওরে তোদের পায় পড়ি, তোরা একবার হরিবোল বল। সকলের পায় পড়তে হাই, তখন চিনে বললে, ‘ওরে, তোর এখন প্রথম অন্নরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে বধন ধূলী শুড়ে, তখন আমি গাছ, তেঁতুল গাছ সব এক বোধ হয়। এটা আঁব গাছ, এটা তেঁতুল গাছ, চেনা যায় না।’”

( ঠাকুর রামকৃষ্ণ ; সংসারী ও সৰ্ব্বভাগী । )

একজন ভক্ত । এই ভক্তি উন্নাদ কি প্রেম উন্নাদ কি জ্ঞান উন্নাদ সংসারী লোকের হলে কেমন করে চলবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সংসারী ভক্ত দৃষ্টে ) যোগী দুরকম । ব্যক্ত যোগী আর গুপ্ত যোগী । সংসারে গুপ্ত যোগী । কেউ তাকে টের পায় না । সংসারীর পক্ষে মনে ত্যাগ, বাহিরে ত্যাগ নয় ।

বাম । আপনার ছেলে কুলোনো কথা । সংসারে জানী হতে পারে, বিজ্ঞানী হতে পারে না ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । শেষে বিজ্ঞানী হয় হবে । জ্ঞোব করে সংসার থেকে চলে আসা ভাল নয় ।

বাম । কেশব সেন বলতেন, ঙ'র ( পরমহংসদেবের ) কাছে লোকে অত যায় কেন ? একদিন কুটুস করে কামড়াবেন, তখন পালিয়ে আসতে হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কুটুস করে কেন কামড়াব ? আমি ত লোকদের বলি, এও কব ওও কর, সংসার ও কর ঈশ্বরকেও ডাক । আমি ত সব ত্যাগ কবুতে বলি না ।

( সহাস্তে ) । “কেশব সেন একদিন লেকচার দিলে, বল্লে, হে ঈশ্বর, এই কব, যেন আমবা ভক্তিনদীতে ডুব দিতে পারি আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সংগম্নে যিয়ে পড়ি । যেযেবা সব চিকের ভিতরে ছিল । আমি কেশবকে বল্লাম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে ? তাহলে এঁদের ( যেরে-দের ) দশা কি হবে ? এক একবার আভাষ উঠে আবার ডুব দিও আবার উঠে । কেশব আর সকলে হাসতে লাগলো ।

“হাজরা বলে, তুমি বড়ো গুণী লোক বড় ভালবাস । বাবের টাকা, কড়ি, মান সন্মম খুব আছে । তা যদি হলো, তবে\* হবিশ, নটো ওদের ভালবাসি কেন ? নরেন্দ্রকে কেন ভালবাসি ? তার ত কলাপোড়া খাবাব নুন নাই ।

\*

\*

\*

ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বরের বাহিরে আসিলেন ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে ক্লাউ ভলার দিকে যাইতেছেন । একটা ভক্ত গাড়ু ও গামছা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন । কলিকাতার আজ চৈতন্যসীমা দেখিতে যাইবেন, সেই কথা হইতে লাগিল ।



শ্রীরামকৃষ্ণ (মার্টারের প্রতি) । রাম সব রজোগুণের কথা বলছে ।  
এত বেশী দাম দিয়ে বসবার কি দরকার !

Box এর টিকিট লইবার কোন দরকার নাই—এই কথা ঠাকুর বলিতে-  
ছেন ।

## সমাজ ও মনুষ্যত্ব ।

( স্বামী বোধানন্দ )

মানুষ হতে হলে তিনটি জিনিষের দরকার—ধর্ম, কর্ম ও শিক্ষা ।  
ধর্ম কাহাকে বলে, ঠিক ঠিক কর্ম কি ও শিক্ষাই বা কি, তাহা ভাল রূপ  
অনেকেই জানেন না । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “মানুষ মানে যার হ’স  
আছে,”—হ’স অর্থে জ্ঞান বা চৈতন্য । যার জ্ঞান আছে, চৈতন্য আছে,  
সেই মানুষ । আমবা তো সেই মানুষ, আমাদেব সেই জ্ঞান, চৈতন্য  
কতদূর আছে, দেখা যাক । জ্ঞান বলতে বিষয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় জ্ঞান নহে ।  
কারণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞান পশুদেরও আছে, তা হলে তো পশুরাও জ্ঞানী ।  
জ্ঞান মানে নিষ্কলুষরূপের অববোধ । ‘আমি কি’ ঠিক ঠিক জানার নাম  
জ্ঞান । সাধারণতঃ আমি বলতে কি বুঝি? চক্ষুকর্ণহস্তপদাদিবিষিষ্ট  
চৌদ্ধপোয়া একটি জীব শরীর মাত্র । এইটী হচ্ছে ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে আমি দেখা ।  
একটু তলিয়ে বা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারা যায়, চৌদ্ধপোয়া শরীরটাই  
আমি নয়; মনবুদ্ধিবিষিষ্ট জীবই মানুষ । এই সিদ্ধান্তটী বিচার দ্বারা লাভ  
হয় । সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বলেন, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির উপর এক জিনিষ আছে,  
তাহার নাম আত্মা । এই আত্মাকে উপলব্ধি করাই ষষ্ঠার্থ জ্ঞান । ‘ইন্দ্রিয়ানি  
পর্যাণ্যাহরিস্থিযেভ্যঃ পরং মনঃ । মনসস্ত পরা বুদ্ধির্ধো বুদ্ধেঃ পরতত্ত্ব সং।’  
আত্মা উপলব্ধির বিষয় । আত্মজ্ঞান কথায় বলে প্রকাশ করা যায় না; ইহা  
মন বুদ্ধির অতীত । ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।’ মন বুদ্ধি  
সে অবস্থার ইয়ত্তা করিতে অক্ষম । এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত অবস্থার  
সম্যক্ অগ্রভূতির নাম জ্ঞান । এই জ্ঞান যার আছে, সেই মানুষ । এই জ্ঞান  
লাভের অস্ত্র যে সাধন, তাহাই ধর্ম ।

ধর্ম বলতে সাধারণতঃ আমবা কি বুঝি, তার একটু আলোচনা করা

বাক্য। কতকগুলি আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বা প্রথা সংস্কার পালন রাজ্যকেই আমরা আপাততঃ ধর্ম বলিয়া থাকি। শ্রাদ্ধ অর্শোচ, প্রারতিষ্ঠাহির ব্যবস্থা পালন, বারতিথিবিধিগেবে ধায়াধায়া দানদানাদির বিচার, উচ্চতর নীচতর জাতির মধ্যে ভক্ষ্য ভোজ্য সম্বন্ধে একান্ত ভেদ রক্ষা, বর্ণাশ্রমের উৎকর্ষতা অপকর্ষতাহুনারে অধিকার তারতম্য সংস্থাপন, আর্থিক জগাদির কিকিৎ অহুষ্ঠান, স্ত্রী সূত্রাহিকে সেবা ভিন্ন অস্ত্র ধর্মে অধিকার না দেওয়া ইত্যাদি দ্বার্ড ও লৌকিক আচার ব্যবহারকেই আমরা ধর্ম বলিয়া থাকি এবং যে ব্যক্তি এইরূপ ধর্ম পালন না করেন, তাঁহাকেই আমরা নাস্তিক বা অধার্মিক বলিয়া থাকি। আমাদের বৃত্তি এতই বহির্ভূতী ও আমরা এমনই তামসিক যে, বাহ্যিক ধর্মাঙ্কুর ও আন্তরিক ধর্মভাবের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তির ধর্মের বাহ্যিকত্ব নাই, তিনি সম্ভাবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সহদয় ও মহাত্ম্যাপী হইলেও আমরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু সে ব্যক্তি যতকৈ দীর্ঘ শিবা ও কপালে চন্দনাদির ফেঁটা ধারণ করিয়া কোশাকুশি ও ফুল ফলাদি উপচার বোগে বহু আঙ্কুরে পূজার অহুষ্ঠান করেন, তিনি কপট, দুরাচার, নিষ্ঠুর ও বিষয়াসক্ত হইলেও আমরা তাঁহাকে মহাধার্মিক বলিয়া পূজা করি। আমরা দুগদশী, কাজেই বাহ্যিকত্বের ভুলিয়া যাই।

ধর্ম বাহিরের জিনিষ নয়। ইহা হৃদয়ের জিনিষ, প্রাণের জিনিষ, সম্ভোগের জিনিষ। যিনি সত্য ধর্মের আশ্রয় একবার পাইয়াছেন, তিনি ধর্ম হইয়াছেন, কৃতার্ক হইয়াছেন ও অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন।

‘ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যাং মহাজনো যেন সত্যঃ স পদ্যঃ।’

ধর্মের তত্ত্ব হৃদয়ে নিহিত। মহাপুরুষেরা যে দার্ম অবলম্বন করেন, তাহাই বদার্ম পদ্য।

কোনও কালে কোনও অবস্থা বিশেষে কোনও বিশেষ রীতি, নীতি বা প্রথা সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। কিন্তু অবস্থা ও কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে সেই প্রাচীন নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলিতে হইবে, তাহার ভাংপর্ধ্য কি? তাহাতে কোনও সফল না হইয়া কুনীতি ও কুরীতির অঙ্কু-খান হইবারই বেশী সম্ভাবনা। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পুরাতন অর্ধপুত্র রীতিনীতির উচ্ছেদ ও নূতন অবস্থা ও কালমূলত সুযোগ অবলম্বনে অভিন্ন আচার ব্যবহারের প্রচলনই জাতীয় উন্নতির মূল কারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। বাহ সব রকজোঙের কথা বলছে।  
এত বেশী দাম দিয়ে বসবার কি দরকার!

Box এর টিকিট লইবার কোন দরকার নাই—এই কথা ঠাকুর বলিতে-  
ছেন।

## সমাজ ও মানুষ।

( স্বামী বোধানন্দ )

মানুষ হতে হলে তিনটা জিনিষের দরকার—ধর্ম, কর্ম ও শিক্ষা।  
ধর্ম কাহাকে বলে, ঠিক ঠিক কর্ম কি ও শিক্ষাই বা কি, তাহা ভাল রূপ  
অনেকেই জানেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “মানুষ মানে যার হুঁস  
আছে,”—হুঁস অর্থে জ্ঞান বা চৈতন্ত। যার জ্ঞান আছে, চৈতন্ত আছে,  
সেই মানুষ। আমবা তো সেই মানুষ, আমাদেরই সেই জ্ঞান, চৈতন্ত  
কতদূর আছে, দেখা যাক। জ্ঞান বলতে বিষয় জ্ঞান বা ইন্দ্রিয় জ্ঞান নহে।  
কারণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞান পশুদেবও আছে, তা হলে তো পশুরাও জানী।  
জ্ঞান মানে নিজস্বরূপের অববোধ। ‘আমি কি’ ঠিক ঠিক জানার নাম  
জ্ঞান। সাধারণতঃ আমি বলতে কি বুঝি? চক্ষুকর্ণহস্তপদাদিবিশিষ্ট  
চৌদ্দপোয়া একটি জীব শরীর মাত্র। এইটা হচ্ছে ক্ষুদ্রদৃষ্টিতে আমি দেখা।  
একটু তলিয়ে বা হৃদয়দৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারা যায়, চৌদ্দপোয়া শরীরটাই  
আমি নয়; মনবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবই মানুষ। এই সিদ্ধান্তটা বিচার দ্বারা লাভ  
হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বলেন, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির উপর এক জিনিষ আছে,  
তাহার নাম আত্মা। এই আত্মাকে উপলব্ধি করাই ষষ্ঠাৰ্থ জ্ঞান। ‘ইন্দ্রিয়ানি  
পর্যাণ্যাহরিস্মিভেষ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্ত পরা বুদ্ধির্ষো বুদ্ধেঃ পবতস্ত সঃ।’  
আত্মা উপলব্ধির বিষয়। আত্মজ্ঞান কথায় বলে প্রকাশ করা যায় না; ইহা  
মন বুদ্ধির অতীত। ‘যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।’ মন বুদ্ধি  
সে অবস্থার ইয়ত্তা কবিতে অক্ষম। এই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত অবস্থার  
সম্যক অনুভূতির নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান বার আছে, সেই মানুষ। এই জ্ঞান  
লাভের জন্ত যে সাধন, তাহাই ধর্ম।

ধর্ম বলতে সাধাবগতঃ আমবা কি বুঝি, তার একটু আলোচনা করা

বাক্য। কতকগুলি আচার ব্যবহার, রীতিনীতি বা প্রথা সংস্কার পালন রাজ্যকেই আমরা আপাততঃ ধর্ম বলিয়া থাকি। ব্রাহ্ম অশৌচ, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা পালন, বারতিথিবিধিবেধে ধান্যাখাদ্য ভ্রাম্যমানাদির বিচার, উচ্চতর নীচতর জাতির মধ্যে ভক্ষ্য ভোজ্য সম্বন্ধে একান্ত ভেদ রাখা, বর্ণাশ্রমের উৎকর্ষতা অপকর্ষতাব্যূহায়ে অধিকার ভারতম্য সংস্থাপন, আর্থিক জপাদির কিঞ্চিৎ অল্পষ্ঠান, জী শূদ্রাদিকে সেবা তিন্ন অল্প ধর্মের অধিকার না দেওয়া ইত্যাদি দ্বার্ড ও লৌকিক আচার ব্যবহারকেই আমরা ধর্ম বলিয়া থাকি এবং যে ব্যক্তি এইরূপ ধর্ম পালন না করেন, তাঁহাকেই আমরা নাস্তিক বা অধার্মিক বলিয়া থাকি। আমাদের বৃত্তি এতই বহিঃস্বী ও আমরা এমনই তামসিক যে, বাহ্যিক ধর্মোদ্ভব ও আন্তরিক ধর্মভাবের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তির ধর্মের বাহ্যোদ্ভব নাই, তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সহনশীল ও মহাত্ম্যপূর্ণ হইলেও আমরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যে ব্যক্তি মস্তকে দীর্ঘ শিখা ও কপালে চন্দনাদির কোঁটা ধারণ করিয়া কোশাকুলি ও ফুল ফলাদি উপচার বোপে বহু আড়ম্বরে পূজার অর্চন করেন, তিনি কপট, হুরাচার, নির্ভর ও বিষয়াসক্ত হইলেও আমরা তাঁহাকে মহাধার্মিক বলিয়া পূজা করি। আমরা শূন্যদর্শী, কাজেই বাহ্যোদ্ভবের ভুলিয়া যাই।

ধর্ম বাহিরের জিনিষ নয়। ইহা হৃদয়ের জিনিষ, প্রাণের জিনিষ, সমস্তাঙ্গের জিনিষ। যিনি সত্য ধর্মের আশ্রয় একবার পাইয়াছেন, তিনি বস্ত হইয়াছেন, কৃতার্থ হইয়াছেন ও অমরত্বের অধিকারী হইয়াছেন।

‘বশন্ত তৎ নিহিতং গুহ্যায়ং মহাজনো যেন পতঃ স পথাঃ।’

ধর্মের তত্ত্ব হৃদয়ে নিহিত। বহুপুরুষেরা যে দ্বার্ষ অবলম্বন করেন, তাহাই বদ্বার্ষ পথ।

কোনও কালে কোনও অবস্থাবিশেষে কোনও বিশেষ রীতি, নীতি বা প্রথা সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। কিন্তু অবস্থা ও কালের পরিবর্তন সত্ত্বেও যে সেই প্রাচীন নিয়মের বশবর্তী হইয়া চলিতে হইবে, তাহার তাৎপর্য কি? তাহাতে কোনও ক্ষুণ্ণ না হইয়া কুনীতি ও কুরীতির অকু-খান হইবারই বেশী সম্ভাবনা। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পুরাতন অর্ধশূন্য রীতিনীতির উচ্ছেদ ও নূতন অবস্থা ও কালানুসৃত সুযোগ অবলম্বনে অভিন্ন আচার ব্যবহারের প্রচলনই জাতীর উন্নতির মূল কারণ।

ভূয়োদর্শন দ্বারাও জানা যায় যে, প্রকৃতি নিরন্তর আপনাকে দেশ ও কালানু-  
রূপী করিতেছে। বিজ্ঞানও বলেন, দেশ কাল ও নিমিত্তোপযোগী সমাজ  
ও ধর্ম স্থাপনই জাতীয় উন্নতির নিদান। ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান যে মত  
একবাক্যে অনুমোদন করেন, তাহাই সমাজের কর্তব্য ও অনুরোধ।

শূদ্রদিগকে অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার না দিবার কোন  
সাময়িক কারণ থাকিতে পারে। প্রাচীন কালে শূদ্রশাস্ত্রে হয়তো আধুনিক  
সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতির জায় কোনও এক অতি অসভ্য, মুর্থ বন্যজাতি ব্রহ্ম-  
ইত। স্থূলবুদ্ধি, আচাবহীন জাতির শাস্ত্রানুশীলন ও জ্ঞানচর্চার বাস্তবিক  
অধিকার থাকিতে পারে না। ভারতের বর্তমান শূদ্রগণ যে তাহাদেবই বংশধর,  
ইহাবও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। যদি তাহাদেবই বংশধর হন,  
তাহা হইলে কালে মার্জিতবুদ্ধি ও আচাবপূত হইলে তাঁহাদিগকে অধিকার-  
চ্যুত করিয়া বাণিবাব কি আবশ্যকতা আছে? যদি তাঁহাবা বেদাদি বর্ধ-  
বোধে সক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধিকার না দেওয়া কি নীচতা,  
বিদ্বেষভাব ও হীনবুদ্ধিভাব পরিচায়ক নয়? উপযুক্তকে যোগ্যাদিকার দানে  
রূপণতাব কারণ কি? বোধ হয় স্বার্থসিক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়।

গাঁহাবা অধিকারবাদ লইয়া বিতণ্ডা কবেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি,  
হে শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ, আপনাবা একবাব নিজের দিকে চাহিবা দেখুন।  
যে মহাপুরুষগণের নাম লইয়া আপনাবা আপনাদের মর্যাদা বাড়াইতে-  
ছেন, সেই মহাপুরুষগণের তেজস্বিতা, ত্যাগ ও তপস্যার কি পরিমাণ  
আপনাদের ভিতর আছে? আপনাদের সজাতীয়গণ অবনতমস্তকে ৭১  
টাকা বেতনের পাচকব কার্য্য করে। যাহাদিগকে ব্লেচ্ছ বলিয়া  
মুখে ঘৃণা করেন, ১০১ টাকার জ্ঞাত আপনাদের আত্মবিশ্বাস তাহাদের  
দাসত্ব কবিত্তে লালায়িত। দাস্তবৃত্তি স্ববৃত্তি বলিয়া আপনাদের জানা  
আছে, কিন্তু তথাপি দেশকালানুরোধে তাহা পরিত্যাগ করিতে  
শিক্ষা দেন না। যে সনাতন বেদের উপর আপনাদের সমস্ত ধর্ম্ম  
কর্ম্ম স্থাপিত, আপনাদের সন্তানগণ সেই বেদধাতা গায়ত্রীর অর্থবোধ  
দূরে থাকুক, শুদ্ধ আবৃত্তি পর্য্যন্ত কবিত্তে পাবেন না। আপনারা যখন  
ত্যাগ তপস্কারূপ নিজবৃত্তি ছাড়িবা দাস্তবৃত্তি অবলম্বনে কুণ্ঠিত নন, তখন  
আচাবপূত, শুদ্ধচিত্ত, সত্যপিপাসু ব্রাহ্মণেতব জাতিকে বাধ্য ও তপস্তার  
অধিকার দিতে কাভর হন কেন? আপনারা মহাত্মতব পূর্বপুরুষগণের

নামের গরিমা করেন যাত্রা, তাঁহাদের যত্নের কণামাত্র আপনাদের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশ কালের অনুবোধে যে নিয়ম তাঁহারা তাত্‌কালিক সমাজশৃঙ্খলার প্রত্যয় স্থাপন করিয়াছিলেন, আপনারা সেই নিয়মটিকে বর্তমান দেশকালানুসারে একটু কোমল ও শিথিল করিতে অনিচ্ছুক কেন ? এই সঙ্গীর্ণতা ছাড়িয়া দিয়া যাহাতে পূর্বপুরুষগণের গুণের ভাগী হইতে পাবেন, তদ্বিষয়ে যত্নশীল হউন। আপনারা তো আপনাদিগকে দেশকালানুযায়ী অবস্থার উপযোগী করিতে অনিচ্ছুক নন। আপনারা বলেন, এখন ইংল্যান্ড রাজা—ইংল্যান্ডী ভাষা না শিখিলে ও ইংরাজের চাকরী না করিলে অর্থাভাবে ও অনাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। বেশ কথা, যখন আপনারা দেশ কালের অনুবোধে অর্ধোপার্জনই এই নিবিড় পথ অনুমোদন করিতেছেন, তখন অপবিত্রতিকেও ঐ নিয়ম অবলম্বনে জ্ঞানাদিকার দিতে কাতর হন কেন ? আপনাদের স্বজাতিগণ, পূর্বপুরুষগণের অবলম্বিত বৃত্তি ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি আশ্রয় করিলে আপনারা তাহাদিগকে দোষী মনে করেন না। কিন্তু অপরূপতাই তাহাদের পূর্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিলে আপনারা ধৈর্য্যচ্যুত হন—ইহার কারণ কি ? আপনাদের কোহিনুর আপনারা রক্ষা করিতে অক্ষম হওয়াতেই তো তাহা বিজাতির হস্তগত হইয়াছে। আপনাদের পূর্বপুরুষগণের শম দম তপস্বাদি সম্পত্তি আপনারা যদি বক্ষা করিতে না পাবেন এবং আপনাদের দেশেব অপর কোন জাতি উহাদের রক্ষার নিমিত্ত অগ্রসর হন, তাহা হইলে আপনাদের উহাতে আনন্দিত হওয়াই উচিত। যে বিষয় আপনারা বক্ষা কবিত্তে অক্ষম, যদি অন্য কর্তৃক তাহা সুরক্ষিত হয়, তাহাকে উহা কবিত্তে দেওয়া যুক্তি ও জায় সঙ্গত। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যে বিষয়ে যে অযোগ্য, সে বিষয় কালক্রমে তাহাব হস্তান্তরিত হইবে। নিশ্চয় জানিবেন, আপনাদের পূর্বপুরুষগণও এই নিয়মানুসারেই ঐ সকল ধনে ধনী হইয়াছিলেন। গুণ উপযুক্ত পাত্রকেই আশ্রয় কবে। তাই বলিতেছি, অধিকারবাদ লইয়া বৃথা তর্ক না কবিয়া যাহাতে বর্তমান সময়ে আমরা জাতীয় উন্নতি সাধন করিয়া যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারি, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। কুসংস্কার উঠিয়া গিয়া প্রকৃত শাস্ত্রার্থ যাহাতে প্রচারিত হয়, বর্তমান সময়ে তাহাই কবা আমাদের কর্তব্য। শাস্ত্রার্থ বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই আমাদের এত মালিন্য ও এরূপ হীনাবস্থা।

আপনারা পুত্রকল্যাণকে অপরিশ্রুত বলসে বিবাহ দিয়া থাকেন এবং

অনেক ভ্রমাত্মক হুক্তি দেখাইয়া আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। আপনারা বলেন, বাল্য বিবাহে দাম্পত্যপ্রেম দৃঢ় হয় ও চরিত্র দোষ নিবারণ করে এবং এই হুক্তি সপ্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কোনও সময়ে কোনও প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য বাল্য বিবাহের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা থাকিতে পারে, বর্তমান সমাজে ইহার উপযোগিতা আছে কি? আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। অস্বাভাব্যে আমরা সর্বদাই কষ্টে পাইয়া থাকি। আমাদের দেশে আহারীয় দ্রব্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু বিদেশীয় বাণিজ্য প্রভাবে তাহার অধিকাংশ দেশান্তরিত হয় এবং অল্প বাহা থাকে, তাহা দ্বারা আমাদের অস্বাভাব্য একেবারে দূর হয় না। উৎসাহ অভাবে ও পাশ্চাত্য পণ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের দেশীয় শিল্প ও ব্যবসা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছে। দেশীয় স্বর্ণ রৌপ্যের পরিবর্তে আমরা বিদেশীয় ফুছ বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি। এই অল্প-লিটে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশে উৎকট উৎকট পীড়া মধ্যে মধ্যে আসিয়া অনেককে গ্রাস করে। হতাবশিষ্টেরা সর্বদা রোগাক্রমণ ভয়ে সশঙ্কিত। ইহার উপর পরাধীনতা। এই দারিদ্র্য, দুঃখ ও পরমুখাপেক্ষিতার কারণ কি জানেন? আমাদের দুর্বলতা। দুর্বল বলিয়াই আমরা দরিদ্র, দুর্বল বলিয়াই আমরা দুঃখী এবং দুর্বল বলিয়াই আমরা পরমুখাপেক্ষী। এই দুর্বলতাব নাশই আমাদের সমাজের বর্তমান কর্তব্য। কি করিলে এই দুর্বলতাব নাশ হয়, একবার কেহ ভাবিয়াছেন কি? আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন ও আত্মান্তিক পবিত্রতা রক্ষা। বাল্যবিবাহে দাম্পত্যপ্রেম দৃঢ় হইতে পারে; কিন্তু সামান্য দাম্পত্যপ্রেমের জন্য সমাজের আবশ্যকীয় বিষয়ে রুদ্ধদৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। বাল্য বিবাহে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয় হয় এবং ক্রীণ-শরীর ও দুর্বল মস্তিষ্ক বিশিষ্ট লোকের সম্ভাগিগণও ক্রীণ ও দুর্বল হয়। যখন দুর্বলতা নাশ ও শক্তিসঞ্চয় আমাদের প্রয়োজন, তখন বাল্যবিবাহটী বর্তমান সমাজের পথ্য নহে।

যে দাম্পত্যপ্রেম ফল স্বরূপ দুর্বলতা ও হীনবীর্য্যতা আনয়ন করে, তাহা নাইবা কি হইবে? বাল্য বিবাহে চরিত্র দোষ নিবারণ হয়, ইহাও ঐকান্তিক সত্য নহে। চরিত্রদোষ কাহাকে বলে? হীনবীর্য্য হওয়াই চরিত্রদোষ। অন্ত-এব বাল্যবিবাহ চরিত্রদোষ নিবারণ না করিয়া বরং তাহার পোষকতা করে। বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদের সম্ভ্রাম সম্ভাগিগণ প্রেমের পরিবর্তে কাষে বীক্ষিত

হয়। বাল্য বিবাহ বন্ধ রাখিয়া বাহাতে আমাদের সততিগণ পবিজ, চরিত্র-বান্ধ ও বীর্যবান হইতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টিই আমাদের প্রয়োজন। বাল্য বিবাহ একদিকে যেমন শাস্ত্রানুমোদিত নহে, অপরদিকে তেমন শরীর-বিজ্ঞানবিরোধী। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন, অজপেনী, অস্থি ও বয়ঃসমুদয় পরিপুষ্ট হইতে পুরুষের ২৫১০ বৎসর ও স্ত্রীলোকদিগের ১৮১২ বৎসর লাগে। ইহার পূর্বে যদি সন্তান হয়, সে সন্তান নিশ্চয়ই দুর্বল ও অস্বাস্থ্যবান হইবে। অতএব সামাজিক ও আধ্যাত্মিক হিতসাধন যদি কর্তব্য হয়, বাল্য বিবাহ অন্ততঃ কিছু কালের জন্য আমাদের দেশে বন্ধ রাখিতে হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আবার বর্তমান হিন্দুসমাজ বিশেষ বন্ধ-শীল নন। অনেক বলেন, স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে। প্রধান অনিষ্ট এই,—স্ত্রীলোকেরা স্বামীকে তক্তি করিবে না, বিলাসিনী হইয়া গৃহকর্ম উপেক্ষা করিবে, নিরাজ হইবে এবং চরিত্র-শালিনী হইতে পারিবে না। আজ কালের নূতন ধরণের স্ত্রীশিক্ষা দেখিলে তাঁহারা এরূপ অনিষ্টোপাতের আশঙ্কা করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, এরূপ শিক্ষা আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার অনুরূপ নহে। উহা পাশ্চাত্য স্ত্রীশিক্ষার অঙ্কুরণ মাত্র। কতকগুলি ইংরাজি পুস্তক মুখস্থ করার নাম শিক্ষা নয়। আমরা চাই,—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ববুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহারা মাতৃহানীয়া, বাহাতে পুঙ্ক-তন ঋষিপত্নীগণের দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রতিভাশালিনী ও তত্ত্বদর্শিনী হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। বাহাতে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে মৈত্রেরী, গার্গী ও উভয়ভারতীর অনুসরণ করিতে পারেন; জ্ঞান জগতে খনা ও লীলাবতীর সমুলী হন ও কর্মজগতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও অমৃত্যু পতিব্রতাস্ত্রীর আদর্শের অনুগামিনী হন, এই বিষয়ে সাহায্য করাই আমাদের বর্তমান সমাজের প্রধান কর্তব্য।

পুরুষের সুখ স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে অনিচ্ছিত রাখা আমাদের বহা অন্তর। আবার বাহাতে কুশিক্ষা প্রভাবে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ও বীরত্বের জলাঞ্জলি দিয়া প্রগল্ভতা ও অশাস্তা না হন, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। আমরা চাই বাহাতে তাঁহারা বৃত্তিতে পারেন যে, পুরুষের জ্ঞান তাঁহাদেরও অবশ্য বিদ্যার অধিকার আছে—তাঁহারাও যেদের অর্থবোধ ও বয়ঃদর্শনে সমর্থ—এবং তাঁহারা সেই সচ্ছন্দমনস্বরীর শক্তির বিকাশ



যাত্র। তাঁহাদের অন্তরে এই প্রত্যয় ক্ষুরিত ও দৃঢ়ীকৃত করাই তাঁহাদের প্রধান শিক্ষা। এই আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া নিজ চরিত্র বলে তাঁহাদের সম্ভোগের চরিত্র গঠনে সহায় হয়েন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। যদি এই প্রণালীতে তাঁহারা শিক্ষিত হন, তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে যে, কালে তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদেরই চরিত্রবলে বলীগান, পুত্ৰচিন্ত ও নির্ভীক হইয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য হইবে। এই প্রণালীতে ত্রীলোকগণকে শিক্ষা দেওয়া বর্তমান সমাজের নিত্য প্রয়োজন। যদি সমাজ এই বিষয়ের আনুকূল্য এখনও না প্রদান করে, তাহা হইলে এই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ কোন কালে হইবে না। দিন দিন অধঃপতন হইবে।

বহু শতাব্দী ব্যাপী পরাধীনতা ও কুশিক্ষা আৰ্য সমাজকে হীনবীর্য ও মৃতকর করিয়াছে। যদি ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হয়, ভারতসন্তানগণকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। তাহাদিগকে কর্তব্য ও দায়িত্ব বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কুসংস্কার ও আলস্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরবলে জগতের কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। জীবন ধারণ করা ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।’ এই মহামন্ত্র জলন্ত অক্ষরে হৃদয়ে হৃদয়ে লিখিয়া দিতে হইবে। যতদিন আমরা পার্থত্যগী না হইতে পারিব, ততদিন নিজের বা অপরের কোন প্রকার কল্যাণ আমাদের দ্বারা সাধিত হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, নানক প্রভৃতি কৰ্মবীবগণের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই,—স্বার্থশূন্যতাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান ধর্ম। কোন মহৎকার্য্যই বিনাত্যাগে সাধিত হয় না। নিঃস্বার্থ কৰ্ম্মই কৃতকার্য্যতাব কারণ। এই নিঃস্বার্থ কৰ্ম্মে আমরাদিগকে ত্রুটি হইতে হইবে। ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে লোকহিতের জন্য নিরন্তর কৰ্ম্ম কবিত্তে হইবে। এইরূপ কৰ্ম্মে যদি প্রাণ যায়, তাহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতে হইবে। এই কৰ্ম্মযোগ বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন। কাল প্রভাবে এই যোগের শক্তি নষ্ট হওয়ায় তিনিই বুদ্ধাদি বগুধারণ করিয়া ঐ যোগের সজীবতা সম্পাদনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইদানীং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অবতীর্ণ হইয়া এই যোগ পুনঃ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আলোচনা করিলে গীতাত্ত কৰ্ম্মযোগ কিরূপে জীবনে

সাধন করিতে হয়, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। ত্রীমং স্বামী বিবেকানন্দ সংক্ষেপে ত্রীময়ককচরিতের কথা এইরূপ বলিতেন,—জ্ঞান, যোগ, তপ্তি ও কর্মের পরাকারতার সমষ্টি স্বরূপ এরূপ অপূর্ণ পুরুষ আর মানব জাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণের জীবন আমরা পুস্তক পাঠকরিয়া ধারণা করি মাত্র, কিন্তু ইঁহার জীবন স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং তন্ন তন্ন পরীক্ষা দ্বারা জামিয়াছি, ইহা সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখন করে। তাঁহার চিত্ত সর্বদা অদ্বয় ব্রহ্মে সমাহিত থাকিত, দৈতভাব অবলম্বনে অনাসক্ত ইন্দ্রিয়-গণ দ্বারা বাহিরের যাবতীয় কার্য সম্পন্ন হইত। “নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্ত্রেত তদ্বিৎ ---ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেধু বর্জিত ইতি ধারয়ন্। ন যে পার্থক্য কৰ্ত্তব্যং ত্রিশু লোকেষু ...বর্জ্যেব চ কর্মণি। ধ্যাবতীং লেলায়তীব। আশুকাম মহাপুরুষের কর্মের কোন আবশ্যক ছিল না, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য এবং গীতোক্ত কর্মযোগটী কিরূপ জীবনে সাধন করিতে হয়, দেখাইবার জন্যই যেন তিনি এই যুগে অবতীর্ণ। তাঁহার পুণ্য চরিত্র আদর্শ করিয়া নিকাম কর্মযোগে দীক্ষিত হওয়াই আমাদের সমাজের প্রধান কর্তব্য।

শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজের অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। শিক্ষা বলিতে কতকগুলি পুস্তক পাঠই আমরা বুঝিয়া থাকি। যে পুস্তক পড়ে না বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নয়, তাহাকে আমরা অশিক্ষিত বোধে ঘৃণা করি। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলে? পুস্তক পাঠের নামই যদি শিক্ষা হয়, তবে স্বয়ং পুস্তক অপেক্ষা শিক্ষিত কে? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের উপযুক্ত ব্যবহার ও বিষয়ে পরিচালনাই যথার্থ শিক্ষা। ইন্দ্রিয়গণ ঠিকঠিক শিক্ষিত হইলে উহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুভূতি হয়, মন ও বুদ্ধির ক্ষুরণ হয়; ও চিন্তের উদারতা সম্পাদন হয়। বালকদিগকে ৫ বৎসর বয়সে স্কুলে পাঠাইয়া ১৪ বৎসর বয়সে এক্ট্রান্স পাস করাইতে পারিলেই যে খুব শিক্ষা দেওয়া হইল, তাহা নহে। ছেলেটী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইল বটে, কিন্তু হয়তো কি করিয়া বলিতে হয়, তত্ত্বলোকের সহিত কিরূপ কথাবার্তা কহিতে হয়, কিরূপে খাইতে হয়, চলিতে হয়, দাঁড়াইতে হয়, তাহার কিছুই জানিল না। কাপড় বা জামা একটু ছিঁড়িয়া গেলে কেমন করিয়া সেইটাকে সেলাই করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানে না। সাহ্যরক্ষার নিয়ম একেবারেই বুঝিল না। পড়িবার দর, বিছানা, টেবিল, চেয়ার কিরূপে পরিষ্কার রাখিতে হয়, তাহা জানিল না। আত্মনির্ভর ও

আমরা সাহায্য স্বত্বকে কোন শিক্ষাই পাইল না। আবার অভিরিক্ত রাজি আগরণ করিয়া পড়া বুঝ করিয়া অতি অল্প বয়সে দুষ্টিহীনতা, শিরোতুর্ণন, অসীর্ণতা বা জাহ্নু-দৌর্বল্য রোগে আক্রান্ত হইল। এইরূপ শিক্ষার সাধারণ ফল তো এই। বালকটী মারা জীবনের জন্ত একেবারে অকর্মণ্য হইল। ২০১২৫ টাকা বেতনের কেরানীগিরির জন্ত অতি আবশ্যকীয় বিষয়ে বালকটীকে চিরদিনের জন্ত বঞ্চিত করা হইল। এরূপ শিক্ষার আবদ্ধ না রাখিয়া যদি আমরা তাহাদিগকে কি করিয়া চিন্তা করিতে হয়, কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, কিরূপ করিয়া লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কেমন করিয়া দেখিতে হয়, বলিতে হয়, চলিতে হয়, বসিতে হয় ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে শিক্ষা দিই, তবে তাহাদের অশেষকল্যাণ হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী করিয়া তাহাদিগকে অলস, পরপ্রত্যাশী ও চিরদিনের জন্ত ক্রম ও অকর্মণ্য না করিয়া তাহাদিগকে শিল্পবিদ্যায় শিক্ষিত করিলে ভবিষ্যতে তাহারা নিজ বুদ্ধি খাটাইয়া মানুস হইতে পারে ও অর্থাগমের নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে। ১৫৭ টাকা বেতনের কেরানীর শারীরিক ও মানসিক হুণে দেখিয়া আমাদের চৈতন্ত হওয়া উচিত। অনেকে এস্থলে বলিতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বড় বড় সরকারী চাকরী করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতে পারা যায়। কিন্তু বলি, তাহা কয়জনের তাপ্যে ঘটে, এবং বাঁহারা বোভাগ্যক্রমে বড় বড় সরকারী চাকরী প্রাপ্ত হন, তাহারা ই বে অতি সুবিল্ল ও দেশহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও নহেন। ইঞ্জিয়, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পূর্ণতা লাভই বর্ধাশিক্ষা। হয়তো আমি মাসে ২ হাজার টাকা উপার্জন করি কিন্তু যদি তাহার অষ্টমাংশও দেশহিতার্থে ব্যয় করিতে কৃত্তিত হই, তাহাহইলে আমার শিক্ষা বা উপার্জনে ফল কি হইল? এরূপ শিক্ষা অপেক্ষা চিরকাল সুখ হইয়া কিঞ্চিৎ কর্তব্যবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া স্বাধীন চিন্তা ও আত্মনির্ভর শিক্ষা করা অনেক ভাল। এইরূপ শিক্ষার গুরু শ্রীশ্রীমাক্ষদেব। পৃথিবীপড়া বিদ্যা তাহার কিছুই ছিলনা; কিন্তু তাহার চক্ষের এরূপ শিক্ষা ছিল যে, কোন জিনিষ একবার দেখিলেই তাহার সমস্ত বুদ্ধিয়া লইতেম। কোন লোককে দেখিবামাত্র তাহার সমস্ত হাব ভাব ও চাল চলন দেখিয়াই তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেম। স্বভাবের মধ্যে কত অভিমত বিষয় সন্নিবিষ্ট করিতেম। হয়তো একটি ফল দেখিয়াই আনন্দে বিভোর হইতেম। নবদুর্জাদল দেখিয়া কত ভাবের উদয় হইত। কোকিলের কুহবর শুনিয়া, সংগীত শুনিয়া

কত ভাবরাশি আধিরা উঠিত। কোন জিনিষ স্পর্শমাত্র উহা কিরূপ জিনিষ ও কিরূপ আশ্রয় হইতে আসিয়াছে, জানিতে পারিতেন। এ সমস্ত কেবল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির শিক্ষার ফল মাত্র। এই শিক্ষা ছিল বলিয়াই তিনি এই সমস্ত গভীর স্বপ্ন ভাব সহজে বুদ্ধিতে পারিতেন।

বহির্জগতের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখিবার আবশ্যকতা না থাকিলেও লোকেব সহিত কেমন শিষ্টাচরণ কবিতেন ও কেমন পবিত্র পবিত্র থাকিতেন! শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, শ্রীমৎকৃষ্ণদেবের তুল্য শির-জ্ঞান আর তিনি কাহাবও দেখেন নাই। তিনি বলিতেন, “তঁহার চলা, বলা, শোয়া, বসা, দেখা, সবসাজান সমস্তই সুন্দর ও ভাবপূর্ণ।” অত্যা বা অনাবশ্যক বোধে যে বিষয় ত্যাগ কবিতেন, শবীর তাহা কদাচ স্পর্শ কবিতেন পারিত না। তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া অসত্য কথা কদাচ নির্গত হয় নাই। কাম কাকন ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া শবীর তাহা স্পর্শ পর্যান্ত কবিতেন পারিত না। সেখানে ২৩ জন লোকে বসিয়া কোন গোপনীয় কথা কহিত, সে দিকে গেলে পাছে তাহা শুনিয়া ফেলেন, পদ সে দিকে যাইতে পারিত না। তাঁহারই যথার্থ মনুষ্যোচিত শিক্ষা। যে শিক্ষা দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, মন ও বুদ্ধির স্বতন্ত্র পবিচালনা হয় ও অতিনব বিষয়েব অনুভূতি দ্বারা মনুষ্য জাত কবা যায়, তাহাই যথার্থ শিক্ষা।

যদি আমরা জগতে কার্যক্ষম হইতে চাই, যদি নিজের কল্যাণ ও দশ  
জন্মের কল্যাণ সাধনই আমাদের প্রধান কর্তব্য হয়, যদি অশূল্য মনুষ্য  
লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহাহইলে শ্রীশ্রীনারায়ণদেবের উজ্জ্বল  
দৃষ্টান্ত সম্মুখে বাঁথিয়া কর্মজগতে অগসব হওয়াই আমাদের প্রধান ধর্ম।  
তাই বলি, বাগবিতণ্ডা, দৈর্ঘ্যাহ্বন, হীনবুদ্ধিতা ছাড়িয়া যাহাতে আমরা মানুষ  
হইতে পারি, যাহাতে আমরা আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া তাহাব প্রতীকার  
কবিতে পারি, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। আর বুঝাইলে চলিবে না। দীর্ঘ  
নিজ্ঞা হইয়াছে। এখন উঠ, জাগো, মহাপুরুষের চরিত্র আদর্শ করিয়া  
মনুষ্যলাভ কর। শক্তি লাভ কবিতে হইবে। শক্তি ভিন্ন কার্য হয় না।  
শাখারিক শক্তি, মানসিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি লাভের  
প্রধান উপায়,—স্বার্থত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য। ত্যাগ আমাদের মূল মন্ত্র। বিনা  
ত্যাগে কোনও মহৎ কার্য সাধিত হয় নাই। মৃত্যুভয় দূর করিতে হইবে।  
শ্রীশ্রীনারায়ণদেব বলিতেন,—“যে তালগাছের পাতা ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে  
হাত ছাড়িয়া দিতে পারে, সেই ধর্মের অধিকারী।” এইরূপ দৃঢ়তা চাই,

অধাবসায় চাই। “মন্ত্রদ্বা সাধয়েয়ম্ শরীরম্ বা পাতয়েয়ম্।” মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন, এইরূপ তীব্র অধাবসায় ও সাহস চাই। মনুগ্রন্থলাভ করিতে হইবে। ইহার জন্য যদি শতজন যায়, তাহাও শ্রেয়স্কর। লোকনিন্দা বা স্তুতি একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। হে বর্তমান ভাবতম্বকগণ, তোমাদের সম্মুখে এই মহাদায়িত্ব বহিয়াছে। তোমরা কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হও—মানুষ হও। তোমরা অতদ্রুত হও, শক্তিমান হও, ওজস্বী হও, বীর্যবান হও, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তোমরাও সেই সর্বশক্তিমানের কাছে একান্তচিত্তে প্রার্থনা কর—“ওঁ তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহি, ওঁ বলমসি বলম্ ময়ি ধেহি, ওঁ বীর্যমসি বীর্যম্ ময়ি ধেহি, ওঁ ওজোহসি ওজো ময়ি ধেহি।”—হে তেজঃরূপ বলঃরূপ, বীর্যঃরূপ ওজঃরূপ ভগবান, আমাদের তেজ, বল, বীর্য, ওজঃ দান কর।

## স্বামীজির কথা ।

( শ্রীহরিপদ মিত্র । )

পূর্বেই বলেছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে হিন্দু ধর্ম বুঝাতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাতে স্বামীজির মত আর কাকেও দেখা যায় নি। তাবই দু'চারটি কথা আজ উপহাস দিবার ইচ্ছা। কিন্তু বুঝিতে হবে, আমার স্বতন্ত্র স্ববণ আছে, তাই লিখছি। অতএব যদি এতে কোন রূপ ভুল থাকে, তা আমার বোঝাব ভুল, স্বামীজির ব্যাখ্যাব নয়।

স্বামীজি বলতেন,—“চেতন অচেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম সবই, একত্বের দিকে উজ্জ্বল্যে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত বকম বকম জিনিষ দেখিতে লাগলো, তাদের প্রত্যেকটাকে বিভিন্ন জিনিষ মনে কোরে ভিন্নভিন্ন নাম দিলে। পরে বিচার কোবে ঐ সমস্ত জিনিষগুলো ৬টা মূলদ্রব্য (Element) হোতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিলে।

\*ঐ মূল দ্রব্য গুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো মিশ্র দ্রব্য (Compound) বোলে এখন তাব সন্দেহ হইয়াছে। আর যখন রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছবে, তখন সকল জিনিষই এক জিনিষেরই অবস্থা ভেদ হইয়া বোঝা যাবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তাড়িত (Heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিষ বোলে সকলে জানতো। এখন প্রমাণ হইয়াছে যে,

ওগুলো সব এক, এক শক্তিবই অবস্থান্তর মাত্র। প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলো নোকে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলে। তার পর দেখলে যে, উদ্ভিদের গ্রাণ আছে,—চেতন প্রাণীর জায় গমন শক্তি নেই মাত্র। তখন খালি দুই শ্রেণী বইলো,—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাবে, আয়বা যাকে অচেতন বলি, তাতেও স্বল্পবিস্তর চেতনা আছে।” তখন অধ্যাপক জগদীশ বসু তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতন (Response of inorganic matter to electric currents) পরীক্ষা প্রসিদ্ধ হয় নি।

“পৃথিবীতে যে উচ্চ নিম্ন জ্বলি দেখা যায়, তাও সতত সমতল হয়ে এক-ভাবে পরিণত হবার চেষ্টা করে। বর্ষাব জগে পর্দাভাদি উচ্চ জ্বলিগুলো ধুয়ে গিয়ে গম্বব সকল পলিতে পূর্ণ হচ্ছে। একটা উষ্ণ জ্বলিই কোন জায়গায় বাঞ্ছনীয় উষ্ণ কমে চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রবাব জায় সমান উষ্ণতায় ধারণ কোত্তে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন বিকীরণাদি (Conduction, convection ও radiation) উপায় অবলম্বনে সর্বদা সমতাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

“গাছের ফল ফল পাতা শেঁকড আয়বা ভিন্ন ভিন্ন দেখলেও বাস্তবিক উহা যে এক, বিজ্ঞান উহা প্রমাণ করেছে। তিনপল কাঁচের ভেতর দিকে দেখলে এক সাদা বং বামধনুকের সাতটা বড়ব মত, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখলে একই বং, আয়বা লাল বা নীল চসমার ভেতর দিয়ে দেখলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

“এইরূপ যাহা সত্য, তাহা এক। মায়া দ্রাবা আয়বা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত বস্তুত সত্যাবলম্বনে যত্নসেব যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হলেও মাত্ত্বম সেই সত্যটাকে ধস্তে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না।”

এই সব কথা শুনে আমি বললাম, “স্বানীজি, আমাদের জোথেন দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? ছাৎনা বেল এনে সমাধিস্থলে বাঞ্ছনীয় যেন ক্রমে এক জায়গায় মিলে গেছে। উহাবই নাম Vanishing Point। স্বীচিকা, রক্ষুতে অহিভ্রম প্রভৃতি Optical Delusion (দৃষ্টিভ্রম) সর্বদাই ইচ্ছে। Calcspars নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে Double refractionএ দুটো দেখায়। একটা উড পেন্সিল আদ মাস জলে ডুবলে পেন্সিলের জল-

ময় ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চক্ষুশূল্য ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা বিশিষ্ট এক একটা লেন্স ( Lens ) যাত্র। আমরা কোন জিনিষ যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখে থাকে, কেননা তাদের চোখের লেন্স ভিন্নশক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা বাহ্য ষট্ক্ষে দেখি, তাই যে সত্য, তারও ত প্রমাণ নেই! জন ঈযার্ট মিল বলেছেন, মানুষ সত্য সত্য কোরে পাগল কিন্তু বাস্তবিক সত্য (Absolute truth) মানুষের বোঝবার ক্ষমতা নেই! কাবণ, ঘটনাক্রমে বাস্তবিক সত্য মানুষের হস্তগত হলে তাই যে বাস্তবিক সত্য, এটা সে বুঝবে কি কোবে? আমাদের সমস্ত জ্ঞান Relative (আপেক্ষিক), Absolute বোঝবার ক্ষমতা নেই। অতএব Absolute ভগবান বা জগৎকারকে মানুষ কখনই বুঝতে পারবে না।”

স্বামীজি বললেন,—“তোমার বা সচরাচর লোকেব Absolute জ্ঞান না থাকতে পারে, তা বোলে কাবো নেই, এ কথা কি কোরে বল? জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান বোলে দু'রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক উহা মিথ্যা জ্ঞান! সত্য জ্ঞানের উদয় হোলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব দেখায় এক! দ্বৈতজ্ঞান অজানপ্রস্থত।

আমি বললাম,—“স্বামীজি! এ ত বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুই জিনিষ থাকে, তা হোলে আপনি যাকে সত্যজ্ঞান ভাবছেন, তাও ত মিথ্যাজ্ঞান হোতে পারে আব আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলছেন, তাও ত সত্য হোতে পারে।

তিনি বল্লেন,—“ঠিক বলেছ, তজ্জুই বেদে বিশ্বাস করা চাই। আমাদের পূর্বকালের মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানেব পাবে গিয়ে ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব কোবে ষা বোলে গেছেন, তাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাব মধ্যে কোন্টা সত্য কোন্টা অসচ্ছা, আমাদের বিচার কোরে বলবার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পাবে গিয়ে দাড়িয়ে—ঐ দুই অবস্থাকে পবীক্ষা কোরে দেখতে পারবো, ততক্ষণ কেমন কোরে বোলবো,—কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যে। শুদ্ধ দুটো বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হচ্ছে, এইটা বলা যেতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অল্পটাকে ভুল মনে হয়। স্বপ্নে হযত কল্কেতায় কেনাবেচা কল্পে, উঠে দেখ, বিছানায় শুয়ে আছ! যখন সত্যজ্ঞানেব উদয় হলে, তখন এন ভিন্ন দুই

দেখ্বে না ও পূর্বের বৈজ্ঞানিক মিথ্যা বোলে বুঝতে পারেন। কিন্তু এ সব অনেক ঘুরের কথা, হাতে ঝড়ি হতে না হতেই রাসায়ন, মহাভারত পড়বার ইচ্ছা কোলে চোবুবে কেন? ধর্ম অমৃতবের জিনিষ, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার নয়। হাতে নাতে কোজে হবে, তবে এর সত্যাসত্য বুঝতে পারেন। একথা তোমানের পাশ্চাত্য Chemistry (রাসায়ন) Physics (পদার্থবিদ্যা) Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রকৃতিবও অনুমোদিত। আর হু বোতল Hydrogen (উদজ) আর এক বোতল Oxygen (অক্সিজেন) নিয়ে জল কৈ বলে কি জল হবে, না, তাদের একটা শরু জাষগায় রেখে Electric current (তড়িত প্রবাহ) তার ভিতর চালিয়ে তাদের Combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) হোলে তবে জল দেখতে পাবে ও বুঝবে যে, জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস হোতে উৎপন্ন। অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি কত্তে গেলেও সেইরূপ ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণে যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসেব অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসেব ত কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিটে বাধা রয়েছে। একমুহূর্ত্ত আশানবৈরাগ্য হল, আর বলেন কি না, কৈ, আমি ত সব এক দেখছি না।”

আমি বললাম,—“স্বামীজি, আপনার ও কথা সত্য হোলে যে Fatalism (অনুষ্ঠান) এসে পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে সাবার নয়, তবে আব চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে, তখন আমারও হবে।”

তিনি বলেন,—“তা নয়। কর্মফল ত অবশ্যই ভোগ কত্তে হবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ সকল কর্মফল খুব অল্প সময়েব মধ্যেই নিঃশেষ হতে পারে। ম্যাজিক লণ্ডনের ৫০খানা ছাব ১০ মিনিটেও দেখান যায় আবার দেখাতে দেখাতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।”

স্মৃতিরহস্ত সম্বন্ধেও স্বামীজির ব্যাখ্যা অতি সুন্দর।—“স্মৃতি বস্তুমাঝেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ স্মৃতি বস্তুর চেতন ভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করেছেন; কেহ বলেন,—মানুষ ল্যাজবিহীন বানর বিশেষ, কেহ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনা-শক্তি আছে, কেহ বলেন, তাহার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ



বেশী—যাহাই হউক, মাতৃময় প্রাণবিশেষ ও প্রাণিসমূহ হইতে পদার্থের অংশ মাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। এখন হইতে পদার্থ কি, বোঝাবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ বিশেষরূপ উপায় অবলম্বন কোরে এটা কি, ওটা কি, অনুসন্ধান কবতে লাগলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় ও উর্বরা ভূমিতে শরীর রক্ষার জন্য যৎসামান্য সময় মাত্র ব্যয় কোরে কোপীন পোবে প্রদীপের মিট মিটে আলোয় বসে আদ্য জল খেয়ে বিচার কোবতে লাগলেন, এমন জিনিষ কি আছে, যা জানলে সব জিনিষ জানা যায় (What is that by knowing which everything will be known)। তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাষেই চার্লসের বস্তুসত্তা মত (Ultra-materialistic theory) থেকে শব্দবাচার্য্যের অদ্বৈত মত পর্য্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্ম্মে পাওয়া যায়। হুইটলই ক্রমে এক জাঘগাঘ উপস্থিত হইলেন ও এক কথাই এখন বলতে আবশ্যক করেন। হুইটলই বলছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশ মাত্র। কাল ও আকাশও (Time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসব, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সমগ্রজ্ঞাপক কাল, যাহার অনুভবে সূর্য্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, তাবিষা দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য্য অনাদি নহে; এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্য্যের সৃষ্টি হয়নি। আবার এমন সময় আসবে, যখন আবার সূর্য্য থাকবে না, ইহা নিশ্চিত। তা হলে অথও সময় একটা অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বললে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎসম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জাঘগাঘবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকার সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্টি বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও তদ্রূপ সময়ের মত অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌর-জগৎ ও সৃষ্টবস্তু কোথা হোতে কিরূপে এল? সাধারণতঃ আমরা কল্পা ভিন্ন ক্রিয়া দেখতে পাই না। অতএব মনে কবি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তা হলে সৃষ্টিকর্তারও ত সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক, তা থাকতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের ত বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ সকল কটি অনন্ত পদার্থই এক ও একই ঐ সকলরূপে প্রকাশিত।

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করি, “স্বামীজি, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস, বাহ্য সাধা-  
বশে প্রচলিত আছে, তাহা কি সত্য ?” জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, “সত্য  
না হবার ত কোন কাবণ দেখি না। তোমাকে কেহ করুণ স্বরে মিষ্টভাষায়  
কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তুমি সন্তুষ্ট হও আব কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা  
বোলে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অগিষ্ঠাত্মী দেবতাও যে  
সুসজ্জিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হবেন না, তাহা মানে কি ?”

এই সকল কথা শুনে আমি বোল্লুম, “স্বামীজি, আমার বিদ্যা বুদ্ধির দৌড়  
তো আপনি সবই বুঝতে পারছেন, এখন আমার কি কথা কর্তব্য, আপনি  
বলে দিন।” তিনি বলেন,—“প্রথমে মনটাকে বশে আনতে চেষ্টা কর, তা  
যে উপায়েই হোক, পরে সব আপনিই আসবে। আর জেনো,—অবৈত  
জ্ঞানটা ভারি কঠিন, কেনে বেঝো যে, ঐটেই মনুজ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য  
বা লক্ষ্য ( highest ideal ) কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌছিবাব পূর্বে অনেক  
চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও বর্ষাধ বৈরাগ্য ভিন্ন উহার  
অমুভবেব অস্ত্র উপাধ নাই।”

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম ।

( স্বামী প্রকাশানন্দ )

পূর্ণতাই জীবের চরম লক্ষ্য। ইহাবই প্রেরণায় সংসারে এত উদ্যম ও  
উৎসাহ, এত স্বপ্নের সংঘর্ষ, এত স্রবের অতিশযা ও এত হৃৎধের পরাকর্ষ।  
পূর্ণতালাভ করিতেই হইবে, নচেৎ বিরামও নাই, চেষ্টার অবসরও নাই।  
সর্বোত্তমিহিত পূর্ণ অধিতীয় চেতন্য আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য সতত  
ব্যস্ত। তাহার সে চেষ্টা বোধ করিবন্ধ সামর্থ্য কাহারও নাই। জীবের  
রুদয়তন্ত্রীতে সতত ‘অহমহমিতি’ এই বৈশ্বর বাজিতেছে, তাহার অর্থই  
হইতেছে,—প্রকট হইব, স্বহিমা প্রকাশ করিব! জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে  
সকলের চেষ্টা সেই দিকে ধাবমান।

ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া মানুষ সেই চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর আবার  
প্রত্যেকেব অজনিহিত শক্তিপ্রকাশসামর্থ্য সমান নয় বলিয়াই প্রত্যেক বাহু-  
ধের ভাব ও রুচি এত বিভিন্ন। বিভিন্নভাবেপন্ন মানবমণ্ডলীকে সাধারণতঃ

চারিশ্রেণীতে বিভক্ত কবিত্তে পারা যায়। ১ম জ্ঞানী, ২য় ভাবপ্রবণ বা তক্ত, ৩য় বোগী ও ৪র্থ কর্মী।

জ্ঞানী কেবল সত্য চাহেন। ভাবের উচ্চাস তাঁহার ভাল লাগে না। তিনি যুক্তি দ্বারা প্রত্যেক জিনিষ চুল চিরিয়া বিচার করিয়া তন্মধ্য হইতে অসার বাদ দিয়া সারগ্রহণে নিযুক্ত। জগতের অসাব্যস্ত ও অস্বাভাবিক দেখিয়া তিনি ‘নিত্যো নিত্যানাং’ বস্তুব অবেষণে অহুক্ষণ ব্যস্ত হন। জুর্ভাগ্যবশতঃ এ পথে বিপদাশঙ্কা কম নহে! ষথার্থ তত্ত্বাধ্বষীৰ সংখ্যা অতি বিরল। অনেকেই এ পথে বহুদূর যাইতে না যাইতে গুরু যুক্তিজালে জড়াইয়া পড়েন এবং শব্দজালরূপ মহাবণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পণ্ডিত হইয়া থাকেন। এইরূপ অসম্পূর্ণ জ্ঞানভিমাত্রী জ্ঞানের বদহজ্জমে ভক্তিপ্রেম ইত্যাদিকে মন্ত্রিকবিকৃতির পরিণাম মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা কবিত্তে পশ্চাৎপদ হন না।

ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ভাববাজোই বিচরণ কবেন! তিনি প্রকৃতিব মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং সকল সৌন্দর্য্যের আকর সৌম্য্যাসৌম্য্য ভগবানকে দর্শন ও লাভ কবিবার ক্ষমতা তাঁহার প্রাণ সতত কাঁদে। ‘ভক্ত হাঙ্গে কাঁদে নাচে গায়।’ তক্ত বলেন, আমিবা ক্ষুদ্র মানব, যুক্তি তর্ক কবিয়া ভগবন্তের কিরণে বুঝি? যুক্তিতর্ক কবিয়া বুঝা সময় ক্ষেপণেবই বা প্রয়োজন কি? ‘বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি’—বিশ্বাসই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার একমাত্র মূলমন্ত্র। কিন্তু এমন সূক্ষ্ম পথেও বিপদের ভীষণ ছায়া দণ্ডায়মান এবং ষথার্থ বিশ্বাসমান ভক্তের সংখ্যাও সংসারে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিপথেব বিপদ—যুক্তিব উন্নত মস্তকে কুঠাবাঘাত কবিয়া গোঁড়াহী ও অন্ধবিশ্বাস রূপ অনলে আপনাদিগকে চিব আহুতি প্রদান কবা। ভক্তিব ঐরূপ বদহজ্জমে জ্ঞানের শতীৰ তত্ত্বাদিব অর্থ বৃদ্ধিতে পারা যায় না এবং ঐ সকল ভক্তেরাই জ্ঞানকে ঢেঁকিব কচকচি ও নীচস প্রভৃতি বলিয়া কটাক্ষ করিয়া থাকেন।

চিন্তরুত্তিনিরোধ দ্বারা সমাধিদ্রষ্টাই বোগীর উদ্দেশ্য। তিনি অষ্টাঙ্গ-বোধ সাধন কবিয়া মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনে প্রয়াস করেন। এ পথেব বিপদ—উদ্দেশ্য ভুলিয়া মনেরই এক অংশের দাসত্ব করা। সংযম-সহায়ে মনোনিহিত গুপ্তশক্তিসমূহ একে একে জাগরিত হইয়া উঠে। ঐ সকল চুরদর্শনশ্রবণাদি শক্তির অসাধারণত্বে দুর্বল মানব মোহিত হইয়া তন্মত্ই জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া থাকে এবং ঐ সকল শক্তির কিছুমাত্র

লোকায় আপনাতে দেখিতে পাইলে অহঙ্কারে ক্ষীত হইয়া আপনাকে কৃত-  
কৃতার্থ মনে কবে। ফলে মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবাব কথা ভুলিয়া  
গিয়া মনের ঐ সকল শক্তির অধীনে অবনতমস্তকে দাসত্ব কবিতে থাকে।  
ইহাই যোগের বদ্বৈজ্ঞান্য। ইহা একবার আসিবে যাওয়া বড় কঠিন। ইহাতে  
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম প্রভৃতি তত্ত্বলাভের উপায় সমূহকে অতিক্রম মনে হয় এবং  
অহঙ্কারের আবরণে চক্ষু ঢাকিয়া যাওয়ায় বিপথে ঘাইয়া পড়িতে হয়।

কর্মী,—জ্ঞান, যোগ বা ভক্তি কামনা করেন না। তিনি চাহেন কায।  
পবোপকারার্থে কায কবিয়া জীবনপাতই তাঁহার উদ্দেশ্য। জীবের হিতার্থে  
কায কবিয়া প্রাণ দিতে তিনি সতত প্রস্তুত। বিশ্বাস, জ্ঞান, ভক্তি, শ্রেয়  
প্রভৃতি অপূর্ণ জিনিষের সন্ধান তাঁহার নাই। তাই তিনি নিজ কর্মরূপ গভীর  
বাহিরে আবদ্ধ কিছুই দেখিতে পান না। এ পথেব বিপদ—অজ্ঞান হারাইয়া  
কায করা বা স্বার্থপরতাকেই কার্য্যের উদ্দেশ্য হানে বসান। কর্মের বদ্বৈজ্ঞান্যে  
কর্মীটা যে একটা উপায়মাত্র উদ্দেশ্যে পৌঁছিবাব, তাহা ভুলিয়া ঘাইয়া মানুষ  
কাযের কোঁকে পাগল হইয়া অহঙ্কার কায করিতে থাকে। কর্মরূপ ভূত  
তাঁহার ঘাড়ের চাপিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অধীনে বাধিয়া যথা ইচ্ছা লইয়া বেড়ায়।  
যান জ্ঞান জ্ঞান ভক্তি এ সকলের সে একটা বড় আবশ্যকতা দেখে না।

জানী জ্ঞানপথই জানেন। কেহ যদি তাঁহার মত ঐ পথেব পথিক  
হন, তবেই তিনি সে পথেব তর যতদূর নিলে বুকেন, বুঝাইতে ও শিখা-  
ইতে পাবেন। যোগ, ভক্তি এবং কর্মের পথ দিয়াও মানুষ যে সত্যলাভ  
কবিতে পারে, একথা তাঁহার অজ্ঞাত, অপরিচিত, অসম্বন্ধ বলিয়া বোধ হয়।

ভক্ত রূপসাগরের উত্তাল তবঙ্গমালায় অঙ্গ ভাসাইয়া তাহাদেরই সহাবে ও  
শক্তিতে কেমনে মানুষ নির্মিয়ে কুলে পৌঁছিতে পারে, তাহা যতদূর নিম্ন  
জীবনে প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন, তাহাই লোককে বুঝাইতে ও শিখাইতে পারেন।  
অপরাপর পথ দিয়া ঐ ফললাভ করা তাঁহাকে বুদ্ধির অগম্য।

যোগী সংঘম ও একাগ্রতাসহাবে মনকে আয়ত্ত কবিয়া শান্তিলাভ  
কবার কথাই বুকেন এবং যতদূর ঐ বিষয় নিজে বুঝিয়াছেন, তাহাই অপরকে  
বুঝান ও শিখান। সমষ্টিমনে যে আর কত বিচিত্র শক্তিপ্রকাশ বর্ত্তমান,  
তাহা এবং যে সকল পথ দিয়া ঐ সকল বিচিত্র প্রকাশের অল্পভূতি হয়,  
তাহা তাঁহার বুদ্ধির অগোচর।

কর্মীও ঐরূপে কর্ম সহাবে আপন স্বার্থ চিরকালের মত ভাসাইয়া অগ্র-

সর হইতে জানেন। অপরাপর মত এবং পঞ্চসমূহ তাঁহার নিকট অমানিশার  
অন্ধকারপূর্ণ অরণ্যানীবেশে বলিয়া উপলব্ধ।

যিনি যে পথ জানেন, তাহারই সংবাদ তিনি দিতে পারেন। এক-  
পঞ্চদশোঁর জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ, একথা নিশ্চিত। তিনি যে একঘেঁষে, তাহাতে  
সন্দেহ নাই। একশ্রেণীব ব্যক্তিবাই কেবল তাঁহাধাৰা উপকৃত হইতে  
পারেন। আবাব আপনাব মতকেই একমাত্র কল্যাণপ্রদ পথ বলিয়া মনে  
করিয়া অত্যাধ পঞ্চাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়াও তাঁহার  
পক্ষে একপ্রকার সুনিশ্চিত। জগতে যে এত গোঁড়াবী ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ,  
তাঁহার মূল বর্তমান এই একঘেঁষে ভাব।

সুতরাং যিনি চাবি পথেরই সন্ধান জানেন, তিনিই যে সকল ভাবেব, সকল  
শ্রেণীব লোকের ষষ্ঠাধ কল্যাণ কবিত্তে পারিবেন, ইহা আব বলিতে হইবে  
না। জ্ঞানতত্ত্বের পথিক তাঁহার নিকট জ্ঞানতত্ত্ব ভিক্ষা চাহিলে প্রত্যাখ্যাত  
হইবেন না, ভক্ত তাঁহার নিকট যাইলে তাঁহার ভক্তি-উৎস খুলিয়া বাইবে,  
যোগপিপাসু তাঁহার কৃপাধ চিত্তসংঘমাধি কবতলস্থ কবিবার উপায়ের  
সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইবে এবং কর্ম্মাও কার্য্যক্ষেত্রে সেই রূপ তাঁহারই  
সমীপে “কর্ম্মেবু কোশলম্” রূপ ষোগোপদেশ লাভ কবিয়া অপ্রতিহতভেজে  
কর্ম্ম কবিয়া সিদ্ধকাম হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

আব একটা প্রশ্ন হইতে পাবে, একপথ অবলম্বন করিয়া গন্তব্য স্থানে  
পৌছানই যখন কত কঠিন, তখন জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মেব একত্র সমা-  
বেশ এক মানবে সম্ভবপব কি? উত্তরে বলা যাইতে পাবে,—আদর্শ লইয়া  
সন্দেহ উঠিলে মহাপুরুষগণেব জীবনই একমাত্র মীমাংসাব স্থল। মহাপুরুষ-  
গণ আদর্শ জীবন লইয়া আসেন। তাঁহাদেব মহৎ জীবনেব দৃষ্টান্ত দেখিয়াই  
সেই ছাঁচে জীবন গঠন কবিত্তে মানুষ চেষ্টা কবিয়া থাকে এবং উহাব ফলে  
সেই উচ্চ আদর্শ অন্ততঃ কতক পরিমাণে প্রতিফলিত কবিত্তে পারিবে বলিয়া  
বিশ্বাস কবিত্তে পাবে।

কে সেই মহাপুরুষ, তাঁহার জলন্ত জীবন ঐরূপ সমস্ত ভাবেব, সমস্ত  
মতেব ও সমস্ত ধর্ম্মেব একত্র মিলন ভূমি? কে সেই বীরাগ্রণী, যিনি জগতের  
নামরূপাদিহ অনিত্যতা বিশেষরূপে জদয়ঙ্গম কবিয়া ত্যাগ বৈরাগ্যের চলমান  
বিগ্রহ হইয়াও নাবায়ণপ্রেমে এবং সেই নাবায়ণেব সাক্ষাৎ মূর্ত্তি মানবপ্রেমে  
লক্ষ লক্ষ বার জন্মমরণজরাব্যাবির সুদৃঢ় মন্দির রূপ দেহধারণ কবাই সুখের

পরাকর্ষী জ্ঞান করিয়াছিলেন? কে সেই ‘অহেতুককৃপাসিদ্ধ’ যিনি জাতিবর্ণ দেশ ও ধর্ম নির্বিশেষে সমভাবে সকল লোকের জুড়াইবার স্থল হইয়া অভয় বাণী দানে সকলের হৃদয়সম্প্রাপ্ত করিয়াছিলেন? পাঠক! বলিতে হইবে কি, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে একবার দণ্ডায়মান হইলেই ঐ প্রশ্নের উত্তর স্বতই প্রাণে অনুভব করিবে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের একত্র সমাবেশ ও পরাকর্ষী শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে কি অদ্বুত ভাবেই বিকসিত হইয়াছিল! “সেই জ্যোতির্ময় বৃক্ষে ধোলো ধোলো রাম ও কৃষ্ণ ফুলছে। দেবর্ষি নারদাদি দূব হইতে ব্রহ্ম সমুদ্রের দর্শন করে এবং গর্জ্জনমাত্র শুনেই ফিবে এসেছিলেন এবং তাহারই ফলে আনন্দময় হয়ে রাবে ঘাবে চরিত্রানামগান কবে ঘুরেছিলেন, অল্প কোন কথা কহা তাঁহাদের অসম্ভব হয়েছিল। আব জ্ঞানগুরু মহাদেব সেই ব্রহ্মসমুদ্রের এক গণ্ডুয মাত্র জল পেয়েই শবের মত হয়ে সমাধিস্থ পড়ে আছেন! তুকেদেব প্রভৃতি সে ব্রহ্মরূপ চিনির পাহাড়ে পিপড়েব মত” প্রভৃতি জ্ঞানেব কথা বলিতে বলিতে তিনি একদিকে যেমন খোব নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইতেন, তেমনি আবার অল্পদিকে ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া স্তম্ভপুর কণ্ঠে ভগবদ্গায়ত্রীগানে পাশেব মন্ত্রভূমি প্রাণেও ভক্তিব প্রবলবহা বহাইয়া দিতেন! আবার কত দিনই না যোগবিভূতিমণ্ডিত সেই প্রশান্ত মহাপুরুষ প্রাতঃকাল হইতে প্রায় রাত্রিশেষ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ঈশ্বরীয় যোগেব কথায় সনাগত ব্যক্তিসকলকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ কবিয়া শুভিত কবিয়া বাধিয়াছেন! শাবীকিক অসুস্থতানিবন্ধন চিকিৎসকেবা যখন তাঁহাকে বাক্যমাত্র উচ্চারণ করিতে নিষেধ কবিয়াছিলেন, জীবকল্যাণে উৎসর্গীকৃতজীবন সেই মহাপুরুষেব তখনই কি ঈশ্বরীয় কথার বিরাম ছিল?

ত্রীরামকৃষ্ণ জীবনরূপ অপূর্ণ ছাঁচে গঠিতপ্রাণ পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেও জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্মের কেমন একত্র সমাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার জ্ঞানেব গভীরতা কথায় আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহা প্রায় সর্বজনবিদিত। আবার ‘সবদুঃখ দূব কবিলে দরশন দিখে মোহিলে প্রাণ, সন্তলোব ভুলে শোক তোমাবে হেরিয়ে, কোথা আমি দীন অতি দীন’ গাহিতে গাহিতে অবিরল প্রেমধারায় প্রাবলিতগুণ্ডুল তাঁহার ভক্ত্যুজ্জ্বল দেখিয়া কত দিন না আপনাদেব ধগজ্ঞান কবিয়াছি! কখন বা আবার ধ্যাননিমগ্ন সেই মহাপুরুষের গভীর মূর্ত্তি দেখিয়া কতই না সকলে

বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার অপূর্ণ কর্ম্মোদ্যমেব কথা আবার কি বলিতে হইবে? তাঁহার আমেরিকান বন্ধু ওডইয়ার বলেন, আমেরিকায় অবস্থান কালে তাঁহাকে কি পরিশ্রমই কবিত্তে হইয়াছিল। প্রতি রবিবারে সাধারণের জন্ত একটা বক্তৃতা এবং অন্যান্য উপদেশ ও প্রবোক্তবদান ব্যতীত সপ্তাহে চটা কবিয়া বক্তৃতা দিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। কর্ম্ম করিতে করিতেই তাঁহার জীবন পাত হয়, এ কথাও এখন আব অনেকের জানিতে বাকি নাই।

এই মহাপুরুষদ্বয়ের অপূর্ণ জীবনেতিহাস দেখিয়া এবং শ্রবণ কবিয়াই লোভ হয়,—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মেব একত্র সমাবেশ মনুষ্যজীবনে সম্ভব-পর। আমাদের পূর্ব সাংসার ও শিক্ষা উহার বিকল্পে দণ্ডায়মান হইলেও অভ্যাস, বৈরাগ্য ও অবিবাহ চেষ্টা দ্বারা যে ঐ আদর্শে জীবন গঠন করা যাইতে পারে, ইহা এখন বিশ্বাস হয়। ঐক্লপ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যজীবন গঠন কবিত্তে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের জীবনসাধারণের জগৎবহুস্ত। তাঁহাদের জলন্ত জীবনবেদের মহিমায ধনীত্বী এই মহামূল্য সত্যধনে ধনী হইয়া ধন্য হইয়াছে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ বা কর্ম্মেব একটীমাত্রের অত্যধিক আলোচনায় বিপদেবও সম্ভাবনা। যেমন জ্ঞানের অধিক চর্চায় সদয় হ্রাস হইয়া যাইবার ভয় আছে, আবার ভক্তির অত্যধিক সেবনে তেমনি ভক্তির আপাতঃ উন্নতি (Fanaticism) আদিয়া সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। অত্যধিক কর্ম্মদ্বারা চিত্তচাক্ষু্যাদির যে রূপ হয় আছে, অত্যধিক যোগাদির অনুশীলনে জীবের কলাগণকর যথার্থ কাষ ছাড়িয়া কেবল কল্পনাবাজ্যে বিচরণেবও তরুণ ভয় আছে। তাই মনে হয়, এই কালে ঐ মহাপুরুষদ্বয়ের শ্রীপাদুকা মন্তকে ধারণ কবিয়া তাঁহাদেরই শ্রীপদানুসরণ কবিয়া জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্ম্মেব সমবায়ে চবিত্ত গঠিত কবিত্তে চেষ্টা করায় নিজের কল্যাণ হইবে এবং উহাতে অপবেবও পবম কল্যাণ সাধন কবিত্তে সক্ষম হইয়া মাতৃষ ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে।

৩

## ভক্তের জাতি।

( ভক্তমাল হইতে গৃহীত । )

ভগবানের যে প্রকৃত ভক্ত, তাহার জাতি বিচার নাই। ভক্তেরা এক সত্ত্ব জাতি। এই শাস্ত্রবাক্যে কার্যে পরিণতির অনেক উদাহরণ বৈষ্ণব ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়।।

মুবারিদাস নামে এক ভক্ত ছিলেন—তিনি জাতিতে চৰ্ম্মকার। তাঁহাব অনেক সদগুণ ছিল। তিনি অতিশয় শাস্ত্রস্বভাব, মিষ্টভাষী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহাব অভিমানের লেশমাত্র ছিল না। তিনি ভগবৎপ্ৰসঙ্গ ব্যতীত অন্য কথা কহিতেন না। তাঁহাব ইন্দ্ৰিয়গ্রাম তাঁহাব বশীভূত ছিল এবং তিনি সৰ্ব্বদা ভক্তিবসানন্দে বিভোব থাকিতেন।

সেই স্থানে বসিক মুবাৰি নামে একজন মোহান্ত বাস করিতেন। তিনি সেই দেশের রাজার গুরু। তিনি সদগুণেব অতিশয় আদৰ করিতেন বলিয়া মুবাৰিদাসকে চৰ্ম্মকার জানিয়াও তাঁহাব গুণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন হঠাৎ তাঁহাব গৃহে উপনীত হইলেন। মুবাৰিদাস মোহান্তজীকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একবাব এগিয়ে যান আবাব পাছু হাঁটিয়া আসেন, ষবে তাহাকে বসিতে দিবাৰ উপযুক্ত আসন নাই। কি কবিলেন, তিনি কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দূবে গিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বসিক মুবাৰি তাঁহাব দৈন্তে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন মুবাৰিদাস অতি কাতৰ হইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘ঠাকুর, আমাকে কেন স্পৰ্শ কবিতেছেন? আমি অতি নীচ জাতি—আমি বুকুবেব অধম।’ তখন বসিক মুবাৰি কহিলেন, ‘আপনি কি বলিতেছেন? আপনি সাধুশ্ৰেষ্ঠ—আপনার আবাব জাতি কি? আমি আপনাকে স্পৰ্শ করিয়া পবিত্ৰতা লাভ কবিব।’ এইরূপ বলিয়া কোনরূপ কৌশলে ঐ চৰ্ম্মকারের পাদোদক পান কবিলেন ও তাঁহাকে নানারূপ স্তবস্তুতি করিয়া নিজস্থানে প্ৰত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে রাজা পৰম্পৰায় ঐ সংবাদ শ্রবণে গুরুর উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। মোহান্তজী একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে পূৰ্ব্ববৎ সন্তোষবাদি কিছুই কবিলেন না। তাহাতে তিনি বলিলেন, ‘মহাবাজ, আমি আপনার গুরু, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অথচ আপনি আমাকে সন্তোষণ পর্য্যন্ত কুৰিতেছেন না কেন?’ রাজা মহা বিবক্ত হইয়া বলিলেন, ‘এখানে কেন আসিয়াছেন? যান, সেই মুবাৰিমুচির বাড়ী যান।’ মোহান্তজী গেলেন, রাজার অতিশয় জাত্যভিমান। তাঁহাব ঐ জাত্যভিমান দূৰ কবিবাব অভিপ্ৰায়ে বলিতে লাগিলেন, ‘রাজা, আপনি অতি মূৰ্খ। বুদ্ধিমান, ভগবান যে আমাব মুবাৰিদাসের পাদোদক পান কবাইয়াছেন, সে কেবল আপনার তমোনিবারণেব জন্ত। আপনি আপনাকে একজন ভগবন্তস্ত বলিব অভিমান কৰিয়া থাকেন। কিন্তু জানেন



না কি, ভক্তে যে জাতিবুদ্ধি করে, তাহার কখন ভক্তিগাত হয় না ? তাহার প্রতি ভগবানের রূপাও হয় না, তাহার সকলধর্মই নষ্ট হয়। অতএব ভক্ত যে কোন বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি পবন পবিত্র।”

এই সকল উপদেশে রাজার চৈতন্য উদয় হইল।

## সমালোচনা ।

### আমার জীবন ।

শ্রীমতী রাসমুকুন্দী কর্তৃক লিখিত। কলিকাতা, ১২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসবসীসাল সরকার দ্বারা প্রকাশিত।

গ্রন্থখানির নাম দেখিয়া আপাততঃ অনেকের মনে উদয় হইতে পারে যে, ইহা কোন নব্যশিক্ষিতা ইংবাজী আলোকপ্রাপ্তা বঙ্গমহিলার লিখিত। কিন্তু পুস্তকখানি খুলিলেই সেই ভ্রম দূর হয়। ১২১৬ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গ জন্ম হয়। অতি বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন হইল, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এইগ্রন্থে অতি সৰল ভাষায় প্রাচীন হিন্দুধর্মগীর জীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাহিনীগুলিতে বিশেষরূপে না থাকিলেও প্রাণের ভাষায় লিখিত বলিয়া মর্ম্মস্পর্শী এবং পুস্তকখানি পাঠ করিতে আবশ্য কবিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। এই পুস্তকখানির আবণ্ড অনেক উপযোগিতা আছে। ইহা প্রাচীন হিন্দুসমাজের একখানি নির্খুঁত চিত্র বলিয়া বক্ষা কবিবার এবং পাশ্চাত্যভাষায় অনূদিত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজে হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক জ্ঞান সঞ্চার করিবার উপযুক্ত। আধুনিক বধুগণ এবং নব্যতন্ত্রে শিক্ষিতা বঙ্গীগণ এই পুস্তকপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। বস্তুতঃ এখানি উচ্চদরের স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত। গ্রন্থকর্ত্রী আত্মস্তিক ধর্ম্মপ্রাণতা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত।

সাঁহারা স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শিক্ষার বিবোধী অথবা সাঁহাবা মনে করেন, তাঁহাদের লেখাপড়া শিক্ষার তত আগ্রহ বা উপযুক্ততা নাই, আমাদের বিশেষ অনুরোধ, -- তাঁহারা এই পুস্তকখানি একবার আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিবেন। অতি বালিকা বয়সে নিজ পিতৃগৃহস্থিত বাজকবিদ্যালয়ে মেয়েব নিকট বসিয়া বসিয়া বিনাশিক্ষায় বালকদিগের পড়া শুনিতে শুনিতে

মনে মনে অক্ষর শিক্ষা করেন। চতুর্দশবর্ষ বয়সে স্বতন্ত্রগৃহে অবস্থান কাসীন 'আমার মনে মনে নিতান্ত চেষ্টা হইল যে, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেঘেছেলে লেখাপড়া শিখিত না।' তখনকার লোকের ধারণা ছিল যে, ত্রীলোকগণের লেখাপড়া শেখা অতি গর্হিত কার্য্য। সুতরাং 'যদি একখানি লেখা কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মুখে দেখিতাম না। পাছে কেহ বলে, লেখাপড়া শিখিবাব জন্তই দেখিতেছে।' পরে কি কবিতা ইনি লেখাপড়া শিখিলেন, সেই বিবরণ বড় মশ্শুপ্পর্শী। আমাদের ইহা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিবাব ইচ্ছাসত্ত্বেও স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তিনি বালিকাবস্থায় সেই বালক বিদ্যালয়েব কণা ভাবিতে লাগিলেন। তাহাতে অক্ষর ফলা বানান সহিত তাঁহার মনে হইল। শেষে একরাত্রে স্বপ্নাবেশে দেখিলেন যে, তিনি চৈতন্তভাগবত পড়িতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার মনে অতিশয় উৎসাহ ও আশ্লাদ হইল। কিন্তু সেই বাটীতে চৈতন্তভাগবত পুঁথি আছে কিনা এবং যদি থাকে, তাহাও তিনি কি প্রকারে চিনিবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ অতিশয় আকুল হইল। দৈবক্রমে তাঁহার স্বামী তাঁহার কর্ণগোচরে পুত্রকে বলিলেন, এই চৈতন্তভাগবত পুঁথিখানি রহিল। বপন বলিব, তখন অসুস্থস্বরে লইয়া বাইবে। এইরূপে চৈতন্তভাগবত পুঁথিব উদ্দেশ্য পাইয়া তিনি তাহার একখানা পাতা লুকাইয়া স্নানঘরে রাখিলেন এবং ছেলের একখানি লেখা তাল পাত লইয়া সেই পাতার সহিত নিজ মনের অক্ষরগুলি এবং লোকের কথাব সহিত মিলাইয়া অনেক কষ্টে চৈতন্তভাগবত পড়িতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইনি যদি বালিকা বয়স হইতে শিক্ষকের সাহায্য পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একজন অসামান্য বিদূষী হইতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নিজ জীবন প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহাতে যখন মনের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া ভস্মিত হইতে হয়।

## সংবাদ ও মন্তব্য ।

বিগত এপ্রেল মাসে বাবাণদীনবাসী পরলোকগত কীর্তিচক্রবাগ্‌টি মহাশয়েব সহধর্মিণী শ্রীমতীইচ্ছামবী দেবী ৫০ টাকা এবং মে মাসে কুমারজিলা হইতে এন, ভি, বঙ্গবাও বাহাদুর ৫০ টাকা বাবাণদী বামকুমার-সেবাশ্রমের সাহায্যার্থ এককালীন দান কবিয়াছেন ।

বামকুমার মিশনের ঢাকা শাখা হইতে ইংরাজী ভাষায় বামী বিবেকানন্দেব জীবনী ও উপদেশ প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে । পুস্তকে ঘটনাসমিবেশ যদিও অল্প, কিন্তু হইতে একবিন্দু অসত্য বা অতিবিস্তৃত বর্ণনা স্থান পায় নাই । বিশ্বস্তম্বরে যতদূর ঘটনা সংগৃহীত হইতে পারিযাছে, তাহা এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণেব উপর নির্ভর কবিযাই এই পুস্তক খানি সঙ্কলিত হইযাছে । পুস্তকেব কাগজ এবং ছাপা অতি সুন্দর । আমরা ঢাকা বামকুমার মিশনেব এই কার্যাত্মকতায় বিশেষ সুখী হইযাছি । আশা করি, তাঁহারা একখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জীবনীসঙ্কলনেব চেষ্টা করিবেন ।

পাশ্চাত্যজাতি ধীবে ধীবে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজেব উপর প্রকা ও সহ-জড়তিসম্পন্ন হইতেছেন, আজকাল তাহাব অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে । লাহোবেব ভূতপূর্ব বিশপ সম্প্রতি ইংলণ্ডে একটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিযা-ছিলেন,—‘ধর্মভাব ভারতবাসীেব মজ্জাগত, আধ্যাত্মিকতা তাহাব প্রাণ । ভারতবাসী জড় জগতেব উন্নতিকেই সভ্যতােব মূলমন্ত্র বলিযা জ্ঞান কবে না । আমরা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্মতত্ত্ব শিখাইতে যাইতেছি । কিন্তু তাহারা যে ধর্ম বিষয়ে আমাদেব অপেক্ষা অনেক উন্নত ।’

মিক্সেব এস, এইচ, সুইনি পজিটিভিটি বিভিন্ন পত্রিকায হিন্দুগণেব সমাজ-সংস্কার নামক প্রবন্ধে অনেক সাব কথা বলিযাছেন ;—‘অনেক সংস্কারক অন্ধ-ভাবে ইংরাজদেব সবই ভাল ও ভারতেব সবই মন্দ, দেখিয়া থাকেন । এই জগুই অধিকাংশ ভারতবাসী এই সকল সংস্কারেব বিরোধী । ভারত ইউ-রোপীয় সভ্যতােব সাবগুলি যথা উহাব বিজ্ঞান—আপনাব কবিযা লইতে পারে, কিন্তু ধীবভাবে ও বিচারেব সহিত অগ্রসব হইলেই প্রকৃত উন্নতি হয়, অপরেব অন্ধ অনুকরণে কিছু হয় না ।’

## বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

গত ১লা ভাদ্রের উদ্বোধন বন্ধ থাকাতে ১৫ই ভাদ্রের উদ্বোধন  
১৫শ সংখ্যাকপে প্রকাশিত হইল ।

### স্বামীজির স্মৃতি।

( শ্রীপ্রবিনাথ সিংহ ।

স্বামীজির বাড়ির কাছেই আমাদের বাড়ি ছিল । এক পাড়ার ছেলে  
আমরা ছেলেবেলায় সে-দুটো কয়ে ঠাঁব সাজ করত যে-দাঁড়া খা গেলেছি !  
ঠাঁব পর ঠাঁব জীবন জাণ আমাদের জীবন কত চফায় হায়ে গেল ।  
কত দিন কত বৎসর দেখা সাফায়েই হয় নাই । শ্রমতে পেতাম বটে,  
তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, দেশ বিদেশে ঘুরছেন । আমাব কিন্তু ছেলেবেলা  
থেকে ঠাঁব উপর বিশেষ একটা টান ছিল । তাই বড় হয়েও ঠাঁব কথা  
একদিনও ভুলতে পারি নাই । তিনি যে একটা খুব বড় লোক হবেন,  
এটা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস ছিল । কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে এমন ভাবে যে জগতের  
পূজা হবেন, একথা কে ভেবেছিল বল ? তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াতে  
এই কথাটি মনে হয়েছিল যে, তায়, এত বড় শক্তিমান পুরুষের জীবনটা  
মিছেই হয়ে গেল ।

ঠাঁব পর তিনি আমাদিকান গেলেন । চিকারোর বস্ত্রসংস্কার ও আমাদিকার  
অগ্নিগ্ন্য ত্যাবের বস্ত্র, ঠাঁব সাধারণ একটু আদর কাগজে দেখতে লাগলাম ।  
যা একটু আদর বিবরণ পেতাম, তাতেই খসাব হয়ে যেতাম । তাবলেম,  
আগুন কখনও কাপড়ে ঢাকা থাকে না । এ-দিনে স্বামীজির ভিতরে  
সেই শক্তি জ্বলে উঠেছে । ছেলেবেলাকাণ সেই কা এতদিন ফটেছে ।  
যতই তাব অদ্ভুত কথা কাগজে পড়তে লাগলাম, ততই সেই বাণ্য-  
বন্ধকে আবাব দেখাব জগৎ প্রাণ বাকুল হয়ে উঠতে লাগলো ।

একদিন শ্রমলাম, তিনি দেশে ফিরছেন । মাদ্রাজে এসেছেন, জগদ  
অগ্নিষ বস্ত্রতা কবেছেন । সে বস্ত্রতা পড়লাম, প্রাণ বেতে উঠলো ।  
ভাবলাম, হিন্দুধর্মের ভেতর এই জিনিষ আছে, আব এমন সহজ করে

১৪৫৪-১৪৫৪-১৪৫৪ বোঝান যায় ? এ'র কি অর্থ ? ইনি কি  
মাহুষ না দেবতা ?

তার পর একদিন কলকাতায় তারি হৈ চৈ, স্বামীজি আসিলেন ।  
বাগ-বাজারে পণ্ডপতি বাবুর বাটীতে তাঁর অভ্যর্থনা হলো এবং শীল বাবুদের  
কাশীপুরের গঙ্গাব ধারের বাগানে তাঁকে সঙ্গে করে রেখে আসা গেল ।  
কয়েক দিন পরে বাজা রাধাকান্তদেবের বাটীতে বিরাট সভায় স্বামীজির  
ব্রিঙ্ক-গভীর বক্তৃতা হলো—যে বেথান থেকে শুন্নে, চিত্তার্পিত হয়ে  
রইল । সে সব সেদিনকার কথা—সকলেবই মনে আছে । লিখবার  
আবশ্যক নাই ।

কলিকাতায় আসা অবধি তাঁহার সহিত নির্জনে একবার দেখা কব'বার  
এবং প্রাণ ধুলে ছেলেবেলাকার মত ছুটো কথা কথবার জন্ত মন বড়  
ব্যস্ত হয়েছিল । কিন্তু সর্বদাই লোকের ভিড় । অনবরত বহুলোকের  
সহিত আলাপ চলেছে । সুবিধামত সময় আব পাই না । ইতিমধ্যে  
একটু অবসর পেয়েই তাঁকে ধবে নিয়ে বাগানে গঙ্গাব ধারে বেড়াতে  
এলাম । তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতই কথাবার্তা  
আরম্ভ কব'লেন । দুচাপটা কথা কইতে না কইতেই ডাকের উপর ডাক  
এলো যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা কব'তে এসেছে । এবার  
একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—“বাবা একটু বেহাই দাও, এই ছেলেবেলাকার  
খেলুড়ের সঙ্গে ছুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি । মায়ার  
এসেছেন, তাঁদের যত্ন কবে বসাতগে, তামাক টামাক খাওয়াওগে ।”

যে ডাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা কব'লাম, স্বামীজি, তুমি  
সাদু । তোমার অভ্যর্থনাব জন্ত যে টাকা আমবা চাদা কবে তুললাম, আমি  
ভেবেছিলাম যে, তুমি দেশের হুভিক্ষের কথা শুনে, কলকাতায় পৌঁছবার  
আগেই আমাদের তার করবে, যে, “আমাব অভ্যর্থনায় এক পরসান না  
ধবচ করে হুভিক্ষনিবারণী কণ্ডে ঐ সমস্ত টাকাগুলি চাদা দাও”,  
কিন্তু দেখলুম, তুমি তা কব'লে না ; এব কারণ কি ?

স্বামীজি । হাঁ, আমি ইচ্ছাই করেছিলাম যে, আমার নিয়ে একটা খুব  
হৈ চৈ হয় । কি জানিস্, একটা হৈ চৈ না হলে তাঁর ( ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের )  
নায়ে লোক চেতবে কি করে ? এন্ত Ovation কি আমার জন্ত করা  
হলো, না, তাঁর নামেরি জয়জয়কাব হলো ? তাঁর বিষয় জানবার জন্ত

লোকের মনে কতটা ইচ্ছা হলো! এইবার ক্রমে তাঁকে জান্নবে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য এসেছেন, তাঁকে না জান্নলে লোকের মঙ্গল কি করে হবে? তাঁকে ঠিক ঠিক জান্নলে তবে মানুষ তৈরী হবে আর মানুষ তৈরী হলে হুভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ান কতক্ষণের কথা? আমাকে নিয়ে এইরূপ বিরাট সভা করে হৈ চৈ করে তাঁকে প্রথমে মানুষ, আমার এই ইচ্ছাই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জ্ঞাত এত হ্যান্ডামের কি দরকাব ছিল? তোদের বাড়ি গিয়ে যে এক সঙ্গে খেলতুম, তাব চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। তুইই বলনা, আমার কি কোন পরিবর্তন দেখুইস্?

আমি মুখে বলিলাম, না, সে রকম ত কিছুই দেখিনা, মনে হল সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন,—“হুভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে! অল্প কোন দেশে হুভিক্ষেব এত উৎপাত আছে কি? নাই, কারণ, সে সব দেশে মানুষ আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থভ্যাগ কর্তে শিথুক, তখন হুভিক্ষ নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও কব্বো, দেখনা।

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার টেকচার দেবেতো? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে?

স্বামীজি। তুই খেপিচিস্, তাঁর নাম প্রচারের কি কিছু বাকি আছে? লেকচার কবে এদেশে কিছু হবে না। বাবু ভাষাবা ওনবে, বেশ বেশ করবে, হাততালি দেবে তাব পব বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম কবে ফেলবে। পচা পুবাণ লোহাব উপব হাতুড়িব যা মারলে কি হবে? ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাকে পুড়িয়ে লাগ কর্তে হবে, তবে হাতুড়িব যা মেরে একটা গড়ন কব্বতে পারা যাবে। এদেশে অল্পত জীবন্ত উদাহরণ না দেখলে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়ে ছুড়ে দেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের Life আগে ভয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি। আচ্ছা স্বামীজি, তোমার নিজের দেশের লোক নিজের ধর্ম

বুঝতে না পেরে কেউ কৃষ্ণান কেউ মুসলমান কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে, তাদের জন্য তুমি কিছু না করে গেলে কি না আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম বিলুপ্তে ?

স্বামীজি । কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করার ও অনুষ্ঠান করার শক্তি কি আছে ? আছে কেবল একটা অহংকার যে, 'আমরা ভালী দ্বন্দ্বগুণী'। তোরা এককালে সাম্প্রতিক ছিলি বটে কিন্তু এখন তোদের ভাবি পতন হয়েছে । সমুদ্র থেকে পতন হলে একেবারে তমস্ব আসে । তোরা তাই এসেছিস । মনে করেছিস বাকি, যে নডেনা চডেনা, যখন ভেতর বসে হাবিমাং করে, সামনে অপবের টোপ হাজির অত্যাচার দেখেও চপ কান থাকে, সেইই দ্বন্দ্বগুণী—তা নয়, তাকে মস্তা তমস্ব ঘিরেছে । যে দেশের লোক পেটটা ভরে পেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি করে ? যে দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটে নি, তাদের নিরুত্তি কেমন হবে হবে ? তাই আগেই যাতে মাত্রয় পেটটা ভরে পেতে পায় ও কিছু ভোগ বিলাস কর্তে পাবে, তারই উপায় কর, তবে কমে ঠিক ঠিক বৈবাগ্য এসে ধর্ম লাভ করতে পারবে । বিলাত আমেরিকার মোকেনা কেমন জানিস ? পূর্ণ বজ্রগুণী, বিপ্লব ব্রহ্মাণ্ডের সকল একম ভোগ করে এলে গেছে । তাতে আবার কৃষ্ণানী ধর্ম মোয়েলি ভক্তির ধর্ম, পুণ্যের ধর্ম । শিক্ষার বিস্ফাব হওয়াতে তাতে আর তাদের শাণি হচ্ছে না । তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সম্বন্ধে পৌছায় । তার পর আজ কাল একটা কালমুখ এসে যে কথা বলবে, তা তোরা যত মানবি, একটা ছেঁড়া ন্যাবডা পবা সরাসরী কথা তত মানবি কি ?

আমি । মহাবাজ, এন ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন ।

স্বামীজি । হাঁ, আমার সেখানকার চেলাবা সব যখন তৈরী হবে এখান এসে তাদের বলবে যে, "তোমরা কি করছ, তোমাদের ধর্ম কয় নীতি নীতি কিসে ছোট দেখ, তোমাদের ধর্মটাই আমবা বড় মনে করি"— তখন দেখিসি হুদো হুদো ঘোষ সেকথা শুনে । তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে । মনে করিসনি, তারা ধর্মের গুরুগরিব করতে এদেশে আসবে । বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তাদের গুরু হবে আর ধর্ম বিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে । ভাবতের সঙ্গে সমস্ত এদেশের ধর্ম বিষয়ে এই সম্বন্ধ চিন্তা করিবে ।

আমি। তা স্বামীজি কেমন করে হবে? ওবা আমাদের যে বকম স্থপা কবে, তাতে ওবা যে কখন নিঃস্বার্থ ভাবে আমাদের উপকার কব্বে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজি। তোদের ছ'। কব্বাব অনেকগুলি কারণ পায়, তাই স্থপা কবে। একে তো তোবা বিজিত তাব উপর তোদের মত হাঘোবের দল আব জগতে কোথাও নাই। নীচ জাত গুলো তোদের চিবকালের অত্যাচাবে, উঠতে বসতে জুতো লাধি গেয়ে, একেবারে মল্লমাত্র হাদিয়ে এখন Professional ভিত্তবী হয়েছ; তাদের উপর শ্রেণীর লোকেবা ছ এক পাতা ইংবাজী পড়ে আর্জী হাতে কবে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ঘুরে বেডাচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরী খালি হলে পাচশো B. A., M A, দবখাত্ত কবে। পোডা দবখাত্তও না কেমন। “ঘবে তাত নেই, মাগ ছেলে গেতে পাচ্ছে না, সাংব ছুটা খেতে দাও, নইলে গেলাম।” চাকরীতে ঢুকেও দাসহেব চডাস্ত কর্ত্ত হয়। এইতো গেল নিম্নশ্রেণীর লোক। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড বড।।) লোকেবা দল বেঁধে “হায ভাবত গেল! হে ইংবেজ, তোমরা আমাদের লোকেদের চাকরী দেও। ভূভিক্ষ ঘোচন কব” ইত্যাদি দিনরাত কেবল “দাও দাও” করে মহা হল্লা কবছে। সকল কথাব পুণো ওড়ে, “ইংবেজ আমাদের দাও!” বাপ! আর কত দেবে? বেল দিয়েছে—তাবের খবর দিয়েছে রাজ্যের স্তম্ভস্থলতা দিয়েছে—ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে—বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে—আবার কি দিবে? নিঃস্বার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোবা কি দিয়েছিস?

আমি। আমাদের দেবাব কি আছে মহাশয়? বাজোব কব দিই।

স্বামীজি। আমাব, সে কি তোবা দিস, না, ছুতো মেবে আদায কবে—বাজাবক্ষা কবে বলে? তোদের যে এত দিয়েছে, তাব জন্ত কি দিস, তাই বল। তোদেরও দেবাব এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নাই। তোবা বিলাত যাবি, তাও ভিতরী তে—কি না বিদ্যা দেও। কেউ গিয়ে বড জোব তাদেব ধন্ডেব ছুটো তাবিস করে এলি - বড বাহাদুরী হলো। কেন—তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমুখ্য ব্রহ্ম রয়েছে—দ্বিতে পাবিস—ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, যত উচ্চ তাব পূর্বে ভাবতেই উঠেছে। চিবকাশ তাবত জনমমাজে



ভাবের খনি হয়ে এসেছে ; তার গ্রন্থ করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আল ইৎরেক ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বোদ্ধাজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের নিকট যা পাস, তার বিনিময়ে তোদের ঐ সকল অমূল্য রত্ন দান কর্। তোদের এই ভিখারী নাথ ঘুচারার জন্ত ঠাকুর আমাদের ওদের দেশে নিয়ে গেছিলেন। কেবল ভিক্ষে করবার জন্ত বিলাত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখন দিয়ে থাকে? কেবল কান্দালেব মত হাত পেতে লওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান প্রদান। এই নিয়ম যে লোক বা যে জাত বা যে দেশ না রাখেবে, তার কল্যাণ নাই। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিচ্লাম। তাদের ভেতর এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মত হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেক দিন থেকে তাদের ধন রত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেব্‌বি, স্বর্গস্থলে প্রদত্ত ভক্তি পাবি আব তোদের দেশের জন্ত তারা অর্থাচিত উপকার করবে। তারা বীরের মত, উপকার তোলে না।

আমি। মহাবাজ, ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছে; আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছে। আবাব এখন বলুছো, আমবা মহা তমোগুণী হয়ে গিছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম বিলাবাব অধিকারী আমাদেরই করুছো—এ কেমন কথা?

স্বামীজি। তুই কি বলিস, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে নেডাব, না, তোদের যা গুণ আছে, সে গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব? গাব দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল আব তার গুণ নিয়ে ঢাক বাজানই উচিত। ঠাকুর বলতেন যে, মন্দ লোককে ভাল ভাল কবলে সে ভাল হয়ে যায়; আব ভাল লোককে মন্দ মন্দ কবলে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ পর্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের দ্বন্দ্ব কর্তে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাবটা তোদের ভেতর একটু না একটু আছে—অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে

হট করে বিলেতে গিয়েই যে বর্ষ-উপদেষ্টা হতে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরোলা নসে বর্ষজীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণ ভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্যা কব্ধে হবে। তোনদেব ভেতর তমোগুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ করবার জন্তই তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব এসেছেন।

আমি। কিন্তু স্বামীজি, তোমার মত কে হবে?

স্বামীজি। তোরা ভাবিস্ আমি মলে বুঝি আর বিবেকানন্দ হবে না। ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত স্বগা করিস্, মহা অপদার্শ মনে করিস্, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক বিবেকানন্দ হতে পারে। দরকার হলে বিবেকানন্দের অভাব থাকবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে, তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্ণর জেনারেল গেলে তার বায়গায় আর একটা আসবেই। তোবা যতই তমোগুণী হস্ না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব ভয় কেটে যাবে। এখন যেও বোপের বোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে লবেন। ঐ তমোগুণটাই মহা সম্বল হয়ে দাঁড়াবে।

আমি। ঘাই বল, ও কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মত Philosophyতে Oratory করবার ক্ষমতা কার হবে?

স্বামীজি। তুই জানিসনি। ও ক্ষমতা সকলেরই হতে পারে। যে ভগবানের জন্ত বার বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্যা করবে, তারই ও ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ ব্রহ্মচর্যা করেছি, তাই আমার মাধার ভিতর একটা পর্দা খুলে গেছে। তাই আর আমার দর্শনের দ্বায় জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে তৈয়েব করতে হয় না। মনে কর, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, আজ রাতে বা বক্তৃতা দেব, তার সমস্ত ছবি পর পর চখের সামনে যেতে আরম্ভ হয়। পরদিন বক্তৃতাৰ সময় সেই সব বলি। অতএব বুঝি তো এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস করবে, তারই হবে। তুই কর, তোরও হবে। আবার শান্তিতেও অনুকের হবে, অনুকের হবে না, তা বলে না।

আমি। মহারাজ, তোমার মনে আছে, তখন তুমি সম্যাস লও নাই, একদিন আমবা অম্বকের বাড়িতে বসেছিলাম; তুমি সমাধি ব্যাপাবটা আমাদের বোঝাব চেষ্টা করছিলেন! কলিকালে ও সব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোব কবে বলেছিলেন, “তুই সমাধি দেখতে চাস না সমাধিস্ত হতে চাস? আমার সমাধি হয়। আমি তোব সমাধি কবে দিতে পারি”। তোমার এই কথা বলবার পবেই একজন নূতন লোক এসে পড়লো আর আমাদের ঐ বিষয়ের কোন কথাই চলিল না।

স্বামীজি। হাঁ, মনে পড়ে।

আমি তখন আমার সমাধিস্ত কবে দিবার জগ্য তাঁকে বিশেষ রূপে ধরায় স্বামীজি বললেন, “দেখ, গত কয় বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ কবে আমার ভেতর বজ্রোত্তর বড় বেড়ে উঠেছে। তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছু দিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তি উদয় হবে”।

ইহাব দুই এক দিন পবে স্বামীজিব সহিত দেখা করবার বলে আমি বাড়ি থেকে বেকজি, এমন সময় দুটী বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজিব সঙ্গে দেখা কবে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হলুম। দেখলাম, স্বামীজি হাত মুখ পুখে বাইবে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নাই শুনেছিলাম, তাই আমবা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলাম। তিনি আসবামাত্র তাঁকে সেই গুলি দিলাম, স্বামীজি সেগুলি নিয়ে নিজেকে মস্তকে ঠেকালেন এবং আমবা প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। আমার সঙ্গে দুটী বন্ধুর মধ্যে একটা তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিন্তে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁহার সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পবে আমাদের তাঁহার নিকটে বসালেন। আমবা যেখানে বসলাম, সেখানে আরও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজিব মধুর কথা শুনে এসেছেন। অজ্ঞাত লোকের দুই একটা প্রশ্নের উত্তর কবে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি আপনিই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান ইহাতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান সহায়ে প্রথমে

উহা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, তাহা বুঝাতে লাগলেন । ইহার আগে আমরা কল্পনাই তাঁহার রাজযোগ পুস্তকখানি ভাল করে পাঠ করেছিলাম । কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে সকল কথা শুন্লাম, তাতে মনে হল যে, তাঁর ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্প মাত্রই সে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে । ইহাও বুঝলাম যে, তাঁহার ঐ সকল কথা কেবল পুঁথিপড়া কথা নয় । মনুদ্রষ্টা ছাড়া ধর্মশাস্ত্রের কুট প্রশ্নসকলের বিজ্ঞান সহায়ে ঐরূপ বিশদ মীমাংসা করা কাহাবও সাধ্য নয় । জগতে পণ্ডিতের অভাব নাই ; কিন্তু সত্যের দ্রষ্টা বা উপলব্ধি বড়ই বিরল । পণ্ডিতের সংখ্যা কমে তাঁর জ্ঞান দ্রষ্টার সংখ্যা যদি অধিক হতো, তা হলে ভাবতের এ দুর্দিন হতো না ।

সেদিন আমার স্বামীজির কাছে ৩০ টার সময় উপস্থিত হই । তাঁহার প্রাণায়ামবিষয়িকী কথা ৭১০ টা পর্য্যন্ত চলেছিল । পবে সভা ভঙ্গ হলে যখন বাইরে এলাম, তখন সঙ্গিষ্ম আমায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁদের প্রশ্নের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজি কেমন করে জানতে পারলেন ? আমি কি তাঁকে পূর্বেই এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলাম ?

ঐ ঘটনার কিছু দিন পবে একদিন বাগবাজারের ৮প্রিয়নাথ ঝুঞ্জেপাধ্যায়ের বাটীতে গিরীশ বাবু, অতুল বাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ এবং আরও ছ একটা বন্ধু সম্মুখে স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, “স্বামীজি, সেদিন আমার সঙ্গে যে ছজন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তারা আগে তুমি এ দেশে আসবাব আগেই তোমার রাজযোগ পড়েছিল আর বলে বেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখন দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে । কিন্তু সে দিন তাবা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না কর্তেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি ভুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কি না । স্বামীজি বললেন ;—ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা হওয়ার অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করতো, আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন করে জানতে পারলেন ? ওঁরা আমার তত হয় না । ঠাকুরের অহরহ প্রায়ই হতো ।

এই প্রশ্নে অতুল বাবু জিজ্ঞাসা করলেন ;—তুমি রাজযোগে বলেছ যে, পূর্বে জন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায় । তুমি নিজে জানতে পার ?

স্বামীজি । হাঁ পাবি ।

অতুল বাবু । কি জানতে পার, বলবার বাধা আছে ?

স্বামীজি । জানতে পারি—জানিও—কিন্তু details বলিব না ।

## তিব্বতে তিন বৎসর ।

( স্বামী অখণ্ডানন্দ । )

যে তিব্বত লইয়া আজকাল চতুর্দিকে ঘেঁষা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাবি সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা এই সময়ে সাধারণে প্রকাশ করিলে বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ।

ক্রমান্বয়ে ৩৪ বৎসর তিব্বতেব নানা স্থানে ভ্রমণ করাব তিব্বতীয়দের সহিত আমার বিশেষ অনিষ্ঠতা হয় । নিববচ্ছিন্নভাবে বহুকাল তিব্বতীয়-ভাষাভাষী লোকেব সঙ্গে বাস করাব আমি তিব্বতীয় ভাষাব আমার মনেব ভাব তাহাদিগকে সুন্দর রূপে বুঝাইতে পারিতাম এবং তাহাদেরও সকল কথা বুঝিতে পারিতাম । এইরূপে আমি তিব্বতীয়দের আচার ব্যবহার, বীতিনীতি, ও শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে যতদূর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, বর্তমান প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে ষংকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব । আমার এই প্রবন্ধ লোকের কতদূর হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিতে পারি না, কারণ, সে আজ ১৬১৭ বৎসরের কথা ।

অতীতের একমাত্র অতি ক্ষীণ স্মৃতি ভিন্ন ভ্রমণরস্তুস্ত লিখিবার উপযোগী অল্প কোন সম্বল আমার নাই । একমাত্র সেই বিনুগুপ্রায় স্মৃতিব সাহায্যেই আমাকে সকল কথা লিখিতে হইবে । ভ্রমণরস্তুস্ত লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে মনে করিবাও আমি কোথাও ভ্রমণ করি নাই বা ভ্রমণেব কোন কথাই কখনও লিখিয়া বাধি নাই । এমন কি, তখন বং যাহা দেখিতাম, তাহাই ভুলিতে চেষ্টা করিতাম । স্মৃত্তরাং এ অবস্থায় আমার তিব্বতীয় কথা সাধাবণের স্মরণার্থ হইবে বলিয়া মনে করা কেবল ছাশা মাত্র । বিশেষ রূপে অনুকল্প হইয়াই আমি এই প্রবন্ধ লিখিতে আবদ্ধ কবিতাম । আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি

তিব্বত সম্বন্ধে কাহারও কিছু মাত্র কৌতূহল নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

ভগবান্ শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবের অন্তর্ধান হইবার প্রায় ৭৮ মাস পবে গোল্ডন্ জুবিলির বৎসর, বোধ কবি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মাঘের শেষে আমাদের তদানীন্তন বরাহনগর মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ৬ গয়া, কাশী, অযোধ্যা ও নৈমিষাবণ্য দর্শন করিয়া (পথে এই কয়েকটা তীর্থস্থান ভিন্ন কেবল লক্ষ্মী ও সীতাপুবে নামিয়াছিলাম।) ৬ হবিষ্যে উপস্থিত হইলাম।

কলিকাতা হইতে বাহিব হইয়া ৬ হবিষ্যে পঁহছিতে আমার পথে ২১০ মাসের অধিক বিলম্ব হয় নাই। দৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পূর্বেই বোধ করি আমি ৬ হরিষ্যে পঁহছিয়াছিলাম। তাহার ৩৪ দিন পবেই আমি ৬ হরিষ্যে হইতে হৃষীকেশে গিয়া পঁহছিলাম। বহুকালের অভীষিত স্থানে পঁহছিয়া আমি পবমানন্দ অহুভব কবিলাম। হিমালয়ের পাদমূলে হৃষীকেশের তুল্য পবিত্র ও রমণীয় তপোবন আব নাই। ৬ বদরিকাশ্রম যাত্রাব এইটা প্রধান দ্বাব। কার্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা পর্য্যন্ত এই হৃষীকেশ নানাসম্প্রদায়ভুক্তসাদুসমাগমে পূর্ণ হয়। বহুতর ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রতি বৎসর মাস মাসে হৃষীকেশে আসিয়া নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী কবিয়া পরম পরিতোষ সহকারে সাধুভোজন কবাইয়া কৃতার্থ হন।

হৃষীকেশের সন্নিকটেই “তপোবন” নামে একটা গ্রাম আছে। সেই গ্রামের কয়েক বিঘা জমিতে উপর “বাসুমতী” চাউল এক অপূর্ণ পদার্থ। চাউল গুলি দেখিতে ছোট কিন্তু বন্ধনেব পব দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ হয়। ভাতগুলি অতি শুভ্র ও এমন সুবাসিত যে, আহাবেব পর সমস্ত দিন উল্লারেও তাহার সুগন্ধ পাওয়া যায়। জনপ্রবাদ এই যে, কোন ঋষির বরে তপোবনের কেবল ঐ কয়েক বিঘা জমীতেই উক্ত দেবভোগ্য “বাসুমতী” জন্মে। হিমালয়ের সর্বত্রই সুগন্ধযুক্ত বাসুমতী চাউলের বড়ই আদর। ৬ কেদার ও বদরীনারায়ণের পথে “বাসুমতী” টাকায় চারিসের হিসাবে বিক্রয় হয়। এই ১৯১৭ বৎসরেব মধ্যে যদি কোন বিশেষ পরিবর্তন হইয়া থাকে, বলিতে পারি না। বাহা ইউক, উত্তরাখণ্ডের আর কোন চাউলই তপোবনের “বাসুমতী” তুল্যগুণসম্পন্ন নহে। হৃষীকেশেব ভরতজীর মন্দির সর্বপ্রধান। তপোবন হরীরাঙ্গ কঙ্ক

ভরতজীব সেবায় সমর্পিত । ভরতজীব মোহান্তের নিকটে গুলিলাম যে, তাঁহাকে প্রায় প্রতিবৎসর পঞ্জাবের কয়েক জন রাজা মহারাজাদের জন্ত কিছু কিছু সেই “বাসুমতী” চাউল পাঠাইতে হয় ।

ত্রিলোকপাবনী ভাগীবতী হিমালয়ের অভ্যুচ্চ, নিম্নত, মল্লভের অগম্য, চিরনীহারময় গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া প্রবলবেগে দ্বর্ভেদ্য পাষণ ভেদ কবিয়া বোব নিনাদে বিষম অরণ্যানী অবিরাম প্রতিধ্বনিত কবিত্তে করিতে ভক্তবাহ্য পূর্ণ করিবার জন্ত এই পথেই মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন । আমি হৃষীকেশে পঁহুছিয়াই উত্তরাখণ্ডের মাহায়া প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলাম । বিমল সর্গীয় স্তম্বে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল । মনে হইল, উত্তরাখণ্ডের প্রারম্ভেই এই, না জানি অন্তে কি আছে । মুমুকু সাধকেব পক্ষে এই হৃষীকেশ স্বর্ণ । হৃষীকেশ-মাহাত্ম্যে নিরুগণও মুগ্ধ । এই হৃষীকেশে বিরক্তদের কাড়ীতে আমি কিছুদিন ছিলাম । এইখানে কতিপয় পঞ্জাবী ত্যাগী মহাপুরুষের সহিত আমাব বিশেষ হৃদয়তা হয় । তাঁহাদের উদার ও সবল ব্যবহারে হৃষীকেশ আমার পক্ষে মধুরতর বোধ হইল । কেবল আত্মশ্রম, আত্মচর্চা ও উপনিষদাদি পাঠ ভিন্ন এই দেবভূলভ স্থানে অল্প কোন কথাই হইতে পারিত না । কি আনন্দে ও পবিত্র ভাবেই আমার জীবনের প্রধান কয়েকটা দিন এইখানে অতিবাহিত হইল, তাহা অবর্ণনীয় । হৃষীকেশ হইতে আমি ডেহাডুন ও মসুরী হইয়া ১ যমুনোত্রি, গঙ্গোত্রি ও ২ কেদার বদরী-নারায়ণ যাত্রা করিবার সঙ্গর কবিলাম । জনৈক উদারচিত্ত পঞ্জাবী সাধু আমাকে তাঁহার সহিত ৩ বদরীনারায়ণ যাত্রা করিবার জন্ত বিশেষরূপে অনুরোধ কবিলেন এবং অর্ধাভাবে উত্তরাখণ্ডে পথে আমার বিশেষ কষ্ট হইবে বলিয়া আমাকে তথ্য দেখাইতে লাগিলেন । তাঁহার নিকট যথেষ্ট অর্থ ছিল এবং একজন দশনামী নাগা অনুচরও তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন । তিনি সেই বৎসর বহু অর্থব্যয় করিয়া হৃষীকেশে মাঘমাস যাবৎ নানাবিধ উপাদেয় সামগ্ৰী প্রস্তুত কবাইয়া প্রত্যহ সজ্জাধিক সাধু মহাপুরুষকে খাওয়াইয়াছিলেন । যাহা উক্ত, আমি তাঁহার কোন কথাতাই না ভুলিয়া একাকী হৃষীকেশ হইতে ডেরাডুন অভিমুখে যাত্রা করিলাম ।

তিস্রত যাত্রার পথে হিমালয়ের যে সকল স্থানের সন্দর্শনে আমার মন নিতান্ত মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইয়াছিল, সেই সকল শান্তি ও পুণ্যময় স্থানের

বিষয় বরণ করিলেও চিত্ত স্থির হয়ও হৃদয় অতিশয় পবিত্র ভাব ধারণ করে। সুতরাং তিব্বতে পৌছবার পূর্বে আমাকে বাধা হইয়া অভি-  
সংক্ষেপে ৬ বদরিকাশ্রম যাত্রা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিতে হইবে।

কিছু দিন হইতে বঙ্গবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ প্রতিবৎসর ৬ বদরিকাশ্রম যাত্রা করিয়া আসিতেছেন। পূর্বে বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা খুব কম ও পঞ্জাবী যাত্রীর সংখ্যাই খুব বেশী বেশী হইত। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও যুবকগণ লিখিত ভ্রমণরুত্তরও আজ কাল মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এক্ষণে হিমালয়ের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলি সম্বন্ধে অনেকই অনেক কথা জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সাধু মহাপুরুষ যাত্রীদের নিকট একই উত্তরাধও সম্বন্ধে পৃথক পৃথক রুত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। কালের প্রভাবে এক স্থানেই কত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে! আবার অবস্থভেদে ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিমাণভেদে এক সময়ে দৃষ্ট একই স্থান বিভিন্ন পর্য্যটক দ্বারা বিভিন্ন আলোকে দৃষ্ট ও তদুচ্চাযী বর্ণিত হইয়া থাকে। সেই জন্ত আমরা প্রত্যেক যাত্রীর নিকটেই একই উত্তরাধও সম্বন্ধে বিশেষ নূতন কিছু শুনিবার আশা করিয়া থাকি। বহু পূর্বে ষাঁহারা “মন ভঙ্গ ও চিৎ ভঙ্গের” রাস্তায় ৬ বদরিকাশ্রম যাত্রা কবিতেন, তাঁহাদের ভ্রমণরুত্তর আজকালকার কেন্দারবদীয়াবীদের রুত্তর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁহাদিগকে যেকোন বিষয় পার্কৃত্য পথ অতিক্রম করিয়া ৬ কেন্দারবদীতে পঁতছিতে হইত, তাহা আজকালকার যাত্রীদের কল্পনাভীত। সে পথ যে কিরূপ ভয়ঙ্কর দুর্গম ছিল, তাহা ঐ নামেই প্রকাশ পাইতেছে। এমন কি, অন্নদিনের কথা, ৬ হরিদ্বারে রেল হাইবার পূর্বেও ষাঁহারা তথায় গিয়াছেন, তাঁহারা এখন আর হরিদ্বারের সে শোভাও শ্রী দেখিতে পান না। এখন আর ৬ বদরীকেন্দার ও পঙ্কোত্রিব পথে যাত্রীদের ত্রাসজনক গিত্যদোলারমান পাহাড়ী ঝোলা নাই। সর্বত্রই পাকা সঁকো ও রাস্তা হইয়া পূর্ণাপেক্ষা এক্ষণে ৬ বদরিকাশ্রম যাত্রা বিবিধ প্রকারে সুগম হইয়াছে। প্রতিবৎসর সেই জন্ত বিভিন্ন প্রকৃ-  
তিব বিভিন্নদেশীয় বহুলোক সমাগম হওয়ার স্থানমাহাত্ম্য ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্বে উত্তরাধবাসী পাহাড়ীদের মধ্যে কেহ চোর ছিল না। এক্ষণে বাত্ৰিসমাগমশূন্য হিমালয়ের অভ্যন্তরস্থ গ্রাম্য লোকের মধ্যেই



কেবল সেই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ী জনসাধারণ যতই দিন দিন নিম্নদেয়ী লোকের সংস্রবে আসিতেছে, তত ইতাহাদের স্বভাব চরিত্রেরও পরিবর্তন হইতেছে। আমিও ১৬১৭ বৎসব পূর্বে রূপীকেশ ও উত্তরাখণ্ডের যে ভাব দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার অনেক ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুনিতে পাই। কেবল তীর্থদর্শনোদ্দেশ্যে পাকা রাস্তায় গিয়া ৮৮৮৮৮৮৮৮ দর্শন করিয়াই ষাঁহাবা স্বদেশ প্রত্যাগমন কবেন, তাঁহাবা আবার হিমালয়ের অনেক তথ্যই অবগত নহেন। তাঁহাবা হিমালয়ের অশুভ্রিত স্রষ্টা নিভৃত, বিজ্ঞান, পরম পবিত্র ও বমণীয় তপোভূমি সকলের বিষয় কিছুই জানেন না। ষাঁহাবা ৮৮৮৮৮৮৮৮ যাত্রা কবিয়া কিছুকাল তথায় বাস কবেন, তাঁহারা কেবল ঐক্লপ পবিত্রস্থানসমূহের মধ্যে কোন কোন স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন।

বর্তমান প্রবন্ধেব মুখ্য বিষয় তিব্বৎ, স্তুতরাং তিব্বৎ যাইতে পথে ক্রমাগত কয়েকবৎসর ধাবৎ : হিমালয়ের গড়োয়াল ও কুমাইন সম্বন্ধে আমি যতদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহাব অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র এই প্রবন্ধের ভূমিকা স্বরূপে লিখিত হইবে।

রূপীকেশ হইতে ডেরাডুন যাত্রাকালে জনৈক সাধু আমাকে উত্তরাখণ্ড প্রবেশের পূর্বে পথে এক জোড়া জুতা লইতে পবামর্শ দিয়াছিলেন। আমি দুই দিনেই রূপীকেশ হইতে ডেরাডুনে পঁহছিলাম। সাধুব কথামত পথে একটা গ্রাম হইতে এক জোড়া জুতা কিনিয়া লইলাম। ডেরাডুনে দুই দিন মাত্র বিশ্রাম কবিয়া তথা হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ দূরবর্তী রাজপুর গ্রামে পঁহছিলাম। মসুরী পর্বতের নীচেই রাজপুর গ্রাম। রাজপুর পর্যন্ত আমার নিকট কয়েক আনা মাত্র পয়সা ছিল। আমি ঐখানেই তাহা ব্যয় করিয়া এককালীন রিক্তহস্ত হইলাম ও একাকী নিঃসম্বল হইয়া উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিবার জন্ত প্রতিক্ষাবদ্ধ হইলাম। কোন সাধু বা গৃহস্থ ঘাতীর সহিত ভ্রমণ কবিব না এবং ক্ষুধাব সময় তিন্ন ভবিষ্যতের জন্ত কখনও কিছু সঞ্চয় করিব না, সংকল্প কবিলাম। একমাত্র ভগবান আমাব সহায় এবং তাঁহাব উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সমুদয় উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ করিবার মানসে রাজপুর হইতে মসুরী পর্বতে আবোহণ কবিলাম। মসুরীতে পঁহছিয়া দেখিলাম যে, স্থানটী সাহেবদের বাঙ্গালায় পবিপূর্ণ। কেবল লটৌরের (মসুরীর বাজার পাড়াকে লটৌর বলে) একটা শিবমন্দিরে অভ্যাগত সাধুসন্ন্যাসিগণ

কটে হুটে দুই এক রাত্রি বাস করিতে পারিতেন। দাক্ষিণাত্যের জনৈক প্রাচীন লিঙ্গায়ণ জঙ্গম সাধু এই মন্দিরের অধিকারী। এইখানে এক রাত্রি বাস করিতেও আমার বিশেষ কষ্ট বোধ হইয়াছিল।

কিন্তু এই মন্দির ছাড়িয়া আর কোথায় যাই? বাজারপাড়া ছাড়া যে দিকে তাকাই, কেবল লাল যুথ। যাহা হউক, লক্টোবের মন্দিরে পহছিবা-মাত্র সেই জঙ্গম সাধুটি আমাকে বড়ই সমাদরের সহিত তাঁহার মন্দিরে আশ্রয় দিলেন। বস্ত্রের মধ্যে সেই সময়ে আমার গায়ে একটা কম্বলের আল-খাল্লা ও একখানি লুই মাত্র ছিল। উত্তরাখণ্ডভ্রমণোপযোগী বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য দেখিয়া এবং আমাব আর্থিক সম্বল কিছুই নাই শুনিয়া সেই সাধুটি আমাকে মসুরীর জনৈক ধনাঢ্য বণিকের নিকট লইয়া গিয়া একখানি কম্বল এবং একটা টাকা দেওয়াইতে চাহিলেন। মসুরী হইয়া যে সকল সাধু মহাপুরুষ উত্তরাখণ্ড যাত্রা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে উক্ত বণিকমহাশয় একটা টাকা ও একখানা কম্বল দিতেন। আমাকেও তাহা লইবার জন্ত তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, মসুরী হইতে টিহরী পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ ক্রোশ পথে ৩৪ খানি দোকান মাত্র আছে, কোন গ্রাম নাই এবং সেই দোকানীবাও কাহাকেও ভিক্ষা দেয় না। এইজন্য আহাবভাবে পথে তোমার অতিশয় কষ্ট হইবে। আমি উত্তরাখণ্ড ভ্রমণকালে এককালীন অর্থস্পর্শ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শুনিয়া তিনি অতিশয় ভাবিত হইয়া পথে যাহাতে আমার কোন বিপদ না হয়, তজ্জন্ত তাঁহার আন্তরিক শুভকামনা জানাইলেন। আমাকে নিতান্ত অন্বয়ক দেখিয়া উক্ত জঙ্গম মহাপুরুষ আমাব প্রতি অতিশয় মেহপরবশ হইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট কেবল পর্ত্তভ্রমণোপযোগী একগাছি দীর্ঘ যষ্টি লইয়াছিলাম।

যাহা হউক, আমি কিছুতেই বিচলিত না হইয়া বরং অভীষ্ট স্থানে পহছিতে আর বিলম্ব নাই ভাবিয়া পবন উৎসাহের সহিত মসুরী হইতে টিহরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মসুরী হইতে ২১৩ ক্রোশ গিয়াছি, একটা দোকানী উপষাচক হইয়া আমাকে কিছু জলযোগ করাইয়া সংকার করিল। আরও কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হইলে উত্তর দিকে হিমালয়ের তুষারা-চ্ছাদিত মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রকৃতির সেই অসামান্য রূপরাশি দেখিবামাত্র আমি বসিয়া পড়িলাম। অনিমেষনেত্রে সেই অপার তুষার-

রাশিপূর্ণ ভূধরশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে আমার দেহ কোম্পাঙ্কিত ও মন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকে যাহা দেখিবার জন্ত উপদেশ দিতেন, এই কি সেই পুণ্যদর্শন হিমালয়? “হিমালয় শৃঙ্গে মহাদেব অঙ্গে প্রকৃতি পার্বতী সতীর মিলন” কি এই? গিরিরাজকন্ডা জগন্নাথ উয়ার এই কি পিত্রালয়? এই কি আমার চিত্রাত্মীপিতৃ স্থান হিমালয়!! বহুবোজমবিস্তীর্ণ বিশাল হিমালয় পর্বতের দর্শন মাঝে আমার হৃদয়ে যে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে, তাহা আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই। আমার প্রকৃতই মনে হইতে লাগিল যে, আমি যেন মর্ত্য-লোক ছাড়িয়া কোন এক স্বর্গবাজো আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই অপার ভূধররাশির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্ত আমার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিতরু, গম্ভীর ও নিবিড় অরণ্যানী-সমন্বিত পর্বতমালাব অপূর্ণ শোভা সন্দর্শনে আমি ভগবানের অপার মহিমা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিহ্বল হইলাম এবং বিচিত্রবিতব-শালী বাবতীষ সৌন্দর্যের আকর্ষণে গিবিবাজের পাদমূলে বার বার নমস্কার করিতে লাগিলাম। এইরূপে হিমালয়দর্শনজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া প্রায় ৮।১০ কোশ পথ অতিক্রম করিলাম। পথশ্রম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মস্তকী হইতে এ পর্য্যন্ত পথে আমার সহিত দুই একটা মাত্র পার্শ্বাভিয পথিকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদিগকে পথি-পার্শ্বস্থিত অসংখ্য রুকে প্রস্তুত স্কন্দ বস্ত্রবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ হইতে মধু আহরণ করিয়া খাইতে দেখিলাম। তাহারা কেবল মধু খাইয়া ভুপ্ত নহে, মধুভাণ্ড পুষ্পগুলি পর্য্যন্ত আহাব করিতেছে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, পাহাড়ীরা ইহাকে “বোরাস” বলে। হিমালয়ের উচ্চ শিখরপ্রদেশে এই জাতীয় পুষ্প বিস্তার করে। এই পুষ্পবৃক্ষগুলি বেশ বড় এবং ইহার কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা সকল প্রায়ই Mosq (এক প্রকার শৈবাল) ঢাকা থাকে। এক এক গুচ্ছে অনেকগুলি পুষ্প; বর্ণ ঠিক বস্ত্রজবার মত। মধ্যে বক ফুলের স্থায় মধু থাকে। পাহাড়ী পথিকেরা একটু লবণ ও লজ্জা মিশ্রিত করিয়া এই পুষ্পের অতি উপাদেয় চাটনী প্রস্তুত করিয়া কুটীর সহিত পবন তৃপ্তিসহকায়ে আহার করে। আমিও প্রথম এইখানেই এই বোরাস ফুলের সহিত কটা খাইয়াছিলাম। হিমালয় ভ্রমণের প্রথম দিনেই পরম উপাদেয় জ্ঞানে কাঁচা ফুল খাইয়া মনে কবিলাম, এই বাজ্যের সকলই অদ্ভুত!

মন্সুবী হইতে প্রায় ১০ কোশ পথ অতিক্রম কবিয়া প্রকাণ্ড এক পর্বতের উপরে একখানি দোকান দেখিতে পাইলাম। সেইখানে পঁহুঁছিয়াই দেখিলাম যে, একটা প্রোটা পার্বত্য স্ত্রীলোক সেই দোকানের অনতিদূরে বসিয়া আছে। আমিও তাহাব নিকটবর্তী একটা বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া পড়িলাম। পর্বতভ্রমণ ও হিমালয়ের অশীতল বায়ুসেবনে আমার জঠরানল তখন প্রদীপ্ত। আমাকে দেখিয়াই স্ত্রীলোকটা আমার নিকটে আসিয়া বসিল এবং আমি কোথা হইতে আসিতেছি ও কোথায় যাইব, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা কবিতো লাগিল। তাহাব পূর্ব আশাব তখনও আহাব হয় নাই শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ আমাকে তথার বসিতে বলিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ কবিল এবং অল্পক্ষণ পূর্বেই কয়েক খানি কটা তৈয়াবি কবিয়া এবং একটু লবণ ও লঙ্কা সহিত বোবাস ফুলের চাট্‌নী করিয়া আমাকে তাহা খাইতে দিল। আমি তাহাব অতিথিসংকার-স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, এপথে কেহ কাহাবও সংকাব করে না, তবে একি? আমি কটা খাইতে লাগিলাম, আব সেই স্ত্রীলোকটা আমার মা বাপ আছেন কি না; আমি এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হই-যাছি কেন? ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল। আমিও যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিয়া তাহাব সন্তোষ বিধান কবিতোছি। ইত্যবসরে সে দূর হইতে তাহাব স্বামীকে মাথায় এক বোকা কাষ্ঠ লইয়া সেই দিকে আসিতে দেখিল। তাহাকে দেখিয়াই সে অতিশয় শঙ্কিতচিত্তে আমাকে বলিতে লাগিল, “দেখ, আমার স্বামী অতিশয় নিষ্ঠুর ও রূপণ-প্রভাবের লোক; কোন সাণ্ড, সন্ন্যাসী, বা ক্ষুধাতুর পণিককে সে কখনও এক মুষ্টি ভিক্ষা দেয় না, সেই জন্য আমার স্বামী দোকানে থাকিতে আমি কাহাকেও কিছু দিতে পারি না। আমি তোমাকে সাবধান কবিয়া দিতেছি যে, যদি আমার স্বামী আসিলে তোমাকে কটা কে দিল জিজ্ঞাসা কবে, প্রকৃত কথা প্রকাশ না কবিয়া বলিলে যে, ময়দা ভুজি কিনিয়াছি, এবং আমি কেবল কট কয় পানি তৈয়াব কবিয়া দিয়াছি মাত্র। আমার স্বামী যদি আমি তোমাকে খাওয়াইয়াছি জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার বড় অপমান করিবে।” এই কথা বলিয়াই সে তাহাব স্বামী আসিয়া পঁহুঁছিতে না পঁহুঁছিতে চলিয়া গেল। যেন তাহাব সহিত আমার কোন বাক্যালাপ নাই। আমি তাহাব সেই কথা শুনিয়া পুনঃ তাড়াতাড়ি

কুটী কথ খানি গল্পাথঃকরণ করিতে লাগিলাম । ভাবিলাম, কি জানি, যদি তাহার স্বামী আসিয়া আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি একটু গোলে পড়িব । কারণ, এক দিকে সত্য কথা বলিলে আমার জীবনদায়িনী স্বাতৃহানীয়া দয়াময়ী স্ত্রীলোকটির অপমান, এবং অন্য দিকে মিথ্যাকথন,—সুতরাং সেই দোকানী বাহাতে আসিয়া আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে না পারে, আমি সেই সুযোগ দেখিতে লাগিলাম । দোকানী ভারবনতমস্তকে দোকানেব মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার গৃহিনীকে দেখিতে পাইল সুতরাং তাহার বাহিরে আসিবর আর কোন প্রয়োজন হইল না । আমার প্রতি সে লক্ষ্যই করে নাই । ইত্যবসরে আমিও আপন কার্য্যশেষ করিয়া সেই স্ত্রীলোকটাব অকপট দ্বৈহ ও উদারতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম ।

( ক্রমশঃ )

## সাবিত্রী ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর । )

অদূরে নন্দাদা নদী পবিত্রসলিলা,  
( গলিত রক্ততল্লাত ) বহে কলকলি ।  
শোভে উপকূলে তার চারু তপোবন,  
সতত বিরাজে যথা ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান,  
সপ্তকোটি দেবতার নিত্য আগমন,  
স্বী ত্রী দোহাকাব বাহিত আসন ।  
সারি সারি শোভে পর্ণকুটীবমণ্ডল,  
কুশচীরপরিকীর্ণ, বেষ্টিত চৌধারে  
শ্রীফল, পনস, তাল, তমাল, তিমিশ,  
কেতক, চম্পক, নীল, তিলক, তিনিষ,  
অশোক, অম্বষ, শয়ী, চন্দন, নীবার,  
বিবিধ বিটপী দলে, ফলফলে ধনী  
হোষধুমে শাখা পত্র ভৈষণ মলিন,

স্বত মধু তৈলরসে অঙ্কুর চন্দনে  
সুচর্চিত কাণ্ডমূল লোহিতচিকণ।  
নিত্য ঋষিসঙ্ঘাসে শিখিয়াছে তরু  
আশ্রয়বিহীন জনে দিইতে আশ্রয়,  
করিতে অতিবিসেবা, ক্ষুধার্জে দানিতে  
সুপক বসাল ফল বহুখাদমুত;  
ক্লান্ত জনে ছায়া দানি পরব-ব্যঞ্জনে,  
কুম্ম সৌভদদানে শ্রান্তি দূবিবারে।  
মাধুর সংসর্গে হায় নাহি ঘটে ঘার  
সুশিক্ষা, এ ভবধামে রথা জন্ম তার!

বিহগ বিহগীগণ বিবিধ-বরণ,  
গাহি গান, চারি দিকে সুধা বরিষয়;  
কেহ বা মধুর বোলে কবে উচ্চারণ  
বেদবাণী, ঋষিমুখে নিত্য শিক্ষা লভি,  
ভাগবৎ স্ততিমালা কেহ পাঠ করে,  
ঋষিসুত কুতূহলে শিখায়েছে যাহা।  
সুশীতল ছায়া লভি তক তলে তনে  
শায়িতা সবৎসা বেশ সুলক্ষণবতী,  
ধবলা শবলা কেহ কপিলা পাটলা;  
ভালে সিদ্ধুরের বিন্দু কজ্জল নয়নে,  
চন্দনে বঞ্জিত শৃঙ্গ, ক্ষুর অলঙ্কিত,  
গলে পবাইয়া দেছে সুনন্দগাঁথনী  
ফুলমালা ঋষিবধু কৌতুক করিয়া।  
হরিণ হরিণী যত, কৌতুকক্রীড়ায়  
রঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালনে, ঋষিসুতটিতে  
বাড়ায় আনন্দ কত। ভীকু শশকুল,  
ইতস্ততঃ প্রধাবিত ব্রত ব্যস্ত তাবে।

মণ্ডল আকারে বসি—রাশিচক্রে বধা  
গ্রহদল—ঋষিকুল বেদগানে রত।

উঠিছে ওঁকার ধ্বনি, কবিতা কল্পিত  
 মেদিনী, ব্যাপিছে গিয়া আকাশমণ্ডল ।  
 কোথাও খনিয়া কুণ্ড, জ্বালিয়া অনল  
 মুচঃ প্রবন্ধিয়া তেজঃ হবিপ্রক্ষেপণে  
 বত হোমঘাগে ঋষি, ব্রতপরিমল  
 বহুদূর প্রবাহিত পবন বাহনে ।  
 কোথায় বা সাবি গাঁথি তাপস সকল,  
 পটুপদ পবিধিয়া, চন্দন চর্চিয়া,  
 মুড়ি কব, উজ্জ্বল তুষিচন্দন স্তবে  
 দিননাথে,—নষ্ট তমঃ তেজবলে যাব ।  
 পুণ্যলাকে স্নানিতমঃ মানবের মথ্য ।  
 ঋষিবধগণ যত, কেত বা আনিছে  
 পুণ্য তোয় ভবি ঘাটে, ব্রত স্রষ্টা ভরি,  
 চন্দন ঘর্ষিছে কেহ, জ্বালিছে অনল,  
 চিবিছে বা কুশচিবি, বাখিছে আনিয়া  
 ফল মূল পুত পাত্রে, ধূপ ধুনা দীপ  
 দিতেছে জ্বালিয়া কেহ, বাজাইছে কেহ  
 শংখ, শংখনখ, কাংসা ঘণ্টা ঘণ্টী আদি ।

বেদপীঠে বসি কোথা ব্রহ্ম মুনিব  
 শ্বেতশত্ৰু, শ্বেতাকশ, বক্তৃপটুবাস,  
 চন্দনচর্চিতদেহ, ব্রাহ্মী তেজঃ বলে  
 মুখকাস্তি বিভাসিত, গজীব সূক্ষ্মবে  
 বর্ণিছেন হল কবে, কেমন প্রকাষে  
 পিতামহচিত্তে হায় মায়াব বিরক্তি,  
 গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি জল স্থল ভেদ,  
 তমঃ আলোকেব জন্ম, কেমনে জন্মিল  
 দেব, উপদেব, যক্ষ, কিন্নর, অশ্বর,  
 মানব, পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী আদি ।  
 মানব ধাতাব কিসে অমুগ্রত সৃষ্টি,

এ ভূতলে আধিপত্য কবিল স্থাপন,  
 ইতর যতক ভূত নত পদতলে ।  
 পিশাচ বান্ধস দৈত্য ঈশ্বরবিবোধী,  
 পীড়িতে নিযত নবে দেবগণপ্রিয় ।  
 নাশিল কি রূপে বিভূ নবরূপ ধবি ।  
 কেমনে ভাবতভূমি সন্তরূপ মানে  
 ঈশ্ববেব রূপাবলে গণা ধনা বলি ।  
 কোন্ স্থলে, কোন্ কালে, কেমন প্রকাণে,  
 কোন্ কোন্ নবপতি হইলা প্রবল,  
 কোন্ বংশে জন্ম কান, কোন্ কার্য্য কবি  
 মহীতলে নবমাক্ষে চিবস্ববণীয় ।

অশ্বখেন ছায়ে কেহ পাতিয়া আসন  
 গাহিছেন বামাষণ, কেমনে শ্রীপতি  
 বান্ধসপীড়িতা ধবা করিতে উদ্ধার,  
 রামরূপে ভূতলে হইলা অবতাব ।  
 কেমনে কোণায় বাম রাজ্য অযোধ্যাব,  
 কোথা কৈকযীর ছলে দাবা ভ্রাতৃ সাথে,  
 জনকে ডুবায়ে শোকে গত বনবাস ।  
 কেমনে হবিলা সীতা বাবল দুর্গতি  
 পাতি ছল। দাশবধি কপিদল সাথে,  
 উতারি লঙ্কাব দ্বারে করিলা সংগ্রাম  
 অদ্ভুত, নাশিলা যত বান্ধস দুর্জয়ে ।  
 উদ্ধারি বৈদেহসুতা ফিবি অযোধ্যায়,  
 কেমনে প্রেমের রাজ্য কবিলা বিস্তার ।

সুদার অধিক সুধা ভাবতের কথা,  
 শ্রাবকেব কর্ণমূলে ঢালিছেন কেহ ।  
 কলিবে ভবিষ্য কথা বর্ণিছেন কেহ  
 কেমনে অচিবে হয় । ঘটবে ভাবতে  
 বিপর্য্যাস,—স্বপনের হবে প্রাক্কল্যব ।



ছাড়ি আৰ্য্যকৃষ্ণাচার ধর্ম পরিহরি,  
 কেমনে কলকে বুঝ করিয়া উদ্ধল,  
 নিজজ্ঞ আর্থের স্বত বিচারিবে ভবে।  
 গুলকে উৎকর্ণ হয়ে ক্ষুরিতনয়নে,  
 কোড়ুকনির্ভর মনে ঋষিপুত্রগণ,  
 চারি পার্শ্বে নিজ নিজ লইয়া আসন,  
 পিয়িছে অমৃত কথা—পিরিলা যেমতি  
 শুক্লমুখবিগলিত ভাগবতকথা  
 ঋষিকুল পূবাকালে নৈমিষ কাননে।

শ্রীহা—

ক্রমশঃ।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নিতাইচরণ হালদাব মহাশয় কনকল  
 রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে কৃপখননার্থ ৫০৭ টাকা দান করিয়াছেন।

কাশীরামকৃষ্ণসেবাশ্রমের কার্য্য ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। আশ্রমবাটীতে  
 ১১ জন রোগীকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইতেছে এবং ৫৮ জনকে ঔষধ,  
 পখা, চাল প্রভৃতি বাটীতে পৌঁছিয়া দেওয়া হইতেছে। কলিকাতার ডাক্তার  
 এস, কে, বর্ধন মহাশয়—এই আশ্রমের জন্য প্রায় ৫০৭ টাকা মূল্যের ঔষধ  
 বিনামূল্যে দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সম্প্রতি শোলাপুরে ধর্মসম্বন্ধে কয়েকটা বক্তৃতা  
 দিয়াছিলেন। ২১ শে জুলাই সন্ধ্যা রঙ্গালয়ে ‘সার্বভৌমিক ধর্ম’ সম্বন্ধে এক  
 বক্তৃতা করেন। তিনি ঈশা, মহেশ্বর ও বুদ্ধদেবের জীবনী বিশেষ ভাবে  
 বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেন, সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, সকলেই আত্মাকে  
 নানা উপায়ে উপলব্ধির চেষ্টা করিতেছেন। এই কারণে অপর ধর্মের  
 দোষ দর্শন বা নিন্দা করা কোন মতেই কর্তব্য নহে, তবে প্রত্যেকেরই  
 কর্তব্য—দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত স্বধর্মমুঠান। ২৮শে জুলাই রিপন হলে ‘স্বধর্ম’

সম্মুখে বক্তৃতা করেন। তিনি অতি সুন্দরভাবে বুকাইয়া দেন যে, পরিবর্তনশীল বা অসং পদার্থ হইতে কখন প্রকৃত সুখলাভ হইতে পারে না, আশ্রয়জ্ঞানেই প্রকৃত সুখ। ৩১শে জুলাই 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্মুখে উক্ত স্থানেই আর এক বক্তৃতা দেন। তিনি যে কয়দিন শোলাপুরে ছিলেন, প্রতিদিনই প্রাতে ও অপরাহ্নে অনেক ব্যক্তি তাঁহার নিকট ধর্মসম্বন্ধে কথাবার্তা করিতে আসিত। তিনিও অতি সরলভাবে সকলের সম্বন্ধে দূর করিয়া দিতেন। তিনি এক্ষণে মাজাজ মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

হিমালয়-প্রদেশের কুমাউন জেলায় মায়াবতী নামক পাহাড়ে বেলুড় মঠের শাখাবরূপ অদ্বৈত আশ্রম প্রায় পাঁচ বৎসরের অধিক হইল, স্থাপিত হইয়াছে। এই মায়াবতী পাহাড় সমুদ্রসমতল হইতে ৬৮০০ ফিট উচ্চ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি বমণীয় এবং ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে বাইতে হইলে কলিকাতা, হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে মোগল সরাই বাইতে হয়। তথা হইতে আউধ রোহিলখণ্ড রেলযোগে বেরিলি ষ্টেশনে পঁহুঁছিয়া তথা হইতে রোহিলখণ্ড কুমাউন রেলযোগে কাটগুদাম ষ্টেশনে নামিতে হয়। এই শেষ রেলওয়ে ষ্টেশন। কাটগুদাম ষ্টেশনে পৌঁছিবাম পুর্বেই হিমালয়ের সৌন্দর্য ঘাটীর নয়নপথে পতিত হয়। এখান হইতে মায়াবতী ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পার্কত্য পথটুকু ঘোঁড়ার চড়িয়া, ডাণ্ডি নামক কুলিবাহিত বানযোগে অথবা পদপ্রজে বাইতে হয়। এই স্থান ভারতীয় হুক্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের শ্রীভাবাস নাইনিতাল হইতে প্রায় ৭০ মাইল এবং এই জেলার রাজধানী আলমোড়া হইতে ৪৭ মাইল দূরবর্তী। এই আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটা শ্যাসী শিষ্য এবং আশ্রমের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সেভিয়ার বাস করেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য—অদ্বৈত বেদান্তের শিক্ষা ও তৃহুপযোগী সাধনা। এই আশ্রমে শিক্ষিত হইবার জন্য ব্রহ্মচারী গ্রহণ করা হয়। সম্প্রতি দুই জন ব্রহ্মচারী শিক্ষালাভ করিতেছেন। যদি কোন গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ এই আশ্রমে কিছু দিনের জন্য বা চির কালের জন্য বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে। আশ্রমের নিয়মাবলি জানিতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে হয়। অদ্বৈতআশ্রম, মায়াবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া)।

উক্ত আশ্রম হইতে ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ ভারত নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। যাহাতে ইংবাজী-ভাষাভিজ্ঞ সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশাবলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা প্রত্যেক কার্যে লাগাইতে পাবেন, এই উদ্দেশ্যেই উক্ত পত্র প্রচারিত হয়। বিগত জুলাইমাস হইতে উহা পূর্বাপেক্ষা সাধারণের অধিকতর উপযোগী কবিবাব চেষ্টা করা হইতেছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী পত্রগুলির মূল ইহাতে ধারাবাহিকরূপে মুদ্রিত হইতেছে। সন্ন্যাসিগণ লিখিত অগ্ন্যাগ্ন প্রবন্ধ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিও ইংবাজী অনুবাদ, শাস্ত্রোক্তি বা মহাপুরুষবচিত সংস্কৃত স্তোত্রের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ এবং ভাল ভাল ইংবাজী গ্রন্থকারের মূল্যবান উক্তিসমূহ ইহাতে নিষমিত ভাবে প্রকাশিত হইবে। ইহা ব্যতীত পাঠকগণের পবম্পর প্রশ্নোত্তর দ্বারা ভাব আদান প্রদানের জন্ত এক পৃষ্ঠা বাখা হইবাছে। ভাল গ্রন্থের চিন্তাশীল বিস্তৃত সমালোচনাও ইহাতে প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসে Hindu Social Progress ও আগষ্ট মাসের পত্রে সিষ্টাব নিবেদিতার The Web of Indian Life এর বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রের বার্ষিক মূল্য ১৯। কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রবুদ্ধভাবে, মায়াবতী, লোগাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায় পত্র লিখিলে সমুদয় বিবরণ জানা যাবে।

অৰ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।

পুরুষং শাস্ততং দিব্যং আদিদেবসকলং বিভূম্ ॥ ১২ ॥

আহঙ্কামৃষয়ঃ সর্কে দেবর্ষির্নাবদন্তথা ।

অসিতো দেবলোবাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অম্বয়ঃ । ভবান্ পবং ব্রহ্ম, পবং ধাম, পবমং পবিত্র ( চ ) । ( বশিষ্ঠা-  
নবঃ ) সর্কে ঋষয়ঃ তথা দেবর্ষিঃ নাবদঃ, অসিতঃ, দেবলঃ, বাসঃ, আং শাস্ততং  
অঙ্কং দিব্যং আদিদেবং বিভুং পুরুষং আঙ্কঃ । স্বয়ং চ এব মে ( তথা )  
ব্রবীষি চ । ১২—১৩ ।

মূলানুবাদ । অৰ্জুন বলিলেন, আপনিই পব ব্রহ্ম, প্রকৃষ্ট ক্ষোতিঃ এবং  
পরম পবিত্র । ( বশিষ্ঠাদি ) ঋষিগণ, দেবর্ষি নাবদ, অসিত, দেবল ও বাসও  
বলেন যে, তুমি সনাতন পুরুষ, তুমি দিব্য, তুমি আদিদেব, তুমি জন্মহীন ও  
সর্বব্যাপী এবং তুমিও নিজের আশ্রয়কে এই প্রকারই বলিতেছ । ১২—১৩ ।

ভাষ্য । যথোক্তাং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রদ্ধা—( অৰ্জুন উবাচ )  
পবং ব্রহ্ম পবমায়া, পবং ধাম পবং তেজঃ, পবিত্রং পাবনং পরমং প্রকৃষ্টং  
ভবান্ । পুরুষং, শাস্ততং নিত্যম্, দিব্যং দিব্য ভবং, আদিদেবং সর্ব-  
দেবানামাদৌ ভবং, অঙ্কং, বিভুং বিভবনশীলং, ঙ্গদৃশং আচঃ কথয়ন্তি  
আং ঋষয়ঃ বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্কে, দেবর্ষিঃ নাবদঃ তথা অসিতঃ দেবলোহপি এব-  
মাহ ব্যাসশ্চ স্বয়ংৈব ব্রবীষি মে । ১২—১৩ ।

ভাষ্যানুবাদ । ভগবানের যথোক্ত বিভূতি ও যোগ শ্রবণ করিয়া  
অৰ্জুন বলিলেন, আপনি “পবব্রহ্ম” পবমায়া, “পব ধাম” পরম তেজঃ,  
“পবম পবিত্র” প্রকৃষ্ট পাবন । বশিষ্ঠাদি সকল ঋষিগণ, দেবর্ষি নাবদ, দেবল  
ও অসিত এবং ব্যাসও বলিয়া থাকেন যে, তুমি পুরুষ, “শাস্তত” নিত্য, “দিব্য”  
স্বর্গে অবস্থিত, “আদি দেব” সকল দেবতাব আদিত্যে অবস্থিত, “দেব”  
( দোতনশীল ) “বিভু” ব্যা শক্ৰভাব, তুমি নিজের আশ্রয়কে ( এই প্রকারই )  
বলিতেছ । ১২—১৩ ।

সর্বমেতদ্রূপং যন্তো যন্মাং বদসি কেশব ।

ন তি তে ভগবন্ দাক্ষিণ্যং বিতাদর্দবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্যঃ। হে কেশব মাং যদ্ বদসি এতৎ সৰ্বং ঋতং মন্যে, হে ভগবন্  
হি (যস্মাৎ) তে ব্যক্তিং দেবা ন বিদ্বঃ (তথা) দানবা (অপি) ন  
(বিদ্বঃ) । ১৪ ।

মূলানুবাদ। হে কেশব, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই আমি সত্য  
বলিয়াই বোধ করিতেছি। কারণ, হে ভগবন্, তোমার প্রভাব দেবতাগণও  
বুঝেন না, দানবগণও বুঝেন না। ১৪ ।

ভাষ্য। সৰ্বমিতি। সৰ্বমেতদ্ যথোক্তং ঋষিভিঃ সত্যং সত্যমেব  
মন্যে। যস্মাৎ প্রতি বদসি ভাষসে হে কেশব ; ন হি তে তব ভগবন্ ব্যক্তিং  
প্রভবং বিদ্বঃ ন দেবা ন দানবাঃ । ১৪ ।

ভাষ্যানুবাদ। সৰ্বং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ এই যে) যে সকল বিষয়  
ঋষিগণ ও তুমি যে ভাবে বলিয়াছ, তাহা সকলই সেই ভাবেই সত্য বলিয়া  
বোধ করিতেছি। তুমি (নিজে) তোমার (যে স্বরূপের বিষয়) বলিয়াছ,  
সেই স্বরূপ দেবতারাও জানেন না, দানবগণও জানেন না। ১৪ ।

স্বয়মেবাশ্বানাস্বানং বেথং ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

অন্যঃ। হে ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ! পুরুষোত্তম !  
ত্বং স্বয়মেব আশ্বান আস্বানং বেথং । ১৫ ।

মূলানুবাদ। হে ভূতভাবন ! ভূতেশ ! দেবদেব ! জগৎপতে ! পুরুষো-  
ত্তম ! তুমি নিজেই আপনাব প্রভাবে আপনাকে জান (অপর কেহই পূর্ণভাবে  
তোমাকে জানিতে পাবে না) । ১৫ ।

ভাষ্য। যতস্তং দেবানামাদিবতঃ—স্বয়মেবাশ্বান আস্বানং বেথং ত্বং নিরতি-  
শয়জ্ঞানৈরর্থ্যবলাদিশক্তিমান্তমীশ্বরং পুরুষোত্তম । ভূতানি ভাবয়তীতি ভূত-  
ভাবনো হে ভূতভাবন ভূতেশ ভূতানামীশিতঃ হে দেবদেব জগৎপতে । ১৫ ।

ভাষ্যানুবাদ। হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন ( যিনি প্রাণিগণের জন্মদাতা,  
তিনিই ভূতভাবন ) হে ভূতনিবহের ঈশ্বর, হে দেবদেব জগৎপতে, 'যে কারণে  
তুমি দেবাদি সকল প্রাণীর প্রধন, সেই কারণেই তুমি নিজেই সেই  
আপনাকে আপনি বুঝিতে পাব যে, তোমার জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও বল প্রভৃতি  
শক্তি অসীম, তুমিই ঈশ্বর । ১৫ ।

বক্তৃমহীশেষেণ দিব্যা হ্যাবিভূতয়ঃ ।

যাতিবিভূতিভিলোকানিমাংসঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

অর্থঃ । ঐ যাতিবিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ( তাঃ ) দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ ( আত্মবিভূতীঃ ) অশেষেণ বক্তৃমহসি । ১৬ ।

মূলানুবাদ । তুমি যে সকল বিভূতিব দ্বারা এই লোকসমূহকে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সকল দিব্য বিভূতি কিপ্রকার, তাহা ( আমাকে ) সম্পূর্ণ ভাবে বল । ১৬ ।

ভাষ্য । বক্তৃমিতি । বক্তৃং কথয়িতুমহসি অশেষেণ দিব্যা হ্যাবিভূতয়ঃ আত্মনো বিভূতয়ো যাত্নাঃ বক্তৃমহসি । যাতিবিভূতিভিরাত্মনো মাহাত্ম্যবিস্তারৈরিমান্ লোকান্ ঐ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি । ১৬ ।

ভাষ্যানুবাদ । বক্তৃং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ । যে সকল নিজ “বিভূতি” ও মাহাত্ম্য বিস্তার দ্বারা তুমি এই সকল লোককে ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সকল “দিব্য” অপ্রাকৃত আত্মবিভূতি ( অর্থাৎ ) নিজের বিভূতি বলিতে তুমিই যোগ্য হও । ১৬ ।

কথং বিদ্যাং যোগিন্ ঐ সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিস্ত্যেহসি ভগবন্ মযা ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ । হে যোগিন্ সদা পরিচিস্তয়ন্ ( অহং ) ঐ কথং বিদ্যাং । হে ভগবন্ কেষু কেষু ভাবেষু মযা ঐ চিস্ত্যেহসি চ । ১৭ ।

মূলানুবাদ । হে যোগিন্, সর্বদা কি প্রকারে চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে পারিব ? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ বস্তুতে আমি তোমার ধ্যান করিব ? ১৭ ।

ভাষ্য । কথমিতি । কথং বিদ্যাং বিজ্ঞানীয়াং অহং হে যোগিন্ ঐ সদা পরিচিস্তয়ন্ । কেষু কেষু চ ভাবেষু বস্তুষু চিস্ত্যেহসি ধ্যেযোহসি ভগবন্ মযা । ১৭ ।

ভাষ্যানুবাদ । কথমিত্যাदि শ্লোকের অর্থ । কি প্রকারে হে যোগিন্, সর্বদা চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমাকে জানিতে পারিব ? কোন্ কোন্ ভাবে অর্থাৎ বস্তুতে হে ভগবন্, আমি তোমাকে চিন্তা করিব অর্থাৎ ধ্যান করিব ? ১৭ ।

বিস্তবেণাশ্বনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ।

ভূয়ঃ কথং তুষ্টির্হি শৃণতো নাস্তি মেঃমৃতম্ । ১৮ ।

অন্থয় । হে জনার্দন আস্থানা যোগং বিভূতিং চ বিস্তবেণ ভূয়ঃ কথং, হি (যতঃ) অমৃতং শৃণতো মে তুষ্টির্নাস্তি । ১৮ ।

মূলান্তবাদ । হে জনার্দন, তুমি পুনর্বার বিস্তীর্ণভাবে নিজের যোগ ও বিভূতি বর্ণন কর, কাবণ, (তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত বাক্যরূপ) অমৃত পান করিতে করিতে আমি এখনও তুষ্টি লাভ করিতে পারিতেছি না । ১৮ ।

ভাষ্য । বিস্তবেণেতি । বিস্তবেণ আশ্বনো যোগং যোগৈগম্বর্ষাশক্তিবিশেষং বিভূতিঞ্চ বিস্তবং ধোযপদার্থানাং হে জনার্দন (অর্দতের্গতিকর্মণোকপম্) অস্ববাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নবকাদিগমস্তিত্বাজ্ঞানার্দন । অভ্যুদযনিঃশ্রেয়সপকসার্থপ্রাযাজনং সর্বৈর্জ্ঞৈর্নৈর্গাচ্যতে ইতি বা । ভূয়ঃ পূর্বমুক্তমপি কথং, তুষ্টির্হি পবিতোষো যস্মাৎ নাস্তি মে শৃণতত্বম্গনিঃসৃতবাক্যামৃতম্ । ১৮ ।

ভাষ্যান্তবাদ । বিস্তবেণ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ । বিস্তাবেণ সহিত তোমার নিজের “যোগ” যোগৈগম্বর্ষাশক্তিবিশেষ এবং বিভূতি (অর্থাৎ) ধোয বস্ত্র-নিবহেব বিস্তব আদিক্য “ভূয়ঃ” একবার পূর্বের বলা হইলেও পুনর্বার, বল হে জনার্দন । (গতিকর্মক অর্দ ধাতু হইতে অর্দন এইকপটা নিম্পন্ন হইয়াছে) জনগণের (অর্থাৎ) দেবতাগণের শত্রু অস্ববগণের নবকাদিলোকপ্রাপ্তিব পক্ষে কাবণ বলিয়া (তিনি) জনার্দন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । অথবা স্তম্ভ ও মোক্ষলাভ করিবার জন্য তিনি জনগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া থাকেন । এই জ্ঞাত ঐহাকে জনার্দন বলা যাউতে পারে । যে কাবণ তোমার মুখ হইতে নির্গত বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া আমার (এক্ষণেও) “তুষ্টি” পবিতোষ হয় নাই । ১৮ ।

শ্রীভগবান্নবাচ ।

হস্ত তে কথমিষ্যামি দিব্যাহ্যাস্ববিভূতযঃ ।

প্রাধান্নতঃ কুর্কশ্রেষ্ঠ নাত্যন্তো বিস্তবস্ত মে ॥ ১৯ ॥

অন্থয় । হে কুর্কশ্রেষ্ঠ তে দিব্যঃ আশ্ববিভূতযঃ (আশ্ববিভূতীঃ) প্রাধান্নাতঃ কথমিষ্যামি হস্ত তি (যতঃ) মে বিস্তবস্ত অস্তো নাস্তি । ১৯ ।

মূলানুবাদ । শ্রীভগবান্ কহিলেন, ॥ কুরুশ্রেষ্ঠ । আমার দিব্য আত্মবিভূতিসমূহেব মধো যাহা প্রধান, সেইগুলি তোমাকে বলিব, কারণ, আমার বিভূতির বিস্তার অনন্ত । ১৯ ।

ভাষ্য । হস্ত তে ইত্যাদি । হস্তেদানীং তে দিবিভবাঃ আত্মবিভূতয়ঃ আত্মনো মম যা বিভূতয়ঃ তাঃ কথয়িষ্যামি ইত্যোতৎ প্রাধাত্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা বা বিভূতিত্যাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যামি কুরুশ্রেষ্ঠ । অশেষ-তস্ত শতেনাপি বর্ধেঃ ন শকা বক্তুং । যতো নাক্ষান্তো বিস্তরস্ত মে মম বিভূতীনামিত্যর্থঃ । ১৯ ।

ভাষ্যানুবাদ । হস্ত তে ইত্যাদি খোকেব অর্থ । হস্ত ( হর্ষহৃচক অব্যয় ) এক্ষণে তোমাকে “দিব্য” ( স্বর্গীয় ) আত্মবিভূতি অর্থাৎ আমার নিজের বিভূতি বলিতেছি, ইহাই তাৎপর্য্য । “প্রাধাত্যতঃ” অর্থাৎ যেখানে যেখানে আমার যে যে প্রধান বিভূতি আছে, সেই সেই প্রধান বিভূতিই প্রাধাত্যতঃ নির্দেশ করিব । আমার যত কিছু বিভূতি আছে, তাহা শত বর্ষ বলিয়াও শেষ কবা যায় না । কারণ, আমার বিভূতির বিস্তারের অন্ত নাই । ইহাই অর্থ । ১৯ ।

অহমাখ্যা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।

অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

অর্থ । হে গুড়াকেশ । অহং সর্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা, অহং এব ভূতানাং আদিশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ । ২০ ।

মূলানুবাদ । হে জিতনিদ্র । আমি সকল প্রাণীর আশ্রয়ে অবস্থিত আত্মা, আমিই সকল ভূতের আদি, মধ্য এবং অন্ত । ২০ ।

ভাষ্য । তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছগ্নু । অহমাখ্যা প্রত্যগাত্মা গুড়াকেশ গুড়াকা নিদ্রা তস্যঙ্গিশ গুড়াকেশ জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ । ষনকেশ ইতি বা । সর্বেষাং ভূতানামাশ্রয়ে অন্তর্হৃদি স্থিতোহহমাখ্যা প্রত্যগাত্মা নিত্যং ধ্যেয়ঃ । তদশক্তেন চ উক্তরেষু ভাবেষু চিস্ত্যোহহং চিন্তয়িতুং শক্যঃ । যস্মাদহমেব আদিভূতানাং কারণঃ তথা মধ্যঞ্চ স্থিতিবহুঃ প্রলয়শ্চ । ২০ ।

ভাষ্যানুবাদ । তাহাব মধো প্রথমেই সম্পূর্ণভাবে জন । হে, “গুড়াকেশ” গুড়াকা ( শব্দের অর্থ ) নিদ্রা গ্রাহ্য ঙ্গিশ অর্থাৎ জিতনিদ্র যথবা ( গুড়াকেশ ১৫ই ভাদ্র, ১৩১১ । ) উদ্বোধন ।



শব্দের অর্থ) ঘনকেশ। আমি আশ্বসকলের আত্মা (অর্থাৎ পরব্রহ্ম)  
(সেই আত্মাব কি স্বরূপ?) সকল প্রাণীর আশ্রয়ে (অর্থাৎ) অন্ত-  
হৃদয়ে অবস্থিত। অর্থাৎ সর্বভূতের প্রত্যগাত্মা এইরূপে আমার সর্বদা  
ধ্যান করা উচিত। যে ব্যক্তি এই প্রকারে ধ্যান করিতে অসমর্থ, সে  
বক্ষ্যমাণ বস্তুনিচয়ে আমাকে ধ্যান করিলে, যে কাবণে আমিই সর্বভূতের  
“আদি” কারণ “মধ্য” স্থিতি এবং “অন্ত” প্রলয়। ২০।

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতির্বাৎ রবিরংগুমান্ ।

মরীচিমীকৃতামগ্নি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥

অর্থঃ । অহং আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ (অগ্নি) জ্যোতির্বাৎ অংগুমান্ রবিঃ  
(অগ্নি) মীকৃতাং মরীচিঃ (অগ্নি) অহং নক্ষত্রাণাং শশী (অগ্নি) । ২১ ।

মূলানুবাদ । আমি দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু নামক আদিত্য ।  
জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক বস্তুনিচয়ের মধ্যে আমি রশ্মিমান্ হর্য্য ।  
মরুৎ এই নামে প্রথিত দেবতাগণের মধ্যে আমি মরীচি । এবং আমিই  
নক্ষত্রনিবহের মধ্যে চন্দ্র (স্বরূপে বিদ্যমান আছি) । ২১।

ভাষ্য । এবং চ ধ্যেযোহহং—আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুর্নাম আদিত্যো-  
হহং জ্যোতির্বাৎ রবিঃ প্রকাশযিতৃণাং অংগুমান্ রশ্মিমান্ । মরীচিনাম মরুতাং  
মরুদেবতাভেদানাং অগ্নি । নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ । ২১।

ভাষ্যানুবাদ । এই প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে । দ্বাদশ আদিত্যের  
মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য । জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশকারী পদার্থ-  
গণের মধ্যে আমি অংগুমান্ হর্য্য । মরুৎ এই নামে প্রসিদ্ধ দেবতাগণের  
মধ্যে আমি মরীচি । এবং নক্ষত্রনিচয়ের মধ্যে আমি চন্দ্রমাঃ । ২১।

বেদানাং সামবেদোহগ্নি দেবানামগ্নি বাসবঃ ।

ইজ্রিরাণাং মনশ্চাগ্নি ভূতানামগ্নি চেতনা ॥২২॥

অর্থঃ । (অহং) বেদানাং সামবেদঃ অগ্নি, দেবানাং বাসবঃ অগ্নি ।  
ইজ্রিরাণাং চ মনঃ অগ্নি, ভূতানাং চেতনা অগ্নি । ২২।

মূলানুবাদ । আমি চারি বেদের মধ্যে সামবেদ ; দেবগণের মধ্যে ইজ্র,  
ইজ্রিগণের মধ্যে মনঃকরণ এবং প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা (স্বরূপে বিদ্য-  
মান) বহির্বাছি । ২২।

ভাষ্য। বেদানামিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদোহ্মি। দেবানাং কদ্রাদিতাদীনাং বাসবইক্সোহ্মি। ইন্দ্রিয়াণাং একাদশানাং চক্ষুরাদীনাং মনশ্চামি স্কন্ধবিকল্পাস্থকং মনশ্চামি। ভূতানাং অগ্নি চেতনা কার্য্য-করণসংজ্ঞাতে নিত্যাভিব্যক্তা বুদ্ধিরুত্তিষ্ঠেতনা।২২।

ভাষ্যানুবাদ। বেদানাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। চারিটি বেদের মধ্যে আমি সামবেদ হই। দেবগণের অর্থাৎ কদ্র ও আদিচাদির মধ্যে আমি “বাসব” ইন্দ্র হই। ইন্দ্রিয়গণের অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয়-গণের মধ্যে আমি মন। যে অন্তঃকরণে সংকল্প ও বিকল্প নামে বুদ্ধিবয় উৎপন্ন হয়, সেই অন্তঃকরণকে মন কহে, আমি সেই মন হই। ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা হই। অর্থাৎ এই কার্য্য ও কবণের সমুদায়রূপদেহে নিত্য অভিব্যক্ত বুদ্ধিরুত্তিষ্ঠি চেতনা শব্দের প্রতিপাদ্য। এই দেহেব মধ্যে আমিই সেই চেতনারূপে আছি।২২।

কদ্রাণাং শক্লরশ্চামি বিত্তেশো যক্ষবক্ষসাং।

বহুনাং পাবকশ্চামি যেকঃ শিখরিণামহম্।১৩।

অন্বয়। কদ্রাণাং চ শক্লবঃ অগ্নি, যক্ষবক্ষসাং বিত্তেশঃ (অগ্নি) বহুনাং পাবকঃ (অগ্নি) অহং শিখরিণাং যেকঃ (অগ্নি)।২৩।

\* মূলানুবাদ। আমি একাদশ কদ্রের মধ্যে শক্লর হই। যক্ষ ও ব্রাক্ষস-গণের মধ্যে কুবের হই। বহুগণের মধ্যে পাবক হই এবং পদ্বর্তগণের মধ্যে স্ত্রমেব হই।

ভাষ্য। কদ্রাণামিতি (কদ্রাণামেকাদশানাং শক্লরশ্চামি। বিত্তেশঃ কুবেরঃ যক্ষবক্ষসাং যক্ষাণাং বক্ষসাং চ। বহুনাং অস্টীনাং পাবকশ্চামি অগ্নিঃ। যেকঃ শিখরিণাং শিখববতামহম্।১৩।

ভাষ্যানুবাদ। কদ্রাণাং ইত্যাদি \*শ্লোকের অর্থ। একাদশ কদ্রের মধ্যে আমি শক্লর হই। যক্ষ ও ব্রাক্ষসগণের মধ্যে আমি বিত্তেশ অর্থাৎ কুবের, অষ্ট বহুর মধ্যে আমি পাবক অর্থাৎ অগ্নি এবং উচ্চশৃঙ্গযুক্ত পদ্বর্তগণের মধ্যে আমি স্ত্রমেব হই।২৩।

পুৰোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্শ্ব বৃহস্পতিং ।

সেনানীনাং মহং স্বন্দঃ সবসামগ্নি সাগবঃ । ২৪।

অন্য। হে পার্শ্ব মাং পুৰোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি। সেনানীনাং মহং স্বন্দঃ ( অগ্নি ) সবসাং ( অহং ) সাগবঃ অগ্নি । ২৪।

মূলান্তবাদ। তে পার্শ্ব, আমাকে পুৰোধিতগণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া জানিও। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্তিকেয় হই। এবং জলাশয়-সমূহের মধ্যে সমুদ্র হই । ২৪।

ভাষ্য। পুৰোধসামিতি। পুৰোধসাং রাজপুৰোধিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীতি তে পার্শ্ব বৃহস্পতিম্। স হি ইন্দ্রাজ্যেতি মুখ্যঃ স্বাং পুৰোধঃ। সেনানীনাং সেনাপতীনাং অহং স্বন্দঃ দেবসেনাপতিঃ। সবসাং যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং সরসং সাগবোহগ্নি ভবামি । ২৪।

ভাষ্যান্তবাদ। পুৰোধসামিত্যাদি শ্লোকের অর্থ। পুৰোধঃ ( অর্থাৎ ) রাজপুৰোধিতগণের মধ্যে আমাকে “মুখ্য” প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে। বৃহস্পতি ইন্দ্রের পুৰোধিত, এই কাবণে প্রধান। সেনানী ( অর্থাৎ ) সেনাপতিগণের মধ্যে আমি “স্বন্দ” দেবসেনাপতি। “সবঃ” অর্থাৎ যে সকল দেব-খাত জলাশয় আছে, তাহাদিগের মধ্যে আমি সাগব হই।

মহর্ষীণাং ভৃগুবহং গিবামশ্রোকমক্ষবম্ ।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি স্থাববাণাং হিমালয়ঃ । ২৫।

অন্য। অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ গিবাং একমক্ষবং অগ্নি, যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি স্থাববাণাং হিমালয়ঃ অগ্নি । ২৫।

মূলান্তবাদ। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, পদসমূহের মধ্যে আমি এক গুঁ কাব হই, যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ হই, স্থাববগণের মধ্যে আমি হিমালয় হই । ২৫।

ভাষ্য। মহর্ষীগামিতি। মহর্ষীণাং ভৃগুবহং গিবাং বাচাং পদলক্ষণানাং একমক্ষবং গুঁ কাবোহগ্নি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহগ্নি, স্থাববাণাং স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ । ২৫।

ভাষ্যান্তবাদ। মহর্ষীণাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। মহর্ষিগণের মধ্যে

## সৃষ্টিতত্ত্ব ।

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

শ্রীহরীকেশ কাক্সিলাল ।

কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক হাবার্ট স্পেন্সার শক্তিব যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ, এবং চৈতন্ত্যবিবহিতা বলিয়া অসম্পূর্ণ। তিনি যে আদান্ত্যবিবহিতা, চৈতন্ত্যনিবাপক্ষা সনাতনী শক্তিকে সমস্ত জগতের কাৰণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? শক্তি জড়, সূতবাং এই জড় প্রকৃতি হইতে চিদচিদাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? জড় হইতে কখনও চৈতন্ত্যের অভিব্যক্তি হয় না, অতএব ন হইতে জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব। এই সত্ত্বজড়মোক্ষময়ী প্রকৃতি সংহতা এবং সংহতা বলিয়াই পদার্থী ; সূতবাং এই পদার্থী পবিণামবিশিষ্টা প্রকৃতি কি কখনও ভোক্তা হইতে পারে ? অতএব প্রকৃতি বাহ্যব ভোগের নিমিত্ত সদাব্যস্ত, স্বাহার জন্য স্বয়ং এই বিশাল একাণ্ডে পবিণত হইয়াছে, সেই ভোক্তা নিশ্চয়ই অসংহত, সেই ভোক্তা নিশ্চয়ই অপবিণামী। যদি জড়প্রকৃতির অতিরিক্ত চৈতন্ত্য না থাকিত, তাহা হইলে মোক্ষাভিলাষে মনুষ্যের কখনও প্রবৃত্তি হইত না। স্বপ্নকপতলাভ কবাই মোক্ষ। সূতবাং চেতন জীবের স্বপ্ন কখনও অচেতন হইতে পারে না, অতএব নিশ্চয়ই এই সংহত পবিণামবিশিষ্টাজড়প্রকৃতিব্যতিবিক্ত, অসংহত, অপবিণামী এবং চৈতন্ত্যময় পুরুষ বিদ্যমান আছেন। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে অরূপস্বরূপ ত্রায় পরস্পর সাপেক্ষ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ হইতেই সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে। সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের অপেক্ষা থাকিলেও সাংখ্যাচার্য্যোব্যু পুরুষকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, পুরুষ যখন অপবিণামী, তখন পুরুষকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলে পুরুষ কখনও অসংহত হইতে পারেন না, এবং পুরুষের সংহত্যকারিত্ব স্বীকার করিলে পরার্থতাপত্তি হেতু অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের টীকাকার বিজ্ঞানভিষ্ণু বলিয়াছেন,—

“পুরুষস্তা পরিণামিভেন কারণতাহ্যন্তাজ্ঞতরন্তাঃ কারণমৌচিত্যমিত্যর্থঃ,  
পুরুষস্যাপরিণামিভে চৈদং বীজং পুরুষস্ত সংহত্যকারিত্বে পদার্থতাপত্যনবস্থা ।”

সুতরাং প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। প্রকৃতি হইলেও অসংখ্য মণির সান্নিধ্য হেতু লোহের যেরূপ চেটা হইয়া থাকে, চৈতন্তের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতিতেও সেইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষের ভোগাপবর্ণের নিমিত্ত প্রকৃতি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পবিণত হইয়া থাকেন। মহত্ত্ব বা বৃদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতির প্রথম পবিণাম, মহত্ত্ব আরও স্কুলরূপে পবিণত হইলে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই অহঙ্কার হইতেই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে ক্ষিত্যপ্তভৌমিকদোষ্যম এই পঞ্চ স্কুলভূতের উৎপত্তি হয়। স্কুলতা এবং সূক্ষ্মতা লইয়াই মহত্ত্বাদির সহিত অব্যক্তের প্রভেদ, অব্যক্ত সূক্ষ্ম, এবং মহত্ত্বাদি অব্যক্ত অপেক্ষা স্কুল ও ব্যক্ত।

“অভিব্যক্তাং ত্রিগুণামহত্ত্বাদপি মূলকাবায়মাক্তং সূক্ষ্মং মহত্ত্বম্ভূতং হি সৃষ্টাদিত্তিগুণঃ সাক্ষাৎ ক্রিয়তে, প্রকৃতেশ্চ গুণোহপি ন সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইতি, প্রধানং পৰমাব্যক্তং মহত্ত্বং তু তদপেক্ষয়া ব্যক্তমিত্যর্থঃ” বিজ্ঞানভিষকু। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবঃ “দিদ্যাত্রাকশমেবাদৌ ততোহস্মীত্যেব” বেদনং, তদনং কথ্যতে বুদ্ধিঃ সা ঘনা মন উচ্যতে”, এই বাক্য দ্বারা প্রকাবাস্তরে ঐ কথাই বলিয়াছেন।

আমরা ষতদূর পর্যালোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে বৃষ্টিতে পারিয়াছি যে, কেবল ঋড় হইতে সৃষ্টি হইতে পাবে না, সুতরাং ঋড়ব্যতিরিক্ত চৈতন্তের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্য এই চৈতন্তকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে মহাদাক্রমে কিরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও দেখাইয়াছেন; দেখাইয়াছেন যে, জগতের সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণাত্মক; সমস্ত বস্তুতেই সত্ত্ব রজঃ তামসঃ কোন না কোন গুণের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং জগতের উপাদান কাবণ নিশ্চয়ই সত্ত্বরজস্তমোময়। এই সত্ত্বরজস্তমোময়ের সাম্যাবস্থাকে সাংখ্য প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সাংখ্যের পুরুষ যদিও নিষ্ক্রিয়, উদাসীন এবং নিত্যমুক্ত, প্রকৃতি যদিও ঋড়, তাহা হইলেও অন্ধ পশুর ন্যায় পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হইতে সৃষ্টিকার্য্য হইয়া থাকে। চৈতন্তের সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে মহাদাক্রমে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেখিয়াছি যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্ত্ব—প্রকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যক্ত, কিঞ্চিৎ

মূল। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ন্যোন্ত্রণের সাহায্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের এবং তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের, এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ ভুলভূতের উৎপত্তি হয়।

সাংখ্যাচার্যেরা পুরুষপ্রকৃতির যে সংযোগরূপ ভিত্তির উপর এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ কবিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহার সমালোচনা প্রবৃত্ত হইব। সাংখ্য বলিয়াছেন, প্রকৃতি জড় হইলেও পদ্ম যেক্ষণ অন্ধকে গমনকার্য্যে প্রবর্তিত করায়, পুরুষও সেইরূপ প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি জানিতাম, পদ্ম পুরুষের জ্ঞায় নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন, বস্তুতঃ যদি পদ্মে বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি কিছুই নাই, তাহা হইলে সাংখ্যগণ এই দৃষ্টান্তকে সৎ বলিয়া শিবেোধ্য্য করিতে পারিতাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি, পদ্মে বাক্শক্তি, কল্পনা-শক্তি বিদ্যমান বহিয়াছে, তখন পদ্ম সহিত নিষ্ক্রিয় উদাসীন নিত্যমুক্ত পুরুষের ভুলনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যে নিষ্ক্রিয়, যে উদাসীন, যে নিত্যমুক্ত, তাহার প্রবর্তক কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। চুর্কের সান্নিধ্যহেতু লৌহেতে যেক্ষণ চেষ্টা হয়, পুরুষের সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতিও সেই রূপ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্তিত হইয়া থাকেন, এক্ষণ বলাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কাবণ, চুর্কের সান্নিধ্য অনিত্য এবং কারণান্তরেব অপেক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ ঘটায় এক্ষণ কোন কারণান্তর পবিলক্ষিত হয় না, সুতরাং পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ অসম্ভব, আবার পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ হেতু সম্ভবজন্মোত্তপ্তেব সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি না ঘটিলেও সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। সাম্যাবস্থাতেও সম্ভবজন্মোত্তপ্তের বৈষম্যপ্রাপ্তির যোগ্যতা আছে স্বীকার করিলেও জড় প্রকৃতিতে জ্ঞানশক্তির অভাবহেতু, এক্ষণ বিচিত্রতুম্ব, শৃঙ্খলাযুক্ত জগৎ রচনা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং এই জড়প্রকৃতি কখনও জগৎকারণ হইতে পারে না।

কেবল জড় পরমাণুও জগতের কাবণ হইতে পারে না, তাহাও মহর্ষি বেদব্যাস তৎপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে “মহদীর্ঘবদা ব্রহ্মপরিমণলাভ্যাৎ” ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদন কবিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া “জন্মান্যন্ত বতঃ” এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের উপাদানকাবণত্বই স্বীকার কবিয়াছেন। প্রতিও

“যতো বা ইমানি জুতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি” এবং “যেনাশ্রুতঃ  
 ঐতং ভবত্যন্তঃ মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাহাই  
 প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত কারণ, তাহাও “স ব্রহ্মাকাক্রে  
 সোহিকাময়ত বহু স্যাং প্রজাযেয,” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দেখাইয়াছেন ।  
 যখন সৃষ্টিব পূর্বে এক ব্রহ্ম ব্যতিবেকে আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না, তখন  
 ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা যুক্তিসঙ্গত । কিন্তু ব্রহ্মই  
 যদি জগতের উপাদান কারণ, তাহা হইলে জগতে ব্রহ্মবৈলক্ষণ্য দৃষ্ট  
 হয় কেন ? জগৎ জড় এবং নানারূপ চঃখজালে পবিত্র, কিন্তু ব্রহ্ম বিশুদ্ধ  
 এবং কলনাবহিত, মহর্ষি শঙ্করচার্য্য এই প্রকার নানা রূপ আপত্তি  
 উত্থাপন পূর্বক একে একে সমস্ত আপত্তিগুলিই প্রতি ও যুক্তির সাহায্যে  
 খণ্ডন করিয়াছেন ; দেখাইয়াছেন, চেতনই যে চেতনৈব প্রভব এবং অচেতন  
 হইতেই যে অচেতনৈব উৎপত্তি হইয়া থাকে, এরূপ কোন নিয়ম নাই ।  
 মনুষ্য চেতন, কিন্তু তদুৎপন্ন কেশনখাদি অচেতন, এবং অচেতন  
 গোময়াদি হইতেও চেতন বৃষ্টিকাদিব উৎপত্তি হইয়া থাকে । ব্রহ্মের  
 অভিব্যক্তির তাবতমাত্রাযুগে চেতনাচেতন শব্দদ্বয়েব ব্যবহাৰ হইয়া থাকে ।  
 ব্রহ্ম সত্যসামান্যরূপে সমস্ত বস্তুতেই বিদ্যমান বহিয়াছেন ; তরঙ্গের  
 যে রূপ সলিলাতিরিক্ত সত্তা পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের  
 ব্রহ্মাতিবিস্তৃত সত্তা দৃষ্টিগোচর হয় না ।

সমুদ্র যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ তবঙ্গমালায় বিবর্তিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মও সেইরূপ  
 এই কোটি জগৎরূপে বিবর্তিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মেব সহিত অবিভাগাপন্ন  
 মায়া নারী যে শক্তি আছে, সেই শক্তি হইতে প্রথমে অপকীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম-  
 জুতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । প্রথমে সূক্ষ্মাকাশ তৎপবে সূক্ষ্মবায়ু তদনন্তর  
 সূক্ষ্মতেজ এবং তাহা হইতে সূক্ষ্মসলিল, এবং তৎপরে সূক্ষ্ম পৃথিবীর উৎপত্তি  
 হয় । আকাশেব সঙ্ঘাংশ হইতে শ্রোত্রেজিয়, বায়ুেব সঙ্ঘাংশ হইতে গগিঞ্জিয়,  
 তেজেব সঙ্ঘাংশ হইতে দর্শনেজিয়, জন্মেব সঙ্ঘাংশ হইতে বসনেজিয় ও  
 পৃথিবীর সঙ্ঘাংশ হইতে ভ্রাণেজিয়ের উৎপত্তি হয়, এবং এই পঞ্চ সূক্ষ্মজুতের  
 সমষ্টি সঙ্ঘাংশ হইতে মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এইরূপে পঞ্চ সূক্ষ্মজুতের  
 ব্যষ্টি রজোহংশ হইতে পঞ্চ কর্মেজিয়ের এবং সমষ্টি রজোহংশ হইতে প্রাণের  
 উৎপত্তি হয় । এইরূপে পঞ্চ সূক্ষ্মজুতের তমোহংশ হইতে পঞ্চ স্থলজুতের  
 উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

পূৰ্ণোক্ত বিভিন্ন মতগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা বাহা বুঝিয়াছি, এক্ষণে তাহাই আপনাদের নিকট প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রগুলি যথাসক্তি পর্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এক, সাংখ্যমতাবলম্বীই হউন, নৈয়ায়িকই হউন, বৈদান্তিকই হউন, সকলেবই হৃদয় একস্থলে গ্রথিত, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন পূর্বক এক উদ্দেশ্যেই ধাবিত হইয়াছেন। বাহাব কর্ণ আছে, সেই শুনিতে পাইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই সদয় হইতে,

“অগ্নির্ঘৈথেকো ভুবনঃ প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিকল্পো বভূব।

একত্বা সর্বভূতান্তবান্ধা

রূপং রূপং প্রতিকল্পো বহিষ্ঠ ॥

বায়ুর্ঘৈথেকো ভুবনঃ প্রবিষ্টো

রূপং রূপং প্রতিকল্পো বভূব।

একত্বা সর্বভূতান্তবান্ধা

রূপং রূপং প্রতিকল্পো বহিষ্ঠ ॥

সূর্যো যথা সর্বলোকান্ত চক্ষু-

র্ন লিপ্যাতে চাক্ষুর্ঘৈবাহদোষ্টৈঃ।

একত্বা সর্বভূতান্তবান্ধা

ন লিপ্যাতে লোকহঃ খেন বাহুঃ ॥”

এই স্তম্ভের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; বাহাব চক্ষু আছে, সেই দৈর্ঘ্যে পাইবে যে, তাহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা সমস্তই অদ্বৈতে বাইয়া বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে।

যখন এই পরিদৃশ্যমান কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে বাইয়া লীন হয়, যখন স্ফুলভূত সমুদায় হৃদয়ভূতে এবং হৃদয়ভূত সমুদায় মায়াতে বাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃতির সেই নাব্যবস্থাপ্রবিকল্পিতা তমোময়ী মূর্তি চিন্তা করিলে কাহার সদয় না বিষময়সে অভিভূত হয়? বাস্তবিকই এ মূর্তি অতি ভয়ঙ্করী। বোধ হয় যেন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তখন স্রষ্টাও নাই, দৃষ্টাও নাই, জড়ও পরিলক্ষিত হয় না, চেতনও দৃষ্টগোচর হয় না, তখন কেবল ষ্ঠৈববিবর্জিত একমাত্র নং আপন-বহির্মা-আপনি বিবাজ করিতে থাকেন। এই ঐশ্বর্য প্রলয়াবস্থা মরণ করিলে ধনে হয়, আর বৃক্ষ স্থিতি



হইবে না, আর বৃষ্টি সুখ হুঃখ করুক উৎপীড়িত হইয়া জীবগণ কাতর স্বরে  
চীৎকার করিবে না, বাস্তবিকই তখন মনে হয়, জীবকুল জালায়ন্ত্রণা বিমূঢ়  
হইয়া শাস্ত শাস্তি লাভ কবিল; সৃষ্টিকার্য্য যে অনাদি, তখন তাহা ভুলিয়া  
যাই; তখন মনে হয় না যে, সমস্ত বাসনাবীজ শক্তিরূপে লীন বহিয়াছে।  
সেই সমস্ত বিচিত্র কর্ম্মসমূহই আবাব বিচিত্রতাময় ভাদী সৃষ্টিব কাবণ হইবে।  
এই ভয়ঙ্কর প্রলয়াবস্থায় যে চিহ্নবিবর্জিত সং বিদ্যমান থাকেন, সেই  
সর্বব্যাপী চৈতন্যে প্রথমে কামের অর্থাৎ সংকল্পশক্তিব আবির্ভাব হয়, এই সঙ্কল্প-  
শক্তিই সৃষ্টির মূল; এই সংকল্পশক্তি হেতু অনন্ত অপবিচ্ছিন্ন চৈতন্য পবিচ্ছিন্নবৎ  
পবিলক্ষিত হইয়া থাকেন, এই স্পন্দধর্ম্মিনী সংকল্প শক্তিই মাযানামে অভিহিত  
হইয়া থাকে। এই মায়া অর্থাৎ সংকল্পশক্তি স্পন্দিত হইতে থাকিলে অনন্ত  
অপবিচ্ছিন্ন চৈতন্য নিজেকে পরিচ্ছিন্ন বিবেচনা পূর্বক প্রজাপতি হিবণ্য-  
গর্ভরূপে আবির্ভূত হইয়া সংকল্পবলে জগৎ সৃষ্টি কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন।  
প্রথমে যুগপৎ কাল ও নিকের জ্ঞান হইল, তৎপরে ক্রমে মায়া হইতে  
সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাই বলিতেছি।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—মায়া—সংকল্পশক্তি, এবং এই সংকল্পশক্তিও চৈতন্যের স্পন্দন ব্যতীত আব কিছুই নয়। যখনই এই মায়া স্পন্দিত হইতে থাকে, তখনই ইহাতে তিন প্রকার ক্রিয়া পবিলক্ষিত হয়, কোন দিকে সঙ্কোচাধিক্য, কোন দিকে বজ্রোত্তপাদিক্য এবং কোনদিকে তমোত্তপাদিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয়, যেন কালকে সহস্র কবিতা মহাবালী মায়া শাস্ত নির্বিকার চৈতন্যের উপর তালে তালে নৃত্য করিতে কবিতা অঙ্গজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে বজ্রোত্তপেরই ক্রিয়া হইয়া থাকে। বজ্রোত্তপ মধ্যস্থানে থাকিয়া সঙ্ক এবং তমোত্তপের উপর ক্রিয়া কবিতা থাকে। প্রথমে তমোত্তপ সহস্ররূপে অতি-ভূত করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমে স্কন্দতন্মাত্র, তৎপরে হৃদ-বান্ধ, বায়বীয় পরমাণু বা স্পর্শতন্মাত্র, এবং হৃদবান্ধ হইতে হৃদাতেক, তৈজস পদমাণু বা জ্ঞপতন্মাত্র, তৎপরে হৃদাতেক হইতে হৃদ সলিল, জলীয় পদমাণু বা রসতন্মাত্র, এবং হৃদ সলিল হইতে হৃদ পৃথিবী, পার্থিব পরমাণু বা গুরুত-তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হৃদভূত সমুদয় স্পন্দন বশতঃ মিলিত হইলে পক্ষ ভুলভূতের উৎপত্তি হয়; যেমিগ্রাণে বাহার ভাগ বেশী থাকে, তাহাকে সেই নামেই অভিহিত করা হয়। যেমন কুশাকাশে, হৃদাকাশের ভাগ

অধিক আছে বলিয়া ইহাকে আকাশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এইরূপে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত হইতে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়া কোটিজগৎরূপে নভোমণ্ডলে বিরাজ করিতে থাকে ।

গ্রহোপগ্রহসম্বন্ধিত এই অন্নময় ভুবন সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির তমোময়ীশক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে অন্নময় ভুবন বিগলিত হয়, এবং অল্পে অল্পে প্রাণ-ময় ভুবন উদ্ভিত হইতে থাকে । বোধ হয় যেন একদিকে তমোময়ী রক্তনী ক্রমশঃ অন্তর্মিতা হইতেছে এবং অপরদিক হইতে অক্লরণমনা সোচন-লোভনীয়া জীবনদায়িনী উষা হাসিতে হাসিতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে । ষাঁহারা এই অন্নময় ভুবনে কেবল জড়াধিক্য দেখিতে পাইয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে প্রতিব্দ সেই অমূল্য বাক্য স্মরণ করিতে বলি,—

“অন্নং ব্রহ্মোতি ব্যজানাং,

অন্নাক্ষেপ বর্ষয়ানি ভূতানি জায়ন্তে,

অন্নেন জাতানি জীবন্তি,

অন্নং প্রযন্ত্যতিসংবিশন্তি” ।

এরূপে বজ্রঃপ্রধানাশক্তি তমঃ সত্ত্বকে অভিভূত করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল । প্রথমে লতা গুল্ম বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জপ্রাণী, তৎপরে কতিপয় কর্মেজ্রিয়সহিত বেদজ, অণ্ডজ প্রকৃতি প্রাণী সমুদয় উৎপন্ন হইয়া গ্রহোপগ্রহ সমুদয় পূর্ণ করিতে লাগিল । উদ্ভিজ্জাণ্ডজস্বেনজ প্রাণী সহিত এই প্রাণময় ভুবন সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির বজ্রঃপ্রধানাশক্তির উপশয় হইল না । এক্ষণে সত্ত্বপ্রধানাশক্তির বিকাশ হইতে থাকিলেও, যেমন মানিনী ত্রীর অভিমান স্বামীর প্রিয সন্তাষণে যাইয়াও যায় না, অবশেষে স্বয়ং অশ্রুপূর্ণ বিগলিত হইয়া অভূতপূর্ব আনন্দ জয়াইয়া থাকে, সেইরূপ বজ্রঃপ্রধানাশক্তির ক্রিয়া বা প্রাণশক্তি, সত্ত্বগুণের বিকাশ থাকিলেও, উপশান্ত হইয়াও উপশবিত হইল না, পরিশেষে স্বয়ং সত্ত্বগুণের সহিত মিলিত হইয়া এক অভিনব মনোরম ভুবন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল ।

প্রথমে নানাবিধ পশু ও তৎপরে মনুষ্যসকল উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষাদি-পরিশোভিত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র, নানাবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ গ্রহোপগ্রহে বসতি করিতে আরম্ভ করিল । ভরাটজাতি প্রাণিসহিত এই মনোময় ভুবন সৃষ্টি হইলে, সত্ত্বপ্রধানাশক্তি আরও অধিকতর হৃদয়রূপে প্রকাশ পাইতে থাকিল, বোধ হইল যেন অন্ধকার দূরীভূত করিয়া, অন্ধরণ সহিত ভবাকোণে অতিক্রম পূর্বক সুরম্যবাস্য

সমস্তদিক আলোকিত করিয়া সচস্রকর সমুদিত হইয়াছে। এক্ষণে অজ্ঞান রূপ অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে, রজঃপ্রণাশক্তিও অতিমাত্র অভিবৃতা। এই বিজ্ঞানময় ভুবনে এক্ষণে বিজ্ঞানের রাজত্ব। এক্ষণে দেবতাগণ উৎপন্ন হইবা মনুষ্য ও তীর্থ্যাগাদি জাতিতে পরিপূর্ণ এই লোক-সমুদয়ে আধিপত্য স্থাপন করিতে প্ররুত হইলেন।

এই বিজ্ঞানময় ভুবনের পব সেই আনন্দময়্যেব আনন্দধাম। এ আনন্দ অপ-  
 বিচ্ছিন্ন, নিরতিশয়, এ সেই স্বয়ং সক্তিদানন্দ ব্রহ্ম। কাহার প্রাণ এই কোটিসুখ-  
 সমিভ, চক্রকোটিসুখীতল চৈতন্যময় প্রাণাবামকে দেখিবা কৃতকৃতার্থ হইতে  
 না চায়? বাস্তবিকই, জ্ঞানতঃ তউক অজ্ঞানতঃ হউক, সকলেই এই পরমানন্দ  
 লাভ করিবাব জন্য লাল্যবিত। দগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে, বা  
 যত কিছু চেষ্টা দেখিতেছি, সকলই সুখের নিমিত্ত, সকলই দুঃখনিরুত্তির জন্ম।  
 কবি দুঃখ ভুলিয়া সুখী হইবাব নিমিত্ত কাব্যবসে নিয়ম, শিল্পী সুখে  
 থাকিবাব নিমিত্ত শিল্পনিষ্ঠায়ে তৎপব, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিব উপর আধিপত্য  
 স্থাপন পূরুক সুখী হইতে প্রয়াসী, দার্শনিকও চিবসুখে সুখী হইতে  
 যত্ববান, বৌদ্ধদর্শনেব উদ্দেশ্যও সুখ, সুখই ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য; সাংখ্য  
 দর্শনের উদ্দেশ্যও আতান্তিক দুঃখনিরুত্তি; মহর্ষি পতঞ্জলিও ধর্ম্মমেল  
 সমাধি হইতে আনন্দধাবা পান কবিতে অভিলাষী; অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন সুখই  
 বেদান্ত দর্শনেব উদ্দেশ্য; বেদ এবং উপনিষদেবও ভূম্য আনন্দই লক্ষ্যস্থল।

তাই বলিতেছি. যে দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিনা কেন, সেই দিকেই  
 দেখিতে পাই, জীবসকল সুখের জন্য লাল্যবিত; কিন্তু আমবা এতই  
 মোছান্ন যে, প্রকৃত সুখ কি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, সেই জন্যই পাগলের  
 জায় এখানে সুখ, ওখানে সুখ বলিয়া বিষয় হইতে বিষয়াস্তরের প্রতি  
 ধাবিত হইতেছি। বিষয়ে যে প্রকৃত সুখ নাই, তাহা আমরা বুঝিনা,  
 প্রকৃতিতে যে আনন্দ নাই, তাহা আমরা জানিনা, জানিনা যে, নিরুত্তিতেই  
 সুখ; জানিনা যে, সংসারাসক্তিত্যাগই আনন্দ।

প্রতি বলিয়াছেন,—

পরাক্ষি ধানি ব্যভূগং স্বয়ম্-

সুখ্যং পরাও পশ্যতি নাস্তবাস্তবম্।

কশ্চিদীরঃ প্রত্যগাঙ্গানমৈক্ষ-

দারুডচক্রবর্ত্তমিমিচ্ছন ॥

সুতবাং প্রকৃত সুখে সুখী হইতে হইলে, অমৃতত্ব লাভ কবিয়া অমর হইতে হইলে, বহিমুখীন ইন্দ্রিয়গামকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে, এবং সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মৈকচিত্ত হইয়া যে স্থানে থাকিলে তাঁহাকে ডাকিবার কোন বিঘ্ন হইবে না, সেই স্থানে অবস্থানপূর্বক তাঁহাব আবাধনা করিতে হইবে। তবেই না চিত্ত কল্মষবহিত হইয়া প্রশান্ত হইবে এবং স্বীয় অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন সত্তার উপলব্ধি হইবে! তখনই আমরা দেখিতে পাইব যে, এই বিশাল জগৎ চৈতন্যের স্পন্দন ব্যতীত আব কিছুই নয়, এবং এই স্পন্দনও চৈতন্যময়, সুতরাং জগৎ বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই, আছে কেবল সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম। এই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মে আমবা নাম রূপের আরোপ করিয়াছি, তৃত্বকে প্রকৃত ভাবিয়া সুখ হুঃখে অভিভূত হইতেছি সুতরাং আমাদের ন্যায্য মুখের। যদি কষ্ট না পায়, তাহা হইলে আব কে কষ্ট পাইলে?

একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, আমবা বাহ্য দেখিতে পাই, তাহা কেবল নাম ও রূপ, তাহা কেবল শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধের সমষ্টি; প্রকৃত বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ যে ষ্ঠেতবর্ণ কুলটী পবন-হিল্লোলে হেলিয়া তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, উগা যে কুল, তাহা কে বলিল? আমবা উহাকে কুল বলিতেছি, আবাব আমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিকট জীবেরা উহাকে অত্যুৎকৃষ্ট দেখিতেছে, সুতবাং উগা যে স্বরূপতঃ কুল, তাহার নিশ্চয়তা কই? আবার উগা যে ষ্ঠেতবর্ণ, তাহাই বা কে বলিল? আমাদের চক্ষু উহাব ষ্ঠেতরূপ গ্রহণে সমর্থ কিন্তু আমাদের অপেক্ষা অধিক-তর দৃশ্যশ্রুতিবিশিষ্ট জীবের চক্ষে উহা অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। আমবা উহাকে কোমল বলি কিন্তু ঐ কুল হইতেও বাহাদেব স্পর্শশক্তি কোমল, তাহাবা উহাকে কঠিন বলিবে। আবও দেখিতে পাই, উহার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হইতেছে; এই ক্ষণে উগা যেকপ ছিল, পবক্ষণে উহার আব ঠিক সেইরূপটা নাই, সুতবাং উহাকে কিরূপে কুল বলিয়া বিশেষিত করি? একটি কুলের সম্বন্ধেও যেকপ, সমস্ত জগতের পক্ষেও সেইরূপ। জগত হইতে যদি আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়প্রদত্ত শব্দস্পর্শরূপরসসংকলিত লই, তাহা হইলে জগতের যেকপ থাকে, তাহাই তাহার প্রকৃত রূপ, তাহাই সেই নিশ্চল কলনাবহিত চৈতন্য। বকভূমিতে হুঁস্কিনবনের স্পন্দনকেই গেমেন আমরা কল বলিয়া থাকি। সেইরূপ চৈতন্যের স্পন্দনকেই

আমরা অজ্ঞানবশতঃ জগত বলিয়া অভিহিত করি। মরীচিকায় পিপাসার শান্তি না হইবা যেমন উত্তবোত্তর অশান্তিরই স্বাক্ষর হইয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্যকে আমরা জগতরূপে দেখি, সেই জগতই আমাদের এত কষ্ট, এত দুঃখ। বাস্তবিকই মহাবিদ্যেগের এক একটা অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিলে হৃদয় এত পুলকিত হয় যে, ইচ্ছা হয় প্রতিজনকে ডাকিয়া বলি, ভাই,

সম্মাদেতি কলনাকুলদৃশ্যজালং

যৎ তত্র চ স্থিতবদিত্যমুভূতমুচ্চৈঃ ।

সম্মাদানো বিপরিবর্ততি দেহস্বষ্ট্যা

সকলং তু তৎ পরমবস্ত্তি বিজ্ঞি বিশ্বং ॥

( যোগবাসিন্ধ )

উপসংহারে আমার ইহাই বক্তব্য যে, বিষয় যেরূপ হৃকহ, তাহাতে মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালকেব পক্ষে চতুর্দশ দিবসের মধ্যে সেই বিষয় অবলম্বন কবিয়া একটা সুন্দর প্রবন্ধ রচনা করা অসম্ভব। অথবা সময়ের অন্তরার দোহাই দিয়া নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবারই বা চেষ্টা করি কেন? আমি যদি সহস্র বৎসর ধরিয়াও এ বিষয় চিন্তা করি এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিকও হই, তাহাইহলেও সৃষ্টি-তত্ত্ব নিকূপণ করিতে না পারিয়া অবশেষে সেই পূজ্যপাদ তত্ত্বদর্শী আৰ্য্য-ঋষিদিগের গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে জগতের সমক্ষে বলিতে হইবে,—

কো অহা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ

কুত আজ্ঞাতা কুত ইয়ং বিশ্বষ্টিঃ

অর্বাণ্ দেবা অস্মা বিসর্জনে নাদ্যা কোবেদ যত আবভূব

ইয়ং বিশ্বষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন

যো অস্যাণাক্ষঃ পবমে বোমন্তসো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ।

( ঋগ্বেদ । )

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্ৰেমোন্মত্ততা ।

( শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী । )

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব মলিতেন—যত মত, তত পথ । জগতের যত বন্দনমত, সকলই ঈশ্বরানুভূতিকল্পে এক একটা পন্থা মাত্র বলিয়া উপ-

লক্ষি হয়। তাঁহার মতে সকল মতেই যে অস্বাভাবিক সত্য নিহিত আছে, তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মমতই দৃঢ় বিশ্বাসে অল্পাধিক হইলে ভগবানে পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব সকল গুলি সমভাবে সত্য। সুতরাং কোন ধর্ম মতই আমাদের রুচিকর না হইলেও অস্ত্রের উন্নতির সহায় বলিয়া উপেক্ষা-নীয় হইতে পারে না। তবে আমার মতে আমি চলিব এবং অস্ত্র মত বা পথকে হেয় মনে করিব না।

প্রত্যেক মতের সার কথা ইহাই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বর লাভের এক মাত্র উপায়,—তাঁহাতে একান্ত অমুরাগ। বৈদী ভক্তির ক্রমে ঐকান্তিকতায় পরিণমিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাহার তাহা হয় নাই, জানিব সে ধর্মজীবনের অনেক নিয়ন্তরে পড়িয়া বহিয়াছে। জপ ধ্যান হোম পূজা প্রভৃতিতে নির্ভা দ্বারা বাহার হৃদয়ে উদ্ভাস অমুরাগের সঞ্চার হয় নাই, তাহার জপ পূজাদি পণ্ডশ্রমে পরিগণিত। কিন্তু জপ হোমাদি বৈদী গভীর ভিত্তব অবস্থিত না হইবাও বাহার মন ভগবান্ লাভে নিতান্ত ঐকান্তান-বৃত্তি, তিনিই জগতে বহু ভাগ্যবান্। বহুশাস্ত্রাঙ্কদর্শী উদ্ভিন্নপ্রতিভা মনুষ্যাপেক্ষা অমুরাগরঞ্জিতনেত্র ভক্তই জগতের বহুকল্যাণকারী হয়েন। ভগবদমুরাগের প্রবল স্রোতে তিনি বেদবেদান্তাদি খাত্তোক্ত অমুভূতি ও অবস্থাসকল অতি সহজেই লাভ করিয়া নিজে ধন হন এবং অপরকে কৃতার্থ করেন। যে অমুরাগে ভগবান্ দীপা ৪০ দিন অনাহারে কাননে অবস্থিত ছিলেন, যে অমুরাগে ভগবান্ বৃক্ষ, জীপুত্রের মায়া ছিন্ন করিয়া নৈশতিমিরে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, যে অমুরাগে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যে অমুরাগে ভগবান্ ত্রীশ্রামকৃষ্ণদেব গঙ্গাসৈকতে নৃষ্টিতকলেবরে শিশুর স্থায় মা মা বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইতেন, সেই অমুরাগের শতাংশের একাংশ পাইলে জীব ধন হইয়া যায়। কতকগুলি বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে সকলেই পারে, কিন্তু বহুজন্মার্জিত মার্জিতসংস্কারাপন্ন মানব ভিন্ন অমুরাগের উদ্ভাস তবঙ্গে কেহ ঐক্সে তদ্রুপিত হয় না। শুকপক্ষীবৎ বর্ণোচ্চারণের সামর্থ্য অনেক পণ্ডিতের থাকিতে পারে। অনন্ত শাস্ত্র অনেকের জিহ্বাগ্রে এমন ক্ষুদ্রিত হইতে পারে, বাহা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইবে। কিন্তু এতাবৎ সন্তোষ বাহার ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা জন্মায় নাই, তাহার সমস্ত পাণ্ডিত্য ব্রহ্মা অভিমানই আনিয়া দেয়। ধনমানবশপ্রভূত বিদ্যাবস্তা যদি ঈশ্বর লাভের সহায় না হইল, তবে সে সকল মানবের

বিপজ্জাল মাত্র। আর ইহারা যদি ঈশ্বর লাভে কথঞ্চিৎ সহায়কারী হয়, তবে সে ধনমানাদি বহুমানাই।

একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়—এ জগতে ধন মানাদি সকলি জীবিত কাল পর্য্যন্ত ; কিন্তু ধ্বংস যখন অবশ্যস্বাবী, মৃত্যু যখন অপরিহার্য্য, দেহ যখন পঞ্চভুগত হইবেই, তখন মৃত্যুর পর আমি থাকিব কি না, একথা জানিতে চেষ্টা করা সকলেবই আবশ্যক।

এই সন্দেহেই নচিকেতা যমসদনে বিজিজ্ঞাসু হইয়া গমন কবেন। এই সন্দেহনিবাকরণোদ্দেশ্যেই অনন্ত শাস্ত্রেব সৃষ্টি। এই সন্দেহেব ফলেই ধীরে ধীরে ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়। সাধাবণ শ্রেণী অপেক্ষা একটু উন্নত মানব কেবল মাত্র বিশ্বাস কবিয়াই স্থিৰ থাকে না। নিজ বিশ্বাসেব মত যাহাতে কার্য্যাবলুষ্ঠান করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা কবিতে থাকে। এইরূপে বিশ্বাসের পরিপক্বাবস্থাতে তাহার ঈশ্ববেব দর্শনতৃপ্তা বেগবতী হয়। সে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ কবিতে চায় যে, যিনি আছেন বলিয়া এতকাল বিশ্বাস করিতেছি, তিনি নিশ্চয় আছেন কিনা। এই অপরোক্ষ তীব্র তৃষার নামই অমৃত্যুগ। এইরূপে অমুরাশমন্ডাকিনী বিশ্বাস-হিমাচল ভেদ করিয়া নানামতরূপ অমৃত অনন্ত পথে অথও চিদানন্দসাগরোদ্দেশ্যে স্তম্ভমানা। দেশকালসর্ব্ববাণ-উল্লগ্নিনী, যুগলজ্জাতযাদিঅষ্টপাশছেদিনী, গোপীকুলোদ্ভাসমান্নরাগো-ল্লাসমন্ডাকিনীতে একবার স্নান কবিলে মানব কৃষ্ণময় নবীন জীবন লাভ করিয়া যাবতীয় বিধি নিবেধেব পাবে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহার চেষ্টাদি কামকামন্যমোহিত জীবের নিকট উন্নতবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। কিন্তু সে উন্নততা বহুসুকৃতিভ্য। যে উন্নততাব জগৎ ভুলাইয়া দেয়, দেহান্নবোধ ছিন্ন করে, সে উন্নততা কে না পাইতে ইচ্ছা করে? সে প্রেমোন্নতের পদতলে আশ্রয় লইয়া কত লোকই না সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইয়া থাকে !

হে জীব ! সেই উন্নততার সাধক হও ; ঐ তোমাব সম্মুখে প্রেমোন্নতের জ্বলন্ত ছবি শ্রীবামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বহিয়াছেন। অত্য দিয়া বলিতেছেন,—নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যক্ষীকৃত হইবে—কারণ, আমি নিজ জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হে মানব। বুঝা তোমাব বেদাদি পাঠে শ্রম ; বুঝা বিধিনিষেধ সীমার গণ্ডিতে অবস্থান ; বুঝা ধন, মান, বিদ্যা, যশেব গোবব। যদি এই হুল্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া ঈশ্ববেপ্রেমোন্নত না হইলে—যদি

মৃত্যুর ভীষণ ছায়া মরিবার অগ্রেই সমাধিতে প্রত্যক্ষ কবিতা মৃত্যু লাভ করিতে না পারিলে।

প্রেমোন্মত্ততালাভ করিয়া যে মৃত্যুজয়ী—সে বলে, কালসহায় মৃত্যু! আমি কি তোমায় ভয় করি? ঐ দেখ আমার মা ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন; দেখ থাক্ বা থাক্, আমি ঈশ্বর দর্শন স্পর্শন কবিয়াছি—আমার “জ্ঞাত গিয়াছে।” প্রেমোন্মাদ জন্ম মৃত্যুর পবপারে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, আবার অহেতুক দয়ার প্রেবণায় জীবের পরিত্রাণে দেহ ক্ষয় করিতেছেন। তাঁহাবই পদধূলিতে দেশ প্রদেশ তীর্থাভূত হয়। এ প্রকাব প্রেমোন্মাদ জগতে কয়টা দেখা যায়? ষাঁহারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হন—তাঁহাবই জগতেব যথার্থ উপদেষ্টা—বেদাদিপ্রকাশক ব্রহ্মভাবাপন্ন—ঈশ্বরবন্ধ অবতারণ।

বুদ্ধজীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পাবে না বা পাগল বলিয়া উপেক্ষা করে। আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান মনে কবায় তাঁহাদেব আচরণ কাকের ন্যায়ই হইয়া থাকে। কথায় বলে, কাক বেশী বুদ্ধিমান, তাই জঘন্য পদার্থই তাহার আহার। ঐরূপ বুদ্ধিজীবীরা সত্য সত্যই কুপাপান্ন, সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম প্রেমোন্মাদ পুরুষ গত ৪০০ বৎসরের মধ্যে আর কেহ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হন নাই। যখনই ধর্ম্মমানি উপস্থিত হয়, সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্ত প্রকৃতির হুলস্থল্য নিদেশে তাবুশ মহাপুরুষেব আবার অভ্যুদয় হয়। ইদানীন্তন কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেহে যে অন্তবাগের প্রবল বক্তা, যে প্রেমোন্মত্ততা, যে মহা সগম্যতাব, যে ভাবভক্তি জ্ঞান ধ্যানাদির অন্তত একত্র সম্মিলন দেখা গিয়াছে, তাহাতে দেশের সৌভাগ্য সূচনা করে। ষাঁহার নামে সসাগরা সমীপা বসুন্ধরা আজ প্রীতধ্বনিত হইতেছে,—যিনি নিরক্ষর পূজক ব্রাহ্মণ হইয়াও আজ আয়েচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের নমস্ হইয়াছেন—তাঁহার বিষয় অমুচিপ্তন, তাঁহার পুত জীবনের রূপা প্রকার সহিত আলোচনা দ্বারা ভারতে কেন, সমগ্র জগতে একবিবিধিবা এবং ঈশ্বরানুরাগ শতশ্রেণে পবিত্রীকৃত হইবে, ইহা আমার স্বীয় জীবনের প্রত্যক্ষ হইতেই নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।



## তিবতে তিন বৎসর ।

স্বামী অখণ্ডানন্দ ]

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

এইরূপে টিহরী পর্য্যন্ত আমি কোথাও আহাবাতাবে কষ্ট পাই নাই । মসুরী হইতে তিন দিনে টিহরীতে পৌঁছিলাম । টিহরী দেশীয় গড়োয়ালের রাজধানী । দেশীয় রাজার রাজ্য বলিয়া গড়োয়াল জেলাব পশ্চিমাংশকে “দেশীয় গড়োয়াল” ( Native Garhwal ) এবং ইংরাজ গভর্ণমেন্টের শাসনাধীন বলিয়া পূর্বাংশকে ব্রিটিশ গড়োয়াল ( British Garhwal ) বলে । টিহরীর রাজা ক্ষত্রিয় । বর্তমান রাজা কীর্ত্তিসহায় তখন নাবালক ছিলেন । আমি টিহরীতে পঁছিয়া এক অভাবনীয় কাবণে কিছুদিনেব জ্ঞাত আটক হইয়া পড়িলাম । ডেরাহুনের পথে আমি যে জুতা জোড়াটী আনিয়াছিলাম, তাহা পায়ে দিয়া ছই তিন দিন ভ্রমণ করিয়াই আমার ছই পায়ে ফোকা পড়িয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল । টিহরীতে রাজার দাতব্য ঔষধালয় হইতে ঔষধ লাগাইয়া আবাগ্য লাভ করিতে আমার ৮১০ দিন লাগিল । পূর্বের টিহরীর রাজারাই সমুদয় গড়োয়াল রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন । ইদানীন্তন ব্রিটিশ গড়োয়ালের শ্রীনগরই ইহাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল । শ্রীনগরের ভগ্নাবশিষ্ট প্রকাণ্ড প্রস্তরময় রাজপ্রাসাদ সেদিন পর্য্যন্ত ইহার সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছে । ব্রিটিশ আক্রমণের পর হইতে ভাগীরথীতীরে এই টিহরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । দেশীয় গড়োয়ালে টিহরীর তুল্য সমৃদ্ধিশালী নগর আর নাই । এইখানে টিহরী রাজাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দেবমন্দির আছে এবং এইখানে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যব বাস । দেশীয় গড়োয়ালের জনসাধারণ তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি টিহরীর বাজারে ক্রয় করে ।

টিহরী হইতে যাত্রা করিবার সময় জনৈক রাজবংশীয় ভদ্রলোক যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর পথে বড় জোঁকেব ভয় বলিয়া অতিশয় পীড়াপিড়ী করিয়া পুনরায় আমাকে এক জোড়া জুতা গছাইয়া দিলেন । একবার জুতা পায়ে দিয়া আমি যে শান্তি পাইয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া তিনি এবার জুতা জোড়াটা ভেলে ও ইহুদে ভিজাইয়া কিছু নবম করিয়া দিবেন । পূর্বের ছায় এ যাত্রায়ও আমি তাহা ব্যবহার করিতে পারিলাম না । উত্তরাবও

যাত্রা শেষ করিয়া তিব্বত পর্য্যন্ত (প্রথম বৎসর) আমি আর জুতা স্পর্শ করি নাই। হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে শীতকালে যেমন পাদত্ৰাণ ভিন্ন পা বাচানো দায হয়, তেমনি নিবিড়গুহপত্রাচ্ছাদিত সংকীর্ণ পার্বত্যপথে জুতা পায়ে দিয়া চলাও বিষম দায। শীতকালে খালিপায় চলিলে বড় জোর পা ছুথানিই পুড়িয়া যাইবে; কিন্তু নিবিড় অরণ্যময় গিরিসঙ্কটে জুতা পায় গুহ পড়ে পা পিছলাইয়া গেলে আর তাহাকে দেখিতে হইবে না। আমি দুইবার এইরূপে ভয়ঙ্কর গিরিসঙ্কট হইতে পড়িয়া যাইতে যাইতে রক্ষা পাইয়াছি। সে সকল স্থানে খালি পায়ে আঙ্গুল টিপিয়া টিপিয়া যাওয়াই নিবাপদ।

টিহরী হইতে ৮ মাসোজিব পাকা বাস্তায় বাস্তায় প্রায় ১৮ ক্রোশ গিয়া আমি ধরাসু নামক একখানি ক্ষুদ্র শরবারী কনফোড বোগীর গ্রামে পহুছিলাম। এই গ্রাম হইতে পাকা বাস্তা ছাড়িয়া যমুনোত্রির একটা পগ্‌ডণ্ডী পথ আছে। অপরিচিতের পক্ষে সেই পথে একা ভ্রমণ করা নিতান্ত হুঃসাধ্য ব্যাপার। একেই ভীষণ হিংস্রজন্তুসমাকুল বিজন অরণ্য, তাহাতে দুই দিনের পথে জন মানবের সহিত দেখা নাই। কেবল বন, কোথাও পথভ্রম হইলে তাহা দেখাইয়া দিবারও কেহ নাই। এরূপ পথে একাকী আমি কিরূপে যাইব ভাবিতে ভাবিতে ধরাসুতে পহুছিলাম। দেখিলাম যে, প্রায় ১০১২ জন যমুনোত্রি অঞ্চলের পাহাড়ী—মাধার বিড়ের মত টুপি দেওয়া—সেই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। ঠিক মধ্যাহ্নের সময় আমি সেইখানে পহুছিয়াছিলাম। তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা যমুনোত্রি অঞ্চলের জামদগ্যজী মকাষ গ্রামের অধিবাসী; ডেরাছুন হইতে হাট বাজার করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিতেছে। তাহাদের এই পরিচয় পাইয়া আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কোথায আমি ভাবিতেছিলাম যে, একটা সহযাত্রী পথপ্রদর্শকের অভাবে বুকি বা আমার যমুনোত্রি দর্শন ঘটিল না। কিন্তু ধন্ত ভগবান্! তিনি সহায় থাকিলে কিছুবই অভাব থাকে না। তাঁহার ইচ্ছায় আমি এই ভীষণ অরণ্যে একেবারে বহুজনপরিবোষ্ট হইলাম। আমি যমুনোত্রি যাইব শুনিয়া সেই পাহাড়ীরাও বিশেষ আনন্দিত হইল।

যমুনোত্রি অঞ্চলের পাহাড়ীদের পরিচ্ছদাদি অনেকটা রামপুর বেসহরীদের মত। মাধার সেই বিড়ের মত কপালের টুপি, জালের মত দ্বতো ও পট্টর

লক্ষ্য চাপকান।\* গড়োয়ালের পূর্বাঞ্চলবাসীদের সহিত পশ্চিমাঞ্চলবাসীদের পবিচ্ছদাদিব বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ধরাস্থ হইতে জামদগ্ধাজীব মকাম প্রায় দুই দিনের পথ। ইহার মধ্যে কোথাও গ্রাম বা জনমানবের চিহ্ন নাই। কেবল পথিকেরা যে স্থানে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া রাতিবাস কবে, তাহাবই নিদর্শন দেখিতে পাইলাম। পথে আমবা যেখানে একবাতি বাস কবিলাম, সেই খানে বিস্তর প্রকাণ্ড লক্ষ্য লক্ষ্য চিড় বৃক্ষের গুঁড়ি পড়িয়াছিল। হিমালয়ের নিম্ন অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রদেশ এই চিড়জাতীয় বৃক্ষে পবিপূর্ণ। ইহা (Pinus Longefolia) দেখিতে অনেকটা ঝাউগাছের মত। পাহাড়ীবা প্রকাণ্ড চাবিটা চিড় গাছের গুঁড়ি পাশাপাশী বাধিয়া তাহাতে আশ্রয় লাগাইয়া ভীষণ অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া দিল এবং তাহার দুই পাশে সকলে সারি সারি বসিয়া কটা সের্গিতে লাগিল। মড়ুয়া বা কোদাব (কোদব) দুই দুই খানি রুটি খাইয়া পাহাড়ীবা গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া সেই প্রদীপ্ত আলোকে জুঁয়া মারিতে লাগিল। জুঁয়া (loose) একপ্রকার উকুনজাতীয় কীট, শীতপ্রধান দেশে গাণবন্ধে থাকিয়া দেহের বস্ত্রশোষণ কবে।

মশা, ছারপোকা অপেক্ষাও জুঁয়া অধিকতর কষ্টদায়ক। তাহাবা পবিষেয় বস্ত্রাদিব সহিত থাকিয়া সদা সর্বদা দেহের সহিত লাগিয়া থাকে ও বৃষ্ণ পান কবে। একটু অবকাশ পাইলেই পাহাড়ীবা জুঁয়া মারিতে আবস্ত কবে। আমাদের সেই জ্বলন্ত প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের নিকট কোন হিংস্রক ক্ষত্বনই অগ্রসব হইবার সাধা ছিল না। স্মৃতবাং আমবা নিশ্চিন্তমনে বাতিষাপন কবিলাম। আমবা তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় যমুনাৰ তীববর্তী জামদগ্ধাজীব মকামে পহুছিলাম। এই গ্রামটোতে একটা প্রাচীন মন্দিরে কতকগুলি প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি আছে। আমি এই গ্রামে দুই বাতি বাস কবিয়া তৃতীয় দিবসে যমুনোত্রি অভিযুখে যাত্রা কবিলাম।

যমুনাৰ তীবে তীবে পথ। সেইগ্রাম হইতে যাত্রা কবিবার পরদিন পথে

\* সিংলা পাহাড়ের উত্তরাংশকে রামপুর বেসহর বনে। বেসহর দিরাঙ একটা তিব্বতীয় পাস আছে। বেনহরীয়া সেই পথে তিব্বতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করে। উহাবা বৌদ্ধ এবং তিব্বতীয় ভাষায় কথাবার্তা করে। এখানে একটা পাহাড়ী রাজ্য আছে। রামপুর বেসহর ও যমুনোত্রির এই অংশ গড়োয়ালের পশ্চিমসীমা বসিয়া উত্তর স্থানের পোখাকই গ্রাম একতর।

আমার সহিত একজন দর্শনামী নাগা সন্ন্যাসী ও একজন বৈকল সাগুর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা জম্মু হইতে ববাবর পার্শ্বতাপথে ৬ বঙ্গরী-নাবায়ণ যাত্রাব মানসে তথায় আসিয়া পঁহুঁছিয়াছিলেন। তাঁহারাও যমুনোত্রি যাইতেছিলেন স্মৃতরাং আমবা তিন জন সহযাত্রী হইলাম। আমরা তিনজন একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পর বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। স্বতঃপ্রাপ্ত সাধুসঙ্গ ত্যাগ কবিয়া একাকী যমুনোত্রি যাওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভবপর হইল না স্মৃতরাং আমাকে বাধ্য হইয়া যমুনোত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত থাকিতে হইল।

যমুনোত্রি গড়োবালের রম্বোলী পরগণায়। এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে অতিধিসংকারস্পৃহা আদৌ নাই বলিলেই হয়। আমরা প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে চলিতে আবস্ত কবিয়া দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চলিতাম। আহারাদির পর পুনর্বাব চলিতে আবস্ত কবিয়া সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামে গিয়া রাত্রিবাস করিতাম। যমুনার তীরে তীরে পথ,—এই পথে চলিতে চলিতে আমরা কখনো প্রকাণ্ড উচ্চ পর্ব্বতোপরি আবোহণ কবিতেছি এবং পুনরাব পর্ব্বত হইতে অবতরণ কবিয়া যমুনাতীরবর্তী হইতেছি। এইরূপে পথে যে কত চড়াই উৎবাই করিতে হয়, তাহাব সংখ্যা নাই। এই পথে পাহাড়ীরা সন্ধ্যা সন্ধ্যা যাতায়াত করে। যমুনোত্রির যাত্রীদের গমনাগমনেব জন্ত কোন বন্দোবস্তই নাই। যমুনাতীরে পথের ধারে ধাবে লজ্জা (এক জাতীয় fern) ও কাপ্‌রা নামক শাক বিস্তর জন্মে। আমরা পথে চলিতে চলিতে প্রচুর পরিমাণে সেই শাক তুলিতাম। মধ্যাহ্নকালে কোন গ্রামে পঁহুঁছিয়া আমাদের সহযাত্রী বৈকল সাধুটি স্বসামান্য তিক্কালক বন্ধোরা ও গ্রামাকের (একপ্রকাব তৃণ বাস্ত বা মুনিধান্য) সহিত তাঁহাব লোটায় (ঘটীতে) সেই শাক সিদ্ধ কবিতেন। পথশ্রান্ত ও ক্ষুধাতুর অবস্থায় আমরা পরম উপাদেয় জ্ঞানে এক এক ভাল সেই শাক সিদ্ধ খাইয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতাম। এ অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এক এক খানি ধন্যশালা আছে। সেই ধন্যশালাতে গিয়া আমরা রাত্রি বাপন করিতাম।

বলিতে পারি না, যমুনোত্রির পথে আমাদের মত ভাগ্য সকলের ঘটিয়াছে কি না।—পাহাড়ীদের ধারে ধারে তিক্কা করিয়া আমরা একদিনও কোন গ্রাম হইতে তিন জনের উপযুক্ত তিক্কা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ অঞ্চলের লোকের ধারে ধারে গিয়া জোর জার করিয়া তিক্কা না করিলে

পঞ্চশ্রুত সাধু সন্ন্যাসী বা পথিকগণ যদি অষ্ট প্রহর অনাহারে ধর্মশালায় বসিয়া থাকেন, অযাচিত ভাবে কেহই ভিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের সংকার করিবে না। দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে হইবে, নচেৎ অনাহারে বসিয়া থাক, কেহই তোমার গোজ লইবে না। গড়োয়ালবাসী মাঝেরই এই স্বভাব, তবে গড়োয়ালের পূর্বাংশে দর্শনালী পবগণায় ৮ বদবীনাথ্যণ অঙ্কলের পাহাড়ীবা অপেক্ষাকৃত অতিধিসংকাবপবাষণ। গড়োয়ালবাসীরা যে সহজে অতিধিসংকাব কবিত্তে জানে না, তাহা একটা কথায় চিবপ্রসিদ্ধ হইয়া বহিয়াছে। সেই কথাটি এই—“গড়োয়াল সবীধা দাতা নহী, লড়া বগব দেতা নহী”। অর্থাৎ জোর জার করিয়া লইতে পারিলে গড়োয়ালবাসীদের তুল্য দাতা নাই।

ইহার বহুকাল পবে একবার ভ্রমণ কালে এই গড়োয়ালে যাহা ঘটয়াছিল, তাহাতে উক্ত প্রবাদবাক্যের সার্থকতা বিশেষরূপে হৃদয়-জম কবিয়াছিলাম। স্বতঃই সেইদিনকার ঘটনা আমার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইতেছে। আমবা একবার টিহবী হইতে শ্রীনগরের পথে একখানি গ্রামে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়া মিষ্ট কথায় সামান্য দুই খানি কাষ্ট ও একটু অগ্নি চাহিয়া পাই নাই। সে যাত্রায় পূজাপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ও সারদানন্দ প্রমুখ আমবা চারি জন সন্ন্যাসী ছিলাম। প্রথমতঃ আমরা একটু অগ্নিব'জ্ঞত প্রত্যেক গ্রামবাসীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কেহই আমাদের কথায় কর্ণপাত কবিল না। তাহার পব ভাগ্যক্রমে উক্ত প্রবাদবাক্যটি আমবা দেব মনে পড়িয়া গেল। আমবা সেই গ্রামেব মধ্যস্থিত চত্বরে বসিয়া যেমন কয়েক বার আগ্ লাও, লক্‌ডী লাও বলিয়া চীৎকার করিয়াছি, তখন অমনি দেখি যে, স্ফুড়স্ফুড় কবিয়া কেহ অগ্নি, কেহ কাষ্ট, কেহ শাক, কটা ও কেহ দুগ্ধ প্রভৃতি লইয়া নিতান্ত ভাল মাহুবেব জায় আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে! তাহার পব আমাদিগের কোন অভাব সম্বন্ধেই আর তাহাদিগকে কিছু বলিতে হইল না। সম্মুখে দুনি (অগ্নি-কুণ্ড) জালিয়া সকলে অবাচ্ হইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। যেন তাহাবা আর সে লোক নয়। দুই চারিবাব চীৎকার কবাত্তেই তাহাদের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বোধ হয় যে, একটু ভয় দেখাইলে তাহারা আপন আপন ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে উদ্যত হয়।

কাৰণ কি, বলিতে পাবি না, যমুনোত্রি অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে যেমন প্রায় সকলেই গলায় গলগণ্ড হইতে দেখিলাম, এমন আব আমি কুত্রাপি দেখি নাই। এই অঞ্চলের এক প্রকার ভয়ঙ্কর মাহীৰ কপাও উল্লেখ না কবিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যদিচ এই জাতীয় মক্ষিকা হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই আছে কিন্তু আমি যমুনোত্রিপথেই ইহার দংশন-সুখ ও বিবেক প্রভাব বিশেষরূপে অনুভব কবিয়াছিলাম।

মাহীগুলি দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্র, নীল বর্ণের মশকের মত, কিন্তু মশকের ত্রায় লম্বা ডুঁড ও পদ বিশিষ্ট নহে। ইহারা শবীবেব যেখানে দংশন কবে, সেইখানে একবিন্দু বক্ত বাহিব হয় এবং দংশন কনিলামাত্র শবীবে মক্ষ একটা কাঁটা ফুটাইয়া দিবার মত বেদনা বোধ হয়। তাহার পর সেই স্থান চুলকাইতে থাকে,—চুলকাইতে চুলকাইতে সেই মক্ষ বক্তবিন্দু এক অশোভা-ব্রৈই একটা বিস্ফোটকে পবিণত হয়। টাকা দিবার সময় যেমন তাহার বিবেক প্রভাব কিছুই বুঝিতে পাবা যায় না, ইহা ঠিক সেউরূপ। আমাকে পূর্বে এ সম্বন্ধে কেহই সাবধান কবে নাই সুতরাং আমি প্রথম দিম আমার পায়েব সে যে স্থানে এই মাহী দংশন কবিয়াছিল, মনেব মাধে চুলকাইয়াছি। তাহার পর দিনই দেখিলাম যে, মক্ষিকাদন্ট স্থান বিষম বেদনায়ুক্ত এক এক খানি ঘায়ে পবিণত হইয়াছে। এত শীঘ্র আমার পার্শ্বে একপ ঘা হইবার কাৰণ কি, জিজ্ঞাসা কনায় আমার সতযাচিত্রয় আমাকে বলিলেন যে, পাহাড়ী বিসাক্ত (সহরীলা) মক্ষিকাব দংশনে আমার পায়ে একপ ঘা হইয়াছে। ইহারা আমাকে দষ্টে স্থান চুলকাইতে নিবেধ কবিলেন, অথবা একপও মক্ষ গোময়েব দ্বাৰা চুলকাইতে বলিলেন। এই অতি ক্ষুদ্র নগণ্য কীটের কি ভয়ঙ্কর বিষ! একবাব ইসাৰায় ছুঁইয়া, মনুষ্যশবীবে কি ভয়ঙ্কর বিষই ঢালিয়া যায়। ইহাব দংশনে আমাদের জনৈক সম্যাসী গুরুভাতাকে একবাব কিছুদিন ঠাঁসপাতালে থাকিতে হইয়াছিল।

সে বাহা হউক, এক্ষণে গম্ভবাস্থানাভিমুখে অগ্রসব হওয়া যাউক। এইরূপে ২১০ দিন পরে বুঝিতে পাবিলাম যে, যমুনোত্রির পথে যদি আমার কোন সঙ্গী না ছুটিত, তাহা হইলে বোধ করি, আমার ভাগ্যে সেই শাক-সিদ্ধও ছুটিত কিনা সন্দেহ। পাত্রেব মধ্যে আমার কেবল একটা দরি-য়াই নারিকেলের কমপুত্ৰমাত্র ছিল। কিন্তু আমার সঙ্গী দুইজনর প্রত্যেকের দুই দুইটা কুঙ্গি ছিল। তাহাদের সেই বিচিত্র কুঙ্গি চারিটাতে

ছিল না, এমন পদার্থই নাই। সুদি ও কাঁসারীর দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া মণিহারী পর্য্যন্ত সকলই সেই ঝুলি ভয়টীতে বিদ্যমান। আটা, ডাল, লবণ, লঙ্কা, ঘটা, বাটা, তাওয়া, হাতা, ধুতী প্রভৃতি এবং এমন খুটী নাটী আরও কত দ্রব্যই যে তাহাতে ছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের নিকটে যে কিছু পয়সা কড়ি ছিল, তাহাও পরে জানিতে পারিলাম।

আমি ইহা একবারও ভাবি নাই যে, যমুনোত্রির পথে আমার কোথাও অর্থের আবশ্যক হইবে। ৮ কেদার, বদরীনাথায়ণ ও গঙ্গোত্রি যেমন প্রতিবৎসর নানাদেশীয়া যাত্রিসমাগমে পূর্ণ হয়, যমুনোত্রিতে তাহা হয় না। যমুনোত্রিতে নিত্য পূজারও কোন ব্যবস্থা নাই এবং পথও অতিশয় দুর্গম। আমরা তিন জন ভিন্ন সে সময়ে আব কোন বাড়ী ছিল না। যমুনোত্রির শেষ প্রান্তস্থ গ্রামে পঁহছিয়া গুলিলাম যে, সেই গ্রামে যমুনোত্রির পাণ্ডারা বাস করে। সেই গ্রামেব পাণ্ডারা যাত্রীদের সঙ্গে না গেলে বিদেশীয়েব পক্ষে পথ চিনিয়া যমুনোত্রি পঁহছানো অসম্ভব। সূতরাং বাধ্য হইয়া সকলকে কিছু দক্ষিণা দিয়া সেই গ্রাম হইতে ( বোধ হয় গ্রামের নাম খরশালী ) দুই এক জন পাণ্ডাকে পথপ্রদর্শক স্বরূপ সঙ্গে লইতে হয়। পাণ্ডারা নিতান্ত দবিত্ত, তাহাবা কিছু দক্ষিণা না পাইলে কিছুতেই কোন যাত্রীর সঙ্গে যাইতে সম্মত হয় না। মন্সুরীর নীচে রাজপুর গ্রাম হইতেই তো আমি বিক্ৰমহস্ত হইয়াছিলাম। অতএব যদি আমি একাকী এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ দয়া কবিয়া আমাকে যমুনোত্রি লইয়া যাইত কি না সন্দেহ। আমাব সহযাত্রিদ্বয় কয়েক আনা পয়সা বাহিব কবিয়া দিবা মাত্র দুই জন পাণ্ডা আমাদিগকে সঙ্গে কবিয়া যমুনোত্রি লইয়া চলিল।

ক্রমশঃ ।

## উদ্ধৃত। স্বদেশী সমাজ।

( শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর )

\* \* \* \* \*

বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার বাহা কিছু আছে ও ছিল, তাহাই আটোষাটে রক্ষা করিবার জ্ঞ, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাখিবার জ্ঞ নিজেকে জাল দিয়া পেড়িয়াছে। ইহাতে ভারত-বর্ষকে আপনার একটি মহৎপদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে গুরুত্ব আসন লাভ করিয়াছিল, ধর্ম, বিজ্ঞানে, দর্শনে, ভারত-বর্ষীয় চিন্তার সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিন্তা, সকলদিকে সুদূরম সূত্র প্রদেশ সকল অধিকার জ্ঞ আপনার শক্তি অবাধে প্রবেশ করিত। এইরূপে ভারতবর্ষ যে গুরুত্ব সিংহাসন জয় করিয়াছিল, তাহা হইতে আজ সে লুপ্ত হইয়াছে;—আজ তাহাকে ছাত্র স্বীকার কবিতো হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাত্রা আমরা সকল দিক্ দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কি জলময় সমুদ্র, কি জ্ঞানময় সমুদ্র! আমরা ছিলাম বিশ্বের—দাঁড়াইলাম পরীতে। সক্ষম ও রক্ষা করিবার জ্ঞ সমাজে যে ভীকর ক্রীশক্তি আছে, সেই শক্তিই, কৌতু-হলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধি-পত্যলাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্থারবন্ধ স্ত্রোপ্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ বাহা কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, বাহা প্রত্যাহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলঙ্কারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, বাহা ধোওয়া বাই-তেছে, তাহা ধোওয়াই বাইতেছে!

বস্তুতঃ এই গুরুত্ব পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বর কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদরূপে ছিল না—তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই—তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণ্যের অধিকার—



অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণেব আধার ছিল। যখন হইতে আচাৰপালনমাত্রই তপস্যার স্থান গ্রহণ কবিল—যখন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিস্মৃত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলেই আপনাদিগকে শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—সমাজকে নব নব ঐশ্বর্য্যবিতরণেব ভার যে ব্রাহ্মণেব ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যখন আপন যথার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজেব দাবদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভাবগ্রহণ কবিল—তখন হইতে আমরা অশ্রুকেও কিছু দিতেছি না, আপনাব যাহা ছিল, তাহাকেও অকর্ম্মণ্য ও বিরূত কবিত্তেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিদ্যমানবকে দান করিবাব, সহায়তা কবিবাব সামগ্রী কি উদ্ভাবন কবিতেছে, ইহাবই সচ্ছত্তব দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ কবে। যখন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায, তখন হইতেই সে বিবাট্টিমানবেব কলেবরে পক্ষা-ঘাতগস্ত অঙ্গের স্রায কেবল ভাবস্বরূপে বিবাজ করে। বস্তুতঃ কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ষ রাজ্য লইয়া যাবামাবি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি কবে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত যুদ্ধোপেব ভয়ে সমস্ত দ্বারবাতায়ন রুদ্ধ কবিত্তে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ষকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকণ্ঠিতচিত্তে গৃহেব মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষ সৈন্ত এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত কবিয়া ফিরে নাই—সর্বত্র শান্তি, সাধুনা ও ধর্ম্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবেব ভক্তি অধিকার কবিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ কবিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব বাজচক্রবর্ত্তিরেব চেয়ে বড়।

সেই গৌরব হাবাইয়া আমবা যখন আপনার সমস্ত পুঁটলি-পাঁটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংবাজ আসিবাব প্রয়োজন ছিল। ইংবাজেব প্রবল আঘাতে এই ভীক পলাতক সমাজেব ক্ষুদ্রবেড়া অনেকস্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিবকে ভয় কবিয়া যেমন দূবে ছিলাম, বাহিব তেমনি হড্ডুড্ড কবিয়া একেবাবে ঘাডেব উপবে আসিয়া পড়িয়াছে—এখন ইহাকে ঠেকাব কাহাব সাধা। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে দুইটা জিনিষ আমরা আবিস্কার করিলাম।

আমাদের কি আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কি আশ্চর্য্য অশক্ত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই বুঝিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজেব অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জাগ্রত করা, চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতাব নিয়ম। ইংরাজ ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিলেই,—ততক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উদ্যমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল “গেল গেল” বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া ছয়বেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা, তাহাও নিজেকে ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরাজ হইতে পারিব না, নকল ইংরাজ হইয়াও আমরা ইংরাজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয়, আমাদের কচি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রতিবোধ করিবার একমাত্র উপায়—আমরা নিজে বাহা, তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে, হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে—কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশে তাপদেরা তপস্বীদ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিষ্ফল করিবেন না। সেইজন্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্টে ভারতকে সুকঠিন পীড়নের দ্বারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারত-বর্ষেব অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না—সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্যই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্য সকল পক্ষকেই সে স্বীকার করে—স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে

আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না—এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জস্য অহিন্দু হইবে না—তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বতই দেশবিদেশেব হোক, তাহার প্রাণ, তাহাব আত্মা ভারতবর্ষের।

\* \* \* \* \*

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ফটো।

(কোন বিষয়াত ইউরোপীয় ফার্ম হইতে প্রস্তুত।)

- নং ১। বসা ক্যাবিনেট সাইজ—সিলভার—৥০।  
 " ২। দাঁড়ান ঐ ঐ ঐ ৥০।  
 " ৩। বসা কার্ড ঐ ঐ ১/০।  
 " ৪। ঐ ক্যাবিনেট ঐ ব্রোমাইড ৮০।  
 " ৫। দাঁড়ান ঐ ঐ ঐ ৮০।  
 " ৬। বসা কার্ড ঐ ঐ ১/০।  
 " ৭। গ্রুপ (স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকা হইতে আসিবার, কান্নাপুরে শ্রীমৎ মহাশয়ের বাগানে কিছু দিন থাকেন। ঐ স্থানে, স্বামীজি, তাহার কয়েকটা সন্ন্যাসী গুরু ভাই এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিষ্যের এক সঙ্গে ফটো তোলা হয়।)—ক্যাবিনেট সাইজ সিলভার ৥০।  
 " ৮। ঐ ঐ ব্রোমাইড ৮০।  
 " ৯। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন প্রকারের ২৭ খানি ক্ষুদ্র ফটো। ইহাতে তিনটা গ্রুপ আছে। ক্যাবিনেট সাইজ সিলভার (ক) ভারতীয় গ্রুপ—৥০ (খ) বিলাতী গ্রুপ—৥০ (গ) আমেরিকান গ্রুপ—৥০।  
 " ১০। ঐ ঐ (ব্রোমাইড) ৮০।

পোর্ট্রেট ও প্যাকিং প্রত্যেক ছবির ১/০। ফটোর অভ্যর্থন দিব্যার সময় উহার নম্বর জানাইবেন।

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

আমি হুঙ। “স্বঃ” অর্থাৎ পদরূপ শব্দনিচয়ের মধ্যে আমি “অক্ষর” প্রণব  
হই। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ হই। “স্বাবব” স্থিতিমান পদার্থ-  
সমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। ২৫।

অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।

গন্ধর্ব্বাণাং চিত্রবথঃ সিকানাং কপিলোমুনিঃ ॥২৬॥

অর্থ। (অহং) সর্ববৃক্ষাণাং অশ্বখঃ, দেবর্ষীণাং নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং  
চিত্রবথঃ, সিকানাং চ কপিলো মুনিঃ (আমি)। ২৬।

মূলানুবাদ। (আমি) সকল বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখ, দেবর্ষীগণের মধ্যে  
নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্রবথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল নামে মুনি  
(হই)। ২৬।

ভাষ্য। অশ্বখ ইতি অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ দেবা এব সন্তঃ  
ঋষিঃ প্রাপ্তা মন্ত্রদর্শিত্বাং তে দেবর্ষয়ঃ তেষাং নারদোহস্মি। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্র-  
বথঃ নাম গন্ধর্ব্বোহস্মি। সিকানাং জন্মনৈব ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং  
প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ। অশ্বখ ইত্যাদি খোকের অর্থ। সকল বৃক্ষের মধ্যে  
(আমি) অশ্বখ। দেবর্ষীগণের মধ্যে আমি নারদ। দেবতা হইয়া ঋষীরা মন্ত্রদর্শন  
করিয়াছেন বলিয়া ঋষি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবর্ষি কহে; সেই  
দেবর্ষীগণের মধ্যে আমি নারদ (ইহাই তাৎপর্য্য)। গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি  
চিত্রবথ নামে গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধগণের (মধ্যে) আমি কপিল নামে মুনি। জন্ম  
হইতেই ঋষীরা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের অতিশয় প্রাপ্ত হন, তাঁহা-  
দিগকে সিদ্ধ বলে। ২৬।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিকি শামমতোত্তবম।

ঐবাবতং গজেন্দ্রাণাং নবাণাঞ্চ নবাধিপম ॥২৭॥

অর্থ। অশ্বানাং বাং অমৃতোত্তবং উচ্চৈঃশ্রবসং বিকি, গজেন্দ্রাণাং ঐরা-  
বতং (বিকি) নরাণাঞ্চ নরাধিপং (বিকি)।

মূলানুবাদ। অশ্বগণের মধ্যে আমাকে উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া জানিবে,  
(উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব অমৃতমথনেন সনয় সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়াছিল)  
১লা আশ্বিন, ১৩১১।] ৪ উত্তোষন। ৫০৫

গজেন্দ্রগণের মধ্যে ( আমাকে ) ঐরাবত বলিয়া জানিবে, মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে নবপতি বলিয়া জানিবে । ২৭ ।

ভাষ্য। উচ্চৈরিতি। উচ্চৈঃশ্রবসমস্থানাং উচ্চৈশ্রবা নাম অশ্বঃ তং মাং বিদ্ধি জানীহি অমৃতোদ্ভবং অমৃতনিমিত্তমুৎপন্নোদ্ভবং। ঐরাবতং ইবাবত্যা অপত্যং গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্রবাণাং তং মাং বিদ্ধি, ইতি অত্ৰ বর্ত্ততে। নরাণাং মনুষ্যাণাং চ নবাধিপং বাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি। ২৭ ।

ভাষ্যানুবাদ। উচ্চৈঃ ইত্যাদি শ্রোকেব অর্থঃ। অশ্বগণের মধ্যে আমাকে উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া জান ; উচ্চৈঃশ্রবা একটা অশ্ব, ঐ অশ্ব অমৃত লাভের জন্ত যে সময় সমুদ্ভবন হয়, সেই সময় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমাকে সেই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব বলিয়া বুঝিবে ( ইহাই তাৎপর্য্য )। গজেন্দ্র অর্থাৎ হস্তিশ্রেষ্ঠগণের মধ্যে আমাকে ঐরাবত বলিয়া “জানিবে” ( জানিবে এই পদটী ) অন্বয়ুক্তি হইতেছে। ইবাবতীব অপত্যকে ঐরাবত কহে। “নব” অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে “নবাধিপ” অর্থাৎ রাজা বলিয়া জানিবে। ২৭ ।

আমুধানামহং বজ্রং ধেনুনামগ্নি কামধুক্ ।

প্রজনশ্চাগ্নি কন্দর্পঃ সর্পাণামগ্নি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ। অহং আমুধানাং বজ্রং ( অগ্নি ) ধেনুনাং কামধুক্ ( অগ্নি ) প্রজনঃ কন্দর্পশ্চ ( অগ্নি ) সর্পাণাং বাসুকিঃ অগ্নিঃ । ২৮ ।

মূলানুবাদ। আমি তদ্বসমূহের মধ্যে বজ্র হই, পয়স্বিনী গাভীগণের মধ্যে কামধেহু হই, আমি লোকসৃষ্টির কারণ কন্দর্প, সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি। ২৮ ।

ভাষ্য। আমুধানামিতি। আমুধানাং অহং বজ্রং দধীচ্যস্তিসংভবং ধেনুনাং দোদ্ধ্রীণাং অগ্নি কামধুক্ বশিষ্ঠস্ত সর্বকামানাং দোদ্ধ্রী সামান্যা বা কামধুক্ । প্রজনঃ প্রজনযিতা অগ্নি কন্দর্পঃ কামঃ। সর্পাণাং সর্পভেদানাম্ অগ্নি বাসুকিঃ সর্পরাজঃ । ২৮ ।

ভাষ্যানুবাদ। আমুধানাং ইত্যাদি শ্রোকের অর্থঃ। “আমুধগণের” অন্ত্রগণের মধ্যে আমি “বজ্র” দধীচি নামক গুনিব অগ্নি হইতে উৎপন্ন (প্রসিদ্ধ অন্ত্রবিশেষ) ধেনু অর্থাৎ প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীগণের মধ্যে আমি “কামধুক্” ( ঐ নামে প্রসিদ্ধ ) মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু, অথবা সাধারণ কামধেনু। আমি “প্রজন”  
৫০৬ উদ্বোধন। [ ৬ষ্ঠ—১৬শ সংখ্যা ;

উৎপত্তি হেতু “কন্দর্প” কাম, এবং সর্পগণের অর্ধাৎ সর্পবিশেষগণের মধ্যে আমি বাস্তুকি সর্পরাজ হই। ২৮।

অনন্তশাস্ত্রি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।

পিতৃণামর্যামা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

অর্থ্য। নাগানাং চ অনন্তঃ অস্মি, যাদসাং অহং বরুণঃ ( অস্মি ) পিতৃণাং অর্যামা চ অস্মি, অহং সংযমতাং যমঃ ( অস্মি )। ২৯।

মূলানুবাদ। আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত হই, আমি জলীয়প্রাণিগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্যামা এবং লোকনিয়ন্তৃগণের মধ্যে যম (হই)। ২৯।

ভাষ্য। অনন্ত ইতি। অনন্তশাস্ত্রি নাগানাং নাগবিশেষাণাং নাগবাক্স-শাস্ত্রি, বরুণো যাদসামহং অদেবতানাং রাজাহং। পিতৃণাং অর্যামা নাম পিতৃবাক্সশাস্ত্রি। যমঃ সংযমতাং সংযমং কুর্ততাং অহম্। ২৯।

ভাষ্যানুবাদ। অনন্ত ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। ‘নাগ’ অর্ধাৎ নাগবিশেষ-গণের মধ্যে আমি ‘অনন্ত’ নাগবাক্স হই। যাদঃ অর্ধাৎ জলদেবতাগণের মধ্যে আমি বরুণ অর্ধাৎ তাহাদের বাক্স। পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্যামা নামে পিতৃরাজ হই। “সংযমঃ” অর্ধাৎ লোকনিয়ন্তাদিগণের মধ্যে আমি যম। ২৯।

প্রহ্লাদশাস্ত্রি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।

মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাং ॥ ৩০ ॥

অর্থ্য। দৈত্যানাং চ প্রহ্লাদঃ অস্মি। অহং কলয়তাং কালোহস্মি। অহং মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রঃ পক্ষিণাঞ্চ বৈনতেযঃ ( অস্মি )। ৩০।

মূলানুবাদ। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ হই, হননকারিগণের মধ্যে আমি কাল, মৃগগণের মধ্যে আমি মৃগেন্দ্র এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়। ৩০।

ভাষ্য। প্রহ্লাদ ইতি। প্রহ্লাদো নাম চাস্মি দৈত্যানাং দিতিবংশজানাং কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্ততাং অহং, মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহো ব্যাঘ্রো বা অহং বৈনতেয়শ্চ গরুস্থান্ বিনতাস্ততঃ পক্ষিণাং পতঙ্গিণাম্। ৩০।

ভাষ্যানুবাদ। প্রহ্লাদ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। “দৈত্য” অর্ধাৎ দিতি-১লা আশ্বিন ১৩১১।] উদ্বোধন। ৫০৭

বংশীয়গণের মধ্যে আমি প্রস্ফুট হই। “কলযৎ” অর্থাৎ গগনকারিগণের মধ্যে আমি কাল, মৃগগণের মধ্যে আমি “মৃগেন্দ্র” সিংহ কিংবা ব্যাঘ্র হই, “পক্ষী” পতঙ্গিগণের মধ্যে আমি বৈনতেষ ( অর্থাৎ ) বিনতার পুত্র গকড়। ৩০।

পবনঃ পবতামগ্নি বামঃ শত্রুভূতামহম্ ।

ঋষাণাং মকবশ্চাম্মি শ্রোতসামগ্নি জাহুবী ॥ ৩১ ॥

অর্থ্য। অহং পবতাং পবনঃ অগ্নি, শত্রুভূতাং রামোহগ্নি, ঋষাণাং চ মকবোহগ্নি, শ্রোতসাং জাহুবী অগ্নি । ৩১।

মূলানুবাদ। আমি পবিত্রতাকাবিগণের মধ্যে পবন হই, শত্রুধারিগণের মধ্যে আমি বাম হই, মৎস্তগণের মধ্যে আমি মকব হই, নদীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা হই। ৩১।

ভাষ্য। পবন ইতি। পবনোবাযুঃ পবতাং পাবয়িতৃণাং অগ্নি, বামঃ শত্রুভূতাং শত্রুাণাং ধাবয়িতৃণাং দাশবতীবামোহহং । ঋষাণাং মৎস্তাদীনাং মধ্যে মকরঃ নাম জাতিবিশেষঃ অহং । শ্রোতসাং শ্রবস্তীনাং অগ্নি জাহুবী গঙ্গা । ৩১।

ভাষ্যানুবাদ। পবন ইত্যাদি শোকের অর্থ। পবৎ ( অর্থাৎ ) পবিত্রতাকাবী, তাহাদের মধ্যে আমি “পবন” বায়ু, “শত্রুভূৎ” অর্থাৎ বাহারা শত্রুধাবন করে, তাহাদিগের মধ্যে আমি বাম দর্শনধেব পুত্র। “ঋষ” অর্থাৎ মৎস্যাদি জলচর জীবগণের মধ্যে আমি “মকব” ( জলচর ) জাতিবিশেষ, “শ্রোত” ( শব্দের অর্থ ) নদী, সেই নদীগণের আমি “জাহুবী” অর্থাৎ গঙ্গা। ৩১।

সর্গাণামাদিবস্তুশ্চ মধ্যাং টৈবাহমর্জ্জুন ।

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

অর্থ্য। হে অর্জুন ! অহং ঐহং সর্গানাং আদিঃ মধ্যাঃ অন্তশ্চ, ( অহং ) বিদ্যানাং অধ্যাত্মবিদ্যা, অহং প্রবদতাং বাদঃ ( চ অগ্নি ) । ৩২।

মূলানুবাদ। আমিই এই সৃষ্টবস্তুগণের আদি মধ্য এবং অন্ত হই, আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে একবিদ্যা, আমি বাদিগণের ( ত্রিবিধ কথার মধ্যে ) বাদ ( নামে প্রসিদ্ধ কথাবিশেষ ) হই। ৩২।

ভাষ্য। সর্গানামিতি। সৃষ্টীনামাদিবস্তুশ্চ মধ্যাকৈবাহমুৎপত্তিস্থিতিবিলয়া অহমর্জ্জুন। ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানাং এব আদিবস্তুশ্চ ইত্যাহ্যজ্ঞমুপক্ৰমে

ইহ তু সৰ্গমাত্রৈব ইতি বিশেষঃ । অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং যোক্তার্থতাং প্রধানমস্মি, বাদোহর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং প্রধানং অতঃ সোহহং অস্মি প্রবক্তৃদ্বারেন বদনভেদানাং এব বাদজ্ঞবিত্তানামিহ গ্রহণং প্রবদতা-  
মিতি । ৩২ ।

ভাষ্যানুবাদ । সৰ্গাণামিত্যাदि শ্লোকের অর্থ । সৃষ্ট পদার্থ সমূহের আমিই আদি মধ্য ও অন্ত ( অর্থাৎ ) আমিই উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় । হে অর্জুন, এই অধ্যাত্মে প্রাপ্তে আদি ও অন্ত আমিই হই এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি জীবাবিষ্ঠিত ভূতনিবহেব আদি ও অন্ত । এখানে কিন্তু সকল পদার্থেরই আদি ও অন্ত যে ভগবান্, ইহাই সামান্ত্যাকারে বলা হইল ( এই বিশেষ ) । সকল বিদ্যাব মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা ( কাবণ ) যোক্তহেতু । এই জন্ত ঐ বিদ্যাই সকল বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠ । বাগ্মিগণের নিকটে আমি বাদ কথা ( অর্থাৎ ) জ্ঞান বিতণ্ডা ও বাদ এই তিনভাগে বিভক্ত কথার মধ্যে পদার্থনির্ণয় বাদকথাতেই হয়, এই জন্ত ঐ ত্রিবিধ কথার মধ্যে বাদ-  
কথাই প্রধান ; এই কাবণ আমিই সেই বাদকথা, যদিচ এই খোকে বক্তা-  
দিগেবই নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি এই স্থানে বক্তাকে দ্বারস্বরূপ করিয়া বদন অর্থাৎ বাদ জ্ঞান ও বিতণ্ডা নামক কথাএয়েরই গ্রহণ করা হইতেছে অর্থাৎ “ বাগ্মিগণের মধ্যে ” এই বাক্যটির অর্থ এই হইবে যে, বাগ্মিগণের ত্রিবিধ কথার মধ্যে । ৩১ ।

অক্ষরাণামকাবেহস্মি ব্ধন্দঃ সামাসিকস্ত চ ।

অহমেবাক্ষয়ঃ কালোধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অর্থ । ( অহং ) অক্ষরাণাং অকাবেহস্মি সামাসিকস্ত ব্ধন্দোহস্মি অহমেব  
অক্ষয়ঃ কালোহস্মি, অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতাহস্মি । ৩৩ ।

মূলানুবাদ । আমি অক্ষরগণের মধ্যে অকার হই, সমাসগণের মধ্যে  
ব্ধন্দ সমাস হই । আমিই অক্ষয় কাল, আমিই বিশ্বতোমুখ ধাতা । ৩৩ ।

ভাষ্য । অক্ষরাণামিতি । অক্ষরাণাং বর্ণানাং অকারো বর্ণোহস্মি,  
ব্ধন্দোহস্মি সামাসিকস্ত সমাসসমুহস্ত । কিঞ্চ অহমেব অক্ষয়ঃ অক্ষীণঃ কালঃ  
প্রসিদ্ধঃ ক্ষণাদ্যাত্ম্যঃ অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্তাপি কালঃ অস্মি । ধাতা-  
হং কন্দ্য়কস্ত বিধাতা সৰ্ব্বজগতো বিশ্বতোমুখঃ সৰ্ব্বতোমুখঃ । ৩৩ ।

১লা আখ্যায়িক, ১৩১১ । ]

উদ্বোধন ।

৫০২



ভাষ্যানুবাদ । অক্ষরাণাং ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ । “অক্ষর” বর্ণগণের মধ্যে অকারনামে বর্ণ হই । “সামাসিক” সমাসসমূহের মধ্যে আমি বৃন্দ সমাস । আরও আমি “অক্ষয়” অক্ষয় কাল, জ্ঞানদিক্রমে প্রসিদ্ধ কালই ( এইস্থলে কালশব্দের অর্থ ) অথবা ( এখানে কালশব্দের অর্থ ) কালেরও কাল পরমেশ্বর । আমি “ধাতা” সর্বজগতের কর্মফলের বিধাতা “বিশ্বতো-মুখ” সর্বতোমুখ । ৩৩ ।

মৃত্যুঃ সর্বহবশ্চাহং উদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।

কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতিমেধা যুতিঃ ক্রমা ॥ ৩৪ ॥

অর্থঃ । অহং সর্বহবঃ মৃত্যুঃ ভবিষ্যতাঞ্চ উদ্ভবঃ ( তথা ! নারীণাং কীর্তিঃ শ্রীঃ বাচ্ স্মৃতিঃ মেধা যুতিঃ ক্রমা চ । ৩৪ ।

মূলানুবাদ । আমি সর্ব হর মৃত্যু । আমি ভবিষ্যৎসংগণেব উদ্ভব, আমিই নারীগণের কীর্তি শ্রী বাচ্ স্মৃতি মেধা যুতি ও ক্রমা হই । ৩৪ ।

ভাষ্য । মৃত্যুঃ দ্বিবিধঃ ধনাদিহবঃ প্রাণহরশ্চ সর্বহর উচ্যতে সৌহৃ-মিত্যর্থঃ । অথবা পর ঈশ্বরঃ প্রলয়ে সর্বহবণাং সর্বহবঃ সৌহৃদম্ । উদ্ভব উৎকর্ষঃ অভ্যুদয়ঃ তৎপ্রাপ্তিহেতু-চাহঃ কেবাং ? ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং মুংকর্ষপ্রাপ্তিবোগ্যানামিত্যর্থঃ । কীর্তিঃ শ্রীর্বাচ্ চ নারীণাং স্মৃতিঃ ক্রমা ইত্যোভা উক্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকঃ কৃতার্বমাত্মানং মজ্ঞতে । ৩৪ ।

ভাষ্যানুবাদ । মৃত্যু দুই প্রকার ( এক যে ) ধনাদি হরণ কবে ( দ্বিতীয় যে ) প্রাণ হরণ করে ( তাহাকেও মৃত্যু কহা যায় ) সুতরাং মৃত্যু সর্বহর বলিয়া কীর্তিত হয়, আমি সেই মৃত্যু । অথবা আমি সেই পবন ঈশ্বররূপে প্রলয়কালে সমুদয় হরণ কবি বলিয়া সেই সর্বহর মৃত্যু আমিই হই । “উদ্ভব” ( এই শব্দটী ব অর্থ ) উৎকর্ষ অর্থাৎ অভ্যুদয় এবং তাঁহাব প্রাপ্তির কাবণ “ভবিষ্যৎ” যাহাবা কল্যাণাম্পদ হইয়া উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ যাহাবা উৎকর্ষপ্রাপ্তির যোগ্য, তাহাদের ( আমিই উৎকর্ষ ) । আমি নারীগণেব কীর্তি বাচ্ শ্রী স্মৃতি মেধা যুতি ও ক্রমা এই কয়টি উক্তম স্ত্রীসত্তাব ( রূপে বিবাজমান আছি ) যাহাদিগের আভাস রূপ সম্বন্ধ লাভ কবিলেও লোক আপনাকে কৃতার্ব বোধ করিয়া থাকে । ৩৪ ।

বৃহৎসাম তথা সান্নাং গায়ত্রীছন্দসামহম্ ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহিমুতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ। তথা সান্নাং বৃহৎসাম অগ্নি। ছন্দসাং গায়ত্রী অগ্নি। অহং মাসানাং মার্গশীর্ষোহিমি। ঋতুনাং কুসুমাকরোহিমি। ৩৫।

মূলানুবাদ। আরও আমি সামগানের মধ্যে বৃহৎসামনামক প্রধান সাম গান। ছন্দঃসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রীছন্দঃ। মাসনিবহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ। আমি ঋতুছয়টির মধ্যে বসন্ত ঋতু। ৩৫।

ভাষ্য। বৃহৎসানেতি বৃহৎসাম তথা সান্নাং প্রধানমগ্নি। গায়ত্রী-ছন্দসাং গায়ত্রাদিছন্দোবিশিষ্টানাম্ ঋচাং গায়ত্রী ঋক্ অহং ইত্যর্থঃ। মাসানাং মার্গশীর্ষোহিম্ ঋতুনাং কুসুমাকরো বসন্তঃ। ৩৫।

ভাষ্যানুবাদ। বৃহৎসাম ইত্যাদি ধোকেব্ব অর্থ। সামগানসমূহের মধ্যে প্রধান বৃহৎসাম নামক গান আমি হই। ছন্দঃসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী (অর্থাৎ) গায়ত্রী প্রকৃতি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রগণের মধ্যে আমি গায়ত্রী-ছন্দোযুক্ত মন্ত্র। মাসগণের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি “কুসুমাকর” বসন্ত। ৩৫।

দ্যুতং ছলযতামগ্নি তেজন্তেজস্বিনামহম্ ॥

জ্যোহিমি ব্যবসায়োহিমি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

অথ। অহং ছলযতাং দ্যুতং অগ্নি। তেজস্বিনাং তেজঃ অগ্নি জয়ঃ অগ্নি ব্যবসায়ঃ অগ্নি অহং সত্ত্ববতাং সত্ত্বং অগ্নি। ৩৬।

মূলানুবাদ। আমি ছলনাকারিগণের দ্যুত হই। তেজস্বিগণের তেজঃ হই; আমি জয়, আমি ব্যবসায়, আমি বলবান্ প্রাণিগণের বল। ৩৬।

ভাষ্য। দ্যুতমিতি। দ্যুতমক্ষদেবনাদিনৃক্ষণং ছলযতাং ছলন্ত কর্তৃণাং অগ্নি। তেজন্তেজস্বিনামহং জ্যোহিমি তেজঃপাং ব্যবসায়োহিমি ব্যবসায়িনাং সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্বিকানামহং। ৩৬।

ভাষ্যানুবাদ। দ্যুতমিত্যাदि ধোকেব্ব অর্থ। “দ্যুত” অক্ষকৌডানিরূপ; আমি ছলনাকারিগণের (দ্যুত) হই। আমি তেজস্বিগণের তেজঃ হই, জয়কারিগণের জয় হই, ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় হই এবং “সত্ত্ববান্” সাত্বিকগণের সত্ত্ব হই। ৩৬।

বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।

মুণীনামপি বাসঃ কবীনাং মুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অর্থঃ । ( অহং ) বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ( অস্মি )  
অহং মুণীনামপি বাসঃ কবীনাং ( অহং ) উশনাঃ কবিঃ । ৩৭ ।

মূলানুবাদ । বৃক্ষিকুলের মধ্যে আমি বাসুদেব হই, পাণ্ডবগণের মধ্যে  
আমি ধনঞ্জয় হই, মুনিগণের মধ্যেও আমি বাস হই এবং কবিগণের মধ্যে  
আমি কবি শুক্রাচার্য্য । ৩৭ ।

ভাষ্য । বৃক্ষীনাং । বৃক্ষীনাং বাসুদেবোহস্মি অবমেবাহং ত্বংসখা,  
পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়স্তমেব মুণীনাং মননশীলানাং সর্বপদার্থজ্ঞানিনামপ্যাহং  
বাসঃ । কবীনাং ক্রান্তদর্শিনাং উশনাঃ কবিরস্মি । ৩৭ ।

ভাষ্যানুবাদ । বৃক্ষীনাং ইত্যাদি থাকেব অর্থ । বৃক্ষিগণের মধ্যে আমি  
বাসুদেব এই তোমার সখা আমিই । পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়  
অর্থাৎ ভূমি । “মুনি” অর্থাৎ মননশীল সর্বজ্ঞগণের মধ্যেও আমি  
বাস, “কবি” অর্থাৎ অতীত বস্তুনিচয়দর্শিগণের মধ্যে আমি উশনাঃ নামে  
কবি হই । ৩৭ ।

দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাং ।

মৌনং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহং ॥ ৩৮ ॥

অর্থঃ । দময়তাং দণ্ডোহস্মি, জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহানাং চৈব  
মৌনং অস্মি জ্ঞানবতাং অহং জ্ঞানং অস্মি । ৩৮ ।

মূলানুবাদ । দমনকারিগণের আমি দণ্ড, বিজযেচ্ছুগণের আমি নীতি;  
গুহগণের মধ্যে আমি মৌন, জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞান হই । ৩৮ ।

ভাষ্য । দণ্ড ইতি । দণ্ডো দময়তাং দময়িতৃণাং অস্মি অদাস্তানাং  
দমকাবলম্ । নীতিরস্মি জিগীষতাং, মৌনং চৈবাস্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞান-  
বতামহম্ । ৩৮ ।

ভাষ্যানুবাদ । “দময়ৎ” অর্থাৎ দমনকারিগণের আমি “দণ্ড” অদাস্তজন-  
গণের দমনের হেতু হই “জিগীষৎ” জযেচ্ছুগণের আমি নীতি হই । “গুহ”  
গোপাগণের মধ্যে আমি মৌন হই এবং ~~জ্ঞানবতামহম্~~ জ্ঞানবতামহম্  
হই । ৩৮ ।

## ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ।

( শ্রী সবসীলাল সরকার এম, এম )

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, বাক্সি মাত্রেবই হৃদযেব মধ্যে একটা আদর্শ থাকে, তাহাই সে কার্যো পশ্চিৎ কবিত্তে চেষ্টা কবে। স্বামীজীব এই কবটি কথাব মধ্যে গভীৰ সত্য নিহিত বহিয়াছে। য়েকপ মনুষ্যেব কার্য ও আচৰণ দেখিবা আমবা তাহাব চবিত্র সঙ্কে অনুমান কবিত্তে পাৰি, সেইকপ জাতীয় কার্য ও আচৰণ দ্বাৰাও আমবা জাতীয়-চবিত্র বুলিত্তে পাৰি। অতএব মনুষ্যবিশেষেণ চবিত্র অথবা ক্ষাতি বিশেষেব চবিত্র উভবই আমবা দুই অংশে বিভক্ত কবিত্তে পাৰি। পথম, আদর্শ, দ্বিতীয়, সেই আদর্শ কার্যো পবিত্রত কবিবাব চেষ্টা। একজন অং রেব মনে উক্ত আদর্শেব চিত্র অঙ্কিত কবিবা চবিত্র-গঠন সঙ্কে সাহায্য কবিত্তে পারে, কিন্তু সেই আদর্শ নিজেব জীবনে পবিত্রত কবিত্তে প্রত্যেক মনুষ্যকে নিজেব উপব নির্ভব কবিত্তে হয়।

সাহিত্যে জাতীয়-জীবনেব প্রতিবিম্ব থাকে। একজ্ঞ কোন সময়বিশেষেব সাহিত্যে সেই সময়েব জাতীয়-জীবনেব পবিচয় অনেকাংশে পাওয়া যায়। এখনকাব বঙ্গসাহিত্য পাঠ কবিলে তাহাব সঙ্গবই প্রায় হতাশ ভাব দেগা যায় এবং কি যেন একটা ছায়া ছায়া অনিশ্চিত ভাবেব ছড়াছড়ি ভিন্ন কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য খুঁজিবা পাওয়া যায় না। অদিকাংশেই উদ্বেগুহীনতাব পবিচয় পাওয়া যায় মাত্র। গ্রহকর্তা কি বলিত্তে চান, তাহা তিনি নিজেই যেন ঠিক জানেন না বা ধবিত্তে পাবেন নাই। ইহাতে মনে তব, আমাদেব জাতীয় জীবনেব আদর্শ এখনও সমাধ্বকপে গঠিত জ্ব নাট। আমরা কি চাই, তাহা আমবা এখনও ঠিক জানিনা। বীতিভাব ভিত্তেব এই নিবাশা, এই বিলাপ, এই উদ্বেগুহীনতা তাহাবই পাচয় প্রদান করে। আমাদেব পুরু-পুরুযেরা কীদংশ মহানুভব হিলেন এবং আমবা কতদূৰ অধঃপাতে গিয়াছি, এই কথা তুলিবা অশ্রুবিসর্জন কবিবাব সুবিধা পাইলে সে মাহেন্দ্র স্বযোগ কোন লেখকই পরিত্যাগ করেন কিনা সন্দেহ। কিসে আমবা উন্নত হইতত্তে পাৰি, কিসে আমরা চরিত্রবান হইতত্তে পাৰি, এই বিবা লইবা বিতর্ক কবিত্তে আমাদেব যে সময় চলিবা যাব, উন্নত আদর্শকে নিজেব জীবনে দৃঢ়ভাবে

স্থাপন কবিত্তে যদি সে সময়ের শতাংশের একাংশও বায় কবা হয়, তাহা হইলে যে আমরা উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসব হইতে পাবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে বাখিতে হইবে যে, ভুখন্দাবিদ্যোব স্রোতে পড়িয়া দিন দিন আমরা অধঃপাতসমুদ্রেব দিকে অগ্রসব হইতেছি বলিয়া বোদন মাত্রেই আমাদের ভিতব মনুষ্যত্বেব উদয় হইবে না।

পূর্ব-পুরুষদেব কীর্তিচিহ্ন দেখিয়া তাঁহাদেব গায় হইবাব আমাদের ইচ্ছা ও উদ্যম আছে কি না, ইহাই অনুসন্ধান কবিত্তে যদি আমরা ব্যগ্র হইতাম, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কীর্তি প্রাণেব ভিতব উত্তেজনার আশ্রয় অক্ষবে “উত্তীর্ণত জাগ্রত” এই মহাবাহী অস্তিত কবিত্তে দিত! তখন অশ্রদ্ধাল ফেলিয়া বিলাপ কবিবাব অবসবও থাকিত না।

আদর্শকে কার্যে পবিণত কবিবাব চেষ্টাব অভাবই যে কেবল আমাদের ভিতব বর্তমান, তাহা নহে, উন্নত আদর্শ-বিশেষ জীবনে পবিণত কবিয়াছে, এমন মনুষ্যেবও যথেষ্ট অভাব।

নন্দলাল তো একদিন একটা কবিত্ত বিষমপণ,

দেশেব জগ্ন যা কবেই হোক বাখিবেই সে জীবন।

সকলে বলিল “আহাহা কব কি কব কি নন্দলাল।”

নন্দ বলিল বসিয়া বসিয়া ব’ব কি চিনটা কাল।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বায়েব চিত্রিত নন্দলালেব মত আদর্শই এখন দেশে অনেক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃত তাগ, নিবলস চেষ্টা ও আত্মসম্মত কার্য যে দেশ হইতে লোপ হইয়াছে, তাহা নব, তাহা হইলে বাঙ্গালীেব নামও এতদিন লুপ্ত হইয়া যাইত।

দ্বর্গায ডাক্তাব মহেন্দ্র লাল সববাবেব জীবনে যে অশ্রান্ত চেষ্টা, অপবিসীম উৎসাহ ও অধাবসায় দেখিত্তে পাওয়া যায়, তাহা পৃথিবীস্থ সকল জাতিব নিকটেই এক উন্নত আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তাঁহাব কর্মময় জীবনেব আদর্শে আমাদের জাতীয় জীবন যে উন্নতি লাভ কবিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। এবং তজ্জন্ত প্রত্যেক বঙ্গবাসীেব হৃদয়ে তাঁহাব নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

হাওডাব আঠান মাইল পশ্চিমে পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেব ২রা নভেম্ববে ডাক্তাব মহেন্দ্রলাল সববাবেব জন্ম হয়। তাঁহাব পিতাব নাম ৬তাবক নাথ সববাব। সামান্ত ভূমিন্স্পত্তিেব আয় দ্বাবা তিনি সংবাবসায় নিরীহ

করিতেন। এই শ্রেণীর লোক ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। জীবিকা নির্বাহের জন্য ইহাদিগকে নিজের বুদ্ধি স্বাধাবসায় এবং পরিশ্রমেব উপব নির্ভর করিতে হইত, সেজন্য তাঁহারা স্বাধীনচিত্ত ও স্বাবলম্বন-প্রিয় ছিলেন। ইংরেজ অধিকাৰে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলনে, খাদ্যদ্রব্যাদির দুর্শূন্যতা হেতু ও অন্যান্য কারণে এই শ্রেণীর লোককে বিশেষ কষ্টভোগ কবিয়া পবিশেষে বাধ্য হইয়া অল্প বৃত্তি অবলম্বন কবিত হইয়াছে! ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বালাকালে নিজ পবিবাববর্গকে ঐক্লপ দুর্দশাভোগ কবিত স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঐ স্মৃতিই যে 'ারে বিজ্ঞানসভা স্থাপন কবিয়া লোকের ঐক্লপ দুর্দশা মোচন করিবাব উদ্দেশ্য তাঁহাব জীবনে আনিয়া দেয়, ইহা নিঃসন্দেহ।

তাবকনাথ সরকারের অল্প বয়সেই মৃত্যু হইল। ঐ ঘটনায় মহেন্দ্রের মাতা নিতান্ত নিবাস্রয়া হইয়া পড়িলেন এবং পুত্র দুটাকে লইয়া কলিকাতায় জাতাব গৃহে আশ্রয় লওয়া ব্যতীত তাঁহাব আব অন্য উপায় বহিঃ না। এইরূপে মাতুলগৃহেই ডাক্তাব সরকারেব জীবনের প্রথম ভাগ অতিবাহিত হয়। মাতুলালয়ে মহেন্দ্রলাল এবং তাঁহাব মাতার কষ্টে দিনযাপন করিতে হইত। বাজার হইতে বিচাপী কিনিয়া আনা, উহা কাটিয়া গরুর খাইবার উপযোগী কবিয়া দেওয়া প্রভৃতি অশেষবিধ গৃহকর্ষ্যই তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে কবিত হইত। বাল্যজীবনেব ঐ সমস্ত পারিবারিক ক্রেশ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারেব ভবিষ্যৎ চবিত্র গঠনে একদিকে যেমন বিশেষ সহায় হইয়াছিল, সেইরূপ অন্যদিকে আবার কয়েকটি কর্কশরেখাও দৃঢ়-অঙ্কিত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সুইফ্টের (Swift) চরিত্র সমালোচনা কবিত ষাইয়া থ্যাকাৰে (Thackeray) এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, সুইফ্ট অদ্বুত প্রতিভাশালী এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন কিন্তু কৈশোব জীবনে পরমুখাপেক্ষী হইয়া দাসভাবে অবস্থানই তাঁহাব স্বভাবের কর্কশতাব একটা প্রধান কারণ। বাল্যকাল হইতেই ডাক্তার সরকার অত্যন্ত নির্ভীক এবং বিশেষ স্পষ্টবাদী ছিলেন। অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। একজন্মই বোধ হয় পরজীবনে তাঁহাব কর্কশ স্বভাবের অপবাদ হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাবে কিন্তু বাস্তবিক কর্কশতা ছিল না। উপরের কঠিনস্তর একবার ভেদ করিতে পারিলে—এবং অতি সহজেই উহাব ভেদ হইত—ভিতরে অমৃতময়ী পরমুখকাতরতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি কোমল গুণবাশি প্রতীয়মান হইত। তাঁহার পরিচিত সকলেই এ বিষয়ে ভূরি নিদর্শন পাইয়াছেন।

মহেন্দ্রলাল সাতবৎসর বয়সে হেয়ারস্কুলে ভর্তি হইলেন এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ হইতে সিনিয়ার বৃত্তি পাইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। পঠদশায় তিনি সমস্ত শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম, ডি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়াছিলেন।

প্রবন্ধেব ভূমিকায় আদর্শ এবং ঐ আদর্শ জীবনে পবিণত কবিবার চেষ্টা রূপ মানবচবিত্তেব যে দুইটি বিভাগেব কথা বলিয়াছি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সবকাবের চবিত্তে সেই দুইটা অংশই বিশেষ পরিশ্ফুট দেখিতে পাই। ডাক্তার সবকাব সকল বিষয়েই উচ্চতম আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন বটে, কিন্তু কেবল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ই বিশেষরূপে পাবদর্শিতা লাভ কবা তাহাব জীবনেব উদ্দেশ্য ছিল না। চিকিৎসা বিষয়ে তিনি মহর্ষি চবকেব বিশ্বজনীন উপদেশট মলমদ্য করিয়াছিলেন, -“স চৈব ভিষজ্ঞাং শ্রেষ্ঠো বোণোঃস্য যঃ প্রাণাত্যেবঃ।” যে মত অবগদন করিয়াই চিকিৎসা ককন না বেন, তিনিই ভিষদশ্রেষ্ঠ, বিনি বোণ হইতে মুক্ত করিতে পাবেন। ডাক্তার সবকাবের যখন ধারণা তইল যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, তখন তিনি নিজেব আর্থিক উন্নতিব সমুদ্র ক্ষতি করিয়াও ঐ প্রণালী পবিত্যাগ করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন নাই। ভূতপূর্বে লেক্‌টেক্সাণ্ট গভর্নর সাব্‌জন উডববগ ডাক্তার সবকাবের উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানসভাব একটা বক্তৃতায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “ডাক্তার সবকাব, তুমি বিজ্ঞানসভা সম্বন্ধে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট নহ। ইহাব কাবণ ইহা নহে যে, তুমি বিজ্ঞানসভা স্থাপন ও তাহাব উন্নতিকল্পে যে যে কার্য্য করিয়াছ, সে গুলি সামান্য কার্য্য কিন্তু তাহাব কাবণ এই যে, তোমাব আদর্শ এত উচ্চ যে, তুমি অল্পে সন্তুষ্ট হইবাব নহ। সাধাবণেব নিকট যাহা অসামান্য বলিয়া বোধ হয়, তোমাব নিকট তাহা যৎসামান্য মাত্র।”

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার সবকাব বিজ্ঞানসভা স্থাপন করেন। ঐ সভা স্থাপনেব পব তিনি যে ২৭ বৎসব জীবিত ছিলেন, উহাবই উন্নতিকল্পে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানসভাব দ্বারা দেশ ক্ষিপ্তে উন্নত হইতে পারে এবং ঐ সভাব উদ্দেশ্য বে বতদ্ভব্যাপা, তাহা তিনি সভাব বাৎসবিক অধিবেশনে সম্বাসাধাবণকে পাইতে চেষ্টা করিতেন। ডাক্তার সবকাব বুঝিয়া

ছিলেন, কেবল পূর্বপুরুষগণের গুণকীর্তন করিলেই দেশের অন্নকষ্ট হুচিবে না অথবা মন্ত্রশক্তি বলে যে, সহসা আমাদের সকল দুঃখ দুঃ হইবে, সে আশাও বুধা। ভাবত যদি আবার কখন উন্নত হয়, ত কেবল মাত্র দেশবাসীদের অশান্ত পবিত্রমেব ফলে হইবে। আবার পবিত্র যদি উদ্দেশ্যহীন হয়, তাহা হইলে তাহাও বুধা হইবে। যথার্থ কর্ম্ম প্রত্যেক কর্ম্মের উদ্দেশ্যটি আপন মনে স্পষ্ট অনুভব করিয়া ও ঐ উদ্দেশ্যকে দীপশিখার ন্যায় সসুখবর্তী করিয়া তৎকালে অগ্রসব হন এবং ক্রমে সিদ্ধমনোবধ হইয়া থাকেন। আমাদেরও ঐ পথ আশ্রয় করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যদেশগুলির এবং নব অভ্যুদিত জাপানের উন্নতির মূল খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যাব, বিজ্ঞানচর্চাই এবং ঐক্যে কন্মাত্মনাই ইহাদের সমস্ত উন্নতির মূল। ভাবতবর্ষ সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটিবে। এই অন্নবর্ষহীন দাবিদ্র্যদুঃখপীড়িত ভাবতবর্ষের যদি এখন উন্নতির কোন উপায় থাকে ত সে কেবল স্বাবলম্বনে, অদম্য-উদ্যমে ও বিজ্ঞান চর্চায়। গত বৎসর “ভাবতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, ইহাব সম্বন্ধে বৃত্তান্ত ও অভাব” শীর্ষক একখানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাব ভূমিকাতে ঐ বিষয়টা বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা উহাব কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম। “কলিকাতাব নিকটবর্তী অনেক স্থানে সামান্য একজন মজুরের মাহিনা দশটাকা, কিন্তু বেলে হউক অথবা লগুনানে হউক, একজন শিক্ষিত উদ্যুবক সেই মাহিনায় চাকুরী পান না। সে দিন একজন ছাত্র-বৃত্তি পাশকবা ব্রাহ্মণ যুবক পাচকের কার্য্য করিবার জন্য ঘূরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, কোন এক ব্যক্তি এফ্.এ. পাশ করিয়া এক আফিসে দপ্তরী কার্য্য করিতেছেন। ফল কথা, ভদ্রসন্তানগণকে যে পেটেব জ্বালায় ক্লিগিবি করিতে হইতেছে, তাহাবই পূর্বদৃষ্টো প্রকাশ পাইতেছে। এখন উপায় কি? আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা করা এবং সেই বিজ্ঞান ক্রমি ও শিল্পকার্য্যে নিবোধিত করাই এই বিপৎসাগর হইতে উদ্ধার পাইবার একমাত্র উপায়। ইহাব পব ভবিষ্যতে আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের যে কিকপ শোচনীয় দুর্দশা হইবে, সাহারা সে কথা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, ঠাটাবা বিজ্ঞানসভার সভা, লজ্জা ও দুগায় জলাঞ্জলি দিবা, দাবে দাবে ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত হইবেন।” ডাক্তার সরকার এটিও বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন যে, বিজ্ঞানালোচনায় যে ঐক্যপ্রিয় উ.তি হয়, একপনহে, কিন্তু বুদ্ধিরস্তিত্ত বিকাশ হয়, সত্যাহুসকানের



চেষ্টা হব এবং সত্যাত্মসন্ধিৎসু ব্যক্তি কিরূপেই বা বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিলে সিদ্ধকাম হইতে পারেন, তাহারও শিক্ষা হয়। আবাব ইহাতে মানবহৃদয়েরও অদ্ভুত বিকাশ হইয়া থাকে। এই মহতী বিচিত্রতাময়ী ও অপার রহস্য-ময়ী প্রকৃতির রহস্যাত্মসন্ধানে চিত্ত নিয়োজিত করিলে চিত্তবৃত্তিগুলি যে ক্রমশঃ ইহার স্রষ্টকর্ত্তাব দিকে আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহার অপূৰ্ণ সৃষ্টির নিত্য নুতন ভাবে পরিচয় পাইয়া ভক্তিবসে আত্মত হইবে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে ?

বিজ্ঞানসভায় বক্তৃতা দ্বাবা এবং বহুতর লিখিত প্রবন্ধের দ্বারা জনসাধাবণে এই সমস্ত তত্ত্বগুলির প্রচারেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার অদ্ভুত জীবনে এই ভাব এতই অধিক ছিল যে, বোগে শোকে নিরাশায় অন্ধকাৰে এবং মৃত্যুশয্যায শায়িত হইয়া তিনি যে ভক্তিরসাত্মক সংগীত গুলি রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদায়ও এই ভাবে পরিপূর্ণ ! আমরা তাহার একটি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা ।

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গগনমণ্ডলে ।

কি শোভা কবেছে সেথা গ্রহ তাবা দলে ॥

( যেন ) প্রকৃতি সাজায়ে বেখেছে জ্যোতির্ময় পুন্দলে ।

দিতে পুস্তাঞ্জলি বিধাতার চরণকমলে ॥

দুববিন সহকারে বিজ্ঞানের বলে ।

( দেখ ) অদ্ভুত রূপ তাদের জ্ঞানচক্ষু মেলে ॥

দেখিবে তবে এই অসীম বিশ্বরাজ্য

চালাইছেন বিশ্বনাথ কি কৌশলে ॥

ছড়ায়ে ধূলি এক মুষ্টি, তিনি কবিয়াছেন সৃষ্টি,

অগণ্য নিখিল ঐশ্ব্য ও, ধূলা খেলার ছলে ॥

সঙ্কর ও মহাপ্রলয় কবিত্তে নিবাবণ,

বন্ধন কবেছেন তাদের নিয়ম শৃঙ্খলে,

নিয়ম পালনে তাবা ভ্রমিতেছে অনুরূপ,

অপার মহিমা তাঁব গাইতেছে সবে মিলে ॥

স্বামী বিবেকানন্দও শিব কবিয়াছিলেন যে, ভাবতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি জনসাধাবণের নিকট প্রচারিত হওয়া বিশেষ

আবশ্যক। উদ্বোধনে প্রকাশিত তাঁহার একখানি পত্রপাঠে জানা যায়, তিনি বায়ক্লব-মিশনের সভ্যগণকে ঐক্যপূর্ণ প্রচারকার্যেব জন্য বিশেষ অনুরোধ কবিতেন। সমাজেব নিম্নস্তরস্থ ব্যক্তিগণেব মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মোটামুটি তত্ত্বগুলি সাধাবণের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইবাব বন্দোবস্ত কবিবাব পরামর্শ দিতেন। ম্যাজিক লিগন প্রভৃতি সামান্য সামান্য যন্ত্র সাহায্যে ঐ বক্তৃতাগুলি সাধাবণের চিত্তাকর্ষক কবিবাব কথো বলিতেন। ঐক্যপ সামান্য ভাবে কার্য্য আবস্ত কবিতেন কুণ্ঠিত হইতেও নিবেদন কবিতেন। কারণ, সামান্য বীজ হইতেই পবিণামে মহান্ মহীকুহের উৎপত্তি হয় এবং ঐক্যপ সামান্য ভাবে আরম্ভ কবিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি ক্রমশঃ সাধাবণে প্রচাৰিত হইলে পবিণামে বহুজন-কল্যাণ-রূপ সুফল প্রদান কবিবে। ডাক্তার সবকাব এবং স্বামী বিবেকানন্দেব ঐ সারগর্ভ বচনগুলি বায়ক্লব-মিশন এবং দেশস্থ অন্যান্য সভাসমিতির সভ্যগণ যদি হৃদয়ে ধাবণা কবিয়া ঐ সুমহৎ প্রচাৰিত্রত যাহার যতটুকু সাধ্য, অহুতান কবেন, তবে দেশেব এই দুর্দশামোচন অতি শীঘ্রই সম্পাদিত হয়।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অনেক প্রকার লোকসম্মানে ও রাষ্ট্র-সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতাব ইউনি-ভার্সিটীবে ফেলো পদে নির্বাচিত হন। ঐ পদে নির্বাচিত হইয়া তিনি ইউনিভার্সিটীর শিক্ষাপ্রণালীসংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের মীমাংসায় বিশেষ সাহায্য কবিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটেব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ন্যাবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার সেরিফের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খ্রিঃ অব্দে তিনি গভর্ণমেন্ট কর্তৃক সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ১৮৯৮ খ্রিঃ অব্দে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী হইতে ডি. এল. (D. L.) উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্বিধা মিউনিসিপ্যাল কমিসনার, আসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য প্রভৃতি নানা পদে নির্বাচিত হইয়া সকল পদের কার্য্যভারই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া ভূরি সম্মান লাভ কবিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রিঃ অব্দে তিনি দি ক্যালকাটা জর্নাল অফ মেডিসিন (The Calcutta Journal of Medicine) নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুহাকাল পর্যন্ত ঐ পত্রিকা তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল।

ডাক্তার সরকারের ধর্মমত আলোচনা কবিবাব পূর্বে ভাবতবর্ষীয় প্রাচীন সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে বর্তমান ভারতের ধর্ম-জীবনে যে পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ২।১ টি কথা বলা আবশ্যিক। প্রাচীন ভাবতে আর্ধ্যজ্ঞাতিগণের মধ্যে ধর্মবিষয়ে যেকোন আলোচনা হইয়াছিল, পৃথিবীর আব কোন জাতির মধ্যে কখনও সেরূপ হয় নাই, এ কথা বলা অত্যাশ্চর্য্য মাত্র। ভাবতের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন দর্শন কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তি অবলম্বনে গঠিত হইয়াছে, কোনটি বা প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। আবার কোন দর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এইরূপে, ধর্মতত্ত্ব যত প্রকারে আলোচনা করা সম্ভব, প্রাচীন ঋষিগণ তাহা কবিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ধর্মজগতে আজ এক প্রকার নূতন প্রমাণপ্রণালীর অভ্যুদয় হইয়াছে। এই নূতন প্রমাণপ্রণালীর নাম বিজ্ঞানপ্রমাণ। ধর্মজগতে আজ কাল যে মহাবিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঋষিগণস্বীকৃত প্রমাণপ্রণালীর সহিত উক্ত বিজ্ঞানপ্রমাণের সংযোগ-সংঘর্ষেই উৎপন্ন হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বর্তমান যুগের হিন্দুধর্মপ্রচারকেবা ঋষিগণাবিস্কৃত তত্ত্বসমূহের সত্যতা বিজ্ঞানপ্রমাণপ্রয়োগে পুনঃ প্রমাণিত কবিয়াই লোকেব মনে ধর্মবিশ্বাস দৃঢ়ীভূত কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন। মুখর্জনমনোহাবী পুবাণসমূহের রূপকো-পাখ্যানাদি এবং মানসকল্পিত ভূগোলাদিব উপবেই যে হিন্দুধর্মের শ্রুতিস্মৃতি দণ্ডায়মান নহে, ইহা প্রমাণিত হওয়াতেই হিন্দুধর্ম সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

বিবেকানন্দপ্রমুখ আচার্য্যেবা ইহাই দেখাইয়াছেন: যে, পুবাণাদি সামান্ত-গ্রন্থনিবদ্ধ অসাধু ভাগের সহিত বিজ্ঞানপ্রমাণের সামঞ্জস্য ন: থাকিলেও বেদান্তবেদ্য অদ্বৈত তত্ত্ববদ্ব্যক্তিত্তি উহাদাবা অধিকতর অচল অটলভাবে সংস্থাপিত হইতেছে! উহাব সহিত হিন্দুধর্মের সার অংশেব আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য হইয়া যাইবে।

পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহ এবং উহাদের অঙ্কবর্ণে এদেশেও কেহ কেহ আবার উক্ত বিজ্ঞানপ্রমাণকে এতদূর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনে করিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞানাবিকৃত সর্বোচ্চ তত্ত্বগুলি যে দিন দিন নানাত্বপূর্ণ জগৎ একত্ব হইতেই প্রকৃত প্রমাণিত কবিতো দ্রুতপদসঙ্কায়ে ধাবমান, ইহা এককালে ভুলিয়া যান! একজুই পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদেবা কেহ বা সেস্বর এবং কেহ বা নিখীলবাদী দেরিতে পাওয়া যায়। পরিণামবাদপ্রণালীব (Evolution) পশ্চাতে কেহ বা পূর্ণ অধৈর্য গন্ত নশনে মুগ্ধ হইয়া থাকেন এবং কেহ বা ঐ প্রণালীবই পশ্চাতে ইচ্ছাবুদ্ধাদিসম্পন্ন (।) লীশাময় (।) জড়ের অস্তিত্ব অঙ্ক-ভল করিয়া জড়গুহি হইয়া পড়েন।

ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার বিজ্ঞান-প্রমাণ বাদী ছিলেন বটে কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার ঐ প্রকার গোঁড়ানী ছিল না! তিনি স্বীকার কবিতেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানপ্রমাণেবও অনেক পরিবর্তন হইবে।

পুৰাতন মত ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলে উহা পবিত্যাগ করিয়া নূতন মত গ্রহণ কবিতো ডাক্তার সবকাবের কোন দ্বিধা হইত না। কিন্তু যতদিন বৈজ্ঞানিক মুক্তিব দ্বাবা কোনও মত ভুল বলিয়া প্রমাণিত না হইত, তত দিন ডাক্তার সবকাব সেই মত কখনই পবিত্যাগ কবিতেন না।

শ্রী 'ম' লিপিত 'বামরুক্ষকথামৃত' পাঠ কাবলে জানা যায় যে, এইজন্ত স্বামী বিবেকানন্দেব সহিত তাঁহার কখন কখন মতভেদ হইত। উহাতে এক স্থলে দেখা যায়, কোন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ অবতারতত্ত্বেব বিষয় নিয়-লিখিতভাবে ডাক্তার সরকারকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, ডাবউইনেব (Darwin) ক্রমবিকাশবাদ(Theory of Evolution) স্বীকার করিয়া লইয়া অনায়াসে আমরা অসম্মান করিতে পারি যে, মনুষ্য ক্রমশঃ উন্নতি-সোপানে আবোহণ করিতে কবিতো এত উন্নত হইবে যে, আমরা নরচক্ষে তাঁহাকে আর দেখিব হইতে বিভিন্ন কবিতো পারিব না। কিন্তু ডাক্তার সরকার, প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিকে কল্পনাব সহায়ে অতদূর পরিবর্তিত করিয়া বিশ্বাস কবিতো অস্বীকৃত হন।

ডাক্তার সরকার যে ওহুই বিজ্ঞানপ্রমাণ মানিয়া চলিতেন, এ কথা বলিলেও ঠিক সত্য কথা বলা হয় না। কারণ, কেহ কেবল বিজ্ঞানপ্রমাণসহায়ে নিজ ধর্মমতাত্মক সংস্থাপনের চেষ্টা করিলে হৃদয়ে প্রকৃতির গ্রাম নিরীহ-বাদী না হইতেও পারেন, কিন্তু সাধনসহায়ে বিজ্ঞানপ্রমাণিত গভীর বাস্তবে

বিচরণ করিতে না শিখিলে কখনই তিনি অজ্ঞেয়তাবাদের ( Agnosticism ) হস্ত হইতে পুরিত্রাণ পাইবেন না ।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সবকায় একদিকে যেমন বিজ্ঞানাবিক্ত তত্বসমূহে আস্থাবান ছিলেন, অল্পদিকে আবার তাঁহার ঈশ্ববেব প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগে সত্যনির্বাক্তন কবিত্তে যাইয়া তাঁহার জন্ম শুদ্ধ না হইয়া নবং তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা, সরলতা ও ঈশ্বববিশ্বাস শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রী-‘ম’ কথিত “রামকৃষ্ণকথামৃত” পাঠ করিলে জানা যায়, যোগবিভূতিসম্পন্ন শ্রীমৎ রামকৃষ্ণপবনহংসদেব ডাক্তার সবকাবের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ঐ কথা বিশেষরূপে বলিয়া গিয়াছেন। ঐ পুস্তক হইতে কয়েক লাইন নিম্নে উদ্ধৃত না কবিয়া থাকিতে পাবিলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বব যে অবতাব হ’তে পারেন, এ কথা যে ঔব সাযেঙ্গে নাই। তবে কেমন কবে বিশ্বাস হয় ?

\* \* \* \* \*

“সরল না হলে ঈশ্ববে চট্ কবে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বব বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেকদূব। বিষয়বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানাবকমে অহঙ্কার এসে পড়ে;—পাণ্ডিত্যেব অহঙ্কার, ধনেব অহঙ্কার, মানেব অহঙ্কার, ঐই সব। ( ভক্তদের প্রতি ) ইনি ( ডাক্তার ) কিন্তু সবল।

গীতার প্রতি ডাক্তার সবকাবের যথেষ্ট অনুবাগ ছিল। গত দুইবৎসর বৈকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কবিত্তে গিয়া প্রায়শঃ তাঁহাকে গীতাপাঠে নিমুক্ত দেখিয়াছি। বিজ্ঞানসভাব বাৎসবিকবক্তৃতাৰ কতিপয়স্থলে তিনি ঈশ্ববেব সৃষ্টিনৈপুণ্য অতি ভক্তিভাবে আলোচনা কবিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানপ্রমাণের প্রতি আস্থাবশতঃ হিন্দুধর্মেব অসাংস্কৃত্যসমূহ তিনি পবিত্রাণ কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনেব সকলকথা বিচার করিয়া দেখিলে তিনি যে একজন আন্তরিকপ্রভাসম্পন্ন হিন্দু ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। বিজ্ঞান-প্রমাণ তাঁহার অন্তর্নিহিত হিন্দুতাবকে তিলমাত্রও ধ্বংস করিতে পারে নাই।

ডাক্তার সবকাবের জীবনেব শেষ ঘটনাতে তাঁহার স্বদেশীয়দিগেব প্রতি আন্তরিক ভালবাসা এবং ঈশ্ববেব প্রতি অলস্ত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। মৃত্যুেব অব্যবহিত পূর্বে যখন তাঁহার কথা বলিবার শক্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখন তিনি কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন,

এইভাবে ইজিতে জানাইলেন। একটা পেন্সিল ও একখানি কাগজ তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি অতিদ্রুতভাবে কয়েকটি কথা লিখিতে লাগিলেন। কয়েকটা কথা লিখিতে লিখিতেই তাঁহার জীবন ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি যে কয়েকটা কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই—

হে আমার মঙ্গলেক্ষুণ, বিদায়। সৃষ্ট-কর্তাকে কোন লোষ দিও না। তিনি যেক্রপ ইচ্ছা কবিযাছেন, ঠিক যথার্থ সেইক্রপই ঘটবে।”

এই ঘটনায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সংসারের সকল ভোগ পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের মত ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র ভয় বা সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয় নাই এবং কোন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইবে, সে কথাও তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

কর্মবীরাগ্ৰণি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এইরূপে বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রভাত সময়ে একাত্তর বৎসর বয়সে পবনোক গমন করিলেন। সিদ্ধুতে বিন্দু মিলিল ; বিদেব রূপনাশে যে জল, সেই জলই রহিল।

## বঙ্গে অকালমৃত্যু ।

মহামারী ( প্লেগ ) ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ ।

( ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ এম. বি )

চিকিৎসা শাস্ত্রের অল্পমত অনুসারে বোগনির্ণয়ের অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত মারীভয় উৎপাদক বিভিন্ন সংক্রামক বোগ এক মহামারী নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন আয়ুর্বেদে জনপদদ্বংসন বা মহামারীর কথাই শুনিতে পাই, মহামারী উৎপাদক ব্যাধি সকলের বিশেষ বর্ণনা দেখা যায় না। মহাবি চরকের জনপদদ্বংসন যদিও আধুনিক ম্যাসেরিয়া বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আছে, কিন্তু সূত্রভেদে মহামারী, কোন সংক্রামক ব্যাধিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিপিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন কালে ইউরোপখণ্ডে, জনপদদ্বংসকর সকল সংক্রামক রোগের সাধারণ নাম মহামারী বা প্লেগ ( Plague ) ছিল। ঐতিহাসিক কালে ইউরোপের মধ্য-যুগে যে সংক্রামক ব্যাধি সহস্র বৎসর ধরিয়া মৃত্যুশ্রোত রক্ত করিয়াছিল, কেবল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যকালে আড়াই কোটি লোকের অকালমৃত্যু

সংঘটন করিয়া মহাদেবেকে জনশূন্য করিয়াছিল। মহামারী বা প্লেগ ( Plague ) নামে তিনিই বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন। চরকসুশ্রুতাди আয়ুর্বেদীয় বা অপর কোন গ্রন্থে মহামারী বোগ সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতে এই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির বর্তমানতা বিষয়ে একারণ সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু দুইসহস্র বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ইউরোপ ও আসি-  
য়াব বিভিন্ন অংশে মহামারী ব্যাধি যে সুপরিচিত, তা'র যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

খৃষ্ট জন্মেব দুইশত বৎসর পূর্বে, মহামারী, মিসর, সিরিয়া ও সিন্ধিকট-  
বর্তী দেশসমূহে প্রাদুর্ভূত হইয়া মারীভয় উৎপন্ন করিয়াছিল, যখন চিকিৎসক-  
দিগের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। পববর্তী কালে ইহাব উপদ্রবের কাহিনী  
লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, ইহাব বিষদন্ত ভগ্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।  
খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিসর দেশ হইতে আবিস্কৃত কবিয়া মহামারী তাৎকালিক  
সমগ্র বোমশাস্রাজ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহাবই নাম—জাষ্টিনিয়ান মহা-  
মারী—ইহা সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে উদ্ভূত হইয়া অর্দ্ধশতাব্দী ধাবৎ  
বোমশাস্রাজ্যে অকালমৃত্যুর প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত কবিয়া, অসংখ্য জনপদ  
মরুভূমিতে পরিণত কবিয়াছিল। মশা ইউরোপের বস্তুর বাহিনী কষ্টক  
বোমবাজা ধ্বংস হইলে, সভ্যতা ও জ্ঞানালোকের তিবোভাবের সহিত সহস্রবর্ষ-  
ব্যাপী অজ্ঞানান্ধকার ইউরোপ আচ্ছন্ন করে। এই সময়ে দীর্ঘকালমুক্ত, বিদ্রোহ,  
অবাক্কতা, দুর্ভিক্ষ ও পাশব অত্যাচাবে যেকোন প্রজাকুল ইতস্ততঃ বিতাড়িত  
ও নিশ্চেষ্ট হইয়াছিল, মারীভয়ও সেইরূপ নানামূর্তি ধাবণ কবিয়া অকালমৃত্যুর  
আর্জনাতে দিগ্দিগন্ত আকুলিত কবিয়াছিল।

কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে মহামারী ইউরোপে আবির্ভূত  
হয়, তাহার ন্যায় সমগ্রাণী মারীভয় ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। তাৎকালিক  
জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—“কেহ কেহ লোকালয় হইতে পলাইয়া বিজন  
ভাবিধা অবশ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছিল, বেহবা অর্ণবখানে আবোহণ করিয়া  
ভীষ হইতে বহুদূর সমুদ্রের উপর বাস'করিতে লাগিল। কিন্তু যে দেবযোনি  
বোগবীজ ছড়াইতেছিলেন, তা'হার একপদ জলে, অপরটি স্থলে। একপ নিবিড়  
জঙ্গল ছিল না, যা'হাব মধ্যে মহামারী পদক্ষেপ না কবিয়াছেন ; তা'হার তীক্ষ্ণ  
দৃষ্টি অতিক্রম কবিয়াছে, একপ নিভৃত স্থান দেখা যায় নাই। পলায়ন করিয়া  
কিছুপে বাচিবে ২ মহামারীই হস্ত সর্বত্র বিস্তৃত। বাবল্যয় কেবল শবধার ও  
শবাস্থানবস্ত্র প্রভৃৎ—তা'হাও কিছুদিন মাত্র চলিয়াছিল। অপরাধমোচনের

জ্ঞাত কে বা পুরোহিতের নিকট স্বকীয় পাপ স্বীকার করিবে ? ধন্যমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত, কিন্তু না আছে পুরোহিত, না আছে অনুচরপী । সকলেই একত্রে শ্মশানভূমে শায়িত । মন্দীবরক্ষক ও চিকিৎসক একই গভীর ও বিস্তৃত কবরে নিহিত ; উইলকানক, ঠাহার উত্তবাধিকারী ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকগণ একই শকট হইতে নিষ্কিপ্ত হইয়া একই গহবরে সমাধিস্থ । গৃহের অগ্নি নির্দীপিত; যেন তাহা দাহিকাশক্তিপরিশূণ হইয়াছে । নাবিক ও খালাসিহীন জাহাজ সূর্যালোকে কেবল শূণ্যবক্ষ প্রসারণ করিয়াছিল । গৃহদ্বার উন্মুক্ত, ভাণ্ডার অরক্ষিত কিন্তু চৌর্য্যভয় নাই । সকল প্রকার হুস্তিয়া অন্তর্হিত, কেবল মাত্র সর্বব্যাপী মহামারীর আর্জনাৎ শব্দ বহিয়াছিল ।”

এই মহামারীর সাধাবণ লক্ষণ কর্ণমূল, বাতমূল বা উকমূলের বিধী সকলের প্রদাহ ও বৃদ্ধি । এই কাণে ইহা ইংবাজী নাম বিউবো পেণ (Bubo plague) । কিন্তু অনেক সময়ে এই লক্ষণ পবিস্কুট হইবার পূর্বে ফুসফুসের প্রদাহ উপর এবং শোণিত ও স্নায়ুগুণল ব্যাধিবিধে বিকৃত হইয়া, রোগীর দেহ কালিমাবর্ণ ধারণ করে ও অল্পকালেই সে মৃত্যুশ্বাসে পতিত হয় । ঈদৃশ-লক্ষণাকান্ত ব্যাধি অত্যন্ত মারাত্মক এবং ইউরোপে ইহা এই প্রায়শো চতুর্দশ শতাব্দীতে, উল্লিখিত ভীষণ মৃত্যুকাণ্ড উপস্থিত হইয়া মারামারীকে “কালামডক” ( Black Death ) নামে আখ্যাত করিয়াছিল ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কেবল লণ্ডন নগরে, ১৬০৩, ১৬০৯, ১৬২৫, ১৬৩৬ ও ১৬৬৫ এই পাঁচবৎসরে, ষোল লক্ষ অধিবাসী মহামারীর আক্রমণে কবচশায়িত হয় । ১৬০৩ সালে মিসর দেশে ইহা দশলক্ষ লোকের অকালমৃত্যু সাধন করে । ১৬৫৬ সালে ইতালিবার্জো নেপলসের নিকটবর্তী স্থানসমূহ তিন লক্ষ, জেনোয়া নগরে ষাট সহস্র ও বোনে চতুর্দশ সহস্র কালকবলিত হয় । ১৬৭৯ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় ৭৬ ০০, ১৬৮১ সালে প্রেগ নগরে ৮৩০০০, ১৭০৪ সালে সুইডেনের প্রধান নগর ষ্টকহলমে ৪০০০০, ১৭২০ সালে ক্রাসের প্রধান বন্দর মারসেলিসে ৫০০০০, ১৭৭০ সালে হাঙ্গেরী, পোল ও প্রভৃতি প্রদেশে তিনলক্ষ এবং ১৭৭১ সালে কসভাজধানী মস্কো নগরের চতুর্বাংশ অধিবাসী শমনের আশ্রয়গ্রহণ করে । রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র কেহই অব্যাহতি পায় নাই । সমুদ্রজনপদ স্থানে পরিণত ; হস্তিশস্ত্রশালিনী দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্র, হবিজাবর্ণ ও দ্ব্যতুণে আচ্ছাদিত ; মহামারীর ঘোর তিমিরাবরণে ইউরোপের জাতীয় জীবন কালনিদ্রাগত হইয়াছিল ।



ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে, এদেশের কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে এই ব্যাধি সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য জাতিদিগের আগমনের পূর্বে এদেশে ইহার বর্তমানতাব প্রমাণাতাব। কেহ কেহ অনুমান করেন, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান সম্রাট্ দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের বুদ্ধি-বিকার ও অবিস্মৃৎকারিতার ফলে রাজ্যমধ্যে বিগ্রহ ও বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইলে এই মহামারী ব্যাধিই তুর্ভিক্ষেব পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ভারত ব্যাপিবা মারীভয় উপস্থিত কবে। এই তুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ের কথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ থাকিলেও ব্যাধি সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট নিদর্শন না থাকাতো মহামারী ব্যাধি যে ইহার কাবণ, সে বিষয়ে নিশ্চিত জানিবাব উপায় নাই। এইরূপ ঐ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন তৈমুরলঙ্গ অসংখ্য তাতাবসৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করেন, মহামারীও তৎসমভিব্যাহারে ভাবতে পদার্পণ করিয়া মৃত্যুশ্রোত শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমরা এই সংক্রামক ব্যাধির প্রথম প্রামাণিক উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৬৮৪ সালে তাতাবলিক বাণিজ্যপ্রধান সুবাট নগর, মহামারী বোগে আক্রান্ত হইয়া, ছয় বৎসর ধরিয়া প্রপীড়িত হইতে থাকে। এক এক দিনের মৃত্যুসংখ্যা তিন শতবেও অধিক হইয়াছিল। ইহার পাঁচ বৎসর পবে বোম্বাই সহরে মারীভয় প্রবেশ লাভ করে। সেই বৎসর আটশত ইংবাজ অধিবাসীর মধ্যে কেবল পঞ্চাশ জন রক্ষা পাইয়াছিল। ১৮১২ সালে গুজবাত ও কাটিহাব প্রদেশে মহামারী প্রাদুর্ভূত হইয়া দশবৎসর কাল একপ অকালমৃত্যু বৃদ্ধি করে যে, প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিবাসী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এই সময়ে গাডোয়াল ও কুমায়ুনে মহামারীর আবির্ভাব হয় এবং কেদার তীর্থ আক্রান্ত হওয়াতে তীর্থরক্ষক ব্রাহ্মণ ও বহু তীর্থযাত্রী বোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর ১৮৩৬ সালে মাঝবাবের বাণিজ্যস্থান পালি সহরে, ইহা আবির্ভূত হইয়া একপ বিস্তৃতি লাভ কবে যে, বাক্সপুতানাব নানা স্থানে প্রায় লক্ষাধিক লোকের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর যদিও গাডোয়াল ও কুমায়ুনের পার্শ্বাঞ্চলীয় প্রদেশে সময়ে সময়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইত, কিন্তু তাহা নির্দোষোন্মুখ বহিবৎ কখন বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

বহুকাল ভারতে ইহার তেজ মন্দীভূত থাকিলেও ১৮৯৬ সালে মহামারী নূতন বিক্রমে বোম্বাই সহর আক্রমণ করিয়াছে। ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে ইহা একপ প্রবলাকার ধাবণ করে যে, প্রতি সপ্তাহে সহস্রাধিক লোক ইহার

গ্রাসে জীবন বিপর্যয় দিয়াছিল। প্রথম বৎসব কেবল বোম্বাই প্রদেশে ইনি পঞ্চাশ সহস্র লোকের অকালমৃত্যু সাধন করেন। ক্রমে সমস্ত বোম্বাই প্রদেশ, গুজরাত, কচ্ছ, সিন্ধু ও পঞ্জাবের কতকাংশ, মাদ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমের স্থানবিশেষে মহামারীর দাবানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। কিন্তু এতাবৎকাল বঙ্গদেশে এই নরকুলাস্তক ব্যাধির বিষদৃষ্টি পতিত হয় নাই। ১৮৯৮ সালে রাজধানী কলিকাতা মহামারীর বিভিন্নকাময়ীমূর্ত্তি প্রথম দর্শন কবে। পূর্বতগাত্রে ক্ষীণকাষ শ্রোতস্বিনী যেরূপ বর্দ্ধিতপ্রবাহে দেশদেশান্তর প্রাবিত কবে, সেরূপ অলক্ষিত ভাবে মহামারী বঙ্গে প্রবেশ কবিশা ধীবে ধীবে দিন দিন কালহস্ত বিস্তার পূর্বক বঙ্গমুঠিতে বঙ্গভূমি নিম্নীড়িত করিতেছে। ইহার আবির্ভাবের প্রথম যুগে কত সন্দেহ, কত অনিশ্চয়তা; পূর্বপরিচিত সামান্য ব্যাধিভ্রমে কত আশ্বাসনাকো ছুর্বীর মহাবোগ উপেক্ষিত হইল কিন্তু কাল প্রতীক্ষা করিয়া নির্ণয় নিযতিবৎ মহামারী বঙ্গে মৃত্যুশ্রোত ক্রমশই বৃদ্ধি করিতেছে। ১৮৯৮ সালে বঙ্গদেশে ১৫৫ জনেব মহামারী বোগে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্বাস্থ্যবিবরণীতে প্রকাশ। ১৮৯৯ সালে কিছুদৈমিক তিনসহস্র, ১৯০০ সালে ৩৮৪১২, ১৯০১ সালে ৭৮৬২৯জন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ৪৬টি জেলার মধ্যে বিহার প্রদেশেব ৮টি জেলা মার এখন মহামারী আক্রান্ত। এই মহামারীর জলন্ত শিখা নির্বাপিত না হইলে দেশে বিস্তৃত হইয়া কিরূপ অকালমৃত্যুর চিতানল প্রজ্বলিত কবিলে, তাবিলেও হৃদয় অবসর হয়।

আমরা দেখিলাম, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত ও মহামারী, বঙ্গে কিরূপ অকালমৃত্যু উপস্থিত কবিয়াছে। ইহা ব্যতীত অতীসার, টাইফয়েড জ্বর, বম্বা প্রভৃতি অপব কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধির উৎপাদনে, প্রতিদিন কত বঙ্গগৃহের ভবিষ্যৎ আশা চিবদিনের জন্ত নির্বাপিত হইতেছে, তাহা কে সংখ্যা করে? বঙ্গের স্বাস্থ্যবিবরণীতে প্রকাশ প্রতীবৎসর ন্যূনাদিক পঞ্চাশ সহস্র মৃত্যুর কারণ অতীসার রোগ। যদিও এদেশে এখন রোগবিশেষে মৃত্যু-সংখ্যা নির্ধারণ অভ্যস্ত কঠিন কিন্তু অতীসার সম্বন্ধে উপরোক্ত সংখ্যা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না। রাজকীয় সেনা ও জেলবিভাগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ মনোযোগী এবং বিচক্ষণ চিকিৎসকের হস্তে রোগনির্ণয়ের ভার থাকতে এই দুই বিভাগের মৃত্যুবিবরণী প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮৯১ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত নয়বৎসরে সহস্র জীবিতের মধ্যে অতীসার বোগে ইউরোপীয় সেনার বাৎসরিক গড় মৃত্যুসংখ্যা ০.৮৭

দেশীয় সেনার ০.৫২ ও কাবাবানীদিগের মধ্যে ৮৯৯। কিন্তু বঙ্গ প্রজা-  
সাধাবণের ঐবোগে, ১৮২৫ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত পাঁচবৎসরের গড় মৃত্যু-  
হাব ০.৬৫ বলিয়া উল্লিখিত আছে। দৈনিকবিভাগের স্বাস্থ্য যেরূপ সত-  
কর্তাব সহিত রক্ষিত এবং ইহাদেব মধ্যে সংক্রামকবোগ সকল যেরূপ  
সুচিকিৎসিত ও সহজে নিবাবিত হইত, তাহাতে এইবাগে ইহাদেব মৃত্যু-  
সংখ্যা সাধাবণ প্রকার অপেক্ষা অনেক ভাল হইবাবই সম্ভাবনা। সুতরাং  
এ দেশে অতীসাব বোগ বাসবিক মৃত্যু, পক্ষাশ সতত না হইয়া  
লক্ষাধিক হইলেও অতিবিক্ত বিবেচনা কবিবাব কাবণ নাই।

অনেক বহুদর্শী চিকিৎসকেব মতে, টাইফয়েড জ্বব বঙ্গের স্থানে স্থানে,  
বিশেষতঃ জনপূর্ণ নগরে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যবিবরণীতে  
জ্বব বলিয়া যে সকল মৃত্যু উল্লিখিত হয়, এই সংক্রামক বোগ তাহার  
কতকাংশ পূর্ণ কবিয়া থাকে। আম্মুকৌদোক্ত কোন কোন সাংগ্ৰাহিক  
জ্বববোগেব লক্ষণেব সহিত ইহাব বিশেষ সাদৃশ্য আছে সুতরাং ইনি  
এতদ্রূপে নিতান্ত অপবিচিত বলিয়া বোধ হয় না।

টাইফয়েডেব জ্বাব যক্ষাবোগও বঙ্গের নগবাদিতে দিন দিন প্রবল  
হইতেছে। চবক ও সূক্ষ্মে এই বোগেব উৎপত্তি, লক্ষণ ও সংক্রামকতা  
যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মানব ইতিহাসেব প্রাচীনতম কালেও  
এই অসাধ্য বোগেব প্রবলতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। দেবশরীরও  
ইহাব প্রভাবে জীর্ণ হইয়াছে বলিয়া পৌৰাণিক আখ্যায়িকায উক্ত আছে।  
শান্তনন্দন কুকবাজ বিচিরণীয়া যক্ষাবোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত  
হইয়াছিলেন, মহাভারতে ইহা প্রসিদ্ধ। বোগনির্দীবণেব অভাব প্রযুক্ত  
বাকালার প্রজা সাধাবণেব ভিতর এই ব্যাধিব উপদ্রবেব বিবরণ জানা  
সুকঠিন। এদেশেব কাবাবানীদিগেব মধ্যে মোট মৃত্যুর দশমাংশেব অধিক  
যক্ষাবোগে সংঘটিত হইয়া থাকে। এবং কশিকাতা ও অপরাপর নগ-  
বেব স্বাস্থ্যবিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মোট মৃত্যুর শতকরা  
দশ হইতে পনের এই রোগজনিত। বসন্ত, ওগাউঠা, মহামারী প্রভৃতি  
সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ষড়িকায অকালমৃত্যু বৃদ্ধি করতঃ, ভয়াতুল লোকহুতি  
আকর্ষণ কবিয়া থাকে কিন্তু যক্ষা, কালকাল অগ্রাহ্য কবিয়া নীরবে মানব-  
চক্ষুর অন্তরালে ধ্বংসকার্য্য সম্পন্ন কবেন।

বঙ্গে অকালমৃত্যাব প্রলম্বপ্রবাহ কিরূপ দেশব্যাপ্ত, ইহার কল

বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ আশা কিরূপ অতনুনিমজ্জিত, পূনপূন প্রবন্ধে তাহা বিবৃত হইয়াছে। প্রতিবৎসর গড় বিংশতি লক্ষ লোক বঙ্গে জীবনীলা সংবরণ কবে; ন্যূনপক্ষে ইহাব অর্দ্ধাংশ, পূর্বোক্ত সংক্রামক বোগ সকলের আক্রমণে অকালমৃত্যু আশ্রয় কবিয়া থাকে। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিদগণের মতে উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে সংক্রামক ব্যাধি কতৃক এই নরকুলক্ষ্য নিবাবিত হইতে পারে; ইংলণ্ড ও ইউরোপের স্বাস্থ্য ইতিহাস তাহাব সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভীষণ অকালমৃত্যু নিবাবণের শক্তি কি বর্তমান বঙ্গে আছে? এই গুরুতব প্রশ্নের মীমাংসাব উপব এ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভব কবিত্তেছে।

## তিব্বতে তিনবৎসর।

পূর্বপ্রকাশিতের পব ]

[ প্রায়ী অখণ্ডানন্দ।

অস্ত্রচলচড়াবলম্বী ববিকিবণে চিবনৌহাবারত হিমালয় যে, হেমো-  
জ্জলরূপ ধারণ কবে, তাহা আমি এই পথেই প্রথম দর্শন কবিলাম।  
চির-শুভ্র-ভূবাবাচ্ছাদিত হিমালয়ের সেই তপ্তকাক্ষনিন্দ গোবান্ধমূর্ত্তি দর্শন  
কবিয়া আমি সবিষয়ে একান্ত বিমোহিতচিত্তে কেবল ভাবিতে লাগি-  
লাম যে, এই “চাম্পেষ গোবান্ধ মূর্ত্তি” কাহাব? সূর্যাস্তকালে হিমগিরি  
প্রকৃতই হেমগিবিকূপে প্রতীয়মান হইল। সেই অপরূপ দৃশ্যের তুলনা  
নাই! সেই অপার সৌন্দর্য্যবাবিব বর্ণনা কবা আমার সাধ্যাত্ত নহে!  
গিরিরাজ হিমালয়ের একান্ত বজ্রতময়, কপূরের জাঘ অতি শুভ্র এবং  
অপরূপ সূবর্ণের জায় অতি উজ্জ্বল! একাধারে দুই বিভিন্নমূর্ত্তি দর্শন করিয়া  
ভাবিলাম যে, এ কি হরগৌরীব মিলন! “চাম্পেষগৌরান্ধশরীবকাঠে, কপূর-  
গৌরান্ধশরীবকাঠ” একাধারে হরগৌরীর এই অপূর্ণ সম্মিলন এক  
হিমালয়েই প্রত্যক্ষ কবিলাম। সেই বিরট দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া  
ভাবিলাম যে, উমাগতপ্রাণ হিমালয় বুঝি বা অর্দ্ধনাবীশ্বর হবগৌরীর  
দিব্যমূর্ত্তি অহরহঃ ধ্যান কবিত্তে কবিত্তে তন্নয় ও তদাকারপ্রাপ্ত হইয়া  
জামাতৃসহ স্বীয় অলোকসামন্তা ছুতিহার বিবহ-ভূষণ চিরদিনের বত  
বিস্তৃত হইয়াছেন!

অগম্যতা গৌরীর নবনান্তিরাম রূপরাশি ও মনোমোহন দর্শন এবং

পার্বতীপদযবলভ, ভূতভাবন ভোলানাথের প্রলয়কালীন ভীষণ কদমুর্তি, একত্র এক হিমালয়েই প্রত্যক্ষ করিলাম। নব-নাবাষণ-সেবিত, মহর্ষিগণ-বন্দিত, পুণ্যসলিলা গঙ্গা, যমুনা ও মন্দাকিনীবিধৌত, বিখ-বিমোহন বদবিকাশ্রম, জীবমুক্ত ঋষি, মুনি ও সিদ্ধচারণগণনিষেবিত সুবম্য গিবিগহ্বর; দেব, দানব, যক্ষ, বক্ষ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণের প্রিয় নিকেতন, বিচিত্র বর্ণ ও গন্ধবিশিষ্ট বিবিধফলপুষ্পভাবানত রক্ষোসধি ও জীবনদায়িনী বিবিধ সোমবল্লী প্রভৃতিতে পূর্ণ বনস্পতি; নানাজাতীয় সুলবপক্ষবিশিষ্ট অসংখ্য বিহগকুণকণ্ঠবিনিঃসৃত মধুর কলববে নিনাদিত, কস্তুরী প্রভৃতি পবন বমণীয় মৃগকুলে সুশোভিত, বিস্তীর্ণ তপোবন, অসংখ্য নদ, নদী, হ্রদ, সর্বোবব, প্রস্রবণ; স্বভাবচ্যুতবনকুসুমামোদিতা বিমলা নির-বিণী, গন্দনকাননসদৃশ বিবিধলতা-বিতানে সমাচ্ছাদিত উপত্যকা, এই সকল দর্শন কবিষা বোধ হয় যেন যাবতীয় সুখ, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য্যের আকর হিমালয় অতুল রূপ ও ঐশ্বর্য্য-শালিনী স্নেহময়ী জননীৰ তায় অনন্ত জীবনবহেব আশ্রয়দাত্রী সর্বমঙ্গলা গৌরীকপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে চিরশান্তি বিতরণ কবিতেছেন! আবার অতি ভীষণ, প্রাণীমাত্রেবই অগম্য, মহাশ্মশানসদৃশ, অত্যাচ্চ চিব-তুয়াব-মণ্ডিত গির্নিশ্ব; অসংখ্যহিংস্রজন্তুসমাকুল সন্যোজীবনান্তকবিবিষ-বল্লীপূর্ণ নিবিড় অবগ্যানী, পাষাণভেদী, প্রচণ্ডবেগশালী, ভীষণগজ্জ্বল-কাবী, মহাত্রাসজনক, অসংখ্য জলপ্রপাত, বোর আবর্তময়ী বিপুল জলবাশি, অগণ্য দুর্গম গিবিসঙ্কট, এবং বিভীষিকাময় নবকঙ্কালপূর্ণ বিজ্ঞান গিরিকন্দবসমূহ দেখিলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কদ প্রলয়-কালীন তাণ্ডব নৃত্য কবিতে কবিতে গগনমণ্ডল ভেদ কবিষা অসংখ্য স্বযতুলিঙ্গরূপে জীবজগতের ত্রাসোৎপাদন কবিতেছেন।

হিমালয় দর্শন কবিষা চক্ষুগ্ৰাম্ ব্যক্তিমাত্রকেই বলিতে হইবে যে, মূর্ত্তিমান্ হবগৌরী এই বিবাট্ দেহ ধারণ করিষা দর্শকের হৃদয় যুগপৎ বিম্বয়, ভয় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ কবিতেছেন। একরূপ বিচিত্র ভাবেব একত্র সমাবেশ হিমালয় ভিন্ন আব কোথাও দেখি নাই। হিমালয় যেমন মনোবম, তেমনি ভীষণ। এমন পবম্পব বিবোধী ভাবসমষ্টির একত্র সমাবেশ হবগৌরীৰ হিমালয়রূপ বিবাট্ দেহেই দৃষ্ট হয়! “সদা শিবানাং পরিভূষণায়ে, সদা শিবানাং পবিভূষণায়, শিবান্ধিতায়ে চ শিবা-

বিভাষ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।” শুভাশুভভাবসম্মিত হরপার্বতীর এই অভেলায়ক অপূৰ্ণ মূৰ্ত্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম।

যাহা হউক, আব বর্ণনাব প্রয়োজন নাই। আশা কবি, পাঠকবর্গের মধ্যে গাঁহাবা কখনও হিমালয় দেখেন নাই, তাঁহারা জীবনে অন্ততঃ একবারও উহা দর্শন কবিয়া জীবন সার্থক কবিবেন। এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট হইতে গতবার যে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ কবিয়াছিলাম, আসন্ন কল্লনাগহায়ে আমাব সহিত যমুনোত্রির সেই পূৰ্ব্ববর্তী গ্রামে।

উক্ত গ্রাম হইতে যমুনোত্রির পথ অধিকতর দুর্গম। পথিমধ্যে ভৈববঘাটী নামক একটি স্থান আছে। তথা হইতে কিয়দূর গিয়াই আমরা ভূজপত্র বৃক্ষের শাখাবলম্বনে অতিক্রমে যমুনোত্রিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটী অপ্রশস্ত, অত্যাচ্ছ বিশালতৃষাবমণ্ডিত গিৰিশৃঙ্গ পৰিসেপ্ত। যমুনা সেই গিরিশৃঙ্গ হইতে মতানু কব কব ববে নিপতিত হইয়া প্রবাহরূপে উদ্যম নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে যেন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা পূর্ণ কবিবাব মানসে অতি বাগ্ৰতাৰ সহিত সোঃসাঃহে শ্রীমদাবনাভিমুখে ধাবিতা হইয়াছেন। যমুনোত্রিতে একটি বৃহদায়তনের মন্দিরে শ্রীযমুনাৰ বোপা ও পাষণময়ী মূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। যমুনোত্রির উক্ত প্রস্রবণ ও উক্ত গহ্বরৰ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিমালয়ের অনেক স্থানেই আমি অবগাহনোপযোগী গন্ধকমিশ্রিত তপ্তকুণ্ড দেখিয়াছি কিন্তু একপ উষ্ণ প্রস্রবণ আব দেখি নাই। শুনিয়াছি যে, কাঙ্গডাব উপবে মণিকবণে এইরূপ একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

যমুনোত্রির তপ্ত কুণ্ডে আমবা ডাল, ভাত, কটী সিদ্ধ করিয়া খাইলাম। পাহাড়ী পাণ্ডাবা সেই দিনই আমানিগকে তথায় বাখিয়া চলিয়া গেল। আমরা তিন জনে এক বাত্রি তথায় সেই উষ্ণ গহ্বরটাতে বাস কবিলাম। গহ্বরটাৰ মধ্যে বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল। তাহার পরদিন প্রাতে আমবা যমুনোত্রি হইতে সেই পাণ্ডাবের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উত্তরাংশপ্রমণকালে এইরূপে আমি প্রায় ৩৭ দিবস যাবৎ উক্ত দুইজন সাদুব সহিত ভ্রমণ কবিয়াছিলাম। তাহার পর যমুনোত্রি হইতে প্রত্যাগমন কবিয়া তাহাবা উপরিকোটের পথে গঙ্গোত্রি যাত্রা কবিলেন আব আমি পুনরাব জামদগ্ন্যজীর মকাম হইয়া গঙ্গোত্রিৰ পথে ভাগীরথীতীরবর্তী উত্তরকাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাম-

দয়াকর মকাম হইতে উত্তরকাশী দুই দিনে পহুছিয়াছিলাম। পথে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর উপদ্রব;—এমন কি, পাহাড়ীরাও একাকী সেই পথে ভ্রমণ করিতে সাহসী হয় না। পশ্চিমধ্যে একখানি মাত্র গ্রাম দেখিতে পাইলাম। সেই গ্রামের লোক চোর ডাকাতের ভয় কাহাকে বলে, তাহা আদৌ জানে না। স্তবতঃ তালা চাবীর ব্যবহারও সেখানে নাই। দুই দিবস বাবু আমাকে নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে আমি পথে কোন হিংস্রক জন্তুর সম্মুখে পতিত হই নাই।

বালককালে কথামালায় দুই পঞ্চিক ও ভালুকের গল্পে ঘাণ পড়িয়াছিলাম, তাহা যে, একান্ত অমূলক নহে, তাহা আমি পাহাড়ীদের কথায় বুঝিতে পারিলাম। নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর সম্মুখে পড়িলে পাহাড়ীরা বলে, চোকে কাপড় বাধিয়া উপড় হইয়া মড়ার মত নিষ্পন্দভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে আর কোন ভয় নাই। ভয়ঙ্কর স্বভাব,—প্রথম আক্রমণেই থাৰা মাঝিয়া মুখ চোঁক ছিঁড়িয়া ফেলে। সেই জন্ত সাবধান হইয়া মুখগানি বাঁচাইতে পাবিলে আর তাহার দ্বারা বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাহা হউক, ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে বাঁচিবার উপায় আমি এইরূপে জানিয়া রাখিলাম। জামদয়াকর মকাম হইতে এক জন পাহাড়ী পথপ্রদর্শক হইয়া আমার সহিত একদিনের পথ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

উত্তরকাশীকে পাহাড়ীরা ববহাট বলে। এইখানে ভাগীরথী উত্তর-কাহিনী হইয়া প্রবাহিতা হইতেছেন এবং ৮ কান্ধামের ৮ বিশ্বনাথ ও অগ্গা দেবদেবীর মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত আছে। অভুলসমৃদ্ধিশালী বারাগসী ক্ষেত্রই যেন এই বিজন পার্বত্যপ্রদেশে আসিয়া তপস্যায় মগ্ন হইয়া আছেন। উত্তরকাশী হইতে কিছু দূর গিয়া আমার সহিত একটা খাষা-জাতীয় ত্রিপর্যায় ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে একটা বক্ষুয়ায় বসিয়া চা পান করিতে দেখিলাম। তাহাকে তিব্বতে যাইবার স্রবণ পথ কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে আমাকে ঘোষী মঠ হইতে নীতি খাটা বা পাস দিয়া তিব্বতে গেলে কৈলাস ও মানস সর্বোবর খুব নিকট হইবে বলিল। গদোদ্রি হইতেও তিব্বতে যাইবার একটা পথ আছে, তাহাও “নিশিং ঘাট বা পাস” বৈ। সে আমাকে এই পথে তিব্বতে

বাইতে নিবেদন করিয়া ৮বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া নীতির পথে বাইতে পরামর্শ লিল। উত্তরকান্দী হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিনেই আমি প্রায় ১৮।১৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ভট্টারী নামক একটি গ্রামে পহঁ-  
ছিলাম। পশ্চিমধ্যে কয়েকটা মহারাজীয় বাত্রীদের নিকট আমি ভিক্ষা  
করিয়াছিলাম। কেবল মধ্যাহ্নে আহার্যাদি করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া-  
ছিলাম, তাহার পর সমস্ত দিনই চলিয়াছি।

সন্ধ্যার প্রাকালে ভট্টারী গ্রামের প্রায় এক মাইল নীচে পহঁছিয়া  
দেখিলাম যে, জনৈক সন্ন্যাসী গৈবিক বসনে সর্সান্ন আশ্রুত করিয়া পশ্চিমধ্যে  
পড়িয়া আছেন। সেই সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও হইতেছিল। নিকটে গ্রাম  
ধাকিতে সেই বিজন আবণ্যপথে পড়িয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়  
সন্ন্যাসীর মুখে শুনিলাম যে, তিনি পশ্চিমধ্যে পীড়িত হইয়া তাঁহার বোচকা  
বুঁচকী লইয়া চলিতে অক্ষম হইয়াছেন সুতরাং উপাযান্তর না দেখিয়া তথায়  
সেই অবস্থায় পড়িয়া আছেন। আমি তাঁহাকে সেই ভীষণ লোকালয়শূন্য  
স্থানে দেখিয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিন্তু কি  
উপায়ে তাঁহাকে তথা হইতে ভট্টারী গ্রামে লইয়া যাই? তাঁহার বোচকাটা  
প্রায় একটা মাহুষের বোকা। আর কেহ যদি বোচকাটা লয়, তবে আমি  
তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারি। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল চিন্তা  
করিতেছি, এমন সময়ে দৈবদৃষ্টিতে সেইখানে একজন ব্রহ্মচারী বাত্রী আসিয়া  
উপস্থিত হইলেন। তিনি ভট্টারী অভিমুখে অতি দ্রুতপদে বাইতেছিলেন।  
আমি তাঁহাকে সেই সন্ন্যাসীর হুবহু রূপে কক্ষা বলিলে তিনি আর দ্বিধা নী  
করিয়া তাঁহার বোচকাটা লইয়া অগ্রেই ভট্টারী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।  
তাঁহার পব আমি ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীকে তুলিয়া খাড়া করিলাম।

যখন তিনি খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখি যে, সেই দীর্ঘকায় পুরুষ উচ্চে  
আবাহি বিগ্ণ! আমার লম্বা লাঠী গছটা তাঁহাকে দিয়া আমি তাঁহার  
কোমর ধরিয়া অতি অল্প দূর যাইতে না যাইতেই তিনি ঘুরিয়া পড়িয়া  
গেলেন। আব একটু হইলে আমরা দুইজনেই সেই উচ্চ পার্বত্য পথ হইতে  
গভীর পর্যন্তগর্ভে নিপতিত হইয়া সদাই ৮ গজালাত করিতাম। সেই  
স্থানটা পক্ষাগর্ভ হইতে খাড়াই উচ্চে আনন্দ ৫৫০০ হাত হইবে। সন্ন্যাসী  
মহাশয় ভো কাপিতে কাপিতে একেবারে চিৎ হইয়া গুইয়া পড়িলেন এবং  
বলিলেন যে, আব এত পাও চলিতে তিনি অক্ষম। তাঁহাকে পৌঁছে করিয়া



লইয়া না গেলে আর তাঁহাব গ্রামে যাওয়া হয় না । স্মৃতবাং আমি তৎক্ষণাৎ ভটাঘীতে গিয়া সেই গ্রামের অধিবাসীমাত্রকেই সেই বিপন্ন সাধুকে গ্রামে আনিবার জন্ত অতিশয় কাতবভাবে মিনতি কবিতো লাগিলাম । কিন্তু সেই রাত্রিতে তথায় কেহই যাইতে সম্মত হইল না । অনেক ক্ষণ সাধাসাধীর পর বীজু নামক একটি পাহাড়ী তাঁহাকে আনিবার জন্ত সম্মত হইয়া আমার সহিত আসিল । সে সন্ন্যাসীকে বহিয়া আনিবার জন্ত আমার নিকট চাবি আনা পয়সা মাত্র চাহিল । আমিও যেক্ষেপে পাবি সমুদ্রে কবির বলিয়া তাহাকে লইয়া চলিলাম ।

বীজুকে খালি পীঠে যাইতে দেখিয়া আমি তাহাকে একটি কেণ্ডী (কবাণ্ডী, এক প্রকার পাহাড়ী বুড়ী, ইহাতেই পাহাড়ীবা মানুষ ও বোকা বহে) লইতে বলিলাম, কিন্তু সে খালি পীঠেই তাঁহাকে আনিতে পাবিবে বলিয়া আমার কথাটা বড় গ্রাহ্য কবিল না । তাহাব পর আমবা সেইখানে পঁহছিয়া দেখি যে, সেই দীর্ঘকায় পুরুষ লম্বা হইয়া পশ্চিমধো শুইয়া আছেন । বীজু তাঁহাব দুইটা হাত ধরিয়া যেমন পীঠেব উপব তুলিয়াছে, অমনি তাঁহাব পা দুইটা মাটিতে লুটাইতে লাগিল । আমি দেখিলাম যে, এক্ষেপে কিছু দূর তাঁহাকে লইয়া গেলেই আব বেশীক্ষণ নাচিয়া থাকিতে হইবে না । নিতান্ত অন্তর্য হইলেও না হয় চেষ্টা করা যাইত । তখন বীজুও দেখিল যে, একটি কেণ্ডীব নিতান্ত আবশ্যক, স্মৃতবাং আমবা সাধুকে আবার পশ্চিমধো বাধিয়া পুনরায় ভটাঘীতে কেণ্ডীব চেষ্টায় আসিলাম । সেখানে গিয়া দেখি যে, কয়েকজন খাত্তী টেনের কানাতাবা ভবিয়া গন্ধেত্রিব জল কেণ্ডীতে কবিয়া আনিয়াছে । আমবা কিছুক্ষণেব জন্ত তাহাদেব নিকট একটি কেণ্ডী চাহিলাম । কিন্তু কিছুতেই তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস কবিয়া তাহা দিতে পাবিল না । তীর্থস্থানে প্রায়ই বাহ্মিতে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস কবিতো চাহে না । স্মৃতবাং অবশেষে আমার গাধেব লুইখানি বন্ধক বাধ্য তাগাবা আমাদিগকে একটি কেণ্ডী দিল । এইরূপে অনেক খানি বাহ্মি হইয়া গেল । এই বাব আমবা সাধুকে সেই পথ হইতে গ্রামে লইয়া আসিলাম । জ্যোৎস্নাব বাহ্মি ছিল বলিয়া পারত্যা পথে কয়েকবার বাতায়ত কবিতো আমাদেব তেমন অসুবিধা হয় নাই ।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৯শে ভাদ্র বেকুনে শ্রীবামকৃষ্ণোৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে শতাধিক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র দিবস ধরিয়া শ্রীবামকৃষ্ণদেবের উপদেশ পাঠ, আলোচনা, ভগবদ্গায়ত্রীকীর্তনাদি করেন। প্রায় ২০০ কাঙ্গালীকে পয়সা, চাল ও প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীবামকৃষ্ণদেবের উপদেশ জ্ঞানিবার জন্য সৰ্বসাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা গিয়াছিল।

---

বিগত জন্মাষ্টমীর দিবস অত্যন্ত বর্ষেব গায় এবাবেও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীবামকৃষ্ণোৎসব আনন্দের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

---

বিগত ১লা আশ্বিন শনিবার কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক আহুত হইয়া গ্রামী সচিদানন্দ সমিতির সভাগণের সহিত প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধর্ম-বিষয়ক কথোপকথন করেন।

---

• মাণিকতলাবাঞ্ছাব হবিসভার সপ্তম সাপ্তাহিক মহোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩০শে ভাদ্র হইতে আবস্ত হইয়া উৎসব চলিতেছে। ১৭ই আশ্বিন উৎসব শেষ হইবে। এই সভায় বিগত ১লা আশ্বিন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী “ব্যবসা ও অক্ষয় ধনলাভ”, ২রা আশ্বিন গ্রামী শুক্লানন্দ “নির্ভয়” ও ৪ঠা আশ্বিন শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যাবত্ত মহাশয় “সুগম সাধন” সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৫ই আশ্বিন হইতে ১০ই আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ কথক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কথকতা করেন। ১৬ই আশ্বিন কাঙ্গালীতোজন ও ১৭ই আশ্বিন নগবসংকীর্তনাতে উৎসব সমাপ্ত হইবে।

---

বিগত ২রা আশ্বিন সাহিত্যসভার পঞ্চম বাৎসবিক “কম মাসিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব এম, এ মহাশয় “কর্ম হল” বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

---

বিগত ৩১শে ভাদ্র কলিকাতা টাউনহলে “শিবাকী উৎসব” অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী বীরপূজা করিতে গীত গীত শিলিতেছে দেখিয়া আশা হয়। আশা করি, এ সকল উৎসব সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র পর্যাবসিত না হইয়া আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উহাদের প্রভাব বিস্তার কবিবে।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহ সাবিত্রী, পাণ্ডুবাস, The Angel of Misfortune ও The Web of Indian Life নামক পুস্তকচতুষ্টয়ের প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। সমযান্তরে ইহাদের সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ফটো ।

( কোন বিখ্যাত ইউরোপীয় ফার্ম হইতে প্রস্তুত )

- নং ১। বসা ক্যাবিনেট সাইজ—সিলভার—৯/০।
- ” ২। দাঁড়ান ঐ ঐ ঐ ৯/০।
- ” ৩। বসা কার্ড ঐ ঐ ১/০।
- ” ৪। ঐ ক্যাবিনেট ঐ ব্রোমাইড ৮/০।
- ” ৫। দাঁড়ান ঐ ঐ ঐ ৮/০।
- ” ৬। বসা কার্ড ঐ ঐ ১/০।
- ” ৭। গ্রুপ (স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার আমেরিকা হইতে আসিয়া, কাশ্মীরে শীত মহাশয়ের বাগানে কিছু দিন থাকেন। ঐ স্থানে স্বামীজি, তাঁহার কয়েকটা সন্ন্যাসী গুরু ভাই এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিষ্যের এক সঙ্গে ফটো তোলা হয়।) — ক্যাবিনেট সাইজ সিলভার ৯/০।
- ” ৮। ঐ ঐ ব্রোমাইড ৮/০।
- ” ৯। স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন প্রকারের ২৭ খানি ক্ষুদ্র ফটো। ইহাতে তিনটি গ্রুপ আছে। ক্যাবিনেট সাইজ সিলভার (ক) ভারতীয় গ্রুপ—৯/০ (খ) বিলাতী গ্রুপ—৯/০ (গ) আমেরিকান গ্রুপ—৯/০।
- পোষ্টেজ ও প্যাকিং স্বতন্ত্র। ফটোর অর্ডার দিবার সময় উহাব নম্বর জানাইবেন।

ঠিকানা—কার্য্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন, বাগবাজার পোঃ, কলিকাতা।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।

ন তদন্তি বিনা যৎ স্যাম্যযা ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

অর্থ্য। হে অর্জুন যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদ্ব্যং (এব অস্মি) ময়া বিনা ভূতং যৎ স্যাত্তং চরাচরং ন অস্তি । ৩৯ ।

মূলানুবাদ। হে অর্জুন সকল ভূতের যাহা কিছু বীজ, তাহা আমিই হই। যাহাতে আমি নাই, এমন বস্তু জ্ঞাবর না জন্ম কিছাই হইতে পারেনা । ৩৯ ।

ভাষ্য। যচ্চাপীতি সর্বভূতানাং বীজং প্রবোহকারণং তদহমর্জুন প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাত্ৰ ন তদন্তি ভূতং চরাচরং চবমচরং বা ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবৎ ময়া অপকৃষ্টং পবিতাক্তং নিবাত্মক\* শূন্তং হি তৎ স্যাত্তং অতো মদাত্মকং সন্ন্যাসিত্যর্থঃ । ৩৯ ।

ভাষ্যানুবাদ। যচ্চাপি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যাহা কিছু সকল ভূতের “বীজ” অর্থাৎ প্রবোহকারণ, হে অর্জুন, আমিই তাহা হই। প্রকরণেব উপসংহার করিবার জন্য বিভূতির সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, চরাচর হউক বা অচরাচর হউক, এমন কোন ভূতই থাকিতে পারেনা, যাহা আমার সহিত সংস্কৃত নহে, যে বস্তুতে আমি নাই, আমি যাহা পবিতাক্ত করি, তাহাই শূন্ত অর্থাৎ নিবাত্মক (স্বত্বাং তাহা থাকিবে কি প্রকারে ?) এট কাৰণে সকল পদার্থই মদাত্মক অর্থাৎ আমিই সকল বস্তুব আত্মা । ৩৯ ।

নাস্তোহস্তি যম দিব্যানাং বিভূতীনাং পবস্তপ ।

এব তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতবিস্তরোময়া ॥ ৪০ ॥

অর্থ্য। হে পবস্তপ যম দিব্যানাং বিভূতীনাং অস্তোনাস্তি এব তু বিভূতে-বিস্তরোময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ । ৪০ ।

মূলানুবাদ। হে শকপীড়াদায়ক । আমার দিবা বিভূতিগণের তত্ত্ব নাই। এই মর্দীয় বিভূতির বিস্তার আমি সংকল্পিত বলিলাম । ৪০ ।

ভাষ্য। নাস্তোহস্তীতি। নাস্তোহস্তি যম দিব্যানাং বিভূতীনাং বিস্তারগণ্য পর-স্তপ। নহীষরস্ত সন্ন্যাসিনো দিব্যানাং বিভূতীনাং ইবজা শক্যা যন্তুং জাতুং বা কেনচিৎ, এষতু উদ্দেশতঃ একদেশেন প্রোক্তো বিভূতবিস্তরোময়া । ৪০ ।

ভাষ্যানুবাদ। নাস্তোহস্তি ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। হে পবস্তপ। আমার ১৫ই আশ্বিন, ১৩১১ ।] ৪ উদ্বোধন ।

দিব্য “বিভূতি” বিস্তরেব অন্ত নাই। সৰ্ব্বাত্মা ঈশ্বরেব দিব্য বিভূতি সম্-  
 হেব ইযন্তা কেহ বলিতে বা জানিতে পারে না। আমাব বিভূতির বিস্তর এই  
 আনি “উদ্দেশতঃ” অর্থাৎ একদেশতঃ বলিলাম ৷৪০।

যদ্ যদ্ বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

অর্থঃ । যৎ যৎ সত্ত্বং ( বস্ত ) বিভূতিমং শ্রীমং উজ্জিতং বা তত্ত্বং এব ত্বং  
 মম তেজোহংশসম্ভবং অবগচ্ছ ৷৪১।

মূলানুবাদ । যে যে বস্ত বিভূতিসম্পন্ন, সুন্দর ও উৎসাহপরিপূর্ণ, সেই  
 সেই বস্তুকেই তুমি আমাব তেজোময় অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া  
 জানিবে ৷৪১।

ভাষ্য । যদ্যদিতি । যদ্ যল্লোকে বিভূতিমদ্ বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্ত শ্রীমদ্  
 উজ্জিতং এব বা শ্রীলক্ষ্মীস্তয়া সহিতং উৎসাহোপেতং বা তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং  
 জানীহি মম ঈশ্ববস্যা তেজসঃ অংশ একদেশঃ সম্ভবো যস্য তং তেজোহংশসম্ভবং  
 ইত্যবগচ্ছ ত্বং ৷৪১।

ভাষ্যানুবাদ । যদাদ্ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ । লোকে গাথা গাহা “সত্ত্ব”  
 বস্ত “বিভূতিমং” বিভূতিযুক্ত “শ্রীমং” শ্রীশব্দের অর্থ লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীর সহিত  
 যুক্ত, বা “উজ্জিত” উৎসাহসমব্রিত, তাহাকে তাহাকেই তুমি আমাব “তেজোহংশ-  
 সম্ভব” বলিয়া জান, তেজোহংশ শব্দের অর্থ আমাব অর্থাৎ ঈশ্বরেব তেজের  
 একদেশ, তাহাই বাহাব উৎপত্তিহেতু, তাহাকেই তেজোহংশসম্ভব বলা  
 যায় ৷৪১।

অথবা বচনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং রুৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভাবতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু

একবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণা-

জ্ঞানসংবাদে বিভূতিযোগো

নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

।

অন্থয় । অথবা হে অর্জুন, তব এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিং ? অহং একাংশেন ইদং কৃৎস্নং জগৎ বিষ্টিভা স্থিতঃ ।৪২।

মূলান্তবাদ । অথবা হে অর্জুন, তোমার এই সকল বিশেষ কবিষা জানিয়া কি লাভ ? আমি নিজের একাংশ মাত্রের দ্বাৰা এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছি ।৪২।

ইতি ব্যাসদেব প্রণীত লক্ষণোক্তায় শ্রীমহাভাবত শাস্ত্রের ভীষ্মপর্বে

যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়া উপনিষৎসমূহ আছে,

যাহা ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র স্বরূপ,

যাহা শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদায়ুক্ত,

তদন্তরগত বিভূতিযোগনামক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ভাষ্য । অথবোতি । অথবা বহুনা এতেন এবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তব-  
র্জুন জ্ঞাদশেষেণ । অশেষতত্ত্বনির্মমর্থমুচ্যমানং শূণ্ণং বিষ্টিভা বিশেষেণ তত্ত্বনং  
কৃৎস্না ইদং কৃৎস্নং জগদেকাংশেন একাবয়বেন একপাদেন সৰ্ব ভূতস্বরূপেণ  
ইত্যোতং । তথা চ মন্তবণঃ ‘পাদোহস্ত বিশ্বাভূতানি’ ইতি স্মিতোহহমিতি ।৪২।

ইতি শ্রীমৎপৰমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দ ভগবৎপূজ্যপাদ

শিষ্যশ্রীমদাচার্য্যশ্রীশঙ্কর ভগবতঃ রচিত শ্রীভগবদ্গীতা-

ভাষ্যে বিভূতিযোগনাম দশমোঃ অধ্যায়ঃ ।১০।

ভাষ্যান্তবাদ । অথবা ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ । অথবা বল এই প্রকার অনেক  
বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে হে অর্জুন । তোমার কি ফল হইবে ? অশেষভাবে  
( সামান্তরূপে ) যাহা বলিতেছি, তাহা শুন । “একাংশ” একটীমাত্র  
অবয়ব অর্থাৎ নিজের একটী পাদ, যাহা সৰ্বভূতস্বরূপ, তাহা দ্বাৰা এই সমগ্র  
জগৎকে বিশেষরূপে স্তব্ধ করিয়া ( সপাংশে ব্যাপিয়া ) আমি অবস্থিত  
রহিয়াছি । বেদেব যন্ত্রাঙ্করেণ আছে ঐষ, “এই পৰমমুখের একটীমাত্র  
পাদ স্বরূপ এই ভূতনিচয়” ইত্যাদি ।৪২।

ইতি শ্রীমৎপৰমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ ভগবান্

গোবিন্দাচার্য্যেব শিষ্য শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর ভগবানের

কৃত শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যেব বিভূতিযোগ

নামক দশম অধ্যায়ঃ ।১০।

## অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পবনং গুহ্যমধ্যাস্ত্রসংজ্ঞিতম্ ।

যজ্ঞদ্বোক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতোমম ॥১।

অর্থঃ । ইয়া মদনুগ্রহায় যৎ পরমং গুহ্যং অধ্যাস্ত্রসংজ্ঞিতং বচঃ উক্তং তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ ৷১।

মুগ্ধানুবাদ । অৰ্জুন কহিলেন, তুমি আমাব প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পবন গোপনীয় আত্মবিষয়ক বাক্য বলিয়াছ, তাহা দ্বারা আমাব এই মোহ অপগত হইয়াছে ৷১।

ভাষ্য । ভগবতো বিদ্যুতয় উক্তা তত্র চ বিদ্যুত্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন হিত্তো জগৎ ইতি ভগবতাঃ তিহিতং শ্রুত্বা যজ্ঞগদাশ্লক্ষপনাদামৈশ্বৰ্যং তৎ সাক্ষাৎকর্তুমিচ্ছন্ ( অৰ্জুন উবাচ ) মদনুগ্রহায় মমানুগ্রহার্থং পবনং নির-  
তিশয়ং গুহ্যং গোপ্যং অধ্যাস্ত্রসংজ্ঞিতং আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যৎ যথোক্তং বচঃ বাক্যং তেন তে বচসা মোহোহয়ং বিগতোমমাং বিবেকবুদ্ধিবপগতে-  
ত্বার্থঃ ৷১।

ভাষ্যানুবাদ । ( পূর্ব অধ্যায়ে ) ভগবান্ আত্মবিভূতিসমূহেব পরিচয় দিয়া-  
ছেন ( ঐ পরিচয়দানপ্রসঙ্গে ) “আমি এই সমগ্র জগৎকে আমার একাংশ দ্বারা  
ব্যাপিয়া রহিয়াছি” এই প্রকার ভগবানের বর্ণিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগ-  
বানেব যে আদ্য ঐশ্বর্য জগদাত্মস্বরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জ্ঞান ( অৰ্জুন  
বলিতেছেন ) যে, আমাব অনুগ্রহার্থ যে “পবন” অতিশয়বর্ণিত ( অর্থাৎ সন্ধ্যো-  
ংকুট ) “গুহ্য” গোপ্য এবং “অধ্যাস্ত্রসংজ্ঞিত” আত্মা ও অনাত্মাব বিবেক-  
প্রকাশক বাক্য তুমি বলিয়াছ, তাহাব দ্বারা ( অর্থাৎ তোমার সেই বাক্যের  
দ্বারা ) আমাব এই মোহ বিগত হইয়াছে অর্থাৎ আমাব অবিবেকবুদ্ধি বিনষ্ট  
হইয়াছে ৷১।

ভাবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিভ্রংশামযা ।

ইওঃ কথ্যপত্রাক্ষ নাহাশ্রম্যাপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

উদ্বোধন ।

[ ৩৪ ১৭৭ সংখ্যা ,

অম্বয় । হে কমলপত্রাক্ষ ভূতঃ ভূতানাং ভবাপ্যর্থো বিস্তরশঃ ময়া প্রত্যৌ  
অব্যয়ং মাহাত্ম্যং অপি ( প্রত্যঃ ) চ । ২।

মূলানুবাদ । হে পরমপাশলোচন ! তোমার নিকট হইতে ভূতসমূ-  
হের উৎপত্তি ও প্রলয় বিস্তররূপে শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার অবিনাশী  
মাহাত্ম্যও ( শ্রবণ করিয়াছি ) । ২।

ভাষ্য । কিঞ্চ ভব উৎপত্তিঃ অপ্যযঃ প্রলয়ঃ ভূতানাং তৌ ভবাপ্যর্থো  
প্রত্যৌ বিস্তরশোময়া ন সংক্ষেপতন্তুতঃ তৎসংক্শাৎ কমলপত্রাক্ষ কমলস্য  
পত্রং কমলপত্রং তদ্বক্ষণী মস্য স ত্বং কমলপত্রাক্ষঃ হে কমলপত্রাক্ষ ! মাহাত্ম্য-  
মপি চ অব্যয়ং প্রতীতিতানুবর্ততে । ২।

ভাষ্যানুবাদ । আরও ( বক্তব্য এই যে ) “ভব” ( শব্দের অর্থ ) উৎপত্তি  
“অপ্যয” ( শব্দের অর্থ ) প্রলয়, ভূতনিবহের সেই ভব ও অপ্যয আমি  
তোমার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। “বিস্তরশঃ” সংক্ষেপে নহে ( কিন্তু  
অতি বিস্তৃতভাবে ) হে “কমলপত্রাক্ষ” “কমল” ( অর্থাৎ ) পদ্মের পত্র ( এই  
অর্থে ) কমলপত্র ( এই শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে ) সেই কমলপত্রের জ্যৈষ্ঠ  
যাঁহাব দুইটী চক্ষু আছে তাঁহার নাম কমলপত্রাক্ষ ( সেই কমলপত্রাক্ষ শব্দের  
সম্বোধনে ) কমলপত্রাক্ষ । ( এই পদটী নিশ্চয় হয় ) এবং ( তোমার ) “অব্যয়”  
অক্ষয় মাহাত্ম্যও “তোমার নিকট হইতে শুনিয়াছি” এই কয়টী পদের অনুরূপ  
হইতেছে । ২।

এবমেতদ্ যথাখ আত্মানং পরমেশ্বর ।

দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

অম্বয় । হে পরমেশ্বর, ত্বং যথা আত্মানং আখ তৎ এবমেব ; হে পুরু-  
ষোত্তম, তে ঐশ্বরং রূপং ( ইদানীং ) দ্রষ্টুং ইচ্ছামি । ৩।

মূলানুবাদ । হে পরমেশ্বর, তুমি ো প্রকারে নিজের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছ,  
তাহা সেই রূপই : হে পুরুষোত্তম, আমি ( এক্ষণে ) তোমার ঐশ্বর স্বরূপ  
দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি । ৩।

ভাষ্য । এবমিতি । এবমেতন্নান্যথা যথা যেন প্রকারেণ আখ কথয়সি  
ত্বং আত্মানং পরমেশ্বর । তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি-  
বলবীৰ্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নং ঐশ্বরং বৈষ্ণবং রূপং, পুরুষোত্তম । ৩।

১৫ই আশ্বিন, ১৩১১ । ]

উদ্বোধন ।

৪১১



ভাষ্ণানুবাদ । তুমি যে প্রকাঃ আত্মস্বরূপ বর্ণন করিয়াছ, তাহা ঠিক, সেই বিষয়ে অগ্রথা হইতে পাবেনা । হে পবনেশ্বর ! তোমার সেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য বল ও বীৰ্য্যযুক্ত সেই ঐশ্বর ( অর্থাৎ ) বৈষ্ণবরূপ আমি হে পুরুষোত্তম, দেখিতে ইচ্ছা করি । ৮।

মত্সে যদি তচ্ছক্যং মযা দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।

যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়ান্নান্যদ্যম্ ॥৮॥

অর্থ । হে প্রভো । যদি তং ( রূপং ) মযা দ্রষ্টুং শক্যং ইতি মত্সে ততো হে যোগেশ্বর ত্বং অব্যয়মান্নানং মে দর্শয় । ৮।

মূলানুবাদ । হে প্রভো । যদি সেইরূপ দেখিবার শক্তি আমার আছে, এই প্রকাব আপনি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, আপনি আমাকে আপনার সেই অবিনাশী স্বরূপ দর্শন করিতে দিন । ৮।

ভাষ্ণ । মত্সে ইতি । মন্যসে যদি চিন্ত্যসি মযা অর্জুনেন তং শক্যং দ্রষ্টুমিতি প্রভো স্বামিন্ যোগেশ্বর ! যোগিনো যোগান্তেষামীশ্বরঃ যোগেশ্বরঃ হে যোগেশ্বর যস্মাদহমভীবার্হী দ্রষ্টুং তত্তত্ত্বান্মে মদপং দর্শয় ত্বং আত্মানং অব্যয়ম্ । ৮।

ভাষ্ণানুবাদ । মত্সে ইত্যাদি শোকেব অর্থ । মন্যসে ( এই পদটোব অর্থ ) চিন্তা কর ( কি ) যদি “আমি” অর্জুন সেইরূপ দেখিতে পাবিব, তাহা হইলে হে “প্রভো” স্বামিন্ হে “যোগেশ্বর” ( এই স্থানে ) যোগ শব্দের অর্থ যোগী, সেই যোগিগণেও যিনি ঈশ্বর, তাহাকেই যোগেশ্বর বলা যায়, হে যোগেশ্বর । যে বাবণ আমি সেইরূপ দেখিবার জ্ঞা অত্যন্ত অধী, সেই কাবণেই তুমি আমার জ্ঞা সেই তোমার অব্যয় আত্মাকে প্রদর্শন কবাও । ৮।

শ্রী ভগবান্ উবাচ ।

পশু মে পার্থ রূপাণি শতশোহংগ সহস্রশঃ ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানি চ ॥৯॥

অর্থ । হে পার্থ নানাবিধানি নানাবর্ণাকৃতানি চ শতশঃ সহস্রশঃ মে দিব্যানি রূপাণি অংগ পশ্য । ৯।

মূলানুবাদ । শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ, অনেক বর্ণ ও অনেক আকার-যুক্ত বহু প্রকাব আমার শত ও সহস্রসংখ্যক দিব্যরূপনিচয় তুমি অবলোকন কর । ৯।

ভাষ্য। এবং চোদিতোহর্জুনেন ( ভগবান্নুবাচ ) পশু মে পার্শ্ব রূপানি  
শতশোহং সহস্রশঃ অনেকশঃ ইত্যর্থঃ। তানি চ “নানাবিধানি” অনেক-  
প্রকাবাণি দিব্য ভবানি দিব্যানি অপ্ৰাকৃতানি “নানাবর্ণাকৃতীনি চ ” নানা  
বিলক্ষণা নীলপীতাদিপ্রকাবা বর্ণাত্তথা আকৃত্যঃ অবয়বসংস্থানবিশেষা  
যেষাং রূপাণাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ৷৫৷

ভাষ্যানুবাদ। এই পশাব অর্জুন প্রার্থনা করিলে ( ভগবান্নু কহিলেন )  
হে পার্শ্ব “শতশঃ” ও “সহস্রশঃ” অর্থাৎ অনেক প্রকাব আমাব রূপনিবহ ভূমি  
দর্শন কব। সেই সকল রূপ ( কেমন ? ) “নানাবিধ” বহুপ্রকাব “দিব্য” স্বর্গীয়  
অর্থাৎ অপ্ৰাকৃত এবং “নানাবর্ণাকৃতি” বর্ণ শব্দেব অর্থ নীলপীতাদি  
বহুপ্রকাব অনেকবর্ণ, আকৃতি শব্দেব অর্থ অবয়ববিলক্ষণ, সেই বর্ণ ও আকৃতি নানা  
প্রকাব ভাবে যে সকল রূপে বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে নানাবর্ণাকৃতি  
কহে ৷৫৷

পশাদিত্যান্ বহ্নু কদ্রান্ অশ্বিনৌ মকতস্তথা ।

বহুদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভাবত ॥৬॥

অর্থ্য। আদিত্যান্ বহ্নু কদ্রান্ অশ্বিনৌ মকতঃ পশা হে ভারত ! তথা  
বহ্নুনি অদৃষ্টপূর্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশা ৷৬৷

মূলানুবাদ। ( আমাব দেহের মধ্যে ) দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবহ্নু, একাদশ  
কদ্র, অশ্বিনৌকুমাবহব, মকৎ এই নামে প্রসিদ্ধ দেবগণ এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ষ  
আশ্চর্য্য বস্তুসমূহও দর্শন কব ৷৬৷

ভাষ্য। পশাদিত্যানিতি । পশু আদিত্যান্ দ্বাদশ বহ্নু অষ্টৌ কদ্রান্  
একাদশ অশ্বিনৌ দ্বৌ । মকতঃ সপ্ত সপ্তগণা যে তান্ তথা বহ্নুনি অপি  
অদৃষ্টপূর্বাণি মনুষ্যালোকে জন্ম গ্রহণেহনোন বা কেনচিৎ পশ্য আশ্চর্য্যাণি  
অদ্ভুতানি ভারত ৷৬৷

ভাষ্যানুবাদ। পশাদিত্যান্ ইত্যাদি শৌকেব অর্থ । “পশ্য”দেখ ( কি ? )  
আদিত্য অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্য, কদ্র ( ইঁহাবা ) একাদশ, বহ্নু ( ইঁহারা ) আট-  
জন, অশ্বী ( ইঁহাবা ) দুই জন, মকৎ ইঁহারা এক একদলে সাতজন করিয়া  
থাকেন, মোট ইঁহাদের সাতটা দল আছে ( অর্থাৎ সর্বসম্মত ইঁহারা উনপ-  
ঞ্চাশৎ জন : সেই বহুদৃষ্টগণকেও দেখ । এইপ্রকার ভূমি বা ভূমি ভিন্ন অল্প কোন  
১৫ই অশ্বিন, ১৩১১ । ] উল্লেখন ।

মম্বা বাহা কখন দেখে নাই, এইরূপ অনেক “অচর্য্য” ~~অনুভূত~~ ~~কল্পিত~~ ও  
তুমি দর্শন কর । ৬।

ইহৈকম্বং জগৎ ক্বংসং পশ্যাদ্য সচচরম্ ।

মম দেহে গুডাকেশ যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসি ~~পশ্যামি~~

অর্থ্য । হে গুডাকেশ ইহ মম দেহে একম্বং সচচরম্ ক্বংসং জগৎ পশ্য  
যচ্চ অগৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ( তদপি পশ্য ) । ৭।

মূলানুবাদ । হে নিদ্রাক্ষয়কানিন, এই আমার দেহে সচচরম্ সকল বিশ্ব  
একত্র সমাবেশিত বহিয়াছে দেখ এবং অগ্ৰ বাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর,  
তাহাও দেখ । ৭।

ভাষ্য । ন কেবলমেতাবদেব । ইহৈকম্বং একম্বিন্ ত্রিতং জগৎ ক্বংসং  
সমস্তং পশ্যাদ্য ইদানাং সচচরম্ সহ চবেণ অচবেণ চ বর্ত্ততে মম দেহে গুডা-  
কেশ যচ্চাত্তদ্রষ্টুমিচ্ছসে “যত্র জঘেম যদি বা নোজযেহুঃ” ইতি ষদ-  
বোচঃ তদপি দ্রষ্টুং যদিচ্ছসি । ৭।

ভাণ্ডানুবাদ । কেবল যে ইহাই তাহা নহে ( আরও বলি গুন ) এই  
সচরাচর অর্থাৎ স্বাবব ও জঙ্গমের সহিত বর্ত্তমান এই সমুদয় বিশ্ব আমার  
এই দেহে বিদ্যমান বহিয়াছে, ইহা তুমি দেখ ( কিরূপে আছে ? ) তাহাই বলি-  
তেছেন ) “একম্বং এক ( আমার দেহকেই ) আশ্রয় করিয়া বহিয়াছে আব  
কিছু ( অর্থাৎ ) জঘ পবাজযাদি ( বাহা ) তুমি শঙ্কা করিতেছ, কাবণ পূর্বেই  
তুমি বলিয়াছ যে আমবা বিজয়ী হইব বা হইতে পাবিব কি না ? ইত্যাদি  
আমার এই দেহে তুমি যদি তাহা দেখিতে ইচ্ছা কর ( তাহা হইলে বল তাহাও  
তুমি দেখিতে পাইবে ) । ৬।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা ।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগৈশ্বর্যম্ ॥ ৮ ॥

অর্থ্য । অনেন স্বচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং তু ( অং ) নৈব শক্যসে ( অহং ) তে দিব্যং  
চক্ষুঃ দদামি মে ঐশ্বর্যং যোগং পশ্য । ৮।

মূলানুবাদ । তুমি তোমার এই চক্ষুর দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে

বিশেষ দৃষ্টব্য ।

আমাদের বৎসবে একমাস ছুটি লওয়া হয় । ইতিপূর্বে ১লা  
ভাদ্র প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণে ১৫ই কার্তিকের সংখ্যা প্রকাশ  
করিব না । তাহা হইলে এক মাস সম্পূর্ণ হইল ।

---

## নূতন সংসার ।

—:~::~:—

শ্রীবাগ—একতারা ।

কবে নবসাজে আমি সাজিব বে,  
নূতন সংসার ভবে স্থাপিব বে ।  
ঐশ্বর্য পিতার ধরি কব স্বকোমল  
নিমল অভয়ধামে ভ্রমিব বে ।  
শান্তিবরণী হবে অক্ষয়গিনী,  
তবে যতনে স্থাপিব রুদ্রপুরে,  
অতি সোহাগে ভূষিব সমাদরে ,  
আমাব সে অন্তঃপুরে ।  
দ্রোণাণী বাসিন হাবে শয়নম ভাই ছজনারে,  
সেন কামাদি তত্ত্বব জ্ঞোব করে,  
আমাব প্রাণের প্রতিমা না নেয় হার বে ।  
ভূমিতল হবে সুগম্য শয়নে,  
তায় নীলাকাশ চাঁদোয়া উপবে,  
আমি লজ্জা নিবাবিব দিগন্তে ,  
আদবে ক্ষমা জননী, দয়া অমায়া ভগিনী,  
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম স্বেচ্ছাধাবে,  
ভোজন কবাবে কাঙ্গালেবে,  
তাব ভবক্ষুধা পলাইবে দূরে রে ।

শ্রী কৈলাস চন্দ্র গুপ্ত ।

## তিব্বতে তিনবৎসর ।

পূর্বপ্রকাশিতের পর ।]

[ স্বামী অখণ্ডানন্দ ।

ভটাবীতে পঁছিয়া আমি আব এক দুর্ভাগ্যবান পড়িলাম । ঠিক পথের উপরেই ভটারী গ্রামের কয়েক খানি ঘর ( পাহাড়ীবা ঘর ) বলে, এক প্রকার Water Mill, জলেব তোড়েই ঘাঁটা ঘোবে ; ইহাতেই সমুদয় পাহাড় অঞ্চলে ময়দা পেয়া হয় ) এক খানি ধর্মশালা, টিহবী বাজার একখানি বাজলা এবং যাত্রীদের জন্য কয়েক খানি ঘর আছে । প্রকৃত গ্রামখানি ঠিক তাহার কিছু উপরেই অবস্থিত । ভটাবী চটীতে পঁছিয়া পীড়িত ব্যক্তিকে বাহিরে বাধা বিশেষ নহে ভাবিয়া আমি তাঁহার জন্য একটু আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলাম । যাত্রীদের ঘরগুলি লোকে পবিপূর্ণ দেখিয়া, বীজ্ঞ আমাকে ধর্মশালায় লইয়া গেল এবং সেইখানেই সে সাধুকে রাখিতে বলিল । ধর্মশালায় দ্বাবে পঁছিতে না পঁছিতেই একেবারে বহুজনকণ্ঠাখিত “ দুব দুব ” শব্দে আমাদের কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিল । ধর্মশালার ভিতরে অন্ধকার, স্তব্ধতা আমরা প্রথমে উহা কাহাব সম্ভাষণ, তাহা বুঝিতে পানি নাই । কিছুক্ষণ পরেই জানিতে পারিলাম যে, একদল বৈষ্ণব নাগা সাধুতে ধর্মশালা ঘরটী পবিপূর্ণ । ধর্মশালার দ্বাবে বসিয়া অতিশয় কাতবভাবে আমবা যতই তাঁহা-দিগকে সেই ধর্মশালার মধ্যে একজন মাত্র পীড়িত সাধুব উপযুক্ত একটু স্থান করিয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলাম, ততই তাঁহারা আমাদিগকে বহুবিধ কটুকটব্য কথাই গালি দিতে লাগিলেন । এ দিকে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া বীজ্ঞ বোকা ফেলিয়া যাইতে ব্যগ্র । আমি তো মহা বিপদে পড়িলাম । কি কবি, আমি তো সাধুকে ভিতরেই রাখিব মনে করিয়া একেবারে নাছোড়-বল হইয়া বসিয়া রহিলাম । তাঁহাদের অল্প অতিসম্প্রাতের প্রতি ক্রক্ষেপও না কবিয়া আমি তাঁহাদিগকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম ।

“চোবা না শুনে ধর্মের কাহিনী” । আমাদের কথাব একবর্ণও না বুঝিয়া, অবশেষে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, আমবা কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহি, তখন আমাদিগকে যেন ভয় করিতে উদ্যত হইয়া, অল্প গালাগালি দিতে

দিতে ধর্মশালা হইতে প্রায় ১৬। ১৭ জন দ্রষ্ট পুষ্ট বৈষ্ণব নাগা সাধু “তোরাই থাক, তোরাই থাক” বলিয়া ধর্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাদের এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাঁহারা মনে করিলেই বিনা বাক্যব্যয়ে অনায়াসে সেই স্বরের মধ্যে একটু স্থান দিতে পারিতেন। আমি আর অণকালও বিলম্ব না করিয়া সাধুকে কেণ্ডি হইতে নামাইয়া ধর্মশালার এক পার্শ্বে শোয়াইলাম। যাহা হউক, অনেক কষ্টে আমি সাধুকে ধর্মশালার মধ্যে শোয়াইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। এইরূপে বাত্রি প্রায় ৯।১০ টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি যাত্রীদের কেণ্ডি দিয়া আমার লুই ফেরং আনিলাম এবং বীজুকে পরদিন প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিতে বলিলাম।

নাগারা ধর্মশালার চারিধারে রকের উপব শয়ন করিলেন এবং আমি তাহারই নিম্নে অনতিদূরে একটা বৃক্ষের তলদেশে শুইয়া পড়িলাম। সেট রাত্রি তো আমার এই রূপেই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়াই দেখি যে, নাগারা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বাহিয়াছেন এবং এক এক বাব ধর্মশালার মধ্যে গিয়া সেই পীড়িত সাধুকে দেখিয়া আসিতেছেন। যেন তাঁহাদের কি ধাঁধাই লাগিয়াছে! প্রকৃত ব্যাপার বুঝিয়া নাগাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, “আরে যহতো পরমহংস ছার, নহী তো ইংনী গালি গালাজ্জ্ কোঁ কর সহ সকেতে” এবং কেহ কেহ আসিয়া গত রাত্রিতে তাঁহারা আমাদের সহিত যে দুর্জীবহার করিয়াছেন, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, আমি আব সে সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করিয়াই সর্বত্রই সাধুকে দেখিতে গেলাম। ধর্মশালার মধ্যে গিয়া দেখিলাম যে, সাধু বসিয়া আছেন। তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বেশ ভালই বোধ হইল। আমি কয়েক খানি কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে একটা খুনী আলিয়া দিলাম। তাহার পর তিনি বুলি হইতে আটা বাহির করিয়া দিয়া কয়েক খানি কুটি করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তাঁহার অল্প কুটি করিতে লাগিলাম। তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে তিনি আমাকে এই পর্যন্ত বলিলেন যে, মাড়োয়ার হইতে ৬ বদবিক্রম যাত্রা করিয়া পথে তিনি অশৌরোগাক্রান্ত হন এবং তাঁহার কিছু অর্ধও নাকি মারা যায়।

আমি সাধুর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছি, এমন সময়ে বীজু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সাধুর নিকট সে মজুবী স্বরূপ চাপি আনা মান পদ্মা চাহিল।

এই কথা শুনিয়াই সাধু অতিশয় বিব্রত হইলেন, এবং তাঁহার নিকট কিছু নাই ও তাঁহাকে কিছু দিতে পারিবেন না বলিলেন। তাঁহার নিকট বস্ত্রাদি ও বাসন প্রভৃতি এত দ্রব্য ছিল, যাহার একটা কিছু দিলেই বীজু সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। অর্থের পরিবর্তে সাধুর নিকট একটা কিছু লইবার জন্য বীজু কত চেষ্টা করিল কিন্তু সাধুর মন কিছুতেই টলিল না, বরং তিনি তাহার ঐক্লপ অত্যাঘ দাবী অসহ বোধ করিয়া, আমি তাঁহাকে কেন সেই লোকটাব পীঠে আনিলাম বলিয়া আমাকে যথোচিত তিরস্কাব করিতে লাগিলেন। এইরূপ উত্তেজনায পীড়িত ব্যক্তির অনিষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া আমি বীজুকে যেকপে পারি সন্তুষ্ট করিব বলিয়া বিদায় দিলাম।

কুটি প্রস্তুত হইলে, আমি সাধুকে তাহা খাইতে দিলাম। তিনি আপন হাতেই কটি খাইতে লাগিলেন। আমিও স্থান করিয়া গ্রামে ভিক্ষা করিতে গেলাম। গ্রামেব লোক সেই দিন আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং আমার নিকট সকল কথা শুনিয়া বীজুকে এক জন দুই আনা পয়সা দিল এবং আর একজন বৈকালে দুই আনা দিয়া আমাকে গণমুগ্ধ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

গ্রাম হইতে ধর্মশালায় আসিয়া দেখিলাম যে, সাধুর মৃত্যুকাল উপস্থিত, কণ্ঠ ঘড় ঘড় ধ্বনি হইতেছে এবং রাশিবাশি মক্ষিকায় মুখখানি আবৃত। অকস্মাৎ সাধুকে আমি এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিব, তাহার কোন লক্ষণই কিছু পূর্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি তাঁহাকে কত ডাকিলাম, আব কে কাহাকে উত্তর দেয়? কিছুক্ষণ পূর্বে যিনি অতি তুচ্ছ একটা পদার্থেবও মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, উপকারী ব্যক্তিকও তিরস্কৃত ও লাঞ্চিত করিতে যিনি কিছুমাত্র রুজিত হন নাই, একটা মাত্র মক্ষিকার তাড়নাযও যিনি বিকল হইতেন, তাহার সেই মমতার আধাব দেহ অসংখ্য মক্ষিকায় আচ্ছন্ন, তাঁহার সেই অতি আদবেব সামগ্রী সবকারী লোকের জিন্মায়। আমার অল্প-পঞ্জিত কালে টিহবী বাজার একজন পাটোয়ারী আসিয়া সাধুর সমুদয় দ্রব্যাদির একটা তালিকা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অন্তিমকালে আমি সাধুর মুখে একটু গজাঙ্গল দিয়া ভগবানের নাম শুনাইলাম। অন্তিমকাল পবেই সাধু ৬ গজা লাভ করিলেন। এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র বাজাপাটোয়ারী আসিয়া সাধুর সমুদয় দ্রব্যাদি লইয়া গেলেন। তাহার বোঁচকার মধ্যে কি আশ্চর্য্য, একটা দোয়ানী বাহির হইল। আমি কেবল মাত্র সেই দোয়ানীটা বীজুকে

দিয়া তাহার বাকী পাওনা চুকাইয়া ঋণমুক্ত হইলাম। পার্শ্বতাবীত্যন্ত্রদ্বারে দুইটা নীচক্রান্তীয় পাহাড়ের দ্বারা সাধুব মৃত দেহ মা গঙ্গাব জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। আমি স্বয়ং সাধুকে গঙ্গায় দিতে পারিলাম না বলিয়া একটু আক্ষেপ বহিয়া গেল। সাধুব মৃত দেহ নড়াইনাব সামর্থ্য আমাব ছিল না এবং গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ বা বাজপুতাই সাধুকে গঙ্গায় লইয়া যাইতে সম্মত হইল না, সুতরাং বাধ্য হইয়াই আমাকে অপব লোক দ্বারা কার্যা নির্বাহ করিতে হইল। এই একটা অভাবনীয় ঘটনায় ভটাবীগ্রামে আমাকে দুই দিন থাকিতে হইয়াছিল।

ভটাবী হইতে যাত্রা করিয়া বোধ হব চতুর্থ দিবসে আমি গঙ্গোত্রিতে পৌঁছিয়াছিলাম। গঙ্গোত্রি পথে ধবাবী শেষপ্রাপ্তস্থিত গ্রাম। উক্ত গ্রাম হইতে গঙ্গোত্রি প্রায় ১২ ক্রোশ হইবে। পথের মধ্যস্থলে তৈরব খোলা নামে একটা স্থান আছে। ভৈরবজীব স্থান বলিয়া গঙ্গোত্রির যাত্রিগণ সেই স্থানে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া যাতায়াত করে। স্থানটোতে একটা ছোট মন্দিরের মত আছে। পথে আব কোন গ্রাম বা দোকান নাই। ভৈরব খাটোতে গিয়া আমি প্রকৃত পথ ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। এইখানে ভোট গঙ্গা নামে আব একটা নদী আসিয়া মূল ধারা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পথহাবা হইয়া কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে ঘুবিতেই আমি পুনরায় প্রকৃত পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাংলা ষটক, ষতই আমি গঙ্গোত্রিব দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, হিমালয়ব স্তম্ভশাল অপক্লপ দৃশ্য ততই আমাব নয়নগোচর হইতে লাগিল। সম্মুখে সেই তুষাবাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড পর্বত। পর্বতটা দেখিয়া অনেকটা কুস্মপুষ্ঠের জায় বোধ হইতে লাগিল। সেই পর্বত হইতেই ত্রিভুবনপাবনী ভাগীরথী প্রবাহরূপে মর্ত্যে আগমন করিতেছেন। সর্পের জায় কুটিল গতিতে পতিতপাবনী ভাগীরথী কর্ণ বধির করিয়া অবিরাম হবহর ধ্বনি করিতে করিতে নিম্নে অবতরণ করিতেছেন। গঙ্গোত্রিতে নার প্রবাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও তাহার প্রচণ্ড বেগে শত ঐরাবতেরও সাধ্য নাই যে, ক্রণকাল দণ্ডায়মান থাকে। মা গঙ্গার অতি শুভ্র ও পবিত্র জলরাশি উদ্ভাম নৃত্য করিতে করিতে অসংখ্য জীবের উদ্ধারকামনায় অতি দ্রুতগতিতে মর্ত্যে অবতরণ করিতেছেন, ক্রণকালও যেন কোথাও তিষ্ঠতে পাবিতেছেন না। ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বের অত্যন্ত পর্বতশ্রেণীর উপরিভাগ অগাধ তুষারশাশিতে পরিপূর্ণ এবং নিম্নভাগ গাঢ় হরিত বর্ণ দেবদারু বৃক্ষে সমাচ্ছা-



দিত এবং স্থানে স্থানে ভাগীরথীর উভয়তীরবর্তী স্থান এমনি সুলব, সুরিকণ ও শুভ্রপাষণময় স্বাভাবিক বেদিকার জাঘ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি সেই অপূর্ণ সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে একেবারে আত্মহারা হইলাম। সেখানে পঁহছিয়া প্রকৃতই আমার মনে হইল যে, আমি যেন আব মর্ত্যলোকে নাই। আমি ত স্থানে স্থানে বসিয়া পড়িতে লাগিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাই যেন আর দেখিতে পাইব না বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহা ফেলিয়া যাইব, তাহাই যেন আর কিবিয়া পাইব না। এই মনে করিয়া কত স্থানেই যে বসিতে বসিতে গেলাম, তাহা বলিতে পারি না।

পথে সন্ধ্যা হইল, তথাপি আমার হুঁস নাই। আমি যেন এক পাও অগ্রসব হইতে পারিতেছি না। সেই অবস্থায় একজন সাধু আমার ঐ অবস্থা দেখিয়া আমাকে সঙ্গে কবিয়া গঙ্গোত্রিতে লইয়া চলিলেন। এই সাধুতীর সহিত আমার ভৈবব কোলাব নিকট সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি আমাকে পথে কুটি করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। সন্ধ্যাব পর আমবা গঙ্গোত্রিতে পঁহছিলাম, গঙ্গোত্রির মন্দিরে যাব ধাতুময়ী সুলব প্রতিমা দর্শন কবিয়া পবম আনন্দ লাভ করিলাম। গঙ্গোত্রিতে যা গঙ্গাব একটা প্রস্তবনিম্নিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রীদের ও পাণ্ডাদের জগ্গ কয়েক খানি ঘর এবং তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সবববাহেব জন্য দুই একখানি দোকান মাত্র ছিল। গঙ্গোত্রির ঘাটের উপরেই একটা গুহাতে জনৈক সাধু থাকিতেন। তিনি ধবাবী ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামে ভিক্ষা কবিয়া যাহা সংগ্রহ কবিতেন, তাহা দ্বারা গঙ্গোত্রিতে তিনি প্রতি বৎসর বহুতব সাধু সন্ন্যাসীব সংকার করিতেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গঙ্গোত্রিতে কোন সদাব্রত ছিল না। যদি সেই সাধু ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্কলের দেবা না কবিতেন, তাহা হইলে অর্থহীন অবস্থায় গেইখানে ২১ রাত্রি অবস্থান কবাও কষ্টকর হইয়া উঠিত।

এই স্থান হইতে মূল গঙ্গোত্রি বা গোমুখী প্রায় ১২ক্রোশ হইবে। ভাগবতীর উভয়পার্শ্বস্থিত চিরভুবারমণ্ডিত পৰ্ব্বত-মালা এতই দুর্গম যে, বহু চেষ্টা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কেহ তথায় পঁহছিতে পারে নাই। শুনিয়াছি যে, এই স্থান হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একবৎসর একটা যুরোপীয়ান পরিভ্রাজক পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও কয়েক জন ইংরাজ ভ্রমণকারী বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি অতি কষ্টে এক মাইল

আবও উপরে বাইতে সমর্থ হইয়াছিল। অত্যুচ্চ নিবিশ্বকুলি বর্ষার পূর্বে অধিকতর জলজ্বা হইবার কারণ এই যে, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ডও-কিবনে তুষার-বাশি বিগলিত হইয়া পর্তগাত্র এমনই পিচ্ছিল হয় যে, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার উপর পদবিক্ষেপ করে। সেইস্থানে পঁহছানো এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থানে ৬ গঙ্গোত্রি স্নান করিয়া সকলে কৃতার্থ হইতেছেন এবং ভগবান শঙ্করাচার্য্যও সেইজন্য এই স্থানেই ৬গঙ্গোত্রির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। যাত্রীরা যে ঘাটে স্নান করে, তাহা “ভগীরথশিলা” নামে খ্যাত। ৬গঙ্গোত্রির মন্দিরের বাহিরে একটি অতি সুন্দর শুভ্র স্ফটিকলিঙ্গ দেখিলাম। পাণ্ডারা সেই লিঙ্গ মূর্ত্তিটী একটি তাম্রাবরণে ঢাকিয়া রাখে। ৬ কেলার ও বজ্রীনারায়ণের সহিত ভুলনায় ৬ গঙ্গোত্রির যাত্রিসংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং মহারাষ্ট্রীয় যাত্রীর সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। যাত্রিগণ প্রায়ই এইখানে একরাত্রি মাত্র বাস করিয়া চলিয়া যায়। বৎসবে ছয় মাস এইখানে মা সঙ্গার পূজা ও যাত্রিসমাগম হয়। আব ভোগ রাগেব তেমন ব্যবস্থা নাই। প্রসাদপ্রার্থী সাধু সন্ন্যাসিগণ অপ-রাহ্নে পিণ্ডাকাব একটি ভাতের গোলা প্রসাদ পান। তাহাও পাহাড়ী পূজ-কেরা দুই এক দিনের অধিক কাঠাকেও নিতে সম্মত হয় না।

আমি মন্দির হইতে গঙ্গার তীরেতীরে অতি অল্পদূর গোমুখীর দিকে গিয়া একটি অতিসুন্দর ও প্রশস্ত গহ্বর দেখিতে পাইলাম। গহ্বরটী বেশ প্রশস্ত এবং উহাকে বাসোপযোগী করিবার জন্য সুন্দর তক্তা দিয়া দুই পার্শ্ব আবৃত, এক জোড়া কপাটও লাগানো ছিল। গুহাটির পশ্চাতে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট গুহা আছে। সেই সময় মোরাদাবাদ অঞ্চলের এক জন বানপ্রস্থান্স্রমী বয়ঃপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ সেই গুহাতে বাস করিতেছিলেন। তথায় তিনি কিছু দিন হইতে গাভ্রী পূবন্দ্রণ করিতেছিলেন। আমি ছোটগুহাটোতে আশ্রয় লইলাম। ২১ দিনের মধ্যেই সেই ব্রাহ্মণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব হইল। শুনি-লাম যে, তিনি দুইদিবস যাবৎ গুহা ছাড়িয়া ভিক্ষার্থে কোথাও বান নাই এবং পূজারী ও পাণ্ডারাও কেহ তাঁহার খোঁজ করে নাই। আমি তাঁহার দুই দিন উপবাসের কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাকে কোন উপায়ে কিছু খাওয়াইবার চেষ্টায় বাহির হইয়া গঙ্গোত্রির মন্দিরে গেলাম। ভগবানের এমনি রূপা যে, বার মন্দিরে পঁহছিবাই দেখিলাম যে, দিল্লী হইতে এক জন খনাচা যাত্রী আসিয়া পঁহছিয়াছেন এবং তিনি সাধু ও ব্রাহ্মণ ভোজনের

আয়োজন কবিতেন। গঙ্গোত্রির যাবতীয় সাধু ব্রাহ্মণকেই তিনি সে দিন সিবা ( গুডের হালুয়া ) ও পুৰী দিবা ভোজন করাইলেন। গঙ্গোত্রির সাধু, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলবই ভোজন হইয়া গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, গঙ্গোত্রিবাসী পাহাড়ীদের মধ্যে কেহই সেই বিবিক্তসেবী, গিবিগুহাবাসী জাপক ব্রাহ্মণের কথা একবার মনেও কবিল না। আমি দিল্লীর সেই শেঠ মহাশয়ের নিকট গিয়া ব্রাহ্মণের কথা বলিবামাত্র তিনি আমার সহিত সেই গুহায় আসিয়া তাঁহার দর্শন করিলেন এবং আমাদের দুইজনের ৮১০ দিনের আহার্য্যোপযোগী আটা, গুড়, চাউল ও ঘৃত প্রভৃতি দিয়া গেলেন।

এইবার ব্রাহ্মণের অনশনক্ৰেশ ঘুচিল। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ আমার প্রতি বিশেষ অনুবক্ত হইয়া পড়িলেন এবং আমাকে অতিশয় যত্নসহকারে মিঠাভাত ও রুটি প্রভৃতি কবিয়া বাণ্যাইতে লাগিলেন। এইরূপে এক সপ্তাহ কাল আমাদের পবমানন্দেই অতিবাহিত হইল। দেবদাক কাঠের ধুনী নিরবচ্ছিন্ন কাল আমাদের গুহায় প্রজ্জলিত থাকিত। দেবদাক কাঠে এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ থাকায় অতি অল্প কাঠেই অহোবাত্র আমাদের ধুনী প্রদীপ্ত থাকিত। ইহা হইতে রজন ও তর্পণ হয়। দেবদাক কাঠ অপরিাপ্ত থাকিতে এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের মধ্যে ব্যতিকালে স্বতন্ত্র প্রদীপের আবশ্যক হয় না। ইহাব একটু মোটা বকমেব একটা কাটিলেই এক একটা মশালের কাজ হয়। এই সকল স্থানে অগ্নি তিন্ন যেমন থাকা যায় না, ভগবানের ইচ্ছায় এখানে অগ্নিও তেমনি স্থলভ।

৬ কেদারবদ্রী ও গঙ্গোত্রি প্রভৃতি তীর্থগুলি হিমালয়ের অভ্যুচ্চ উত্তর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া বৎসরের মধ্যে ছয় মাস মাত্র লোকসমাগম থাকে। অক্ষয়তৃতীয়ার পব বৈশাখ মাসের ৩৪ দিন থাকিতেই পট খোলে অর্থাৎ পূজা ও যাত্রা আবস্ত হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসেব ২৩ দিন হইতেই পট বন্ধ হয়, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত তুষারপাত নিবন্ধন জনমানবের অগম্য হওয়ায় এই ৬ মাস কাল যাত্রা এককালীন বন্ধ থাকে। পাহাড়ীরা বলে যে, এই সময়ে দেবগণের যাত্রা আরম্ভ হয় এবং তাঁহাবাই প্রত্যহ আসিয়া পূজা কবেন। আমি যে বৎসর গিয়াছিলাম, ঠিক তাহার পূর্ব বৎসবেই গঙ্গোত্রির পটবন্ধের পর জনৈক ব্রহ্মচারী তথায় থাকিয়া ছয় মাস নির্জনে উপস্থান করিতে উদ্যত হন। তাঁহাবই জন্য ধরারী গ্রামের একজন ধার্মিক গৃহস্থ এই গুহাটী বিশেষরূপে বাসোপযোগী করিয়া দেন।

এবং গুহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড সিঁদুরে ছয় মাসের উপযোগী অগ্নির সংস্থান কবিতা দেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী যত্নশীল নাকি কিছুদিন থাকিয়াই শীতের চোটে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করেন! তাঁহার জন্যই গুহাটী অমন সুন্দর বাসোপযোগী করা হইয়াছিল। সে যাহা হউক, এক সপ্তাহ পবেই আমি গঙ্গোত্রী হইতে যাত্রা কবিত্তে উদ্যত হইলাম। টিহবী হইতে আসিবাব কালীন গঙ্গোত্রীর জল লইবাব জন্য একটি শিশি আনিয়াছিলাম। কেবল এক শিশি জল মাত্র লইলাম। উক্ত ব্রাহ্মণও আমার প্রতি এত দূর অনুবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার সংকল্পিত পূর্বচরণ শেষ হইতে না হইতেই তিনি গনিরূপে আমার সহিত একত্রে ভ্রমণ কবিবেন বলিয়া আমার সহযোগী হইলেন। তাঁহাকে আমার একাকী ভ্রমণ কবিবার প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনাইয়া আমার সহিত ভ্রমণ কবিবার সংকল্প ত্যাগ কবিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তিনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। গঙ্গোত্রী হইতে যাত্রা কবিতা ধবাবী গ্রামে পৌঁছিয়া আমরা একবাড়ি ঘাট একত্রে ছিলাম। আমার একাকী ভ্রমণ কবিবার বাসনা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, আমি অগ্নানবদনে ব্রাহ্মণের সেই অকপট স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন কাটাইয়া সেই গ্রামেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ কবিতা কৈদাবনাথ দর্শনাভিলাষী হইয়া উত্তরকাণী অভিমুখে যাত্রা কবিলাম।

ক্রমশঃ।

## ব্রহ্ম কি ?।

( শ্রীবাল্মীকি নাগ বোধ। )

বস্তু সকল কি স্বভাবাপন্ন, কি নিয়মে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়, কিরূপেই বা রূপান্তরিত হয়, আমরা যতই জানিতে পারি, আমাদের জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানবলে বর্দ্ধিতশক্তিসাহায্যে আমরা কি না করিতেছি! নৃকীন্ত ইহার এতই প্রচুর যে, এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে বাওরা যথা শক্তি হয় মাত্র। জানই যে শক্তি, ইহা মহা-

জনোক্তি। জ্ঞানের বুদ্ধিতে যেমন শক্তির বুদ্ধি, সেইরূপ শক্তির বুদ্ধিতে আবার সুখের বুদ্ধি ; এবং সুখী হইতে আমাদের সকলেরই ইচ্ছা। সুখী হইবার ইচ্ছা। বেরূপ আমাদের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, সেইরূপ জ্ঞানবুদ্ধির প্রবৃত্তিও আমাদের স্বাভাবিক। প্রতিপদবিক্ষেপে আমরা ঘাহা করিতেছি বা করিবার অভিলাষ করিতেছি, তাহা জাগতিক বস্তুনিচয়ের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ জ্ঞান উপার্জননে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই পথে চিন্তা করিতে করিতে একটু অগ্রসর হইলে দেখিব যে, গোণ বা মুখ্য ভাবে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে এই বিশাল জগতেব মূল কারণ জ্ঞানিবার জন্য আমরা সকলেই স্বভাবতঃ অল্প বিস্তর সমুৎসুক। মৃত্তিকাবিষয়ক জ্ঞান হইলে মৃত্তিকা হইতে যে সকল বস্তু হইতে পারে, তাহার জ্ঞান জন্মিবে। মৃত্তিকাজাত বস্তুসমূহের স্বার্থ বোধ মৃত্তিকাজ্ঞান ব্যতীত সম্পূর্ণ হইবে না। সমগ্র বস্তুব মূলীভূত কাবণকে পৃথিবী ব্রহ্ম বলিয়াছেন। সুতরাং সমুদয় পদার্থেব মূল অনুসন্ধান ব্রহ্মতত্ত্বেই অনুসন্ধান করা হইবে। ব্রহ্ম-তত্ত্বঅনুসন্ধাননে আমাদের জাগতিক জ্ঞান, বল ও সুখ বৃদ্ধি হইবে। ইহা শুনিলে অদ্ভুত কথা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বলিতে কি, যে শিক্ষা ও সংস্কার বশে আমরা ঐ কথা অদ্ভুত মনে করি, তাহাই আমাদের অধঃপতনেব হেতু। ঐ শিক্ষাবশেই এক্ষণে আমরা গৃহপ্রাঙ্গণে ব্যাঘ্রশৃংগালের ভক্ষ্য হইয়াছি! যে জ্ঞান কেবল মৃত্যুর পব মানুষকে সুখী করিবে বলে, ইহজগতের উন্নতিসাধনে ঐদাশু শিক্ষাই যে জ্ঞান লাভের একমাত্র সাধন, তাহাকে আজ দূর হইতে নমস্কার করা উচিত। তাহার সেবা করিয়াই সেই আৰ্য্যপৃথিবীগণেব বংশধরদিগের আজ এই অবস্থা। যে জ্ঞান বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের বিবাক্ত শায়ক সমূহের মর্ষবেদনা সহ্যসাধনে সহ্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, সেই জ্ঞানই আবার মহামতি ভীষ্মকে স্বেচ্ছায় শবশয্যাগ্রহণে শিক্ষা দেয়। আজ কিন্তু শিক্ষার দোষে “আত্মানং সততং বক্ষেং দানৈবপি ধনৈরপি” ইহাই আমাদের প্রাণের কথা দাঁড়াইয়াছে। এবং উহাবই প্রয়োচনায় আমরা অনেকে গৈরিক বসন, কমণ্ডলু বা হবিনামেব ঝুলি লইয়া মনুষ্যজীবনের কর্তব্য সমুদয়ে জলাঞ্জলি দিতে ব্যস্ত হইয়া থাকি।

সর্বাসম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদেরকে কখনই ওরূপ শিক্ষা দেয় না। সর্বস্বকারণের কাবণজ্ঞান ওরূপ শিক্ষা কখন দিবেও না। ব্যক্তিগত ভাবে উহা বেরূপ একব্যক্তির অভ্যুদয় নিঃশ্রেণস সাধন হেতু হইবে

আবার জাতিগত ভাবে সেইরূপ উহা সেই জাতিকে স্বকীয় সর্ববিধ অভাব মোচন করিতে সমর্থ করিবে। কর্মই সকলের বন্ধহেতু, এ কথা নির্দেশ করিষাই ক্ষান্ত থাকিবে না, কিন্তু উহা হইতে মোচনের উপায়স্বরূপ স্ব স্ব কর্তব্য পালনে সকলের সহজে বলদানে সহায় হইবে। ব্রাহ্মণকে উহা সমাধিনিবিষ্ট হইয়া যে রূপে আত্মস্বরূপে নিমগ্ন হইবার জন্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে শিক্ষা দিবে, ক্ষত্রিয়কে তদ্রূপ বাহবলেব দ্বারা সত্য ও ধর্মের রক্ষাব জন্ত জগৎ হইতে অত্যাচার অনাচারেব লোপ সাধনের জন্য মৃত্যুকে উপহাস করিতে শিক্ষা দিবে। বৈশ্যপ্রকৃতি মানবকে যে রূপ বাণিজ্য প্রত্নতির দ্বারা দেশের সমৃদ্ধিসাধনে বন্ধপারিকব হইয়া জীবনবিসর্জন করিতে উৎসাহী কবিবে, শূদ্রপ্রকৃতিকে তদ্রূপ প্রভুর হিতার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়া উন্নতি লাভ কবিত্তে প্রস্তুত করিবে। বেদসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান বস্তব স্বার্থস্বরূপ শিক্ষা দিয়া মানবকে একদিকে যেমন কৃতার্থ করে, অত্ৰদিকে আবার উহাই সেইরূপ স্ব স্ব অধিকাবগত কর্তব্যপালনে তাহাকে নিয়োজিত ও সমর্থ কবিয়া সমাজের সর্বাদীন উন্নতি ও কল্যাণ বিধান করিয়া থাকে। মহাত্মারতাদি ইতিহাসনিবন্ধ, ভারতের তাৎকালিক শ্রী ও সমৃদ্ধিই ইহার প্রমাণস্থল। আজকাল এই ব্রহ্মজ্ঞান ইহার আত্মবল্লিক ফলস্বরূপ কর্তব্যপালনসামর্থ্য প্রদান করে না বলিয়াই আমাদের এই অবস্থা। আমরা নগববাসের অস্থপযোগী হইয়া ক্রমে অরণ্যবাসের যোগা হইতেছি। প্রাপ্তবস্তুর ক্ষয়জনিত ভয় এবং মৃত্যুভয় আমাদের কর্তব্যপরাঙ্খ করিয়াছে, আত্মা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাসই আমাদের মৃত্যুভয়ের হেতু এবং অজ্ঞানই ঐ অবিশ্বাসের মূল। শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান থাকিলে আমাদের আত্মা ও ঈশ্বরজ্ঞানও দৃঢ় হইত। তখন মৃত্যুভয়ে কাতব হইয়া কাপুরুষ হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত।

আমাদের বর্তমান ছুববস্তুর আর একটা কারণ ভবিষ্যদ্বাট্টারঅভাব। ভবিষ্যদ্বাট্টার অভাব আবার অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। কি করিলে কি হয়, এ কথা আমরা বতই জানিব, ততই ভবিষ্যদ্বাট্টা পুলিয়া যাইবে। ততই আমরা পতনের হেতু নিবারণে সমর্থ হইব। ভবিষ্যদ্বাট্টার অভাব বশতঃই আমাদের ক্ষণিক স্বভোগের লালসা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই ক্ষণিকস্বভোগলালসাই আমাদের ক্ষণিক স্বভোগের আরও কর্তব্যপরাঙ্খ করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ দেখা যাইতেছে, অজ্ঞান যেমন আমাদের সর্ববিধ দুঃখের হেতু, তদ্রূপ জ্ঞানই আমাদের সর্ববিধ সুখের হেতু। আর এই অজ্ঞাননিবারণও জ্ঞান

ব্যতীত সাধিত হয় না। সমগ্র বিশ্ব গাঁহাব কার্য, তাঁহার জ্ঞান লাভ হইলে আমাদের সমগ্র বিশ্ব স্বত্বীয় জ্ঞান জন্মিবে। তাঁহার জ্ঞান লাভ হইলে জগৎ সম্বন্ধে আমরা অভিজ্ঞই হইব। সর্ব প্রকার কার্য-কাৰণ-জ্ঞান হইলে আমাদের সৰ্ববিস্তারেই স্মৃতি সজাবনা। অন্যথা স্মৃতির আশা সূর্যপরাহত।

বিজ্ঞান নানাধাৰাবিস্তারে বুঝাইতেছে, নানা বস্তুর সম্মিলনস্থল বিচিত্রতা-ময় জগৎ পরস্পর অবিকল্প নানা নিয়মে আবদ্ধ। সেই নানা নিয়ম আবার জড় ও চেতন দুই শ্রেণী পদার্থ নিবদ্ধ। চেতন স্বসত্তাস্থত্বক্ষম ও জড় উদক্ষম, ইহা চিহ্নপ্রসিদ্ধ। এই জড় ও চেতনের মূল কি ও উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি জানিতে পারিলে আমাদের অভীষ্ট নিদ্ধ হয় কিন্তু উহা নিতান্ত দুর্লভ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাহায্যে বুঝাইতে বিজ্ঞান এখনও সক্ষম হন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে অল্পমান প্রভৃতি প্রমাণেব সাহায্য লইতে আমরা বাধ্য। ধীমান মনোবিগণ এ বিষয়ে নানামতাবলম্বী হইয়াছেন। অধিক কি, একজন ইহাকে চির অজ্ঞেয়ত্বমধ্যে পবিগণিত করিয়াছেন! প্রাচীন মহাত্মাগণের পদপংক্তি অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে বেদ, উপনিষৎ, পশ্চাৎ বেদান্ত, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি পুস্তকে ইহার এক প্রকার বোধগম্য মীমাংসা বেশ পাওয়া যায় বটে কিন্তু পৰমাত্মিক মহাত্মাগণ ব্যাখ্যাচতুর্যে ঐ গুলিকে নিজ নিজ মতেরই প্রমাণ ও পোষকে পবিগত কবিয়াছেন। তত্ত্ববুৎসুহ পক্ষে একের সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্যক্ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আবাব সৰ্বশ্রেণীর ব্যাখ্যাকর্তার ব্যাখ্যা অবগত হওয়াও সহজসাধ্য নহে। এক বিষয়ে ৫টা মতের ব্যাখ্যা একত্র পাইলে, নিজ প্রতিভাবলে অনেকেই একটা যথার্থ তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ হন। কিন্তু আজ আমাদের সে স্মরণ নাই। যাহা ইউক তথাপি স্বাধীনভাবে প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাত্মাগণের আবিষ্কৃত সত্য এবং যুক্তি অবলম্বনে আমরা ইহা যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। স্মরণ্য বিজ্ঞান ও ত্রায়সম্মত অনুমান, স্বাত্মানুভূতি এবং সিদ্ধ মহাত্মাগণের উপদেশসমূহই সহায় রূপে গৃহীত হইবে। একশাখী বিজ্ঞান বলিয়া দিবে, যাহা জড়, তাহা জড়ই, তাহা চিবকালই জড় আর যাহা চেতন, তাহা চিরকালই চেতন। একটা মৃত জীবগু পুনরায় জীবিত হয় না কিন্তু একটা জীবিত জীবগুকে মৃত হইতে দেখা যায়। জড় হইতে চেতন উৎপন্ন হইতে দেখা যায়

না আবার জড়বিহীন চেতনও এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রত্যক্ষীকৃত হয় নাই যে, চেতন হইতে জড়ের উৎপত্তি অনুমান করিয়া লইব। কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, জড় ও চেতন পৃথক্ হইলেও কখনও পৃথক্ সত্তার সত্তাবান হইতে পারে কি ? বিজ্ঞান আজ কাল পূর্বাণেকা আরও কিছু অগ্রসর হইয়া জড় বলিয়া নিশ্চিতপূর্ব পদার্থনিচয়েও চৈতন্তের অস্তিত্ব দেখিতেছেন, এবং জড়ও চেতনাশূন্য নহে বলিতে সাহসী হইতেছেন। তবে উহা এখনও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া সর্ব বিজ্ঞানবাদীর নিকট স্বীকৃত নহে।

অনুমানপ্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করিলে এ বিষয়ে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে দেখা যাউক। জড়ে চেতনের সত্তাব স্বীকার আমরা আগাগোড়া অনুমান সহায়ে করিয়া থাকি। রান, গ্রাম আমার কথাব জবাব দেয়, আমার মত অভীষ্ট সিদ্ধিতে আনন্দ ও প্রতিকূল অমুভূতিতে দুঃখ করে স্মরণে উহাদের আমার দ্বারা চেতনা আছে। আমাতে যে চেতনা আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আর সেই চেতনা আছে বলিয়া অপর বস্তুতে উহার অস্তিত্ব আরি বুঝিয়া থাকি বা অপর বস্তু জড় বা চেতন, ইহা অনুমান করিয়া থাকি। আমার চেতনার দ্বারা যেমন উহাদের মধ্যগত চৈতন্তকে বুঝি, তেমন আমাতে অচেতন দেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই উহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিয়া থাকি। আমার ভিতরে দেহ ও চক্ষুরাদি জড়পদার্থের অস্তিত্ব না থাকিলে আমার অস্ত্র জড়সম্বন্ধীয় জ্ঞান কখনই হইত না, অতএব স্থিতি হইতেছে যে, জড় বা চেতন বুঝিতে যখন জড় চেতন উভয়ায়ক বস্তুর প্রয়োজন, তখন আমরা জড় চেতন বলিতে বাহ্য বুঝি, তাহা অন্তোন্ত পৃথক্ সত্তায় থাকিতে অক্ষম। তবে কি তাহার একই পদার্থের দুই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র বা একই পদার্থাশ্রিত ?

দেখিতে পাই, আমাদের যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে, সেইরূপ অপর একটা করণ বা ইন্দ্রিয় আছে; উহার দ্বারা আমাদের ইচ্ছা, অমুভূতি এবং অমুভূতিসমূহের একত্র সমাবেশকার্য্য সাধিত হইতেছে। তৎসহায়েই আমরা প্রাপ্ত অমুভূতিসমূহের সাহায্যে প্রয়োজনমত নূতন অমুভূতিসমূহ উৎপাদন করিতে পারি। ইহারই নাম জাগ্রদবস্থা। আবার দেখি, সময়ে সময়ে ঐ সব পূর্বাভূতি যেন কোথায় চলিয়া যায়; আবার নিরিয়া আসে! কিন্তু নিজের অস্তিত্ববিষয়ক যে অমুভূতি, তাহা আমরা কখনও হারাই না। নিদ্রা মুচ্ছাদি অবস্থায়ও আমি যে কেবল বর্তমান ছিলাম, আর কিছুই ছিল না, ইহা যেন



আমাদিগকে তৎসময়ে কে প্রাণের ভিতর বলিয়া দেয় । তৎসময়ে সেই আমি-  
 দ্বের সহিত যে অজ্ঞান রূপরসাদি বিষয় সংযুক্ত থাকে না, তাহা ক্রাহাকেও  
 বলিয়া দিতে হয় না । নিজ নিজ প্রত্যক্ষই তাহার প্রমাণ । সুষুপ্তি, মুচ্ছা  
 প্রভৃতি অবস্থায় ঐরূপ ঘটিয়া থাকে । আমাদের আর একটা অবস্থা আছে,  
 বাহ্য পুরোক্ত অবস্থা সকল হইতে বিভিন্ন । উহাতে জাগ্রতবৎ সবই দেখি,  
 সবই কবি; কেবল তদবস্থায় অনুভূত বিষয়সমূহ জাগ্রতরূপের বিষয়সমূহ  
 অবলম্বনেই উঠিয়া থাকে । জাগ্রতের বিষয়সমূহ যে জাতীয়, সেই অবস্থায়  
 তজ্জাতীয় বিষয়াতিবিক্ত অল্প কিছুই থাকিতে দেখা যায় না । কিন্তু ঐ  
 অবস্থায় বিষয়সমূহ অনুভব কবিত্তে বহিঃস্থ কোন বস্তুর সাক্ষাৎ সাহায্য লইতে  
 হয় না । ইহাবই নাম সপ্নাবস্থা । পুরোক্ত সুষুপ্তিতে “আমি ছিলাম”  
 এই অনুভূতির মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় ভাব বিভাজিত ছিল বলিতে  
 হইবে ; কাবণ, অনুভূতি কখন কর্তাশূন্য এবং কর্তা কখনও ক্রিয়াশূন্য নহে ।  
 ক্রিয়াও আবাব বিষয়শূন্য নহে । কাষেই ঐ অবস্থায় অনুভূত “কেবল  
 আমি ছিলাম” এই অনুভূতিটির সমস্তই আপাত চৈতন্যময় বোধ হইলেও  
 উহাতে দৃশ্য বস্তু বা জড়ের গন্ধ যে এককালে বিলুপ্ত, তাহা নহে । কাবণ,  
 চৈতন্য আপন অস্তিত্ব অনুভব করা হেতু নিজেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রকাশ  
 পাইতেছেন, বলিতে হইবে । অতএব ঐ অনুভূতিটাও জড়চৈতন্যাত্মক, ইহা  
 নিশ্চিত । এবং ঐ অবস্থাবিশেষই সচবাচর ব্যবহৃত চৈতন শব্দের অভিধেয় ।  
 মুচ্ছাদি অবস্থাতেও চৈতনের ঐ ভাব । অতএব দেখা যাইতেছে, সুষুপ্তি, স্বপ্ন  
 এবং মুচ্ছাদি অবস্থায় চৈতন পদার্থটা দ্রষ্টা ও দর্শনরূপে প্রকাশিত থাকে অর্থাৎ  
 ঐ অবস্থায় উহার ভিতর ঐ প্রকার স্বগত ভেদ পবম্পব সম্বন্ধবিশেষে বর্তমান  
 থাকে । জাগ্রদবস্থায় কিন্তু চৈতন পদার্থ নিজে দ্রষ্টা রূপে প্রকাশিত থাকিলেও  
 বহিঃপদার্থের সংসর্গে অপূর্ণদৃষ্টে বিষয় সকল অনুভব করেন । অতএব বিষয়  
 যখন দ্রষ্টা নিজেই হয়, যেমন সুষুপ্তাদি অবস্থায়, তখন চৈতন, দ্রষ্টা ও  
 দর্শন রূপে ত্র্যাশ্বক ; আব বিষয়টা যখন দ্রষ্টা ভিন্ন অল্প কিছু হয়, যেমন  
 জাগ্রদবস্থায়, তখন চৈতন পদার্থটা দ্রষ্টা ও দর্শন ও দৃশ্যরূপে ত্র্যাশ্বক । ত্র্যাশ্বক  
 ও ত্র্যাশ্বক হইলেও যে একেরই ত্র্যাশ্বকতা ও ত্র্যাশ্বকতা, তাহা স্মরণ রাখিতে  
 হইবে ।

ক্রমশঃ ।

## স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ।

ইয়াকোহামা ।

১০ই জুলাই, ১৮৯৩ ।

প্রিয় আলাসিন্কা, বালাজী, জি জি ও অজ্ঞাত মাস্ত্রাজী বন্ধুগণ,—

আমাব গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্বদা খবর দেওয়া আমাব উচিত ছিল, আমি তাহা করি নাই, তজ্জন্ত আমায় ক্ষমা করিবো। এক্ষণ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ আমার ত কখন নানা জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া যোবা অভ্যাগ ছিল না। এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হইতেছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম স্বষ্টি !

বোম্বাই ছাড়িয়া এক সপ্তাহেব মধ্যে কলম্বো পৌঁছিলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দবে বহিল। এই সুযোগে আমি নামিয়া সহর দেখিতে গেলাম। গাড়ী কবিয়া কলম্বোর বাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেখানেকার মধ্যে কেবল বুদ্ধ ভগবানের মন্দিরটীক কথা আমার স্মরণ আছে; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মহানির্ঝরণ মূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় অবস্থিত আছে। আমি মন্দিরের পুৰোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অল্প কোন ভাষা জানেন না বলিয়া আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। এখান হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যে অবস্থিত কাণ্ডি সহর সিংহলী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার তথায় বাইবাব সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই মংস্ত্রমাংসভোজী, কেবল পুৰোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মাস্ত্রাজীদেরই মত। তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হয়, উহা তোমাদের তামিলের অধরূপ।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগিল; উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটা ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। ইহা খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু অত্যন্ত সুনির্ধিত নগরীর জায় খুব পরিষ্কার স্বরিকার। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে ইহার বণিকুলের ভীতির কারণ বিখ্যাত জলদস্যু ছিল। কিন্তু এখনকার

অভেদ্য দুর্গপ্রাণ যুদ্ধপোতের কুন্তীরা মুকাবী কামানব চোটে মালয়বাসিগণকে অপেক্ষাকৃত কম হান্ধামাব কাষ করিতে বা ধা করিষাছে।

পিনাং হইতে সিঙ্গাপুর চলিলাম। পথে দুব হইতে উচ্চশৈলসম্মিত স্মারাজ্য দেখিতে পাইলাম; আব কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালের জলদস্যু-গণের কয়েকটা আড্ডা দেখাইতে লাগিলেন। সিঙ্গাপুর প্রণালী উপনিবেশেব রাজধানী। এখানে একটা সুন্দব উদ্ভিদুদ্যান আছে, তথায অনেকজাতীয় পাম (Palm) সংগৃহীত আছে। ভ্রমণকারীব পাম নামক সুন্দব তালরুস্তবৎ পাম এখানে অপৰ্যাপ্ত জন্মায়, আর “ব্রুটফল” (Bread-fruit) বৃক্ষ ত এখানে সৰ্বত্র। মাস্ত্রাজে যেমন আম অপৰ্যাপ্ত, বিখ্যাত ম্যান্গোস্টিনও এখানে তজপ অপৰ্যাপ্ত; তবে আম্রেব মত আব জিনিষ কি? এখানকাব লোকে মাস্ত্রাজী লোকের অর্ধেক কালও হবে না; তবে কাছাকাছি বটে। এখানে একটা সুন্দব চিত্রশালিকাও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পাটা অপৰ্যাপ্ত মাস্ত্রায় বিরাজমান, ইহাই এখানকার ইউরোপীয় ওপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দবেই জাহাজের প্রায় অর্ধেক লোক নামিয়া এইরূপ স্থানের অন্বেষণ কবে, যেখানে সুবা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজহ করে। থাক্ সে কথা।

তাহার পর হংকং। যদিও সিঙ্গাপুর, মালয় উপদ্বীপেব মধ্যবর্তী, তথাপি ঐ স্থানে আসিলে যেন মনে হয়, চীনে আসিযাছি। চীনের ভাব এখান হইতেই এত অধিক! সকল কার্য, সকল ব্যবসা বাণিজ্য বোধ হয় তাহা-দেবই হাতে। আর হংকংই আসল চীন। যাই জাহাজ কিনাবায নজব করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডান্ধাব লইয়া যাইবাব জন্ত তোমায বিবিধা ফেলিবে। এই নৌকাগুলি একটু নূতন রকমের—প্রত্যেকটাতে ২টা কবিধা হাল। মাঝিবা সপবিবাবে, নৌকায বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রীই হালে বসিয়া থাকে, একটা হাল দুই হাত দিয়া ও অপব হাল এক পা দিয়া চালায়। আব অনেক সময় দেখা যায়, তাহার একটা কচি ছেলে পিঠে এক প্রকাব নূতন রকমের থলিতে বাধা থাকে, যাহাতে সে হাত পা অনায়াসে খেলাইতে পারে। এ এক দেখতে বড় মজা। এদিকে চীনে থোকা মাঘের পিঠে বেশ শাস্তভাবে নড়ছে চড়ছে; ওদিকে মা কখন তার বত শক্তি সব প্রয়োগ করে, নৌকা চালাচ্ছেন, কখন ভাবী ভারী বোঝা তেঁজ-ছেন, অথবা অত্যন্ত তৎপরতার সহিত এক নৌকা থেকে অপর নৌকায

লাফিয়ে যাচ্ছেন। আর এত নৌকা ও ষ্ট্রিম লঞ্চার ভিড়, আর চীনে খোকার প্রতিমূর্ত্তে মাথাটা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোকার সে দিকে খেয়াল নাই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কৰ্ম্মজীবনের কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাকে মাকে তাকে ছুঁ এক থানা পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার আলোচনা কবেই সম্ভব।

চীনে খোকা একটা বীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কার্য্য কবিতো যায়। সে বিশেষ রূপেই অভাবের দর্শন শিখিয়েছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতা-সোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দরিদ্রের অতি দাবিদ্র্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহাব প্রাত্যহিক অভাবই তাহাব সময়েব এতদূর ব্যাপ্ত কবিয়া বাধে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবাব অবসর দেয় না।

হংকং অতি সুন্দর সহর। উহা পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্মিত; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে, উহা সহর অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে বাতাসে ট্রাম গিয়াছে। উহা বাষ্পীয় বলে চলে আর পাড়ীগুলি তাবের দড়ি দ্বারা সংযুক্ত।

• আমবা হংকঙে তিন দিন বহিলাম। তথা হইতে ক্যান্টন দেখিতে গিয়াছিলাম; হংকং হইতে একটা নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে ৮০ মাইল বাইলে ক্যান্টনে যাওয়া যায়। নদীটা এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত বাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যান্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমবা বৈকালে একটা জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যান্টনে পহুছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নোকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেনে দিচ্ছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিবে যাবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রয়েছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলি হুতলা তেতলা বাড়ীস্বরূপ—চাবিদিকে বাগাণ্ডা রয়েছে—মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে কিন্তু সব জলে ভাসছে!!

আমবা যেখানে নাবলাম, সেই জাহাজটুকু চীন গবর্ণমেন্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দিকে, নদীর উভয় পাশে অনেক মাইল ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মনুষ্য

বাস কবিতোছে, জীবনসংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা। কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্মপ্রবণতা যতই হউক, আমি ইহাব মত ময়লা সহব দেখি নাই। তবে ভাবতবর্ষের কোন সহবকে যে হিসাবে আবর্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসাবে বলিতেছি না—চীনেরা ত একবিন্দু ধূলি পর্য্যন্ত রূখা নষ্ট হইতে দেখ না—সে হিসাবে নয়, চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই আমি বলছি—তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন গ্নান করবে না। প্রত্যেক বাড়ীখানি এক একখানি দোকান—লোকেরা উপবতলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সূক যে, বাতাস দিয়ে চলতে গেলেই দুধাবের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চলতে না চলতে মাংসের দোকান দেখতে পাবে; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর বিড়ালের মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গবীবেবাই কুকুর বিড়াল খায়!

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখন দেখতে পায় না, চীন মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সামনে বেবোব। ইহাদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটা স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট ছেলের পায়েব চেয়ে ছোট; তারা হেঁটে বেড়াতে ঠিক বলা যায় না; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ থপ কোরে চলেছে।

আমি কতক গুলি চীন মন্দির দেখিতে গেলাম। ক্যান্টনের মধ্যে যে সর্কাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটা আছে, তাহা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট্ এবং সর্কপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্ত্তি, তাঁহাব নীচেই সম্রাট্ বসিয়াছেন—আব দুধারে শিষ্যগণের মূর্ত্তি—সব মূর্ত্তি গুলিই কাষ্ঠ হইতে সুন্দর রূপে খোদিত।

ক্যান্টন হইতে আমি হংকঙে ফিরিলাম। তথা হইতে জাপানে গেলাম।

নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্ত আমাদের জাহাজ লাগলো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্ত জাহাজ হইতে নামিয়া সহরের মধ্যে গাড়ী করিয়া বেড়াইলাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহানের অন্ততম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি সব চওড়া, শিখা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো।

ইহাদের খাঁচার মত ছোট ছোট দিবি বাড়ীগুলি, প্রায় প্রতি সহস্র ও পরীষ পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু বৃক্ষে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড় গুলি, বেঁটে, স্মরকায়, অদ্ভুতবেশধারী জাপগণ—তাদের প্রত্যেক চালচলন, ভাবভঙ্গী সবই স্মরক। জাপান “সৌন্দর্য্য”ভূমি। প্রত্যেক বাড়ীষ পশ্চাতেই এক একখানি বাগান আছে—জাপানী ফ্যাশনে স্মরকভাবে প্রস্তুত। ছোট ছোট গুহা, তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয়, ছোট ছোট পাথরের সাঁকো, এই সমুদয় দিয়া তাহার বাগানখানি উত্তমরূপে সজ্জিত।

নাগাসাকি হইতে কোবিতে গেলাম।

কোবি গিবা জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়াকোহামায় আসিলাম—জাপানের মধ্যবর্তী প্রদেশসমূহ দেখিবার জন্য। আমি জাপানের মধ্য-প্রদেশে তিনটা বড় বড় সহর দেখিয়াছি। ওসাকা—এখানে নানাশিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিযোটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিয়ো—বর্তমান রাজধানী। টোকিয়ো কলিকাতার প্রায় দ্বিগুণ বড় হইবে। লোকসংখ্যা প্রায় কলিকাতার দ্বিগুণ।

বৈদেশিককে ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না।

দেখিয়া বোধ হয়, জাপানীরা বর্তমান কালে কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। উহাদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনীযন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। উহাদের যে কামান আছে, তাহা উহাদেরই একজন কর্মচারী আবিষ্কার করিয়াছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের বলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করে। আমি একজন জাপানী স্থপতিনির্মিত এক মাইল লম্বা একটা স্রুঙ্গ (funnel) দেখিয়াছি।

ইহাদের দেশলাইএর কারখানা এক দেখ্‌বাব জিনিষ। ইহাদের যে কোন জিনিষের অভাব, তাই নিজের দেশে কর্‌বাব চেষ্টা করে। জাপানীদের—নিজদের একটা জিয়ার লাইন আছে—চীন ও জাপানের মধ্যে ইহাদের জাহাজ যাতায়াত করে। আর ইহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়াকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাইবে, মতলব করিতেছে।

আমি ইহাদের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত-

গণের অন্ন লোকেই সংস্কৃত বুলে। কিন্তু ইহাবা বেশ বুদ্ধিমান। বর্তমানকালে সর্বত্রই যে একটা উন্নতির জ্ঞান প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুৰোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ কোবে বলতে পারি না। তবে এই-টুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেবা দলে দলে প্রতি বৎসব চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্দপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্ররাজ্যস্বরূপ।

আব তোমবা কি কোচো? সারা জীবন কেবল বাজে বোচ্চো। এস, এদেব দেখে যাও, তার পর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ নুকোও গে। ভারতের যেন জবা-জীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমবতি ধবেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইবে গেলে তোমাদের জাত যায়। এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারেব বোবা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধবে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার কোবে শক্তিকর কোরছে। পৌরোহিত্যরূপ আত্মশক্তির গভীর ঘূর্ণিতে ঘূরপাক খাচ্ছে! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি। আব তোমবা এখন কোবছোই বা কি। আত্মশক্তি, তোমবা বই হাতে কোবে সমুদ্রের ধাবে পাই-চারি কোবছো। ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বেব এককণামাত্র—তাও খাটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা কমাগত আওড়াচো আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০ টাকার কেবাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে না হয় খুব জোব একটা ছুট উকিল হবার মতলব কোরছে। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্বোচ্চ ছবাকাজ্ঞা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে পাশে এক পাল ছেলে—তাঁব বংশধরগণ—বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও কোবে উচ্চ চীৎকার তুলেছে।।। বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?

এস, মাঝুষ হও। প্রথমে ছুট প্রকৃত গুলোকে দূর কোরে দাও। কারণ, এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন ভাল কথা শুনে না—তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তাবও কখন প্রসাব হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মাঝুষ হও। নিজেদের সন্ধীর্ণ গর্ভ থেকে বেবিযে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সবজাতি কেমন

উন্নতিপথে চলেছে ! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো ? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো ? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্ত, উন্নত হবার জন্ত, প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়োনা—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁড়ক ; পেছনে চেয়োনা, সামনে এগিয়ে যাও ।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান । মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয় । প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়নরহিত সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্ত ইংরেজ গবর্ণমেন্টকে প্রেরণ করেছেন আর মাস্ত্রাজের লোকই ইংরাজদের ভারতে বসবার প্রথম সহায় হন । এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবাব জন্ত সর্বাস্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন কববার জন্তে মাস্ত্রাজ কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত ?—যাবা দবিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্তি মুখে অন্ন প্রদান কববে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণের অত্যাচাবে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ কববার জন্ত আমরণ চেষ্টা করবে ?

\* \* আমাদের কুককোম্পানি, চিকাগো, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবে ।

তোমাদের—ইত্যাদি

বিবেকানন্দ

পুঃ—ধীব, নিস্তরু অথচ দৃঢ়ভাবে কাষ কবিতে হইবে । খবরের কাগজে ছড়ক কবা নব । সর্বদা মনে বাধ্বে, নামঘণ আমাদের উদ্দেশ্য নয় ।

বি—

## গীতা ।

( শ্রীকৃষ্ণকেশ দ্বিজলাল । )

গীতার এখন বড় সমাদর । ধনীর গৃহেও গীতা, নিধনীর গৃহেও গীতা ; ধনী, নিধনী সকলেই এখন গীতার আদর করিয়া থাকেন । যিনি পণ্ডিত, তাঁহাব ত কথাই নাই ; যিনি অপণ্ডিত, তিনিও গীতার গভীর তত্ত্বগুলি লইয়া বাদান্তবাদ করিতে বিরত হন না । তাই বলিতেছি, গীতার এখন বড় সমাদর । কেহ বলেন, গীতা কর্মপ্রধান ; কেহ বলেন, গীতা ভক্তিপ্রধান, কেহ বা “জানই গীতার চরম উদ্দেশ্য” এই কথা বলিয়া জ্ঞানের দুয়নী প্রশংসা



করিয়া থাকেন। আমরাও অন্য গীতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে অগ্রসর হইয়াছি দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আমরা কৰ্ম্মের কিম্বা ভক্তি-ব কিম্বা জ্ঞানের প্রাধান্ত স্থাপনে অভিলাষী এবং বাদানুবাদ করাই আমাদের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। আমরা জিজ্ঞাসু এবং শিক্ষার্থী স্মরণ্য পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে প্রকৃত শিক্ষালাভ করাই আমাদের অভিপ্রায়। এক বিষয় লইয়া পণ্ডিতদিগকে বিতণ্ডা করিতে দেখিলে এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শ্রবণ করিলে, জিজ্ঞাসুদিগের সন্দেহ নিবাকৃত হওয়া দ্রুবে থাকুক, বরং সংশয়-জালে হৃদয় আরও অতিভূত হইয়া পড়ে।

কেহ বলেন, গীতা কৰ্ম্মত্যাগ করিতে বলেন নাই, কারণ, গীতা কৰ্ম্মত্যাগ করিতে বলিলে গীতোক্ত উপদেশ শ্রবণ কবিয়া অৰ্জুন কখনও যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বারবার বলিয়াছেন, কৰ্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগই অধিকতর প্রশস্ত। স্মরণ্য কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করাই গীতার উদ্দেশ্য, কৰ্ম্মত্যাগ গীতার উদ্দেশ্য নহে।

যাঁহারা এইরূপে কৰ্ম্মের প্রাধান্ত স্থাপনে অভিলাষী, তাঁহাদিগকে আমরা বলি, “শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন” এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে চীংকার করিয়া নাচিলে চলিবে কেন? শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ ভাবে কিরূপ কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, তাহাই অগ্রে বুঝিয়া দেখা কর্তব্য। গীতা কৰ্ম্মত্যাগ করিতে বলেন নাই বলিয়া কেবল ষষ্ঠী মার্কেণ্ডেয়, শীতলামনসা, শনি শুক্রাদির পূজাকেই একমাত্র কৰ্ম্ম বলিয়া কোথাও উপদেশ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কেবল ব্রহ্মগোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি প্রতিমার্চন করিলেই কৰ্ম্মযোগের চূড়ান্ত অন্নুষ্ঠান হইল, এরূপ আভাস কোথাও দেন নাই। অহঙ্কারপরিপূর্ণ ধনৈর্ধর্য্যমন্ত মন্ত্ৰবোয়র কথা দূরে থাকুক, যিনি স্মৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রেন্ধনচিন্তায় অশস্তবুদ্ধি, বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া দিবারাত্র অর্ধের জল লালোষিত, এবং কিরূপে জীপুত্রাদির ভবণপোষণ করিব এই চিন্তায় মুহ্যমান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিও “গীতা কৰ্ম্ম করিতে বলিয়াছেন” বলিয়া স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অগ্নাধিক বেতনের কৰ্ম্ম করা এবং কৰ্ম্ম করিয়া গৃহে আসিয়া “ভবী শ্যামা শিখরিম্বশনা পঙ্কবিম্বাধরোজী”দিগের মুখাবলোকন, কিম্বা দু'এক বার চণ্ডীপাঠ এবং হৃদশব্দার গায়ত্রীজপ অথবা একটু সন্ধ্যা আত্মিক কিম্বা দুই একবার “ঐতৎসং” “হরি হরি” ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা গীতোক্ত কৰ্ম্ম নহে,

গীতোক্ত কৰ্ম অতিমহৎ। যিনি গীতোক্ত কৰ্মের প্রকৃত অনুষ্ঠানকারী, তিনি সকলের পূজনীয়, তিনি সকলের নমস্কৃত। গীতোক্ত কৰ্মের বিশাল মূর্তি আমাদের নয়নপথে স্বেচ্ছা পতিত হইয়াছে, এক্ষণে আমরা ধৰ্মসাধ্য তাহাই অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিব।

ধাঁহারা বলেন, গীতা কোন বৈষ্ণব কবি কর্তৃক মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, ধাঁহাদিগের বিশ্বাস, বুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে গীতোক্ত ধর্মের উপদেশ দেন নাই, তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। যেরূপ রামায়ণ হইতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণকে পৃথক করিলে রামায়ণ অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, সেইরূপ মহাভারত হইতে গীতাকে পৃথক করিলে মহাভারতেরও উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বেদব্যাস যখন মহাভারত প্রকৃত করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, “ভগবন্, আমি এক পরম শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি,” এবং সেই কাব্যে কি কি বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা বলিবার সময় যখন সর্বশেষে বলিলেন, “যচ্চাপি সর্বগং বস্তু তচ্ছৈব প্রতিপাদিতং” অর্থাৎ যাহা সর্বগ বস্তু, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন গীতাকে মহাভারত হইতে পৃথক করিলে বেদব্যাসের উদ্দেশ্য যে অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে, তাহা সুবী ব্যক্তি মাঝেই বুঝিতে সক্ষম। কারণ, গীতায় ঈশ্বরতত্ত্ব যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, মহাভারতের আর কোথায়ও সেরূপ সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই। বাস্তবিকই, মহাভারতরূপ বিশাল শরীরের গীতাই অস্থিস্বরূপ।

অৰ্জুন যখন কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, একদিকে বিশাল পাণ্ডবসৈন্য এবং অপরদিকে অসংখ্য কুরুসৈন্য যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যখন দেখিলেন, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, পূজনীয় কৃপাচার্য্য সকলেই এই মহাসমরে প্রাণবিসর্জন করিতে আগমন করিয়াছেন, এবং কেবল কি তাঁহারাই? প্রাণের অধিক প্রিয়তর অভিমুখ্য, প্রেমাশ্রিত ভ্রাতৃগণ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, জাতি কুটুম্ব, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজস্ববর্গ সকলেই, এই কালসমরে প্রাণ বিসর্জন করিতে রুতসংকল্প, তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হস্ত হইতে গাতীব ধনু খসিয়া পড়িল, তিনি স্নেহাভিকৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, “আমি কিরূপে এই যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব? শুক্ললোকদিগকে হত্যা করিয়া বিষয়ভোগ করা অপেক্ষা বরং ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ। অতএব হে মহাপুংসব, এক্ষণে

আমার পক্ষে বাহা মঙ্গলজনক, তাহাই বল, আমি তোমার অনুগত শিষ্য স্মৃত-  
রাং আমাকে উপদেশ-প্রদান কর ।” অর্জুনের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ  
করিয়া এবং তাহার দুর্বল চিত্তেব পরিচয় পাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেব মুখ হইতে  
যে অমৃতময় বাক্য নির্গত হইল, তাহা কর্ণের সাব, জ্ঞানেব জ্ঞান এবং  
ভক্তিরও চরম সীমা, তাহা অতুলনীয়, তাহাই অমৃত । গীতাব দ্বিতীয় অধ্যায়  
এই অমৃতময় বাক্যে পবিপূর্ণ । এক্ষণে আমবা সংক্ষেপে দ্বিতীয় অধ্যায়ের  
তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়া পশ্চাৎ গীতোক্ত কৰ্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে প্রবৃত্ত হইব ।

আত্মার নিত্যত্ব এবং সৰ্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদন করাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের  
উদ্দেশ্য । সেইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিমোহিতচিত্ত অর্জুনকে বলিলেন,  
“তুমি মুখের জাঘ অশোচ্য বজ্রবাদকেব নিমিত্ত রথা কেন শোক প্রকাশ  
করিতেছ ? বাহা সং, তাহার কি কখনও অভাব হইয়া থাকে ? এবং বাহা  
অসং, তাহারই কি কখন আবির্ভাব হয় ? তুমি, আমি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ,  
সমস্ত রাজসুতবর্গ, আমরা সকলেই অবিনাশী, সকলেই নিত্য । তুমি পূর্বেও  
ছিলে, এখনও আছ, ভবিষ্যতেও থাকিবে, স্মৃতরাং তুমি নিত্য, তুমি হস্ত-  
পদাদিসম্বন্ধিত নামরূপবিশিষ্টে দেহ নহ । যদি দেহই হইতে, তাহা হইলে  
কখনও “আমার দেহ” ইত্যাদি সম্বন্ধস্থচক বাক্য ব্যবহার কবিতে না । অন্ত-  
এব তুমি দেহ হইতে পৃথক্ । তুমি যদি দেহই হইবে, তাহা হইলে মৃত দেহ  
অবশ্যই স্বেচ্ছামত গমনাগমন এবং কথোপকথন করিতে সক্ষম হইত, কিন্তু  
তাহা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন তুমি নিশ্চয়ই দেহাতিবিক্ত । শৈশব, কৌমার,  
যৌবন, বার্দ্ধক্য যেমন দেহের এক একটা অবস্থামাত্র, মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থা-  
ন্তর ব্যতীত আব কিছুই নয়, স্মৃতরাং এই উৎপত্তিবিনাশশীল দেহের  
নিমিত্ত কোন সুখী ব্যক্তি শোক কবিয়া থাকেন ? দেহ এক অবস্থা হইতে  
অবস্থান্তরে পরিণত হইলেও আত্মা ‘অপবিবর্তনীয় এবং অবিনাশী । আত্মাকে  
দেহী বলিয়া বোধ হইলেও স্বরূপতঃ ইহা অনন্ত এবং অপরিচ্ছিন্ন । এই  
আত্মাই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিরাছেন; স্মৃতবাং ইহা অনন্ত,  
অপরিমেয় এবং অব্যয় । বাহা অব্যয়, তাহাব কি কখনও বিনাশ হইয়া থাকে ?  
আত্মা চিৎস্বরূপ । এই অসীম চিৎসমুদ্রে অসংখ্য জলবিশ্বতুল্য এই বে  
জীবসত্ত্ব দৃষ্ট হইতেছে, ইহা/যনের ক্রীড়া ব্যতীত আব কিছুই নয় । মনই  
জন্ম গ্রহণ করে, মনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার মনই সত্তরুপে বদ্ধ হইয়া  
স্থব দুঃখে অভিভূত হইয়া থাকে । লোকে যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ

পূর্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করে, মনও সেইরূপ সজ্জিত বাসনাক্ষয়ের নিমিত্ত দেহ হইতে দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকে। বাম্পীৰ শকটে গমনকালীন পাৰ্শ্বস্থ অচল বস্ত্রও বেক্সপ সচল বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ চঞ্চল মন নানারূপ সঙ্কল্পজাল বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকিলে শাস্ত নির্বিকল্প আত্মাতে জগদ্ব্যবস্থার দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত পক্ষে মনই দেহ হইতে দেহান্তর পরিগ্রহ করিলেও, বোধ হয় যেন আত্মাই জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং আত্মাই যুত্মমুখে পতিত হইতেছে। আত্মা অনন্ত অধিতীয় এবং কলনারহিত হইলেও, তাহাকে তখন সাস্ত, নানা এবং দেহবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

মন সঙ্কল্পরহিত হইয়া প্রশান্ত হইলে, একমাত্র শাস্ত নির্বিকল্প আত্মাই বিদ্যমান রহিয়াছেন বলিয়া বোধ হব। তখনই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, এই নির্বিকল্প আত্মা অবিনাশী এবং অনন্ত। অনলও ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ুও ইহাকে গুচ্ছ করিতে পারে না, এবং অস্ত্র শস্ত্রও ইহাকে বিদীর্ণ করিতে অসমর্থ। যিনি এইরূপে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই গীতোক্ত কৰ্ম্মের প্রকৃত অধিকারী। তিনি কাহাকে হননও করেন না, কিম্বা কাহারও কর্তৃক হতও হন না। বাঁহাব সময়ে একাত্মবিজ্ঞান দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে, যিনি এই আত্মবিজ্ঞানরূপ সুদৃঢ় কবচ পরিধান কবিত্তে পাবিয়াছেন, সেই মহাত্মাই গীতোক্ত কৰ্ম্মের প্রকৃত অধিকারী, সেই মহাত্মাই গীতোক্ত কৰ্ম্ম কবিত্তে সক্ষম। আমাদের বহু, মধু, নিধু, বিধু যে কৰ্ম্ম কবিয়া থাকে, গীতোক্ত কৰ্ম্ম যদি সেইরূপ সহজসাধ্য কৰ্ম্ম হইত, তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জায শিষ্যের নিকট সেই কৰ্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতে এত অধিক সময় ক্ষেপণ করিতেন না। যিনি সমস্ত সংকল্প পরিত্যাগ পূর্বক বিগতস্পৃহ হইয়াছেন, যিনি কামনারহিত হইয়া প্রশান্ত সমুদ্রের জায স্থিরভাব অবলম্বন করিয়াছেন, সুখ দুঃখ নীতোচ্ছাদি বস্তুসমূহ বাঁহাকে সিচলিত করিতে পারে না, বাঁহার বুদ্ধি কেবলমাত্র ব্রহ্মবিষয়িনী, সেই আত্মতত্ত্ব, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই গীতোক্ত কৰ্ম্মের প্রকৃত অধিকারী। চিন্তাশূন্য করিবার নিমিত্ত যে কৰ্ম্ম, তাহা গীতোক্ত কৰ্ম্ম নহে। নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তাদি যে সমুদয় কৰ্ম্ম, তাহা গীতোক্ত কৰ্ম্ম নহে।

বাঁহারা বলেন, “অগ্রে কৰ্ম্ম, তৎপরে জ্ঞান, কৰ্ম্ম না করিলে জ্ঞান কোথা হইতে হইবে? সেই জগ্গই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৰ্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন”, আমাদের বিশ্বাস,—ভাঁহারা গীতোক্ত কৰ্ম্ম সম্যাকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, গীতোক্ত কৰ্ম্ম করিতে হইলে অগ্রে আত্মজ্ঞানেব প্রয়োজন।

যিনি আত্মবিজ্ঞানলাভ করিতে পাবেন নাই, তিনি কখনই গীতোক্ত কৰ্ম্ম করিতে সক্ষম হইবেন না। গীতোক্ত কৰ্ম্ম হইতে হইলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া আবশ্যক, এবং যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ কবিয়া বিদিতবেদা হইয়াছেন, কেবল তিনিই গীতোক্ত কৰ্ম্ম কবিত্তে সমর্থ।

এইজ্ঞানী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “যৎ সাংখ্যঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈবপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্নতি স পশ্নতি” ॥ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যে পদ লাভ করা যায়, কৰ্ম্মের দ্বারাও সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যিনি জ্ঞান এবং কৰ্ম্মকে এক বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। এখানে যোগের অর্থ সম্যক্ আত্মিক দান ধ্যান, দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি কৰ্ম্ম নয়। যোগ কি, তাহা ভগবান্ “যোগঃ কৰ্ম্মস্ব কৌশলং” এই মহাবাক্য দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কৰ্ম্মের কৌশলের নামই যোগ। এক্ষণে কৰ্ম্মের কৌশল কিপ্রকার, তাহাই আমরা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। দুইজনকে কাঁটাল খাইতে বলায় তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, তিনি হাতে ও মুখে তেল মাখিয়া কাঁটাল খাইলেন। এইরূপ কবায় তাহার হাতে ও মুখে আটা লাগিল না, অথচ কাঁটাল খাওয়ার যে স্বথ, তাহাও অক্ষুণ্ণ কবিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মুর্থ, সে কাঁটাল খাইতে যাইয়া হাতে ও মুখে এত অধিক আটা লাগাইল যে, কাঁটাল খাইয়া স্বথভোগ করা দূরে থাকুক, আটার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিল। এই সংসারও একটা কাঁটাল স্বরূপ। যিনি জ্ঞানী, তিনিই ইহা স্বথভোগ করেন, আর যে অজ্ঞানী, সে স্বথভোগ দূরের কথা, আনও বরং সংসারজ্বালে বদ্ধ হইয়া জুখভোগ কবিয়া থাকে।

যিনি জ্ঞানী, তিনি কি কৰ্ম্ম করেন না? তিনিও কৰ্ম্ম কবিয়া থাকেন, তিনিও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গৃহ অবস্থান করেন, তিনিও বিশাল রাজ্যবক্ষা এবং প্রজাবর্গকে পালন কবিয়া থাকেন। তিনি তত্ত্বদর্শী বলিয়া কৰ্ম্ম কবিবার কৌশল সম্যক্ রূপে অবগত আছেন, সেইজন্ত কৰ্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন না। কিন্তু যিনি অনাত্মদর্শী, তিনিই কেবল “আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভাই, আমার বোন, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র” এইরূপে আমার আমার চীৎকার কবিয়া থাকেন, তিনিই কেবল “কিসে আমার অর্থলাভ হইবে, কিসে আমি সুখে থাকিব, অদ্য আমার এই লাভ হইল, কল্য আমার এত লাভ হইবে, আমি ধনী, অমুক গবির, অদ্য আমি রাজা উপাধি পাইয়াছি, কল্য আমার মহারাজা উপাধি পাইব” এইরূপে নানা প্রকার স্বপ্নজালে অভিভূত হইয়া

কখনও সুখে, কখনও দুঃখে মুহুমান হইয়া কাল যাপন করিয়া থাকেন।  
 ষাঁহাব হৃদয় জ্ঞানানুরাগে কখনও আশোকিত হয় নাই, তিনিই কেবল  
 কামিনী কাঞ্চন বিষয় সম্পত্তির আশায় উধাও হইয়া চলিয়া থাকেন। মুহুর্তের  
 জগৎ আশ্রয়স্থ চিন্তা কবিরাব অবকাশ পান না। কিন্তু যিনি তত্ত্বদর্শী,  
 তিনি সংসারের কোন বিষয়েও অভিভূত হন না। তিনি বলেন, “সংসার,  
 তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনিযাছি। তুমি আব আমার কি করিবে ? এখন ত  
 তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি। এখন কেবল দেখিতেছি, প্রতি পবনগু,  
 প্রতি পত্র, প্রতি পুষ্প, প্রতিফল, আশ্রয়স্থ পর্দাস্ত সমস্তই এক পরমেশ্বর  
 কর্তৃক ব্যাপ্ত বহিরাছে, এখন দেখিতেছি,—

তদেবাগ্নিতদাদিতাত্তদ্বাস্তুত্ৰ চক্ষুমা ।

তদেব শুকং তদ্রূপ তদাপত্যং প্রজাপতিঃ ॥

তিনিই অনল, সূর্য্য, বায়ু, নিঃপতি,

তিনি পুত্র, তিনি ব্রহ্ম, জল, প্রজাপতি ।

( ষেতাশ্বতর উপনিষৎ )

যাহা কিছু দেখিতেছি, এ সমস্তই সেই পরমেশ্বর। সেই আশ্রয়স্থ যত্না  
 বাল্লি বলিয়া থাকেন, “আমার পিতাও নাই, আমার মাতাও নাই, আমার স্বামীও  
 নাই, আমার পুত্রও নাই। কারণ,

২৫ স্ত্রী ২৫ পুমানসি

২৫ কুমার উত না কুমারী ।

২৫ জীর্ণো দেওন বক্ষসি

জাতোভবসি বিম্বতোমুখঃ ॥

২৬ ১ঃ পতঙ্গো হরিহতা লোহিতাক্ষ-

শ্রুতিপাঠঃ পাতবঃ সমুদাঃ ।

অনাদিমম্বঃ বিভূয়েন বর্জ্জস

যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥

( ষেতাশ্বতর উপনিষৎ )

তুমিই পুরুষ, তুমিই রমণী,

কুমার, কুমারী তুমি ।

স্তবির হইয়া শব্দ দণ্ডবানি

শ্রবণ করিছ তুমি ॥

নানারূপ ধরি নানাবিধ নামে  
 বিশ্বরূপে ভবধর ।  
 লভিছ জনম মহিমা প্রকাশি'  
 যা কিছু তুমিই সব ॥  
 তুমিই ভ্রমর, তুমিই বিহঙ্গ,  
 তুমি ঋতু, কলধর ।  
 তুমিই সমুদ্র, অনাদি অনন্ত,  
 তুমি বিশ্ব চবাচব ॥

সেই ব্রহ্মবিৎ তখন বলিয়া থাকেন, যখন এ সমস্তই সেই চৈতন্য ব্যতীত  
 আর কিছুই নয়, তখন আমিও সেই চৈতন্যস্বরূপ । আমিও এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড  
 ব্যাপিয়া বিদ্যমান বহিয়াছি । অতএব

নাহং প্রাণসংজ্ঞো ন বা পঞ্চবাহুঃ  
 ন বা সপ্তধাতুর্গ বা পঞ্চকোষঃ ।  
 ন বাক্‌পাণিপাদোন চোপস্থপাদু-  
 শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥  
 অহং নির্ঝিকলো নিবাক্যবরূপঃ  
 বিভূর্বাপী সর্বত্র সর্বৈক্সিয়াণাং ।  
 ন মে বন্ধনং নৈব মুক্তির্গ তীতি-  
 শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥

( শঙ্করাচার্য্য )

নহি আমি প্রাণসংজ্ঞ, নহি পঞ্চবাহু,  
 সপ্তধাতু নহি আমি, নহি পঞ্চ কোষ,  
 উপস্থ অথবা বাক্য নহি পাদ পাদু,  
 আমি শুধু চিদানন্দ, আমি আভ্যন্তর ।  
 আমি নির্ঝিকল, মোর রূপ নিরাকার,  
 আমি বিভূ, আছি আমি ব্যাপি চরাচর,  
 নাহি বন্ধ, নাহি মুক্তি, কি ভয় আমার,  
 আমি শিব চিদানন্দ, আমি মহেশ্বর ।

এই একাত্তরবিজ্ঞানই কর্ম করিবার কৌশল । জ্ঞানার্থী হারা বাঁহাঙ্গ  
 সংকল্পজাল দগ্ধীভূত হইয়াছে, তিনিই কেবল অনাসক্ত ভাবে কর্ম করিতে

সমর্থ। কারণ, তিনি জানিয়াছেন যে, তিনি চৈতন্যব্রহ্মণ, তাঁহার পাণপুণ্য, ধর্মার্থ কিছুই নাই, তাঁহার বন্ধনও নাই, তাঁহার মুক্তিও নাই। তাঁহার কোন অভাব না থাকায়, তিনি স্বর্গপ্রদ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিম্বা সংকল্পমূলক নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম অথবা দুর্গোৎসব, কালীপূজা, শ্রুতি প্রতীমার্চনরূপ ছেলেখেলা করেন না। তাঁহার তখন করণীয় কিছুই থাকে না। তিনি কেবল সর্বদা আত্মতত্ত্বচিন্তা এবং বোধলিঙ্গেরই পূজা করিয়া থাকেন। তিনি অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক বা হর্ষ প্রকাশ করেন না কিম্বা অনাগত বিষয়েরও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি কেবল বর্তমানে যে কার্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাই অনাসক্ত ভাবে করিয়া যান। গীতোক্ত কর্ম করিতে হইলে অগ্রে এই জ্ঞানলাভের প্রয়োজন। এই একাত্মবিজ্ঞান লাভ করিলে কর্ম করিয়া সিদ্ধ হইতে হয় না। সেইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রথমে আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কামনা-রহিত ও মমতাবিহীন হইয়া অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক সংসারে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিতে সমর্থ।

( ক্রমশঃ )

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাবিত্রী। টাঙ্গাইল সাধন-সমিতি হইতে শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি, এ, কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রভূষণ লাহিড়ী, বি, এ, ১২নং বলরাম দেব ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য। ০ চারি আনা। ৪১ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

সাবিত্রী পুণ্যাকারের এক অপূর্ণ ছটি। বাতায়, কথকতায়, নাটকে, কাব্যে, বারত্রেতে, কতরূপে আমরা 'সাবিত্রীর' পূণ্যদর্শন লাভ করি, তবু যেম আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কারণ, সাবিত্রী হিন্দুধর্মবীর এক মহোচ্চ আদর্শ। আজ এই ক্ষুদ্রপুস্তিকার স্বামী দ্বীর কথোপকথনচ্ছলে সাবিত্রীচরিত্র আবেগময়ী ভাষায় বিস্তৃত দেখিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। সাবিত্রীচরিত্র ব্যতীত স্বামী-



জীতে তত্ত্ববিষয়ক আর যে সে কথোপকথন আছে, তাহাও অতিশয় মনোবম ও শিক্ষাপ্রদ। এখানি একখানি উৎকৃষ্ট দ্বীপাঠ্য পুস্তক।

পাণ্ডুবাস (নাট্যকাব্য) শ্রীকণ্ঠভূষণ কাব্যালঙ্কার প্রণীত। ৫৭নং, কলেজস্ট্রীট, বোস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ আনা।

বঙ্গীয় বাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলবিজয় অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচিত। ‘টেকিয়তে’ প্রকাশক লিখিয়াছেন,—

“তুলনায় সমালোচনা ব্যতীত বাস্তব ধারণা হয় না। বঙ্গের বিজয়কুমার লঙ্কায় যাহা কবিষাছিলেন, সদয়হৃদয় ইংবাজরাজ আজ আবার জাতীয় জীবনের উন্নতির নিমিত্ত তাহাই কবিত্তেছেন। যক্ষরক্ষ বাঙ্গালীর মূলে হিন্দু, মুসলমান, ইংবাজ বসাত, দেখিবে, আমরা কি উন্নত ছিলাম, কি অধোগতিয় লাভ কবিষাছি। আমাদেরই পিতৃপুরুষদিগের আসনে বসিয়া ‘পৃথিবীর একপ্রান্তবাসী স্তম্ভব সাগবপাবেই’ আমাদের উন্নতির জ্ঞাত কতই না সচেত। ‘ত্রিবিধ কুসুমের মালা গ্রথিত স্তম্ভব’ হিন্দু মুসলমান ইংবাজ জীবনের সহৃদয় সাধনে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া একই প্রেমেশপায় লুটাইতে সক্ষম হইতে কি পারি না ?” গ্রন্থকাব্যের উদ্দেশ্য মহৎ। তিনি সিংহলবাসীদিগকে যক্ষ রক্ষ নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত কবিষা উহাদিগকে হিন্দু মুসলমান এবং বিজ্ঞতা বাঙ্গালীকে ইংবাজ বলিয়া ধরিয়া লইতে অনুরোধ কবিত্তেছেন এবং যেমন বিজয়সিংহের স্বশাসনে বাঙ্গালী, যক্ষ ও বক্ষ পবম্পব সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ ইংবাজ, হিন্দু ও মুসলমানে পবম্পব সম্প্রীতির আশা করিত্তেছেন।

গ্রন্থকর্তার আদর্শ উচ্চ হইলেও তাঁহার বর্ণিত বিবরণ যে সত্য হইতে ক্ষতি দূরবর্তী, তাহা স্বামী বিবেকানন্দের বিলাতযাত্রীর পত্রের মিল্লোকৃত অংশ পাঠ কবিলেই প্রতীয়মান হইবে (উদ্বোধন, প্রথম বর্ষ, ৬১১ পৃঃ দেখ)। ‘একটা ছিল মহা ছুটু বাঙ্গালী বাঙাব ছেলে—বিজয়সিংহ বোলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কোবে নিজের মত আরও কতগুলি সঙ্গী জুটিয়ে, জাহাজ কবে ভেসে ভেসে লঙ্কানামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের আবাস। তাদের বংশধবেবা এক্ষণে ‘বেন্দা’ নামে বিখ্যাত। বুনো বাঙা বড় খাতিব কবে বাখলে, যেযে বে দিলে। কিছুদিন ভাল মানুষের মত বইল, তাব পর একদিন মাগেব সঙ্গে যুক্তি কবে, হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে, বুনো বাঙাকে সর্দাবগণ সহিত কতল কবে ফেলে। তাব পর বিজয়সিংহ হলেন রাজা।

ছুটু মিব এইখানেই বড় অস্ত হলেন না। তাবপর আর তাঁর বুনোর মেয়ে বাণী ভাল লাগলো না। তখন ভারতবর্ষ থেকে আবও লোকজন আব অনেক মেয়ে আনালেন। অমুবাধা বলে এক মেয়ে ত নিজে কল্লেন বিয়ে, আব সে বুনোব মেয়েকে জলাঞ্জলি দিলেন। সে জাতকে জাত নিপাত কর্তে লাগলেন। বেচারিবা প্রায় সব মারা গেল। কিছু অংশ ঝোড় জঙ্গলে আজও বাস কব্ছে। এই রকম করে লঙ্কার নাম হল সিংহল আর হল বাঙ্গালী বদ্মায়েসেব উপনিবেশ।”

যাহা হউক, গ্রন্থকাবের ভাব ও ভাষা অতি সুন্দর। নাটক হিসাবে গ্রন্থখানি উত্তম হইযাছে।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ৮ই আশ্বিন তারিখে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় গৃহে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ “কর্শ্বজীবনে বেদান্ত” বিষয়ে একটা সুন্দর বক্তৃতা করেন। স্বামী সত্যকাম Song of the Sanyasin নামক স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাটির আরম্ভি এবং বাবু পুলিন বিহাবী মিত্র আধ্যাত্মিক সঙ্গীত করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে প্রমোত্তব হয়। বিগত ১৫ই আশ্বিন সিংলা স্ট্রীটস্থ জনৈক ভদ্রলোকের গৃহে উক্ত সমিতির আর এক অধিবেশন হয়। তাহাতেও স্বামী সচ্চিদানন্দ ধর্মবিষয়ক আলোচনা করিয়াছিলেন।

অগষ্ট মাসের মধ্যভাগে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ মহোশুরেব বাঙালানী বাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইংরাজী ভাষায় (১) পবে কি হইবে? (২) খ্রীষ্ট কি বৈদান্তিক ছিলেন? এবং (৩) বেদান্ত আন্তিক না নাস্তিক? এই তিনটা বক্তৃতা করেন। এক্ষণে স্বামী আত্মানন্দ বাঙ্গালোরে থাকিয়া তিনটা ক্লাস করিতেছেন। মুদালিয়াবের বাঙ্গালায় একটা,

দেবংধন স্থলে একটা ও বিবেকানন্দ আশ্রমে একটা । পঞ্চদশী, গীতা প্রভৃতি অধ্যাপিত হইতেছে ।

মসলিপাটামের হিন্দুগণ “বিবেকানন্দ মন্দির” নামক একটা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন । তথায় ওস্কারের পূজা ও সপ্তাহে দুই দিবস গীতাপাঠ হয় । গত ২৭শে অগষ্ট এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তথাকার হিন্দু সাধারণ কর্তৃক আহূত হইয়া উক্ত দিবস ঐ প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করান । উক্ত স্বামী মসলিপটমে ইংবাজী ভাষায় দুইটা বক্তৃতা দেন ( ১ ) সত্য কি ? ( ২ ) সত্য উপলব্ধি কবিবার উপায় ।

স্বামী শিবানন্দের তত্ত্বাবধানে বারাণসীস্থ রামকৃষ্ণ অধৈত আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে । আশ্রমে বৎসরে গড়ে ২ জন কবিষা ব্রহ্মচারী বীতিমত সাধনভজন, পূজাপাঠ ইত্যাদি করিতেছেন । পাঠ্যবিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ, মহাভারত, গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি । এতদ্ব্যতীত এই আশ্রমের দ্বারা কাশীনিবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে দিন দিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে । গাঁহাবা ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার আদর কবেন, তাঁহাদের সকলেবই এই আশ্রমের স্থায়িত্বকল্পে সহায়তা করা উচিত । গাঁহারা এই আশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অথবা আশ্রমের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত পত্র লিখিতে বা সাহায্য পাঠাইতে পারেন ;—স্বামী শিবানন্দ, রামকৃষ্ণ অধৈত আশ্রম, খাজাজীব বাগান, লাক্ষা, বেনারস সিটি ।

অম্বরনাশিনী মার সন্তান আমরা সব ।  
আজি মহানবমীতে কর ‘জয় মা মা’  
বিজয়ার সজ্জাষণ প্রেমাগ্বেষ সমাপনে ।  
মিষ্টিমুখে বাহিরিব অশিবাসুরদলনে ॥

# শ্রীশ্রীরামানুজচরিত ।

বোডশ অধ্যায় ।

স্বামী বামরুক্ষানন্দ ।]

[ পূর্বপ্রকাশিতের পব ।

শ্রীব্রহ্মস্ব স্বীয় ঘাটে প্রত্যাবর্তন করিয়া যতিপুঙ্খব রামানুজ কিবদ্বিবস অবস্থান করিলেন । তৎকালে তদীয় শিষ্য কুবেশ তাঁহার নিকট হইতে চরম শ্লোকের \* রহস্যার্থ জানিবার জন্য তৎসূচ্য প্রকাশ করায় তিনি কহিলেন, “কুবেশ, মদীয় গুরু শ্রীগোষ্ঠপূর্ণ আমার আদেশ করিয়াছেন যে, যিনি একবৎসর কাল অভিমানলেশপবিশূণ্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও নিরতিশয় দাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুসেবায নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাকেই শোকার্ধ দান করিবে ; আব কাহাকেও নহে ।” সুতরাং, তুমি এক বৎসর কাল উক্ত প্রকারে যাপন কর, তৎপরে আমি তোমায় শোকার্ধ দান করিব ।” কুবেশ কহিলেন, “হে মহাত্মন, জীবন অত্যন্ত অস্থির । কিরূপে জানিব যে, আমার এখনও এক বৎসর কাল প্রাণ ধারণ করিতে হইবে ? অতএব যাহাতে শীঘ্র আমি মৃত্যুর্থে অধিকারী হই, সেইরূপ বিধান করুন ।” যতিবাক্ত তৎশ্রবণে কহিলেন, “শাস্ত্রে আছে, যিনি এক মাস অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহার বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল হয় । সুতরাং তুমি একমাস তিষ্কার দ্বারা জীবন অতিবাহিত কর, কাবণ, তিষ্কার গ্রহণ ও অনশন দুইই সমান ।” কুবেশ তদ্রূপ আচরণ করিয়া মাসান্তে শোকার্ধ লাভ করিলেন ।

তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য দাশবধিও চব্বিশশ্লোকের রহস্য জানিবার জন্য আবেদন করিলেন । তিনি তাঁহাকে \*কহিলেন, “বৎস, তুমি আমার আত্মীয় এবং সদ্ভাক্ষকুলোদ্ভব, সুতরাং তুমি গোষ্ঠপূর্ণের নিকট রহস্যার্থ জানিয়া লও, ইহাই আমার ইচ্ছা । আত্মীয় বলিয়া তোমার বহুদোষ থাকিলেও আমি দেখিতে পাইব না । সেই জন্য যাহা কহিলাম, তাহা কব ।” দাশবধি মহাপণ্ডিত ছিলেন, এবং বোধ হয় তাঁহার তজ্জ্ঞ কিছু

---

\* গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ “সর্ব্বদ্বন্দ্বান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং নাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা ভয়ঃ ॥”



অভিমানও ছিল, সেই হেতুই ষতিবাজ তাঁহাকে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট শ্লোকার্থ জানিভে আদেশ করিলেন।

দাশবধি বামামুজ্জব নিদেশামুসাবে গোষ্ঠিপূর্ণের নিকট গমন কবিলেন, কিন্তু ছব মাস কাল ক্রমাগত গতাযাত কবিলেও তিনি তাঁহাকে রূপা কবিলেন না। পরে একদিন অমুগ্রহ কবিয়া কহিলেন, “দাশবধে, তুমি আত্মীয় এবং পবম পণ্ডিত, ইহা আমি জানি, কিন্তু ইহা স্থিৰ জানিও, বিদ্যা, ধন ও সংকুলে জন্মলাভ কবিলে ক্ষুদ্রচিত্তেবই মদাধতা আইসে, সজ্জনের উচ্চ বিষয়গুলি দমেব কারণ হইয়া, দোষের পবিবৰ্ত্তে পরম সঙ্গণেব কারণ হয়। ইহা সবিশেষ জদয়জ্জম কবিয়া তুমি নিজ ংকব পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ কব। তিনিই তোমায শ্লোকার্থ দান কবিলেন।” এইরূপ উপদিশ্ট হইয়া দাশবধি অনতিবিলম্বে শ্রীবামামুজ্জ-সন্নিধানে গমন কবিয়া সকলই জ্ঞাপন কবিলেন। সেই সময় অন্তুলানাঙ্গী মহাপূর্ণেব কথা তথায় উপস্থিত হইয়া ষতিবাজকে এইরূপ নিবেদন কবিলেন, “দাতঃ, পিতা আমায তোমাৰ নিকট প্রেবণ কবিলেন। তাহাব কারণ সবিত্তাবে বলিতেছি, শ্রবণ কব। আমি অদাই স্বশ্রাগ্রহ হইতে আসিয়াছি। তথায় প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সাংযংকালে আমায বন্ধনার্থ সুদুববর্তী এক ব্রহ্ম হইতে জল আনয়ন কবিতে হয়। পথ দুর্গম ও ক্রু-শূন্য স্তম্ভবাংল্য ও শাবীকিক ক্রেশে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। একথা আমি গতকলা স্বশ্রাকে নিবেদন কবায, সহানুভূতি প্রকাশ করা দুবে ংকুক, বং নিবতিশয ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি কহিলেন, ‘বাপেব বাড়ি হইতে পাচক আনিতে পার নাই? আমাব এমন সংস্থান নাই যে, তোমাৰ জন্য এক চাকর বাখিয়া দি আব তুমি পায়েব উপব পা হিয়া থাক।’ ইহাতে মন বডই ক্ষুদ্র হইল এবং আমি কাদিতে কাদিতে পিতান নিকট চলিয়া আসিলাম ও সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি কহিলেন, “বংসে, তোমাৰ ধর্মব্রাতা বামামুজ্জব নিকট গমন কব। তিনি এই বিষয়ে হাহা উচিত হয়, তাহাই কবিলেন।’ তদমুসারে আমি তোমাৰ নিকট আগমন কবিয়াছি। এখন কি কর্তব্য হয় বল।”

শ্রীবামামুজ্জ ইহা শুনিয়া অন্তুলাকে কহিলেন, “ভগিনী, তুমি হুঃখ করিও না। আমাব নিকট একটি ব্লাঙ্কণ আছে, আমি তোমাৰ সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিতেছি। তিনিই ব্রহ্ম হইতে জল আনয়ন ও সমস্ত পাককার্য্য

সম্পন্ন করিবেন।” এই বলিয়া তিনি দাশবথির দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। গুরুর অভিপ্ৰাণ অবগত হইয়া তিনি সঙ্গীহে অন্তুলার অন্ত-বর্তী হইলেন এবং তাঁহার স্বকৃগৃহে গমন করতঃ অতি যত্নসহকাৰে ও ভক্তির সহিত পাচকের কৰ্ম করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইল। একদা কোনও বৈষ্ণব, শাস্ত্ৰেব একটি খোক লইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ঈহাদেব নিকট ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাঁহারা অতি আগ্রহেব সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন। দাশবথিও তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি খোকার্ণুনিয়া বুঝিলেন যে, ব্যাখ্যাকর্তা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং ঈহাবা শুনিতেছেন, উক্ত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস বরিলে তাঁহাদেব অমঙ্গল সম্ভাবনা। অতএব তিনি অৰ্ধের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইহাতে ব্যাখ্যাতা ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, “মূঢ়, ক্ষান্ত হও, কোথায় শৃগাল আব কোথায় স্বৰ্গ! কোথায় পাচক আব কোথায়ই বা শাস্ত্র! শাস্ত্ৰে তোমাব অধিকাব কি? পাক-শালায় গিয়া স্বীয় সামর্থ্য প্রকাশ কব।” মহাত্মা দাশবথি ইহাতে কিঞ্চিদ্ভ্রাত্ত ও ক্ষুণ্ণ না হইয়া ধীবভাবে আপনি ব্যাখ্যা কবিত্তে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা একপ ব্যাকবণসম্মত ও স্তুচাক বর্ণবিভাস দ্বাবা অমুগ্ধিত হইল যে, সকলে তচ্ছবণে মোহিত হইয়া গেলেন এবং ব্যাখ্যাতা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাব পাদস্পৰ্শ পূৰ্ব্বক ক্রমাপ্রার্থনা করিলেন ও কোতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা কবিলেন, “আপনাব জীব সুখীবরেব একপ দাসবৃত্তি কেন?” তিনি তাহাতে কহিলেন, “শ্রীকব আদেশ পালনার্থ তিনি পাচক হইয়াছেন। যখন তাঁহাব জানিলেন যে, তিনি যতিবাক্ত শ্রীরামানুজের দাশবথিনামা পবন পণ্ডিত শিষ্য, তখন তাঁহাবা দলবদ্ধ হইয়া শ্রীরামে উপনীত হইলেন ও যতিবাক্তকে কহিলেন, “হে প্রাতঃস্বৰ্ণীয় মহাত্মন, আপনাব উপযুক্ত শিষ্য মহানুভব দাশবথিকে আব পাককার্যে নিযুক্ত রাখা উচিত নহে। তাঁহার অঃমানেব লেশমারও নাই। তিনি সাক্ষাৎ পরমহংসব্রহ্মপ। অতএব আপনি আদেশ ককন, যেন আমরা তাঁহাকে বহুসম্মানসহকাৰে আপনাব শ্রীপাদমূলে আনয়ন কবিত্তে পারি।” যতিবাক্ত তাঁহাদেব কথা শুনিয়া পবন পবিত্র হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহাদেব সতিত গমন কবিয়া দাশবথিকে সত্ৰেহে আলিঙ্গনপূৰ্ব্বক আশীৰ্বাদ কবিলেন। পরে তাঁহাকে শ্রীদত্তে আনয়ন কবিয়া চবনখোকার্ণ প্রদান পূৰ্ব্বক চবিত্তাৰ্

কবিলেন। দশবর্ষি বৈষ্ণবসেবা দ্বারা কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি বৈষ্ণবদাস নামে বিখ্যাত।

ইহার পব শ্রীরামানুজ মহাপূর্ণের আদেশক্রমে শ্রীবরবঙ্গের নিকট হইতে তামিল প্রবন্ধ পুনর্বাণ পাঠ কবিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ, মালাধবনামা কোনও যামুন মুনিব শিষ্যকে লইয়া, এই ঘটনার পর বামানুজ সন্নিধানে আগমন পূর্বক কহিলেন, বৎস, ইনি মহাপণ্ডিত, অশ্বদাদিব গুরু যামুন মুনিব শিষ্য। ইনি “শঠারি স্কৃত্ত” বা শঠাবিচিত “সহস্রগীতি” নামক প্রবন্ধের অর্থ সবিশেষ অবগত আছেন। ইহঁাব নিকট হইতে তৎসমস্ত অধ্যয়ন কবিয়া কৃতকৃত্য হও। গুরুবাক্যানুসারে শ্রীমান্ যতিবাজ তদ্রূপ কবিলেন। একদা তিনি মালাধবের ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ না করিয়া আপনি নূতন রূপে ব্যাখ্যা করায় উক্ত পণ্ডিতবর শিষ্যেব এইরূপ আচরণকে ধৃষ্টতা মনে কবিয়া স্বগতে প্রস্থান কবিলেন। গোষ্ঠিপূর্ণ লোক-পবম্পরাক্রমে ইহা শুনিয়া মালাধবের নিকট গমন কবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সমগ্র সহস্রগীতির সম্যক্ অর্থ বামানুজ হৃদয়ঙ্গম কবিতো পারিষাছেন তো?” ইহাতে মালাধব যেক্রপ ঘটিয়াছে, নিবেদন কবিলেন। তচ্ছবণে গোষ্ঠিপূর্ণ কহিলেন, “ভ্রাতঃ, তুমি উ হাকে সামান্য মানব মনে কবিও না। শ্রীযামুনমুনিব জ্ঞানগতভাব উনি যেমত অবগত আছেন, তদ্রূপ তুমি বা আমি কেহই অব-গত নহি। সাক্ষাৎ বামানুজ লক্ষণই বামানুজ নাম গ্রহণ কবিয়া জীবহিত-চিকীর্ষাব অবতারণ হইয়াছেন। অতএব উনি যেক্রপ অর্থ কবেন, তাহা তুমি যামুন মুনিব মুখে না শুনিলেও, সাক্ষাৎ তন্মুখনিঃসৃত্ত বহুসংখ্যক ন্যায গ্রহণ কবিও।” গোষ্ঠিপূর্ণের বাক্যানুসারে মালাধব পুনর্বাণ শ্রীরামানুজ সন্নি-ধানে গিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যতিবাজ এক দিবস পুন-বাণ কোন শ্লোকের অর্থ কবায় মালাধব তাহাতে বিবস্ত্র না হইয়া মনো-যোগপূরক শ্রবণ কবতঃ পবম বিস্তিত হইলেন। শ্লোকের ভিতব যে এরূপ গভীর অর্থ আছে, তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি পবমানকে শ্রীরামানুজকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাব সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রণাম কবিলেন ও স্বীয় পুত্র সুলববাহকে তাঁহার শিষ্য কবিয়া দিলেন। এইরূপে যতি-বাজ মালাধবের নিকট হইতে সহস্রগীতি শিক্ষা কবিয়া, শ্রীবরবঙ্গের নিকট ধর্ম্মবহস্যা উপদেষ্ট হইতে কৃতজ্ঞদল হইলেন। দেবগানবিশাবদ বববঙ্গ বধন জীবজনাথ স্বামীব সম্মুখে গান ও নৃত্য করিয়া ক্লান্ত হইতেন, শ্রীরামানুজ সেই

সময় তাঁহার পাদসম্বাহনাদি কবিতা ক্লেশ অপনোদন এবং হরিদ্রাচূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেপন পূর্বক তদীয় শবীরবেদনা দূর কবিতেন। প্রতি বজ্রনীতে তাঁহার জন্ত স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আহাবার্থ প্রদান কবিতেন।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে শ্রীবরবঙ্গ তাঁহার উপর রূপাদৃষ্টিপাত করিলেন। পাদসম্বাহনকালে যতিবাজ্জকে তিনি কহিলেন, “বৎস, তুমি আমার সর্বশ্রম গ্রহণ মানসে যে আমার সেবা করিতেছ, ইহা আমি জানি। অদ্য আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আইস তোমায় আমি আমার হৃদয়তত্ত্ব নিবেদন কবি।” এই বলিয়া তিনি কহিলেন, “বৎস, বাহা কহিতেছি, ইহাই চরম পুরুষার্থ। গুরুবেব পবং ব্রহ্ম গুরুবেব পবং ধনম্। গুরুবেব পবং কামো গুরুবেব পবায়ণম্॥ গুরুবেব পবাবিদ্যা গুরুবেব পবাগতিঃ। বস্মান্ বহুপদেষ্ঠ্যাসৌ তস্মাদগুরুতবো গুরুঃ। উপাযশ্চাপূপেযশ্চ গুরুরেবেতি ভাবয় ॥ অর্থাৎ গুরুই পবব্রহ্ম, গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠধন, গুরুই সর্ববিধ কাম্য বস্তুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুরুই পবম আশ্রয়, গুরুই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ, গুরুই শ্রেষ্ঠা গতি। তিনিই সংসারসাগরে তোমার কর্ণধারস্বরূপ বলিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আব কেহই নাই। ভগবান্ লাভেব উপায়ও তিনি, এবং স্বয়ং ভগবান্ও তিনি।” এই বহুশ্রবণ কবিতা শ্রীরামানুজ আপনাকে কৃতার্থ মনে কবিলেন। তাঁহার মনের সমুদয় অভাব দূর হইয়া গেল। তিনি অবাগ্ন-সম্ভটকাম হইয়া যারপরনাই দর্শনীয় ও পরমানন্দময় হইলেন। “গদ্যজয়” নামক মহাগ্রন্থে তিনি নিজ হৃদয়ের সেই বিপুল আনন্দ কথঞ্চিৎ প্রকটিত করিলেন। তাঁহাকে সকলে সেই সময় হইতে সাক্ষাৎ শ্রীবঙ্গনাথস্বামী বলিয়া পূজা কবিতে লাগিলেন।

শ্রীবরবঙ্গ নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার এক প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, নাম শেট্টনম্বি। তিনি তাঁহাকে শ্রীরামানুজের শিষ্য করিয়া দিলেন। কাঙ্কি-পূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বরবঙ্গ এই পঞ্চ মহানুভব শ্রীধামুন মুনির অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। যতিরাজ ইহাদেব প্রত্যেকের নিকট শিক্ষালাভ কবিতা শ্রীধামুনাচার্য্যের দ্বিতীয় বিগ্রহ রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। কারণ, উক্ত মুনিবর আপনার পঞ্চশিষ্যে পঞ্চধংরূপে বর্তমান ছিলেন। এক্ষণে শ্রীরামানুজবিগ্রহে সেই পঞ্চধং একীভূত হওয়ায় মুনিবর তথায় পূর্ণাকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। যতিরাজের বিকৃতির আভিষ্যই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ। শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার



সহিত বাক্যলাপ করিবার শক্তি তাঁহার বিশেষরূপে ছিল এবং সংসার-দাবসন্তগুণকে শ্রীতগবৎপাদমূলে লইয়া পিয়া তাহাদের স্বাবতীষ হুঃখাপ-নোদনের শক্তিও তাঁহার তদনুরূপই ছিল, এই জ্ঞাত্য তাঁহাকে সকলে উত্তম-বিভূতিপতি কহিত । তাঁহার প্রীতিসমুদ্ভাসিত বদনকমল দর্শন করিলে চির-সন্তপ্তেরও সন্তাপ দুবে পলায়ন করিত ।

ক্রমঃ ১

## সামাজিক ছবি ।

( নং ২ ) \*

“গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধবিব,  
শঙ্কর কুণ্ডল পরি;  
যোগিনী ববেশে, যাব সেই দেশে,  
যথায় নিষ্ঠুর হরি ।

( প্রাণবধু লাগি আমি যোগিনী হব । ”

বে—লি টেসন প্র্যাটকবমে তৃতীয় শ্রেণী যাত্রীদেব অপেক্ষা কবিবার আড্ডায় বসিয়া একতাবাব সঙ্গে গাছিতেছিল একটি বৈষ্ণবী । গলাখানি সাধা, মিঠা । বয়স ত্রিশের কম নহে ; শ্রামবর্ণা, নাক খাঁদা, মুখ বাঙ্গলা পাঁচের মত, তবে বস্ত্রিন কাপড়, বসকলি আব ছোটো ভাসা ভাসা চোখে একটা ঢলঢলে মহা চতুর ভাব রূপের অভাব বড় বুকিতে দেব না । বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা । বৈষ্ণবী রেল হইতে নামিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখিয়া যেখানে কতকগুলি হিন্দুস্তানী স্ত্রীপুরুষ যানী, গাড়ির অপেক্ষায় ধসিয়াছিল, সেইখানে আপনাব পুঁটলিগুলি রাখিখ । বসিল এবং একতাবা বাজাইয়া গান ধরিল,—

“আমি মথুরা নগরে, প্রতি ঘবে ঘবে,  
খুঁজিব'যোগিনী হয়ে ;  
যদি মিলায় বিধি, মম গুণনিধি,  
বাধিব অঞ্চল দিয়ে ।

আপন বঁধুয়া, আপনি বাঁধিব,  
 রাশিতে কেবা পাবে ;  
 যদি রাখে কেউ, তাজিব এ জীউ,  
 নারী বধ দিব তাবে ।”

কষেকজন স্ত্রীপুরুষ বৈষ্ণবীক দিকে সবিস্ময় আসিল । বৈষ্ণবী খামিলে  
 একজন বলিল,

“বাস্তালীন হৈ, কলকতাসে আয়ি ?”

বৈষ্ণবী এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল, “এখানে বাস্তালী নাই নাকি ?” পরে  
 প্রশ্নকর্তাকে বলিল, “হাঁ, কলকতাসে আয়া, হিয়া সাধু বৈবাগী কাতা থাক্তা ?”

লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখস্থ বাস্তাব অপব পাঠে, ট্রেনের ঠিক  
 বিপরীত দিকে, একটি বাগানবাড়ি দেখাইয়া বলিল,

“ও বাঁহা নয়া মোকান্ন লাগ বহা হৈ, হঁয়া যাপ্ত ; ও ধবমশালা হৈ ।”

বৈষ্ণবী দাঁড়াইয়া সেদিকে দেখিল, পবে লোকটিকে বলিল, “হাম যেয়ে  
 যান্নহ হৈ, নেই পছানতা ; তোম হামকো সঙ্গ আকে দেখিবে দেও ।”

“চলো, অব বেলকো দেব হৈ”, বলিয়া লোকটি বৈষ্ণবীকে ধর্মশালায়  
 পঁহুছিয়া আসিল ।

বড় বাস্তাব উপবেই, একটি বৃহৎ কুয়া সম্মুখে, আম, কাঁটাল, পিয়ারা,  
 কলাগাছে ঠাসা, ফলগাছও যথেষ্ট, নুতন পাকা বাড়ী তৈয়ার হইতেছে, স্থানীয়  
 কোন ধনাঢ্য বৈষ্ণবের ধর্মশালা ।

বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কারিন্দা খাতাপত্র ফেলিয়া উঠিয়া আসিল, বলিল,—

“মাথি, আপ হিয়া ব্রহ্মনা চাতি হৈ ?”

“ব্রহ্মদেবের মধ্যে ত দেখছি সবে একটি দালানে ছাদ হয়েছে, আর সব  
 খোলা, থাকবে কোথায় ? এখানে নিকটে কোন বাস্তালী থাকে না ?”  
 বৈষ্ণবী কারিন্দাকে ভুনাইয়া ‘স্বগত’ বলিল ।

কারিন্দা বাস্তালী শব্দটি বুঝিয়া বলিল, “বাস্তালী নাব হৈ, যেবা মোকান্ন  
 কি পাস, আপ হঁয়া জানা চাতি হৈ ?”

“হাঁ বাপু, হাম মেয়ে মান্নহ হৈ, হিয়া কাতা থাকেগে । কেৎনা দুর হৈ ?”

“কৈ মাইল দুর হোগা । তো এসা কবো, হিয়া প্রসাদ পাও, ফেব কৈ  
 দো তিন বাজে মে ঘবকো বাওগী, তোমকো সাধ লেয়াওগী ।”

“বেশ, তাই থাকা ।”

ବୈଷ୍ଣବୀ ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟାଦି କବିତେ ଗେଲ । କ୍ରମେ ଆରଓ ତିନି ଜନ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ବାମାୟେ ସାଧୁ ଆସିଲ ଏବଂ ଅନତିବିଳମ୍ବେ ଅଧିଷ୍ଠାତାବ ଗୃହେ ପାକାଦି ସମ୍ପାନ୍ନ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଚକ ଧର୍ମଶାଳାୟ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ଓ ଅଭ୍ୟାସଦିଗେବ ଜନ୍ମ ପାକ କବିତେ ଆସିଲ । ଯଥାକ୍ଷେ ପାକକ୍ଷେପ ହଇବାର କିଛି ପୂର୍ବେ ତାରଓ ଏକଟି ଅତିଥି ଆସିଲେନ, ସନ୍ନାସୀ, ଦୀର୍ଘ କେଶ ଶୁଣ୍ଢ, ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ମୁର୍ତ୍ତି, ବୟସ ୩୫-୩୬, ମଲା ହଇତେ ପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଟି ଆଳଖାଲା ପବା, ପାସେ ଜୁତା, ମଞ୍ଜେ ଏକଥାନି କଞ୍ଚଳ ଓ ଏକଟି କମ୍ବୁଳ । କାବିନ୍ଦା ସନ୍ନାସୀକେ ଦେଖିଆଇ ମାଟ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରେମାୟ କରଲ ଏବଂ ଏକଥାନି ଖାଟିଆ ବାହିବ କରିଆ ବସିତେ ଦିଲ ।

ବୈଷ୍ଣବୀ କିରିଆ ଆସିଆ ଦେଖିଲ, କାବିନ୍ଦା ଦାଲାନେ ନିଜେର ମଞ୍ଜୁରେର କାଢେ ସନ୍ନାସୀକେ ଖାଟିଆତେ ବସାଇବାଢେ ଏବଂ କି ଭିକ୍ଷା କରିବେନ, ଛିଞ୍ଚାସା କବିତେଢେ ; ସନ୍ଦୋଧନ କରିତେଢେ, କଥନ ‘ପରମହଂସ ବାବା’ କଥନ ‘ମହାପୁରୁଷ’ ବଲିଆ । ବୈଷ୍ଣବୀ ଅନତିଦୂରବେ ବୁଦ୍ଧତଳେ ସେଥାନେ ଅଗ୍ର ସାଧୁବା ବସିଆଛିଲେନ, ସେହିଥାନେ ନିଜେର ଖୁଟିଲିଖୁଲି ବାଧିଆ ବସିଲ ଏବଂ ତାହାଦେବ ମଞ୍ଜେ ଆଧା ବାଞ୍ଚଲାୟ ଆଧା ହିନ୍ଦିତେ ଆଲାପ କରିତେ ଲାଗିଲ ଓ ଯଥୋ ଯଥୋ ଦାଲାନେବ ଦିକେ ଡିଅୁ ନିରୂପ କରିତେ ଲାଗିଲ । ବୈଷ୍ଣବୀ କାବିନ୍ଦାବ ନାନାବିଧ ଧର୍ମବିଷୟକ ପ୍ରେମ୍ନେର ଉତ୍ତରେ ସନ୍ନାସୀବ କୋମଳ ଓ ଶାନ୍ତିମାଧା ସ୍ବେ ସାବଗର୍ଭ ଓ ସବଳ କଥାଖୁଲି ଶୁନିତେ ପାହି-ତେଢିଲ, କିନ୍ତୁ ଏକବାରଓ ସନ୍ନାସୀବ ଚକ୍ଷୁ ଛୁଟାକେ ନିଜେବ ପ୍ରେତି ଆକୃଷ୍ଟ ଦେଖିତେ ପାହିଲ ନା । ବୈଷ୍ଣବୀ ଭାବିତେଢିଲ, “ଲୋକଟାର ଚେହାରା ଦେଖେ ବୋଧ ହସ, କୋନ ବଡ଼ ସ୍ବରେର ଢେଲେ, ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍ବୟ ଓ ବେଶ ଆଢେ ଦେଖିଛି, କିଛି ପେସେଢେ କି ? ଆଞ୍ଛା ଦେଖା ଯାକୁ ।” ବୈଷ୍ଣବୀ ଏକତାବା ଲଇଆ ଗାନ ଧରିଲ ।

“ବୈବାଗ-ଯୋଗ କଟିନ ଉଠୋ,

ହମ ନ କରବ ହୋ !

କୈସେ ତଜବ ଐଷୋ ଦେଶ,

ଜଟା ମୁକୁଟ “ଧବବ କେଶ,

ଅଙ୍ଗ ବିଭୂତି ଲାୟ ଜହର,

ଧାୟ ଯବବ ହୋ !

କୈସେ ଧରବ ଅଞ୍ଜଟୀର,

ମୃଗଛାଲା ଧବି ଶରୀବ,

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଞ୍ଜ ଛାଡ଼ି ଭୂଈୟା

କୈସେ ପବବ ହୋ !

যমুনা জল অতি গভীর,  
 তনমন নহি ধবত ধীর,  
 ক্লম্ব বিবহ লাগি বরুক  
 ডুবি মবব হো।  
 একতো দ্রবল গাত,  
 দুজ্রে লিখত বিবত বাত,  
 স্নব শ্যাম দবল বিনা  
 প্রাণ ত্যজব হো।”

কারিন্দা কথা বন্ধ কবিতা বৈষ্ণবী দিকে ফিরিয়া উগ্ৰীব হইয়া  
 উনিতে লাগিল এবং “মাযি বহত আচ্ছা গাতি হৈ” না বলিয়া থাকিতে  
 পারিল না। অল্প সাধুবা নানাপ্রকারে আপনাদেব সন্তোষ প্রকাশ  
 করিতে লাগিল, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য সত্ত্বেও বৈষ্ণবী পবমহংসটির দৃষ্টি  
 একবারও তাহার দিকে আসিতে দেখিল না।

ওদিকে ব্রাহ্মণ পাক শেষ করিয়া শালগ্রামের ভোগ দিয়া সকলকে  
 প্রসাদ পাইতে ডাকিল। একখানি রুপড়িও মধ্যে রাখাষব। চৌথার  
 সন্নিকটেই ছাই দিয়া গণ্ডি কাটিয়া পবমহংসকে বসাইল, এবং কিছু দূরে  
 অল্প অভ্যাগতদিগকে এক একটি গণ্ডিও ভিতব বসিতে দিল। কারিন্দা  
 পবমহংসের জন্য কিছু দহি ও ববফি আনাইয়াছিল। কাবিন্দাব বিশেষ  
 অনিচ্ছাসত্ত্বেও পবমহংস তাহা সকলকে ভাগ করিয়া দিতে বলিলেন।

আহারান্তে সকলে স্ব স্ব আসনে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।  
 বৈষ্ণবী দালানে উঠিল। কাবিন্দা জিজ্ঞাসা করিল, “ক্যা মাযি, কুছ  
 কাহোপি?”

বৈষ্ণবী বলিল, “সন্ন্যাসী ঠাকুর, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা  
 করতে পারি?”

সন্ন্যাসী খাটিয়ার উপর বসিয়াছিলেন, বৈষ্ণবীও প্রতি নির্ভয়, আশ্বাস-  
 পূর্ণ, ওহ শাহ দৃষ্টপাত কবিতা বলিলেন, “কহিয়ে মাযি, ক্যা আজ্ঞা হৈ?”

“আমি হিন্দিতে কথা কইতে পারিনি, বাঙ্গালায় বল্লে বুঝতে  
 পাব্বেন?”

“কহিবে।”

বৈষ্ণবী ভাবিল, লোকটি বাঙ্গালী নাকি? এবং কহিল, “হ্যাঁগা,

এই যে পৃথিবীতে সুখ আছে, যাব জন্মে মা ছেলে-অন্ত প্রাণ, যাব জন্মে পতি পত্নী পবম্পবেব কাছে বাঁধা, যাব জন্মে দাতা দান করে, তপস্বী তপস্যা কবে, ডাকাত মালুষ মাবে, বাদ শিকার ধোবে তাকে আধমাবা কোরে তার সঙ্গে খেলে ও গর্জন কবে, এসব ত মানসিক ও শারীরিক সুখ। এ ছাড়া অল্প কোন সুখ আছে ?”

“ইযে জো সুখ শরীর ও মনকি আপনে কথা, উযো বিষয় জন্ম অতএব পবাধীন হোনে সে সুখাভাস মাত্র হৈ, সুখ নহি হৈ। উযো কিসি সময় সুখরূপী হৈ, কতি দুঃখরূপী হৈ। উস্কো সুখ কথা নহি জা সত্তা হৈ। পবন্ত দুঃখকি নামান্তর মাত্র হৈ। সচ্চা সুখ মন ও শরীরসে মহি পায়া জা সত্তা হৈ। উযো আত্মাহিসে অনুভব হোতা। জব্ ইঞ্জিয়ঁ আউব মন অপনা নিকট বিষয়বস্তি ছোড কব্, উৎসর্গ আত্ম-গতি প্রাপ্ত হোকব্ শান্ত হোতেহৈ, তব্ সূর্য্যগ্রহণকালে আকাশমে ঘাসা তারকা দেখাই দেতি, এমাহি আনন্দময় আত্মা অপনা স্বরূপমে প্রকাশিত হোতা। তারকারাজি সদা আকাশমে মহত্ব হৈ, কেবল্ সূর্য্য কি জ্যোতিসে দেখাই নহি পড়তি, এমাহি আনন্দময় আত্মা সবজীবোকে সন্দেশমে সদা বিবাজিত হৈ, ইঞ্জিয়ঁ আউব মনকি মলিনতাকি কাবণ, মালুম নহি হোতা। ঐহি যথার্থ সুখস্বরূপ হৈ।”

“সন্ন্যাসী ঠাকুর, লিখটি গুছিয়ে ত বেশ বল্লেন। কিন্তু ইঞ্জিয় ও মনকে শান্ত করে যে সুখ অনুভব হয়, তাব প্রমাণ কি ? সে অবস্থাতে আব জড়াবস্থাতে ত প্রভেদ দেখি না। আব যদিই কোনপ্রকার সুখবোধ হয়, সে যে সূক্ষ্ম ভাববীণ সুখ নয়, তাই বা কে বল্লেন ?”

“আপকা আক্ষেপ সহি হোতি, অগব বে আনন্দরূপী আত্মা অনুভবসিদ্ধ বস্ত নহি হোতা। প্রামাণিক বস্তমে কল্পনাকা মৌকা নহি হোতি। বথা আপ কহি নহি সক্তি কি আম নাম ফল নহি হৈ, অগর হৈ তো কল হৈ, আউব মিঠা নহি হৈ, পরন্তু মিটিচসে তেজি হৈ।”

“বলি ঠাকুর, ভাবাব ত কল্পনা ভল। তুমি আর খেয়েছ কি ? না, পুঁপি পড়ে বলছ ?”

মুহূর্ত্তেকের জন্ম সন্ন্যাসী নির্বাক্ হইয়া বৈষ্ণবীণ প্রতি চাহিয়া বহিলেন, পরে বলিলেন, “আপকি বঙ্গদেশমে এক কহাবৎ হৈ না কি ‘আত্মক কি বর্ণিমাঝে জাহাজকি খববসে ক্যা মতলব ?’

কারিন্দা একমনে বৈষ্ণবী ও পরমহংসের কথোপকথন শুনিতেছিল। বৈষ্ণবীর কথা প্রায়ই বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু পরমহংসের উক্তর শুনিয়া বৈষ্ণবীর প্রশ্নের শুক্ল হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল এবং মনে মনে বৈষ্ণবীকে একটা কেহ ঠাওবাইতেছিল। কিন্তু বিষয়সংযোগজনিত অপর সুখের ন্যায় তাহার চিন্তামৎকাবজনক সুখ স্থায়ী হইল না, চকিতে নশ হইয়া গেল। কাবণ, পরমহংসের ‘কহাবৎ’ প্রশ্নে বৈষ্ণবীকে বাকশক্তি-রহিত, নিম্পদ ও ভ্রমিবদ্ধদৃষ্ট পুতলিকাব মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল।

পরমহংসও পুনর্বার নিজ শাস্ত্র অন্তর্মুখী ভাব অবলম্বন করিলেন। কারিন্দা অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বহিল। বৈষ্ণবীর ঘোর ভাঙ্গে না। গতক দেখিয়া কারিন্দা বলিল, “মাযি অব মে ঘবকো ষাওগাঁ, আপ ভি চলিলে।” বৈষ্ণবী নিঃশব্দে দালান হইতে নামিয়া গেল।

ডান হাতে একতারা, বাঁ কাঁধে পুঁটলি পাঁটলার ঝুলি, ধর্মশালা পাব না হতে হতে সিধা বাস্তাও খোলা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীর স্বাভাবিক চিন্তাতাবলা, প্রগল্ভতা, ক্ষুণ্ণিত্তি প্রকৃতি ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথ নিজেব পোটেক্ট হিন্দিতে কারিন্দার নিকট তাহার প্রতিবেশী বাঙ্গালী বাবু ঘবেব থবব লইতে লাগিল।

উচ্চৈঃস্ববে “চাক বাবু মোকান্বে হৈ,” বলিয়া কারিন্দা একটি বিনুজি সক গলিতে একখানি পুতান দোতারা বাটাব সম্মুখে দাঁড়াইল। দানী বারান্দায় দেখা দিয়া বলিল, “বাবুজি অভি দপ্তবসে আয়া নহি।”

“দেগোতো, মাযিজিকো কহো কি এক বাঙ্গালীন মাযি আযি হৈ, আপসে ভেট করনা চাতি হৈ,” কারিন্দা বৈষ্ণবীকে দেখাইয়া কহিল।

দানী ভিতবে চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে সদর দরজা খুলিয়া বৈষ্ণবীকে বাটাব ভিতব আসিতে বলিল। কারিন্দা বৈষ্ণবীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বাটীর ভিতব ঢুকিয়াই বৈষ্ণবী উচ্চরবে বলিল, “জয় রাধে, কোথায় গিরিমা?”

একটি শ্রবীণা বিধবা (তাঁহার আচল ধরিয়া একটি ছোট মেয়ে) আসিয়া বৈষ্ণবীকে অন্তর্ধান কবিয়া একটি ঘরে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা থেকে এসেছ গা?”

“এখন ইন্টিশনেব কাছে ধর্মশালা থেকে আসছি, সফালে বেল থেকে নেবেছি। ধর্মশালায় থাকবার জায়গা নেই দেখে সবকারকে জিজ্ঞাসা কব্তে সে তোমাদেব কথা বল্ল, আব এখানে পঁছছে দিলে। সরকার মানুষটি বেশ বাপু।”

“তা বেশ কবেছ, এখানে এসেছ। বাত্রে কি খেয়ে থাক ?” এমন সময় শিক্সস্তান ফ্রোডে একটি যুবতী আসিল। প্রবীণা তাহাকে বলিলেন, “বৌমা, তুমি এই বটুমদেব মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা কও, আমি চাকর কটি করিগে” এবং বৈষ্ণবীর প্রতি “ই্যাগা বাছা, তুমি রাত্রে কি খেয়ে থাক ?”

“মা, আমরা ভিখারি, বা পাই তাই খাই, তোমবা যা দেবে, তাই খাব।”

“আমবা কায়স্ত, আমাদের হেঁসেল খাবে, না, নিজে বাঁধবে ?”

“তোমাদেব হেঁসেলেই হবে।” বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল। প্রবীণা চলিয়া গেলেন।

“তোমাদেব বাড়ী কোথায় ?” বৌ জিজ্ঞাসা করিল।

“এখন যেখানে থাকি, আগে ছিল কল্‌কাতায়।”

“তোমবা—আপনাবা ?”

“এখন বৈষ্ণব। আমি কুলীন কায়স্থেব মেয়ে।”

“ই্যাগা, তোমাব বিবাহ হয়েছিল ? তুমি বৈষ্ণব হলে কেন ?”

“সে অনেক কথা। এখন বল, তোমাদেব বাড়ী কোথা ?”

“আমাব শগুৰবাড়ী ও বাপেব বাড়ী কল্‌কাতারই নিকটে। এখানে আমাব স্বামীব চাকরি উপলক্ষে থাকা।”

“চাক বাবু কত মাতিনে পান ?”

“ষাট টাকা।”

“ই্যাগা, তুমি এমন কাহিল কেন ? তোমাব ছেলে মেয়ে কুটিই বেগা দেখছি। এখানে এমন জল হাওয়া ভাল। কোন অসুখ আছে নাকি ? না, দেশেব বেগ যা, অল্প বয়সে সন্তান হওয়া, তোমাদেবও তাই ?

বৌ সলজ্জ ভাবে বলিল, “না, এমন কোন অসুখ নেই, তবে অল্প বয়সে যা হয়েছি বটে।”

“আহা দেখ দেখি বোন, এমন সুখের জীবন, সুখের বরকরা, অল্প

বয়সে বিয়ের জন্ত সবই যেন এককলসী দ্রুপে এক নোঁটা চোনা পড়াব মত হয়েছিল। তোমার শরীর খানি যেন কচি বাঁশে ঘুন ধবেছে। ছেলে মেয়ে দুটি যেন অপুকটু বশেখি বাচ্ছ।। আজ লিভর, কাল পীনে, পবণ পেটের ব্যামো, ভাবনায ভাবনায হাড় কালি। না আছে রাত্রে ঘুম, না হয় দিনে খাওয়া। ভেবে দেখ দেখি, বয়সে সন্তান হলে, কি সুখের হোতো—” বহির্ভাবে শব্দ হইল, “কেওয়াড খোল দেও।” বৌ ডাকিল, “গন্ধাকি মায়ি, বাবু আয়া, কেওয়াড খোল দেও।” দাসী গিয়া দবজা খুলিয়া দিল; চাক বাবু উপরে গেলেন। বৌ বৈষ্ণবীর কাছে বিদায় লইল, “এখন আসি, আবার আসবো।” দাসী বৈষ্ণবীর ঘবে আলো লইয়া আসিল এবং তাহার শয্যা করিয়া দিল।

বৌ চাক বাবুর খাবার উপরে লইয়া গেলে, প্রবীণা বৈষ্ণবীর ঘবে তাহাকে খাবার আনিয়া দিলেন, কিছু বিলম্বে স্বামীকে খাওয়াইয়া বৌ বৈষ্ণবীর কাছে আসিল এবং প্রবীণাকে বলিল, “পিসীমা, তুমি যাও, আত্মিক কবগে, আমি এখানে বসছি।” প্রবীণা চলিয়া গেলেন।

বৈষ্ণবী বলিল, “উনি তোমার পিস্মাউডি, আমি ভেবেছিলাম তোমার শাওডি।”

“না, আমার শাওডি একটি পাঁচ বছরের ছেলে ও একটি দুমাসের মেয়ে বেখে মাঝা ঘান। পিসীমা কড়ে বাঁড়, ভাইয়ের বাড়ীতেই থাকতেন, ভাইয়ের ঘরের গিন্নি হয়ে ছেলে মেয়ে দুটি মানুষ করেন। উনিই আমাদের সংসারের লক্ষী।”

“বটে, তোমার নন্দ আছে?”

“হ্যাঁ।”

“কোথায় বিবাহ হয়েছে?”

“তার বিবাহ হয়নি।”

“বিবাহ হয়নি! কেন?”

“সে অনেক কথা, অল্প এক সময় বলবো। এখন আসি। পিসীমা এই ঘরেই এসে শোবেন।”

বৈষ্ণবী ভাবিল, “মন নয়, হয়ত কোন ইতিহাস আছে!”

পরদিন প্রাতে চাক বাবু বৈষ্ণবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কত দিন এই বেশ নিয়েছেন?”



“প্রায় সাত বৎসব হ'ল।”

“আপনাদের আশ্রয় কোথায়?”

“আমি কোন আশ্রয় নই, এমনি ঘূবে বেড়াই।”

“আপনা আপনিই এই আশ্রয় নিয়েছেন?”

“হুঁ।”

“বটে। আপনাকে পূজাশ্রমেব কথা কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি?”

“তা জেনে আব কি হবে? এখন বাধাক্ষক বলে পথে দাঁড়িয়েছি।  
ঝড়ের পাতার মত এখানে ওখানে ঘাই, এই আমার জীবন।”

“আপনি লেখাপড়া জানেন?”

“জানি।”

“এলেশে এসেছেন, যাবার উদ্দেশ্য কোথায়?”

“বঙ্গীনাথ যাব।”

“এখানে কিছুদিন থাকুন না।”

“আপনাবা রাখেন ত থাকবো।”

“বেশ; আপনাব যত দিন ইচ্ছা থাকুন।” এই বলিয়া চাক বাবু  
জানাদি করিতে গেলেন।

চাক বাবু আপিসে চলিয়া গেলে, যে সময় বৈষ্ণবী মান করিতেছিল, চাক  
বাবুর চার বৎসরের মেয়ে সুহাসিনী বৈষ্ণবীর একতারা লইয়া পিসীমার  
কাছে উপস্থিত। পিসীমা বামালসহিত চোবকে বৈষ্ণবীর কাছে আনি-  
লেন। বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, “বৈষ্ণবী হবে? এস রসকলি পরিয়ে দি।”  
পিসীমা বলিলেন, “সুহাস তোমাব কাছে গান শুন্তে চায়।”

বৈষ্ণবী একতারা লইয়া গাহিতে বসিল।

“রাধা নামের হাট বসেছে, তাই এসেছি শুনে,

( ঘবে মন কি মানে )

আনার বাধা মস্তেব উপাসনা স্থির হতে পারিনে।

রাধা নামেব কি মাদুরী, ভুলিল যত পুরুষ নারী,

তার চলেছে সব সারি সারি হরি সংকীর্ণনে।

( প্রথমে শ্রীরাধে বলে )

রাধা নামে পাতক কাটে, নিতাই বিলাচ্ছেন প্রেম হাটে মাটে,

আবার যে পেলে সে নিলে লুটে, অধম চণ্ডাল জনে।

বৈষ্ণবী কোকিল কণ্ঠ্য শুনিয়া পার্শ্বের তুতিন বাড়ীর মেঘেবা আসিল।  
পিসীমা ও বৌ ত বিস্মিত ও মোহিত। আগন্তুকদের হিন্দুস্তানী দেখিয়া  
বৈষ্ণবী আবাক্ত ধবিল।

“মেবে গিবিশ্বর গোপাল হুসরো ন কোই,

জাকে শিব মোব মুকুট মেবো পতি সোঠ।

আঁখিবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বেল বোই,

অবতো বাত ফৈল গই জানে সব কোই।

সাপুন সঙ্গ নৈঠি বৈঠি লোক লাজ থোই,

দধিমধ স্নাত কাচ লীন ছাচ পিবে কোই।

ছোড দই কুলকী লাজ কা কবেগা কোই,

দাস মীবা শরণ আই হোণী হোসো হোই ॥

বৈষ্ণবী ধামিলে বৌ বলিল, “পিসী মা, কাল সরলাকে গান শুনতে  
ডাকলে হয়।”

পিসী। “বেশ ত”।

বৈষ্ণবী বলিল, “নিকটে বাঙ্গালী আব কেউ আছে নাকি?”

বৌ। নিকটে এক ঘর আছে। সমস্ত বে—লি সহরে অনেক বাঙ্গালী  
আছে।”

সেই দিন আহাবাস্তে বৈষ্ণবী বৌকে একলা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,  
“একটী মেয়েকে বারান্দাবের ভিতর পুকুতে দেখলুম, ওটী তোমার ননদ নাকি?”

“হ্যাঁ। ও বড় লাজুক, নূতনলোকের সন্মুখে বেকতে পারে না।”

“তা ওঁর বে হয়নি কেন?”

“ওর বের সন্ধান কব্বে আব টাকা যোগাড় কব্বে বয়স অনেক হয়ে  
গিয়েছিল—প্রায় বোল বছর। কিছু গহন ও টাকা কম দেবার কথাতে তারা  
বর তুলে দিলে যে, ওর স্বভাব খাবাপ হয়ে গিয়েছে। শেষে এমন মুস্তিল  
হলো! ওকে নিদেশে পাঠিয়ে দিতে হল, কিন্তু কোন ক্রমেই কোথাও  
নিবাহের স্থির করতে পারা গেল না। যেখানে কথাবার্তা হয়, শত্রুরা উড়ে  
চিঠি বা অস্ত্র কোন উপায়ে বদনাম বাটবে দিয়ে সম্বন্ধ ভাঙিয়ে দেয়। এই  
রকমে ৪৫ বছর হতে আমার ননদ একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মব্বে গিয়ে-  
ছিল। কি ভাগ্যে জানতে পাবা গিয়েছিল। না হলে মব্বেতো! তার  
পর থেকে বেব চেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া হল।”

“বটে, সেই পুরোণো কাহিনী। পুরুষে যা ইচ্ছে করুক, কোন দোষ নেই, মেয়ের নামে একটু সন্দেহ ওঠাতে পাবলে হয়, তাহলেই সমাজ মেয়ের সন্ধান কববেন! কি হবে, আমাদের দেশে মেয়েদের পত্তন ঘোচেনি, তারা লেখা পড়া জানে না, ভীকর একশেষ, পুরুষের পাচাটা, কোন উপা-যই হবার জো নেই। মুখটি বুজিয়ে, পুরুষের সাম্নে সাধ দিয়ে যেতে হয়।

“তুমি কি বল, মেয়ে পুরুষ সমান?”

“অসমান কিসে? পুরুষের যে বক্তব্যসেব শবীব, মেয়ের কি তা নয়? পুরুষের যে ইচ্ছা, মন, মেয়ের কি তা নয়? পুরুষের যে ইচ্ছা, অভাব, সুখ, দুঃখ, আশ, সাধ, মেয়ের কি তা নয়? মেয়ের স্বভাব খারাপ হয়, পুরুষের ঘাবাই ত! কিন্তু দণ্ড পায় কে? মেয়ে। আর দণ্ডই বা কেমন? যাব-জীবন জীবন্তত্ব, সমাজের চূড়ান্ত ঘণা, যাব চেয়ে আর দণ্ড হতে পারে না!”

“মেয়ে গর্ভধাবিনী, সমস্ত বংশের কল্যাণ মেয়ের সতীত্বের উপর নির্ভর করে, তাই মেয়ের উপর এত কড়াকড়।”

“ও সব জুচ্চুবি কথা। মেয়ে পুরুষের সম্পত্তি, ক্রীতদাসী, ‘আমার জিনিসে আর কেউ হাত দিতে পারে না,’ পুরুষের এই ধারণা থেকে নিঃ-স্বার্থ উৎপত্তি হয়েছে যে, ‘স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অপরা পুরুষকে জানতে পারবে না।’ বংশের কল্যাণের জন্ত পুরুষের ঘটটা সতীত্বের দবকাব, মেয়ের তার বেশি নয়। পুরুষ আইনের কর্তা কি না, তাই নিজের কোলে ঝোল টেনে-ছেন। নিজের বেলা স্বেচ্ছাচার, মেয়েদের বেলা কড়াকড় নিয়ম। ন্যায়ের দিক থেকে হলে, মেয়ে পুরুষের একই নিয়ম হত। বোঝ না, পুরুষের বৈধব্য নেই, আশি বছরের বুড়ো পর্য্যন্ত দশবার বিয়ে করতে পারে, আর পাঁচ বছরের মেয়ে বিধবা হলে, তার আর বিয়ে হবার জো নাই! অবিচারের দৌড়টা একবার দেখ দেখি!”

“তুমি কি বল বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত?”

“উচিত নয়? বিধবারা কি অপবাদ কবেছে যে, যাবজীবন সংসারের সুখে বঞ্চিত থাকবে? পুরুষের কি অধিকার আছে যে, মেয়েদের জ্যান্তে মরা করে রাখে?”

“দেখ, সরলাও বলে, বিধবার বিয়ে হওয়া উচিত। সে বেশ লেখা পড়া জানে। মেম টিচার রেখে তার স্বামী তাকে ইংরেজি শিখিয়েছে। ছেলে পুত্র হয় নি। স্বামী বড় চাকরী করে, সংসারে বেশি কাজ কর

নেই, খুব পড়া শুনা করে। তার সঙ্গে তোমার আলাপ হলে বেশ হবে।  
আজ তাকে চিঠি দিয়েছি, কাল দুপুর বেলা আসবে।”

“সরলারা ব্রাহ্ম নাকি?”

“না। সরলার স্বামী দুর্গাদাস বাবু কোন ধর্মের ধার ধারেন না।  
তবে সরলাব মামা ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি সরলাকে মাহুষ করেন ও লেখা  
পড়া শেখান। দুর্গাদাস বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পাঁচ ছয়  
বছর পরে সরলাকে বে করেন। দুর্গাদাস বাবু এদিকে লোক মন্দ নন,  
তবে বেস্তা আছে, মদও খান। সরলার অল্প সব সুখ থাকলেও স্বামীর  
স্বভাবের জন্তে বড় মনকষ্ট।”

“মনকষ্ট কবলে কি হবে, আপনার সুখ কি কেউ ছাড়ে? তা থাক,  
এখন তোমার নন্দদেব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।”

“আমিকত বলছি, সে শোনে না। সরলার সঙ্গে তার খুব ভাব।  
সে যদি কাল আসে, জোর করে ধরে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।  
এখন বল, তোমাব বিয়ে হয়েছিল কি না, আর তুমি এমনই বা হয়েছে  
কেন?”

“নেহাণ্ড শুনে আমার কাহিনী, তবে ফুল মুটো করে বস। আমি  
ভরা যৌবনে বিধবা হয়ে একজন পুরুষের জন্ত পাপল হয়েছিলুম; সেও  
খুব ভালবাসা দেখিয়েছিল। পরে আমার বোকামির জন্ত বাড়ী থেকে  
বেরুতে হল আর কি! তার পর এই বৈষ্ণবী হয়েছি। এদেশ ও দেশ  
দুরি; নূতন জায়গা দেখি, নূতন মাহুষ দেখি, আপনার মনের স্বচ্ছন্দে  
থাকি।”

বৌয়ের চক্ষু তরিয়া জল আসিল। বৈষ্ণবী হাসিয়া উঠিল, এবং এক-  
ভায়া বাজাইয়া পান ধরিল।

“জামের নাগালি পেলুম নালা সই,

কি সুখে আর ধরে রই।

“আমি বনপোড়া হরিণের মত ইতি উতি চেয়ে রই।”

বউ উঠিয়া চলিয়া গেল।

## তিব্বতে তিন বৎসর ।

স্বামী অথগানন্দ । ]

[পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

ধরাবী গ্রামে আমি সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গ ত্যাগ কবিয়া একাকী প্রস্থান করিলাম বটে, কিন্তু সহজে তাঁহার অকপট ব্বেহ ও ভালবাসা ভুলিতে পারি নাই। পথে যাইতে যাইতে কেবল ব্রাহ্মণের কথা মনে হইতে লাগিল। আমি যখন ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইলাম, তখন তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, কেবল ছল-ছল নৈবে তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া বহিলেন। তাঁহার সেই সক্রিয় দৃষ্টি ও কাতর ভাব মনে করিয়া আমারও প্রাণটা কেমন কবিয়া উঠিল এবং এক একবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু কাহাবো ব্বেহ ও ব্বেদ মুক্ত হইলে পাছে আমি একাকী স্বাধীন ভাবে বিচরণ কবিতো না পাবি, এই ভাবিয়া আমার মনকে স্থির কবিয়া পুনরায় একাকী আমি যে পথে গঙ্গোত্রি গিয়াছিলাম, সেই পথেই নামিতে আবশ্য করিলাম।

গঙ্গোত্রি হইতে ৬ কৈদার যাইবার দুইটা পথ। ভটাবী হইতে বুঢ়া কৈদার ও ত্রিযুগীনাথায়ণ হইয়া আর একটা পথ উত্তরকানী হইতে গিয়াছে। গঙ্গোত্রির যাত্রীরা এই দুই পথেই ৬ কৈদার ও বদরীনাথায়ণ দর্শন করিতে যায়। আমাকেও ঐ পথেই যাইতে হইত, কিন্তু বিশেষ কাৰণ বশতঃ পুনরায় আমাকে টাইবীতেই নামিয়া আসিতে হইল। ৬ গঙ্গোত্রি যাইবার কালীন আমি টাইবীতে শুনিয়াছিলাম যে, টাইবী ও দেবপ্রয়াগের মধ্যবর্তী ঘোব বনাকীর্ণ অতি নির্জন প্রদেশে একটা উচ্চ পর্বতের শিখোভাগে দাক্ষা-যণী মতীৰ ২২পীঠের অত্যন্ত এক পীঠস্থানে চন্দ্রবদনী দেবী আছেন। ৬ চন্দ্রবদনী দেবীর কথা শুনিয়া অবধি মহামায়ার সেই পবিত্র স্থান দর্শন করিবার জন্ত আমার মন নিত্যন্ত উৎসুক হয়। ৬ কৈদার বদরী দর্শন করিয়া পুনরায় যদি আমি সেই অঞ্চলে আব আসিতে না পারি, তাহা হইলে আর আমার ভাগ্যে চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শনের সম্ভাবনা নাই, এই জ্ঞাই আমাকে পুনরায় টাইবী হইতে বিস্তর ঘুরিয়া ৬ কৈদার বদরীনাথায়ণের পথে যাইতে হইল। ৬ চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শন কবিয়া ৬ কৈদার বদরীনাথায়ণে পঁহুঁছিতে আমার যে সম্মত লাগিল, ভটাবী হইতে তাহার অর্ধেক সময়ে আমি ৬ বদ-বিক্রম যাত্রা কবিয়া ফিবিতে পাবিতাম।

যাহা হউক, আমি উত্তরকাশী হইতে যে পথে গঙ্গোত্রি গিয়াছিলাম, সেই পথেই আবার উত্তরকাশীতে আসিয়া পহঁছিলাম। এইবার উত্তরকাশীতে পহঁছিয়াই আমি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলাম। বোশ হয় যাহাকে Hill diarrhoea বলে, আমাবও তাহাই হইয়াছিল। হঠাৎ আমাব ভয়ঙ্কর ভেদ হইতে লাগিল। কোথায় যাই, কি কবি, ভাবিতে লাগিলাম। উত্তরকাশী একটি পবনতীর্থ। ৬কাশীশায়েব জায় উত্তরকাশীতেও সেই মণিকর্ণিকা, সেই বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির প্রভৃতি থাকায় যাত্রার সময় স্থানটী জনতায পূর্ণ হয়। হিমালয়ের বিজ্ঞান প্রদেশে উত্তরকাশী ববহাটকে একখানি গণ্ডগ্রাম বলা যাইতে পারে। বাবে বারে গ্রামেব বাহিবে ঘাওয়া অপেক্ষা আমি একেবারে উত্তরকাশী গ্রাম হইতে কিছুদূর গিয়া অতি নির্জন ভাগীর্থীতীরবর্তী একখানি প্রশস্ত শিলাব আশ্রয় লইলাম এবং সম্পূর্ণ রূপে বোগমুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামেব বাহিবে সেই লোক-সমাগমশূন্য স্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা কবিলাম। দুইদিবস যাবৎ আমাব যেকোন ভয়ঙ্কর ভেদ হইতে লাগিল, তাহাতে সেই স্থান পবিত্যাগ কবিয়া আমি আর গ্রামে আসিতে পারিলাম না। দুইদিন অবিরাম ভেদ হওয়ায় আমাব শরীর অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িল। প্রকৃত গ্রাম হইতে আমি গঙ্গাতীরে এমন একটি নির্জন স্থানে অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছিলাম যে, দুইদিনেব মধ্যে আমাব সহিত জনমানবেব সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু দুই দিন নির্জন বাসেব পব বোগমুক্ত হইয়া যেদিন আমি উত্তরকাশীগ্রামে যাইব মনে কবিয়াছি, সেই দিন প্রাতঃকালেই একটি মলিনবেশধারী পাহাড়ী সুপুরুষ আমাব নয়নগোচর হইল। দুইদিন পবে আমার সহিত মনুষ্যের এই প্রথম সাক্ষাৎ হইল। লোকটী আমাব নিকট আসিয়াই আমান সম্বন্ধে সকল কথা এমন তাপে জিজ্ঞাসা কবিত্তে লাগিল, যেন সে আমাব উপস্থিত বিপদের কথা জানিত্তে পারিযাই আমাকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্ত আসিয়াছে। উদরাময় বোগে আক্রান্ত হইয়া দুইদিন আমি সেই উন্মুক্ত মৌকলযশূ স্থানে একাকী কষ্ট পাইয়াছি শুনিয়া তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িত্তে লাগিল এবং সে কত দুঃখই কবিত্তে লাগিল। তাহার সরল, আন্তরিকতাময়, প্রীতিপূর্ণ আচরণে আমি মুগ্ধ হইলাম। ভাবিলাম কে এ, আমাব এই দুঃসময়ে আসিয়া আমান দুঃপে অকপট দুঃখ পকাশ কবিয়া আমাকে স্তুত কবিবার জন্ত এত চেষ্টা কবিত্তেছে। সে অনন্তায়

প্রকৃতই কাহারো সাহায্য ব্যতিরেকে আমার বিশেষ কষ্ট হইত, এবং সমস্ত সুস্থ হইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে আমার বিশেষ বিলম্ব ঘটিত।

আমিও ভাবিতেছিলাম যে, এই দুর্বল শরীরে আমি কাহার নিকট যাই, কে আমাকে একটু নেবুর রস দিয়া ছুটা ভাত দেয়। কি আশ্চর্য্য! আমাকে আব অধিকক্ষণ এ ভাবনা ভাবিতে হইল না। তাহাকে দেখিয়াই আমার সকল ভাবনা দূব হইল। তাহার পর সে আমাকে অতিশয় যত্নের সহিত তাহার কুটারে লইয়া গেল। গ্রামের এক প্রান্তে একখানি সামান্য কুটারে তাহার বাস। কুঁড়েখানিতে কয়েকটি মাটির ইঁড়ি কুঁড়ি ও ২১ খানি প্রস্তরখণ্ড ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমাকে পথ্য দিয়া সুস্থ করিবার জন্ত সে কিছুক্ষণ পরেই কোথা হইতে নেবু আনিয়া আমাকে অতি শীঘ্র চাবটা ভাত বাঁধিয়া খাওয়াইল। আমাকে সুস্থ করিবার জন্ত তাহার যত্নের সীমা ছিল না। আমাকে পথ্য দিয়া সে যে কতদূর আনন্দিত হইল, তাহা স্মরণ করিলেও আমার হৃদয় এক স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হয়। সেই সামান্য আড়ম্বল্য কুটারখানিতে না জানি আমার মত কত অসহায় বিপন্ন রে'গী পথ্য কনিষা গিয়াছে। সেই সামান্য কুটারের মহত্ত্ব ও পবিত্রতা আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম। সেই কুটারেব স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং সেই অদ্ভুত পুরুষের স্বাভাবিক উদারতা ও সপ্রেম ব্যবহাব আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আহা রেব জন্ত অস্ত্র কোন বাসন ছিল না, দুইখানি স্বভাব-জাত প্রস্তরখণ্ড ভোজনাধার, তাহাতেই আমরা দুই জনে পরমানন্দে ভোজন করিলাম।

যাহার জন্ত উত্তবকাশীর সেই সামান্য কুটার অতি পবিত্র স্থান বলিয়া আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে, সেই হৃদয়বান পার্শ্বতীয় পুরুষটি সম্বন্ধে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি যতদূর জানিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিলাম যে, উত্তবকাশীর জনসাধারণ সেই অদ্ভুত পুরুষের সহৃদয়তার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত নহে। সেখানকার সকলেই তাহাকে পাগল মনে করিত। উত্তবকাশীর নিকটবর্তী কোন গ্রামে তাহার আদি নিবাস। জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেখিতে সুপুরুষ, কেবল দেহের প্রতি যথোচিত যত্নের আত্যন্তিক অভাব। তাহার দিব্য দেহের বাহ্য মলিন দশাসত্ত্বেও তাহার স্বাভাবিক শ্রী ও দীপ্তি যেন কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। সদা হাস্তবদন, হঠাৎ দেখিলেই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে হইবে। সে যেন সহজে কাহাকেও ধরা দিতে

চাহে না বলিয়াই ঐক্যপাণলের ভান করিয়া থাকিত। যেহেতু সাধারণ লোকের কাছে স্থগিত হইবার ইচ্ছাই বেশ তাহার প্রবল। স্বয়ং ব্রাহ্মণ হইয়াও সে সকল জাতির সহিত আত্মীয়তা করিত এবং বিপদের সময় সকলেরই সেবা করিত। তাহার নিকট কোনো জাতিবিচার ছিল না বলিয়া তাহার স্বজাতিয়েরা তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে পাগল বলিয়া স্থগ্য করিত। আমি তাহার উন্নততায় কোনো চিন্তাই দেখিতে পাই নাই। আমার চক্ষে সে যেন ভয়াঙ্কান্বিত অগ্নির স্রাব প্রতীয়মান হইল। সাধারণের নিকট সে অসংলগ্ন প্রলাপবাক্য বলিয়া সময় সময় পাগলের ভান করিলেও আমার নিকট সে একটাও অসংলগ্ন কথা বলে নাই। বরং তাহার প্রত্যেক কথাই অতি সরল ও শিক্ষাগ্রন্থ বলিয়া আমার মনে হইল।

যাহা হউক, আমি সেই অদ্ভুত পাগলের সেবা গুপ্তবায় দুই তিন দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ বোধ করিলাম এবং আমার সেই আত্মগোপ্যশালারূপ কুটীর ধান সাধারণের চক্ষে অতি সামান্য ও তুচ্ছ হইলেও আমার চক্ষে তাহা অতি পবিত্র ও মহৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমার সেই অসহায় কন্ধ্যাবস্থার কথা কে তাহাকে শুনাইল? সেই জনমানবশূন্য স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার জীবনরক্ষার জন্ত কে তাহাকে এত কষ্টস্রীকার করিতে বলিল? কতদূর ব্যথার ব্যধী হইলে যে, সেই রূপে হঠাৎ একজন দুঃস্থ অপরিচিত ব্যক্তির সেবা করিয়া আনন্দিত হওয়া যায়, তাহা সাধারণ হৃদয় আছে, তিনি বুঝিতে পারিবেন, তন্নিম্ন অন্যের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। আমার বলিয়া নহে, অভ্যাগত পথিক যাদেরই সে সেবা করিতে ভালবাসিত, তাহার ভিক্ষার অধিকাংশ ভাগই সে এইরূপে অস্ত্রের সেবায় ব্যয় করিয়া স্বয়ং অতি অল্পমাত্র আহাব করিয়া জীবন ধারণ করিত। তাহাকে ভালবাসিয়া যে বাহা দিত, সে তাহাই খাইত। তাহার উদার প্রশান্ত চিত্তে অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না।

যাহা হউক, পরিশেষে আমার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সেই পাগলটী বড় সাধারণ পাগল নহে। এত বুদ্ধি, উদারতা ও প্রেম কি পাগলে সম্ভবে? নির্দ্বিকারচিত্তে যে জীবের সেবা করিয়া মহা আনন্দ অনুভব করে, তাহাকে পাগল বলিয়া সাধারণ উপহাস করেন, তাহার্য যে কি, তাহা আমি আশঙ্কিত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। সামান্য দয়িত্বের পূর্ণকূটরে যে আতিথেয়তা, উদারতা, যে মহাপ্রভুত্ব ও প্রেম প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার



তুলনা অতুল ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজ-প্রাসাদেও নাই। এখনো এই হতভাগ্য দেশের অতি সামান্য নিম্নতর কুটারে নীরবে প্রতাহ যে মহান পবিত্র কর্মের অমুষ্ঠান হইতেছে, তাহায় তুলনা কোথায়? ভ্রমণের সময় আমি বহুতর স্থানে ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ পাইয়াছি। ঐশ্বর্যের আগার ইন্দ্রতবনতুলা ধনীর ভোগবিলাসপূর্ণ উত্তম সৌধমালা দবিদ্রের শূন্য পর্ণকুটারের বিমল পুণ্যময় জ্যোতিতে চিরনিম্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। দবিদ্রের পর্ণকুটারে ঐশ্বর্যের কিছুই নাই সত্য, কিন্তু সেখানে হৃদয় আছে, হৃদয়ী বৃক্ষ বৃকিবাব ও তাহা দূর কবিবাব জন্য সবল প্রাণে চেঁচা কবিরার লোক আছে। হৃদয়বান দবিদ্রব্যক্তি তাঁহার জীর্ণপর্ণকুটারে ক্ষণেকের মধ্যে যে মহৎ পুণ্যামুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা যে, ধনীর ঐশ্বর্যগর্বে গর্হিত সুরহং অট্টালিকাতেও নাই, তাহা চিদপ্রসিদ্ধ। ভারতীয় আৰ্য্য পর্ণকুটারের অতুল মাহাত্ম্যে আমবা এখনো জীবিত বহিয়াছি।

প্রধাণের পর্ণকুটারে বহুফলমূল্যশী কোপীনধারী ভবদ্বাজ মুনি স্বীয় তপঃপ্রভাবে রামমাতা কৌশল্যা, রামামুজ ভবত, শত্রুঘ্ন ও অযোধ্যাবাসিগণের সংকারের জন্য এই মর্জ্যেই যে বিপুল স্বর্গীয় সুখ ও ঐশ্বর্যের অবতারণা করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রনিবাসী উৎকৃষ্টপরাযণ অনশনক্লিষ্ট দবিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটারে সামান্য শত্ৰুপ্রহরানে যে মহাযজ্ঞের অমুষ্ঠান হইয়াছিল, যে পবিত্র যজ্ঞ-ভূমিতে লুপ্তিকায নকুলের অর্জাজ দিব্য কাকনময় রূপ ধারণ করিয়াছিল, যে যজ্ঞের অতুল মহিমা মহাবাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকেও নিম্প্রভ করিয়াছিল, বজ্রাশনিসদৃশকণ্ঠে মহাবাজ যুধিষ্ঠিরের বিবট সভায় নকুল যে যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করিয়া সভাস্ত সকলকে স্তম্ভিত কবিয়াছিল, ভাবতভাগো এখনো সেই পুণ্য ও তপঃপ্রভাব বিলুপ্ত হই নাই। দবিদ্রের পর্ণকুটারমাহাত্ম্য এখনো ভারতকে সজীব রাখিয়াছে।

ক্রমশঃ ।

## সংবাদ ও মন্তব্য ।

স্বামী অণ্ডানন্দ তিঃরতে অজ্ঞাতভাবে ৩৪ বৎসর বাস কবিয়া যখন কাশ্মিরে উপস্থিত হন, তখন তথাকার ব্রিটিশ বেসিডেন্ট নিস্বেট সাহেব তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া তাঁহাব সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া লন। ফলেণ অফিস হইতে তাঁহাব সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইবার পর তাঁহাব সম্বন্ধে ব্রিটিশ

গভর্ণমেন্টের সকল সন্দেহ দূর হয় এবং ভারতগভর্ণমেন্ট তাঁহাকে তিক্ততাভিষানে পাঠাইবার সম্বল করিয়া বেনিডেক্সির ইউরোপীয় কর্ণচাবিগণ কর্তৃক তাঁহার নিকট ঐ কথা উত্থাপিত কবেন। নানা কারণে ঐ প্রস্তাবাহুবারী কার্য্য হয় নাই। যাহা হউক, গভর্ণমেন্টের বেকডপ্তরকে এখনও ইঁহাব ভ্রমণস্বাস্ত্য রক্ষিত আছে।

বিগত ১২ই কার্তিক বামকৃষ্ণ মিশনের আব একজন সন্ন্যাসী আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন। ইঁহার নাম স্বামী সক্তিদানন্দ। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। ইনি ভারতের নানাস্থানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা কবিয়াছিলেন এবং অনেক দিন যাবৎ উদ্বোধন ও প্রবুদ্ধ ভারতের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি কালিফোর্নিয়ায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের কার্য্যের সহায়তা কবিবেন।

বাল্মালোর বামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মানন্দ সম্প্রতি শ্রীরঙ্গপট্টম ও কোলাব নানক দুইস্থানে তিনটা বক্তৃতা করেন। ২টা বক্তৃতা ইংরাজীতে ও একটা হিন্দীতে হইয়াছিল।

উদ্বোধনের পাঠকবর্গ বাগবাজার বিবেকানন্দ সমিতির কথা অবগত আছেন। বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকটি বৃক স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পর দলবদ্ধ হইয়া স্বামীজির জীবনের আদর্শে জীবনগঠন ও নিঃস্বার্থ ভাবে লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিতে কৃতসম্বল হইলেন। তাঁহারা যে তাঁহাদের চেষ্টায় কি পরিমাণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা এই অঞ্চলের সকলেই অবগত আছেন। প্রতি বাড়ীতে ইাড়ি বাধিয়া সমিতির সভাপণ সপ্তাহে সপ্তাহে চাল সংগ্রহ করেন। এইরূপে প্রায় ১২।১০ মন চাল সংগৃহীত হয় ও প্রায় ৪০।২০ ঘর নিঃস্বতন্ত্র পরিবারকে এতদ্বারা সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত সমিতির অনাথ বিদ্যালয়ে প্রায় ১৩।১৪ জন বালক বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

বিগত ১৩ই কার্তিক ৪৬নং বোসপাড়া লেনে উক্ত সমিতির প্রথম সাধারণিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে প্রায় ৪০০ চার শত লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাবু পুলিন বিহারী মিত্র কয়েকটা ধর্ম্মবিষয়ক গান গাহিলে

সমিতির অনাধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জোহাদি আয়ত্তি করেন । সহকারী সম্পাদক মহাশয় কার্যবিবরণী পাঠ করিলে শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী তুচ্ছানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর এবং সভাপতি স্বামী সারদানন্দ মহাশয় সমিতির উদ্দেশ্য সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন । ৩২-পরে দি গ্রেট ইঞ্জিপসিয়ান ক্লাব আর্ট এণ্ড ভ্যারাইটি পার্টি কর্তৃক ম্যাজিক ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া সভাভঙ্গ হয় । সভাস্থলে বীরবাহী ও স্বামী বিবেকানন্দ নামক দুই খানি পুস্তিকা, শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত বিরচিত একটি কবিতা এবং স্বামীজীর হাকটোন ছবি বিতরিত হয় । পর দিবস রবিবার সমিতির অনাধবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হইয়াছিল ।

ভারতবর্ষীয় ডাকঘর সমূহের ডাইরেক্টর জেনারেল মহোদয় সর্বসাধারণের সুবিধার্থ ডাকঘরের মারফতে গবর্ণমেন্ট কাগজ ক্রয় বিক্রয় করিবার নিয়মাদি বিগত ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে অনেকাংশে শিথিল করিয়াছেন । এক্ষণে ঐ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষত কোনরূপ ফি বা কমিশন লাগিবে না, উহার সূদের উপর কোন ইনকম ট্যাক্স লওয়া হইবে না এবং সাবাসকেব পক্ষে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জমা রাখিতে পারা যাইবে । বিশেষ বিবরণ ডাকঘরে দরখাস্ত করিলে জানিতে পারিবেন ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২য় ভাগ পুস্তকাকারে অতি সুন্দর কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলাম । পুস্তকেব মূল্য বাধান ১১/০ । প্রকাশক শ্রীপ্রভাস চন্দ্র গুপ্ত, ১৩২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা ।

১৫ই কার্তিক ছুটি সওয়া হেতু ১লা অগ্রহায়ণ ১৯শ সংখ্যাক্রমে প্রকাশিত হইল । আগামী সপ্তমবর্ষে উদ্বোধনগ্রাহকগণকে স্বামী বিবেকানন্দের পত্ররূপ যে অমূল্য উপহার বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাত্রে দেওয়া যাইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ বিজ্ঞাপনের (ক) পৃষ্ঠায় দেখুন ।

না। তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি। আমার ঐশ্বরিক যোগসামর্থ্য অবলোকন কর। ৮।

ভাষ্য। কিন্তু ন তু যানিতি। ন তু মাং শক্যসে ন স্বকীয়েন চক্ষুযা মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুযা স্বকীয়েন চক্ষুযা যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্বিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুস্তেন পশ্য মে মম যোগ-মৈশ্বরং জৈশ্বস্য মমৈশ্বরং যোগং যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ। ৮।

ভাষ্যানুবাদ। ন তু মাং ইত্যাদি শ্রোকের অর্থ। কিন্তু “প্রাকৃত” স্বাভাবিক এই নিজ চক্ষু দ্বারা “বিশ্বরূপধর” বিশ্বরূপধারী আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না। যে দিব্যচক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে, আমি তোমাকে সেই দিব্যচক্ষু দিতেছি, তদ্বারা আমাব “ঐশ্বরযোগ” দেখ। জৈশ্বরস্বরূপ আমার মহান যোগশক্তির অতিশয় (অলৌকিক শক্তিসমূহ) দেখ।

সঙ্গয় উবাচ।

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।

দর্শয়ামাস পার্শ্বায় পবমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অর্থঃ। (হে) রাজন্, মহাযোগেশ্বরো হরিঃ এবম্ উক্তা ততঃ পার্শ্বায় পবমং ঐশ্ববং রূপং দর্শয়ামাস। ৯।

\* মূণানুবাদ। সঙ্গয় বলিলেন, হে রাজন্, সেই মহান ও যোগীদিগের গুরু হই এইরূপ বলিয়া তৎপরে অর্জুনকে পরম ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন। ৯।

ভাষ্য। এবং তং যথোক্তপ্রকারেণোক্তা ততোহনন্তরং রাজন্ দ্বতরাষ্ট্র মহাংশাসৌ যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরো হরিনারায়ণঃ দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ পার্শ্বায় পৃথাস্থতায় পরমং রূপং বিশ্বরূপমৈশ্বরং। ৯।

ভাষ্যানুবাদ। এইরূপে অর্থাৎ পূর্বে যেক্রপ বলা হইয়াছে, সেইভাবে বলিয়া তৎপরে হে “রাজন্” দ্বতরাষ্ট্র, “মহাযোগেশ্বর”—(ইনি) মহান ও (বটেন) এবং যোগেশ্বরও (যোগ অর্থে এখানে যোগী, তাঁহাদের জৈব অর্থাৎ প্রভু) (বটেন, এই অর্থে মহাযোগেশ্বর শব্দ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে) “হরি” নামাবল “পার্শ্বকে” পৃথাপুত্র (অর্জুনকে) পরম ঐশ্বররূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। ৯।

অনেকবস্ত্রনয়নমেকোদ্ধতদর্শনম্ ।

অনেকদিব্যাত্তবণং দিব্যানেকোদ্যাত্মম্ ॥ ১০ ॥

দ্বিবায়ালাস্ববধবং দিব্যগন্ধাহুলেপনম্ ।

সর্কীশ্চর্যাময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

অর্থঃ । ( কীদৃশং তৎ রূপং ? ) অনেকবস্ত্রনয়নং অনেকোদ্ধতদর্শনং অনেকদিব্যাত্তবণং দিব্যানেকোদ্যাত্মম্ দ্বিবায়ালাস্ববধবং দিব্যগন্ধাহুলেপনং সর্কীশ্চর্যাময়ং দেবং অনন্তং বিশ্বতোমুখং । ১০—১১ ।

মূলানুবাদ । ( কেমন রূপ দেখাইয়াছিলেন ? ) অনেকবদন ও নয়ন পবিপূর্ণ, বহু বিষয়কব দর্শন, অসংখ্য স্বর্গীয় আভরণ শোভিত ও অনেক অভূ-  
দাত দিব্য আয়ুর্গুণিচযে পবিশোভিত সেইদেহে দিব্য বস্ত্র ও মায়া বিদ্যমান  
ছিল, স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্য দ্বাৰা উহা অমূলিগ্ধ, জগতেব সকলপ্রকার বিশ্বযজ্ঞক বস্ত্র-  
নিচয় ঐ দেহে বিবাজ্র কবিতৈছিল । ঐ দেহ দীপ্তিশালী, উহা অনন্ত এণং  
বিশ্বতোমুখ । ১০—১১ ।

ভাষ্য । অনেকৈতি “অনেকবস্ত্রনয়নং” অনেকানি বস্ত্রাণি নয়নানি চ  
যস্মিন্ তৎ অনেকবস্ত্রনয়নম্ । “অনেকোদ্ধতদর্শনং” অনেকানি অদ্ধুতানি  
বিশ্রাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকোদ্ধতদর্শনং । তথা “অনেক-  
দিব্যাত্তবণং” অনেকানি দিব্যানি আভরণানি যস্মিন্ তদনেকদিব্যাত্তবণং ।  
তথা “দ্বিবায়েনেকোদ্যাত্মম্” দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুর্গুণানি যস্মিন্  
তৎ দিব্যানেকোদ্যাত্মম্ । দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । কিঞ্চ দ্বিবায়ালা-  
স্ববধবং দিব্যানি মালায়ানি পুষ্পাণি অঙ্কবাণি বস্ত্রাণি চ প্রযন্তে যেন ঈশ্ববেণ তৎ  
দ্বিবায়ালাস্ববধবং । “দ্বিবাগন্ধাহুলেপনম্” দিব্যং গন্ধাহুলেপনং যস্য তৎ দ্বিবা-  
গন্ধাহুলেপনং । “সর্কীশ্চর্যাময়ং” সর্কীশ্চর্যাপ্রাণং দেবং “অনন্তং” নাস্তান্তোহ-  
ন্তীত্যনন্তত্বং “বিশ্বতোমুখং” সর্বতোমুখং সর্বভূতান্দ্ৰাং দর্শয়ামাস অর্জুনো  
দদর্শ ইতি বা অধ্যাহ্রিতে । ১০—১১ ।

ভাষ্যানুবাদ । অনেক ইত্যাদি শ্লোকেব অর্থ । “অনেকবস্ত্রনয়ন” মুখ  
ও নয়ন যে দেহে অনেক, তাহাকে অনেকবস্ত্রনয়ন বলা যায় । “অনেকোদ্ধত-  
দর্শন” যে দেহে অনেক বিষয়জ্ঞক দর্শনীয় বস্ত্র বিদ্যমান আছে, তাহাকে  
অনেকোদ্ধতদর্শন বলা যায় । “অনেকদিব্যাত্তবণ” যে রূপে অনেক স্বর্গীয়  
অলঙ্কার আছে, তাহাকে অনেকদিব্যাত্তবণ বলা যায় । সেইরূপ “দ্বিবায়েন-  
৬১১ উদ্বোধন । [ ৬ষ্ঠ—১১ সংখ্যা ;

কোদ্যাতামুখ” অনেক দিব্য অস্ত্র যে দেহে সর্বদা উদ্যত কবিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাকে দিব্যানেকোদ্যাতামুখ বলা যায়। এই প্রকার রূপ “দেখাইয়াছিলেন” এই পূর্বশোকস্থ ক্রিয়ার সহিত অর্থ করিতে হইবে। আরও “দিব্যমালা-স্বরধব” যে ঈশ্বর দিব্য “মালা” পুষ্পবাশি ও “অম্বর” বস্ত্রনিচয় ধারণ কবিয়া থাকেন, তাঁহাকে দিব্যমালাস্বরধব বলা যায়। “দিব্যগন্ধানুলেপন” যাহাব গন্ধানুলেপনও স্বর্গীয়, তাঁহাকে দিব্যগন্ধানুলেপন বলা যায়। “সর্বাশ্চর্য্যময়” সকল প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থে পবিপূর্ণ “দেব” দীপ্তিময় “বিশ্বতোমুখ” অর্থ যে দেহে মুখ সকল দিকেই আছে, তাহাকে বিশ্বতোমুখ বলা যায়। তিনি যে কারণ সকল ভূতের আত্মা, এই কাবণে ( তিনি বিশ্বতোমুখ ) এই প্রকাররূপ “দেখাইয়াছিলেন” কিংবা অর্জুন এই প্রকার “দেখিয়াছিলেন” এই প্রকার ক্রিয়াব অধ্যাহাব কবিয়া ইহার অর্থ করিতে হইবে। ১০—১১।

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেৎ যুগপদ্ধৃতিত।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যান্তাস্তস্য মহাশ্বনঃ ॥১২॥

অর্থ্য। যদি দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উৎথিতা ভবেৎ তদা সা ভাঃ তস্য মহাশ্বনো ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ ১২।

মূলানুবাদ। যদি আকাশে এক সময়ে সহস্র সূর্য্যের প্রভা উৎথিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রভা সেই মহাশ্বার দেহেব প্রভাব সদৃশ হইতে পাবে ১২। ভাঃ। যা পুনর্ভগবতো দিব্যরূপস্য ভাস্তস্য উপমা উচ্যতে দিবি অন্তরীক্ষে তৃতীয়স্য বা দিবি সূর্য্যানাং সহস্রং সূর্য্যসহস্রং তস্য যুগপদ্ধৃতিতস্য বা যুগপদ্ধৃতিত ভাঃ সা যদি সদৃশী স্যাৎ তন্ত মহাশ্বনঃ বিশ্বরূপস্য ভাসঃ যদি বা ন স্ত্যাং ততোহপি বিশ্বরূপস্ত ভা অতিবিচ্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ ১২।

ভাঃ। সেই বিশ্বরূপ ভগবানেব যে দেহপ্রভা, তাহার উপমা দেওয়া যাইতেছে। “দিবি” এই শব্দটী বর্জিত অন্তরীক্ষে অথবা দ্যোঃ এই নামে প্রসিদ্ধ সন্ধ্যাপবি দ্বিত তৃতীয় আকাশে; সহস্র সূর্য্য যদি এককালে উৎথিত হয় এবং সেই সহস্র সূর্য্যেব রশ্মিনিচয় যদি একসঙ্গে ( একস্থানে ) উদ্ভিত হয়, তাহা হইলে সেই ( সহস্র সূর্য্যেব যুগপদ্ধৃতিত ) রশ্মিনিচয়, সেই মহাশ্বা বিশ্বরূপের দেহের প্রভাব যদি সমান হয় অথবা হয়ই না অর্থাৎ তাহা হইতেও বিশ্বরূপেব দেহপ্রভা অনেক পরিমাণে অতিবিস্তৃত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য ১২।

১লা অগ্রহায়ণ, ১০১১ । ]

উদ্বোধন ।

৬০৩

তত্রৈকহং জগৎ ক্লমং প্রবিভক্তমনেকধা ।

অপশ্যদ্ দেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

অর্থঃ । তদা পাণ্ডবঃ দেবদেবস্ত তত্র শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং ক্লমং জগৎ একহং অপশ্যৎ ॥১৩॥

মূলানুবাদ । সেই সময়ে পাণ্ডব ( অৰ্জুন ) সেই দেবদেবের শরীরে নানা প্রকারে বিভক্ত সকল জগৎ একত্র অবস্থিত রহিয়াছে দেখিয়াছিলেন ॥১৩॥

ভাষ্য । কিঞ্চ তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে একস্মিন্ স্থিতং একহং জগৎ ক্লমং প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমহুষ্ঠাদিভেদৈবপশ্যৎ দৃষ্টবান্ দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে পাণ্ডবোহৰ্জুনস্তদা ॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ । আবণ্ড, সেই বিশ্বরূপ দেবদেব হরির শরীরে সেই সময়ে ! দেব পিতৃ ও মহুষ্ঠাদি নানারূপে প্রবিভক্ত সমগ্র জগৎকে “পাণ্ডব” অৰ্জুন একস্থানেই অবস্থিত দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥১৩॥

ততঃ সবিম্ব্যাবিষ্টো হৃষ্টবোমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিবভাষত ॥১৪॥

অর্থঃ । ততঃ বিম্ব্যাবিষ্টঃ হৃষ্টবোমা স ধনঞ্জয়ঃ কৃতাজ্জলিঃ সন্ দেবং শিরসা প্রণম্য অভাষত ॥১৪॥

মূলানুবাদ । তাহাব পর বিম্ব্যাবিষ্ট বোমাঞ্চিতাজ্ঞ অৰ্জুন কৃতাজ্জলি হইয়া সেই দেবকে মস্তক অবনত কবিয়া নমস্কাব পূৰ্বক বলিলেন ॥১৪॥

অৰ্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে

সৰ্বাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-

মুখীংচ সৰ্কানুভবগাংচ দিবান্ ॥১৫॥

অর্থঃ । হে দেব তব দেহে সৰ্কান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ব্রহ্মাণং ঈশং কমলাসনস্থং সৰ্কান্ দিবান্ ঋষীন্ উভগাংচ পশ্যামি ॥১৫॥

মূলানুবাদ । হে দেব ! আমি আপনার দেহে সকল দেবতা, সকল প্রকার জীবগণ, কমলাসনস্থিত ঈশ্বর ব্রহ্মা, সকল দিব্য ঋষি ও উরগ-গণাক দেখিতেছি ॥১৫॥

ভাষ্য। কথং স্বভাৱা দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বাত্মভবমাবি-  
জুর্জন (অর্জুন উবাচ) পশ্যামি উপলভে, হে দেব তব দেহে দেবান্  
সর্বান তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থান-  
বিশেষাণাং সজ্জাঃ ভূতবিশেষসজ্জাতান্। কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্শূখং ঈশং  
ঈশিতারং প্রজ্ঞানাং কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে যেকৃকর্ণিকাসনস্থং  
ইত্যর্থঃ। ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন সর্বাত্মরূপাংশ্চ বাস্তুকিপ্রভৃতীন দিব্যান্  
দিবি ভবান্ ॥১৫॥

ভাষ্যাত্মবাদ। কেমন?—তুমি যে প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইলে, আমি  
তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি (এই কথা অর্জুন বলিতেছেন যে) হে  
দেব, তোমার দেহে সকল দেবগণকে আমি দেখিতেছি (অর্থাৎ) অমু-  
ভব করিতেছি। সেই প্রকার আরও সকল “ভূতবিশেষসজ্জ” কে  
(ও দেখিতেছি) “ভূতবিশেষ” অর্থাৎ স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক নানা আকার-  
বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ, তাহাদেবস সজ্জ অর্থাৎ সমূহকে ভূতবিশেষসজ্জ  
বলা যায়। আরও চতুর্শূখ প্রজাগণের ঈশ্বর ব্রহ্মাকেও দেখিতে  
পাইতেছি। ঐ ব্রহ্মা “কমলাসনস্থ” অর্থাৎ পৃথিবীপদ্মমধ্যে যেকুরূপ কর্ণি-  
কাসনে যিনি অবস্থান করেন, তাহাকে কমলাসনস্থ বলা যায়। ঐরূপ বশি-  
ষ্ঠাদি ঋষিগণ এবং বাস্তুকি প্রভৃতি “দিব্য” স্বর্গীয় উরগণগণকে দেখিতে  
পাইতেছি। ১৫।

অনেকবাহুদববক্ত্রনেত্রম্

পশ্যামি স্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

অর্থঃ। হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ অনন্তবাহুদববক্ত্রনেত্রং অনন্তরূপং স্বাং  
সর্বতঃ পশ্যামি তব অন্তঃ পশ্যামি ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং (পশ্যামি) ॥১৬॥

মূলাত্মবাদ। হে বিশ্বেশ্বর হে বিশ্বরূপ, আমি সকলদিকেই তোমাকে  
দেখিতে পাইতেছি। তোমার বাহু উদয় মুখ ও নেত্র অনেক; তোমার  
আকার অনন্ত। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতেছি। ১৬।

ভাষ্য। “অনেকবাহুদববক্ত্রনেত্রম্” অনেকে বাহবউদবাণি বক্ত্রাণি  
১৬। অগ্রহণ্যং, ১৩১১।] উদ্বোধন। ৬০৫



নেত্রাণি চ যন্ত তব স ত্বমনেকবাহুদববক্তৃনেত্রস্ত্বমনেকবাহুদববক্তৃনেত্রং  
পশ্যামি ত্বা ত্বাং সৰ্বতঃ সৰ্বত্র অনন্তরূপং অনন্তানি রূপাণি অস্ত ইত্যনন্তরূপস্ত-  
মনন্তরূপং নাস্ত্য অস্তোহিবসানং ন মধ্যং মধ্যং নাম দ্বয়োঃ কোট্যোরন্তরং ন  
পুনস্তবাধিং তব দেবস্ত নাস্ত্য পশ্যামি ন মধ্যং পশ্যামি ন পুনবাধিং পশ্যামি হে  
বিশেষ্বর হে বিষ্ণুরূপ । ১৫ ।

তাৎপৰ্য্যবাদ । “অনেকবাহুদববক্তৃনেত্রম্” যে তোমার বাহু উদর মুখ  
ও নয়ন সমূহ অনেক, সেই তুমি অনেকবাহুদববক্তৃনেত্র, তোমাকে অনেক-  
বাহুদববক্তৃনেত্র দেখিতেছি “সৰ্বতঃ” সৰ্বত্র “অনন্তরূপ” বাহাব রূপেব অস্ত  
নাই, সে অনন্তরূপ, তোমাকে অনন্তরূপ দেখিতেছি । অস্ত ( শব্দেব অর্থ )  
অবসান, মধ্য ( শব্দেব অর্থ ) দুইটি সীমার অন্তর প্রদেশ , আমি তোমাব অন্তর  
দেখিতেছি না, তোমাব মধ্য দেখিতেছি না, তোমার আদিও দেখিতেছি না,  
হে বিশেষ্বর, হে বিষ্ণুরূপ । ১৫ ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ

তেজোরাশিং সৰ্ব্বতো দীপ্তিমহতং ।

পশ্যামি ত্বাং দুর্নিবীক্ষ্যং সমস্তাং

দীপ্তানলার্কহ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অর্থ । কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং তেজোরাশিং সৰ্ব্বতোদীপ্তিমহতং  
দুর্নিবীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কহ্যুতিং অপ্রমেয়ং সমস্তাং পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

মুলাদ্বাদ । আমি তোমাকে সকল দিকেই দেখিতেছি । তুমি কিরীট-  
ধারী, তুমি গদাপাণি, তোমার হস্তে চক্র, তুমি সৰ্বদিকে দীপ্তিমান তেজো-  
রাশি, তোমার হ্যুতি সূর্য্য ও অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত, তুমি কত বড়. তাহার  
ইয়ত্তা কবা যায় না ॥ ১৭ ॥

তাৎপৰ্য্য । কিরীটিনং কিরীটং নাম শিরোভূষণবিশেষস্তদ্ব্যগ্ৰান্তি স কিরীটা তং  
কিরীটিনং তথা গদিনং গদা যন্ত বিদ্যতে ইতি গদী তং গদিনং তথা চক্রিণং  
চক্রমগ্ৰান্তি ইতি চক্রী তং চক্রিণং চ । তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জং সৰ্ব্বতো-  
দীপ্তিমহতং সৰ্ব্বতো দীপ্তিৰ্যগ্ৰান্তি স সৰ্ব্বতো দীপ্তিমান্ তং সৰ্ব্বতো দীপ্তিমহতং  
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিবীক্ষ্যং হৃৎশেন নিবীক্ষ্যো দুর্নিবীক্ষ্যন্তং দুর্নিবীক্ষ্যং সমস্তাং  
সমস্ততঃ সৰ্বত্র দীপ্তানলার্কহ্যুতিং দীপ্তাবনলার্কৌ তযোদ্যুতিরিব হ্যুতিস্তেজো  
৬০৬ উদ্বোধন । [ ৬ষ্ঠ— ১৯শ সংখ্যা .

যন্ত তব স ত্বং দীপ্তানলার্কহ্র্যতিঃ তং জ্ঞাং দীপ্তানলার্কহ্র্যতিং । অপ্রমেয়ং ন  
প্রমেয়মপ্রমেয়ং অশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ । ১৭ ।

ভাষ্যানুবাদ । “কিরীটিনং” ( এই শব্দটির অর্থ ) কিরীট ( অর্থাৎ )  
মস্তকের ভূষণবিশেষ ; তাহা বাহার আছে, তাহাকে কিরীটী কহা যায়, সেই  
তাহাকে ( এই অর্থে ) কিরীটিনং এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই প্রকারে  
“গদিনং” এই শব্দের অর্থ এই যে, বাহার গদা আছে, তাহাকে, সেইরূপ  
“চক্রিণং” ইহার অর্থ এই যে, বাহাব চক্র আছে, তাহাকে ( তোমাকে এইরূপে  
আমি দেখিতেছি ) “তেজোরানি” অর্থাৎ তুমি তেজঃপুঞ্জ এবং “সর্বতোদীপ্তি-  
মান্” বাহাব সকলদিকে দীপ্তি ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার নাম সর্বতোদীপ্তি-  
মান্, তুমি সর্বতোদীপ্তিমান্ ( তোমাকে সেইরূপেই আমি দেখিতেছি )  
তুমি “দীপ্তানলার্কহ্র্যতি” ( ইহাব অর্থ এই যে ) দীপ্ত অনল ও অর্ক ( অগ্নি ও  
সূর্য্য ) এই অর্থে দীপ্তানলার্ক এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই দীপ্তানলার্কের  
জ্বাষ বাহাব হ্র্যতি, তাহাকে দীপ্তানলার্কহ্র্যতি বলা যায় ( তোমাকে আমি  
দীপ্তানলার্কহ্র্যতিকপে দেখিতেছি, ইহাই তাৎপর্য্য ) “অপ্রমেয়” যে প্রমেয়  
নহে অর্থাৎ বাহার সীমা নাই, সেই অপ্রমেয় । তুমি অপ্রমেয় ( ইহাও আমি  
দেখিতেছি ) ইহাই অর্থ । ১৭ ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং

ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততথর্ম্মগোপ্তা

সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতোষে ॥ ১৮ ॥

অর্থ্য । ত্বং পরমং বেদিতব্যং অক্ষরং । ত্বং অস্ত বিশ্বস্ত পবং নিধানং  
ত্বং অব্যয়ঃ শাস্ততথর্ম্মগোপ্তা ( চ ) ত্বং সনাতনঃ পুরুষো মে মতঃ । ১৮ ।

মূলানুবাদ । তুমিই পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর ( অবিনাশি ব্রহ্ম ) তুমিই এই  
বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তুমি অব্যয়, তুমিই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, আমার  
বিবেচনায় তুমিই একমাত্র সনাতন পুরুষ । ১৮ ।

ভাষ্য । ইত এব তে যোগশক্তিদর্শনাদহুমিনোমি ত্বমক্ষরং ন ক্ষরতীতি  
পরমং ব্রহ্ম বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুহুক্ষুতিঃ । ত্বং অস্ত বিশ্বস্ত সমস্তস্ত অগতঃ  
পবং প্রকৃতং নিধানং নিধীষতেহস্মিন্ ইতি নিধানং পর আশ্রয় ইত্যর্থঃ । কিঞ্চ  
১লা অগ্রহায়ণ, ১৮১১ ।] উদ্বোধন ।

স্বং অব্যয়ঃ ন তব ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ শাস্ততর্কগোপ্তা শব্দতবঃ শাস্ততঃ  
নিত্যঃ ধর্মস্তত্ত্ব গোপ্তা শাস্ততর্কগোপ্তা সনাতনচিরন্তনস্বং পুরুষঃ পরো  
মতোহভিপ্রেতো মে মম । ১৮ ।

ভাষ্যানুবাদ । তুমি এই যে যোগশক্তি দর্শন করাইলে, ইহা দ্বারা আমি  
অনুমান করিতেছি যে, তুমি “অক্ষর” বাহাব ক্ষরণ হয় না । সেই বস্তু অক্ষর  
তুমি “পবন” পব ( ব্রহ্ম ) “বেদিতব্য” অর্থাৎ মুমুক্শুগণের তুমিই একমাত্র  
জ্ঞাতব্য ( পরব্রহ্ম ) তুমি এই বিশ্বের অর্থাৎ সমস্ত জগতের একমাত্র পরম  
“নিধান” যাহাতে পদার্থ সকল নিহিত হয়, তাহার নাম নিধান ; তুমি পর  
নিধান অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আশ্রয় । আরও তুমি অব্যয় অর্থাৎ তোমার ব্যয় নাই  
সুতরাং তুমি অব্যয় এবং তুমি “শাস্ততর্কগোপ্তা” যে ধর্ম সর্বদা বিদ্যমান  
থাকে । তাহাকে শাস্ত ( অর্থাৎ ) নিত্য ধর্ম কহে, সেই শাস্ত তর্কের যে  
রক্ষা করে, সেই শাস্ততর্কগোপ্তা এবং আমার অভিপ্রায় এই যে, তুমিই  
সেই “সনাতন” চিরন্তন পরম পুরুষ ( অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ) । ১৮ ।

অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীর্য্য-

মনস্তবাহুঃ শশিস্বর্য্যানেত্রম্ ।

পশ্চামি ত্বাং দীপ্তহতাশবক্রুং

স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ ১৯ ॥

অর্থ । অনাদিমধ্যান্তঃ অনস্তবীর্য্যঃ অনস্তবাহুঃ শশিস্বর্য্যানেত্রঃ দীপ্ত-  
হতাশবক্রুং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপস্তম্ ত্বাং পশ্চামি ।

মূলানুবাদ । তোমার আদি মধ্য বা অন্ত নাই । তোমার পরাক্রম অনন্ত ;  
চক্র ও স্বর্য্য তোমার নেত্র ; প্রদীপ্ত হতাশনই তোমার বদন ; আমি দেখিতেছি  
যে, তুমি নিজতেজের দ্বারা এই বিশ্বকে তাপিত করিতেছ । ১৯ ।

ভাষ্য । কিঞ্চ, “অনাদিমধ্যান্তঃ”-আদিষ্ট মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ ন বিদ্যতে বস্তু  
সৌহর্য্য অনাদিমধ্যান্তঃ তৎ স্বামনাদিমধ্যান্তঃ । “অনস্তবীর্য্যঃ” ন তব বীর্য্যন্তা-  
ন্তোহন্তীতি অনস্তবীর্য্যন্তঃ স্বামনস্তবীর্য্যঃ । তথা “অনস্তবাহুঃ” অনস্তা বাহবো  
বস্তু তব স স্বমনস্তবাহুস্তৎ স্বামনস্তবাহুঃ । “শশিস্বর্য্যানেত্রম্” শশিস্বর্য্যো নেত্রে বস্তু  
তব স স্ব শশিস্বর্য্যানেত্রম্ ত্বাং শশিস্বর্য্যানেত্রং চক্ৰাদিত্যনয়নং পশ্চামি ত্বাং “দীপ্ত-  
হতাশবক্রুং” দীপ্তচাসৌহতাশশ্চ স এব বক্রুং বস্তু তব স স্ব দীপ্তহতাশবক্রুঃ  
৬০৮

উবোধন ।

[ ৬ষ্ঠ—১১শ সংখ্যা ;

আমেরিকায় দেখিলাম

বন্ধাকরণভঙ্গ

## মায়ের এক মনোহর উদ্ভান ।

( একখানি পত্র , আনেকি হইতে প্রেরিত । )

লসএঞ্জেলস ; ২২শে এপ্রিল, ১৯০৪ ।

পাঠকবর্গ,

অনেক দিন পরে, আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি। নানাবিধ স্থানে প্রচারকার্যে অতীব ব্যস্ত থাক। বশতঃ, সাতিশষ ইচ্ছা সঙ্গেও আপনাদিগের দর্শন লাভ কবিত্তে পাবি নাই ; ক্ষমা কবিলেন। অনেক বার চেষ্টা কবিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হই নাই। সকলই তাঁব ইচ্ছা। তিক্ততঃ কৈলাস, মানস সর্বোবব, ও হিনাদ্রিশিখবঃ তুষাবক্ষেত্র হইতে আনাইয়া ভাবতেব “রাজ-প্রাসাদীয় সহবের” কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিক্ষেপ কবিলেন ; তাঁব ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তথায় তাঁব কার্য্য যথাসাধ্য কবিলাম। পরে, তথা হইতে “সাত সমুদ্র তেব নদী” পাব করিয়া পৃথিবীর অপর তলে তুলিয়া দিলেন ; এখানে আসিয়া দেখি ভীষণ কর্ম্মসমুদ্র। মনে কখন, স্থানফ্রান্সিকো হইতে এখানে গত মাচের শেষে আসিয়াছি, সেখানে প্রত্যাগমন কবিব সেই জুলাই মাসে, জুলাই মাসে তথায় যাঁহা কবে কখন কাঁহার সঙ্গে দেখা কবিব, এবং কবে কখন কিনি আসিয়া তথায় আমাব সহিত দেখা কবিলেন, এ সমস্ত “নোটবুকে” সেই মার্ক্স মাসেই অর্থাৎ চাবি মাস পূর্বে, ঠিক কবিয়া টুকিয়া লইতে হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, সমস্ত বৎসবেব মধ্যে কোথায় কবে কখন যাঁহা কি বিষয়েব উপর বক্তৃতা দিব, তাহা এক বৎসর পূর্বে হইতেই ঠিক হইয়া গিয়াছে। যাঁহাবা আমাব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কবিত্তে আসেন, তাঁহাদেব জন্ম সপ্তাহে দুই তিন দিবস পৃথক্ ব্যখ্যা দিয়াছি, এক এক দিবস ১৬ জন হইতে ২৫ জন পর্য্যন্ত আসেন। পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিতে হয় যখন কাঁহারও সঙ্গে কথাবার্তা কহিব, তখন বাবে আর কেহ থাকিবে না, ইহাই এখানকার প্রথা। কাঁহাবও সহিত অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর সময় অতিবাহিত কবিত্তে পাবি নাই। কেন না, আরও পাঁচ জন, দেখা কবিলার জন্য বাহিরে অপেক্ষা কবিত্তেছেন। যাঁহাবা দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদেব মধ্যে অনেক প্রকাবের লোক থাকেন, কখনও কখনও তাঁহাদেব

সূর্যোদয়ের কাগজওয়ালাও থাকেন । এক এক দিন, প্রতিরাতে ৮ ঘটিকা হইতে আৰম্ভ করিয়া, সেই রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনবরত লোকজন্মের সহিত ঐরূপ কথা কহিতে হয়, মধ্যে কেবল দুইবার আহাবের জন্য অল্পঘণ্টা করিয়া এক ঘণ্টা বিবাম পাই । এতই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে ।

অনেকেই ধর্ম্মের উপদেশ লইতে আসেন । কি করি, ঠাকুরের কার্য্য কবিতেই হইবে, “নান্য পহা অযন্য” । এ ছাড়া এখন আব আমাব গতি নাই । ঠাকুর এই রূপ কবাইতেছেন, কবিতেই হইবে । ধন্য যে, ঠাকুরের কার্য্য বলিয়া উপলব্ধি কবিতো পারিতেছি । পরমহংসদেব বিভাল ছানাব উপমা দিতেন, আহা কি চমৎকাব ! ঠাকুর যেখানে বাধিবেন, সেইখানেই থাকিব ; ঠাকুর যাহা করাইবেন, তাহাই কবিব ; ঠাকুর যেন সর্বদাই সঙ্গে থাকেন, ঠাকুরকে যেন সর্বদাই মনে থাকে । যেখানে থাকি, যাহাই কবি, মা আনন্দময়ি, মা ব্রহ্মময়ি, তোমাকে যেন না ভুলি । ইহাই হইতেছে “কর্ম্মমু কৌশলং” । ভীষণ কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়াও, এইরূপে কর্ম্ম করিলে আব কর্ম্মবন্ধনে পড়িতে হয় না । আমাব মাকে যদি না ভুলি, আমার ঠাকুরকে যদি না ভুলি, তাঁরা যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তাঁরা যদি আমাব হৃদয়ে সর্বদাই জাগরুক থাকেন, তাঁরা যদি আমাব হাত ধরিয়া লইয়া বেড়ান, তাহলে আব আমাব ভয় কি ? ইহাই হইতেছে সিক্রেট অভ্ সেক্রেস্ ( Secret of success ) । ইহাই হইতেছে, যাবতীয় কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবাব একমাত্র উপাদ । “ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যো”, ব্রহ্মই এক মাত্র জয়লাভ কবিতেছেন । তাহাবই জয়, তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক । “জয়ন্তী মঙ্গলকাণ্ডী” মীর হৃদয়ে সর্বদা, তাব জয় সর্বত্র । পাঠকবর্গ, প্রাণভবে আশীর্বাদ ককন, যাতে আপনাদিগেব এই ভূত্যা এখানে ঐরূপ ভাবে, ঠাকুরকে সর্বদাই হৃদয়ে বাধিয়া, মা ব্রহ্মময়ীকে না ভুলিয়া, “তাহাবই কার্য্য কবিতেছি, গুভ্যন্তভেব ফল তাহাবই”, এইরূপ ভাব সদা মনে জাগরুক বাধিয়া চলিতে পাবে ।

পাঠকবর্গ, অনেক দিন আপনাদিগকে দেখি নাই, আপনাদিগকে আব কি দিব । সস্ত্রুতি, মায়েব এক অদ্ভুত উদ্যান দর্শন কবিয়া আসিয়াছি, তাহাবই কথঞ্চিৎ আভাস আজ আপনাদিগকে দিতে চেষ্টা কবিব । মা ব্রহ্মময়ীব সে অদ্ভুত উদ্যান বর্ণনা কবা আমাব সাধাতীত, কেবল আভাস মাত্র দিতে চেষ্টা কবিব । নিজের চক্ষে না নিবীক্ষণ কবিলে সে রত্নাকরগর্ভের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও অদ্ভুত হৃদয়ঙ্গম হইবে না ।

সকলেই জানেন, আমেরিকার পূর্বদিকে অতলন্তিক মহাসাগর, এবং পশ্চিমদিকে প্রশান্তমহাসাগর। এই প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে “কালিফোর্নিয়া” নামক এক প্রদেশ আছে। এখানকার লোকে এই প্রদেশকে কখন কখন “সুবর্ণ-প্রদেশ” বলে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশে প্রথম সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়। তখন হইতে গতবৎসর পর্য্যন্ত “কালিফোর্নিয়া” জগৎকে ৪২৭, ৬৫, ৩৬, ০৬৭ টাকার সুবর্ণ প্রদান করিয়াছে। এই প্রদেশের মধ্যে “স্যান-ফ্রান্সিসকো” নামক সহরই সর্বোৎকৃষ্ট সহর। এই সহর, কলম্বো হইতে জল-পথে, প্রায় দশ হাজার মাইল পূর্বোত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে “রামরুক্ষ মিশনেব” এক প্রধান বেদান্ত-সভা আছে। অনেকেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, জগতে যত প্রদেশ আছে, তাহার মধ্যে “কালিফোর্নিয়া” স্বাস্থ্য ও জল-হাওয়া সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট স্থান। ইহার দৈর্ঘ্য ৭৭০ মাইল ও প্রস্থ ২০০ মাইল। ‘স্যানফ্রান্সিসকো’ নামক সহর এই কালিফোর্নিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণাংশে, স্যানফ্রান্সিসকো হইতে প্রায় ৪৮৩ মাইল দূরে, লসএঞ্জেলস নামক আর একটি সহর আছে। এখানেও রামরুক্ষ মিশনেব একটা বেদান্ত-সভা আছে। লসএঞ্জেলস হইতে ৫৩ মাইল ঠিক দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ‘ক্যাটালিনা’ বা ‘স্যান্টা ক্যাটালিনা’ নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের অন্তর্ভুক্তি য্যাভেলন নগর ইহার দক্ষিণপূর্বাংশে অবস্থিত।

\* লসএঞ্জেলস হইতে প্রথমে বেলপথে ২৭ মাইল দক্ষিণে “স্যানপেড্রো” নামক স্থানে আসিতে হয়। ইহাতে এক ঘণ্টা কাল লাগে। ইহা সমুদ্রের উপকূলে। পরে, স্যানপেড্রো হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর জাহাজে কবিতা আসিলে, ক্যাটালিনা দ্বীপে য্যাভেলন নামক নগরে পৌঁছান যায়। তাহাতে ২১ ঘণ্টা কাল লাগে।

প্রশান্ত মহাসাগর, আগে মনে করিয়াছিলাম, যথার্থই ঐ প্রান্ত। জাপান হইতে যখন এ দেশে আসি, তখন ১৭ দিন ১৭ রাত্রি এই মহাসমুদ্রের বক্ষে বাস করিতে হইয়াছিল। তখন ইহাকে বিশেষরূপে জানিয়াছিলাম। নামে প্রশান্ত, চবিরে মহা হুর্দান্ত। আমেরিকার এক জন প্রসিদ্ধ অর্থবৈদ্যপতি সেই জাহাজে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মহাশয়, আপনি ত সকল সমুদ্রবই খবর রাখেন নিশ্চয়ই, বিশেষ, — অতলন্তিক ও প্রশান্ত এই দুইটি মহাসমুদ্রের, খবর রাখিবেনই, কেননা, আমেরিকার দুই পাশে এই দুইটিই সমুদ্র বর্তমান। বহু দিন

মহাশয়, এই দুর্দান্ত মহাসমুদ্রের নাম “প্রশান্ত” দেওয়া হইল কেন ?” তিনি হাসিয়া বলিলেন, “যথার্থই এ মহাসমুদ্র বড়ই দুর্দান্ত বটে ; ইতার নাম প্রথমে দক্ষিণ-আমেরিকার এক উপকূলিক নগর হইতে দেওয়া হয়, তথায় এই সমুদ্র যথার্থই প্রশান্ত ; সেই অবধি এই সমগ্র মহাসমুদ্রকেই ঐ “প্রশান্ত” নামে ডাকা হয় ।

যাহা হউক, এবাবে স্যান্‌পেড্রো হটতে এই প্রশান্ত-সাগরে সামান্ত আড়াই ঘণ্টার পথ আসিতেই যাবতীয় সাহেব বিবি আবাল-বৃদ্ধ প্রায় সকলেই সকলকাব সেই অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত, সমস্তই “আবিষ্কার” কবিয়া দিতে আরম্ভ কবিলেন । প্রশান্ত মহাসাগর কিনা, তাই সকলকেই একেবারে চব্বিশ প্রশান্ত অবস্থায় প্রেরণ কবিবারই তাঁব কেবল চেষ্টা ! কাহাবও আব কথাটি কহিবাব সামর্থ্য নাই । যিনি যেখানে বসিয়া বা শুইয়া আছেন, তাঁহাকে সেইখানেই ঠিক থাকিতে হইয়াছে, দাঁতে দাঁত দিয়া পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে, মাথাটি নাড়িবার যো নাই, চক্ষু চাহিবাব শক্তি নাই, নড়িয়া বসিবাব ক্ষমতা নাই, কাহাবও মুখে হাত, কাহাবও মাথায় হাত, কাহাবও বুকে হাত . একটিও কথা কহিবাব ভরসা নাই—পাছে এখনই অপ-দস্থ হইতে হয় ; এত যে লোক, কোনও শব্দ নাই । শব্দের মধ্যে, বাহিরে প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্দান্ত গর্জনের কোলাহল ; আর ভিতরে, কেবল “আবিষ্কারের” হিক্কাব, ছুইয়ে মিশিয়া এক অদ্বুত একাতান । আমি যে কিরূপ অবস্থায় ছিলাম, তাহা আর আপনাদিগকে বলিব না, তবে, ঠাকুর বিশেষ সহায় ছিলেন বলিয়া আব আবিষ্কার-কার্য্যটা আমাকে দিয়া কবান নাই । এত যে কষ্ট, তবু কেহ তথ্য যাইতে ছাড়িবে না । যিনি একবার গিয়াছেন, তাঁহার গলায় আবার জগন্নাথের ডুরি পড়িবেই পড়িবে । পাঠক মহাশয়, বলুন দিকিন, কেন ?—মহামায়াব সেই অদ্বুত কাণ্ড দর্শন করিবার জন্ত । ব্রহ্মযযীর বিচিত্র লীলা অবলোকন করিবার জন্ত । যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি মজিয়াছেন । তাঁহাকে আবার আসিতেই হইবে । আমিও গত বৎসরে একবার আসিয়াছিলাম, কাহাকেও কিছু বলি নাই, আপনাদিগকেও কিছু মাত্র বলি নাই । এ বৎসরে আবার তথ্য না বাইয়া থাকিতে পাবি নাই, এবং এবাবে আর সব কার্য্য ফেলিয়া আপনাদিগকে তথাকার একটু খবর না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না ।

দ্বীপটা যে বড়, তাহা নহে, অতি ক্ষুদ্র একটা দ্বীপ। এ দ্বীপেব মাহাত্ম্য কেহ পূর্বে জানিত না। কাত্রিলা নামক স্পেনদেশীয় জনৈক পর্যটক ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই ক্যাট্যাগিনা দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তখন ইহা এক বহু জাতির আবাস ছিল। কাত্রিলা যখন প্রথম জাহাজ হইতে নামিলেন, সেই বহু জাতি, তাঁহার প্রতি কোনও প্রকার অসম্মতবাব না করিয়া, সকলে তীর-ধনুক ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল; তাহাবা সকলেই তাঁহার আগমনে আনন্দ-ধ্বনি ও নৃত্য করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঐতিহাসিক গল্প আছে। কিন্তু সে সকলের এখন প্রযোজন নাই। এখন আসল কথা বলি।

আমার সঙ্গে প্রায়ই একখানি গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকা থাকে। গত ১০ই চৈত্রৈব প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় লস এঞ্জিলস্ সহব ছাড়িয়া যথাস্থানে প্রায় এক ঘটিকার সময় “ক্যাট্যাগিনা” দ্বীপেব “ম্যাভেলন” নামক নগরে পৌঁছিলাম। এখানে তারিখ ১০ই চৈত্র বলিলাম বটে, ইহা কিন্তু কলিকাতার তারিখ; এখানকার তারিখ হওয়া উচিত—১২ বর্ষা পূর্বে—১২ই চৈত্র।

আমার সময় অতি অল্প; লোকে দিন গণনা করেন, আমার দ্বারা ঠিকুর মিনিট গণনা করাইয়া লেখেন। এক মিনিটও সময় আমাকে তিনি সহজে বাজে খরচ করিতে দেন না। স্মরণে জাহাজ হইতে নামিয়াই, অপর এক ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিলাম। দুই চারিজন বহু অভ্যর্থনা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সেই জেটি হইতেই কেবল হস্তোত্তোলন প্রভৃতি সাঙ্কেতিক সম্ভাষণ দ্বারা সম্বোধন করিতে হইল। নামিয়া যে হস্তধারণ অর্থাৎ শেক্ হ্যাণ্ডস্ (Shake-hands) প্রভৃতি করিব, তাহার আর সময় পাইলাম না। এক দিনের মধ্যে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, তার পর দিনই লস এঞ্জিলস্ আসিয়া, জাহাজের কণ্ঠ ভুলিয়া বাইবার পূর্বেই সেখানে বন্ধুতা দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। অপরাপর ব্যক্তিগণ, কেহ বা নিজ বন্ধুর আগমনে, কেহ কেহ বা নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

যে ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিলাম, সে জাহাজ সাধারণ ভাবে নিষ্পত্তি নহে। সেখানে একজন জাহাজকে “পাওয়ার গ্লাস-বটম বোট (Power Glass-bottom Boat) বলে। “পাওয়ার” অর্থাৎ বাষ্পীয় যন্ত্রের দ্বারা চলে, সেই জন্য;



“গ্লাস-বটম” বলে, কারণ, ইহার তলা কাচ-নির্মিত। আমরা প্রায় ৫০ জন উঠিলাম। আমি ছাড়া আর সকলেই সেখানকার ২৪ দিনের পুৰাতন যাত্রী। জাহাজের তলাব কাচ ; বৃষ্টিতেই পাবিতেছেন, সাধারণ কাচ নহে ; অতি স্থূল, কিন্তু বড়ই স্বচ্ছ, অভ্যস্ত কঠিন, শীঘ্র ভাঙ্গিবাব নহে। তত্রাচ, সামুদ্রিক উপদ্রবের দরুন, পাছে কোথাও হঠাৎ পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা-ধুকি লাগে বলিয়া কাচের চতুঃপার্শ্ব মোটা তক্তাব বেড়াব দ্বাৰা রক্ষিত। সেই বেড়াব শিৰোভাগ সমুদ্র-তলাভিমুখীকৃত। স্রুতবাৎ দর্শকবৃন্দেব কাচাত্যস্তব হইতে দর্শনেব কিছু ব্যাঘাত হয় না। কাচের নিয়ে চতুঃপার্শ্বে বেড়া আছে বলিয়া দর্শকবৃন্দেব বোধই হয় না। জাহাজের মধ্যস্থলে এঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্রাগার। সেই যন্ত্রাগাবেব পশ্চাতে ও সম্মুখে, আন্দাজ চাবি হাত চওড়া ও দশ হাত লম্বা, এই মাপেব স্থান মাত্র জাহাজের তলা কাচ-নির্মিত। যন্ত্রাগাবেব উভয় পার্শ্ব দিয়া সব লম্বা পথ—ঐ কাচ-নির্মিত স্থানে যাইবাব জন্ত। আমবা প্রায় ২৫ জন ঐ সরু পথ দিয়া যন্ত্রাগারেব পশ্চাতে নামিবা জাহাজের তলে কাচনির্মিত প্রদেশে যাইলাম। অপব ২০।২৫ জন যাত্রী ঐক্লপ, যন্ত্রাগাবেব সম্মুখস্থ অর্থাৎ অপব দিকেব, কাচনির্মিত স্থলে যাইলেন।

আমবা যাইবা সব, বেঞ্চেব উপব পা বুলাইবা, বসিলাম; বেঞ্চ সুন্দব মঞ্চমলেব গদী পাতা। স্থানটী যেমন মধ্যে লম্বা টেবিল পাতা এবং টেবিলেব চতুঃপার্শ্বে বেঞ্চ পাতা। কিন্তু, ঐ লম্বা টেবিলেব পরিবর্তে আমাদেব কাচনির্মিত লম্বা কূপ। কূপেব চতুর্দিকে বাবাণ্ডা বা রেলিং দেওয়া। আমবা বেঞ্চেব উপব বসিবা, সেই বেলিঙেব উপর হাত বাধিবা, কূপেব ভিতব ব্লকিবা দেখিতে লাগিলাম। কূপ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, লম্বা প্রায় দশ হাত, চওড়া প্রায় চাবি হাত। গভীর প্রায়—আমবা যেখানে পা বাধিবাছিলাম, তথা হইতে হাত আড়াই, তলা কাচ-নির্মিত—ঠিক জলেব উপবেই। কাচ যেন জলকে দাবাইবা বাধিবাছে ; জল, কাচ ভেদ কবিবা, ভিতবে প্রবেশ করিবার কতই চেষ্টা কবিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পাবিতেছে না। এই কাচেব ভিতব দিয়া মহাসমুদ্রেব বহ্নাকব দেখিতে লাগিলাম!! ইহারই নাম “গ্লাস-বটম-বোট”(Glass-bottom Boat) অর্থাৎ কাচ-তল-পোট। ইহা ছোট বড় নানা প্রকাব। কলেবরেব আছে। কতকগুলি বাঙ্গীয় যন্ত্রেব দ্বাৰা চালিত, কতকগুলি দাঁড় দ্বাৰা বাহিত হয়। অনেক দেশ-

দেশান্তর হইতে লোক আসিয়া থাকেন—এই অদ্ভুত “গ্রাস-বটম-বোট” দেখিবার জন্য। যদিও গ্রাস-বটম-বোট জগতে এক নূতন পদার্থ, কিন্তু লোকে কি, কেবল এই গ্রাস-বটম-বোটই দেখিতে আসেন? আমাদের ক্ষু নিশ্চিত হইয়াছে কেন? কেবল কি চক্ষুরই জ্ঞান? না—এই জগতের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য? গ্রাস-বটম-বোটও নিশ্চিত হইয়াছে—আর এক জগতের অদ্ভুত বস্তু অবলোকন কবিবাব জ্ঞান। পূর্বে জানিতাম, রমণীষ কানন সকল কেবল ফুলেই হইয়া থাকে, পবে এখানে আসিয়া দেখিলাম, মায়েব মনোহর কানন জলমধ্যেও আছে। যাহা হউক, পাঠকবর্গ, এই জলধিমাঝে যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার কিছু বর্ণিতছি। সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব, কেননা, সে সকল বস্তুর নাম ইহণেকে কেহ জানে না; এবং আমাব তাষাও প্রকাশ করিতে অক্ষম। শুধু তাহাও নহে, দেখিয়া শেষ কবা যায় না। সময় অল্প। সেই ক্ষুদ্র জাহাজের ভিতর কাঁচের তলা দিয়া কতকগুলি বস্তু যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তখনই তাহা কাগজে টুকিয়া লইয়াছিলাম। সমস্ত টুকিতে পারি নাই। অতি যৎসামান্য টুকিয়া লইতে পারিয়াছিলাম।

ক্রমশঃ কিনারা হইতে সেই “পাওয়ার-গ্রাস-বটম-বোটে” করিয়া দুব সমুদ্রে যাইতে লাগিলাম। আমবা মকলেই “গ্রাস-বটমেব” (কাঁচের তলাব) দিকে নিম্নগ্রীব হইয়া নিবীক্ষণ কবিত্তে লাগিলাম। ওয়াবব, যত দুবে যাঁইলাম, সমুদ্রের তলা অতি পবিস্কাব রূপে দেখা যাইতেছিল। যেমন কিনাবা, তেমনি তলা। কিনাবায়ও যেমন বালি ও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শামুক ভাঙ্গা, তলাতেও সেইরূপ। তবে মধ্যে মধ্যে শেওলা। পুকুবে-শেওলাব মত নয়। সমুদ্রের শেওলা। সমুদ্র যেমন অতি সুন্দর দেখিতে, শেওলাও তেমনি সুন্দর। স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। সেই সকল শেওলাব মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মংস্ত। ক্ষুদ্র বলিবা, পুঙ্খবিশীর সফবী মংস্তেব মত ফবফরিয়া বেড়াইতেছে না। ইহাবা সমুদ্রে বাস কবে, সমুদ্রের মত ধীব। অতি গভীর ভাবে হেলিয়া ফুলিয়া নানারকমেব বকমানি কবিয়া বেড়াইতেছে। লাল, সবুজ, কাল হবিদ্রা, মিশ্রিত প্রভৃতি নানা রঙ্গের মংস্ত।

জাহাজ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে গভীর হইতে গভীরতর জলে যাইতে লাগিল। জলের অভ্যন্তরস্থ দৃশ্যও সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতে লাগিল।

জাহাজ যেমন দূরে যাইতে লাগিল, জলও সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ বদলাইতে লাগিল। কিনাবাব নিকট জল বেশ সাদা ছিল, ক্রমশঃ নীলাভায়ুক্ত হইতে লাগিল। নীল হইল বটে কিন্তু স্বচ্ছতার কিছু ব্যাঘাত ঘটিল না। সমুদ্রের তলাব গঠন বা ধরণও সঙ্গে সঙ্গে বদলাইতে লাগিল। পূর্বে সমতল ছিল, যত দূরে যাইতে লাগিলাম, সেই সমুদ্রের তলা ঢেউখেলানে হইতে লাগিল, যেন কোদালি দ্বারা খণ্ডীকৃত ক্ষেত্র। নানা প্রকারের ও নানা রঙের মৎস্য-দলও ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। মৎস্যের যেন মেলা। আমবা যেমন বাজারে একটা বড় মাছ আসিলে ভিড় কবিয়া দাঁড়াই ও আহাবের জন্য ক্রয় কবিতো তৎপব হই, মৎস্যেরা তদ্রূপ তথায় যদি একটা নরদেহ পায় ত না জানি কত আক্লাদ কবিয়া থাকে !

ঢেউ-খেলানে জমি হইতে ক্রমশঃ, সমুদ্র-তল ছোট ছোট পাহাড় পর্ত্তকপে প্রকাশ হইতে লাগিল। পাহাড়গুলি আমাদের পাহাড়ের মত ঠিক নহে। যেন বড় বড় প্রস্তবপিণ্ড একত্রে সাজাইয়া পাহাড়ের আকারে কেহ কবিয়া বাখিয়াছে। প্রস্তবখণ্ডগুলির গায়ে নানাবর্ণের শৈবাল। শুধু নানাবর্ণের নয়, নানা বকমেব।

যত দূরে যাইতে লাগিলাম, ততই দৃশ্যেব ঘোবঘটা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনোহাবিত্ত্ব অধিক হইতে অধিকতব হইতে লাগিল। ক্রমশঃ নিবিড় জঙ্গল, রুহৎ পর্ত্ত, বড় বড় বৃক্ষ, বড় বড় মাছ। আবার জঙ্গল একটু পাতলা হইয়া আসিল, পর্ত্তগুলি ছোট ছোট হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এক অতীব চমৎকাব পুষ্পোদ্যানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। নানা প্রকাবের ফুল গাছ। গাছগুলি ছোট ছোট নয়। এক এক তলে খুব বড় বড় ফুল গাছ, গাছেব পাতা ঠিক যেন স্বচ্ছ পাতলা পাচ'মেন্ট কাগজেব মত দেখিতে। আকাবে অনেকটা শালগাছেব পাতাব মত। কোথাও কোথাও, তলায় যেন তগুল ছড়াইয়া বাখিয়াছে, সে গুলি মস-ফ্লাওয়ার ( Moss-flower ) বা শৈবালপুষ্প। খুব বড় বড় লাল মাছ, সবুজ মাছ, কপোলি বঙ্গেব, সোণালী বঙ্গেব মাছ দেখিলাম ; এক একটা মাছ মাঝারি কাতলা মাছেব মত বড়। সমুদ্রের ভিতবেও তালগাছ ( বিলাতী তাল গাছ ) দেখিলাম। তাহার নাম সি-পাম ( Sea-palm )। কোথাও ঠিক পলাশ-ফুল গাছেব মত বড় বড় ও অতি সুন্দর ফুল গাছেব জঙ্গল। কোথাও ছোট ছোট ঠিক মোমেব ফুলেব মত ফুল

গাছের জঙ্গল। কোথাও ছোট ছোট ঠিক মোমের ফুলের মত ফুলগাছের জঙ্গল। নানা বঙ্গের ফুল। ফুলের সে রঙ ও আকৃতি দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। যেন মা নিজের নির্জনে বসিয়া তাঁর সেই চিৎখন অঙ্কলি দ্বারা নিজের মনের মত কবিতা এই মনোহর ফুলগুলি নির্মাণ করিয়াছেন। পাছে নবলোকে স্পর্শ করিয়া সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নষ্ট কবে, সেই জন্তই বোধ হয় মা উহা সমুদ্রগর্ভের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কোথাও অতি স্নেহ অপরাধিতা ফুলের মত সবুজ ছোট ছোট ফুলের গাছ। গাছতবা ফুল। কোথাও কোন কোন গাছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পঞ্জ টুকরার মত ফুল। কোথাও সমুদ্রের তলা আবডো খাবড়ো, কোথাও অতি পবিপাটীরূপে ঢেউখেলানো। এক এক স্থলে তালের আঁঠির মত যেন কি ছড়ান রহিয়াছে।

বড় বড় ফুলগাছগুলির গোড়া যে মোটা, তাহা নহে, খুব লম্বা, এক-এনে, শাখা-প্রশাখা গিবর্জিত, কেবল পাতা আব ফুল। সেই গাছের গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত কেবল গায়ে সমান দূববর্তী এক একটা পাতা, আব প্রতি পাতার গোড়াধ কতগুলি ফুল। ঐরূপ এক-এনে গাছ এক সঙ্গে দুই তিনটা কবিতা এক এক স্থলে। এক এক স্থলে ঝোপ-ডের মত। ঝোপডগুলিও নেহাত বেঁটে নয়। এক একটি গাছ এমন কি ২০০ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা।

এক এক বকম গাছে ঠিক জহবী-চাঁপা ফুলের মত ফুল বাশীকৃত। কোন কোন গাছ দেখিতে যেন ঠিক “গাজি-সাহেব”। খুব লম্বা ও মাথায় খুব বড় চামর। কোন কোন গাছ ঠিক বাবলা গাছের মত। এক একটা গাছ বেল ফুলের কুঁড়ির মত কুঁড়িতে ভরা। এ সব বাহাবী গাছের তাকত কবিতা হয় না, জল দিতে হয় না। কোনও কষ্ট নাই, কোনও যত্ন নাই; কিন্তু কেমন আশ্চর্য্য! কুলবাগান! এ বাগানের মালী ও মালিক কে জানেন?

এ বাগানের মালীও যে, মালিকও সে। কে জানেন?—মা—মা—মা। এ বাগানের নিয়ম, তত্ত্ব প্রভৃতি সবই বিভিন্ন। মায়ের হকুমে এ বাগান চলে। সে চকুমও আমাদের হকুমেব মত নহে। সে হকুম কবিতা মুখ দবকার হয় না, কথা দরকার হয় না, ভাষা দবকার হয় না, সে হকুম জাতি করবারও দবকার হয় না।

পাঠক, বলুন দিকিন্, এ বাগানে, মায়ের এইরূপ মনোহর উদ্যানের কাহাণী বাস করে ? তাহাণী কিরূপ দেখিতে ?

মনে কবিবেন না যে, জলাশয় বলিয়া তথায় কেবল সাধারণ মৎস্যই থাকা সম্ভব ; মনে কবিবেন না যে, উহা সমুদ্র বলিয়া তথায় কেবল সীল, হোয়েল, হাঙ্গর, জলহস্তী প্রভৃতি প্রকাবের জন্ত থাকাই সম্ভব ।

অবশ্য যে সকল প্রাণী সামুদ্রিক উদ্যানমধ্যে দেখিলাম, তাহাদিগকে জল-জন্ত বলিতে পারা যায়, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জল-জন্ত ।

এক প্রকাব জীব দেখিলাম, তাহাদিগকে “সি-হেয়ার” (Sea-hare) বলে । দেখিতে ঠিক ছোট খরগোশের মত । কিন্তু বোধ হয় ইহার অগ্নিমা লম্বিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিবান । কেননা, থাকে থাকে, হঠাৎ সমস্ত শরীর ভিতরে ঢুকাইয়া তাল গোল পাকাইয়া ঠিক একটা লাড়ুুর মত হয়ে যায় ; আবার, যখন সমস্ত শরীর বাহির করে, তখন ঠিক একটা ছোট খরগোশের মত হয় ।

খাগিক ক্ষণ বাদে আর এক স্থলে দেখিলাম, কতকগুলি মৎস্য মাটির উপর লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে । লক্ষ্যভাবে (মৎস্যেরা যেমন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে ) যে লাফাইয়া যাইতেছে, তাহা নহে । ঠিক খাড়া ভাবে ।

নানা প্রকাবের ককট দেখিলাম । তাহাব মধ্যে দুই প্রকাবের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, ককটবিদ্রোহিণ ক্ষমা করিবেন । এখানে Crab-salad ( অতি দ্রব্য টক্ দিবে কাঁকড়া ) হচ্ছে এক উপাদেয় Dish । এক প্রকাবের নাম “Hermit-Crab” অর্থাৎ পরিব্রাজক-ককট । ইহার পীঠে বাটী বা আবাস-স্থান লইয়া বেড়াব । ঝাড়ের কাছে গাঠ বাস্তবিকই একটা বড় বিহুক । বিহুকগুলি দেখিতে অতি সুন্দর । কাঁকড়াগুলিও ততোধিক সুন্দর ।

আর এক প্রকার ; তাহার নাম “Sea Rock crab” অর্থাৎ সামুদ্রিক পার্শ্বীয় ককট । যেমন আমাদের দেশে কান্দীয়া লোক দেখিতে অতি সুন্দর, তেমনি ককটবাজের মধ্যে ‘সি বক ক্র্যাব’ অতীব সুন্দর । ইহাব মাথাষ একটা অতি সুন্দর মটুক, কখন ঢুকছে, কখন বাহির হইতেছে , ঠিক যেমন, ময়ূষ মধ্যে মধ্যে পুচ্ছগুলি প্রসা-বণ করিয়া “প্যাকম্” ধরে, আবার মধ্যে মধ্যে সে গুলি সমুচিত করিয়া

লয়। চক্ষু উপরে একটা ঢাকনি আছে, রক্ষাবরণের মত। দেখিতে ঠিক যেন জানালার গ্রীষিয়াম টব। সেই রক্ষাবরণগুলিও দেখিতে অতি সুন্দর।

মাকড়সাও সেই জলের ভিতর নানা প্রকারের দেখিলাম। লাল, পীত, সবুজ, মিশ্রিত রঙের, বাহারী, নক্সাকাটা প্রভৃতি নানা প্রকারের।

চিংড়ি মাছও নানা রকমের ও নানা রঙের। এখানে চিংড়ি মাছেরও স্যালাড (ঈষৎ টকের এক রকম তরকারি) অতি উপাদেষ। তবে সে সকল চিংড়ি মাছ অতি সাধারণ। এ সকল চিংড়ি মাছ নরলোকভোগ্য নহে।

শশা—গাছেই হইয়া থাকে, এবং অচেতন ফলের মতোই গণ্য, এই জানিতাম। কিন্তু এখানে সমুদ্রের ভিতর দেখিলাম ‘শশা’ চেতনও হইয়া থাকে এবং জলে আপনা হইতে জন্মায় বিনা গাছের সাহায্যে। ইহাকে “সি কিউকম্বর” (Sea Cucumber) অর্থাৎ সামুদ্রিক শশা বলে। ইহা এক প্রকার মাছ, ঠিক শশাব মত দেখিতে।

তারপর, “স্যান্ ড্যাব” (Sandab Fish)। ইহাব গায়ে নানা প্রকার ছিটের মত নক্সা। সেই সকল নক্সাও নানা রঙের।

“Opal-eyed Fish” ওপাল আয়েড ফিশ্। ইহার চক্ষু ঠিক Opal অর্থাৎ মাণিকের মত। নানা রঙের চক্ষু—ভিন্ন ভিন্ন মাছের চোখে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মাণিক।

“Electric Fish” (ইলেকট্রিক ফিশ্) অর্থাৎ “তড়িৎ-মৎস্ত”। এই মাছগুলি দেখিতে খুব বড় বড় পায়রা-চাঁদা মাছের মত। কিন্তু গায়ে সব বিন্দু বিন্দু দাগ। সেই সকল বিন্দু হইতে নানা রঙের আলো (ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক) বাহির হইতেছে।

একটা মাছ দেখিলাম, খুব বড় কাতলামাছের মত; গায়ে নানা রকম রঙ।

আর একটা মাছ, ঠিক ভেড়ার মত তার মুখ ও দাঁত। ইহাকে “Sheep-Fish” (শীপ্-ফিশ্) বলে, অর্থাৎ মেঘ-বৎস্ত।

নানা রঙের ও আকৃতির বড় বড় কিল্ক ও শামুক সমুদ্রের তলায়, পাহাড়ের গায়ে ও পাছের গায়ে রহিয়াছে।

কলম মত, সাধারণতঃ, হংসাদির পালকেই হইয়া থাকে, এবং তাহা দিয়া আশরা নিখিয়া থাকি। এখানে কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে এক রকম মৎস্ত

দেখিলাম, তাহা ঠিক কলমের মত। ইহাকে “Sea-Pen” (সি-পেন্) অর্থাৎ “সামুদ্রিক কলম” বলে।

আব এক বকম মাছ, নাম Star-Fish (ষ্টার্-ফিশ্) অর্থাৎ তাবা-মাছ। ইহা ঠিক \* এইরূপ চিহ্নের মত। প্রতি ফলায় সব বিন্দু বিন্দু দাগ। ঐ সকল দাগ জ্যোতিতে খুব ঝক্-ঝক্ কবিতোছে।

বড় বড় বুয়াকো ফুলের মত একবকম মাছ দেখিলাম। ইহাব নাম “সি অব্‌চিন্‌স” (Sea Urchins)। সি অব্‌চিন্‌স নানা বঙের ইইষা থাকে, সাদা, কাল, বেগুনি প্রভৃতি। অনেকটা Pin-pad (with pins on) এর মত দেখিতে।

আবও যে কত বকম ফুল, কত বকম গাছ, কত বকম মাছ, কত বকমের শামুক ও কিল্ক দেখিলাম, তাহাব আব কত বর্ণনা কবিল! যাহাবা দেখাইল, তাহাবাও অনেকের নাম জানে না।

সাধারণ মৎস্যও নানা বকমের ও বহুৎ বহুৎ আকাবের এখানে পাওয়া যায়। এই দ্বীপের আন একটা নাম “The Angler’s Paradise” অর্থাৎ মৎস্যধারকের স্বর্গ। দূর দূর দেশ হইতে লোকে এখানে মৎস্য ধরিতে আসে। একজন, মিষ্টার এফ্‌, এস্‌, শেন্‌ক্‌ (Mr F. S. Schenck) নামক ব্যক্তি ছিপ ও এখানকার মৎস্য ধরবার ২১ নম্বর স্রুতাব দ্বারা ৩৮ পাউণ্ড অর্থাৎ কমবেশ সাড়ে তিন মণ ওজনের এক প্রকাণ্ড ব্ল্যাক্‌সি বাস্‌ (Black-sea Bass) জাতীয় মৎস্য ধরেন। এই মৎস্য নাকি অতি উপাদেয়। বৎসব ত্রয়েব কথা হইল, একজন স্ত্রীলোক, মিসেস্‌ এ, ডবলিউ, ব্যাবেট্‌ (Mrs. A. W. Barret), ছিপ ও স্রুতাব দ্বারা ৫ মণ ওজনের (৪১৬ পাউণ্ড) ঐ জাতীয় এক বহুৎ মৎস্য ধরেন।

এই দ্বীপে, সমুদ্রের কিনাবাতেই, “Zoological Station and Marine Aquarium” অর্থাৎ “পালিত সামুদ্রিক জন্তুর স্থান ও বক্ষিত সামুদ্রিক উদ্যান” নামক স্থান আছে। এই স্থান আজকাল তত ভাল অবস্থায় নাই। তত্রাচ অনেক নূতন নূতন সামুদ্রিক বস্তু জীবন্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সব বড় বড় কাচের বাক্সের ভিতর জল ভরিয়া রাখিয়াছে; সেই জলের ভিতরে হাওয়া যাবাব পথ, এক এক সরু কাচ-নলের ভিতর দিয়া, করা হইয়াছে। এইরূপ জল-বাক্সের ভিতর সমুদ্রের নানা প্রকাব মাছ ও গাছপালা অতি সুন্দররূপে পালিত ও বক্ষিত কবা হইয়াছে।

পূর্বে যত প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মাছের কথা বলিয়াছি, তাহা ছাড়া আবও কয়েক প্রকার নুতন মাছ এই স্থানে কাচ-বাক্সের ভিতর দেখিলাম। সে সকলেরও নাম শুটি কতক করি শুনি। .

একটা বাক্সের ভিতর (বাক্স চারিদিকেই কাচ দ্বারা নির্মিত) দেখিলাম অত্যদ্ভুত পদার্থ। ইহাব নাম ডেভিল্-ফিশ্ (Devil Fish) অর্থাৎ অস্তুর-মৎস্ত। ইহা যখন নিজে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেখিতে ঠিক একটু মাংসপিণ্ড। বক্ষকেরা বলিলেন, ইহা যথার্থই পুণিবীৰ এক আশ্চর্য্য জন্তু। ইহাব শবীবের ভিতর কুসুম্ভ, যক্ষুণ্ণ প্রভৃতি কোনও প্রকাব সাধাবণ আভ্যন্তরিক যন্ত্র নাই; উদর নাই; মস্তিষ্ক নাই। কিন্তু তত্রাপি, কোপগ্রস্ত হইলে ভয়ানক ভয়ানক নাক মুখ চোখ প্রভৃতি যে কেমন কবিয়া সেই মাংসপিণ্ডের ভিতর হইতে বাহির কবে, কিছুই বলা যাব না। ইহাব শবীবে স্থানে স্থানে, ১২০টা করিয়া, Suckers অর্থাৎ রক্ত-শোষক যন্ত্র আছে। তাহাব দ্বারা অত্যাচ্ছ জন্তুর গাত্র হইতে নিমিষে প্রচুব পরিমাণে রক্ত শুষিয়া লয়। বাক্সের গায়ে একটু আঘাত করিলেই অমনি উহা রাগান্বিত হয়। বাগান্বিত হইলেই নানাপ্রকাবের ভীষণ ভীষণ মূর্ত্তি ধাবণ কবিয়া ভয় দেগায়। তখন লক্ষ্য প্রায় এক হাত ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ হাত হয় এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই নানাপ্রকাব রঙ বদলায়।

একজন বক্ষক বলিলেন যে, উহাদেব ঐ স্থানে, বৎসর কতক হইল, একটা Angel Fish (এঞ্জেল ফিশ্) অর্থাৎ “সাদু-মৎস্ত” ছিল। সেটা মারা গিয়াছে। আব একটা আজও অন্বেষণ করিয়া পাইতেছেন না। এই মৎস্ত নানাবিধ শাস্ত স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে।

আপনারা সকলেই প্রাণ, হাঙ্গর দেখিয়াছেন, কিন্তু বসুন দিকিন, হাঙ্গরের বাচ্চা পেটেব ভিতর হইতে কি অবস্থায় বাহির হয়? কি অবস্থায় জানেন?

ডিম্বাকাবে। হাঙ্গরের ডিম্ব কি বকল জানেন? ঠিক পাকান শিঙের মত। আশ্চর্য্য নয় কি, ডিম—পাকান শিঙের মত? কতকগুলি এইরূপ হাঙ্গরব ডিম (তাবা বলে—Shark-eggs) একটা জলভরা কাচের বাক্সের ভিতর রাখিয়া দিয়াছে।

আর একটা কাচের বাক্সের ভিতর কতকগুলি ঠিক বাধাপন্ন কুলের মত মাছ দেখিলাম। ইহাবা একটু কিছু আওষাজ হইলেই অমনি মুখ



বন্ধ করে; তখন দেখিতে ঠিক রাধাপন্ন ফুলের কুঁড়ির মত। ক্ষণিক পরে, আবার প্রস্ফুটিত হয়। বন্ধকেরা বলিল, ইহারা নাকি ৫৪০ ফিট্ অর্থাৎ ৩০০ হাত জলের নীচে সমুদ্রে বাস করে।

কতকগুলি Live Sponge অর্থাৎ জীবিত স্পঞ্জ দেখিলাম। সে গুলিও মাছ।

Live coralও দেখিলাম অর্থাৎ জীবিত প্রবাল। দেখিতে খুব ছোট ছোট শৈবাল পুষ্পের Moss-flower) মত। পাহাড়ের গায়ে খুব ছোট ছোট গর্ভের ভিতর থাকে। ইহাদেব বাস-স্থান অতি সুন্দর। প্রাচ্য মাহুনের মত। সকলের বাটীগুলি লাইনগাঁথা। প্রতি বাটীতে বৈঠক-খানা (Parlours) প্রভৃতি আছে। ইহারা আত্মীয় কুটুম্ব সহিত একত্রে বাস করে। দর্শকবৃন্দকে, সেখানকার বন্ধকেরা এ সমস্ত অতি বহুসহকারে দেখায় ও বুঝাইয়া দেয়।

আর একটা বাস্তবের ভিতর একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি ছোট ছোট গর্ভের ভিতর খুব ছোট ছোট রুমকো ফুলের মত মাছ অনবরত ঢুকছে আব বাহির হইতেছে। ঠিক ছোট রুমকো ফুলের মত খুব সরু বঙ্গিন পাপড়ি।

এইরূপ আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মাছ ও ফুলগাছ আছে, আর কত নাম কবির! এই দ্বীপেব আব একটা নাম “Magic Island” অর্থাৎ ঐজ্ঞাতালিক দ্বীপ। বলিয়াছি ত, মাযের বাগান। যা আমাদের “বাস্তবিকের মেয়ে জামা” কিনা! তাই তাঁর দ্বীপ বা বাগান এত বিচিত্র! এই দ্বীপের আরও একটা নাম ‘The Enchanted Isle of the sea’ ঠিকই কথা। মাযের মন্ত্রমুগ্ধ দ্বীপই বটে।

পাঠকবর্গ, ক্ষমা করিবেন, আপনাদিগকে অনেক কষ্টে দিলাম এই দীর্ঘ পত্র পড়িতে। আপনার শীঘ্র আপনাদিগেব নিকট আসিতে চেষ্টা করিব—এবার আরও কিছু ভাল বিষয় ভনাইতে চেষ্টা করিব।

ইতি শুভানুধ্যায়ী

ত্রিগুণাভীত।

# শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

স্বামী বামরুক্ষানন্দ ]

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রায় হওয়াতে আৰ্য্যাবৰ্ত্তে অপেক্ষা এখানে মন্দিরসংখ্যা অত্যধিক । এখানকার তুলনায় প্রাচীনকালসেবিত, সিদ্ধজাহ্নবীপুত্র, হিমাচলোপাধান বিত্তীর্ণ ভূভাগ দেবালয়শূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । কিন্তু যদিও মনুষ্যবুদ্ধিগ্রহত শিল্পেব মহিমায় এদেশ আপনাকে মহিমান্বিত মনে কবে, তথাপি এই বিচিত্র বিশ্বসংসার যে আদি-শিল্পীর রচনা, সেই অতুলনীয় অধিতীতপ্রকাণ্ড-পতি-বিবচিত, সাধুতপস্বিনিষেবিত, সৰ্বসৌন্দর্য্যাগাভীৰ্য্যময় স্বৰ্গলোক-প্রধান উত্তমশিখরবান্ তুহিনাচল আৰ্য্যভূমির পৌরবন্দরূপ হওয়ায় তাহাও সহিত তুলনায় দাক্ষিণাত্যেব গোঁববচ্ছটা সূর্য্যচ্ছটার সম্মুখে জ্যোৎস্নার জ্বালায় পরিণত হইয়া যায় । মনুষ্যশিল্প কখনও নির্দোষ হইতে পাবে না, এবং তাহা কেবল প্রাকৃতিক রচনায় অমূল্যরূপে মাত্র ; কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতিদেবীই যেন হিমালয়রূপ বিপুলমন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে চিরকাল ধরিয়া আপনার ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেছেন । স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে এবং একের তুলনায় অপরটি যে একবারে নগণ্য হইয়া যায়, ইহা স্পষ্ট । অতএব সুবৃহৎ দেবালয়পুঞ্জ-পরিমণ্ডিত হইলেও সৌন্দর্য্যবিষয়ে দাক্ষিণাত্যকে আৰ্য্যাবৰ্ত্তের পদতলে চিরকালই পড়িয়া থাকিতে হইবে ।

কিন্তু সে বাহা হউক, যদি প্রাচীন হিন্দুগণের শিল্পকৌশল দেখিতে চাও, তাহা হইলে সীতাবিবাহবিধুর ঝামের অশ্রবারিপুত্রা রামকটকপ্রস্থতি দাক্ষিণাত্যভূমিতে না আসিলে তাহার সম্ভাবনা নাই । এখানকার মন্দিরগুলির আরভন ও উচ্চতা উভয়ই সুবিপুল । শ্রীবঙ্গমন্দির শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির এত বৃহদাশতন যে, পবিবাসসহিত অর্জকগণ তাহারই মধ্যে বাস করেন, এবং তাঁহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, শান্তিবিধানার্থ মন্দিরচত্বরের একপার্শ্বে দণ্ডনিবাস ( পুলিস ) অবস্থিত । সেই বিশালপ্রাঙ্গণের অত্র এক স্থলে সহস্রটি স্তম্ভের উপর এক মণ্ডপ বিরাজ করিতেছে । যখন ইংরাজ ও

করাসিগণ দাক্ষিণাত্য লইয়া সাংগাম করিতেছিলেন, সেই সময় সমুদয় ফবাশি সৈন্ত উক্ত মহামণ্ডপের এক পাশে মাত্র আশ্রয় লইয়াছিল! এতদ্বাৰা মন্দিবেব বিশালতা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে।

সমুদয় অর্চকগণ এক প্রধান অর্চকেব অধীন। ইঁহারই মতানুসারে সকলকে কার্য্য কবিতে হয়। সুতবাং ইনি একপ্রকাব অন্ত্যাত্ম সকলেব উপর বাজ্জ্ব কবিয়া থাকেন। অর্চকগণের স্বভাব সাধাবণতঃ তত পবিত্র হয় না, কাংবণ, ইঁহারা ভগবন্তুক্তিছাবাই অল্পপ্রাণিত হইয়া বে দেবার্চনা কবেন, তাহা নহে; অনেক সময়ে অর্ধোপার্জনেই এই সেবাব কাংবণ। অর্থ ইঞ্জিয়-পবিত্বপ্তিব সাধক বলিয়া ইহাব এতদ্ভাংব। সুতবাং অর্থলোভিণ ইঞ্জিয়-সেবা-পরাযণ। ভগবন্তুক্তি ইঞ্জিয়লৌল্য দূৰ্গ করে কিস্ত অর্থপ্রিয়তা তাহাবই ব্যঞ্জক। সুতরাং অধিকাংশ দেবার্চকগণই ইঞ্জিয়দাস। তাঁহাবা যে ভগবদ্বিগ্রহের অর্চনা কবেন, তাহা অর্ধোপার্জনের উপায় বলিয়াই তাঁহা-দেব নিকট আদবেব সামগ্রী। সকল অর্চকই যে এইরূপ, তাহা বলিতেছি না। ইঁহাদেব মধ্যে কখন কখন পবম তক্তিমানও দেখিতে পাওয়া যায়। কিস্ত অধিকাংশ স্থলেই ইহাব বিপরীত লক্ষিত হয়। এই জন্তই দেবার্চকগণ সমাজে দেবল বলিয়া হেয়।

শ্রীৰামানুজের সময় যে প্রধান অর্চকটি শ্রীরঙ্গনাথেব সেবা করিতেন, তিনি ভাদৃশ তক্তিমান ছিলেন না। তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং ধনেব প্রতিই তাঁহাব বিশেষ তক্তি ছিল। অর্থজন্ত ইঞ্জিয়সুখভোগই তাঁহাব জীবনেব মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায়, যখনই কেহ তল্লাভে তাঁহাব অন্তবায়স্বরূপ হইত, তিনি যেন তেন প্রকাংরেণ তাঁহাব উচ্ছেদসাধন করিতে চেষ্টা পাইতেন।

শ্রীৰামানুজেব অতুল কীর্তি, তাঁহাব প্রতি সকলেব অকুরিম অনুরাগ, শ্রীরঙ্গমন্ত সন্তানুজনসমূহের তদর্থে অকাতবে অর্পণব্য, তাঁহাকে শ্রীরঙ্গনাথ স্বায়ীৰ দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে লোকের ধারণা, ও আপনাব প্রতি জনসাধাবণের পূরভক্তির হ্রাস দেখিয়া প্রধানার্চক আব স্থির থাকিতে পাবিলেন না। কিরূপে তিনি এই কষ্টকের হস্ত হইতে সর্সতোভাবে মুক্ত হইবেন, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। দুই হৃদয়ে পৈশাচিক উপায় সহজেই প্রস্কুরিত হয়। কৰ্ত্তব্য হিব কবিয়া তিনি অবিলম্বেই শ্রীৰামানুজসন্নিধানে গমনপূর্বক তাঁহাকে সেই দিবস নিজগৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করি-

লেন, এবং তৎপরে স্বগৃহে গমনপূর্বক সহধর্মিণীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “দেখ, আজ রামানুজকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি। অন্নের সহিত তাহাকে বিষপ্রয়োগ করিতে হইবে, এই জন্যই সেই নরাধমটাকে নিমন্ত্রণ। ও পাপটা জীবিত থাকিলে অচিরাৎ আমাদের হা অন্ন হা অন্ন করিয়া কাল কাটাইতে হইবে। বিষপেটিকা কোথায় আছে, তুমি জান। অধিক আব কি বলিব। তুমি বুদ্ধিমতী, সাবধানে সকল কার্য্য নির্বাহ করিবে।” নরপত্তির উপযুক্ত সহধর্মিণী সম্মিহবদনে লোচনভঙ্গি দ্বারা আপনাব কার্য্যপটুতা প্রকাশ করিলে আনন্দোৎফুল্ল অর্চক পিশাচীও গণ্ডে প্রেম-ভাবে চুপন করিয়া কহিলেন, “শ্রীবল্লভাধিপায়ী রূপাতেই তোমার জায় মনোরত্তানুসাবিনী ভার্য্যা লাভ কবিয়াছি, আজ আমি নিষ্কণ্টক হইব। আজ আমি তোমাকে অন্ধে লইয়া সুখে নিদ্রাসুখ অমুভব করিব।” এই বলিয়া দৃষ্ট দেবর্চনার্থ শ্রীমন্নিরাতিমুখে গমন কবিলেন।

মধ্যাহ্নে হৃদিবাক তিক্কাগ্ৰহণ মানসে অর্চকালয়ে আগমন করিলেন। অর্চকপত্নী তাহাকে অতি সমাদরে পাদপ্রক্ষালনার্থ জল দিলেন ও স্বয়ং বস্ত্রদ্বারা তাহার পাদমার্জনা পূর্বক বসিবার আসন প্রদান করিলেন। যদিও পাপীষসীও হৃদয় বহুসারময়, যদিও সে অনেকবার স্বহস্তে অনেককে বিষ-প্রয়োগ কবিয়াছে, তথাপি শ্রীরামানুজের সাবলম্ব্য বদনও দেবতুলা কান্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে অপত্যস্নেহের সঞ্চার হইয়া ক্রমে তাহা এত বলবান হইয়া উঠিল যে, সে যখন বিষমিশ্রিত অন্ন লইয়া রামানুজের পাত্রে স্থাপন করিবে, তখন আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিয়া ফেলিস এবং কহিল, “বৎস, যদি প্রাণ বক্ষা করিতে চাও, অস্ত্রগ্রহণিয়া তিক্কা কব। এ অন্ন গ্রহণ করিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে।” শ্রীরামানুজ তচ্ছবণে কিংকর্্তব্যবিমূঢ়ের জায় অণকাল থাকিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, “আমি কি এমন অনিষ্ট করিয়াছি, বাহাতে প্রধানার্চক আমার প্রতি এইরূপ ভয়ঙ্কর আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন?” তিনি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্তমনস্কের জায় তথা হইতে উঠিলেন এবং শূন্যমনা হইয়া কাবেবীর দিকে আপনি চলিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহব অতীত হইয়া গিয়াছে। কাবেবী তীরস্থ বালুকা আতপতাপে অগ্নিবৎ উষ্ণ হইয়াছে। তিনি অনতিদূরে গোষ্ঠিপূর্ণকে সন্দর্শন পূর্বক সেই উষ্ণ সিক্তভাময় প্রদেশে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম কবিলেন। তিনি সেই অবস্থায় অনেকক্ষণ রহিলেন। পরে গোষ্ঠীপূর্ণ তাঁহাকে স্বয়ং উঠাইয়া বোদনের কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন কবিয়া কহিলেন, “হে ওবো, আমি প্রধানা-  
র্চকের মনেষ ছুববস্থা স্ববণ কবিয়া রোদন করিতেছি। এ ভীষণ মহা-  
পাতক হইতে তাহার কিসে নিষ্কৃতি হইবে, তাহা বলুন।” গোষ্ঠীপূর্ণ  
ইহা শুনিয়া কহিলেন, “বৎস, তোমার ছায় মহামুভব যখন সেই ছবাস্মার  
উদ্ধাবের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তখন আব তাহার কোনও ভয় নাই।  
অচিরাৎ সে পাপমার্গ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যমার্গের পথিক হইবে।”  
ওক শিষ্য পবম্পবেব নিকট হইতে বিদায় হইলেন। শ্রীবামান্নজ নঠে গমন  
কবিয়া দেখিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণ নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লইয়া তাঁহার  
জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্বক শিষ্যগণকে তৎ  
সংবাদ বর্ণন কবিয়া দিলেন এবং কাত্যাকেও উক্ত দিবসের ঘটনা জ্ঞাপন  
না কবিয়া নিবস্তব অর্চকব শুভচিন্তা কবিতে লাগিলেন।

এদিকে অর্চক গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়া যখন গুলিলেন যে, তাঁহার  
অর্চাদ্রী অরুতকার্য্য হইয়াছেন, তখন তাঁহার আব ক্ষোভের সীমা বহিঃ  
না। স্ত্রীলোকের মন সত্যবতঃ কোমল বলিয়া তিনি জামাকে ক্ষমা  
কদিলেন এবং তখনই আব এক উপায় উদ্ভাবন কবিয়া মনে মনে বড়ই  
সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীবামান্নজ প্রতিদিনই সন্ধ্যাব পর শ্রীবঙ্গনাথ স্বামী,  
সন্দর্শনার্থ মন্দিরে গমন কবেন। সেই দিবসও গমন কবিলেন। অর্চক  
তাঁহাকে স্নানজল পানার্থ দান করিলেন। তিনি পান কবিলেন ও বৃষ্টিতে  
পানিলেন যে, ইহা বিষমিশ্রিত। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হওয়া দূবে  
থাকক, বৎস তি উপাদেষ ও পবিত্র পীষুষ পানে যেক্রপ হর্ষের উদয় হয়,  
সেইক্রমেই পবাস কবিয়া শ্রীবঙ্গনাথ স্বামীকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন,  
“হে কৃপাণে, দাসের প্রতি আপনাব এত মেহ! এই দেহহুল্লভ  
পীষুষ অদ্য আমি কি পুণ্য লাভ করিলাম, বলিতে পারি না। ধন্ত তোমার  
অমুগ্রহ।” এই বলিয়া আনন্দে উন্নত হইয়া টলিতে টলিতে শ্রীমন্দির  
হইতে বহিঃগমন কবিলেন। অর্চক ভাবিলেন, বিষ ধবিয়াছে, এই জন্তই  
পদস্থলন হইতেছে। তাঁহার আব আনন্দের সীমা বহিল না। ভাবিলেন,  
পনদিন প্রাতঃকালেই রামান্নজের চিতাধূম আকাশপথ অবলম্বন করিবে।  
তিনি ইহা স্থিঃসিদ্ধান্ত কবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কাবণ, তিনি যে বিষ

প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা দশজন বলিষ্ঠ মনুষ্যকে একপ্রহরের মধ্যে ষমালয়ে প্রেরণ করিতে পাবে।

পূর্ব দিবস শ্রীরামানুজের চিত্তাধ্ব আকাশে না উঠিয়া বরং শত শত কর্ণ হইতে এককালে “ভজ যতিবাজং ভজ যতিরাজং ভজ যতিরাজং যুগ্মতে” এই আনন্দ সঙ্গীতের গগন ভেদ কবিতা অর্চকের হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। গৃহেব বাহিবে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, শ্রীবল্লভ যাবতীয় নবনাবী যতিবাজ শ্রীরামানুজকে নানাবিধ পুষ্পালঙ্কারে অলঙ্কৃত পূর্বক মণ্য-বর্তী কবিতা, উল্লু নৃতন গাথা গান পূর্বক নৃত্য করিতেছে। যতিবাজের লোচনযুগল আনন্দধানাপরিপ্লুত। বাহ্য দৃষ্ট কিছুই নাই। মন প্রাপ সমুদয়ই ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পিত। তাঁহার সেই দেবতুল্য কান্তি, অমূল্যমুখী জ্যোতিঃ, ও প্রেমময় বিগ্রহ অবলোকন কবিতা সেই বান্ধবের হৃদয়েও সযত্নের সঞ্চাব হইল। তিনি আপনার বিষপ্রয়োগ-রূপ ভয়ঙ্কর নৃশংসতার বিষয় চিন্তা করিয়া, শ্রীরামানুজকে অমরণধর্ম দেবতুল্য জ্ঞান কবিতা আর হিব থাকিতে পাবিলেন না। তিনি জনতার মধ্যে বেগে ধাবমান হইয়া শ্রীরামানুজের পদতলে গিয়া পতিত হইলেন। সহসা এই ব্যাপারে সঙ্গীতের ধামিমা গেল। সকলেরই চক্ষু প্রধানার্চকের উপর পতিত হইল। তখন অমৃতাপবণতঃ বোদন করিতে করিতে অর্চক কহিলেন, “তৎ যতিবাজ, আপনি মানব নহেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু; কলেবর ধারণ করিয়া আমার আয় ত্বাংগা-গণেব উচ্ছেদ সাধনের সজ্জ অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে আর বিলম্ব কেন প্রভো! শীঘ্র আমাকে ষমালয়ে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর ভার চরণ করুন। উঃ! আমি কি মহাপাতকী। কত লোককে বিষপ্রয়োগে নাশ করিয়াছি। তোমাকেও বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম; কিন্তু জানিতাম না যে, তুমি মৃত্যুও মৃত্যুরূপ। প্রতি প্রসয়কালে কত যমের নাশ করিয়াছ, আমার প্রতি প্রলয়ধামানে কত যুগ্মের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার সংখ্যা কে করিতে পাবে? আমি অতি নবান্দম। তোমার পাদস্পর্শ কবিতার যোগ্য নহি। আমাকে সমুচিত শাস্তি দিয়া আমার মহাপাতকেব প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। অতি অকৃতমোদন নবকে নানাবিধ যন্ত্রণার মধ্যে আমায় নিষ্কপ করুন। হুঃসহ যন্ত্রণানলে হযতো এই অসীম মহাপাতক কালক্রমে লঘু হইয়া যাইতে পারে। অযি দীনশরণ, আর বিলম্ব কেন? আমার শীঘ্র হস্তিপদতলে বা জলন্ত অঙ্গারে স্থাপন করুন। আর আমার মুহূর্ত্তযাত্রও

জীবন ধারণের সাধ নাই। নরক, নরক, নরক, তুমি কোথায়? এস, এস; শীঘ্র এই মহাপাতকীকে গ্রাস কর।” এই বলিয়া সবেগে ভূমির উপর মস্তকাঘাত কবিত্তে কবিত্তে সেই স্থানকে কধিবসিক্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্শ্বস্থ জনগণ নিরতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ নিরস্ত করিলেন। কিন্তু তিনি উত্তরোত্তর আবও অধীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তিনি হৃদয়ে কবাঘাত কবিয়া তাহা রক্তাক্ত কবিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ শোণিতরঞ্জিত হইল। অশ্রুবারি শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া শোণিতবর্ণ ধারণ কবিল। তাঁহার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। শ্রীবামাজ্জ ইতিমধ্যে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্ণণ পূরক তাঁহাকে শাস্ত্র কবিলেন। তিনি কহিলেন, “ভ্রাতঃ, আর হিংসাত্মকপরাযণ হইয়া নৃশংসের স্নায় আচরণ কবিও না। শ্রীবঙ্গনাথ স্বামী তোমার পূর্বকৃত সমুদয় অপবোধ ক্ষমা কবিলেন।” অর্চক কহিলেন, “কি! আমান স্নায় মহাপাতকীর প্রতিও তোমার এত দয়া! অথবা যখন তোমার বিগ্রহই দয়াগঠিত, যখন তুমি পাপীযসী পুতনাব বিষদিক্ত স্তন পান করিয়া তাহাকে স্নায় জননীর সহিত এক লোকে বাস কবিতাব অধিকার দিয়াছ, তখন এই নৃশংস নবাধমেব প্রতিও তোমার দয়া হওয়া অসম্ভব নয়। আহা! এমন দয়ালু পবিত্র্যগ কবিয়া আর কাহার শরণ লইব? হে দীনশরণ, তোমার এ কীর্ত্তি চিবকাল লোকে ঘোষণা কবিলে।” যতিবাজ ব্রহ্মপবন হইয়া তাঁহার গারে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। তদীয় শ্রীকবম্পর্শে অর্চকের সমস্ত সস্তাপ দূর হইয়া গেল, নৃশংস পিশাচ, দেবঋলাভ কবিলেন।

ক্রমশঃ।

## বাৎসরিকী ।

গেল গেল গেল ববষ চলিয়া  
কি কবিলু আমি তোমার লাগি,  
বৎসবেক পরে আগাতে সে স্মৃতি  
চিদাকাশে তাই উঠিলে লাগি।

কে ভাবিলে আব অত্যাগার তবে  
তুমি না ভাবিলে ককণাসিক্ত,  
তুমি মুক্তা মাত্র এহাদিসাগরে  
নাহি তাহে আর রতনবিন্দু।

অপাব কল্পণ নাহিক তুলনা  
জাগাতে ধরার পতিত জনে,  
কভু একাশনে কভু অনশনে  
ভ্রমিলে ধবাব নগরে বনে।

যে বাণী হৃদয়ে জাগিত সত্যত  
জাগাতে সে বাণী নরের মনে,  
কবি প্রাণপণ স্বার্থত্যাগ শত  
ব্যস্ত ছিলে দেব যামিনী দিনে।

হিমালয় হৃদি অগাধ কন্দরে  
ভুনেছিলে যেট প্রণবধ্বনি  
'অস্তি' 'ভাতি' 'প্রিয়' অপলগ্ন সরে  
উদ্ধত বাহায় তোমাব প্রাণী।

বম্বা বৃন্দাযন মাধব নিকুঞ্জে  
'পীতম পিযাব' অপূর্ণ গান  
ভুনেছ ধ্বনিত বাহা কুঞ্জে কুঞ্জে  
যাহাতে নাচিত তোমার প্রাণ।

নদীযাব গোবা ভাবে মাতোয়ারা  
প্রেমের নর্দন তবঙ্গলীলা  
যে ছবি তোমাব প্রাণ মনোহরা  
মানস নয়নে করিত খেলা।

গুরু নানকের সেবকগণের  
অপূর্ণ 'ওয়াই গুরু কি দ্যত'  
যে বাণী ভূনিয়া নাচিত সে হিয়া  
ব্যস্ত ছিলে বাহা মানবে দিতে।

বেদান্ত বৃক্ষের অনন্ত ছায়ায়  
'তত্ত্বমসি' গীত কেহ বা গায়;  
ঘটে পটে প্রাণ কেহ বা জাগায়  
কেহ বা নামের মহিমা গায়।

অধৈতের ভাব করি নিবীক্ষণ  
প্রাচীন নবীন সকল পথে,  
জগতের জীব করি সত্ত্বাষণ  
বুঝাইতে এই নুতন মতে।

এই সব কথা ছিল হৃদে গাঁথা  
বুঝাইতে তাহা মানবগণে,  
আপন জীবন করি সমর্পণ  
ভ্রমিলে ধরায় যামিনী দিনে।

অসহায় দেব ছিন্ন বাস ধরি-  
অনন্ত-ভুবার-আবৃত দেশে  
'তত্ত্বমসি' বাক্য দিতে ধনে ধনে  
অনশনে কত সয়েছ রেশে।

'নহি নহি নহি মেঘ-শিশু মোরা  
সিংহের কুমার জগত মাঝে'  
এই মহাবাণী জীব-মাতোয়ারা  
অজ্ঞ কাব আর শ্রীমুখে রাজে।

'অনন্তের মোবা সবে অধিকারী  
প্রেমসিদ্ধুনীরে হৃদয় ভরা'  
এই মহাতত্ত্ব প্রাণেন্দ্রাদকাবী  
মানবমনের তিমিরহরা।



কে আব দানিবে, কে আর কহিবে  
উঠ জাগ জীব প্রস্তুত হও ?  
কে আব কহিবে মানবে মানবে  
অভীপ্সিত বর ত্বায় লও ?

শুনিযাছি দেব, ছিল তব ব্রত  
ভাবতে কবিতে ধর্ম্মেব গুরু ;  
হইযাছে দেব, সে কার্য সাধন,  
শোভিছে হিন্দুব ধবম মেক ।

ব্রাহ্মণ-ইতব জাতিব উন্নতি  
ছিল তব দেব উদ্দেশ্য আব ;  
দ্বিভ্র অনাথ ইতব সংহতি  
পেযেছে সন্ধান পেযেছে তার ।

আচণ্ডাল জীব সবে অধিকারী  
উন্নত কবিতে আপন প্রাণ  
পেযেছে এতদ জীব-হিত কবী  
ছড়ায়ে পড়েছে নূতন জ্ঞান ।

তাই আজি তব গুরুদাতাগণ  
চলেছে তোমাব চালিত পথে,  
অগ্নি ইষ্টদেব যুগল চরণ  
চলেছে জীবন মহান ব্রতে ।

ধারে ধারে ফিবে লয়ে জ্ঞানবাশি  
তুলিতে জগত পতিত জনে  
ধারে ধাবে ফিরে সাধিগা সন্ন্যাসী  
পুঁবিল জগত মঙ্গল গানে ।

জীব-সেবা-ব্রত কবিধা ধারণ  
ভ্রমিছে তাহাবা ভুবনময় ;  
নারায়ণ সেবা কবে নাবায়ণ  
তোমাব(ই) সে শিক্ষা প্রচাব হয় ।

কবে হবে দেব সে দিন আমার  
অবিধা বাক্যীব চরণ দুটি  
অনাথের মত সেবিব অনাথে  
জ্ঞানমূর্য্য সঙ্গ উঠিবে ফুটি ?

যাবে অহমিকা হবে তিবোহিত  
অধম মনের তিমির ঘোর ?  
কবে হবে দিন সাধি জীব-হিত  
করিবে নয়নে প্রেমের লোব ?

দিযাছ অনেক বহু জনে দেব !  
দাও কিছু এই পতিত জনে ,  
খুলে যাক তাব হৃদয় ভাণ্ডার  
সেও কিছু দিক স্বজনাগণে ।

কিরণ ।

## সংবাদ ও মন্তব্য ।

আগামী ২রা মাঘ, ১৫ই জানুয়ারি ববিবার দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী বাসমণির দেবালয়ে ভগবান শ্রীবাক্ষদেবের মাঘ-মহোৎসব হইবে ।

কিছুদিন হইল, মাযাবতী অধৈত আশ্রমে জনৈক বজ্রব অর্থাল্লুকলো একটি দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছে ও তাহাব তত্ত্বাবধানের জন্ত মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করা হইয়াছে। মাযাবতী কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত। এ অঞ্চলেব লোকেরা অতি দরিদ্র। সমতল প্রদেশের সঙ্গদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য তাহাদের নিকট পহুছে না। এই কাবণে এখানকার অনেকে ২১৩ নংসব ধবিয়া বিনা চিকিৎসায বোগ ভোগ কবিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এখানে দরিদ্র লোকের মধ্যে রোগের এত আতিশয্য যে, অজ্ঞ জনগণের ঔষধাপেক্ষা দেবতার রূপায় অধিক বিশ্বাস থাকিলেও এমন কি, ৩০ মাইল দূর হইতেও বোগিগণ চিকিৎসার্থ এখানে আসিয়া থাকে। অল্প অল্প দূর হইতে ত অনেকেই আসে। ইহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান না দিলে ইহাদের চিকিৎসা করা অসম্ভব। আবার একজন লোকের দ্বাও সমুদয় কার্যগুলি সুনিয়মিতভাবে চলে না। এই সকল কাবণে এই কার্যকে স্থায়ী করিবার জন্ত অর্থসাহায্য আবশ্যিক। সঙ্গদয় সাধাবণকে এই কার্যে সাহায্যের জন্ত আহ্বান করা যাইতেছে। সাহায্যদাতাগণ তাহাদের সাহায্য স্বামী সুরুপানন্দ, অধৈতশ্রম, মাযাবতী, লোহাঘাট পোঃ (আলমোড়া) ঠিকানায পাঠাইবেন। বিগত জুন মাস পর্যন্ত ছয় মাসে এখানে সর্বশুদ্ধ ৬৬৬ জন বোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

আজকাল আমরা অনেকে দেশের হিতচিন্তা করিতেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন দেশের জন্ত যথার্থ কাতর? আমাদের মধ্যে কয়জন দেশের জন্ত নিজের ব্যক্তিগত গুণস্বার্থ নিজ সাংসারিক উন্নতির আশা প্রভৃতি ছাড়িতে প্রস্তুত? কয়জন দেশকে যথার্থ ভালবাসেন?—যে ভালবাসায় মানুষ পাগল হয়—মানুষ মরিতে প্রস্তুত হয়? প্রিজ্ঞাসা করি কয়জন?

আমাদের ভারতভূমির দুর্দশাব কাবণ কি কেবল ইংবাজের শাসননীতি? রাজনৈতিক আন্দোলনেই কি আমাদের সুখের দিন নিকটবর্তী হইবে? আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত দোষ কি কিছুই নাই? সে কি দোষ? তন্নিবারণের কি কোন উপায় হয় না? সমগ্র প্রজাশক্তির ভিতর কি কোন মহাশক্তি নিদ্রিত নাই, যাহা জাগ্রিত হইলে রাজশক্তির সহায়তানিরপেক্ষ হইয়া প্রজাকুল নিজেদের হিত নিজেবা সাধন কবিতে পাবে? এই সমস্তা লইয়া আজ আমবা বিব্রত । কে ইহাব প্রকৃত উত্তর দিবে?

ইহা সত্য যে, কোন কার্যাই বিফল নহে । রাজনৈতিক আন্দোলনও একেবারে বৃথা হইবে না । কিন্তু বুঝিতে হইবে, উহাই আমাদের উন্নতির সর্বোত্তম উপায় নহে । সমাজরূপ নিবাট দৈত্য একবার জাগিয়া উঠিলে নানারূপে নানাদিকে নানা চেষ্টা হইবে । তন্মধ্যে সকলগুলিই অল্প বিস্তব কল্যাণেব সহায়ক । উহাব মধ্যে আবার যে পথে আমাদের আত্মনির্ভরবৃত্তি সবিশেষ বিকশিত হয়, সেইটাই সমধিক কল্যাণের নিদান ।

আমবা নিজেব মুক্তি সাধন ও সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির মুক্তিসাধনের চেষ্টাকেই আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্থল বলিয়া বিবেচনা কবি । এই মুক্তি আমাদের সকলেব আদর্শ হইলেও ইহাব পথ সকলের পক্ষে এক নহে: এ বিষয়ে ব্যক্তিগত, জাতিগত, দেশগত অধিকাবভেদ আছে ।

এই জন্ত কোন ব্যক্তিব পক্ষে উন্নতির উপায় সংসার, কাহারও পক্ষে সন্ন্যাস । কাহারও জ্ঞান, কাহারও তত্ত্ব, কাহারও কর্ম । বিভিন্ন জাতিবও সেইরূপ বিভিন্ন রূপ ভাব আছে । কোন জাতি ভোগের চরম দশায় উপস্থিত । তাহাদেব পক্ষে বৈবাগ্য বা নিরুক্তিধর্ম । কোন জাতি বা সমগ্র জীবনে ভোগ কাহাকে বলে, তাহা জানেনা, তাহাদেব অনেকব হয়ত দিনান্তে অর্দ্ধাশনও জুটে না । তাহাদেব পক্ষে ভোগের পথ প্রশস্ত না কবিলে তাহাবা মোক্ষমার্গে কখনও অগ্রসব হইতে পারিবে না ।

ভাবতে এখন অন্নর অভাব, লৌকিক বিদ্যায় অভাব । কিসে অন্নাতাব খুচিবে, কিসে বিদ্যা বিস্তার হইবে, এই চিন্তায় ভাবতেব মনীষিগণ অনেকব ব্যস্ত হইয়াছেন । এ সমস্তাব কেহ মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন কি ?

তং স্বাং দীপ্তহতাশবক্তং সতেন্দ্রস্যা বিশ্বমিদং তপস্তং নাপ্যন্তম্ । ১৯।

ভাষ্যানুবাদ । (আরও দেখিতেছি যে তুমি) “অনাদিমধ্যান্ত” যে তোমার আদি মধ্য ও অন্ত নাই, সেই তুমি অনাদিমধ্যান্ত, সেই অনাদি-মধ্যান্ত তোমাকে (দেখিতেছি) । “অনন্তবীৰ্য্য” যে তোমার বলবোধ অশ্রু নাই, সেই তুমি অনন্তবীৰ্য্য, সেই অনন্তবীৰ্য্য তোমাকে (দেখিতেছি) । সেইরূপ “অনন্তবাহু” যে তোমার বাহুসমূহ অনন্ত, সেই তুমি অনন্তবাহু তোমাকে (দেখিতেছি) । “শশিস্বর্য়ানেন” যে তোমার নেত্রদ্বয় চন্দ্র ও স্বর্য়্য, সেই তুমি শশিস্বর্য়ানেন, সেই চন্দ্রস্বর্য়্যানেন তোমাকে (দেখিতেছি) । “দীপ্তহতাশবক্ত” দীপ্ত হতাশ অর্থাৎ অগ্নি তোমার বক্তৃ (অর্থাৎ) মুখ, সেই তুমি দীপ্ত হতাশবক্ত, সেই দীপ্তহতাশবক্ত তুমি তোমার নিজেকে হেতু হেতু দ্বারা এই বিশ্বকে প্রাপ্ত করিতেছ, ইহা আমি দেখিতেছি । ১৯।

দাবাপুথিব্যাবিদমন্তবং চি

ব্যা ১২ দাব কন্যা ১৭, ১৮ ১। ১৬

দুট্টা ইদুতং কানিনং তবোণ

নোকসং প্রবাসিতং মহাশ্বন ॥ ২০ ॥

অর্থ । (হে) মহাশ্বন! ব্যা হি একেন ইদং দাবাপুথিব্যাবিদমন্তবং ব্যাপ্তং, সন্ধ্যা দিশশ্চ (ব্যাপ্তাঃ) । তব ইদং অদুতং উগ্রং কানিনং দুট্টা লোকবৎ প্রবাসিতমাশ্বন।

মুণ্ডানুবাদ । হে মহাশ্বন, তুমি একাকীই যেহেতু এই জ্বালোক ও পৃথিবীর মধ্যভাগ ব্যাপিয়া বহিয়াছ এবং সর্ববলিক্ (ও তুমি ব্যাপিয়া বহিয়াছ) সেই হেতু তোমার এই অদুত অথচ ভাবদরূপ বিলোকন করিয়া দ্বিলোক ব্যথা পাইতেছে । ২০।

ভাষ্য । দাবাপুথিব্যাবিদমন্তবং অস্ত্রীকং ব্যাপ্তং ইয়া একেন বিশ্ব-রূপধবেণ দিশশ্চ সন্ধ্যাব্যাপ্তাঃ । দুট্টা উপলভ্য অদুতং বিশ্রাপকং রূপ-মিদং তবোণং ক্রুৎ লোকানাং স্বয়ং প্রবাসিতং ভীতং প্রত্নিতং বা মহা-শ্বন অক্ষুদ্রভাবাঃ ২০।

ভাষ্যানুবাদ । দ্যৌ এবং পৃথিবীর এই অস্ত্র অর্থাৎ অস্ত্রবীক্ষকে তুমি একাকী ব্যাপিয়া রহিয়াছ । এবং দিক্‌গমুও তুমি ব্যাপিয়া বহিয়াছ । তোমার “অদুত” বিশ্বরাজনক এবং “উগ্র” ক্রুর এইরূপ দেখিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১১। ] ৪ উদ্বোধন । ৬৩৩

এই “লোকত্রয়” তিনটি লোক ( অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্য ও রসাতল ) “প্রব্যথিত” অর্থাৎ ভীত বা প্রচলিত হইতেছে। হে মহাত্মন ( অর্থাৎ ) অক্ষুদ্র-  
স্বভাব । ২০।

অমী হি ত্বাং সুবসজ্জা বিশস্তি

কেচিদ্ভীতাঃ প্রাজ্ঞলয়োগৃণস্তি ।

স্বত্তীত্বাত্মা মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ

স্তবস্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্কলাভিঃ ॥২১॥

অর্থ্য। অমী সুবসজ্জাত্বাং বিশস্তি, কেচিৎ ( সুবসজ্জা ) ভীতাঃ  
প্রাজ্ঞলয়ঃ ( সন্তঃ ) ত্বাং গৃণস্তি । মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ স্ততি ইত্যাত্মা পুঙ্কলাভিঃ  
স্ততিভিঃ ত্বাং স্তবস্তি । ২১।

মূলানুবাদ। এই কতকগুলি দেবতা তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে,  
আবার কতকগুলি দেবতা ভয় পাইয়া ও বকাজলি হইয়া তোমার স্তুতি  
করিতেছে। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্ততি এই শব্দোচ্চারণপূর্বক অথও স্ততি-  
নিবহেব দ্বারা তোমার গুণ কীর্তন করিতেছেন । ২১।

ভাষ্য। অত্যাধুনা পূর্বা “যদ্বা জন্মে যদি বা নো জয়েয়ু” বিতর্জুনস্ত সংশয়  
আসীৎ তদ্বিগ্নায় পাণ্ডবজয়মেকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবক্তো ভগবান্  
তং পশ্যামাহ কিঞ্চ অমী হি যুধ্যমানা যোদ্ধারঃ ত্বা ত্বাং সুবসজ্জা যেহত্র  
ভূতাবহরণায়াবতীর্ণা ববাদিদেবসজ্জা মহুয্যসংস্থানাং বিশস্তি প্রবিশন্তো  
দৃশ্যন্তে । তত্র কেচিদ্ভীতাঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সন্তঃ গৃণস্তি স্তবস্তি ত্বামন্ত্রে পলায়নেহপা-  
শক্তাঃ সন্তঃ যুদ্ধে প্রতু্যপস্থিতে উৎপাতাদিনিমিত্তান্যাপলক্ষ্য স্বত্যস্ত জগত  
ইত্যাত্মা মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ মহর্ষীগাং সিদ্ধানাঞ্চ সজ্জাঃ স্তবস্তি ত্বাং স্ততিভিঃ  
পুঙ্কলাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ । ২১।

তাত্পর্যবাদ। এক্ষণে “আমবা জয়ী হইব বা আমাদিগকে ( তাহাবা )  
জয় করিবে?” এই প্রকাব যে সংশয় অর্জুনের হইয়াছিল, তাহার নির্ণ-  
য়ার্থ “পাণ্ডবের জয় যে অবশ্যস্বাভাবী, তাহা দেখাইব,” এই তাবে ভগবান্  
প্রবৃত্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া অর্জুন আবশ্য বলিতেছেন যে,—এই যুদ্ধে  
প্রবৃত্ত যোদ্ধাগণ ( ইহাবা ) দেবসমূহ ( অর্থাৎ ) ভূমিব ভারহরণ করিবার  
জন্ত যে সকল বস্তু প্রভৃতি দেবগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাবাই মহুযা  
উদ্বোধন । [ ৬ষ্ঠ—২০শ সংখ্যা ;

আকার ধারণ পূর্বক ( যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও ) “ স্বা ” তোমার দেহেতে  
প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইহা দেখা যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে ( আবাব )  
কেহ বা ভীত হইয়া অঞ্জলিবন্ধসহকারে তোমার গুণবর্ণনা করিতেছেন।  
( আবাব ) পলায়নে অসমর্থ হইয়া ( এবৎ ) এই উপস্থিত যুদ্ধে উৎপাতাদি  
নানা ভয় নিমিত্ত দর্শন করিয়া “জগতের মঙ্গল হউক” এই কথা উচ্চা-  
রণ পূর্বক অত্যাচ্ছ মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সম্পূর্ণরূপে নানাবিধ স্তুতি দ্বারা  
তোমার স্তব করিতেছেন ।২১।

---

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা

বিশ্বেঋণিনৌ মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।

গন্ধর্ব্বক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা

বীক্শস্তে স্বাং বিম্বিতাষ্টশ্চব সর্কে ॥২২॥

অর্থ্য । যে রুদ্রাদিত্যা বসবঃ সাধ্যাঃ বিশ্বে ( দেবঃ ) মরুত উন্নপাঃ  
চ গন্ধর্ব্বক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জাশ্চ ( তে ) সর্কে বিম্বিতা এব স্বাং বীক্শস্তে ।২২।

মূলানুবাদ । যে সকল রুদ্র, আদিত্য, বশু, সাধ্যা, বিশ্ব, অশ্বিনীকুমার-  
দ্বয়, মরুৎ নামক দেবতাগণ এবং উন্নপনামক পিতৃগণ (আছেন) তাহাবা এবং  
গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিম্বিত হইয়া তোমাকে দেখি-  
তছেন ।২২।

ভাষ্য । কিঞ্চাচ্চৎ রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা কদ্রাদয়ঃ গণাঃ  
বিশ্বে, অশ্বিনৌ চ দেবৌ মরুতশ্চ উন্নপাশ্চ পিতরঃ, গন্ধর্ব্বক্ষাসুবসিদ্ধ-  
সজ্জাঃ গন্ধর্ব্বা হাহাহুপ্রভৃত্যঃ অসুবা বিবোচনপ্রভৃত্যঃ সিদ্ধাঃ কপিল-  
দয়ঃ তেষাং সজ্জাঃ গন্ধর্ব্বক্ষাসুবসিদ্ধসজ্জাঃ তে বীক্শস্তে পশুন্তি স্বা স্বাং  
বিম্বিতা বিম্বয়মাপনাঃ সন্তস্তে সর্ক এব ।২২।

ভাষ্যানুবাদ । আবও কদ্র ও আদিত্যগণ, বশু ও সাধানামক দেবগণ,  
বিশ্বদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসংজ্ঞাদারী দেবগণ ও উন্নপনামধারী  
পিতৃগণ,—এবং হাহা ও হুহ নামক গন্ধর্ব্বগণ, কুবের প্রভৃতি যক্ষগণ,  
বিবোচনপ্রমুখ অসুরগণ ও কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ ( এই সকল দেবতা-  
দিগের সমূহ একত্র হইয়া ) বিশ্বমসহকারে সকলেই তোমাকে দেখিতে-  
ছেন ।২২।

কপং মহন্তে বহুবক্ত্রনেত্রঃ

মহাবাহো বহুবাহুকপাদম্ ।

বহুদনং বহুদংষ্ট্রাকবালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রবাথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥

অর্থঃ। হে মহাবাহো তে বহুবক্ত্রনেত্রঃ বহুবাহুকপাদং বহুদনং  
বহুদংষ্ট্রাকবালং মহৎ কপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ অহং চ প্রবাথিতাঃ ॥২৩॥

মন্তব্যম্। হে মহাবাহো এই বহু মুখ ও নয়নযুক্ত, অনেক বাহু,  
চক্র ও পাদযুক্ত, অসংখ্য উদরযুক্ত এবং বহুদনসংখ্যক ভয়ঙ্কর তোমার  
এ প্রকাণ্ড বপুঃ দেখিয়া এই সকল লোক এবং আমিও নিতান্ত প্রবাথিত  
হইতেছি ॥২৩॥

ভাষ্য। যজ্ঞাৎ কপং মহদতিপ্রমাণং তে তব ‘বহুবক্ত্রনেত্রঃ’ বহুনি  
বক্ত্রাণি মুখাণি নেত্রাণি চক্ষুর্বা যজ্ঞিন্ তদপং বহুবক্ত্রনেত্রঃ হে মহাবাহো  
“বহুবাহুকপাদম্” বহুঃ বাহবঃ উববঃ পাদাশ্চ যজ্ঞিন্ কপে তদ্ বহুবাহুক-  
পাদম্, বিধ্বংসনং বহুদংষ্ট্রাকবালং বহুদংষ্ট্রাচরঃ কবালং বিকৃতং  
বহুদ প্রাকবালং দৃষ্ট্বা কপাদৃশং লোকাঃ প্রাণিনঃ প্রবাথিতাঃ প্রচলিতা  
স্ময়েন তথাহমপি ॥২৩॥

ভাস্কর্যম্। যে কারণ- তোমার এইরূপ ( শরীর ) “মহৎ” অতি বৃহৎ  
( এবং ) “বহুবক্ত্রনেত্রঃ” বহু ( অর্থাৎ ) অনেক “বক্ত্র” মুখ এবং “নেত্র”  
চক্ষুঃ যেকপে আছে, তাহা বহুবক্ত্রনেত্রঃ হে মহাবাহো ( এবং ঐরূপ )  
“বহুবাহুকপাদম্” যেকপে অনেক বাহু উরু এবং পাদ আছে, তাহাই বহু-  
বাহুকপাদ এবং “বহুদনং” ( অর্থাৎ ) অসংখ্য উদর যেকপে বিদ্যমান আছে,  
তাহা বহুদন, এবং বহুদংষ্ট্রাকবাল অর্থাৎ অসংখ্য দস্তবাজি দ্বারা “কবাল”  
বিকৃত ও ভয়ঙ্কর, এই প্রকার তোমার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া “লোক”  
লৌকিক প্রাণিগণ এবং আমি ‘প্রবাথিত’ ভয়ে প্রচলিত হইতেছি ॥২৩॥

নভঃস্পৃশ দীপ্তমনেকবর্ণঃ

বাস্তাননং দীপ্তবিশাগনৈব্রহ্ম ।

দৃষ্ট্বা হি বাৎ প্রবাথিতাস্তবাস্মা

প্রতি ন বিন্দামি শমং চ রিকো ॥২৪॥

অর্থঃ। হে বিষ্ণো নভঃস্পৃশং দীপ্তং অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্ত-  
বিশালনেত্রং ত্বং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতাস্তবায়ী (অহং) স্তুতিং শমং চ ন বিন্ধ্যামি ৷২৪৷

মূলানুবাদ। হে বিষ্ণো তোমার দেহ গগনস্পর্শী এবং দীপ্তিমান,  
তোমার বর্ণ অনেক প্রকার, তুমি মুখবাদান কবিয়া বহিষাছ, তোমার  
নেত্র অতি বিস্তৃত ও দীপ্তিয, তোমাকে দেখিয়া আমিাব অস্থবায়ী বাথা  
পাইতেছে, আমি দৈর্ঘ্য ও শান্তিলাভ কবিত পাবিতেছি না ৷২৩৷

ভাষ্য। নভঃস্পৃশং দ্ব্যাম্পৃশমিতার্থঃ দীপ্তং প্রজ্বলিতং অনেকবর্ণং  
অনেকে বর্ণভয়বদা নানাসংস্থানা যস্মিন্ দ্বয়্যি তং হামনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং  
বিস্তৃতানি আননানি মুখানি যস্মিন্ দ্বয়্যি তং ত্বং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশাল-  
নেত্রং দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রাণি যস্মিন্ স্তুতি  
তং ত্বং দীপ্তবিশালনেত্রং দৃষ্ট্বা হি ত্বং প্রব্যথিতাস্তবায়ী প্রব্যথিতঃ প্রতীতো-  
হস্তবায়ী মনো বত্ মন সোহহং প্রব্যথিতাস্তবায়ী সন্ স্তুতিং দৈর্ঘ্যং ন  
বিন্ধ্যামি ন লভে শমং চ উপশমং মনতৃষ্ণং হে বিষ্ণো ৷২৪৷

ভাষ্যানুবাদ। নভঃস্পৃশ্ অর্থাৎ ‘গগনস্পর্শী - দাপ্ত’ প্রজ্বলিত ‘অনেক-  
বর্ণ’ অনেকবর্ণ অর্থাৎ ভয়বদা নানাসংস্থানা রূপ যোগ্য হয়, তাহাব  
নাম অনেকবর্ণ তুমি সেই অনেকবর্ণ, ‘ব্যাত্তানন’ ব্যাত্ত অর্থাৎ বিস্তৃত  
হইয়াছে আননঃমূহ মুখনিচয় যে তোমাব সেই তুমি ব্যাত্তানন ‘দীপ্ত-  
বিশালনেত্র’ ‘দীপ্ত’ প্রজ্বলিত ‘বিশাল’ বিস্তৃত হইবে নেত্রসমূহ যে তোমাব,  
সেই তুমি দীপ্তবিশালনেত্র এক প্রকার বিচিহ্নাকার। তোমাকে দেখিয়া  
হে বিষ্ণো, আমি ‘প্রব্যথিতাস্তবায়ী’ যাহাব ‘অস্থবায়ী’ মন প্রব্য-  
থিত, অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়াছে, সেই আমি প্রব্যথিতাস্তবায়ী (হইতেছি) এবং  
‘স্তুতি’ দৈর্ঘ্য লাভ কবিত পাবিতেছি না ও ‘শম’ উপশম অর্থাৎ মনস্তৃষ্ণ  
(লাভ কবিত পাবিতেছি না) ৷২৪৷

দংষ্ট্রাকবাল নিচ তে মুখানি

দৃষ্টে কাল নলসান্তানি।

দিশোন জামে ন লভে চ শম

প্রসীদ দেবেশ জগদ্বাস ৷২৫৷



অথ্য। দংষ্ট্রাকরালানি কালানলসন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্ৱা দিশো ন জানে ন চ শর্ম্ম ভতে হে দেবেশ জগন্নিবাস প্রসীদ । ২৫ ।

মূলানুবাদ। তোমার মুখসমূহ দংষ্ট্রাবাজি দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ মুখসকল যেন প্রলয়কালীন হতাশনের আঘ জ্বলিতেছে। ঐ সকল মুখ দেখিয়া আমি দিগ্ভ্রান্ত হইয়াছি, আমি কিছুতেই স্থথ পাইতে-  
ছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

ভাষ্য। কস্মাদ দংষ্ট্রাকবালানি দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি তে তব মুখানি দৃষ্ট্ৱে বোপলভ্য কালানলসন্নিভানি প্রলয়কালে লোকানাং দাহকো-  
হগ্নিঃ কালানলন্তংসংনিভানি কালানলসদৃশানি দৃষ্ট্ৱে ত্যতং দিশঃ পূর্বাপর-  
বিবেকেন ন জানে দিওঁ মূঢ়ো জাতোহস্মি অতো ন জতে চ নোপলভে চ শর্ম্ম  
সুখমতঃ প্রসীদ প্রসন্নোভব হে দেবেশ জগন্নিবাস । ২৫ ।

ভাষ্যানুবাদ। কি কারণে?—“দংষ্ট্রাকরাল” দন্তরাজি দ্বারা করাল বিকৃত  
তোমার মুখসমূহকে দর্শন করিয়া (কিরূপমুখ?) “কালানলসংনিভ” প্রলয়-  
কালে লোকসমূহদাহকাবী যে অগ্নি, তাহাকে কালানল কহে, সেই  
কালানলের সংনিভ অর্থাৎ সদৃশ (তোমার মুখ) দেখিয়া এই এইপ্রকার  
পৃথক্ভাবে বুঝিতে পারিতেছি না অর্থাৎ আমি (ভয়ে) দিওঁ মূঢ় হইয়াছি  
এবং “শর্ম্ম”সুখ লাভ কবিত্তে পারিতেছি না। হে দেবেশ, হে জগ-  
ন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও। ২৫।

অমী চ ত্বাং ধৃতবাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ

সর্কে সহৈবাবনিপালসংজ্ঞৈঃ ।

ভীষ্মো দ্রোণঃ স্ততপুত্রস্তথাহসৌ

সহায়দীয়েবপি ঘোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥

অথ্য। অমী ধৃতবাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ সর্কে (এব) অবনিপালসংজ্ঞৈঃ সহ (তথা)  
ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ স্ততপুত্রস্ত অশ্বদীয়েঃ ঘোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বাং (বিশক্তি) । ২৬

মূলানুবাদ। ঐ ধৃতবাষ্ট্রের পুত্রসকল অবনিপালগণের সহিত তোমার  
মধ্যে প্রবেশ কবিত্তেছে এবং ঐ ভীষ্ম ঐ দ্রোণ এবং এই স্ততপুত্র আমার-  
দেব পক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠগণের সহিত তোমাতে মিশিয়া  
বাইতেছে। ২৬।

ভাষ্য। যেভ্যো নম পরাজয়াশক্তা আসীৎ সা চাপগতা বন্দ্যাত্ অমী চ  
বাৎ শ্বতরাষ্ট্রপুত্রাঃ দ্ব্যর্থোদনপ্রভৃতয়ঃ “ত্বরমাণা বিশস্তি” ইতি ব্যবহিতেন  
সম্বন্ধঃ সর্বৈ সঠৈব সংহতা অবনিপালসত্ত্বৈঃ অবনিং পৃথ্বীং পালয়ন্তি ইতি  
অবনিপালান্তেষাং সত্ত্বৈঃ। কিঞ্চ ভীষ্মঃ দ্রোণঃ স্ততপুত্রঃ কর্ণঃ তথাসৌ,  
সহাস্রদীপৈরপি ধৃষ্টদ্যায়প্রভৃতিভিঃ যোধমুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ সহ। ২৬।

ভাষ্যানুবাদ। যাহাদের নিকট হইতে আমার পবাক্রয়ের আশঙ্কা ছিল,  
এক্ষণে সেই আশঙ্কা অপগত হইয়াছে, কাবণ (তাহারা অর্থাৎ) শ্বতবাষ্ট্রের  
পুত্রগণ (অর্থাৎ) দ্ব্যর্থোদন প্রভৃতি অবনিপতিগণের সহিত “ত্বরমুক্ত হইয়া  
তোমার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে” (এই ব্যবহিত বাক্যাংশেব ইহার  
অর্থ করিতে হইবে) অবনি অর্থাৎ পৃথিবীকে যাহারা পালন কবে, তাহা-  
দিগকে অবনিপাল কহে, তাহাদের সত্য অর্থাৎ সমূহ এই অর্থে অবনিপাল-  
সত্ত্ব এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আরও ভীষ্ম, দ্রোণ এবং স্ততপুত্র কর্ণ ইহাবাও  
আমাদের পক্ষের যোদ্ধা প্রধান ধৃষ্টদ্যায় প্রভৃতির সহিত (তোমার দেহে  
প্রবেশ করিতেছে) “যোধমুখ্য” যোধশব্দেব অর্থ যোদ্ধা, তাহাদের প্রধান  
পুরুষগণকে যোধমুখ্য বলা যায়। ২৬।

বক্তৃগি তে ত্বরমাণা বিশস্তি

দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্ বিলগ্না দশনাস্তবেষু

সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈকস্তমাজৈঃ ॥ ২৭ ॥

অন্থ্য। ত্বরমাণাঃ (এতে দ্ব্যর্থোদনাদয়ঃ) তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি  
বক্তৃগি বিশস্তি, কেচিৎ দশনাস্তবেষু বিলগ্না চূর্ণিতৈকস্তমাজৈঃ সংদৃশ্যন্তে। ২৭।

মূলান্তবাদ। (এই সকল দ্ব্যর্থোদন প্রভৃতি) ত্বরার সহিত তোমার দংষ্ট্রা-  
বিষম ভয়ানক মুখনিবহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, কেহবা তোমার দশন-  
রাজি মধ্যে বিলগ্ন রহিয়াছে, উহাদের মস্তকসকল (তোমার দস্তাযাতে) চূর্ণিত  
হইয়া গিয়াছে। ২৭।

ভাষ্য। বক্তৃগি মুখানি তে তব ত্বরমাণাস্তবায়ুক্তাঃ সন্তে। বিশস্তি কিং-  
বিশিষ্টানি মুখানি? দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি তৎকরাণি। কিঞ্চ কেচিৎ  
মুখানি প্রবিষ্টা লভ্যন্তে চূর্ণিতৈশ্চূর্ণীকৃতৈকস্তমাজৈঃ শিরোভিঃ। ২৭।

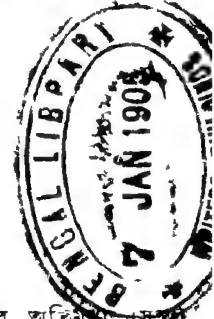
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩১১।]

উদ্বোধন।

৬৩৯

ভাষ্যানুবাদ । “স্বৰূপ” স্বৰূপ হইয়া ( ইহা বা ) “তৈ” তোমার “বক্তৃ”  
মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে । কিন্তু মুখ ৭ দংশ্ট্রাকবাল ও “ভয়ানক”  
ভয়ঙ্কর । আরও তোমার মুখের মধ্যে যা হাবা প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহাদেব  
মধ্যেই কেহ কেহ তোমার “দশনাস্তর” দন্তসমূহের মধ্যে ভক্ষিত মাংসপণ্ডের  
ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছে, এইরূপ দেখা যাইতেছে । তাহাদেব “উত্তমাজ্জ” মস্তক-  
সমূহ ( দন্তাঘাতে ) “চূর্ণিত” চূর্ণীকৃত হইতেছে । ২৭ ।

যথা নদীনাং বহবোহস্তুবেগাঃ  
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।  
তথা ত্বামী নবলোকবীৰ্য্য  
বিশস্তি বক্তৃণ্যতিবিজ্ঞানন্তি ॥ ২৮ ॥



অর্থ । যথা বহবো নদীনাং অস্তুবেগাঃ সমুদ্রং এব অভিমুখা দ্রবন্তি  
তথা অমী নবলোকবীৰ্য্য অতিবিজ্ঞানন্তি তব বক্তৃণ্যতি বিশস্তি । ২৮ ।

মূলানুবাদ । যেমন নদীগণেব অনেক জনবেগ সমুদ্রেব অভিমুখে ধাবমান  
হয়, সেইরূপ এই সকল মনুষ্যবীৰ্য্যগ তোমার ঐ প্রদীপ্ত মুখনিবহ অভিমুখে  
প্রাণে কবিতোছে । ২৮ ।

ভাষা । কথং প্রবিশন্তি মুখানি ইত্যাহ যথা নদীনাং অস্তুবেগাঃ বহবো-  
হনেকে অস্তুনাং বেগা অস্তুবেগাস্থবাবিশেষাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা প্রতিমুখা  
দ্রবন্তি প্রবিশন্তি যথা তদং তব অমী ভীয়াদযঃ নবলোকবীৰ্য্য মনুষ্যালোক-  
শূবা বিশস্তি বক্তৃণ্যতিবিজ্ঞানন্তি প্রকাশমানানি । ২৮ ।

ভাষ্যানুবাদ । কিন্তু মুখের মধ্যে প্রবেশ কবিতোছে, তাহাই বলিতে-  
ছেন । যেমন “নদী” স্রোতস্বতীগণেব “বহ” অনেক “অস্তুবেগ” জলের  
“বেগ” স্বাবিশেষ অভিমুখ হইয়া সমুদ্র প্রবেশ কবিয়া থাকে, “তথা”  
সেইরূপ এই ভীয়াপ্রভৃতি “নবলোকবীৰ্য্য” মনুষ্যালোকেব শূবগণ সবতঃপ্রকাশ-  
মান তোমার মুখসমূহের মধ্যে প্রবেশ কবিতোছে । ২৮ ।

যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা  
বিশস্তি নাশ্য সমুদ্রবেগাঃ ।

## তিব্বতে তিন বৎসর ।

স্বামী অখণ্ডানন্দ । ]

পূর্বপ্রকাশিতের পর । ]

আমি সেই দিব্যেব আন্তরিক চেষ্টায় ২৩ দিনের মধ্যেই স্তূহ হইলাম । কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রমণক্রম না হইতে হইতেই উত্তরকাশী হইতে আমি টীহবী অভিমুখে যাত্রা কবিত্তে উদ্যত হইয়াছি দেখিয়া আমাব জীবনদ্যাতারূপ সেই উদাব পুরুষেব হৃদয় গলিল । সে আমাকে সেইখানে আবও দুই চাবি দিন থাকিয়া সম্পূর্ণ স্তূহ ও সবলকায হইয়া যাত্রা কবিত্তে পুনঃ পুনঃ অনুবোধ কবিল । আমাব ভ্রমণেব এখনো অনেক বাকী স্মতরাং আমাব ধীরে ধীরে চলিয়া যাওয়াই উচিত, পথে বসিয়া থাকিলে আমাব যাত্রা পূর্ণ হইবে না বলিয়া আমি তাঁহাকে কোনরূপে আশ্বাস দিয়া উত্তরকাশী হইতে যাত্রা করিলাম । আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই দেবচরিত্র লোকটী অনেক দূব আসিল । অকারণ আমার প্রতি তাহার নিঃস্বার্থ অকপট প্রীতির বিষয় ভাবিয়া আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতাবসে পূর্ণ হইল এবং কি বলিয়া যে আমি তাহার ধন্যবাদ করিব এবং কি বলিয়া যে আমার জীবনের সেই পরমোপকারী ব্যক্তিকে আমাব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহাই ভাবিত্তে লাগিলাম । আমার মনোগত ভাব বুদ্ধিত্তে পাবিয়াই যেন সে আমাকে বালকের স্তায় বলিয়া ফেলিল যে, “এই নীতে আমাব জীবনে কখনো লুই গায় দিই নাই” । তাহাব এই কথাটী শুনিবামাত্র আমি তাহাকে আমার লুইখানা দিয়া ভাবিলাম যে, সামান্ত একখানি লুই দিয়া আমি যে, এমন একজন উদারচেতা পরমোপকারী পুরুষের মনের একটা সাধও মিটাইতে পাবিলাম, ইহা অল্প সোভাগ্যের বিষয় নহে । আমার নিকট বিদায় লইবার পব সে অনেককক্ষণ আমাব প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া ঠাড়াইয়া বহিল । পথে চলিত্তে চলিত্তে যতই আমি সেই পাগলেব বিষয় ভাবিত্তে লাগিলাম, ততই আমার তাহাকে একজন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল । অতি বালককাল হইতেই শুনিয়া আসিত্তেছি যে, অনেক মহাপুরুষ উদ্ভবের স্তায় বিচরণ করিয়া সাধারণের নিকট অতি গুপ্ত ভাবে থাকিত্তে ভালবাসেন , উত্তরকাশীে এই লোকটীও কি ঠিক সেইরূপ নহে ?

এই এক অত্যাবশ্যকীয় কারণ বশতঃ উত্তরকাশীতে আমাব ত্রিদিব-বিলম্ব হইল। টীহার পর উত্তরকাশী হইতে টীহারী পৌঁছিতে আমাব বোধ করি ৩৪ দিন লাগিয়াছিল। ৬গঙ্গোত্রিব উত্তরকাশী হইতে ধনাসু পর্য্যন্ত পথটা আমি দেখি নাই। কাবণ, আমাকে উপবে যাইবার সময় ধনাসু হইতে গঙ্গোত্রিব কাটা সড়ক ছাড়িয়া অল্প পথে যমুনোত্রি যাইতে হয় এবং যমুনোত্রি হইতে উত্তরকাশীতে আসিয়া আমি গঙ্গোত্রিব সড়ক ধরিয়া-ছিলাম। এই পথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার মনে পড়ে না। টীহবীতে পৌঁছিয়াও আমাব পুনরায় একবার উদবাসম্ভ হয়। সম্পূর্ণ স্মৃতি না হইয়া পার্শ্বতাপথে ভ্রমণ করিয়াই বোধ করি পুনরায় আমি বোগাকান্ত হইলাম। টীহবীতেও এক দ্বিভ্রম ব্রাহ্মণ যুবা নির্বিকার-চিত্তে আমাব সেবাশ্রম কবিয়া আমাব সেই বিপদের সময় মহ-হুপকাব কবিয়াছিল। এখানেও আমাকে ২৩ দিনের অধিক থাকিতে হয় নাই। ৬গঙ্গোত্রি হইতে আমি যে এক শিশি জল আনিয়াছিলাম, তাহা এই টীহবীতে আসিয়াই একজন বাঙ্গালী বাজকর্ণচারী সাহায্যে পোষ্ট করিয়া ঠাকুরপুজার জন্ত আমাদেব বরাহনগব মঠে পাঠাই।

টীহবী হইতে আমি চন্দ্রবদনী দেবীর দর্শন মানসে যাত্রা কবিলাম। টীহবী হইতে ববার আমাকে নিবিড় আবণ্য পথে যাইতে হইল। মধ্যে মধ্যে কোথাও ছুই একটা পাহাড়ী সন্থিত সাক্ষাৎ হইলেই চন্দ্রবদনী দেবীর পথের কথা জিজ্ঞাসা কবি। এইরূপে প্রায় সমস্ত দিন চলিয়া আমি বেলা তৃতীয় প্রহরে মন্দিরের স্নান অতীত একটা ঘনবনাচ্ছাদিত মনোবম গিরিচূড়ার তলদেশে উপস্থিত হইলাম। এই গিরিচূড়ার শিবোভাগে চন্দ্রবদনী দেবীর মন্দির।

মাঘের মন্দিরের জন্তই বোধ করি হিমালয়েব এই গিরিশৃঙ্গটা বিলক্ষণ রূপে সূক্ষ্মিত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী পর্বতমালা হইতে এই গিরিশৃঙ্গটা যেন সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত ; দেখিলেই মনে হয় যে, মহাভাগ্য গিরিরাজ হিমালয় সগর্বে জগদম্বাকে এক শিরে ধারণ কবিয়া দণ্ডবৎ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এবং অতিশয় ভক্তি-বিনয়চিত্তে অস্ত্রাস্ত্র শিরগুলি অবনত করিয়া মাকে ঘিরিয়া নানাবিধ ফল পুষ্প দিয়া নিত্য মাঘের পূজা করিয়া ধন্য হইতেছেন। মাঘের পূর্ণিমাটা নিম্নদেশ হইতে উর্ধ্বে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম চূড়াব মত হইয়া যাওয়া

এবং পার্শ্ববর্তী পর্বত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হওয়ায় জগদম্ভার সুবিশাল প্রাকৃতিক মন্দিরের অতুল শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই পর্বতের নিয়ে প্রথমেই আমি একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, সেই গ্রামের অধিবাসী মাঝেই মুশলমান। হিমালয়ের সমগ্র গাড়েয়াল জেলায় এই একটি মাত্র মুশলমানের গ্রাম। পার্শ্বত্যা ক্রীলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী গালায় চুড়ি জড়ত করিয়া বিক্রয় করাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। কেবল মুশলমান ভিন্ন সেই গ্রামে আর ঐক ঘরও হিন্দু নাই। সেইখান হইতেই পর্বতারোহণ করিয়া মাঘের মন্দিরে পহঁছিতে পারিব, কিন্তু কাহার সাধ্য যে সেই ছুরারোহ পর্বতে আবোহণ করে? প্রকৃত পথ ছাড়িয়া এই উচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপরে যাওয়া অসম্ভব। আমি পথদ্রাষ্ট হইয়া কোন দিক দিয়াই উপরে উঠিতে না পারিয়া সেই পর্বতটী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে উপরে মাঘের মন্দিরে বাইবার একটি পথ দেখিতে পাইলাম। সেই পথ ধরিয়া বরাবর উপরে উঠিতে উঠিতে সন্ধ্যার প্রাকালে মাঘের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

উপরে উঠিয়াই মনে হইল যে, মাঘের মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্ত গিরি-চূড়ার স্বক্সাগ্র ভাগটী সূর্যের সমতল কবিয়া দেওয়া হইয়াছে। জগন্মাতা চন্দ্রবদনী দেবীর অধিষ্ঠানের জন্তই যেন সর্বতোভাবে মাঘের মন্দিরেব উপযোগী হইয়াই এই গিরিশৃঙ্গটী নির্মিত হইয়াছিল। উপরে পহঁছিয়াই মনে হইল যে, আমি সদামুখরিত নিত্যকোলাহলপূর্ণ বহুবিপ্লবগ্রস্ত নর-লোক হইতে বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছি। এখানে পৃথিবীর কোন গোল নাই। সবলই মহানিস্তর। এখানে পহঁছিলে মনে হয় যেন চরাচর ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত মৌনব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখানে যে পহঁছিলে, তাহারও হৃদয় এই গভীর নিস্তরভাবে মিশিয়া যাইবে! উপরে উঠিয়াই হিমালয়ের দিপঙ্ক্ত-বিস্তৃত সুবিশাল অপার দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমার শ্রান্তি দূর হইতে কণেকণ বিলম্ব হইল না। যে দিকে তাকাই, কেবল অনন্ত-গগন-বিহারী অসংখ্যগিরিশৃঙ্গসমবৃত্ত হিমালয়ের বিরাট মূর্তি যেন আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে। উত্তরে অপার ও অগম্য গুহ্র চির-হিমালী মহাম্মিওবদনে অনন্তের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। গুহ্র জ্যোতিঃ-পুঞ্জকায় সুবিশাল হিমালী হইতে যেন অনন্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া

জগৎকে আলোকিত করিতেছে। না জানি কি মহান্ অদীম সৌন্দর্য্যরাশির ঘনীভূত মূর্ত্তি এই অনন্ততাবসম্পন্ন চিরহিমালয়! এখানে সকলই মহা-নিম্গর, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। মনে হয় যেন সমগ্র জগৎ এক অনন্তের ধ্যানে সমাধিস্থ! অনন্তেব ধ্যানে মগ্ন হইয়া যেন সকলেরই বাকরোধ হইয়াছে। যাহা হউক আমি হিমালয়েব বিরাট্ দেহে অনন্তশক্তিরূপিনী মহামায়াব আবির্ভাব দর্শন করিয়া ধম্ম হইলাম।

মন্দিবে প্রবেশ কবিবাব পূর্বে একবাব চাঁবিদিকে হিমালয়েব অপূর্ণ-শোভাসমরিত বিরাট্ মূর্ত্তি ভাল কবিয়া দেখিয়া লইলাম। তাহার পব মায়েব মন্দিবাত্যন্তরে গিয়া মহামায়াব অনন্ত মহিমা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার চরণে প্রণিপাত কবিলাম। এখানে মায়েব একখানি যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাহাতেই মায়েব পূজা হয়; কোন প্রতিমা নাই। মায়েব মন্দিবটা নিতান্ত অমূল্য ক্ষুদ্রাবতন প্রস্তুতনির্ম্মিত একখানি ঘর এবং তাহার পার্শ্বেই যাত্রীদিগেব থাকিবার জগ্গ আব একখানি ছোট ঘর আছে। এইরূপ উচ্চগির্জাদ্বয়ের উপবে বায়ুব বেগ এমনি প্রবল হয় ও উহা এমনি ভীষণ শব্দের সহিত বহিতে থাকে যে, মনে হয় যেন প্রকৃতির মহানিস্কৃত্ত তাব পবন-দেবের অসহ, যেন হিমালয়ের অনন্ত সমাধি ভঙ্গ করিবার জগ্গ তিনি সদা ব্যগ্ৰ। চন্দ্রবদনী দেবীর পর্কতের উপরে সময় সময় এমনি প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে যে, সেই উন্মুক্ত গির্জাদ্বয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতেও ভয় হইত, মনে হইত যে, সেই প্রবল বায়ুব এক ঠেলাতেই না জানি আমি কোথায় গিয়া পড়িব। সুতরাং এইরূপ উচ্চ পার্কত্য প্রদেশে সুরহং হর্ম্মাদি নির্ম্মিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই সুরহং উচ্চ পর্কতচূড়াই এখানে ব্রহ্মাওতাণ্ডোদবী অনন্তশক্তিরূপিনী জগজ্জননী মহামায়াব প্রকৃত মন্দিব।

প্রকৃতির স্ববিধান বিচিত্র কাককার্য্য-বচিত শোভাব নিদান বৃহৎ গিরিমন্দিরে, মনুষ্যেব কাককার্য্য ও শিল্পরচনা স্থান পায় না। সেই জগ্গই এই তীর্থবহল পার্কত্য প্রদেশের মন্দিবগুলিতে মানবীয় সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য বা কাককার্য্যের বিশেষত্ব নাই। যে মহাশক্তির এক লেশ আশ্রয় করিয়া মনুষ্য মহাশক্তিশালী ও সকল গুণের আধার হইয়া জন্মিয়াছে, যে মহা-শক্তির এক কটাক্ষে এইরূপ অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ প্রতি রূপে রূপে হইতেছে, সেই মহাশক্তি প্রকৃতি যেখানে আপনার উপযুক্ত মন্দির আপনি সৃজন করিয়া তাহা বিরলে বসিয়া মনের সাথে সাজাইয়াছেন, সেই

খানে মানবীয় কলাকৌশল, শিল্পাতুর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলই লয় পায়। সেই জন্যই বোধ হয় দাক্ষিণাত্য ও আৰ্য্যাবৰ্ত্তবাসী হিন্দু ও বৌদ্ধগণ স্ব স্ব উপাস্ত দেব দেবীর মন্দিরাদি নিৰ্ম্মাণে যে শক্তি ব্যয় করিয়া মানবীয় শিল্প-নৈপুণ্য ও কলাবিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, পার্শ্বত্যাগ প্রদেশের মন্দিবাদি নিৰ্ম্মাণে তাঁহারা সে প্রয়াস কবেন নাই।

সে যাহা হউক, আমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজারীঠাকুর যেখানে মাঘের ভোগের আয়োজন কবিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া বসিলাম। মন্দিরের ভিতর দুইভাগে বিভক্ত; একভাগে কেবল মাঘের মন্দির ও অপরটীতে মাঘের পাকশালা ও পূজারী ব্রাহ্মণের থাকিবার স্থান। একমাত্র মাঘের সেই পূজক ব্রাহ্মণ ভিন্ন সেখানে তখন আর কেহ ছিল না। আমাব সেখানে পঁছছিবার কিছুক্ষণ পবেই একটা পাহাড়ী এক ঘড়া জল লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তি দেবীর একজন চহলুয়া সেবক। এ ব্যক্তি পূজারী ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। পূর্কভেব নিয়মদেয় হইতে সে প্রত্যহ ভোগ বাঁধিবাব জন্য জল লইয়া আইসে এবং পূজার অন্যান্য কায করিয়া দেয়। যাহা হউক, এতক্ষণে আমরা সেই দুর্গম নিভৃত উচ্চ গিরিশৃঙ্গে তিনটা প্রাণী একত্র হইয়া কিছুক্ষণের জন্য পরস্পর কথাবার্তা কহিয়া মর্ত্যালোকের অতি ক্ষীণ সত্তা উপলব্ধি করিলাম। তিনজনে মিলিত হইয়া একবার লোকালয়ের অস্তিত্ব অনুভব কবিলাম। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে কেবলমাত্র আমাদের তিনজনের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। ব্রাহ্মণ মাঘের ভোগ বাঁধিতে লাগিলেন আর আমি তাঁহাকে চন্দ্রবদনী দেবীর সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

সেই পূজক ব্রাহ্মণ এবং পরে অন্ত্যস্ত পার্শ্বত্যাগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখেও শুনিয়াছি যে, সতীর বক্ষঃস্থল এইখানে পতিত হয়। দেবীর মন্দিরে প্রবেশ কবিয়া দেখিলাম যে, মন্দিরের উপরিভাগ সম্পূর্ণ রূপে একখানি মোটা চাঁদোয়া দ্বারা আচ্ছাদিত। শুনিলাম যে, দেবীর মূল যন্ত্রখানি আর কেহ দেখিতে পায় না, তাহা সেই চাঁদোয়া দ্বারা সদা আবৃত রহিয়াছে। চাঁদোয়া পরিবর্তনের সময় অগ্রে নূতন চাঁদোয়াখানি টাঙ্গাইয়া পুৰাতন চাঁদোয়াখানি বাহির করিয়া লওয়া হয়। জনপ্রবাদ এই যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মহাপবিত্র স্থানে আসিয়া দেবীর প্রাচীন মূল যন্ত্রখানি লোকচক্ষুর অগোচর কলিয়া গিয়াছেন এবং এই নূতন যন্ত্রখানি



স্থাপন করিয়া মূল যন্ত্র দর্শন কবিত্তে চকলকে নিবেশ করিয়া গিয়াছেন । সেই অবধি নাকি মূল যন্ত্রখানি আঁবি কেহ দেখিতে পায় না । ইহাও ঙ্গনিলাম যে, যদি কেহ হঠাৎ সেই যন্ত্রখানি দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে । এই সংস্কার যে কেবল এই ষানেই তাহা নহে, দেবীর অধিকাংশ পীঠস্থানেই এই সংস্কার বহুমূল হইয়া আছে যে, মূল পীঠের কোথাও দর্শন হয় না এবং তাহার দর্শন ঘটিলেই মৃত্যুর সম্ভাবনা । চন্দ্রবদনী দেবীর পর্ত্ত দেলায় গড়োবালের টাহরী রাজ্যে । টাহরীর রাজা বহুকাল হইতেই দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন । সেই পর্ত্তের অনতিদূরবর্ত্তী পূজার নামক একখানি গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণ মাঝেই দেবীর পূজক ; টাহরীরাজকর্ত্তক প্রদত্ত সেই গ্রামেব উপসত্ত দেবীর পূজক ব্রাহ্মণগণই পুৰুষায়ক্রমে ভোগ কবিয়া আসিতেছেন । পর্য্যায়ক্রমে সেই গ্রামেব ব্রাহ্মণগণ মায়ের পূজা করিতেছেন । দেবীর টহলুয়া সেবকগণেরও বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে ।

মার ভোগ প্রসত্ত হইতে হইতেই আমি তাঁহার অনেক কথা জ্ঞানিয়া লইলাম । তাহার পর ত্রিত্রি প্রায় ৯টার মধ্যেই দেবীর পূজা, আরতি ও ভোগ হইল । এখানে প্রত্যহ শীলে চাউল গুঁড়াইয়া তাহা তেলে ভাজিয়া মার ভোগ দেওয়া হয় । কেন যে এই পদার্থ মার এত প্রিয় হইল, সে সম্বন্ধে আমাকে সেই ব্রাহ্মণও কিছুই বলিতে পাবিলেন না । চাউলেব গুঁড়া রুটা ও একটু জ্বধ দিয়া মায়ের ভোগ হইল । আমিও সেই ব্যক্তিতে মায়ের সেই প্রসাদ পাইয়া পরম তৃপ্তিনাত করিলাম । সেই চাউলের গুঁড়া প্রসাদ যে, এত মিষ্ট লাগিবে, তাহা পূর্বে বুকিতে পারি নাই । যাহা হউক, মহামায়ার প্রসাদ লাভ করিয়া পরমানন্দিতমনে বসিয়া আছি, এমন সময় পূজাবী ঠাকুর অতিশয় ভদ্রতার সহিত আমাকে রাজিবাসের জন্ত বাহিরেব সেই ধর্ম্মশালা ঘরটীতে বাইতে বলিলেন । তাঁহারই মুখে ঙ্গনিলাম যে, কিছুদিন পূর্বে টাহরীরাজকর্ত্তক প্রদত্ত দেবীর পূজার কতকগুলি রূপাব বাসন জনৈক সাধুবেশধারী ব্যক্তী গভীর নিশীথে দেবীর মন্দির হইতে চুরী করিয়া পলায়ন করে । তাহার পূর্বে সাধু সরাসরী ব্যক্তীগণকে মন্দিরাত্যস্তরে থাকিতে দেওয়া হইত । এই ঘটনার পব হইতে মায়েব পূজক ব্রাহ্মণ ও সেবক ভিন্ন মন্দিরের মধ্যে ব্যক্তিকালে আব কেহ থাকিতে পায় না । স্ততরায় আমাকে বাধ্য হইয়া সেই ধর্ম্মশালাতে গিয়া বাণিষাপন কবিত্তে হইল ।

বিশ্ব বিমল জ্যোৎস্নাব রাত্রিতে হিমালয়ের যে অদ্ভুত বিচিত্র দৃশ্য নয়নগোচর হয় এবং সেই জ্যোৎস্নাব ও চমৎকার স্বর্গীয় দৃশ্যাব অবলোকনে যুগপৎ হৃদয় যে মহানিস্ক্রিয় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহা লিখিয়া প্রকাশ কবিসার বিষয় নহে। মন্দিরের বাহিবে আসিয়া সম্মুখে সেই মহান্ পবিত্র দৃশ্য দর্শন কবিবা বরং সমস্ত রাত্রি আমি বিশেষ আনন্দেই কাটাইলাম। যাহা হউক, মার কৃপায় প্রথম রাত্রি তো আমার পবমানন্দেই কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও সেই ভাবেই মায়ের পূজা দেখিলাম ও প্রসাদ পাইলাম। সমস্ত দিন বাত্মির মধ্যে সেই পূজারী ও টহলুয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও মার মন্দিরে আসিতে দেখি নাই। আমি একবার অপবাহে মার মন্দিরে যে ধারা হইতে জল আইসে, সেই পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিলাম। মায়ের মন্দির হইতে জলের জন্ত অনেকটা নীচে নামিতে হয়। দুই রাত্রি বাস কবিয়া তথা হইতে শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিবার মানস করিলাম। চন্দ্রবদনী দেবীতে দুই রাত্রি মাত্র থাকিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই। সকল বিষয়েই সুবিধা হইলে আমি সেইখানে আরও কিছুদিন থাকিতাম। কিন্তু দুই একদিনের অধিক সেই দুর্গম গিরিশিখরে কাহাকেও রাখিতে দেবীর পূজকগণ অসমর্থ। কেবল ২১ জন সাধু সন্ন্যাসীকে দুই এক দিনের জন্ত তাঁহারা মায়ের চারটা প্রসাদ দিয়া কোন রূপে সংকার করিতে পাবেন। এই সকল দুর্গম স্থানে দুই একদিন থাকাও বিষম কষ্টকর। অতি কষ্টেই যৎসামান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণ মায়ের পূজা নিরূহ করিয়া থাকেন। এইরূপ নানা অসুবিধা হওয়ায় আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাসঙ্কেও আমি সেই-খানে অধিককাল থাকিতে পাবিলাম না। তগবতীর চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় যেন আমি তাঁহার দর্শন করিতে তথায় আসিতে পারি, এই প্রার্থনা কবিলাম। দিনান্তে সামান্য দুই গ্রাস মাত্র অন্নের সংস্থান থাকিলেও আমি আরও ২৪ দিন চন্দ্রবদনী দেবীতে থাকিতে পারিতাম।

কিন্তু কি করি, উপায় নাই বলিয়াই আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে মায়ের নিকট “আবার আসিব” বলিবা বিদায় লইতে হইল। মায়ের পূজারী ব্রাহ্মণও আমাকে তথা হইতে শ্রীনগরে বাইতে পরামর্শ দিলেন। কারণ, শ্রীনগরে পহঁছিলেই আমি ৬ কেদার বদরীনারায়ণের পথ পাইব।

চক্রবদনী হইতে একদিনেই শ্রীনগরে পঁহুঁচিতে পার। ষাষ। নিবিড় আবণ্যপথে প্রায় অর্ধেক দিন চলিয়া শ্রীনগর হইতে যে কাটা সড়ক্ চীহরীতে গিয়াছে, সেই সড়ক ধরিয়া শ্রীনগরে যাইতে হয়। পূজাবী ঠাকুর মন্দির হইতে কিছুদূর আসিয়া আমাকে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিবাব একটা পথ, এবং দুব হইতে তাহাদের গ্রামখানি দেখাইয়া বলিল যে, আমি ঐ গ্রামে পঁহুঁচিতে পারিলেই তথা হইতে নিবাপদে শ্রীনগরে পঁহুঁচিতে পারিব। জন-মানবশূণ্য ঘোব অরণ্য ও সেই অতি সংকীর্ণ মনুষ্যপদচিহ্নিত পথ দেখিয়া আমি পূর্বেই মনে কবিয়াছিলাম যে, পথ হাবাইব। ফলে কিছুদূর যাইতে যাইতে তাহাই হইল। চক্রবদনী দেবী হইতে যে পূজাব গ্রাম লক্ষ্য কবিয়া আমি অগ্রসর হইতেছিলাম, কিছুদূর গিয়াই আব আমি তাহা দেখিতে পাইলাম না। ক্রমশঃ এক মহাঘোব নিবিড় অরণ্যমধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাব চতুঃপার্শ্বে কেবল ঘন নিবিড় বন ; সূর্যালোকের পর্য্যন্ত প্রবেশ নাই। সেখানে গিয়া পথেরও আব কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সম্পূর্ণ অপবিচিত বিষম ছুরারোহ পর্ব্বতা-রণ্যে পথভ্রান্ত হইয়া হঠাৎ একদিকে যাইতেও সাহস হইল না। তখনো আমি দেবীর মন্দির হইতে অধিক দূর নামিতে পারি নাই। কোন দিকে গেলে আমি ঠিক পথে পঁহুঁছিব, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে না পারিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম।

এমনই স্থানমাহাত্ম্য সে, এমন বিপৎসঙ্কুল কঠিন স্থানে পথহাবা হইয়াও ইত্যশেব দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে নাই। কারণ, সেই স্থান যে স্বর্গভূম্য, তাহার যেখানেই থাকি স্বর্গস্থ। হিমালয়ে বিচিত্রলীলাময়ী প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার ত্রপাকাবে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ষাহা হউক, প্রায় এক ঘণ্টাকাল সেই খানে বিশ্রামস্থল উপভোগ কবিলাম। আমি জানিতাম যে, পথ কবিয়া লইব, সেই স্থানেই আমাকে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। এই নিশ্চয় ধাবণা ছিল বলিয়া আমি এইরূপ বিপদের জন্ত বড় ভাবিয়া বাকুল হইতাম না। প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন এমন একটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, যাহাকে পথের কথা-জিজ্ঞাসা কবি, তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া জঘ মা জগদম্বা! বলিয়া আপন মনে একদিকে চলিলাম। যত যাই, যোত্রতর নিড় বনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলাম এবং ক্রমশঃই ওংবাই

প্রকাণ্ড একটি পর্বতের উপর হইতে নিয়ে বাইতেছি। পর্বতের উপরে উঠা অপেক্ষা নামিবার সময় অধিকতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। পর্বত ভ্রমণে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাট্রেই ইহা জানেন যে, পর্বতে উঠিবার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু নীচে নামিবার সময় যেন সামান্য, সামান্য, নিজের পায়েব উপর তখন কোন জোর থাকে না, একটুতেই গড়াইয়া বাইতে হয়। হিমালয়ের উচ্চ হিমবান্ পার্শ্বত্যা প্রদেশেব উত্তম্ গিরিশৃঙ্গারোহণ অববোহণ যেক্রমে করিতে হয়, তাহা আমি ক্রমশঃই প্রকাশ করিব।

পাহাড়ের চড়াই ও২রাইয়ের এই ত মোটে আরম্ভ,—কেদার বদরী বাইতে আমাকে এখনো কত চড়াই ও২রাই করিতে হইবে, বলা যায় না, তাহাব পর তিব্বত।

যাহা হউক, এক্ষণে আমি সেই ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ বিকট পথে কোথায় বাইতেছি, দেখা যাউক,—আমি সেই প্রকাণ্ড পর্বত হইতে যে দিক্ দিয়া নামিতে লাগিলাম, সেই দিকে কখনো মহাব্যার পদসঙ্কাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। এইরূপে অনন্ত জীবনবিবহের একমাত্র নিয়ন্তা ভগবান্ আমাকে যেদিকে লইয়া বাইতে লাগিলেন, আমিও সেই দিকেই চলিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই আমি বিষম ও২রাইয়ে আসিয়া পহঁ-ছিলাম, নামিয়া যাওয়া একান্তই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সেখানে আর সমান পা ফেলিয়া বাইবার জো নাই। তবে সেখানে রক্ষা পাইবার প্রধান কারণ হইল এই যে, সেই পর্বতগার শুদ্ধ পাৰাণময় না হইয়া স্বনতুণবনাচ্ছাদিত হওয়ায় আমি পিঠে ভব দিয়া নরম মুক্তিকায় পা বসাইতে বসাইতে, বৃক্ষশাখা ও ভূগণ্ডাচ্ছাদি ধরিতে ধরিতে প্রায় দুই তিন মাইল নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কি কঠিন স্থান যে অতিক্রম করিয়া আসিলাম, তাহা বলিতে পারি না। পার্শ্বত্যা প্রদেশের কঠিন স্থানবিশেষে ৫৭ মাইল পথ চলিতেই সমস্তদিন লাগিয়া যায়। যাহা হউক, এইরূপে আমি বেলা ত্রিপ্রহরের সময় একটি নিরাপদ সমতল স্থানে পহঁছিয়া দেখিলাম যে, একটি পাহাড়ী-কৃষক একখণ্ড অন্নপরিসর বস্ত্রক্ষেত্রে বসিয়া পক গোদুমশীর্ণ আহরণ করিতেছে এবং একটি শুদ্ধ ভূগণ্ডাশির অগ্নি-কুণ্ড করিয়া তাহাতে উষ্মী করিতেছে। সদ্য-আহত অর্ধপক ভূগণ্ডা-

সংভূত যবগোধুমজরীকে ঐ অঞ্চলের পাহাড়ীবা উদ্ভী বলে। যব ও গম পাকিলে পাহাড়ে উদ্ভী খাইবার ভাবি ধুম লাগিয়া যায়। পাহাড়ী ক্রী, পুরুষ, ছেলেপিলে সকলে মিলিয়া উদ্ভী খাইবার জন্ত দল বাঁধিয়া আপন আপন ক্ষেতে গিয়া গুচ্ছ তৃণপত্রাদির অগ্নিতে যব ও গমের শীষ-গুলি ভাজিয়া তৃণদণ্ড হইতে একটি একটি করিয়া শস্ত ছাড়াইয়া কৌচড ভরিয়া খাইবে। তাহাতে তাহাদের বড়ই আনন্দ। যাহা হউক, আমার পাহাড় হইতে নামিতে কেবল পা দুইখানি কাঁটা গাছে একটু একটু ছড়িয়া যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। নিবাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া একেবারে জলযোগেব যোগাড় দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। ‘বিকট পথশ্রমে ক্ষুধা বৃদ্ধিতে পাবি নাই। কিন্তু এক্ষণে একটু বিশ্রামস্থল উপভোগ না করিতে কবিতেই (এদিকেও বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছিল) আমার জঠবা-নল স্বভাবতঃই উদ্ভীপ্ত হইল। পাহাড়ী ভাষা তো এক মনে উদ্ভী কবিতে কবিতে হঠাৎ আমাকে সেইখানে পঁহুঁছিতে দেখিয়াই চমকাইয়া গেল ও কিছুক্ষণেব জন্ত তামাব দিকে তাকাইয়া অবাচ্ হইয়া বহিল। তাহার পর সে পাহাড়ী কথায় আমি কিরূপে কোথা হইতে সেইখানে আসি-লাম, জিজ্ঞাসা করিল। আমি চন্দ্রবদনী দেবী হইতে সেইখানে আসি-য়াছি শুনিয়া তাহার আর বিষয়েব সীমা রহিল না।

ক্রমশঃ।

## ব্রহ্ম কি ?

শ্রীবাল্মীকীনাথ দ্বৈপায়ন লিখিত।]

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর।

এখন জড় ও চেতন যদি পৃথক্ হইয়াও একত্র অবস্থান করে, অল্পখা করে না বুঝিলাম, তখন ইহাদের মূল কিছু আছে কিনা ও যদি থাকে, তবে তাহা কিরূপ, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। প্রথমেই এই জড় ও চেতনের মূল থাকা না থাকা সম্বন্ধে কতপ্রকার মত আছে, আব কত প্রকারই বা হইতে পারে, দেখা যাউক। কারণ, তাহা হইলে একে একে তাহাদিগের আলোচনা করার সুবিধা হইবে। চিং ও জড়ের মূল সম্বন্ধে পরপূর্ণায় লিখিত প্রায় ১৬টি মত বর্তমান। এতদ্ব্যতীত বাহা হইতে পারে, তাহা যুক্তিবহির্ভূত বলনা মাত্র।



উক্ত বিবরণী হইতে নিম্নলিখিত ১৬টা মত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১ম। জড় ও চেতনের কাবণ নাই, ইহারা চিরকালই এইরূপ, নিয়ত পরিবর্তনে নিত্য নূতন নূতন পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

২য়। ইহাদের স্বরূপ চিরকাল অজ্ঞেয় সুতরাং ইহাদের কারণও চির অজ্ঞেয়।

৩য়। ইহাদের কাবণ একজাতীয় জড় ও চেতন উভয়াত্মক জড়বিশেষ।

৪র্থ। ইহাদের কারণ একজাতীয় জড় ও চেতন উভয়াত্মক চেতন-বিশেষ।

৫ম। ইহাদের কাবণ একজাতীয় জড় মাত্র।

৬ষ্ঠ। ইহাদের কাবণ একজাতীয় চেতন মাত্র।

৭ম। ইহাদের কাবণ একটা চিহ্নাঙ্ক জড়বিশেষ।

৮ম। ইহাদের কারণ একটা চিহ্নাঙ্ক অভিন্ন-নিমিত্ত-বিবর্ত-উপাদান-কারণভূত চেতন।

৯ম। ইহাদের কাবণ একটা চিহ্নাঙ্ক নিমিত্ত-পরিণামী-উপাদান-কাবণভূত চেতন।

১০ম। ইহাদের কারণ একটা জড়।

১১শ। ইহাদের কারণ একটা চেতন।

১২শ। ইহাদের কাবণ নিমিত্ত রূপে ঈশ্বরচেতন, উপাদানরূপে অনীশ্বর পৃথক পৃথক বহু জীবচেতন ও বহু জড়।

১৩শ। ইহাদের কারণ বহু উপাদানভূত জড়।

১৪শ। ইহাদের কারণ বহু উপাদানভূত চেতন।

১৫শ। ইহাদের কারণ বহু উপাদানভূত জড় এবং চেতন।

১৬শ। ইহাদের কাবণ বহু জীবচেতন নিমিত্ত কারণ ও বহু জড় পরমাণু উপাদান কারণ।

১ম মতটা ভুল। জগতের কাবণ আছে, ইহার সূক্ষ্মাবস্থা আছে। প্রাণি-জগতে বিশেষ বিশেষ জাতীয় প্রাণীব ক্ষয়, জ্যোতিষ্কমণ্ডলে গ্রহ উপগ্রহের লয়, প্রত্যক্ষীকৃত এবং নিকীরিত সত্য। অদ্বীভূত জাতি বা গ্রহ উপগ্রহাদি লয়ে অদ্বীভূত সমগ্র জগতের লয় প্রায়সিক্ত। নিবিউলা বা তরলাবয়ব-বিশিষ্ট পরমাণুপুঞ্জই যে সূর্যাদিরূপে উৎপন্ন, ইহাও সিদ্ধান্ত মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

২য়টি অজ্ঞেয়বাদ। জড় ও চেতনের স্বরূপ অজ্ঞেয়, সূত্ররাং ইহাদের মূলও অজ্ঞেয়। ইহা কতিপয় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত। এ মতের ফলে আমাদের কারণবোধে প্রবৃত্তি না হওয়াই উচিত কিন্তু ঐ মতাবলম্বীগণ জ্ঞানোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট বন্ধপরিষ্কর। অজ্ঞেয় বলিলেও যে ঐ দুই বিষয় কতকটা জ্ঞেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই কতকটা যে কতদূর, তাহা কি করিয়া স্থির হইবে? অজ্ঞেয়বাদিগণ যোগশক্তিসাধ্য ব্যাপাবসমূহের তথ্য নির্ণয় করিতে না পারিয়া উহাদের অস্তিত্বেও সন্দেহান! বাহাই হউক, জড় ও চেতন পৃথক্। এইরূপ স্থূল দৃষ্টিতে অজ্ঞেয় বলা অযুক্তিযুক্ত নহে। পরন্তু জড় ও চেতন একাশ্রিত বা এক, এমত খণ্ডনে অজ্ঞেয়বাদের যুক্তি পরাজিত। অতএব জড় চেতনের কারণানুসন্ধান যে অমুসরণযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১শ সংখ্যক মতগুলিতে জড় ও চেতনের কারণ অনুভয়াত্মক। ইহাও ঠিক নহে, কাবণ, কিছু পূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, সমস্তই জড় ও চেতনাত্মক এবং জড় চেতন উভয়াত্মক বস্তু দ্বারা ই জড় ও চেতন সংক্রান্ত জ্ঞান হয়। সূত্ররাং ইহাদের মূল উভয়াত্মক হওয়াই অধিক সম্ভব।

৩য়, ৪র্থ, সংখ্যক মত দুইটিতে ইহাবা এক জাতীয় ও উভয়াত্মকরূপে স্বীকৃত। কিন্তু একজাতীয় বলিলে কারণব্যতিরিক্ত আরও কিছু পদার্থ স্বীকার করা হয়। ইহার প্রথম হেতু এই যে, একজাতীয় বস্তু অনুভব করিতে হইলে তাহাদেব সীমা ও আকৃতি স্বীকার করিতে হয়। তাহা অল্প বস্তু না থাকিলে অসম্ভব সূত্ররাং একজাতীয় পদার্থ স্বীকার করা হইল না, দুই বা বহু জাতীয় পদার্থ স্বীকার করা হইল। দ্বিতীয় হেতু এই যে, চিজ্জড় বলিতে আমরা সমস্ত বস্তুই ইতিপূর্বে বুঝিয়াছি। দেশ কাল প্রভৃতিও গৃহীত হইয়াছে। সূত্ররাং 'একজাতীয় উভয়াত্মক' পদার্থই মূল কারণ বলা ঠিক নয়। কোন কোন মন্তাবলম্বীরা দেশকালকে ছাড়িয়া দিয়া একজাতীয় উভয়াত্মক বস্তুই চিজ্জড়ের কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। কিন্তু আমরা সমস্ত বস্তুর আদিম কারণ অব্যবহায়ে প্রবৃত্ত সূত্ররাং ওরূপ মত আমাদের অমুসরণীয় নহে। যদি দেশকালেব উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া আপত্তি করা হয়, তাহা হইলে বলিব, না, উহা অসম্ভব নহে। একমাত্র অপরিবর্তনীয় পদার্থের প্রথম বিকৃতি ও আকৃতি পর্যায়ক্রমে কাল ও দেশের উৎপত্তির কারণ, এইরূপ হওয়াই সম্ভবপর।



১৩শ, ১৪শ, ১৫শ, এই মতগুলিতে বহু উপাদান বাবণ সমষ্টিতেই এই জগৎ। এটোও আদরলীয় নহে। যেহেতু কেবল উপাদান কারণে এ জগৎরূপ কার্যে নিবমেব শৃঙ্খলা থাকা অসম্ভব। ইহার মূলে কোন বুদ্ধিমানের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিলে কতকগুলি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাপারের হেতু অনির্দিষ্ট থাকিবা যাযও আমাদের স্বাভাবিক অস্বীকার বৃত্তিটিকেও সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দিতে হয়! সত্যনির্ণয়ে ঐ বৃত্তিই আমাদের প্রধান সহায় এবং উহা সহায়তা গ্রহণ না করা যে প্রশংসনীয় চেষ্টা নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের পূর্ব পূর্ব অনেক ধারণা বিজ্ঞানালোকে অভ্রাণ্য প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া দৈর্ঘ্যরাস্তিহরণও যে একদিন একরূপ ভুল প্রমাণ হইবে, ইহা অস্বীকার করা জাযাবিকর।

১৬শ মতটোও সুন্দর নহে। অসংখ্য জীব নিমিত্তকারণ হইলে এ জগতে বিশৃঙ্খলাই সম্ভব।

৭ম, ৮ম, ৯ম, ১২শ, এক্ষণে এই চারিটি মত অবশিষ্ট রহিল। তন্মধ্যে ৭ম মতের সহিত ৮ম, ৯ম মতের কোন ভেদ স্বীকার করা যায না। ৭ম মতে উভয়দিক একটা জড়ই কাবণ আব ৮ম, ৯ম মতে উভয়দিক একটা চেতনই কারণ। উভয়দিক বলায় জড় বা চেতন এতদ্ব্যতীত বাস্তবিক কোন ভেদ থাকিতে পারে না। কেবল কথার পার্থক্য মাত্র বর্তমান থাকে। ৮ম, ৯ম, ১২শ মতগুলিই আমাদের দেশে প্রধানতঃ আদরলীয়। আদি বিদ্বান্ মহর্ষি কপিল হইলে আরম্ভ কবিতা শ্রীমান্ শঙ্কর, শ্রীমান্ রামানুজ, শ্রীমান্ মধ্ব, শ্রীমান্ বল্লভ এবং মহাপ্রভু চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের প্রচাৰিত মতগুলি উক্ত মতত্রয়ের প্রকাবভেদযায়। তাহাদের মতের বিস্তৃত আলোচনা যথেষ্ট সময় ও সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। অতএব উহাদের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আলোচনা কালে তাহাদের প্রচাৰিত মতগুলি আনুসঙ্গিক ভাবে বিচার করিয়া দেখিব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, ব্রহ্ম এক কিনা, এবং এক হইলে কি প্রকারের 'এক'। দেখিতে পাওয়া যায়, 'এক' শব্দ নানা প্রকাবে ব্যবহার হয়। পরন্তু ইহা যে 'ঐ' ও বহু শব্দের বিরোধী, তাহাতে সংশয় নাই। ব্যক্তি, জাতি, গুণ ও কাল প্রভৃতি, সমগ্র বা কোন একটা অৰ্ধ অবলম্বনে 'এক' শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। কোন বস্তু 'ঐ' বা 'বহু' হইলে তাহাতে ভেদ থাকে, এক বলিলে কিন্তু ভেদের অভাব বুঝায়। একটা দ্রব্যোতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত

বে পরস্পরভেদ, তাহা অবয়বগত ভেদ বা স্বরূপভেদ। এই ভেদসত্ত্বেও সেই বস্তুটাকে এক বলা যাইতে পারে। যথা আমাদের এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-বিশিষ্ট দেহ। একাধিকসংখ্যক বাক্তি বা বস্তু যদি একরূপ কার্য্য-কারী—একপ্রকার চেতনবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে ‘এক’ বলা যায়। ইহা জাতি অর্থে ‘এক’, এবং ইহাতে বিজ্ঞাতীয় ভেদের অভাব বুঝায়। এক বস্তু ও তাহাব গুণ পৃথক্ রূপে অনুভূত হইলেও তাহাদেব যে একই, তাহা গুণ অর্থে একইেব বোধক। গুণ আবার আকস্মিক ও স্বাভাবিক দ্বিবিধ হইতে পারে। এস্থলে স্বাভাবিক গুণেব কথাই বলা হইল। কালার্থে একই বলিলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে এক ছিল, এখন তাহা নহে; বা এখন এক নহে, পবে একে পবিণত হইবে।

বিজ্ঞানের চক্ষে জগৎতত্ত্ব আলোচনা কবিলে দেখা যায়, বহুসংখ্যক জগতের বাহিরে বহুই থাকিলেও একই সঙ্গত অসংখ্যত আছে। বহুই মূলে এক অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হইলেও বহুও সঙ্গে সঙ্গে পবিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কারণের কার্য্যে পরিণতি, মূল কাবণেব সহিত সহকারী কারণেব সম্ভাব প্রমাণ করে। আজকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতাগ্রণী কেহ কেহ ‘এক’ হইতে ‘বহুই’ উৎপত্তি প্রমাণীকৃত কবিতোছেন, কিন্তু তাহা হইলেও যে ‘বহুই’ কারণ একই হইতে হইবে, তাহাব কোন প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে পারেন নাই। বিজ্ঞান ‘বহুই’ কারণ ‘এক’ হইবার নিশ্চয় প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন না করিতে পারিলেও দর্শনশাস্ত্র তাহাতে সমর্থ। যদি সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে তাহা ‘একেতে’ সেরূপ সঙ্গত হয়, ‘বহুতে’ সেরূপ সঙ্গত হয় না। ‘বহুবই’ কোন উদ্দেশ্য বশতঃ জগৎ অতএব জগৎ বলিলে শূন্যতার অভাব বোধই যে শূন্যদৃষ্টিগ্রাহ হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রতি প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ যে একেবই প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহা কাহাবও অবিদিত নাই। ব্রহ্ম কাহারও দৃষ্ট বা পরিচিত কখনও হন নাই, ব্রহ্ম অবধারণ কবিয়া আমরা এ তত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত নহি, এ কথা পূর্ণ হইতেই মনে কবিয়া রাখা আবশ্যক। যদিপি পূর্ব্বতন মহাত্ম্যাগণের লেখনীনিঃসৃত তত্ত্বগুলি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভেব সাক্ষ্য সম্বন্ধে কি নিমিত্ত সন্দ্বিহান হইব? অদ্যপিও এরূপ সাক্ষ্যের একেবারে অসম্ভাব হয় নাই।

জগৎকারণ যে এক, তাহা মানিয়া লইলাম। এখন দেখা যাউক, সে এক কি প্রকারের এক।

জগৎকারণ যে জাতিগত অর্থে এক, নহে অর্থাৎ একজাতীয় কতকগুলি পদার্থ নহে, তাহা পূর্বোক্ত বহুত্বনিবারক যুক্তিতেই সিদ্ধ হয়। যদি এক-জাতীয় বহু বস্তুবই স্বভাবতঃ শৃঙ্খলা আছে বলা হয়, তাহা হইলে তাহার ঋণ নাই, পবস্ত্র এরূপ স্বীকানে যুক্তিরও বড় একটা আবশ্যকতা থাকে না।

পূর্বোক্ত যুক্তিতে যেমন ‘বহুতে’ শৃঙ্খলার পূর্ণতা অসম্ভব বুঝা যায়, সেইরূপ বহুবিধ শৃঙ্খলা স্বীকার করিলে ‘একেতেও’ তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে উদয় হয়। এই দুই পক্ষেই যুক্তি তর্ক বহুবিধ হইতে পারে। পরন্তু বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে, বহুশৃঙ্খলার ‘একেতেই’ পর্য্যবেশন বেশ অমুশিত হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে ‘একেব’ বহু শৃঙ্খলার পূর্ণতা ‘বহুর’ বহু শৃঙ্খলার পূর্ণতার সহিত, তুল্য হইতে পারে না। পরন্তু তাহা বহু পদার্থে সম্ভবপর হইলেও স্বগতভেদ বা গুণগতভেদবিশিষ্ট ‘একের’ তাহা পূর্ণরূপে না হইবার হেতু নাই। যাহা হউক, তাহা হইলে ‘একের’ বহু শৃঙ্খলার পূর্ণতা স্বীকার করিতে হইলে অব্যবগতভেদবিশিষ্ট বা গুণগতভেদবিশিষ্ট ‘একেবই’ স্বীকার করা হইল। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, মূল কারণ একজাতীয় বহু বস্তু নহে। জগৎ ও তাহার শৃঙ্খলা ‘এক’ হইলে সর্ববিধভেদপরিশূন্য মূল একটা বস্তু, আর জগৎ ও তাহার শৃঙ্খলা বহু হইলে মূল বস্তুটি অব্যবগত বা গুণগতভেদবিশিষ্ট একটা বস্তু। এখন দেখা যাউক, জগৎ ও তাহার শৃঙ্খলা ‘এক’ কি ‘বহু’। এ কার্য সাধন করিতে হইলে কেবল যুক্তি তর্কে হইবে না, উহাদের সহিত বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। পবস্ত্র এ সম্বন্ধে আলোচনা অতি বিস্তৃত ব্যাপার। ইহাতে প্রবৃত্ত হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই জগতের মূল ‘এক’, ইহা স্বীকার করেন ও তাহাবই প্রমাণে বদ্ধপরিকর। শাস্ত্রপ্রমাণ অবলম্বন করিলে আমবা কতকগুলি ভগবান বা ব্রহ্মবোধক এমন শব্দ পাইব, যাহার পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিলে জগৎকারণের একত্বই সুসিদ্ধ হইবে। ‘সর্বশক্তিমান’, ‘সর্বজ্ঞ’, ‘একই অধিতায়ী’, ‘একই বহু হইয়াছেন’—ইত্যাদি বাক্যে জগৎকারণের একত্বই বেশ বুঝা যায়।

এক্ষণে কাল অর্থে কিরূপ এক, তাহা একবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ‘পূর্বে এক ছিল’, বা ‘পরে এক হইবে’, ইহা কাল অর্থে এক শব্দের অভিধেয় হইতে পারে। যাহা পূর্বে এক ছিল, তাহা যদি পরে বহু হয়, তাহা হইলে পূর্বের একে বহুত্ব স্বল্প বা লুপ্তবিত্ত ভাবে ছিল, বলিতে হইবে। কার্যের

সমস্ত ভাব কারণে থাকি যুক্ত, কিন্তু কারণের সমস্ত ভাব কার্যে থাকি অযুক্ত। কার্য বহু হইলে কারণও বহু মানিতে হয়, একেব স্বীকারে অন্তের স্বীকার অপরিহার্য। কতকগুলি পণ্ডিত এই প্রকার শুক্তিজ্ঞান ছিন্ন করিবার জন্য একটিকে বাস্তব ও অপবর্তকে অবাস্তব বলিয়া থাকেন, কারণটিকে সত্য সত্য 'এক' বলিয়া কার্যটিকে মিথ্যা বলেন। আবার কেহ কেহ অবয়বগত বা গুণগতভেদ স্বীকার দ্বারা "এক কারণের" কার্যাবস্থার বহুত্ব সিদ্ধ করেন। 'কারণ' সত্য 'কার্য' মিথ্যা মতে, মিথ্যা শব্দের অর্থ আবার দুই রকম শুনা যায়। একটা অনিত্য ও তুচ্ছ অর্থে মিথ্যা, এবং অপরটা অভাব অর্থে মিথ্যা ; এই দুই প্রকার অর্থে মিথ্যা শব্দের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। গাঁহার 'কার্যের' অসম্ভাব অর্থে মিথ্যা বলেন, তাঁহাদের মত পক্ষপাতদোষহুই ; যে হেতু 'কার্য' অগ্ণাহ্য হইলেও অথবা কারণাতিবিক্ত না হইলেও কার্যাবস্থা স্বীকার ও তৎসঙ্গে তাহার অসম্ভাব বলায় নিজেব কথায়, নিজেবই প্রতিবাদ করা হয়। অতঃ অনিত্য ও তুচ্ছ অর্থে মিথ্যা শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রকৃতপক্ষে অল্প দুইটা মতের কোনটা স্বীকার করাই হয়। 'কার্যের' অনিত্যতা ও তুচ্ছতা হইলেও তাহা সেই মূল কারণের অবয়বগত ব্যাপাব বা গুণগত ব্যাপারের কোন একটা না হইয়া বাইতে পারে না। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, সেই মূল কারণ 'এক' হইলেও অবয়বগতভেদবিশিষ্ট বা গুণগতভেদবিশিষ্ট। হইতে পারে। এখন এই দুইটাব কোনটা সঙ্গত, তাহাই বিচার্য। সুতরাং দেখা যাউক, ব্রহ্ম এক হইলেও অবয়বগতভেদবিশিষ্ট কিম্বা গুণগতভেদবিশিষ্ট ব্রহ্ম বস্তু যে একেবাবে সৰ্ববিধভেদশূন্য, তাহা ভাবিবার আমাদের অবকাশ নাই, যে হেতু আমরা এই অপবিত্তমান বস্তুসমূহ দেখিয়াই তাহার মূলাধেষণে প্রবৃত্ত। বহুত্ব দেখিয়াই একত্বের অনুসন্ধান রত। সুতরাং এই ভেদের সামঞ্জস্য সেই 'একে' কিল্পে হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। এই স্থানে আমাদের দেশে ৩টা মহাত্মার মত প্রবল দেখা যায়। সেই ৩ জন মহাত্মা,— শঙ্কর, রামানুজ ও চৈতন্য। মহাত্মা শঙ্করের মতে মূল পদার্থ 'এক', তাহার গুণ বা শক্তিসাহায্যে এই বিচিত্র বস্তুসমূহ জাত বলিয়া উহার। সেই মূল পদার্থেব ত্রায় সত্য নহে, পরন্তু তাহা অনিত্য, তুচ্ছ অথবা মিথ্যা। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ বাস্তবিক ভেদ নহে, তাহা কাল্পনিক ভেদ মাত্র, আর কাল্পনিক ভেদকে মিথ্যা ব্যতীত কি বলা বাইতে পারে ? বাস্তবিক ভেদে ২টা বস্তুর পৃথক সত্তার পৃথক আধারে অবস্থানসামর্থ্য

ধাকে, আর সেই নিমিত্তই বাধ্য হইয়া, আমাদেরকে সেই ভেদকে মানিতে হয়। বাহা বাধ্য হইয়া, নিজেকে ও অপরকে মানিতে হয়, অথবা বাহা, মান আর নাই মান, তথাপি তাহাই, এইরূপে মানিতে হয়, তাহাই যথার্থ বাস্তবভেদের বিষয়। পক্ষান্তরে কাল্পনিক ভেদ সেরূপ নহে, ইহা যখনই ভাবিবে, তখনই বুঝিবে ; যখন ভাবিবে না, তখন বুঝিবে না। উহা কখন পৃথক্ আধাবে অবস্থান করে না ও করিতেও পারে না। ভাবিলে পৃথক্ বুঝা যায় আর না ভাবিলে পৃথক্ বুঝা যায় না, ইহাই 'ইহার বিশেষত্ব। পবস্ত তাই বলিয়া ইহা পাগলের চিন্তার মত নহে। যথার্থীতি যুক্তিপূর্বক ভাবিলে সকলেই সেই একই রূপ কল্পনায় উপনীত হইবেন, 'অথবা হইবে না। সকলকেই একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় বলিয়াই উহা করিতে যেন আমরা বাধ্য ; আব সেই কাবণেই যেন ইহা, এক প্রকার বাস্তব ভেদবিশেষ বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুতঃ এই ভাবটাকে স্বরণ করিয়াই মহাত্মা শঙ্কর শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ অনির্কচনীয় বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। শক্তি বশতঃ শক্তিমানের বৈচিত্র্য ভাব ধারণ, কাল্পনিক বা মিথ্যা হইলেও তাহা অনির্কচনীয়, অত্যন্ত মিথ্যা বা অতাসব মিথ্যা নহে। ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সমগ্র মত আলোচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

মহাত্মা রামানুজ কিন্তু সেই মূল কাবণকে অব্যবগতভেদবিশিষ্ট 'একটা' বস্তু বলিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় "যাহাতে 'বৈচিত্র্য হেতু' থাকে, তাহাতে উহা অব্যবগত ভাবে না থাকিলে উহা না থাকিব মধ্যে গণ্য। শক্তিগত-ভাবে স্বীকার করিলেও বিচিত্র অব্যব বিশিষ্ট পদার্থেরই বিচিত্রশক্তি সম্ভব। অবিচিত্র বস্তুব বিচিত্রশক্তি কে বুঝিতে পারে ?" কিন্তু বিচারে ইহা স্মৃজিত বলিয়া বোধ হয় না। এক বলিয়া অব্যবগতভেদ স্বীকার করিলে প্রকৃত পক্ষে নিজের কথারই প্রতিবাদ করা হয়। • একটা বস্তুকে সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন অসীম এক বলিয়া ভাবিলে তাহার অংশ কল্পনা পূর্বোক্ত "সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন এক" ভাবনার বিরোধ সাধন করে। সুতরাং অংশ ভাবনাটিকে কাল্পনিক বলিতে হইবে নচেৎ উহাদের সমন্বয় অসম্ভব। স্বগত ভেদে যে নিজের কথায় নিজের প্রতিবাদ করা হয়, তাহা ছাড়া আর একটা দোষ আদিয়া পড়ে। ইহাতে বিজ্ঞাতীয় বস্তুব অস্তিত্ব প্রকারান্তরে মানিতে হয়। একট ঘটিকা যন্ত্রের অব্যবগত ভেদ আছে, ঘণা, কাঁটা, চাকা, প্রভৃতি। এ স্থলে কাঁটা ও চাকার

অবয়বগত সীমাই তাহাদের পরস্পর পার্থক্যের হেতু, এবং সীমা অবকাশময় আকাশ পদার্থের দ্বারা সীমিত হয়, এবং অবকাশ, ঘটিকার অবয়বের সহিত বিজাতীয় বস্তু। যদি বলা যায় যে, বৃহৎ জলাশয়ের মধ্যে যদি একটা অংশ বরফে পরিণত হইয়া জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তাহার সীমা যেমন বিজাতীয় পদার্থবিশেষ দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না—উহাও তদ্রূপ; সুতরাং বিজাতীয় বস্তুব কোথায় সঙ্গতি থাকিল ? তাহাও সিদ্ধ হয় না। দেখা যায়, জলমধ্যগত তাপের অন্নাধিক্য এবং জলপবমাণুব অন্তর্গত আকাশ-রূপ অল্পকালের সঙ্কোচ বিস্তারই উক্ত বরফের সীমানির্ণয়ের হেতু। তাহার পর জল বরফ হইলে উহার অবয়ব বর্ধিত হয়। এক ঘন ইঞ্চি জল বরফ হইলে তাহার সমগ্র অবয়বের একাদশ ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি হয়। যদি বলা যায়, জলদৃষ্টান্ত গ্রহণ না করিয়া অপর তরল পদার্থের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে অবয়ববৃদ্ধি আশঙ্কা হইল। তাহা নহে। যে হেতু অপর তরল পদার্থ বৃদ্ধি না পাইয়া সঙ্কুচিত হয়। যদি বলা যায়, অবয়বগত বৃদ্ধি ও সঙ্কোচের কথা পরিত্যাগ করিয়া যে তাপ ও আকাশের কথা বলা হইয়াছে, উহা বাস্তবিক বিজাতীবৈভেদবোধক নহে, যে হেতু তাপ ও আকাশ জলের সহিত সহাবস্থান করে সুতরাং জল বলাতেই উহা গৃহীত হইয়াছে। তাহাও নহে। তাহা না হইবার দুইটা কারণ আছে, প্রথম, যে তাপ ও আকাশ বরফ হইবার পূর্বে জলে ছিল, তাহাই কখন বরফের হেতু নহে; কিন্তু উহাদের অন্নাধিক্যই বরফে পরিণতির হেতু। অন্নাধিক্য মানিলেই তাপ ও আকাশের সজাতীয় অল্প তাপ ও অল্প আকাশ স্বীকার করা হইল এবং অল্প পদার্থ স্বীকারে উহারা উভয়েও পরস্পর বিজাতীয় হইল। যদি বলা যায়, অল্প তাপ ও আকাশের বিজাতীয়তা স্বীকার করিলাম তথাপি জলের তাপ ও আকাশের সজাতীয়তা লোপ হইল কিরূপে ? যদি বলা যায় যে, জলের তাপ ও আকাশ অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সেই বরফের হেতুস্থানীয় তাপ ও আকাশের সহিত সংযুক্ত, এবং সেই সংযুক্ত তাপ ও আকাশ জলের সহিত সহাবস্থান করে, এইরূপ জলই দৃষ্টান্তে গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব যে, ভূমি উহাকে আর অবয়বগত প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছে কেন ? উহা ত আমার গুণগত ভেদের সহিত সমান, যে হেতু আমার মতে গুণ ও গুণী তোমাবই মতের প্রায় পবম্পাবে সম্বন্ধ; অতএব আর বিরোধ কোথায় ? যদি বল, না, বিরোধ আছে, যে হেতু তাপ ও আকাশ পদার্থবিশেষ

জল ব্যতীত আছে। না, তাহাও বলিতে পারা যায় না, যে হেতু দৃষ্টান্তে কেবল জলনিমজ্জিত বরফের কথাই হইয়া আসিয়াছে ; জলাতিবিক্ত পদার্থেব ধারণা ত ছিল না। শেষ কথা, স্বগতভেদবিশিষ্ট ‘এক বস্তু’ জগতের মূল কারণ বলা অপেক্ষা যে ‘বিচিত্রগুণবিশিষ্ট এক বস্তুই’ জগতের মূল কারণ বলা অধিক যুক্তিযুক্ত, একথা ঐ বিষয় যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই পবিস্ফুট হইতে থাকিবে।

মহাত্মা চৈতন্য অসামান্য প্রতিভাবলে মহাত্মা শঙ্কর ও বামাহুজের মতের সত্যাসত্য নির্ধারণ কবিয়া পুরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার মতে অবয়বগতভেদবিশিষ্ট বস্তুর বাস্তবিক একত্ব অসম্ভব। অবয়বগত ভেদবিশিষ্ট বস্তুর ক্রিয়া বা গুণ গত ব্যাপারে একত্ব লক্ষ্য করিয়া কখন কি বস্তুর অবয়বগত ভেদকে অভেদ বলা যায়? না; কিন্তু তাহাকে গুণ বা শক্তিগত ভেদ বিশিষ্ট বলিয়া তাহাব কার্যাবস্থাকে তুচ্ছ বা অনিত্য জ্ঞান করা যায়। যাহা শক্তিবশতঃ এক হইয়াও বহু হইতে পারে, তাহা যৎকালে বহু নাও হয়, তখনও সেই বহুব্যাপারবিহীন মনে। সুতরাং সেই ‘একে’ বহুত্ব তখন স্পষ্ট বা লুক্কায়িত বলিতে হয়, এবং লুক্কায়িত বা স্পষ্ট বস্তু কখন লুপ্ত বা অভাব মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না।

ঐ তিন মহাপুরুষের যুক্তিলাল পরস্পর তুলনা করিলে শঙ্কর ও চৈতন্যই অধিকতর মহিমান্বিত বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মতদ্বয় ব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে পরস্পরবেব শঙ্কগত ভেদ পবিত্যাগ করিলে একই বলিয়া প্রতীতি হয়। গুচ্ছচিত্তে তগবন্তজিমান হইয়া তাবিলে অল্পথা কদাচই অমুভূত হইবে না বরং উভয়ে উভয়েব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির হেতু হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইবে। মহামতি শঙ্কর ও চৈতন্যেব মতদ্বয় একত্র তুলনা করিলে বোধ হয় যেন একটা বিশাল উভয়গ্রাহী মতের অন্তরঙ্গ যাত্র। অঙ্গীভূত হুইটার, কোন একটা ব্যতিরেকে অপরটি অসম্পূর্ণ। একেরই যে বহুত্ব, তাহা সমগ্র শাস্ত্র সাক্ষ্য দিবে, এবং তাহা হইলে তাহার অবয়বগত ভেদ মানিয়া পূর্ণত্বেব বাস্তবিক হানি করা সুযুক্তির পবিচারক নহে। এবং গুণগত ভেদ মানিয়া কার্যকে কাবণবৎ পূর্ণ সত্য বলাও মহাত্মা চৈতন্যের পক্ষে যেমন ঠিক নহে, শঙ্করের পক্ষেও কার্যকে এককালে মিথ্যা বা তুচ্ছ বলাও তদ্রূপ সঙ্গত নহে। যিনি যে উদ্দেশ্যেই ‘কার্য’ সত্য বা

মিথ্যা বলুন, যে মতে মানবকে নিয়ত কেবল ব্রহ্মেই অমুখ্যানে অমুখ্যগী করিবে, তাহাই আদরণীয়। এবং প্রকৃতিরই অমুচিন্তন উদ্দেশ্য থাকিলে জগৎ-জ্ঞান-কালে বর্থেচ্ছাচারিতা বা কর্তব্যপরাভূততা কখনই আসিয়া মানবহৃদয় গ্রাস করিবে না।

এক্কেণে আমরা পূর্বোক্ত ৪ প্রকার একত্বের কথা সংক্ষেপে এক প্রকার আলোচনা করিয়াছি। পরন্তু ব্রহ্মের একত্ব সম্বন্ধে আর একটা পন্থা বর্তমান আছে। সেটা সর্বতোভাবে একত্ব। ইহাতে গুণ বা শক্তি, অবয়ব বা কাল বা জাতিগত কোন প্রকার ভেদের লেশ মাত্র নাই, কেবল 'একই এক।' একত্ব প্রসঙ্গ সমাপ্তি করিবার পূর্বে একবার এটাও চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। জগৎকারণ একরূপ একটা বস্তু বলিলে বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধির অতীত কথা আসিয়া পড়ে। একরূপ 'একে' কিরূপে এই বৈচিত্র্যের সমাধান হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। অধিকন্তু ইহারা জগৎপারকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ইহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসহ নহে। কারণ, ভ্রমব্যাপার কোন একটা সত্য বস্তু আশ্রয় করিয়া সেই বস্তুতে অন্তর্থা উপলব্ধি করাইয়া থাকে। তৎস্বীকারে এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া থাকে যে, ঐ অন্তর্থাভাব কোথায় ছিল যে, সেই আশ্রয়ীভূত বস্তুতে আসিয়া পড়িল ? জ্ঞান কথা ইহা অসম্ভব। মহাত্মা শঙ্করের যুক্তিজ্ঞান অধ্যয়নকালে অনেক স্থলে ইহা তাঁহার মত বলিয়া বোধ হইতে পাবে, কিন্তু সমগ্র লিখনভঙ্গী আলোচনা করিলে ইহা তাঁহার মত বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। তাঁহার নামে একরূপ মতের আবিস্কৃতি বলিয়া প্রবাদের হেতু, বোধ হয়, কোন তত্ত্বাবলম্বী মহাত্মার কার্য্য। যাহা হউক, ব্রহ্মের একত্বতত্ত্ব বুদ্ধিতে বাইরা কাহারও মতামত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এক্কেণে পূর্বে বাহা বাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্ম যে কি প্রকারের 'একত্ব', তাহা কতকটা বুদ্ধিতে পায় গিয়াছে। এক্কেণে ব্রহ্ম কি প্রকার বস্তু, আমরা তাহা বুদ্ধিতে চেষ্টা করিব।

ক্রমঃ।



# শ্রীশ্রীরামানুজচরিত ।

## অষ্টাদশ অধ্যায় ।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ । ]

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

যজ্ঞমূর্তিনামা কোনও দাক্ষিণাত্যবাসী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আৰ্য্যাবৰ্ত্ত পর্য্যটন-পূৰ্ব্বক তত্ত্বত্যা পণ্ডিতমণ্ডলিকে জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন কবিলেন । তিনি ভাগীরথীতীরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব যখন শুনিলেন যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য নামক কোনও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মায়াবাদ খণ্ডন কবিয়া স্বমত প্রচার করিতেছেন, তখন তিনি বালবিলম্ব না কবিয়া শ্রীরঙ্গমে উপনীত হইলেন । একরাশি পুস্তকপরিপূর্ণ একটি শকটও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল, কাবণ, তিনি পুস্তকগুলি না লইয়া কখন কোথাও যাইতেন না । যতিরাজের সম্মুখীন হইয়া তিনি তর্ক ভিক্ষা করিলেন । তাহাতে শাস্তমূর্ত্তি, স্মিতবিকশিতামন শ্রীরামানুজ কহিলেন, “মহাশয়, তর্কের আবশ্যকতা কি, আমি আপনাব নিকট পবাস্ত হইলাম । আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ; আপনার সর্ব্বত্রই জয় ।” ইহাতে যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, “যদি আপনি পবাস্ত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিলেন, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, আপনি ভ্রান্ত বৈষ্ণব মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্রান্ত মায়াবাদ গ্রহণ কবিলেন ?” যতিরাজ কহিলেন, “মায়াবাদীরাই তো ভ্রান্তি ভ্রান্তি কবিয়া উন্নত । তাঁহাদের মতে তর্কযুক্তি প্রভৃতি সকলই মায়া । অতএব মায়াবাদ কিরূপে অত্রান্ত হইতে পারে ?” ইহাতে যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, “দেশ কাল নিমিত্তের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসকলই মায়ায়, এই জ্ঞানই মায়াবাদী বলেন, এ তিনটি ত্যাগ না করিলে কখনও অত্রান্ত সত্যে উপনীত হওয়া বাইবে না । আমরা যাহাকে ভ্রম বলি, আপনাবা তাহাকেই সত্য বলেন । সুতরাং আপনারা ভ্রান্ত না হইয়া আমরা কিরূপে ভ্রান্ত হইব ?”

বাদানুবাদ এইরূপে আরম্ভ হইয়া সপ্তদশ দিবস ধরিয়া চলিতে লাগিল । শেষ দিন শ্রীরামানুজের যুক্তিগুলি যজ্ঞমূর্ত্তি খণ্ডন করিয়া ফেলিল । যতিরাজ তাহাতে কিছু বিমর্ষ হইয়া স্বমঠে গমন কবিলেন ও মঠস্থ দেববিগ্রহ শ্রীদেবরাজের সম্মুখে এই বলিয়া যুক্তকবে আবেদন করিলেন, “হে নাথ, যে বৈষ্ণবশাস্ত্র পূর্ব্ব পুণ্য মহানুভবগণ অবলম্বন করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মকরণ্যাপানের

অধিকারী হইয়াছেন, কালক্রমে সেই মহান শাস্ত্র মায়াবাদরূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মায়াবাদিগণ কৃষ্ণকৃষ্ণ দ্বারা আপনাদিগকে ও মোহান্বিত জীব-  
গণকে মোহিত করিতেছে। তাহাদের তর্ককাল একপ ভ্রান্তি আনয়ন  
করে যে, সাত্ত্বিক মহামাগণও সময়ে সময়ে চমৎকৃত হইয়া উঠেন। হে  
আনন্দধামন, আর কতকাল নিজ সন্তানগণকে আপনার শ্রীপাদছায়া হইতে  
দূরে রাখিবেন?” এই বলিয়া জীবহুঃখকাতর বতিরাজ অশ্রুবারি  
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। সেই বিবুধাগ্রণী রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে দেব-  
রাজকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার নিকট এই আশ্বাসবাণী শুনিলেন,  
“বতিরাজ, উদ্বিগ্ন হইও না। ভক্তিব্যোগের প্রকৃত মাহাত্ম্য তোমার ভিতর  
দিয়াই শীঘ্র জগতে ঘোষিত হইবে।”

শয্যা হইতে গাঢ়শ্রীখান করিয়া তাঁহার আব আনন্দের সীমা রহিল না। এই  
অমৃতনিঃসান্বিনী সরসভী তাঁহার হৃদয়ের বাবতীয় মানি দূর করিয়া, তদীয়  
মুখমণ্ডল এক প্রকার স্বর্ণীয় জ্যোতিঃ দ্বারা মণ্ডিত করিল। তিনি প্রাতঃকৃত্য  
সমাপন করিয়া বজ্রমূর্ত্তির মঠে উপনীত হইলেন। তাঁহার অমাহুতী রূপবিকাশ  
দেখিয়া মায়াবাদী ভক্তিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, “গতকল্যাণমন সময়ে  
শ্রীরামানুজ মলিনমুখে স্বমঠে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্য দেখিতেছি,  
সাক্ষাৎ স্বর্ণীয় দেবতার ত্রায় ইনি এখানে উপনীত। নিশ্চয়ই ইনি দৈববল  
আশ্রয় করিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁব সহিত তর্ক করা বিফল। একপ মহা-  
পুরুষের শরণাগত হওয়াই শ্রেয়ঃ, কারণ, বৃথা শুদ্ধ তর্ক করিয়া সমস্ত জীবনটা  
কাটাইলাম। অহঙ্কারকে এইরূপে পরিপুষ্ট করিয়া চিত্তের মানিই বর্জন  
করিলাম। যখন চিন্তাভ্রষ্ট হইল না, তখন ব্রহ্মজ্ঞান ত স্পষ্টবাস্তব।  
কিন্তু এই মহাপুরুষের স্বভাব কি নির্মল! ক্রোধ, অহঙ্কার, অভিমান ইহাঁকে  
স্পর্শ করিতে পারে না। বদন সর্বদাই এক অনির্বচনীয় দিব্য কান্তিতে  
উদ্ভাসিত। এত কর্কশ কথা প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু এতদিনের মধ্যে  
ইহাঁকে কখনও রুষ্ট হইতে দেখি নাই। কিন্তু ক্রোধে ও অভিমানে আমি  
যে ইতিমধ্যে কতবার দগ্ধ হইয়াছি, তাহা গণনা করিতে পারি না। ধিক্  
আমাকে! একপ মলিন হৃদয় লইয়া একপ দেবভূলা পবিত্রহৃদয় মহাপুরুষের  
সম্বন্ধ হইতে চেষ্টা করা বাতুলতা-বাহ। ইহাঁর শিগ্ঘ্র প্রহরণ করিয়া,  
আমি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, অহঙ্কারকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া  
পবিত্রতারূপ অমৃত আশ্বাদনে বহুবান্ হইব।”

এইরূপ স্থির করিয়া সুকৃতী যজ্ঞমূর্ত্তি যতিরাজেব পাদগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। যতিপতি তাহাতে ক্রিষ্ণিং সন্তুচিত হইয়া কহিলেন, “যজ্ঞ-মূর্ত্তে, আপনি মহাপণ্ডিত হইয়া এ কিরূপ আচরণ করিতেছেন? অদ্য তর্কেব অবতারণা কবিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?” ইহাতে বিনয়নম্র পণ্ডিতবর উত্তর করিলেন, “মহানুভব, যে তার্কিক এতদিন ধরিয়া আপনাকে বিধিযতে খেযোক্তিসমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে রুথা চেষ্টা করিয়াছিল, আমার পূর্ব্ব সুকৃত-কলে সে এক্ষণে আমার হৃদয়রাজ্য হইতে প্রস্থান করিয়াছে সুতরাং কে আর আপনার জ্ঞান মহানুভবের সহিত রুথা তর্ক করিবে? অমুনা সন্মুখে আপনার চিরদাস দণ্ডায়মান আছে, তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন।” আমি আপনাব শিষ্ঠ, আপনার পবিত্র উপদেশ দ্বারা আমার চির অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে পবিত্রতার আলোকে আলোকিত করুন।” “নাথমাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহনা শ্রুতেন”। রুথা পাণ্ডিত্যাভিমানকে প্রশ্রয় দিয়া আমি অহঙ্কারকেই বলবান কবিয়াছি। হায়! আমার জ্ঞান মূৰ্খ আর কে আছে? আপনি এ অকিঞ্চন দাসকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করুন। শ্রীবামনুজ যজ্ঞমূর্ত্তিব সহসা এই পবিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন না, কারণ, তিনি নিজ ইষ্টদেব শ্রীববদরাজের স্বপ্নকথিত বাক্যগুলি স্মরণ কবিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহারই কৃপায় সন্মুখস্থ দাস্তিক পণ্ডিত বিনয়ভূষণে বিভূষিত হইয়া এক মনোহর দেবতুল্য কান্তিলাভ কবিয়াছেন।

তিনি মৃদুমধুবন্ধবে কহিলেন, “ধন্য শ্রীবরদরাজ! তাঁহার কৃপা পাষণকেও দ্রব করিল! যজ্ঞমূর্ত্তে, অজ্ঞান অভিমান ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করা মনুষ্যশক্তিব আয়ত্তাধীন নহে। ‘বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্’, কিন্তু সেই বিদ্যা যদি অবিদ্যারূপে দম্ব ও মদের প্রসুতি হয়, তাহা হইলে আব কাহার সাহায্যে মদান্বিত দাস্তিক হৃদয়ে বিনয়ের প্রবেশলাভ হইতে পারে? একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপায় এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভবপর কবিতে পারে। তুমি সেই কৃপাবলেই অদ্য, মানবেব পবন শত্রু যে অহঙ্কার, তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ। অসীম তোমাব সৌভাগ্য!” যজ্ঞমূর্ত্তি কহিলেন, “যখন আপনার জ্ঞান মহানুভবের সন্দর্শন লাভ করিয়াছি, তখন বাস্তবিকই আমার গোভাগ্যের সীমা নাই। এখন আমায় কি করিতে হইবে আদেশ করুন। আমি আপনার মূৰ্খ সন্তান।” যতিরাজ কহিলেন, “বৎস,

‘হৌমো যজ্ঞোপবীতেন যদি ত্বাং জ্ঞানভিক্ষকঃ।

তত্ত্ব জিহ্বাঃ নিম্বলাঃ স্ত্রীঃ প্রাশস্তিত্বং বিধীয়তে ॥

গায়ত্রীসহিতানেন প্রাজ্ঞাপত্যান্ বড়াচবেৎ।

পুনঃসংস্কারমাস্ত্য ধার্ম্যঃ যজ্ঞোপবীতকম্ ॥

উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জনপবিত্রকম্ ।

কোপীনং কটিবন্ধ ন তাজ্যং যাবদায়ুযন্ ॥’

এই বচনানুসারে তোমার যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রথম কর্তব্য।” যজ্ঞমূর্ত্তি তাহাতে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথাবিধানে উপবীত ধারণ কবিলেন। পরে যতিবাজ তাঁহাকে উর্দ্ধপত্ৰ ধারণ কবাইয়া শঙ্খচক্রাঙ্কিত কবিলেন, এবং দেববাজের রূপায় তাঁহার চৈতন্য লাভ হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দেববাজ মুনি এই অগ্ন্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস, এক্ষণে তোমার অতুল পাণ্ডিত্য অভিমানমেঘমুক্ত হইয়া পবন শোভাব আশ্রিত হইয়াছে। তুমি সত্বপদশপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া লোকের হিতসাধনে আপনাকে নিযুক্ত কর। যজ্ঞমূর্ত্তি শ্রী গুরুবাক্যানুসারে তামিল ভাষায় “জ্ঞানসাব” ও “প্রমেয়সাব” নামক দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইলেন। শ্রী বামানুজ তাঁহার নিবাসেব জন্ম এক বৃহৎ মঠ নির্মাণ কবিয়া দিলেন।

এই ঘটনাব কিয়দ্বিবস পরে চাবিজন মেধাবী শাস্ত্র দান্ত বৈবাণ্যবান্ যুবক শ্রী বামানুজের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্ম আগমন কবিল। মতি-বাজ তাহাদিগকে কহিলেন, “তোমরা দেববাজ মুনির নিকট গমন কবিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিষ্যত্ব গ্রহণ কব। তাহার দ্বায মহাপণ্ডিত পৃথিবীতে অতি বিবল। গুরু পাণ্ডিত্যই তাঁহার ভূষণ নহে, তাঁহার দ্বায ভগবদ্বক্তৃ-পরায়ণও অতি দুর্লভ।” তদ্বাক্যানুসারে উক্ত চারিটি যুবক দেববাজ মুনির শিষ্য হইলেন। শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করা দূবে থাকুক, ভাবিলেন, “এ আবার কি এক উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। কোণায় বহুকষ্টে অভিমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি, তদুপরি আবার ‘আমি গুরু’ ইত্যাকার অভিমান আশার মোহিত কবিতো প্রবৃত্ত হইল।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় গুরুর পাদমূলে উপনীত হইলেন এবং অতি দীনভাবে কহিলেন, “প্রভো, আমি আপনার সন্তান। তবে আমার প্রতি আপনার কেন এরূপ নিষ্ঠুরতা?” যতিবাজ কহিলেন, “কেন বৎস, কি হইয়াছে?” দেববাজ মুনি কহিলেন,

“পিতঃ, আপনার রূপায় অভিমান রূপ রাক্ষসের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। আবার কেন এ অকর্ণশীল চুরাচারকে সেই অভিমানকবলে নিক্ষেপ করিতেছেন? আশায শুক হইতে আদেশ করিবেন না। জলে পদ্মপত্রের ভাষ আমার নির্লেপভাব এখনও আইসে নাই। আপনি আমায় নিজ দাস করিয়া আপনারই নিকট স্থান দিন। আমার নূতন মঠেব আবশ্যক নাই।” শ্রীরাধামুখ তাঁহার এই বাক্যে পবম-প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রেমভাবে গাত আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “বৎস, আমি তোমায় পবীক্ষা করিবার জন্তই এইরূপ করিয়াছি। তুমি পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। হে বৈষ্ণবশিরোমণে, তোমাব শুদ্ধা ভক্তিলাভ হইয়াছে। তুমি আমার নিকটেই থাক ও মঠস্থ দেববিগ্রহ শ্রীবদবাজেব সেবা করিয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত কর।” এই আদেশলাভ করিয়া দেবরাজ মুনি আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন এবং শ্রীমদেবরাজেব সেবা ও শ্রীরাধামুখের কৈঙ্কর্য্য করিয়া অবশিষ্ট জীবনের অমূল্যতা সম্পাদন পূর্বক সকলেরই অমুকরণীয় হইলেন।

ক্রমশঃ।

## আক্ষেপ ।

কুটারের কোণে বসি,  
গড়িলে মূবতি তাব,  
জানিনা কেন ভাঙ্গিয়া যায় !  
কল্পনাব ভুলি দিয়া,  
আঁকিলে তাহার ছবি,  
জানি না কেন মুছিয়া যায় !  
দিবানিশি কেঁদে কেঁদে,  
ফেলি কত অশ্রুধার,  
পড়ে না ছায়া হৃদয় মাঝে !  
কোথা হ’তে আসে বেন,  
আকুল সনেহ ঘোর,  
প্রাণের ধারে শিখর বাজে !

আসিবার কালে হেথা,  
পূজিতে চরণ তার,  
প্রতিজ্ঞা কত করিয়াছিহু !  
কি মোহ মদিরাপানে,  
বিভোর হইয়া এবে,  
চরণ তার ভুলিয়া গেহু !  
অভাবে পড়িয়া পাছে,  
ভুলে থাকি নাম তার,  
আদরে তাই মতন করে ;  
আমার স্বপ্নের লাগি,  
সাজাইয়া চারিধারে,  
রেখেছে কত ধরে বিধরে !

পূত জাহবীর জল,  
 মধুমাধা ফুল, ফল,  
 শিশুর মুখে মধুর হাসি !  
 দখিনা মলয় বায়,  
 বিহগের কল গান,  
 অমিয় মাথা জোছনা রাশি !  
 পথহারা হব ভেবে,  
 দিবাকর, নিশাকর,  
 সন্ধ্যাই তার হৃদয়ে জাগে,  
 দৌড়ে যথা যাই আমি,  
 তারাত ছুটিয়া ধায়,  
 দেখায়ে পথ আমার আগে।

কত দয়া, ভালবাসা,  
 বুকেতে জাগিছে তার,  
 আমার হৃদু কল্যাণ ভরে,  
 অকৃতজ্ঞ, পাপী আমি,  
 শুধু আমারে লইয়া,  
 ডুবিয়া আছি যুগের ঝোরে।  
 এ যুগ ভাঙ্গিয়া যাবে,  
 এ নিশা হইবে ভোর,  
 তাহার কাছে রহিব আমি।  
 আসিবে সূর্য্যদিন যবে,  
 নিশিবে তাহার সনে,  
 আমার সেই হৃদয়-স্বামী।  
 শ্রীয়েবতীমোহন চৌধুরী।

## সাধ।

( ১ )

তবু মোব সাধ যায়।  
 তোমার সেবক সনে,  
 ঘুরি ফিরি বনে বনে,  
 তব নাম গুণ গেয়ে,  
 পরাণ জুড়াই।  
 সৌভাগ্যের অন্তরালে,  
 যদিও বিজুলী খেলে,  
 যদিও আলোক দেখি,  
 তমসা নিশ্বাস,  
 তবু মোর সাধ যায়।

( ২ )

তবু মোব কঁাদে প্রাণ,  
 কামিনীর ভালবাসা,  
 যশ, মান, ধন আশা,  
 যদিও হৃদয়ে জাগে,  
 অঁধিয়া নয়ান,  
 চরণে শরণ লব,  
 পূজিব চরণ তব,  
 আজন্ম অর্জিত গুণে  
 লভিয়াছি প্রাণ ;  
 তবু মোর কঁাদে প্রাণ !

( ৩ )

পথ নাহি পাই আর,  
কত সুব স্বপ্ন দেখি,  
এ জগৎ ভুলে থাকি,  
অঁকিলে মূৰ্তি তব,  
হৃদয়ে আমার !  
ও দিকে কুটীর ঘরে,  
ক্ষুদ্র আশ্রিনায় প'ড়ে,  
অতৃপ্ত বাসনা কত,  
কবে হাহাকার,  
পথ নাহি পাই আব !

( ৪ )

মরণ আসিছে ঘিরে,  
হৃদিনেব ভাষাবাসী,  
হৃদিনেব মেলা মেলা,  
হৃদিনে ফুৰায় ঘাঘ  
চিরদিন তরে ।  
ভেঙে দাও ঘুম দেহ,  
প্রণয়ী শ্রীপদে তব,  
বাজিছে কালের ভেবী  
কুটীর দুধাবে ।  
মরণ আসিছে ঘিরে !  
শ্রীরেবতীমোহন চৌধুরী ।

## সমালোচনা ।

মর্শোচ্ছ্বাস । শ্রীকৃষ্ণ কুমারী বায় প্রণীত । ভবানীপুর ২নং কেশব নাথ  
বসু লেন হইতে শ্রীনবগোপাল চাকি এম, এ, কর্তৃক প্রকাশিত ।

“জদযেব কদ বেদনা ভাষায় প্রকাশ কবিতা একটু শাস্তি পাইবাব  
আশায়” লেখিকা এই কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন । তদীয় পিতৃদেবের  
অম্লবোধে প্রকাশ কবিতাছেন । দুঃখের বিষয়, গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বেই  
লেখিকা স্বর্গবোধ করিয়াছেন । কবিতাগুলিতে প্রাণ আছে । পড়িয়া  
মনে হয় কবিতাগুলি কবির জদযেব স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস । ভাষা ও ছন্দ  
মনোরম । মোটেব উপর মর্শোচ্ছ্বাস আমাদের ভাল লাগিয়াছে ।

বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র । শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত । ৩৩নং মণিক বসুর  
ঘাট ষ্ট্রাট, জয়ভূমি কার্যালয় হইতে গ্রন্থকাব দ্বাবা প্রকাশিত । মূল্য ৥০ আনা ।

এটা চৈতন্য লাইব্রেরির পুস্তক প্রবন্ধ । সুতরাং ইহার পবিচয়  
প্রদান বাছল্য মাত্র । গ্রন্থকার ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া  
সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন । বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের স্থান

অতি উচ্চে । গ্রন্থকাব তাঁহার পুস্তিকায সংক্ষেপে হেমচন্দ্রচরিত আলোচনা করিয়া তাঁহার কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা কবিয়াছেন । সমালোচনাটী উৎকৃষ্ট হইয়াছে । আমরা গ্রন্থকাবের নিকট হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আবার বিস্তারিত আলোচনার প্রত্যাশা করি ।

দেশের কথা । প্রথম ভাগ । গ্রীসখাবাম গণেশ দেউস্বব প্রণীত । কলিকাতাব স্কল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত্য । মূল্য ১ এক টাকা ।  
দেউস্বব মহাশয়ের নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত । সম্ভ্রতি তিনি ভারতহিতৈষী উইলিয়ম ডিগ্‌বি, দাদাভাই নোবোজি, গ্রীষ্মন্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতিব গ্রন্থ অবলম্বনে অতি সুললিত ভাষায় দেশের কথা বিবৃত কবিয়াছেন । ইংবাজের শাসননীতিতে ভারতবর্ষের কৃষক ও শিল্পিকুলের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাবতে দ্বিগুণ যে একটা চিরস্থায়ী ব্যাধিবিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন কি, সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাজ-নৈতিক বিষয়ে যে অবনতি ঘটিয়াছে, গ্রন্থকাব তাহা বিশিষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ দ্বাৰা বিবৃত কবিয়াছেন । একপ একখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হওয়াতে বঙ্গ-ভাষা বিশেষ লাভবান হইলেন, বলিতে হইবে । গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহা কাল্পনিক উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, ইহাতে প্রতি পদে সবকারী তালিকা ও বিবাসযোগ্য মনসী লেখকগণের রচনা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

গ্রন্থকাবের মতে স্বদেশভক্তি এবং প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনই এই অবস্থা প্রতীকারের একমাত্র উপায় । আমরা বলি, রাজনৈতিক আন্দোলন কর্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সহিত আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত কর্তব্যগুলি কি আমরা যথাযথ কবিতোছি ? আমাদের বিশ্বাস,—যেমন ব্যক্তিগত কর্মফলে ব্যক্তিগত অবনতি হয়, তদ্রূপ জাতীয় কর্মফলে জাতীয় অবনতি । এই কর্মফল কাটাইতে হইলে জাতীয় গুণকর্মের অহুতান প্রয়োজন । শুধু গবর্ণমেন্টের কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত কবিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চীৎকাবই সে গুণ অহুতান নহে । কতকগুলি সম্পূর্ণ স্বার্থভাগী পুস্তকের প্রয়োজন,—যাহারা দেশকে তাঁহাদের ইষ্ট-দেয়তাক্রমে জানিবেন এবং মৃত্যুভয় পর্যাঙ্ক তুচ্ছ করিয়া সাধারণের ভিতর ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়া সর্ববিধ নৈতিক বিদ্যার বিস্তার করিবেন । তবেই দেশের আমূল সংস্কারের কার্য আরম্ভ হইবে । ভারতের প্রবল



আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান হইলে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও বাস্তবনৈতিক সমস্যাগুলি লইয়া দেশের লোক ভাবিতে শিখিবে। ভাবিতে শিখিলেই উপায় উদ্ভাবিত হইবে।

যাহা হউক, গ্রন্থখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ব্যক্তিমাট্রেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করা কর্তব্য।

বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড। পান্নাধিপতির ভূতপূর্ব ডাক্তার শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ এম বি কর্তৃক বিরচিত। ৫৫নং ক্রামবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীশ্রীনাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ১১০ টাকা।

এই পুস্তক তিনখানি কলেবর ও নাম দেখিয়া আমরা যেরূপ আশাব্যস্ত হইয়াছিলাম, পাঠ করিয়া তদ্রূপ নিরাশ হইয়াছি। গ্রন্থকার বর্ণনা না করিয়াছেন, এমন বিষয় নাই, কিন্তু আমরা ইহাব মধ্যে ‘বৈজ্ঞানিক’ কিছুই খুজিয়া পাইলাম না। গ্রন্থকারের ভাষা স্থলে স্থলে হাস্যোদ্বীপক, ভাবও তথৈবচ। এরূপ পুস্তক প্রচারে শুধু গ্রন্থকার সাধাবণের নিকট হাত্তাস্পদ হন, তাহা নহে, হিন্দুধর্মেরও অবমাননা করা হয়। কিন্তু হিন্দুধর্ম এখন বেণ্ডয়ারিস মাল। তাহাকে যিনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতেছেন। এ অবস্থায় আর শ্রীনাথ বাবু অপরাধ কি? আমরা কাহাকেও এই সুদীর্ঘ তিনখণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া সময়ের অপব্যয় করিতে বলি না।

## সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৮ই ও ২৫শে অগ্রহায়ণ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে কলিকাতা বিবেকানন্দ সমিতির অধিবেশন হয়। স্বামী সারদানন্দ ‘সাংখ্য ও গীতার ঈশ্বরতত্ত্ব’ এবং ‘গীতা ও অত্যাচার শাস্ত্রে কথিত বিষয়ানুভূতির ক্রম’ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

মাসের সময়ে সময়ে উৎসাহ সহকারে কত কার্য করে, আবার সময়ে সময়ে উৎসাহ কমিয়া যায়, তখন বদ্ববৎ কার্য করিয়া থাকে। দেখা যায়, সভাসমিতি যখন প্রথম প্রথম স্থাপিত হয়, তখন হু একজন উৎসাহী লোক থাকতে তাহার কার্য সূচরূপে চলে, তাহার দ্বারা কতকগুলি খুব

ভাল ভাল কার্য্য হয়। কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্কানের সঙ্গে সঙ্গে হয় সেটা উষ্টিয়া যায়, নতুবা কতকগুলি লোক, স্বহাদের সেই কার্য্যে কোন উৎসাহ নাই, কোন অনুরাগ নাই। তাহাদের উপর সেই কার্য্যের ভাব পড়ে। তাহারা ঔষধগেসার মতন কার্য্য নির্বাহ করে, ফলে হয় শেষে কার্য্যটা উষ্টিয়া যায় অথবা প্রবর্তকের উদ্দেশ্যে বিপরীত কার্য্য হইতে থাকে। ইহাকেই আমাদের দেশের চলিত কথায় বলে, প্রথমে বিগ্রহ, পরে নিগ্রহ, পরিশেষে গলগ্রহ।

ইহাই প্রকৃতির নিয়ম—উত্থান, পতন। মাষার রাক্ষো কিছুই চিরস্থায়ী হয় না, এটা জানিয়া বাধা আবশ্যক। তবে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য সূচাকল্পে কাষ চালাইতে গেলে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও কার্য্যতৎপরতা আবশ্যক। নিয়মাদির সংস্কার প্রকৃত সংস্কার মতে, ষোড়াতাড়ি দিয়া কাষ চালান মাত্র।

মিউনিসিপ্যালিটির কাষ ভাল চলিতেছে না। শুধু আন্দোলনেই কি সুফল পাইবে? আগে নিজের ঘর দোর, বাড়ীর সামনের রাস্তা ভাল করে সাফ কর, রাস্তাঘাট খামখেয়ালিমত অপবিস্কার কবিতো না। তুমি বলিতেছ, আমি একা না হই করিলাম, আর দশজনে যদি না করে, আমি একা কতটুকু করিতে পাবি? তুমি সব কবিতো পার। বিশ্বাস কব, তোমার ভিতরে সব শক্তি অন্তর্নিহিত ও সব ভার তোমার উপর।

এক ব্যক্তি কতদূর কাষ কবিতো পাবে, তাহা আমবা এখনও জানি না। আমাদের আত্মশক্তি সম্বন্ধে আমবা এখনও অপরিচিত। আগে যতটুকু পার কর দেখি। পান্ঠাত্য সংহতিগ (Organization) কথা বলিতেছ? এই সংহতির মূলেও ব্যক্তিগত শক্তি।

মেতার উপর অবিস্তারিত বিশ্বাস, উদ্দেশ্যের (Cause) সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দার্ঘ বা মতামত বিসর্জন এবং পরম্পর বিশ্বাসই সংহতির মূল। এ দেশে এখনও তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে বিলম্ব আছে।

‘গুরু উপর দৃঢ় বিশ্বাস’ বলিয়া একটা কথা এ দেশে প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে আজ আমরা সেটাকে কুসংস্কার বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছি। কিন্তু এ দেশে সংহতি গঠন করিতে হইলে প্রথমে এই ‘গুরু উপর অবিচলিত বিশ্বাসের’ ভিত্তির উপরে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

তবে কি নিজেব স্বাধীনতা বিসর্জন দিব ? স্বাধীনতাই যে মানবজীবনের অমূল্য সম্পত্তি ! মনকে যত পাব স্বাধীনতা দাও, কিন্তু কার্যকালে সম্পূর্ণ বশতা স্বীকার কর। গুরু—যাহাকে তুমি গুরু বা মেতৃপদে বরণ করিয়া লইয়াছ—তিনি যাহা বলেন, তোমার অন্তর্য বোধ হইলেও আগে কর, পরে প্রতিবাদ। তোমার কোন বিশেষ মতামত চলিল না বলিয়া ক্ষতস্থ মল গঠন করিতে যাইও না।

জাতীয় ভাব উদ্বোধনের প্রতিবন্ধক এ দেশে দুইটা। যাহা বা বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত, তাঁহা বা সময়ে সময়ে জাতীয়তাব লইয়া গলাবাজি ও চীৎকার করিলেও কার্যকালে তাঁহাদের নিজ পদোন্নতি, নিজ আত্মীয় স্বজনের কথাই বিশেষভাবে জাগরক হয়, তাঁহারা অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার আদৌ সময় পান না—তজুগ কবা ছাড়া। আর এক প্রকৃতিব লোক, যাহারা ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহারা দেশের জন্ত প্রাণ দেওয়াটাকে ‘মায়া’র অন্তর্গত বলিয়া নিশ্চিত হইয়া হবিনামেব মালা জপ করেন।

এদেশে জাতীয়তাবের যে অভ্যুত্থান, ইহা এখনও দোরতর পাশ্চাত্য-গুরুবিশিষ্ট বহিয়াছে। ইহা অনেকটা পোষাকী ব্যাপার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। চাই ওটকতক অবিবাহিত, সংসারসম্বন্ধহীন যুবা, যাহারা এই ক্ষুদ্র সংসারের গভী ছাড়িয়া সমগ্র দেশের জন্ত ভাবিতে ও কাষ করিতে পারেন।

## ব্রহ্ম-কি ?

শ্রীবাঞ্ছেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত ।]

[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ।

এক্কেব একই বৃত্তিতে যাটবা আমবা এই প্রবন্ধে শসঙ্গকমে, জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, ব্রহ্মজ্ঞানের উপকাৰিতা এবং জগৎকাৰণ সম্বন্ধে যত প্রকাৰে প্রচলিত মত, পুস্তকাদি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ছ। অধুনা, বন্ধ কি পদার্থ, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ষট কি পদার্থ বলিলে, উহা মুক্তিকানিমিত্ত ইত্যাকার পদার্থ জ্ঞানিয়া, যেমন আমবা আমাদের জিহ্বাসারস্টি চবিতার্থ করি, 'ব্রহ্ম-কি' বলিতে আমাদের সেইরূপ একটা বিহু বৃত্তিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমবা দেব যে জ্ঞান, তাহাও কিছুই মৌলিক ও নূতন নহে। যাহা যাহা দেখি বা শুনি, তাহাই ভাবি, এবং যাহা কিছু নূতন বলিয়া সাধাবণতঃ মনে করি, তাহা পুরোক্ত উপাঞ্জিত জ্ঞানের প্রকাৰাম্বব মাত্র। প্রকৃত পক্ষে যথার্থ নূতন আমবা কিছুই ভাবিতে বা বৃত্তিতে পারি না; নূসিংত মুক্তি অদিত কবা সাধাবণতঃ নূতন ভাবনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা নূতন নহে, উহা পুৰুষ্ট সিংহ ও নবের মুক্তির অবয়ব-সংযোগ দ্বারা সাধিত। জড়-বিজ্ঞান আলোচনা কালেও আমবা দেখিতে পাই যে, এ সৃষ্টিৰ উপাদান বাহা পূর্বে ছিল, এগনও তাহাই আছে, ইহাও একটা পদমাণুও ব্রহ্মি হয় নাই, এবং হইবার সম্ভাবনা নাই। উভয় স্মৃতিই আমবা দেখিলাম, মানস কার্য বা জড় জগতে নূতন কিছুই হয় না বা আমবা মনে আনিতেও পারি না। প্রকৃত পক্ষে এ কথাটা ঠিক। উহা যতই আলোচনা কবা যাউনে, ততই স্পষ্ট বলা যাউবে। যাহা আছে বা পাপি, তাহা বিকালই থাকিবে ও পারিব। কাল ও অবস্থাভেদে বস্তুসমূহের রূপান্তর ও প্রকাৰাম্বব ভেদ হয় মাত্র।

'ব্রহ্ম-কি বস্তু' বৃত্তিতে হইলে আমাদের এই জাগতিক জ্ঞান সাত্তাশো বৃত্তিতে হইবে। তাহাকে বাক' মনের অগোচর বা চিত্তস্থ বলিয়া ক্ষান্ত হইলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কিছুই বলা হয় না। যেহেতু জগদন্তীত পদার্থের জ্ঞান আমাদের নাই। আমবা যাহা বৃত্তি, তাহা এই জাগতিক পদার্থের তুলনায় বা ইহাদিগকে দৃষ্টান্তস্থানীয় করিয়া বৃত্তি। পবিত্রাত বস্তু-মূলের সহিত মিশাইয়া ইহা সেই বস্তুব সহিত কোন অংশে একরূপ এবং কোন

অংশে অগ্ররূপ দিব' করিয়া বুলি। বন্ধ যদি জগৎকাবণে জগতের সহিত কোঁকিলে সন্ধ না হইতেন, বশিতে কি, তাহা হইলে আমরা কখনও ইহা বুলিতে চাহিতাম কিনা জানি না। যদি তিনি জগৎকারণ হন, তাহা হইলে তিনি জগতের সহিত সন্ধ, সেই হেতু তিনি আমাদের বোধ্য হইবেন। বোধ্য বলিয়াই যে সব্যতোভাবে বোধ্য, তাহাও ভাবিব না। যেহেতু 'কার্য্যে' 'কাবণে' যতটা ভাব বর্তমান থাকে, ততটাই 'কার্য্য' দৃষ্টে আমাদের বোধ্য। 'কাবণ' ভাব সমগ্রভাবে 'কার্য্যে' বর্তমান থাকে না, পবন্ত 'কার্য্যভাব' সমগ্রভাবে 'কাবণে' থাকে। সুতরাং বন্ধ যখন জগৎকাবণ, তখন জগদ্ভাব সমগ্ররূপে তাহাতে আছে, তাহাব সমস্তভাব জগতে নাই, তাহার কতক ভাব যে জগদতীত, তাহাই সম্ভব। যাহা জগদতীত, তাহা আমাদের এখানে বুলিবার প্ররুত্তি নাই। তবে যতটা ভাব তাহাব জগৎ দৃষ্টে অসম্ভব কবা যাইতে পারে, ততটাই বুলিতে চেষ্টা করিব। একপতাবে বন্ধ বুলিতে ইচ্ছা করিলে জাগতিক জ্ঞান আমাদের যতই পূর্ণ হইবে, বলা বাহুল্য, আমবা জাগতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ ব্রহ্মকে ততই পূর্ণরূপে বুলিতে পারিব। আশকাল বিজ্ঞানের উন্নতি যে ইহাব একটা প্রধান সহায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা হউক, জাগতিক বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক, কতিপয় সিক্তবিষয়ে ইহা অগ্রথা প্রমাণ করিবে না মনে হয়। আমবা সেই কতিপয় সিক্ত সত্য অবলম্বনে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইবাব চেষ্টা করিব।

জগতের জ্ঞান আমবা যতই উপার্জন করি, দেখি, ইহা জড় ও চেতন-সংকান্ত। জড় ও চেতন ব্যতীত তৃতীয় জাতীয় পদার্থ কিছুই দেখি না। কেহ কেহ বলেন যে, জড় ও চেতন ব্যতীত জড় ও চেতন উভয়াক্ষর একটা পদার্থও দেখা যায়। কিন্তু সেটা তত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এ জগতে যাহা এতদিন বিস্তৃত জড় বলিয়া জানিতাম, তাহা আজ বিজ্ঞানালোকে সম্পূর্ণ চেতনবিহীন নহে, আভাস পাঠতেছি। এবং যাহা চেতন, তাহাও একটু বিচার করিলে জড়ীয়ভাবপরিপূর্ণ নহে, দেখা যায়। মৃত দেহও চেতন-শূন্য নহে। জড়দেহে চেতনের বিশেষ অভিব্যক্তভাবই জীবিতের চেতন, তাহার লোপই মৃত্যু নামে অভিহিত হয়। জীবিতের চেতন অপগত হইলেও সামান্যভাবে অব্যক্ত চেতন মৃতদেহ ত্যাগ কবে না। জড়ে চেতন যে নিতান্ত পৃথগভাবে থাকে না, ঠৈলে জলের মত থাকে না, তাহা পুরে আমবা কিকি; আলোচনা করিয়াছি। জড়ে 'জীবন' জড়ই চেতনের বিশেষ

অভিব্যক্তি। মন তাহাতে আবণ্ড বিশেষ অভিব্যক্তি। বলিতে কি, এমনটী বিজ্ঞান এখনও প্রমাণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্র ও অনুমানের শরণ লইয়া গ্রীণী মানিয়া লইলাম।

বিজ্ঞান বাহা প্রমাণ করেন, তাহাতে অনেক প্রকাব মতের সম্ভাবনা হইতে পারে। জড়ানুবাদিগণ 'চেতন' জড়সম্ভব বলেন, এবং চেতনানুবাদিগণ 'জড়' চেতন-সম্ভব বলেন। এ দুই মতে কোন জীবনই একেভাবে চেতনশূন্য নহে। বুদ্ধিবত্ত্ব অব্যক্তভাবে নিজ সত্তা অনুভব করিবার মন বা ক্ষমতা আছে। কতিপয় সম্প্রদায় সমস্ত জড়ে সামান্য ও বিশেষ উভয়বিধ জীবন ও সমস্ত জীবনে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা মন ও জীবনকে আগন্তুক পদার্থ বলেন। যাহাই হউক, জড় ও চেতন যদি সম্পূর্ণ এক বস্তু হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে জড় ও চেতন যতই পৃথক বস্তু হউক, তাহাদের অভ্যন্তরে একা থাকিবে। আব একদপতা থাকিবে বলিয়াই যে, জড় ও চেতনের কোন পার্থক্য থাকিবে না তাহাও ভাবা উচিত নহে। এক উৎপত্তিস্থান মানিলে এবং জড়ে চেতনের আগন্তুকতা স্বীকার করিলে 'জীবন' পদার্থটা জড়ে, চেতনের এক প্রকাব বিশেষ অভিব্যক্তি-মাত্র অনুমিত হয়। জড় ব্যতীত যেমন জীবন দেখা যায় না, জীবন ব্যতীত তেমন মন দেখা যায় না এবং মন ও জীবন ব্যতীত জড়ও দেখা যায় না। নিতান্ত বিজাতীয় ভিন্ন বস্তুতে অল্প বস্তুর আগন্তুকত্ব সম্ভব কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। পবস্ত্র আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে জড় ও চেতনের উৎপত্তিস্থান যে একটা বস্তু, তাহা পূর্ণে প্রক্ষেব একই প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে ; সুতরাং জড়ে 'জীবন' চেতনের বিশেষ অভিব্যক্তিমাত্র, এইমত অনুমানই অগ্রসব হওয়া যাউক।

অত্মদিকে আমাদের যে আনিষ্ট বোধ আছে যাহা সচরাচর চেতনের একমাত্র অতি পরিষ্কৃত দৃষ্টান্তহল, তাহাতেও বলিতে কি, জড়ীয় ভাব বহিয়াছে। অনুভবকর্তার অনুভব বিষয় চিবকালই জড়, ইহা জড় ব্যতীত অল্প কিছুই নহে। চেতন কখন ইহার অনুভব বিষয় হয় নাই ও হইবেও না। চেতন অনুমিত বিষয় হইতে পারে, অনুভূত বিষয় হইতে পারে না। বোদ্ধা-বোধ্য-ভাবটী যখন এক পর্যাযকমে 'আমি এই বোধের' বোধোৎপত্তি হয়, তখন 'চেতন'ও জড়চেতনানু্যক। বোদ্ধা যখন অল্প কিছু না ভাবিয়া নিজেই নিজেকে ভাবে বা অনুভবের

বিষয় হবে, তখনই তাহা কেবল চেতন নামে অভিহিত হয়। এই চেতন অপেক্ষা আব বিস্তৃত চেতনোর্ব পবিচয়, সাধাবণতঃ এ জীবনে আশাদেব হয় কি না জানা যায় না। দেখিতে পাওয়া যাইলে, এষ্ট চেতনাব মদ্যে অনুভবক্রিয়া বর্ডমান। অনুভবক্রিয়া থাকায় বিষয়-বিষয়ী ভাবও বর্ডমান। কাজেই আমবা যাঃ চেতন বলিয়া বনি, তাহাতেও বিষয়নিষ্যিভাব বহিয়াছে এবং তাঃ থাকাব ঐ চেতনেও জুডেব অংশ আছে, মানিতে হয়। চেতনে যদি কোন অনুভবক্রিয়া না স্কীকাব কবা যায়, তাহা হইলে উঃ কল্পনামাত্রগাহ নিশ্চ জুড অপেক্ষাও নিরুষ্টি বস্তু হইয়া দাঁডায়, অভ্যদিকে আবাব অনুভবক্রিয়া থাকিলে উঃ বিষয়সংযুক্ত, 'একথা অপবিহায়া। বিষয়স্পর্শ থাকিলে আবাব আমিঃ বোশে ভিন্নতা আসিয়া পড়ে। কাবণ, নিজে নিজেকে অনুভব হলেও 'আমি' ও 'আমি-ভিন্ন' উভয়াকাব ভাব লক্ষিত হয়।

সুতরাং বেশ স্পষ্টা যাইতেছে, জুড ও চেতন সম্বন্ধই একই অপৃথক্ ভাবে, আশ্রিত আশ্রিভাবে বর্ডমান। সচবাচব যাহাকে আমবা জুড বনি, তাঃ জুডচেতনাত্মক এবং যাহাকে আমবা চেতন বনি, তাহাও জুডচেতনাত্মক। এক্ষণে স্পষ্ট যদি কেবল জুড ও চেতনময় বস্তু হইল, তখন এতদাশ্রিত তৃতীয় জুডচেতনাত্মক বস্তু স্কীকাব নিষ্পোজন। আবাব জগৎ যখন জুড ও চেতনবৎ হইল, তখন উঃ মূলও যে তরুণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জুড ও চেতন যদি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু হইত, তাহা হইলে উঃ মূল অগোচর পৃথক্ জুড ও চেতনাত্মক পদার্থ হইত। জুড ও চেতন যে তেঃ একাধারে বা একই বস্তুতে সহাবস্থান করে, সেই তেঃ ইহাব মূলও তা তরুণ হইলে, ইহা বেশ স্পষ্টা যাবে।

যে সমস্ত পণ্ডিত জুড ও চেতনকে পৃথক্ মানিয়া লিহাব মূলকে কেবল চেতন বা কেবল জুড বর্ডেন, তাহাবা উভয়েই ভ্রান্ত, সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতিকে পৃথক্ মানিয়া মূলও পৃথক্ মানা বৎ যুক্তি-সঙ্গত। একদিকে যুক্তিসঙ্গত হইলেও অন্যত অপব দিকে অনেক গোল থাকিয়া যায়। কাবণ, বিশেষ ব্যক্তচেতনাত্মক জীবিত জীবদেহে জুড ও চেতনাব স্বভাবিক সহাবস্থান বাতী। যে প্রাণ সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহাতে জুড ও চেতন পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বনিবা স্কীকাবে বনি ও বস, আব সেই জুডই, এইরূপ চেতনের জুডসংযোগ-

জনিত নিয়ত সুখ দুঃখ অনুভব অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, জড় ও চেতন পৃথক্ হইলে মূলেও পৃথক্ থাকিয়া ব্রহ্মকেও ঐক্যে নিয়ত সুখদুঃখ-ভাগী করিবে। পবন ব্রহ্ম ঐক্যে নিয়ত সুখদুঃখভাগী, একথা আমবা কিছুতেই মানিতে পারি না। উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্বশিগণও বলিয়াছেন যে, সমস্তই ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেতেই স্থিত, ও ব্রহ্মেতেই লয় হইবে; ব্রহ্ম চিন্মাত্র, নিত্য, একরূপ, ইত্যাদি, তিনি এক, আনন্দময় স্বতন্ত্রঃস্ববিশীণ ইত্যাদি। উক্ত বাক্য সকলের সমান মর্যাদা বক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্ম জড় ও চেতনের অনীত বা উভয়ায়ক অথবা উভয়প্রয় না বলিয়া\* থাকা যায় না। জগৎকাণ্ড উভয়ায়ক হইবাব আবও হেতু আছে। সেটা এই,—চেতন ও জড় পৃথক্ মানিয়া ব্রহ্মের সঙ্গত্ব, সঙ্গমত্ব, সৰ্ব্বকাণ্ডকাণ্ডত্ব, একত্ব, সঙ্গশক্তিমান প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হয় না। কিন্তু জড় ও চেতন একটা বস্তুব ভাবদ্বয়মাত্র, এইরূপ বুঝিলে উক্ত পূর্ণ-মাত্রায় সিদ্ধ হয়।

আমাদের এই উভয়ায়ক বস্তুকে শাস্ত্রে “চিং” নাম দেওয়া হইয়াছে। উপনিষদাদিতে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কখন কালে, তাহাকে সচ্চিদানন্দ, সত্যজ্ঞান ও প্রজ্ঞান প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐ “চিং”টা আমাদের জাগ্রত স্বপ্ন স্মৃপ্তির চিং নহে। জাগ্রতাদির চিং বা চেতন জড়ে ঐ চেতন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। বিজ্ঞান যেমন সমস্ত বস্তুতে থাকিলেও ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা বস্তুবিশেষে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে এবং তখনই ঐ বস্তু বিজ্ঞানগুণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হয়, উহাও তদ্রূপ। স্তব্ধতা ব্রহ্মকে সাধারণ অর্থে চেতন বলা যুক্তি-যুক্ত নহে। সাধারণ চেতন জড়সাপেক্ষ, জড়ের অস্তিত্বহীনায় সিদ্ধ, ব্রহ্মচেতন কিন্তু স্বাধীন ও জড়াস্তিত্বহীনসাপেক্ষ। ইহাতে জড় ও সাধারণ চেতন একটা প্রাপ্ত হইয়া বহিয়াছে। উপনিষদে চিং যে অর্থে ব্যবহৃত, সে অর্থে কোন দোষই নাই, তাহা জড় ও চেতনের কাণ্ড, স্তব্ধতা তাহা উভয়ায়ক।

সচরাচর চিং অর্থে আমরা উভয়ায়ক একটা বস্তু বুঝি না, কিন্তু কখন আসে কখন যায়, দেহ ছাড়া একটা পৃথক্ বস্তুবিশেষ বলিয়াই বুঝি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই উভয় চিত্তবৃত্তে একটা সাধারণ ভাব বহিয়াছে। উপনিষদের চিং



একপ্রকার একরূপ, নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব মাত্র স্বরূপ, অহং ইত্যাকার বোদ্ধবোধ্যভাবাত্মক জ্ঞানমাত্র, অহংত্বক, বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রবাহ। জৈব চিংকিত্ত অবচ্ছিন্ন, অহং ইত্যাকার বোদ্ধবোধ্যভাবাত্মক অস্তিত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট, অনির্দোশ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানপ্রবাহ। অহং ইত্যাকার বোদ্ধবোধ্য-ভাবাত্মক অস্তিত্বস্বরূপতাই ইহাদের সাধারণ অংশ। যে অংশে মিল নাই, তাহা অবতাভেদ মাত্র। এই সাধারণ ভাবটী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অভি-ন্যক্ত হইয়া প্রচলিত অহং শব্দের লক্ষ্য যে চৈতন্য, তাহাই বুঝায়। বিশেষ-রূপে অভিব্যক্তিই ইহার উৎপত্তি, এবং এই উৎপত্তি থাকায় ইহাব বিনাশও অবশ্যজ্ঞাবী। সৃষ্টি, মূর্ত্তা ও মৃত্যুতে যে অজ্ঞান দেখা যায়, ‘আমি যেন ছিলাম না’ এইরূপ যে একটি ভাব দেখা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে আমিব অস্তিত্ব অংশের লোপবোধক নহে, তাহাতে আমির দেহাদি সম্বন্ধ-জ্ঞানের লোপমাত্র বুঝায়।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, আমি এই বোধটীব মধ্যে উক্ত দুইটী অংশ বিদ্যমান। অস্তিত্বরূপী গুণোক্ত সাধারণ অংশটী আমিতে অঙ্গুল থাকে। এই অস্তিত্বরূপী বোধটীই আমিব নিঃস্ব-বা বস্তুত্ব। মৃত্যু আদি অসম্ভবত্বে আমি বস্তুত্ব বস্তুত্ব বোধ যায় না। আমবা যে উহাব অভাবের কল্পনা কবি, তাহা ভ্রম। কারণ, আমবা কোনকালেই একেবারে আমাদের আমিত্বের সম্পূর্ণ অভাব বোধ কল্পনা কবিতো পাবি না। যদি মৃত্যুতে সম্পূর্ণ অভাব হইত, তাহা হইলে আমাদের ওরূপ অভাব কল্পনাব সামর্থ্য থাকিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাবো তাহা বোধ হয় নাই। যতই কঠোরতাব সহিত, সাবধানে আঁবা ইহাব কল্পনা কবি, ততই আমাদের আমিত্বের অস্তিত্ব অংশটুকু আকাশের মত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, কখনই একেবারে লোপের জ্ঞান আসে না।

তাহার পর বস্তুর একেবারে লোপ কল্পনা কবিবার আমাদের অধিকাষ নাই। আমবা কখন এমন কোন বস্তু দেখি নাই, যাহা একেবারে লোপ হই-যাছে। বলিতে পারা যায় যে, এই যে পবিত্রজ্ঞান ঘটটী বহিষাছে, এটা ভাঙিলে আব এটা ত থাকে না ; যাহা পবে হইবে, তাহা ইহাব মতই হইবে, স্মৃতবাং “এই” কথাটির বিনাশে আমবা একেবারে লোপের বা অভাবের আভাস পাইতে পাবি এবং আমিত্ব সম্বন্ধেও ঐরূপ ভাবিয়া লইতে পাবি। না ; উহা ঠিক নহে, উহা আমবা পারি না। যে হেতু “এই” বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

ছিল “এই ঘট”। “এই” কথাটি দ্বারা যাহাই বুঝি না কেন, উহা ঘট সম্বন্ধ ছিল। ঘট গিখাছে, আবাব ঘট আসিবে, ঠিক তদ্রূপই আসিবে, আসিবে না কেবল “এই” শব্দবাচ্য পদার্থটী। বস্তুতঃ “এই ঘট” কথাটীর ভিতৰ আছে কি? আছে তদ্রূপতা ও কালসাপেক্ষতা মাত্র। অর্থাৎ এই সময়েব এইকপ ঘট—এই ভাবটী আছে মাত্র। উহাব মণো এত-দ্রুপতাটি ব্যাপাবসাধ্য; ‘কালসাপেক্ষতা’টিই কেবল অসাধ্য। হাজার হাজার “ঘট” কব. সেই সময়েব ঘটটী আব আসিবে না। যত্নসহযোগে একটা মুংপিও হইতে পুনঃ পুনঃ একইকপ ঘট নিৰ্ম্মাণ কবা যাইতে পারে, পান্য যায় না কেবল সেই সময়েব সেই ঘটটী কবিতো। যাহাই হউক, কালসাপেক্ষতা দ্বাবা কখনই বস্তু বস্তুই প্রমাণ হয় না। উহা সম্বন্ধের জ্ঞাপক মাত্র। সম্বন্ধের লোপ বা অভাব আমরা বুঝিতে পারি ও স্বীকার কবি, কিন্তু বস্তু লোপ বা অভাব বুঝি না বা স্বীকার কবি না। মৃদুই ঘটরূপ হয়। মৃদুত্বের অভাব কখনই হয় না। অতএব সম্বন্ধের অভাব-সম্ভবতা বস্তুতে আরোপ কবিয়া আনিহেব অস্তিত্ব অংশের প্রতি সংশয় কবা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

তাহাব পব আমি বোবে বিষয়তা আছে, অন্তত্বিত্ব রূপ ক্রিয়া আছে, সেই হেতু কোন দেহাদিসম্বন্ধীয় কার্যের সংস্কার ইহার গাত্রে অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাই পুনর্দেহসম্বন্ধকালে ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে। স্থূল বিষয়ে অহবহ নিমজ্জিত থাকায় আমবা স্বেপ্তি, মৃত্যু বা মুচ্ছার আনিহবোধ বুঝিতে পাবি না। পবন্তু অভ্যাসবলে তাহাও সূক্ষ্ম হয়। এবং যাহাদের হয়, তাহারা ই পূৰ্ব জন্মের কথা শ্রবণ কবিতো পাবেন। শাস্ত্র ইহাব ভূবি গাঙ্ক্য প্রদান করেন। যাহা হউক, যে কাবধে উহা একরূপ বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহা আমবা কিঞ্চিৎ পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে উপনিষদেব চিত্তের বা বুদ্ধিসত্ত্বের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক।

আমরা পূৰ্বেই সৰ্বকাবণকাবণের অন্তসন্ধানো প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই হেতু সেই একটা বস্তু ব্যতীত সমস্তই ইহা হইতে জাত, এই পক্ষ অবলম্বন কবিয়া আমবা বিচার কবিব। অপব বস্তুও আছে এবং সেইটও আছে, এ ভাবে তাহার বিচার কবিব না। সূতরাং উহা সৰ্বকাবণকাবণ বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃকরণ প্রভৃতি কোন সহকারী কাৰণ নাই। ইহাতে

কেবল নিজে নিজেই অনুভূতিমাত্র বর্তমান । অতঃপর এমন কিছুই নাই, যাহাব দ্বারা ইহাব কোন ভাবতমা হইতে পাবে । দেশ বা সীমা নাই যে, ইহাব অঙ্গ বা অংশ কল্পনা হইবে, কাল নাই যে, ইহা এখন একরূপ, কিন্তু পরে আবার একরূপ হইবে । অতঃপর বস্তু নাই যে, তৎসহযোগে ইহাব গুণেব পরিচয় হইবে । এই হেতু ইহা নিগূর্ণ, কিন্তু গুণশূন্য বলিয়া নিগূর্ণ নহে । ইহা কেবলই কেবল, সূতবাং নিষ্ক্রিয় । স্বাভাবিকরূপে ক্রিয়াবিহীন বলিয়া নিষ্ক্রিয় নহে ।

পূর্বে একই সময়ে যাহা আলোচিত হইবাছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা কেবল একটি বস্তুমাত্র । ইহাতে জাতি বা অব্যবগত কোন ভেদ বা বিশেষ নাই । পরন্তু কোন বাস্তবিক বিশেষ নাই বলিয়া যে ইহাতে কোন প্রকাবই বিশেষ নাই, তাহা নহে । ইহাতে শক্তিগত ব্যাপার-ভেদ বা বিশেষ কল্পনা কবিত্তে আমবা বাধা । ইহাতে অতঃপর সর্ববিধ ভেদ কল্পনাৰ তুলনাৰ শক্তিগতভেদ বা বিশেষ কল্পনাই অপেক্ষাকৃত নিদোষ । ঐরূপ ভেদকল্পনাৰ উহার সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিময় প্রভৃতি পরিচয়গ্রামেব অধিক সার্থক্য সাধিত হয় । অপৰ সৰ্ববিধ বিশেষ স্বীকাৰে ঐরূপ সার্থকতা থাকে না । শক্তিগত ঐরূপ ভেদ স্বীকাৰ না কবিলে উহাতে আপন অস্তিত্বানুভূতি থাকিতে পাবে না এবং এ দৃশ্য জগতেব উৎপত্তি ব্যবস্থা এবং লয়ও উহা দ্বারা হইতে পারিত না । জগৎ নাই বলিলে দৃষ্টেব অপলাপ কবা হয়, এবং জগতেব অস্তিত্ব না মানিলে এ বিচারকার্যই বা কে কবিত ? অতঃপর বস্তু না থাকায় তাহাতেই তাহাব শক্তিৰ কার্য্য মানিতে হইবে । অগ্নিৰ দাহিকাশক্তি, অজবস্তুৰূপ কাঠে প্রকাশ পায় । ইহা কিন্তু সে প্রকাবেব নহে । বোদ্ধবোধাতাবাশ্রক স্বাভাবিকরূপেই ইহাব গুণ বা শক্তিগত ভেদেব পরিচায়ক । আমবাৰ বোধাতাবটী যে ইহাব বোদ্ধাতাব ছাড়া, তাহাও নহে । এ দুইটী ভাব পৃথক্ নহে, ইহাবা থাকিয়াও একত্বেব স্থানি কবে না । ইহাতে একই বোধ ওতপ্রোত ভাবে বহিবাছে । আমবা পৃথক্ কবিয়া বুঝিতে পারি বলিয়া ইহা পৃথক্ নহে । অপৰ কোন বস্তু না থাকায় ইহাব সেই কেবল ভাবেব ভাবান্তবেব বাস্তবিক হেতু নাই ।

এই জগত ইহাকে স্বাধীন সূতবাং আনন্দরূপ বলা যায় । এ আনন্দ আপেক্ষিক শব্দ নহে, ইহা দুঃখেব সহিত সৰ্ব্বত্র বাখে না । এটী একটি স্বতঃসিদ্ধ ভাব । ইহা অনুভব কবিত্তে হইলে একটু ধ্যান অভ্যাস প্রয়োজন ।

আমাদের মধ্যে সকলেই অল্প বিস্তর একরূপ গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন অনেক সময়ে হইয়া থাকেন। ইহা সেই গাঢ় চিন্তার অনুরূপ করিয়া একটু মাত্রা বাড়াইলেই হইবে।

যাহা হউক বুনিয়াদ ইহা চিৎ, ইহা এক, অপরিচ্ছিন্ন অসীম নিষ্ক্রিয় আনন্দ-ময় নিত্য অনুরূপিত স্বরূপ বস্তু। আমাদের যে ‘আমি’ অনুরূপিত, ইহা তাঁহারই অনুরূপিত, পবিত্র তাঁহার অনুরূপিত। যেমন অসীমত্ব, সর্বত্রত্ব, সর্বপাবকত্ব বর্তমান, আমাদের তাহার বিপনীত দেহমাত্রত্ব, অল্পত্ব, অল্পপাবকত্ব বহিয়াছে। ব্রহ্মের ‘আমি’ আনুত ইহা আমাদের ‘আমি’ হইয়াছে। তাঁহাতে যেমন তাঁহার নিত্যভাবের অপলাপ না হইয়া এই বহুভাব বর্তমান, আমাদেরিগেতে ত্রিবিধীত আদ্য সাধনা রূপ জগৎ মূঢ়া বর্তমান। শক্তিবশে জগদাদি বিচিত্ররূপ ধারণ কবায় ব্রহ্মের সমষ্টি বস্তু হইয়া ইনি ইহাদের নিয়ামক রূপও ধারণ করিয়া থাকেন, অথচ ইহাঁর কোন ক্ষয়বৃদ্ধি হয় না। বহু বশে যে একটা একভাব, তাহা বহু নিয়ামক হইয়া পড়ে। ভগবানের বহুত্ব ভগবানেও সেইরূপ নিয়ামকত্ব অন্বেষণ। জগতে যেমন দেখা যায়, কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু জন্মিলে তাহা ঠিক পূর্ববৎ ভাবে প্রত্যায়িত হয় না, ইহাতে সেরূপ ভাব নাই। জগতে যেমন কোন বস্তু কোন রূপান্তর গ্রহণ কবিলে তৎকালে স্বীয় রূপের ব্যতিক্রম নিবারণ কবিত্তে পাবে না, ইনি সেরূপ নহেন। ইহাতে যেন সর্ববিকল্পধর্ম সময়প্রাপ্ত।

এ পর্য্যন্ত যত মত উঠিয়াছে, তাহার কোনটিই ভগবানকে বিরুদ্ধ ভাব হইতে মুক্ত কবিত্তে পাবে নাই। তাহা পাবে নাই বলিলেও তাহার। যে ভগবানকে অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝে নাই, তাহাও নহে। প্রকৃতপক্ষে ভগবানই এইরূপ। ইনি সমস্ত প্রসব করেন বলিয়া, প্রসূত পদার্থের দ্বারা তাঁহাকে বুঝিবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন তাঁহার একদেশমাত্র বুঝাইতে সক্ষম হয়। কার্য্য দ্বারা কারণ কখনই সমগ্র-ভাবে বুঝাইবার আশা করা যায় না। বরং জন্মিলে অবয়ব বৃদ্ধি পায়, ইহা অল্প সময়ের তরলবস্তুবিশেষ। যে হেতু ইহার মত অপর তরল বস্তু জন্মিয়া অবয়ব বৃদ্ধি করে না, সেই হেতু উহা ওরূপ কেন হইবে, ওরূপ হইতেই পারে না, এরূপ কথা যেমন আমরা না বলিয়া উহা ওরূপই হয় বলিয়া বুঝি, ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিয়া বুঝিতে হইবে। কোন বস্তু বিষয়ক জ্ঞান আমাদের দুই প্রকার হয়। প্রথম, বস্তুটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া,

দ্বিতীয়, অপর ইঞ্জিয়গ্রাহ্য বস্তুর সহিত সংযোগ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াগত বিশেষতা উপলব্ধি করিয়া। প্রস্তুত দেখাও বলিলে, প্রস্তুতখণ্ডটা যদি হাতে একেবারে আনিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহা ইঞ্জিয়গ্রাহ্য জ্ঞান, এবং প্রস্তুতখণ্ডটা হাতে কবিতা পরে অগ্নি প্রভৃতি অন্য বস্তুতে সংযোগ বা আঘাতাদি দ্বারা প্রস্তুতের যে বিশেষ ক্রিয়া ও গুণের উপলব্ধি হয়, তাহা দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের প্রথম প্রকারের জ্ঞান বা ইঞ্জিয়গ্রাহ্যজ্ঞানলাভোদ্দেশ্যে উৎপাদিত “আমি বস্তু” বলা হইয়াছে এবং সম্বন্ধজ্ঞান বা দ্বিতীয় প্রকারজ্ঞান-লাভোদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত অবয়ব, অসীম, সর্বত্র, সর্বশক্তিমান, নির্দিকার প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমাদের ভিতরকার আমি বস্তুটির মূল শূন্য কবিতা পারিলে আমাদের ব্রহ্ম বস্তুর প্রথম প্রকারের জ্ঞান পূর্ণ হয়, আর বিভিন্ন জগৎ ব্যাপার একরূপ ব্রহ্ম হইতে তৎশক্তিবশে জাত, এইটি বুঝিতে পারিলে ব্রহ্মবিষয়ক দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থার হেতু দেহ মন বুদ্ধি এবং অজ্ঞান বা জীবন বাস্তব নইয়াই আমাদের আমি বস্তু এবং উহাই ব্রহ্মে মলস্থানীয়, এবং বিভিন্নজগৎব্যাপার একই ব্রহ্মে অসম্ভব এই প্রকার বোধই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। বিচারসাহায্যে উক্ত প্রতিবন্ধক ও মল দূর করিতে পারিলে যে রূপ বোধ হয়, তাহা ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে। ইহা দূর করিতে হইলে বিশেষ সাবধানসহকারে বিচার প্রয়োজন, নচেৎ পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়।

মহাত্মা শঙ্কর, যিনি ব্রহ্মবস্তুকে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ বিষয়বৎ জগতে স্পষ্ট জ্ঞানগম্য করিয়া গিয়াছেন—যিনি চিন্তামণিজিজ্ঞাসুর হস্তে চিন্তামণি দিয়া “এই চিন্তামণি লও” বলার মত ব্রহ্মবস্তুকে আমি বস্তুতে ও আমি বস্তুকে স্বরূপতঃ ব্রহ্মবস্তুতে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যিনি সত্যবস্তু বলিতে এক-মাত্র ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রহ্মবিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞান সম্বন্ধে অথবা ব্রহ্মের শক্তিগত ব্যাপারবৈচিত্র্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া ফেলিয়াছেন। সেই ঔদাসীন্যফলে ব্রহ্মের নিত্য, নির্দোষ, নির্দিকার ও অবয়বভাব স্বকার্য, পরবর্তী তত্ত্বাত্মবলক্ষিণ জগৎকে একেবারে সত্তাহীন ভ্রম বা বন্ধাপ্রভৃৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মকে একেবারে নিস্তর্ক ও নিঃশক্তি বুঝিয়া লইয়াছিলেন। এক ব্রহ্মেরই শক্তিবশে ব্যাপারবৈচিত্র্য যে সম্ভব, তাহা

ভুলিয়া গিয়াছেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপতায় ও ষড়্ পাষণে বিশেষ কোন ভেদ রাখিতে পারেন নাই। এ জগৎ নির্মল আমি বস্তুই ব্রহ্ম, ইহা বুঝিতে বাইরা সমল অহংজ্ঞানই ব্রহ্মেব স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহাত্মা শঙ্করের মত তত্ত্বতানুসারিগণ কর্তৃক বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে কালে মহাপ্রভু চৈতন্য উহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ আচার্য্য শঙ্কর ভ্রম অর্থে সঙ্কল্পে অজ্ঞা বা বোধ এবং মিথ্যা শব্দে পবিত্রতন-শীলতা হেতু অনিত্য অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন; জগদ্ব্যাপার বা ব্রহ্মশক্তির অত্যন্তাভাব উপদেশ করেন নাই। তাঁহার নিঃশূন্য, নিষ্ক্রিয়, নিঃশক্তি, নির্বিকার প্রভৃতি শব্দগুলি ব্রহ্মে বস্তুত্তররাহিত্য বুঝায় মাত্র, গুণ বা শক্তি-রাহিত্য অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মে সমস্ত অজ্ঞাভাব তাঁহার শক্তিপ্রভাবে তাঁহাতেই, বিনা অজ্ঞ উপকরণে সংঘটিত। এক অসীম বস্তুর শক্তিপ্রভাবে রূপান্তর ঘটিয়াও সেই বস্তু যে রূপ সেই রূপই বহিয়াছে, একরূপ ধারণা করা দুঃসাধ্য। আমরা অজ্ঞাত বস্তু দৃষ্টান্তেব দ্বাৰা অনুমান করিয়া থাকি, এ স্থলে কোন একটা দৃষ্টান্ত সাহায্যে এই ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শাস্ত্রকারগণ একজ্ঞ নানাবিধ দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা এ স্থলে তন্মধ্যে একটা গ্রহণ করিব। ইহা মন ও তাহার কার্য্য। অজ্ঞাত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা ইহা প্রকৃতপক্ষে বহুদূরব্যাপী ও বহুভাব-গ্রাহী। আমরা মনসাহায্যে যেমন কোন বস্তুব্যতীবেকেও সমস্ত সৃজন করিয়া সমস্ত রূপ ধারণ কবিয়াও তাহাব ব্যবস্থা প্রভৃতি কবিতে পারি, অথচ নিজের স্বরূপ ভুলি না, নিজের নিজস্ব অপরের সহিত পৃথক্ রাখিতে পারি, ব্রহ্ম এ স্থলে তজ্রূপ কবিয়াছেন বা করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াই জগদ্ব্যাপার ‘ব্রহ্মকল্পনা’ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জগৎ আদির প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ মনেতে যেমন স্মৃতিব উদয় ও অহুদয়। স্মৃতিতে থাকার মত থাকে বলিয়া জগদ্ব্যাপার ব্রহ্মে বস্তুগত কোন প্রকার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না, পদন্ত বস্তুতে শক্তিবিশেষ যেমন লুক্কায়িত থাকে, তজ্রূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করে বুঝায়।

কেহ কেহ আপত্তি কবেন, আমরা কোন কল্পনাবলে যে আয়বরূপ বিদ্যুত হই না, এ কথা ঠিক নহে। কারণ, কল্পনার মুহূর্ত্তকালে বাহ্য কল্পনার বিষয়, তাহাই বর্ত্তমান থাকে, কল্পনাকর্ত্তা সেই ‘বিষয়ে’ মিশাইয়া

যায় এবং ইহা অত্যন্ত অনাক্ষয়্যস্থায়ী বলিয়া স্বাভাবিক বা অকল্পনা কালের  
কর্তা ভাবটী বর্তমান থাকে বলা হয়। না, এ আপত্তি ঠিক  
নহে। যেহেতু আত্মা অহং ইত্যাকার জ্ঞানই অন্তঃকরণে প্রকাশিত। এই  
অহংজ্ঞান স্মৃতিস্থ বা বহিঃস্থ বিষয়কে আবরণ করিয়া তাহাব আকাবটী যেন  
একটী ছাঁচের মত হইয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে। সুতরাং অহংভাবে  
বিনষ্ট হয় না। দুইটী বিষয় চিন্তাকালে আমাদের একটার পর একটা আসে  
সত্য, একটা বিস্মৃত বা চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়া অপরটা আসে সত্য, কিন্তু  
এস্থলে সেকপ নহে। দুইটী চিন্তাই এককালে বিষয় মধ্যে গণ্য, কিন্তু একটী  
অহংচিন্তা ও অপরটী অনহংচিন্তা হইলে, উহাবা বিষয়মধ্যে গণ্য হয় না।  
কাল্লেই ঐ আপত্তি স্থান পায় না। সুতরাং চিন্তে স্মৃতিব উদয় অমুদয়  
দুটাস্তটী এ অংশে দোষাবহ নহে।

নানাক্রম ধারণ করিয়াও যাহা তাহাই, কেবল এইটী বুদ্ধিবাব জ্ঞান  
আবও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে হইলে, স্বর্ণ ও কুণ্ডলের  
দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে স্বর্ণ, কুণ্ডল হইলেও, স্বর্ণই যায়  
না; সেইরূপ ব্রহ্ম জগৎ হইলেও তাহাব ব্রহ্মই কোন অংশে একটুও যায়  
নাই। এ দুটাস্তে জ্ঞাতিগত একা বন্ধা হয় মাত্র, স্বগতভেদ নিবারণ হয় না।  
কল্পনা বা চিন্তাব দৃষ্টান্ত দিয়া একবস্ত এক হইয়াও নানাক্রম হয়, বুঝা যাইল  
বটে, কিন্তু কল্পনা বলিলে অনতিদূরে আব একটা দোষ আসিয়া পড়ে। মনে  
হয়, জগৎ তবে আমাদের মনঃপ্রসূত, ইহাব কিছুই সত্য নহে, এই আছে  
এখনই যাইবে, শিক্ষা সঙ্গাচাব প্রভৃতি সবই বুঝা। এ দোষটী নিবারণ  
করিবাব জ্ঞান এক সম্প্রদায় ইহা সত্য সত্যই সৃষ্ট বুলিয়াছেন। পবস্ত তাহাতেও  
আবাব আর একটা মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। মনে হইবে যে, ব্রহ্ম তাহা  
হইলে বিকারী। ইহা নিবারণাভিপ্রায়ে তাহাবা বৈদূর্য্যমণিব দৃষ্টান্ত প্রদ-  
র্শন করেন। বৈদূর্য্যমণি বা “ক্যাটসু আই” প্রস্তব একটা বস্ত হইলেও নানা-  
দিক্ দিয়া নানাক্রম দেখায়। পরন্তু ইহাতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্বগত-  
ভেদই ইহার একপ বৈচিত্র্যের হেতু, এবং স্বগতভেদবিশিষ্ট বস্ত কখনই সম্পূর্ণ  
স্বাধীন বা সর্গশক্তিমান হইতে পারে না। যাহাব অংশবিশেষ দাবায়, জগ-  
ন্ত্যাপার সাধিত হয়, তাহা যে সমস্তোভাবে অবিকারী নহে, তাহাতে সংশয়  
নাই। যাহার কার্য্য সং এবং পরিবর্তনশীল, তাহার কাবণও যে তদ্রূপ, তাহা  
অনিশ্চিত। অতুপকীয়গণ আবার ব্রহ্ম জগতের কারণ হইয়াও অপরিবর্তনীয়

অবিকারী, ইহা বুঝাইবার জন্য জগৎ, রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি, বা স্বপ্ন, অথবা ব্রহ্ম-  
জালিকব্যাপারবিশেষ বলিয়াছেন। বলিতে কি, ইহাও দোষবশবিশৃঙ্খল নহে।  
কল্পনা বলিলে যে দোষ, ইহাতেও সেই দোষ আসিয়া পড়ে। জগৎকে ভ্রান্তি  
প্রভৃতি বলিবার তাৎপর্য্য ব্রহ্মতাব অন্তর্ভুক্ত রাখিবার জন্য, জগৎকে মিথ্যা বলি-  
বার জন্য নহে। স্কুল কথা, ব্রহ্ম সব হইয়াও স্বরূপে আছে। দৃষ্টান্ত-  
প্রয়োগ দার্শনিকের সর্বাংশের জন্য নহে, ইহা সততই কোন বিশেষ বিশেষ  
অংশ বা ভাব বুঝাইবার জন্য। এবং সেই অংশে মাত্র অবস্থান করিলে কোন  
দৃষ্টান্তই দোষাবহ নহে। চাঁদের মত মুখখানি বলিলে মুখখানি চাঁদের মত  
গোলকাকার বুঝা না।

এখন দেখা যাউক, ব্রহ্মে জগতের উদয় অমুদয় আছে কিনা ও যদি থাকে,  
তবে তাহা কি প্রকারে? মনেতে কোন ব্যাপার স্মরণ কবাব জায় শক্তি-  
সাহায্যে ব্রহ্মের জগদাদি ভাবান্তর যেন হইয়া থাকে, এ দৃষ্টান্ত পূর্বে উক্ত  
হইয়াছে। ইহাতে বাস্তবিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যবিষয়ক কিছুই বুঝান হয় নাই,  
শব্দ কবণ ও উপকরণান্তবরাহিত্যই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উদয় অমুদয়  
থাকিলে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই কোনরূপ থাকিবে সুতরাং উদয় অমুদয় বিচারকালে  
উদ্দেশ্যও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা আবশ্যিক। ভ্রান্তি বা স্মরণ ও কুণ্ডলের দৃষ্টান্তও  
জগৎকর্তার উদ্দেশ্য লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন না থাকিলে কখনই সত্য হউক বা মিথ্যাই  
হউক, কোন কার্য্যে কাহাবো প্রবৃত্তি দেখা যায় না। শাস্ত্র  
এস্থলে “ক্রীড়াপরাষণ, বালকের চেষ্টার জায় ব্রহ্মেব চেষ্টা” দৃষ্টান্ত  
অবলম্বন করিয়াছেন। বাস্তবিক ক্রীড়াপরাষণ বালকের কোন আনন্দের  
অভাব নাই অথচ একটা খেলা বা ভাব ছাড়িয়া অন্য খেলা আবৃত্ত  
কবে; ব্রহ্মে সৃষ্টির উদয় অমুদয় তজ্জপ। এ দৃষ্টান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ হইতে পারে  
না। যেহেতু আনন্দের অভাব না হইলেও পূর্ণতার অভাব না মানিয়া থাকা  
যায় না। এবং একটা খেলা ছাড়িয়া অন্য খেলা গ্রহণে পূর্ণভাবেই লোপ  
হয়। এ দোষ নিবারণার্থ শাস্ত্র জগদ্ব্যাপারকে তাঁহার স্বভাব বা বিভূতি  
বলিয়াছেন, যেহেতু এরূপ বলিলে পূর্ণতার অভাব আপত্তি স্থান পায় না।  
এ আপত্তিও এস্থলে থাকিল না বটে, কিন্তু আবার অন্য আপত্তি উপস্থিত  
হইল। মেটী স্বভাবের অপরিহার্য্যতা নিবন্ধন বাধ্যতা। ব্রহ্ম যেন তাহা  
হইলে আর অন্যরূপ হইয়া থাকিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার স্বাধীনভাব



ধর্মতা হইল। কোন কোন মহাত্মা এল্পে নির্দোষতা প্রমাণ অসম্ভব বিবেচনায় জগৎপার একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলে যে দোষ হয়, তাহা পূর্বে দেখান হইরাছে। উভয় দোষের তুলনায় মিথ্যা বলা দোষই অধিক বলিয়া বোধ হয়।

মোট কথা, ভগবন্ত্ব এতই দুর্কোষ্য যে, ইহা তাঁহার কৃপা ও বিনা সাধনে কখনই নিশ্চয়াবধাবণ হইবে না। তবে এটুকু বুঝা যায় যে, তাঁহাতে জগৎতাব আবির্ভাব তিরোভাব তাঁহার ইচ্ছা বশতই হয়, উহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারেব জায় অনাম্যাসসাধ্য এবং সৃষ্টিকার্যে তাঁহার স্বরূপেব চ্যুতি হয় না। অপর, সৃজন করিবার ইচ্ছা আছে বন্ধিয়াও তাঁহার আনন্দের পূর্ণতার অভাবও নাই। সৃক্তিক্রান্ত সত্যের অমরোথে অবশ্যই স্বীকাব করিতে হইবে যে, পূর্কোক্ত কথাগুলি পরস্পর বিরোধী ও মনে ধাবণা কবা যায় না। পরন্তু জগৎত্ব যতই আলোচনা কবা যাইবে, ততই সমস্ত অসম্ভবের আশ্রয় সেই ভগবান্কে একরূপ ব্যতীত অপর কোন রূপ বলিতে প্রবৃত্তিব অভাব উপলব্ধি হইবে। মহুষ্যের জ্ঞান যতই বিস্তৃত হউক না কেন, স্বভাবের উপব আমাদের আধিপত্য যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, আমাদের ক্ষমতা যে একটা অদৃশ্য অনির্লচনীয় ক্ষমতাব অধীন, তাহার পরিমাণ একটুও কমে মাই। যেহেতু এই বৈসাদৃশ্য মোচন আমাদের ক্ষমতার অতীত, এবং সর্লমূল যিনি, তিনিই এই বৈসাদৃশ্য প্রসব করিয়াছেন, তখন তিনি সেই বৈসাদৃশ্যের অতীত বস্ত বলায় আমাদের কোন প্রকারে যুক্তিরাজ্যেব বহিভূত স্ত্রাচরণ করা হইবে না। প্রত্ন্যত একটা নূতন বস্তর নূতন গুণ যেমন আয়ুবা পবীকার দ্বারায় স্থির করিয়া মানিয়া লই, ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের তাহাই করা উচিত। উৎপত্তি লয় হয় না বলিবার উপায় নাই। যেহেতু সৃষ্টিরই অংশবিশেষ আমাদের সমক্ষেই উৎপন্ন ও লয় হইতেছে। এবং হয় বলাও ঠিক নহে, যেহেতু তাহা হইলে ব্রহ্মেব বিকাব সম্ভব। এই উভয় পক্ষকে সমান মর্যাদা দিলে বদতো-ব্যাঘাত দোষ আছে, নিজের কথার প্রতিবাদ নিজের দ্বারাই করা হয়। কাজেই একটাকে গৌণ ও একটাকে মুখ্য করিতে হয়। ব্রহ্মের বিকারহীনতা মুখ্য সত্য করিয়া জগৎ উৎপত্তি গৌণ সত্য করা ভিন্ন উপায় নাই। এই প্রত্নই জগৎপার মনঃকল্পনাসদৃশ, ইন্দ্রজালবৎ সত্য, অথবা বস্তর শক্তিগত ব্যাপারবৈচিত্র্যবৎ বলিয়া উক্ত মিভাস্ত্র রিক্রম পক্ষের সাধনস্ত রক্ষা করা হয়।

এতদূরে আমরা দেখিলাম, ব্রহ্ম কি বস্তু। ইনি চিং বা স্বকীয় অনুভূতি মাত্র বস্তু। স্বভাব বশে কার্য্য করার দ্রুত ইনিই স্রষ্টা হিতি ও লয় ব্যাপার দ্বারা, জীবজগৎ ও জৈবের ভাব ধারণ করিতেছেন মাত্র। এবং ইহাতে তাঁহার, করা ও না করার মধ্যে যে একটা সাধারণ বা এক ভাব আছে, তাহার পরিবর্তন বা বিস্মৃতি হয়না। ইনি খণ্ড খণ্ড বস্তুসমষ্টি নহেন স্রুতরাং অখণ্ড বা অপবিক্সিত। ইহার সীমা বা অন্ত নাই স্রুতরাং অসীম। ইনিই কেবল একমাত্র বস্তু, ইহা ছাড়া অস্ত্র আর কিছুই নাই। জীবগণ বাহাকে অস্ত্র বস্তু বা পৃথক্ পৃথক্ বস্তু বলিয়া থাকে, তাহা তিনিই অস্ত্র বা পৃথক্-রূপ ধারণ কবিয়াছেন মাত্র। অস্ত্ররূপ ধারণ করিলেও মনের ভিতরের ইচ্ছা দ্বারা বা স্মৃতি দ্বারা যেমন নিজেতে অস্ত্রধাতাব অনুভব করা যায়, তাঁহাতে কতকটা তদ্রূপই হয়। ইহাকেই তাঁহার সীমা বলা হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে হৃদবঙ্গম কবিত্তে হইলে বিশ্বাস ও ব্রহ্মসহকারে অভ্যাস প্রকৃতির প্রয়োজন। এই অভ্যাসগুণে ইহা ক্রমেই হৃদয়ে প্রকাশ হইতে থাকিবে।

ব্রহ্ম স্বরূপতঃ যেকোন বস্তু, এবং সৰ্ব্বকারণকারণরূপে যেকোন বস্তু, তাহা কতকটা দুখা গেল, এক্ষণে এই জগদ্ব্যাপারের সহিত বা সমগ্র বিশেষ ভাবেব সহিত তিনি কিরূপ বস্তু, তাহা একবার দেখা বাউক। জগদ্ব্যাপারের সহিত কিরূপ ভাবাপন্ন জানিতে পারিলে তাঁহাব সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ, এবং তাঁহার প্রতি, জগতের প্রতি, ও আমাদের জিজ্ঞেব প্রতি আমাদের কিরূপ কর্তব্য, তাহা স্থির করা যাইতে পারে। • এবাব আমরা ব্রহ্মকে কিভাবে বুদ্ধিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহা একটা দৃষ্টান্তেব দ্বাবা পবিফুট করা বাউক। জল কারণ, বরফ কার্য্য। জলে বরফ হইবার শক্তি থাকে। সেই শক্তির প্রকাশ, যখন জল বরফ হয়। এবং অপ্রকাশ, যখন জল জলাবহায়া থাকে। জল-জ্ঞান হইলে কাবণাবহায়া জ্ঞান হয়, এবং বরফ জ্ঞান হইলে কার্য্যাবহায়া জ্ঞান হয়। জল জ্ঞান বরফ জ্ঞান ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ, এবং বরফজ্ঞানও জলজ্ঞানব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ। পূর্বে বাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে জলের জ্ঞান কতকটা জন্মিয়াছে, এইবার বরফ জ্ঞানের দ্বারা সেই জল জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধন করা বাউক।

পূর্বেও লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্ম একরূপ স্বীয়ানন্দ ব্যতিরেকে • যখন

আনন্দের বৈচিত্র্য বিধান করেন, তখনই সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বিষয়সমূহের মনেব ভিতর স্বতন্ত্রপে স্থিতির জায় সমগ্র জগৎব্যাপার তাঁহাতে শক্তিরূপে লীন ছিল, এক্ষণে তাহা জাগরুক হইল। ইচ্ছাই এই জাগরণের ছেতু, এবং তাঁহার বিচিন্নবসানাদন সত্যবই এই ইচ্ছার উদ্দেশ্য। প্রভুব আজ্ঞায় তৃত্যাব আগমনের জায় সেই শক্তি যেন তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যকে বন্ধে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল। ইহাই ঐতি উক্ত ঈক্ষণ। অবগম্যার স্বত্ববিষয় জাগরুক হইয়া যেমন একটা, বিষয়ান্তর হয়, আনন্দের বিচিন্নবসানাদন উদ্দেশ্যে অবগম্যাত্রে তাঁহানও যেম তাহাই হইল। এবং তিনি যেন নিজে সেই বিষয়ান্তরের স্রষ্টা হইগেন। এইরূপ ব্যাপার হইবামাত্র সেই ব্রহ্ম প্রকৃতি ও পুরুষ পদবাচ্য হইলেন।

যাহা তাঁহার অবগমপথে আসিল, তাহাই এক্ষণে প্রকৃতি এবং স্মৃত বিষয়ের স্রষ্টাভাবই ব্রহ্মের পুরুষ ভাব। স্মৃতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ শব্দদ্বয় আপেক্ষিক বা সম্বন্ধাত্মক শব্দদ্বয়। একটা ব্যতীত অপন্যাস সত্তা স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মের এই পুরুষ ভাবটির জগতের সম্বন্ধে নিমিত্তকাবণতা, এবং ঐ প্রকৃতিভাবটির ঐ সম্বন্ধে উপাদানকারণতা বুঝিতে হইবে। গুণ ও বস্তুকে যেমন আমরা পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারি, সেইরূপ এখানেও ব্রহ্মকে প্রকৃতি ও পুরুষ রূপে ভাবিতেছি যাত্র। জ্ঞান ভাবিতে পানি বলিয়াই যেমন গুণ গুণী বাস্তবিক পৃথক্ নহে বা পৃথক্ সত্য্য সত্য্যবান নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি পুরুষ ভাবও পৃথক্ পৃথক্ সত্য্য সত্য্যবান নহে।

কিন্তু এই যে প্রকৃতিভাব, ইহা ব্রহ্মের শক্তির সহিত এক পদার্থ নহে। ব্রহ্মের প্রকৃতিভাবাপন্ন হইবার পূর্বে ব্রহ্মের শক্তির সত্তা আছে; কিন্তু প্রকৃতির সত্তা তখন প্রকৃতির আকারে ছিল না; শক্তির আকারে লীন ছিল। ব্রহ্ম এই শক্তিবশে পূর্বে যে নিজা-দান ভোগ করিতেছিলেন, তাহা পূর্ষ ভাবেই ব্রহ্মেতে রহিল অর্থাৎ ব্রহ্ম তাঁহার নিজদান বিস্মৃত বা নিজ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইগেন না। এবং যে শক্তিবশে তাঁহার স্বরূপ অচ্যুত রহিল, তাহাবই কিরণংশ স্বজনে-জ্ঞান পরে সৃষ্টিকার্য্যে পরিণত হইল। ব্রহ্মে সেই পুরুষ ও প্রকৃতি ভাব দুইটা প্রকৃত পক্ষে একটা বস্তুরই ভাব বলিয়া ব্রহ্মকেই পরমেশ্বর বলা হইয়া থাকে।

সুতরাং ব্রহ্মের ঈক্ষণ ক্রিয়ায় পরমুৎকৃষ্ট হইতেই ব্রহ্মের চারিটা

ভাবের পরিচয় আমরা পাইলাম। প্রথম আদিম নিত্য ব্রহ্মভাব, দ্বিতীয় পুরুষভাব, তৃতীয় প্রকৃতিভাব, চতুর্থ শরমেধর ভাব। 'নিজানন্দের বৈচিত্র্য বাহ্য কবিতা ব্রহ্ম বে মুহূর্ত্তে সৃষ্টির সূচনা কবিলেন, অমনিই ক্রিয়ার পরিমাপক কালব্যাপার আরম্ভ হইল অর্থাৎ তিনিই কালরূপ ধারণ করিলেন। এবং যে মুহূর্ত্তে সসীম জগচ্ছবি তাঁহার স্বৰূপপথে সমুদিত হইল, অমনিই সসীমাবস্থা বা দেশেব আবির্ভাব হইল। সৃষ্টিকার্য্যে আনন্দের বিচিত্রতা সাধন হইল; কাজেই বৃষ্টিতে হইবে, বিষয় ও বিষয়ভোক্তা উভয়েবই বৈচিত্র্য বা বহুত্ব সাধনও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইল।

ব্রহ্মের স্বৰূপ মাত্রই তাঁহাতে যে সৃষ্টিছবি প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাঁহাতে তিনি নিজে যখন সেই ছবি দেখিয়াছিলেন, তখনই তিনি আপনাতে ব্যাষ্টিভাব আদ্যোপ ক্রিয়া জীব ও জগতের বীজভাব ধারণ কবিয়াছিলেন। স্মৃতবাৎ পবনেশ্বরেই ব্যাষ্টিভাবে এই অগণ্য জীব ও জগৎ।

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের বুদ্ধিবাদ জগৎ ব্রহ্মের এই ভাবান্তর ব্রহ্মের এক দেশবিশেষে বা অংশবিশেষে সাধিত হইল, একথা বলায় তাহাতে দোষ স্পর্শে, কাবণ, অসীম ব্রহ্মের অংশ কল্পনা কবিলে তাঁহার অসীমত্বের হানি হয়। আমাদের সর্বদা মনে বাধিতে হইবে যে, কাবণাবতাব ভাব পূর্ণভাবে বজ্রায় নাগিয়া তিনি একরূপ হইতেছেন। সমষ্টি পরমেশ্বরে ব্যাষ্টি জীবজগৎ আদির ছবি সূত্র হইতে সূক্ষ্মতম, এতদে ইহাও বৃষ্টিতে হইবে। বটবীজবোধে অণুনীক্ষণ সাহায্যে যেমন ভাবী বৃক্ষরূপি দেখা যায়, এবং জলপরমাণুসমূহ একত্র অণুত্ব হইয়া যেমন জলাশয় নামে খ্যাত হয়, সূক্ষ্ম ও অঙ্গীভূতর অংশে পবনেশ্বরে ব্যাষ্টিভাব কতকটা তদ্রূপ। স্থূল চক্ষে বটবীজে যদ্রূপ বটবৃক্ষ অথবা জলাশয়স্থ অণুও জলের অঙ্গীভূত জলপরমাণুসমূহ যেমন অদৃশ্য বস্তু, পরমেশ্বরে সেই প্রথম বহুতাবও তদ্রূপ বৃষ্টিতে হইবে।

যে উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের এই বহুত্ব সাধন, তাহা ঐ বীজভূতরূপে সুসজ্জ না হওয়াব অহং ইদং ভাবেব বা জড়চেতনের বিশেষ অভিযুক্তি প্রযোজন হইল অর্থাৎ প্রাণবিশিষ্টত্বের প্রযোজন হইল। ভগবান্ এইবার আকাশাদি পঞ্চমহাভূত হইয়া, বিশেষ বিশেষ চেতনকণাব ভোগোপকরণ ও সাধনের আকার ধারণ করিলেন। আকাশাদির পঞ্চবিষয়তা বা গুণই উপকরণ, এবং সেই পঞ্চ মহাভূতের সাব পদার্থ ইন্দ্রিয়াদি এবং অন্তঃকরণ রূপে ভোগসাধন হইল। পবনেশ্বরও তৎসঙ্গে সমষ্টিভাবে হিরণ্যগর্ভভাব গ্রহণ করিলেন।

ইহাতেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়ায়, সেই ভূতপক্ষ, পক্ষীকৃত অর্থাৎ প্রত্যেক ভূত পক্ষগণবিশিষ্ট হইয়া আবার নূতন এক প্রকার পক্ষ মহাভূত রূপে পরিণত হইল ; এবং তাহাদেব সারভাগ হইতে সেই অন্তঃকরণাদি-বিশিষ্ট ব্যাষ্টি জীবের এই পবিত্রস্থান ভোগায়তন স্থল দেহ জন্মিল। ভগবানও সেই সঙ্গে তাহাদেব সমষ্টিভাবে বিবাটরূপ ধারণ করিলেন।

এইবার তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইল, এতক্ষণে তাঁহার এই পরিদৃশ্য-মান জগৎস্রাব ধারণ করা হইল। সূতরাং বুঝিতে হইবে, আমরা অজ্ঞ অবস্থায় যে জগৎ দেখি ও উহাকে যে রূপে ধর্ম্মবিশিষ্ট মনে করি, উহা সেরূপ নহে, উহা যথার্থতঃ যে রূপে বস্তুরূপে তাহার নাম ব্রহ্ম। কল কথা, যাহা যে রূপে দেখিতেছি, তাহা সেরূপ নহে, ভিতরে অল্প ব্যাপার, অল্প ভাব সনাতন ভাবে রহিয়াছে। বিরাটরূপী ভগবানকে বুঝিতে হইলে—যাহা দেখিতেছি, তাহার মধ্যে ভগবানকে জানিতে হইলে, এই সমগ্র জীবসমূহের যে সাধারণ ভাব ও বৃত্তি ও ইহাদের সমষ্টি ভাবেব সহিত যে ব্যাষ্টি ভাবের বিশেষত্ব, তাহা বুঝিতে হইবে।

বৃক্ষ ব্যাষ্টি কিন্তু বন সমষ্টি। বৃক্ষ হইতে এক কার্য্য হয়, কিন্তু বন হইতে তাহা ছাড়া অল্প কার্য্যও সাধিত হয়। সমস্ত বৃক্ষের যে একটা সাধারণ ভাব আছে, তাহা সেই বনের ভাব। বন বলিলে সমুদায় বৃক্ষ বুঝায়—বৃক্ষ বলিলে কিন্তু বন বুঝায় না। বৃক্ষের শক্তি অল্প, বনের শক্তি মহতী। বনস্থ বৃক্ষের বৃক্ষ ও স্রাব, এই ভাবে বনকে বৃক্ষের নিয়ামক কথা যাইতে পারে। কোন কোশলে বৃক্ষ যদি বনস্থ প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে বনের মহতী শক্তি বৃক্ষও প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাষ্টিভাবে দেখা যায়, সর্ব প্রাণীবই যথাসম্ভব সুখেচ্ছা, জীবিতাশা, জ্ঞান-পিপাসা বা শক্তিপ্রিয়তা বর্ত্তমান। সূতরাং সর্বপ্রাণিসমষ্টি ভগবানেও ঐ বৃত্তি বর্ত্তমান। এক্ষণে ভগবানকে মঙ্গলময় বলা হয়। যদি কেহ স্বীয় মঙ্গল কামনার সহিত অপরের মঙ্গল কামনা কবে, স্বীয় রক্ষণাবেক্ষণের সহিত অপরেরও তাহাই করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে ঈশ্বরীয় বৃত্তির অনুগামী হইয়াছে, এবং তৎসংসৃষ্ট ঈশ্বরীয় ভাবেব বা সুখের কিছু আশ্বাদ পাইবে। আবার তাহার প্রতিকূলতা আচরণ করিলে তদ্বিপরীত দুঃখও অবশ্যস্রাবী।

বলিতে পারা যায়, তবে ভগবানেব দুঃখের সৃষ্টি করা কেন? উত্তরে বলিব, সুখের মাত্রা বৃদ্ধি কবাই উহার উদ্দেশ্য ; কারণ, দুঃখের পর সুখ বড়ই প্রিয় হয়, এবং নিয়ত দুঃখ কোথায়ও নাই। আর দুঃখের উদ্দেশ্যে ভগবান

দুঃখসৃষ্ট করেন নাই। ব্যষ্টিভাবের শক্তি একত্র হইলে সমষ্টিভাবের শক্তিতে পরিণত হয়, এবং সেই হেতু সমষ্টি ভাবের শক্তির যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যই, তাহার শক্তির পরিচায়ক, সুতরাং ব্যষ্টিভাবের শক্তি একত্র হইলে ঐশ্বর্য্য আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং ঐশ্বর্য্যের ফল যে সুখ ও আনন্দ, তাহাও আসিবে। ব্যষ্টি জীবের জ্ঞান যে যে বিষয়ে সমষ্টি ভাবের সহিত মিলিত হইবে, সেই সেই বিষয়ে অজ্ঞান দূর হইয়া যাইবে এবং জন্মে সার্বজনীন উৎকর্ষ সাধনে সকলকে সহায়তা করিবে।

সর্ব্ব বিষয়ক অজ্ঞান দূর হইলে যে পরিশেষে ভগবৎস্বরূপতা লাভ স্ক্রনিচয়, এতদ্বারা তাহা বেশ বুঝা যায়। এই বাক্ত জগতে ভগবানের স্বতন্ত্র পবিচয় লাভ কবা যাইতে পারে, তাহা লাভ করিলে, উক্ত ফলগুলি যে আপনি আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব ভগবৎস্বাদেশী ব্যক্তি দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে নিজের যেমন ইহপারলৌকিক উপকার সাধিত হয়, সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জাতিতেও তদ্রূপ উপকার সাধিত হয়। ইহাতে আত্মপবভাব হ্রাস পাইয়া, সকল বস্তুতে আত্মভাব সমুদিত হয়। জীবের কর্তব্য শাস্ত্র এই ভিত্তি উপর সংস্থাপিত হইলে উহা যে সার্বভৌমিক ও সকলের আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেখিলাম, পরমেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে আমাদের কর্তব্যাহর-গুলিও বুঝা যায়। যে মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া আমরা আমাদের কর্তব্য নির্দেশ কবি, তাহা জীব ও পরমেশ্বরের স্বভাবের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইহাদের স্বভাব আলোচনা কবিতো পারিলে কি বিধেয়, তাহা আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম কবিতো পারি।

পূর্বে যাহা আলোচনা কবা হইল, তাহাতে আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকটা সাধারণ সত্য নিরূপণ কবা সম্ভব বোধ হয় নটে কিন্তু জীবের কর্তব্য বা স্বাধীনতা যদি না থাকে, তাহা হইলে, উক্ত প্রয়াস বুঝা জীবের স্বাধীনতা যদি থাকে, তবেই তাহার কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ সার্বক, তবেই তাহার মন্দ প্রবৃত্তিনিচয় পরিবর্তন সাধনের সম্ভাবনা। স্বভাবের শ্রোতে যদি আমরা মন পবিচালিত হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্ব চেষ্টাই বুঝা। সুতরাং অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিব।

শ্রীযাজ্ঞেশ্বর নাথ গোস্বামী

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

শ্রীম—কথিত ।

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে ভক্ত সঙ্গে । ]

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী । ১৮ই অক্টোবর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ । ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন । শরীর অসুস্থ—কলিকাতায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন । ভক্তেরা সর্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন । ভক্তদের মধ্যে এখন কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই—তাহার নিজের বাটী হইতে যাতায়াত করেন ।

[ সুরেন্দ্রের ভক্তি । ]

শীতকাল, সকাল বেলা ৮টা বাজিয়া গিয়াছে । ঠাকুর অসুস্থ, বিছানায় বসিয়া আছেন । কিন্তু পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত ; মা বই কিছু জানেন না । সুরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন । নবগোপাল, মাষ্টার ও আবও কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন । সুরেন্দ্রের বাটীতে ৬ভূগাপূজা হইয়াছিল । ঠাকুর যাঁহিতে পাবেন নাই, তাই ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন । আজ বিজয়া, তাই সুরেন্দ্রের মন খাপাপ হইয়াছে ।

সুরেন্দ্র । বাড়ী থেকে পালিয়ে এলাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মাষ্টারের প্রতি ) । তা হলেই বা । যা হৃদয়ে থাকুন ।

সুরেন্দ্র মাঝে মাঝে পবনেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিত লাগিলেন । ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া গদ গদ স্বরে বলিতেছেন, কি ভক্তি ! আহা, এঁর যা ভক্তি আছে !

শ্রীরামকৃষ্ণ ( সুরেন্দ্রের প্রতি ) । কাল ৭টা ৭।০ টার সময় তাবে দেখলাম, হোমাদেব দালান । ঠাকুর প্রতিমা বহিষাছেন, দেখলাম সব জ্যোতি-

---

\* দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত । For opinions see advertisement sheets.

শ্রয়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে! যেন একটা আলোর স্রোত হু জায়গাব মাঝে বইছে!

স্ববেদ্র। আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা বলে ডাকছি, দাদাবা ত্যাগ কবে উপবে চলে গেছে। মনে উঠলো, মা বলেন, আমি আবাব আসবো।

( ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও শ্রীভগবদগীতা । )

বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথা পাইলেন। মণি হাতে আঁচাবার জল দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণি ব প্রতি )। ছোলাব ডাল খেয়ে রাখালের অসুখ হয়েছে। সাত্বিক আহাব কবা ভাল। তুমি গীতা দেখ নাই?

মণি। আজ্ঞা হাঁ, যুক্তাহাবের কথা আছে। সাত্বিক আহাব, বাজসিক আহাব, তামসিক আহাব। আবাব সাত্বিক দয়া, বাজসিক দয়া, তামসিক দয়া। সাত্বিক অহঃ ইত্যাদি সব আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। গীতা তোমার আছে?

মণি। আজ্ঞা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওতে সর্বশাস্ত্রের সাব আছে।

মণি। আজ্ঞা, দৈবকে নানা রকমে দেখাব কথা আছে; আপনি যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ধ্যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কর্মযোগ মানে কি জ্ঞান? সকল কর্মের ফল ভগবানে সমর্পণ করা।

মণি। আজ্ঞা, দেখেছি ওতে আছে। কর্ম আবাব তিন রকমে কবা যেতে পারে, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি কি বকম?

মণি। প্রথম, জ্ঞানের জন্ত। দ্বিতীয়, লোকশিক্ষার জন্ত। তৃতীয়, স্বভাবে।

ঠাকুর আচমনাঙে পান খাইতেছেন। মণিকে মুখ হইতে পান প্রসাদ দিলেন।



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ, Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ । ]

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন । পূর্বেদিনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমাব সঙ্গে কি কি কথা হলো ?

মাষ্টার । ডাক্তারের ঘরে অনেক বই আছে । আমি এক খান বই সেখানে বসে বসে পড়্ছিলাম । সেই সব পড়ে আবার ডাক্তারকে শেনাতে লাগলাম । Sir Humphrey Davy \*র বই । তাতে অবতারের প্রযোজন, এ কথা আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বটে ? তুমি কি কথা বলেছিলে ?

মাষ্টার । একটা কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষে বুঝতে পারে না । ( Divine truth must be made human truth to be appreciated by us. ) তাই অবতারাদির প্রয়োজন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বাঃ, এ সব ত বেশ কথা ।

মাষ্টার । সাহেব উপমা দিয়েছে, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো বেথানে পড়ে, (Reflected rays) সে দিকে চাওয়া যায় ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । বেশ কথা, আর কিছু আছে ?

মাষ্টার । আর এক জায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান-হস্তে বিশ্বাস ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এ তো খুব ভাল কথা । বিশ্বাস হ'লে ত সবই হয়ে গেল ।

মাষ্টার । সাহেব আবার স্বপন দেখেছিলেন,—রোমানদের দেব দেবী ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । এমন সব বই রয়েছে ? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাষ করছেন । আর কিছু কথা হ'লো ?

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও 'জগতের উপকার' । ]

মাষ্টার । ওবা বলে, জগতের উপকার করবো । তাই আমি আপনার কথা বললাম ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে) । কি কথা ?

---

\* Sir Humphrey Davy's *Consolations in travel or the Last Days of a Philosopher*.

বিশ্ববিদ্যালয় অধীত হয় এবং ব্যবহার্য শাস্ত্র ও রাজনীতি বহুতর আইন শিক্ষার কলেজে অধ্যাপনা হয়ে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সাহিত্য কলেজের শিক্ষা শেষ হলে যাহারা বিশেষ অমুশীলন করতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের জন্য বিশেষ শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে (Post-graduate course.)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বহু পুস্তকাগার, চিকিৎসা কলেজের আনুষঙ্গিক চিকিৎসালয়, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বস্তুদিস্থান (Observatory) পদার্থ-বিদ্যা, বসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র ও কৃষিবিদ্যা অমুশীলনার্থ ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরি (Laboratory) প্রভৃতি আধুনিক উপকরণ সকল শিক্ষার সহায়তা করছে। ইহা ব্যতীত উদ্ভিদবিদ্যা শিখবার জন্য বহুবিভূত নানাতাত্ত্বিক ও নানাদেশীয় বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ বাগান, জাহাজ নির্মাণের কারখানা ও সামুদ্রিক ল্যাবরেটরি, কৃষিক্ষেত্র, পটুচিকিৎসালয়, বনজঙ্ঘের উৎকর্ষ সাধন করবার জন্য বৃক্ষপূর্ণ বন, রেসমের চাষের উন্নতিকল্পে বিশেষ কৌশলে নির্মিত অট্টালিকাদি নগরের বিভিন্ন স্থলে অবস্থিত। এ সমস্তই কলেজের ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য সমস্ত দিন ও রাত্রি উন্মুক্ত। উপরে যে সকল বিদ্যাশিক্ষার কথা বলা হল, ইহাব প্রত্যেক শিক্ষা বিশেষে ব্যাপক হতে ৩৪ বৎসর কাল বিভিন্ন কলেজে অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয় না।

যারা শাস্ত্রবিশেষে পারদর্শী হ'তে ইচ্ছা করেন, তাঁরা উপরোক্ত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বিশ্ববিদ্যালয়মন্দিরে (University Hall) পাঁচ বৎসর সেই বিষয়ের অমুশীলন করে থাকেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্দির জাপানে উচ্চশিক্ষার শেষ জোপান। ইহাই Post-graduate course, বৈজ্ঞানিক উচ্চ-শিক্ষার জন্য জাপান এখন পরমুখাপেক্ষী নয়। প্রথমে বিদেশীয় অধ্যাপকদিগের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদি অধ্যাপনা হ'ত, কিন্তু আজ এই ক'দিনে বিজ্ঞানজগতে জাপানের নাম শ্রুতি হ'য়েছে। আজ বিজ্ঞানের দ্রুত গতি ভবের মর্যাদাব্যাপ্তি জাপানি মস্তিষ্কপ্রসূত। জাপান আজ বিজ্ঞানবিদ্যে তদ্বৎসরী শিক্ষাপ্রদানের স্থান অধিকার করেছে। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী অধ্যাপকের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হচ্ছে।

## সংবাদ ও মন্তব্য ।

আগামী ২৭শে জানুয়ারি বেলুডমঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিপূজা ৩৬ তৎপরদিন রবিবার ২৯শে জানুয়ারি সর্বসাধারণের জন্য উৎসব হইবে। তৎপলাক্ষে বেদাদি পাঠ, সঙ্গীত, কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতি হইবে।

বিগত ১৬ই ডিসেম্বর মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে কলিকাতা বিবেকানন্দ-সমিতির এক অধিবেশন হয়। স্বামী দারদানন্দ ‘স্মৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে গীতার উপদেশ’ বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন।

দেশের জন্য কোন সংকার্য করিবার প্রস্তাব হইলে অনেকেই এই বলিয়া আপত্তি করেন,—এ কার্যে অগাধ অর্থের প্রয়োজন। আমাদের সে ধনবল কোথায়? ধনের আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু প্রথম চাই লোকবল, যাহারা পদব্রজে লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্মের ও সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিদ্যার বিস্তার করিবেন, দেশের অভাব স্বচক্ষে দেখিবেন, লোকের কষ্ট প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন, পরে প্রাণ দিয়া সেই অভাব মোচনে সহায়তা করিবেন। যাহারা দেশকে ইষ্ট বলিয়া জানিবেন, নরসেবাকে ঈশ্বরসেবার সহিত অভেদজ্ঞান করিবেন।

এ বিষয়ে ত শিক্ষা দীক্ষা আবশ্যক? আবশ্যক বৈ কি। তৎক্ষণ ‘ব্রতধারী’সিঙ্কালয় চতুর্দিকে প্রয়োজন। প্রাচীনকালের গুরুগৃহের কতকটা জীব লইয়া তাহাতে সেবা, সাধন, অধ্যয়ন প্রভৃতি শিক্ষা আবশ্যক।

গুরুগোবিন্দ সিং সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। কলিকাতা, তখন এক সময় শক্তি পূজা করিয়া শিষ্যগণের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন যে, মা নরবলি চাহিয়াছেন, অতএব তোমাদের মধ্যে কে কে বলি হইবার জন্য প্রস্তুত? একজন অগ্রসর হইল। তাহাকে ঘবনিকার মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার রক্ত অপর শিষ্যগণকে প্রদর্শিত হইল। আর কে প্রস্তুত বলিয়া আত্মারী'করা হইল, আর একজন অগ্রসর হইল। এইরূপে কয়েকজনকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ যাদের জন্য বলি দেওয়া হইল। তাহারাই পরে ‘কলি’ দিগের পৌরবপ্রতিষ্ঠার নেতা হইরাছিল। ‘বলা বাহুল্য, সাধারণের কেবল ছাত্ররক্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মাষ্টার। শত্ৰু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে, টাকা দিয়ে কতকগুলি হাঁসপাতাল, ডিম্পেন্সরী, স্কুল এই সব করে দি, তা হ'লে অনেকের উপকার হ'লে। আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বলুন, “যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তবে তুমি কি বলবে, আমাকে কতকগুলি হাঁসপাতাল, ডিম্পেন্সরী, স্কুল করে দাও?” আর একটা কথা বললাম।

ত্রিভীরামকৃষ্ণ। হাঁ, থাক আলাদা আছে, তারা কণ্ঠ করতে আসে। আর কি কথা?

মাষ্টার। বললাম, কালী দর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল কাঙ্গালী বিদায় করলে কি হবে? বরং যো যো করে একবার কালী দর্শন করে নাও, তার পর যত কাঙ্গালী বিদায় করতে ইচ্ছা হয় করো।

ত্রিভীরামকৃষ্ণ। আর কিছু কথা হ'লো?

[ ঠাকুরের ভক্ত ও কামজয় । ]

মাষ্টার। আপনার কাছে যাবা আসে, তাদের অনেকে কাম জয় করেছেন, এই কথা হলো। ডাক্তার তখন বললে, “আমারও কাম টাম উঠে গেছে, জানো?” আমি বললাম, আপনি তো বড় লোক। আপনি যে কাম জয় করেছেন, বলছেন, তাতো আশ্চর্য্য নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের পর্য্যন্ত তাঁর কাছে থেকে যে ইন্দ্রিয় জয় হচ্ছে, এই আশ্চর্য্য।

“তার পর আমি বললাম, আপনি যা গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন।”

ত্রিভীরামকৃষ্ণ ( সহাস্য )। কি বলেছিলাম?

মাষ্টার। আপনি গিরীশ ঘোষকে বলেছিলেন, ‘ডাক্তার তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই।’ সেই অবতারের কথা।

ত্রিভীরামকৃষ্ণ। তুমি অবতারের কথা তাঁকে ( ডাক্তারকে ) বলবে। অবতার অর্থাৎ যিনি তারণ করেন। তা দর্শনাত্মক আছে, চক্ৰবর্তী অবতার আছে, আবানু অসংখ্য অবতার আছে।

মাষ্টার। গিরীশ ঘোষের ভারি খবর নেই। কেবল জিজ্ঞাসা করে, গিরীশ ঘোষ কি সব মদ ছেড়েছে? গিরীশ ঘোষের উপর বড় চোখ।

ত্রিভীরামকৃষ্ণ। তুমি গিরীশ ঘোষকে ও কথা বলেছিলে?

মাষ্টার। আছে হাঁ, বলেছিলাম। আর, সব মদ ছাড়বার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি বল্লে ?

মাষ্টার। তিনি বললেন, তোমরা যে কালে বলছো, সেখানে ঠাকুরের কথা বলে মানি—কিন্তু আব জোর করে কোন কথা বোলবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও নিত্যলীলা যোগ। ]

[ Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal world. ]

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে) ও হেম, ডাক্তারের সঙ্গে আসিয়াছেন। নবেস্ত্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন।

ঠাকুর নিভূতে অমৃতের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা কহিতেছেন, তোমার কি ধ্যান হয় ? আর বলিতেছেন,—‘ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান ? মনটা হযে যায় তৈলধাবাব লাগে। এক চিন্তা, ঈশ্বরের ; অথ কোন চিন্তা তার ভিতর আসবে না’। এইবার ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)। তোমার ছেলে অবতার মানে না। তা বেশ। নাই বা মান্লে।

“তোমার ছেলেটা বেশ। তা হবে না ? বোধহয় আমার কাছে কি টোকো আম হয় ? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস। সেই ত মানুষ। মানুষ আর মানহুঁস। যার হুঁস আছে, চৈতন্য আছে, সে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মান হুঁস।

“তা অবতার মানে না, তাতে দেরি কি ? ঈশ্বর ; আর এ সব জীব জগৎ, তাঁর ঐশ্বর্য্য। এ মান্লেই হলো। যেমন বড় মানুষ আর তাব দ্বাগান।

“এ বকম আছে, দশ অবতার—চরিত্র অবতার আবার অসংখ্য অবতার। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার। তাইত আমার মত।

“আব এক আছে, যা কিছু দেখছে, এ সব তিনি হইছেন। যেমন

বেল, ব্রিটি, খোলা, শাঁস তিন ছড়িয়ে এক। ধারই নিতা, তাঁরই লীলা,  
বাঁরই লীলা, তাঁরই নিতা। নিতায় ছেড়ে শুধু লীলা বোঝা যায় না।  
লীলা আছে বলেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিতো পৌছান যায়।

“অহংবুদ্ধি বতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে বাবার বো নাই।  
নেতি নেনতি করে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিতো পৌছান যেতে পারে।  
কিন্তু কিছুই ছাড়বার বো নাই। যেমন বললাম—বেল।

ডাক্তার। ঠিক কথা।

শ্রীবাসকৃষ্ণ। কচ\* নির্দিকল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে,  
একজন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বললেন, দেখছি যে,  
জগৎ যেন তাঁতে জ্বরে রয়েছে। তিনিই পরিপূর্ণ। যা কিছু দেখছি, সব  
তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্টা ফেলনো, কোন্টা লবো, ঠিক  
পাচ্ছি না।

“কি জ্ঞান নিত্য আর লীলা দর্শন করে, দাস ভাবে থাক। হুম্মান  
সাকার, নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছিলেন। তার পরে, দাস ভাবে ভক্তের  
ভাবে ছিলেন।

মণি (স্বগতঃ)। নিতা লীলা দুইই নিতে হবে। জন্মানিতে বেদান্ত  
বাওয়া অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছারও কাছারও এইমত†। কিন্তু  
ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ—না হলে নিতা ও  
লীলার সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ঠিক ত্যাগী! সম্পূর্ণ অনাসক্তি।  
এইটুকু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ দেখছি।

## নূতন জাপান।

স্বামী সদানন্দ লিখিত।]

[পূর্বপ্রকাশিতের পর।

সহর বেড়িয়ে আমরা কোবি ষ্টেশনে ফিরে এলাম। কোরি  
থেকে টোকিও পর্যন্ত বেলপথ। আমরা যে, গাড়িতে চড়লুম, তাহা  
ডাক গাড়ি; আমেরিকার অনুকরণে প্রস্তুত, ঘুমোবার ও খাবার সত্বর

\* যোগবাসিষ্ঠ।

† Hegel

কামরা আছে। প্রত্যেক টেনে কতকগুলি বালক চাকর যাত্রীদের জিনিষপত্র কেনা, বিছানা কবা, কাপড় জুতা, খাবিকার কবা প্রভৃতি সেবার্থ্যে নিযুক্ত থাকে। এই বেল পথটী অনেক পাহাড় কেটে কবতে হ'য়েছে স্রুতবাং যাবাব সময় বিস্তব টনেল ( Tunnel ) দেখা গেল। রেলের দু'ধাবেই ঝানের ক্ষেত। যে দিকে দেখ, ঝানা হ'তে জল পড়'চে, চার্লিকিক'ই সরু সরু নদী। জাপানে কিরূপ ইউবোপীয় ব্যবসায় বৃদ্ধি প্রবেশ ক'রেছে, তা বেল দেখলেই বুঝা যায়। টেনেব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছাড়া, রেলপথের দু'পাশেই বড় বড় কাঠের বোড়ে অসংখ্য বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। জাপানের প্রত্যেক টেনে এ দেশের পুবি মিঠাই বা কটি গোসেন মত যাত্রীদের আহ্বারের জন্য এক একটা ছোট কাগজের বাজের ভিতর ভাত মাছ ও ব্যঞ্জন, সঙ্গে দুটি কাটি, বিক্রী হয়ে থাকে। ১৮৭২ সালে জাপানে প্রথম বেল খোলা হয়। প্রথম বৎসর ১৮ মাইল নির্মাণ হয়েছিল। ১৯০১ সালে ৪০০০ মাইল বেল খোলা হয়েছে। ইহাব মধ্যে প্রায় ১০০০ মাইল বেল রাজসরকার কর্তৃক নির্মিত; বাকি ৩০০০ মাইল বে-সবকারি ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানির দ্বায্য প্রস্তুত। এই বেলপথ নির্মাণ কবতে বাজভাণ্ডার হ'তে প্রায় কুড়ি কোটি এবং বিভিন্ন কোম্পানির বত্রিশ কোটি টাকা মূলধন ব্যয় হয়েছে। জাপান রাজত্বের প্রথম উদ্দেশ্য,—সকল কার্য্য, সকল ব্যবসায় প্রজাদের জন্য খুলে দেওয়া। প্রজাবা শিক্ষিত হ'বে এই সকল কার্য্যভার নিজেরা যেমন গ্রহণ কব'ছে, বাজহস্তও ধীবে ধীবে সে সকল তাদের উপর অর্পণ কব'ছে।

আমাদের জাপানি সমভিব্যাহারী ইয়োকোহামা (Yokohama) যাবার জন্য আমাদের নিকট বিদায় নিলেন। তাঁর সহিত আলাপ অবধি আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। আমবা এ পর্য্যন্ত তাঁর অতিথি হয়ে আসছিলাম, তাঁহার সহযোগে আমাদের বিদেশের কোন কষ্ট ভুগ'তে হয় নি। বিদেশীর প্রতি এরূপ আতিথ্য জাপান ভিন্ন অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। টোকিওতে কোন পূর্বপরিচিত জাপানি বন্ধুর বাটীতে আমরা অতিথি হব স্থির কবেছিলাম। ইহাকে তাঁহার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় জাপানি ভাষায় লিখে দিখে বললেন, যে কোন পুলিশের লোককে ইহা দেখালেই আমবা গন্তব্য স্থানে যেতে পাব'বো। তাঁহার নিঃস্বার্থ আতিথ্যের জন্য শত শত ধন্যবাদ দিয়ে আমবা পরম্পর বিদায়

## নূতন জাপান।

৩ সিংহাসনে উপস্থিত। এই কক্ষাট  
এই আগষ্ট প্রায় একমাসে আমবা জাপানের  
গুম। পিতলের চাক্তি দেখাবামাত্র কুলিরা  
র একটা কুকরা (বিনবিক্রম জাপানি নাম)  
হুম্মাওলাকে আমাদেব ঠিকানা দিবে একজন  
পঞ্চ জেমে নিতে বলুম। জাপানি পুলিশ কি  
সকলেরই সহায় স্বরূপ। তাহাবা ঘেরূপ দেশে শান্তি-  
বাক্তিরও যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকে। যদি কোন  
ভুক্ত বিদেশী লোক বিপদে পড়ে, বাস্তা থেকে টেলিফো-  
নিয়ে পুলিশ তাব তদন্ত কবে থাকে। জাপান দেশে  
এই—সেখানে সম্রাট থেকে সামান্ত পুলিশ পর্যন্ত  
প্রজা সাধারণেব প্রতিনিধি জ্ঞান কবে। প্রজাব মুখ  
হু তাবা—তারা প্রজারক্ষক, যথার্থই “আপমাত্রা।” আর  
জ, মাজিষ্টেব, মিউনিসিপালিটি, পুলিশ, কেবানিরাবু পর্যন্ত দেশেব  
তিনিধি—সকলেই সবকাবের চাকব, ভাবতের প্রজা সাধারণেব  
দেব ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ। পুলিশেব লোক বাড়ি এলেই  
উপস্থিত মনে করি; সর্বস্বান্ত হলেও লোকে পুলিশেব  
কবতে চায় না। ঘোল আনা টেন্স দিযেও প্রজাকুল মিউনিসি-  
নিকট জোডহস্ত। সকল অবস্থাতেই আমাদেব “নায়েব কড়ি  
ডুবে পাব।

টোকিওতে আমবা যেখানে বাসা ভাড়া কলুম, তাহার অতি নিকটেই  
গানের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় (Tokio Imperial University)। যেসকল  
স্তির সম্মিলনে নূতন জাপানেব অভ্যুদয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা তাহাদের  
মধ্যে প্রদান। পূর্বে এ দেশের চতুষ্পাঠীতে যেনন সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার  
ব্যাকরণ ভাষা দর্শনাদিচর্চা হ’ত ও ব্রাহ্মণবর্ণেরু ভিতর সেই সকল বিদ্যা  
আবৃত্ত ছিল, জাপানেও সেইরূপ চীন সাহিত্যের ও শাস্ত্রগ্রন্থের আদর ও  
অধ্যয়ন হ’ত। রাজা ও জমিদারদিগের সভাতেই বিদ্বজ্জনেরা আপনাদের  
পাণ্ডিত্যের পবিচয় দিতেন। লেখা পড়া প্রধানতঃ বুদ্ধ শ্রমণদের হাতে ছিল।  
যখন কোন শাসনকর্ত্তা (মোগল) বিন্যাস্ত্রাঙ্গী হ’তেন, তিনি গ্রাম্য  
পাঠশালা স্থাপন করে সাধারণ শিক্ষার কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা করতেন কিন্তু



## উদ্বোধন!

দেশের যত জাপানেও উল্লেখ্য ভিৎ দেবতা  
ভারতের জায় জাপানের অদৃষ্ট আকাশে যত দি  
না হয়েছিল, ততদিন জাপান আপনায় এটি  
শিল্প বজায় রেখে সুখে দুখে জীবন যাত্রা দি  
যুদ্ধের মর্কন নৌসেনাপতি কমোডর পেরির (Com  
জাহাজ থেকে জাপানের বন্ধ দার উন্মুক্ত কব্জার জ  
হ'ল, জাপানের জনকতক শৃঙ্গদর্শী লোক স্থিৰ বুকলে  
কব্জতে তাহাদেব প্রাচীন শিক্ষা কৌশল অক্ষম। অজ্ঞে  
পশ্চাতে এক নূতন জ্ঞানবল বর্তমান। যদি এই জা  
বিপদ থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে, যদি জাপা  
রক্ষা কব্জতে চায়, তা হ'লে এই নূতন বিজ্ঞানবল সহ  
মচেন নয়। জাপান বুকলে, যদি তার চিরাগত স্বাধ  
নষ্ট হয়, তবে তার ধর্মকর্ম, ইহলোক পরলোক চিরদিনের  
অতলজলে নিমজ্জিত হবে। এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানরূপ মহাশক্তি  
জাপান প্রাণ মন উৎসর্গ করলে। জাপান নিজেব সমাজ, ধর্ম,  
আচারাদি সমস্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত; বিদেশীয় আহাব, বি  
চ্ছদ, নিদেশীয় সমাজ, বিদেশীয় ধর্মগ্রহণ কর্তে কুণ্ঠিত নয়, :  
মহাদেবীপ্রবাদের দুইসহস্র বৎসরের স্বাধীনতা বক্ষা কব্জতে স  
জাপানেব মহা সাধনা সিদ্ধ হয়েচে, আজ জগৎ তাহাব সাক্ষী।  
জাপানেব অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন শিক্ষা জাপানে প্রবর্তিত হো  
১৮৭২ সালে নূতন শিক্ষাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র আজ্ঞায় দেশ মে  
প্রচারিত হোলো। সম্রাট ঘোষণা কব্জলেন—“কি রাজশাসনসম্বন্ধীয় কার্য  
কি বাণিজ্য, কি কৃষিকর্ম, কি শিল্প চিকিৎসা, যে কোন বৃত্তি হউক না, সক  
বিষয়েই, জ্ঞান লাভেব উপায় শিক্ষা। অদ্যাবধি শিক্ষাপ্রণালী একরূপ  
বিস্তারিত হবে যে, কোন গ্রামে একটীও অজ্ঞ পরিবার অবস্থান কব্জবে  
না, কোন পরিবারে একটীমাত্র লোকও মুখ থাকবে না।” জাপানের  
অদৃষ্টকালে এক জগজ্জয়া মহাপুরুষেব হাতে তার শাসনভার ঐক্য হয়ে-  
ছিল। তাহারই পুণ্যে জাপানেব ভাগ্যলক্ষী স্তপ্রসন্ন।

বর্তমান শিক্ষা আইনে প্রত্যেক বালক বালিকাকে সাধারণ বা জাতীয়  
শিক্ষা (National Education) লাভ কব্জতে হ'ল। ছয় বৎসর বয়স

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে বাতা বা অভিভাবক প্রত্যেক শালক ও বালিকাকে বিদ্যালয় পাঠাতে বাধ্য। ছয় বৎসর হতে চতুর্দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সাধারণ বা জাতীয় শিক্ষার কাল। বাহাতে অতি দীর্ঘদূরিত এই সাধারণ শিক্ষা লাভ করতে পারে, উক্ত প্রত্যেক গ্রামা সমিতি ও মিউনিসিপালিটি নিজেদের দ্বারা বিদ্যা দান করবার জন্য পাঠশালা স্থাপন করে। বিশেষ কারণ থাকলে স্থানীয় শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে শিক্ষার্থীর নিকট বেতন লবায় ব্যবস্থা আছে কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষা আপাততঃ সম্পূর্ণ বিনা বেতনে লাভ করে, ইহাই রাজ আজ্ঞা। যদি অবস্থার বৈচিত্র্যে ছেলেকে কোন কার্যে নিযুক্ত হতে হয়, তা হ'লেও যাতে শিক্ষা প্রাপ্তি বঞ্চিত না হয়, মিযোগকর্তাকে একপ ব্যবস্থা করতে হয়। ১৯০৩ সালে প্রায় ২৬৮০০ এইরূপ পাঠশালা (Primary School) ৪৮ লক্ষ বালক ও বালিকাকে জাতীয় শিক্ষাদান করছিল। প্রত্যেক একশত শিক্ষাপ্রার্থী বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মধ্যে ৯১ জন ঐ বৎসর শিক্ষাপ্রাপ্ত করতে পাঠশালায় প্রবেশ করে। এই সকল পাঠশালার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রামা সমিতি ও মিউনিসিপালিটি বহন করে। অর্থাভাবে পাঠশালা স্থাপনে অসমর্থ হ'লে রাজস্বাধিকার থেকে ব্যয় সংকলন হয়ে থাকে।

এই জাতীয় শিক্ষার দুটি শ্রেণী আছে। নিম্নশ্রেণীর পাঠশালায় আপানি ভাবা, গণিত, নীতি ও ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা ছাড়া চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও কায়ার ও ছুতাবের কর্ম, স্থানবিশেষে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। চারি বৎসর এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত করে উচ্চ শ্রেণীর পাঠশালায় প্রবেশ করতে হয়। এখানে দুই হইতে চারি বৎসর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করলে সাধারণ বা জাতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। উচ্চশ্রেণীর পাঠশালায় আপানি ভাবা, নীতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও ব্যায়াম শিক্ষা ব্যতীত স্থান-বিশেষে কৃষি, ব্যবসায়বিশেষ বা স্বত্ববাদের কর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বাগিকারার বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্ম, সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা করে।

এই জাতীয় শিক্ষা দিন দিন একপ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, স্থান-ভাবে সেনসিটিভ, লোকের আবাসস্থল প্রভৃতি স্থানে পাঠশালা স্থাপন করে শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হচ্ছে।

দশম হতে চতুর্দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই জাতীয় শিক্ষার শিক্ষিত যবে কোন বিশেষ অর্থকরী শিল্প লাভ করবার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে প্রবেশ

করতে হয়। এইরূপ বিদ্যালয়ের নাম মধ্য বিদ্যালয় (Middle school)। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রনিগের চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকে। ইহাতে শিক্ষার কাল পাঁচ বৎসর। জাপানি ভাষা, পাঠ্য পিত্ত, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদির সহিত স্থানবিশেষে ব্যবসায় বা উপজীবিকাবিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছা করে, এ ছাত্র নিগেরও উপযোগী মোটামুটি শিক্ষাবিধান আছে। যাহারা ব্যবসায়িক প্রতিভা বিশেষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে মনোবান, তাহারা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল শেষ করে বিশেষ টেকনিকাল (Technical) বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং যাহারা বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারি প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন হ'তে প্রয়াসী, তাহারা আর একশ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয় (High school) তিন বৎসব কাল অধ্যয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাবার উপযোগী হন। গত ১৯০২ সালে ২১৮টি মধ্য বিদ্যালয়ে প্রায় ৭৮০০০ ছাত্র শিক্ষালাভ কর্ছিল। ঐ বৎসব প্রায় ৩৭০০ ছাত্র বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অধিকাংশই উচ্চ ও টেকনিকাল বিদ্যালয়ে এবং অল্পসংখ্যক মৈনিক বিভাগে, ব্যবসায়বিশেষে ও রাজসরকারে নিযুক্ত হইতেছিল। এখন জাপানে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮টি। উচ্চ বিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী ছাত্রগণ অধ্যয়ন করে থাকে। জাপানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়। একটি বর্তমান রাজধানী টোকিওতে, অপবটী প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় নগরের বিস্তীর্ণ প্রদেশ নিয়ে অবস্থিত। ইহার মধ্যে ছয়টি কলেজ আছে। ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে, সিভিল (Civil) মেকানিকাল (Mechanical) ইলেক্ট্রিক (Electric) ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্মাণ, কামান বন্দুকাদি প্রস্তুত, স্থপতিবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, বাক্সাদি প্রস্তুত প্রণালী, খনিজ-দ্রব্য বহিষ্করণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত অধ্যাপকেরা শিক্ষাদান করেন; বিজ্ঞান কলেজে গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি আলোচিত হয়। কৃষিকলেজে কৃষিবিদ্যা, কৃষিসম্বন্ধীয় রসায়ন, অখণ্ডবানি প্রভৃতি ও চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। সাহিত্য কলেজে দর্শন, জাপানি সাহিত্য, চীন সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাশাস্ত্র, ইংরাজি, জার্মান ও ফরাসি সাহিত্য অধ্যয়ন করে থাকে। চিকিৎসা কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র ও ঔষধাদি